তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাবিংশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৩

—পঁয়তাল্লিশ টাকা—

প্রধান উপদেষ্টা ঃ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনিতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ ঃ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র ঃ

শ্রীমোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

ভা. র—২২

নব দিগন্ত

প্রারম্ভ

পৃথিবীর পূর্ব-গোলার্ধ জুড়েই প্রায় যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। লণ্ডন থেকে মস্কো—ফিনল্যাণ্ড থেকে ইওরোপের দক্ষিণ প্রান্ত, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল—সেখান থেকে লাফ দিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসাম—আসাম ছাড়িয়ে বার্মা, মালয় উপদ্বীপ, সেখান থেকে উত্তর মুখে হংকং হয়ে কোরিয়া। কোরিয়া কেন, সোভিয়েট রাশিয়া যখন যুদ্ধে নেমেছে তখন উত্তর মেরু পর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতেও আগুন জ্বলছে। চৈত্র মাসে পাহাড় অঞ্চলে যারা ঘুরেছে তাদের মনে হবে রাত্রিকালে পাহাড়ের বুকের বনে আগুন লাগার ছবি। আঁকাবাঁকা রেখায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত জ্বলছে—ঘাস পুড়ছে, ঝরা পাতা জ্বলছে, মধ্যে মধ্যে বড় বড় বনস্পতি জ্বলছে। মধ্যে-মাঝে খানিকটা খানিকটা ফাঁক। বহুদূর পর্যন্ত বাতাসে আগুনের আঁচ ভেসে আসে। কলকাতায় আঁচই আসছে না, মধ্যে-মধ্যে ছিটকে আসা অগ্নিপিণ্ডের মত বোমা পড়ছে। তার সঙ্গে সাইরেনের আতঙ্ককর ধ্বনি তো আছেই।

কলকাতা থেকে বাসিন্দারা সেই রেঙ্গুন পতনের কাল থেকেই পালিয়েছেন এবং পালাচ্ছেন। যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরির দায়ে নিজেদের পালাবার উপায় নেই, তাঁরা মেয়েছেলেদের সরিয়ে দিয়ে শনি-রবিবার যাচ্ছেন—আবার ফিরছেন। বাংলার বাইরে দেওঘর মধুপুর গিরিডি শিমুলতলার বাড়িগুলি ভরতি হয়েছে। বর্ধমান সিউড়ি বহরমপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি শহরগুলি তো কলকাতার বাবুতে গিজগিজ করছে। হাটে বাজারে হাটুরেরা এবং গ্রাম্য লোকেরা এদের নাম দিয়েছে—ড্যাঞ্চিবাবু।

কলকাতার বড় বড় কলেজগুলি বড় বড় শহরে—কেউ সিউড়ি কেউ নবদ্বীপ কেউ বর্ধমানে ব্রাঞ্চ খুলছেন। কারণ মা-বাপের সঙ্গে ছেলেরা পালিয়েছে, যারা হোস্টেলে থাকত তারাও এমন সহজ ছুটির অজুহাত ছাড়েনি, তারাও বাড়ি গিয়ে আধা-পলিটিক্স আধা-কালচার নিয়ে মেতেছে। তার সঙ্গে ফুটবল খেলা তো আছেই এবং প্রেমে পড়া ও প্রেমের কবিতা লেখাও আছে। খাস ব্রিটিশ সিংহ মিত্রদের সঙ্গে বাংলাদেশের শেষ সীমানা বরাবর—উখরা, পানাগড়, বাঁকুড়া, পিয়ারাডোবা, মেদিনীপুরে দ্বিতীয় আত্মরক্ষা লাইনের আস্তানা বানাচ্ছেন—পূর্ব সীমান্তে তাড়া খেয়ে পালাবার পথে এখানে হাঁফ ছাড়বেন; এবং এখানে একদফা লড়াই দেবার ভান করতে করতে সব দপ্তরপাটী গুটিয়ে দিল্লী বোম্বাইয়ের পথে পাড়ি দেবেন।

এদিকে দেশে কংগ্রেসের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আন্দোলন চলছে। তার পাশাপাশি চলছে 'জনযুদ্ধের' শোভাযাত্রা। ওদিকে বিয়াল্লিশ সালে সাইক্লোন হয়ে গেছে, যে সাইক্লোনের মত সাইক্লোন একশো বছরের মধ্যে হয়নি। তার ফলে হাজারে হাজারে মানুষ ঘর-ছাড়া হয়ে পথের ভিক্ষুক হয়েছে। শুধু তাই নয়—মড়ক এসেছে দেশে। এরই মধ্যে বর্ধমান জেলার শীতলহাটী গ্রামে চৌধুরী বাড়ির উত্তরাধিকারী শ্রীমান অজয় মুখুজ্জে শীতলহাটী শিবচন্দ্র হাই ইস্কুলের মুখোজ্জ্বল করে নামের পাশে তিন-চারটি অক্ষর চিহ্ন নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করে একটি সমস্যার সৃষ্টি করলে।

এরপর অজয় পড়বে কোথায়?

মা আর ছেলে নিয়ে সংসার। বিত্তের অভাব নেই, যথেষ্টই আছে। মা মনোরমা দেবী—একালের মান অনুযায়ী শিক্ষিতা নন—কোন পরীক্ষা তিনি পাস করেননি। কিন্তু সকল কালের যে একটি শিক্ষা ও যোগ্যতা—প্রয়োজন অনুযায়ী সব ভার নিতে সক্ষম করে

তোলে—সে শিক্ষা তাঁর ছিল। এক মাত্র সন্তান অজয়কে মানুষ করে তোলা তাঁর মাতৃধর্ম ; তো বটেই—তার উপর তাঁর স্বামীর শেষ অনুরোধ। এমন সমস্যা যে জীবনে আসবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এই শীতলহাটীতেই যে এসে কোনদিন বাস করতে হবে এই কি তিনি ভেবেছিলেন ? শীতলহাটীর চৌধুরী বাড়ি পুরানো বাড়ি। আয় চায় বিপুল কিছু না হলেও কম নয় ; বার্ষিক হাজার আষ্টেক টাকা জমিদারির মুনাফা—চাষের জমি—বাগান পুকুর নিয়ে সেকালের পক্ষে যথেষ্ট। এই আয় থেকেই এখানকার হাই ইস্কুল, গার্লস প্রাইমারি ইস্কুল, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি হয়েছে। দেবসেবা চলে। এ সবের গল্প অনেক দিন অর্থাৎ তাঁর বিয়ের পর থেকেই তিনি শুনে আসছেন, কিন্তু কখনও চোখে দেখেননি। জন্মের পাঁচ বছর পরই অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর স্বামী এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তবু তিনিও কোনদিন শীতলহাটী আসেননি। তাঁদের অর্থাৎ তাঁর স্বামীর বংশ আজ অজয়কে নিয়ে তিন পুরুষ চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে বাস করছিলেন। এখানে এই শীতলহাটীতে আসা সম্পর্কে একটা বিচিত্র মনোভাব ছিল তাঁদের ; এ সম্পত্তিতে প্রয়োজনও ছিল না। চট্টগ্রামে তাঁদের সম্পত্তি—আয় ছিল প্রচুর। শীতলহাটীতে আসার পক্ষে আর একটি বাধা ছিল। সেটা রেলস্টেশন থেকে চৌদ্দ মাইল দূরত্ব। এবং সে দূরত্ব অতিক্রমের একমাত্র সাধারণ যান ছিল গো যান ; তা ছাড়া পথে ছিল ভয়। গর্দানমারীর দেশ। আগের কালে ঘাড় ভেঙে ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ মারত ; রাহাজানি আজও চলে। রাহাজানি বাদ দিয়েও এবং গর্দান আজ না ভাঙলেও এই চৌদ্দ মাইল গো-যানে যেতে যাত্রীর সারা অঙ্গই ভাঙে। প্রায় গতর চূর্ণ হয়ে যায়। অজয়ের বাবা বিজয়বাবু বার দুই বর্ধমান পর্যন্ত এসেও এই পথের ভয়ে ফিরে গেছেন। কিন্তু যুদ্ধের ঠ্যালায় মনোরমা দেবী চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা এবং সেখান থেকে শীতলহাটীতে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

অজয়েরও পাঠ্যজীবনে বার বার ধাক্কা পড়ল। চট্টগ্রামে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ; সেখান থেকে কলকাতায় বছরখানেক—তারপর শীতলহাটীতে এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। অজয়ের এ ইস্কুল ভাল লাগেনি—পড়াশুনা ঠিক পছন্দ হয়নি। সে বরাবর শহরে প্রথম শ্রেণীর ইস্কুলে পড়েছে ; কিন্তু তার মা তাকে বলেছেন—কিন্তু করবে কি ? তা ছাড়া এ কথা তোমার বলা উচিত নয়। কারণ এ ইস্কুল তোমার বাবার মাতামহের নামের ইস্কুল—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তোমার ঠাকুর্দা। এটা মনে কর না কেন অদৃষ্ট চক্রান্ত করে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে পড়বার জন্যে। স্কলারশিপ নিয়ে ইস্কুলের গৌরব বাড়াতে হবে তোমাকে। জান তো শুনেছ তো সে-সব গল্প।

শুনেছে বইকি। সে গল্প তার ঠাকুর্দার গল্প। গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনিই চট্টগ্রাম গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। মস্ত বড় উকিল হয়ে সেখানে বিশাল প্রতিষ্ঠা বিপুল সম্পত্তি করেছিলেন। গিয়েছিলেন—এই চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে। বাড়ির সঙ্গে ঠিক নয়—এ বাড়ির গিন্নী তাঁর শাশুড়ী মাতঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

পূর্বকথা

গঙ্গাচরণ ছিলেন উড়ো কুলীনের ছেলে। শীতলহাটী থেকে ক্রোশ চারেক দূরে এক গৃহস্থ বাড়ির পোষ্য ভাগ্নে। বাপ শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়াতেন, বাস্তু তাঁর ছিল না ; মা মারা গিয়েছিল অল্পবয়সেই। মামী অবশ্যই সুচক্ষে দেখতেন না। কিন্তু ছেলেটি ছিল বুদ্ধিমান, অত্যন্ত মেধাবী ; নিকটস্থ মাইনর ইস্কুলে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে চার টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। সেই বৃত্তি অবলম্বন করে গিয়েছিলেন শীতলহাটীর ক্রোশ দেড়েক দূরের হাই ইস্কুলে পড়তে। বৃত্তি পাওয়া ছেলে—ইস্কুলে মাইনে লাগত না। সেকালে বাংলাদেশে অন্নের অভাব ছিল না। ওই গ্রামে তাঁর মাতামহের এক শিষ্যের বাড়িতে সমাদরের সঙ্গেই আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছিলেন।

গঙ্গাচরণ বলতে গেলে নিজের জোরেই বেড়ে উঠছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সংসারে বাঁচতে হলে যতটা সংকোচ ও সংস্কারহীন হতে হয় তা তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। দুটো প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন বাপ-মার কাছ থেকে—সেটা তাঁর স্বাস্থ্য আর পেয়েছিলেন জেদী মন। তারই জোরে মাতামহের শিষ্যের কাছে এসে নিঃসংকোচে বলেছিলেন—আমি আপনার গুরুর দৌহিত্র। দুটো অন্নপ্রার্থী হয়ে এসেছি। ইস্কুলে পড়ব। দেবেন আমাকে খেতে ? তখনও তাঁর পৈতের সময় কামানো মাথায় চুল গজায়নি ; পৈতের সেই গেরুয়া পরনে ছিল। মাতামহের শিষ্য অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—এ আমার পরম ভাগ্য।

এই ইস্কুলে তিন বছর পড়ে যেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন সেইবারই শীতলহাটীর জমিদার শিবচন্দ্র চৌধুরী ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণী অর্থাৎ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুভাগমন উপলক্ষ্যে সেলাম দান করতে এসে দেখলেন—একটি সুদর্শন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণতনয়—উপাধি মুখোপাধ্যায়—বারপাঁচেক এসে প্রায় ভারখানেক পুরস্কার নিয়ে গেল। দু বৎসরের প্রাইজ একসঙ্গে। দুটো ফার্স্ট প্রাইজ, দুটো গুড কণ্ডাক্ট প্রাইজ এবং অবশেষে এই দু বছরের শেষ বছরের বেস্ট বয় সিলভার মেডেল নিয়ে চলে গেল। শিবচন্দ্রের পুত্র শম্ভুচন্দ্রেরই সমবয়সী ছেলেটি। শম্ভুচন্দ্র বাড়িতে পড়ছে। কারণ কয়েক বৎসরই সে ফেল করে করে ইস্কুলের উপর বীতস্পৃহ হয়েছে। সে সভায় বাপের পাশে বসেছিল—নিমন্ত্রিত সজ্জন হিসাবে, তার সঙ্গে গঙ্গাচরণ পড়েছেন এবং তাকে ফেলে উপরে উঠে গেছেন। সে বললে—কুলীনের ঘরের ভাগ্নে। দাদামশায়ের শিষ্যের বাড়িতে খেয়ে পড়ে। চার টাকা করে বৃত্তি পায়। পোস্টাপিসে সে টাকা জমাচ্ছে। কলেজে পড়বার জন্যে। ভারী ভাল ছেলে। শিবচন্দ্রবাবু সেইখানেই সংকল্প করলেন—কন্যার বিবাহ দেবেন এই ছেলের সঙ্গে ; অবশ্য অপেক্ষা রইল—পত্নীর অনুমোদনের। পত্নী মাতঙ্গিনী দেবী—শুধু মাতঙ্গিনী নন—ক্রোধ হলে মত্তমাতঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। পত্নী বললেন—আগে ছেলে দেখি।

শম্ভুচন্দ্র একদিন অনেক অনুরোধ করে গঙ্গাচরণকে আনলেন। মাতঙ্গিনী দেবী আড়াল থেকে দেখলেন এবং পছন্দ করলেন। পছন্দের মূল কারণটা পাত্র নয়, পাত্রের অসহায় এবং বাপ মা না-থাকা অবস্থা। রজনী, কন্যার নাম রজনী, সে আজীবন তাঁর কাছে থাকবে, জামাই অনুগত থাকবে। সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে পুষে রাখবেন। স্বামীকে বললেন—ভালই বেছেচ। দাও বিয়ে। কিন্তু সম্পত্তির একটা অংশ দিতে হবে রজনীকে।

সম্বন্ধ পাকা করতে বেগ পেতে হল না। মামা মামী পণ চাইলেন—পাঁচশো এক টাকা। মাতঙ্গিনী বললেন—দিতে হবে বইকি। গরু বাছুরের দাম আছে। এ তো ওদের ভাগ্নে।

গঙ্গাচরণও বললেন—তা দিন। আমার অন্ন ঋণটা কিছু শোধ হোক। তবে আমাকে পড়াতে হবে, যতদূর পড়ব, পড়তে পারব!

শিবচন্দ্র বললেন—নিশ্চয়!

মাতঙ্গিনী বললেন—তবে বিলাত-টিলাত যাওয়া হবে না। সে বলে দাও।

গঙ্গাচরণ বললেন—না, বিলাত আমি যেতে চাই না।

বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিন—মাস কয়েক যেতে না-যেতেই উভয় পক্ষের ভুল ভাঙল। গঙ্গাচরণের আগে—তারপর শ্বশুরপক্ষের।

গঙ্গাচরণ দেখলেন এরা তাঁকে পোষা জানোয়ারের চেয়ে উঁচু চোখে দেখে না। কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল—জাত বাঘ। সে পোষ মানতে চাইলে না।

অপর দিকে মাতঙ্গিনী দেবী—যাঁর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির মধ্যে অহরহ প্রত্যক্ষ কারবার তিনি প্রায় সিংহবাহিনী। স্বামী শিবচন্দ্রকে দশমহাবিদ্যার দশরূপে ধরাশায়ী করে রেখেছেন। অধিক বিবরণে প্রয়োজন নেই, একটি মহাবিদ্যার রূপই যথেষ্ট।

তিনি তাঁর স্বামীর এক পরকীয়া প্রেয়সীর সন্ধান পেয়ে পালকি চড়ে স্বয়ং বাগান-বাড়িতে গিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে ঝাঁটা মেরে পথে বের করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রায় শতখানেক হাত প্রকাশ্য পথে তাকে তাড়া করে গিয়েছিলেন। এহেন যিনি জমিদার গৃহিণী তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো ষোল সতের বছরের বালক গঙ্গাচরণ। শিবচন্দ্রবাবুর সন্তান দুটি—এক পুত্র এক কন্যা। পুত্র বড়, কন্যা রজনী ছোট। পুত্র শম্ভুচন্দ্র ভালমানুষ জমিদারপুত্র ছিলেন। গঙ্গাচরণ বলতেন—গোবরগণেশ। শান্তশিষ্ট নধরকান্তি, প্রচুর খায়—চব্বিশ ঘণ্টা পান চিবোয়, গড়গড়ায় ধূমপান করে, গানবাজনা শেখে, প্রজাদের গালাগালও করে আবার দয়াও করে; করে না শুধু পড়াশুনা। বাড়িতে পড়াবার জন্য তিনজন মাস্টার, তাঁরা আসতেন ফিরে যেতেন। প্রথম ঝগড়া শুরু হলো এই শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে একসঙ্গে আহারে বসে। অবশ্য বিবাহের মাসকয়েক পর। লক্ষ্য করলেন—একসঙ্গে খেতে দিলেও আসন দু রকম,—বাসন দু রকম, আহার্যের বেলায় দু রকম না-হলেও মাছের মুড়োটা নিত্যই শম্ভুচন্দ্রের বাটিতে পড়ে; এবং দুধের বাটিতে দুধ দু রকম। অর্থাৎ একটা প্রায় ক্ষীর—অন্যটা সাধারণ দুধ। গঙ্গাচরণ ঘোষণা করে দিলেন—তিনি আসনে বসবেন না, মাছ মাংস দুধ খাবেন না; কারণ তাঁর এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৎসর, তার সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা; এটি তাঁর মাতামহ বংশের কুলাচরণ। ব্রত। প্রথমটা শাশুড়ী বুঝতে পারেননি, বুঝতে যখন পারলেন তখন তিনি স্ফীতকায়া বন্য মার্জারীর মত জামাইকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তাঁর কন্যা। কন্যা রজনীবালা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেছিল—সব মিছে কথা মা—সব মিছে কথা।

মায়ের মুখে ছিল সদ্য পোরা কয়েকটা পান এবং কাশীর জরদা; তিনি কথাও কইতে পারেননি—ভ্রূভঙ্গীতে প্রশ্ন তুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন—কি?

—তোমার জামাইয়ের। আমাকে—আমাকে—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে।

এবার মেঝের উপরেই পচ্ করে পানের পিক্ ফেলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি মিছে কথা? কি হলো? কাঁদছিস কেন?

মেয়ে বিবরণ যা দিয়েছিল তা এই।

গঙ্গাচরণ গতকাল এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। রাত্রে সে তার নিয়মমতই আসনে বসেনি—মাছ দুধ খায়নি, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন শাশুড়ীর মনে না জাগলেও রজনীর মনে জেগেছিল। সে স্বামীকে প্রশ্ন করেছিল—পরীক্ষা হয়ে গেল—তবে মাছ দুধ খেলে না যে? গঙ্গাচরণ দাঁত খুঁটছিলেন—ও কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন—একটু জল আন তো।

আর উঠতে পারছিনে। শরীরটা খুব ক্লান্ত।

স্ত্রী বলেছিল—আগে বল—মাছ দুধ খেলে না কেন? পরীক্ষা তো হয়ে গেছে।

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে।

—ইচ্ছে?

—হ্যাঁ। একটু জল আন।

—পারব না।

—পারবে না?

—হ্যাঁ। পারব না—আমার ইচ্ছে।

—ও। বলে গঙ্গাচরণ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজে গিয়ে ঘাটে মুখ ধুয়ে এসেছিলেন।

স্ত্রী রজনী ওই বাড়ির মেয়ে, ওই মায়ের মেয়ে, সে ফোঁস করে উঠে বলেছিল—এত বড় বাড় তোমার? আমাকে অপমান কর?

গঙ্গাচরণ বিছানায় শুয়ে বলেছিলেন—পায়ে ব্যথা করছে, টিপে দাও।

—টিপে দেব? আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি।

তারপরই বিস্ফোরণ হয়ে গেল। গঙ্গাচরণও আত্মসংবরণ করতে পারেন নি—সব কথাই বলে ফেলেছিলেন—গায়ে এক গা গয়না পরে খাটের ওপর বসে পান দোক্তা খেলেই বড়লোক হয় না। ধনী লোক হয় বটে। তোমার মায়ের মত এমন ধনী ছোটলোক.আর আমি দেখিনি। তুমি মায়ের দৃষ্টান্ত ধরো না। আমি ভেড়া নই—আমি বাঘ। বাঘের থাবা খেতে হবে।

মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে পড়েছিল—মায়ের কাছে। সমস্ত শুনে শাশুড়ী ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন—কই সে হারামজাদা! কোথায়?

—কে হারামজাদা? কাকে বলছেন হারামজাদা?

একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলের সে মূর্তি দেখে চৌধুরী গিন্নী খানিকটা দমে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি গর্জে উঠেছিলেন—এত বড় আস্পর্ধা তোমার—

কথার উপর কথা দিয়ে জামাই বলেছিল—আস্পর্ধা আমার না আপনার। আমার বাপ পিতামহকে আপনি কুৎসিত কথা বলেন?

তিনি বলেছিলেন—ওরে পথের ভিখিরী—

—ভিখিরী নয়, আপনার ঘরে ভিক্ষে চাইতে আসিনি, আমার এই দুটো পা ধরে আপনার স্বামী প্রথমে অর্ঘ্য দিয়ে ফুল দিয়ে পুজো করে মাথা হেঁট করে কন্যাদান করেছেন।

চৌধুরী গৃহিণীর ক্রোধ হলে জ্ঞানগম্য থাকত না। তিনি নিষ্ঠুর ভাবে বলে উঠেছিলেন—তোর জিভ খসে যাবে যে জিভে এই সব কথা বলছিস—খসে যাবে।

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—ঠাকরুন, আমি খাঁটি বামুনের ছেলে—খাঁটি বামুন, ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খাইনে। তোমরা খানিকটা বামুন, খানিকটা বেনে, খানিকটা দাঙ্গাবাজ—ভাল করে বললে ক্ষত্রিয়। তোমার ওসব কথা আমাকে লাগবে না। আমর জিভ চিরকাল এমনি ধারালো থাকবে, তোমাদের এমনি করে গাল দেবে।

চৌধুরী গৃহিণী এবার সত্যই অভিসম্পাত দিয়েছিলেন—তুই মর—তুই মর,—রজনী বিধবা হোক—তাতেই ও সুখী হবে।

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—সে সুখ ওর হবে না ঠাকরুন, আমার মরতে অনেক দেরি। আমি খাঁটি বামুন, আমি বলছি—তুমি মর, অনেক লোক দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে, তুমিও পরিণামের

দুঃখ থেকে বেঁচে যাবে।

মাতঙ্গিনী চিৎকার করে উঠেছিলেন—কি বললি হারামজাদা ?

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—আমার বাবা বরাহ হলে বরাহ অবতার ঠাকরুন। কিন্তু তোমার বাবা গাধা তাতে আর সন্দেহ নেই। তা নইলে মেয়েকে বিধবা দেখতে চাও। একসঙ্গে খেতে বসে মেয়ে খাবে শাকপাতা চচ্চড়ী আর তুমি গবগব করে চিবুবে—চুষবে মাছের মুড়ো!

এবার হাঁক পেড়েছিলেন শাশুড়ী—দারোয়ান।

গঙ্গাচরণ তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সেই খালিগায়ে খালিপায়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

এসে উঠেছিলেন কলকাতায়। পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন। কলকাতায় ঘুরতে ঘুরতে কাজ যোগাড় করেছিলেন এক মুদীর দোকানে। খাবেন থাকবেন—পাঁচ টাকা মাইনে পাবেন—দোকানের কাজ সব করবেন, ধরবেন না শুধু ঝাঁটা আর ছোঁবেন না কারুর এঁটো, আর ছোঁবেন না জুতো।

এখানে থাকতেই খবর বের হলো এণ্ট্রান্সের। গঙ্গাচরণ বৃত্তি পেয়েছিলেন পনের টাকা, ডিভিশনাল স্কলারশিপ। এতদিনে মুদী সমস্ত জেনে তাঁকে বলেছিল—বাবাঠাকুর, তুমি তো সহজ প্রাণী নও, তুমি খরিস সাপের ডেঁকা। তা বাবা আমি বলি কি—আমি একবার যাই তোমার শ্বশুরঠাকুরের কাছে।

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—না। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আমার চুকে যাবে তা হলে।

—তা হলে বাবা আমার এখানে থাকুন, পড়াশুনা করুন ; আমার আপনাকে বড় ভাল লেগেছে।

—থাকতে পারি। কিন্তু এমনি থাকব না। কিছু কাজ আমাকে দিতে হবে। এমনি অন্ন শ্বশুরের খেয়েছি—সে অন্নে বদহজমের ব্যারাম দেখা দিয়েছে ; আবার আপনার খেলে অম্লশূল হবে না কে বললে ? আপনার খাতা লিখে দেব আমি। কিংবা আপনার ছেলেকে পড়াতে পারি।

ওই ছেলে পড়ানোর কাজ নিয়ে ওখান থেকেই সসম্মানে বৃত্তি পেয়ে বি-এ পাস করে চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিলেন। চাকরি পেয়েছিলেন চট্টগ্রাম ইস্কুলে। ষাট টাকা বেতন। ওখানে চাকরি করতে করতেই বছর পাঁচেকের মধ্যে আইন পাস করে ওই চট্টগ্রাম আদালতেই প্র্যাকটিস্ শুরু করেছিলেন। এমন মানুষের প্র্যাকটিস্ জমতে দেরি হয় না, হয়ওনি। বামুনের ছেলের অহংকারের সব বাক্য কোনকালেই অবশ্য থাকে না, কিন্তু গঙ্গাচরণের ওই বাক্যটি—'আমার জিভ কখনও খসবে না, চিরকাল এমনি ধারালো থাকবে'—ঐ কথাটি নির্ভুল সত্যে পরিণত হয়েছিল। বুদ্ধি এবং ধারালো বাক্শক্তির প্রসাদে ফৌজদারীতে ওখানকার আদালতে একজন খ্যাতনামা উকিল হয়ে উঠেছিলেন। বছর আটেকের মধ্যে বাড়িও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ করেননি। সেকালে এমন ক্ষেত্রে আবার বিবাহ করাটাই স্বাভাবিক ছিল, নানান স্থান থেকে বিবাহ সম্বন্ধও এসেছিল—সর্বত্রই তিনি সত্য জবাব দিয়েছিলেন—আমার স্ত্রী আছেন। তাঁর সঙ্গে বনাবন্তি হয়নি বলেই তিনি পিত্রালয়ে থাকেন। সেই জ্বালাই আমি ভুলতে পারি না—দ্বিতীয়বার কর্কট নাগের বিষ আমার সহ্য হবে না।

আরও বছর দুয়েক পর হঠাৎ তিনি চট্টগ্রাম থেকে বর্ধমান রওনা হলেন। বর্ধমান শহরে এলেন একটি সেলের আগের দিন। বর্ধমানের আদালতের নীলাম ইস্তাহার প্রকাশিত হয় যে সব কাগজে, সেই সবগুলি কাগজের তিনি গ্রাহক ছিলেন। তাতেই প্রকাশিত হয়েছিল—দেনার দায়ে তাঁর শ্বশুরবংশ চৌধুরীদের সম্পত্তি নীলাম হচ্ছে। টাকাটা কম নয়, প্রায়

পঁচিশ হাজার টাকা। এসে সমস্ত খবর নিয়ে তিনি যা জানলেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। চৌধুরীদের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। জমিদারী বাঁধা পড়েছে। ছেলেটি দুর্দান্ত মদ্যপ হয়েছে। প্রথমে ছেলেটি এমন ছিল না কিন্তু বিবাহের পর বৎসর তিনেকের মধ্যে বধূটি আত্মহত্যা করার পরই সে এমন মাতাল হয়েছে। বিবাহ করেনি, দিনরাত মদ খেয়েই পড়ে থাকে। কারণ বুঝতে গঙ্গাচরণের বিলম্ব হয়নি। কারণ ওই চৌধুরানী ঠাকুরানী। তার জন্যই বধূ আত্মহত্যা করেছে। তার জন্যই শ্যালক আর বিবাহ করেনি, মদ খেয়ে ভুলে আছে। যাই হোক তিনি মনস্থির করেই এসেছিলেন—সেই অনুযায়ী টাকাটা তিনি দাখিল করে দিয়ে রসিদ নিলেন এবং বর্ধমানের এক বিখ্যাত উকিলকে দিয়ে শ্বশুরকে চিঠি দিলেন—"মদীয় মক্কেল শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী রজনীবালা দেবী আজ বারো বৎসর তাঁহার গৃহে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় আবদ্ধ আছেন। যেহেতু তিনি হিন্দু পর্দানশীন নারী সেই হেতু তাঁহার নিজ হইতে আসার উপায় নাই এবং মদীয় মক্কেল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় অসম্মানের আশংকায় আপনার গৃহে যাইতে চাহেন না, সেই হেতু আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, পর্দানশীন কন্যার পিতা হিসাবে আপনি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত...তারিখ মধ্যে বর্ধমান শহরে...ঠিকানায় পেঁছাইয়া দিবেন। অন্যথায় আদালতের সাহায্যে আমার মক্কেল তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার পন্থা অবলম্বন করিবেন।"

বলা বাহুল্য চৌধুরী গৃহিণী তাঁর জামাই সম্পর্কে ভীত হয়েছিলেন এবার। কন্যাকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাননি। চৌধুরী নিজে অবশ্য অনেক দিন থেকেই অনুতপ্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি কন্যাকে এনে জামাতার হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। সঙ্গে শ্যালকও এসেছিল। সে কিন্তু বিচিত্র মানুষ, প্রচুর খাওয়ার সঙ্গে সে তখন প্রচুর মদ্যপান করে। সে গঙ্গাচরণের সামনে এসে কোঁচার খুঁটটি গলায় দিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল—আমি ভাই মদো মাতাল মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—রাগ ভাই আমার উপর করো না। ইচ্ছে হয় কান মলে দাও, কিন্তু ভাই রাগ রেখো না, আর রজনীকে যেন কিছু বলো না। তারপর সুর করে আবৃত্তি করেছিল—অপরাধ করিয়াছি—হুজুরে হাজির আছি—ভুজপাশে বান্ধি দাও দণ্ড। বলে নিজেই বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। এবং হাজার বাহবা দিয়ে বলেছিল—Bravo my dear—Thousands Bravo—বাবা তুমি মদীয়া মাতৃদেবী মহামহিম মাতঙ্গিনী চৌধুরানীর দর্প চূর্ণ করেছ। স্রেফ ফ্ল্যাট! খাটের উপর ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছেন—আর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছেন। কিন্তু no বাক্যি—no সাক্যি। পঁচিশ হাজার টাকার গন্ধমাদন চাপিয়ে বিশল্যকরণী দিয়ে চৌধুরীদের মরা লক্ষ্মীকে বাঁচিয়েছ তুমি—গাল তোমাকে দেয় কি করে। তাই তো তোমাকে হাজার Bravo! কিন্তু দোহাই ব্রাদার, রজনীকে তুমি ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে নিয়ো।

তা তিনি করেননি। ক্ষমা করে বা ঘৃণার সঙ্গে তিনি রজনীকে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করেছিলেন গভীর প্রেমের সঙ্গে। বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামের পথেই তাঁদের মিলনপর্ব সমাধা হয়েছিল। সেকালে, গঙ্গাচরণ রজনীকে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে চট্টগ্রাম যাত্রা করেছিলেন। নিরালা নিরিবিলিতে রজনী কত কেঁদেছিলেন—গঙ্গাচরণ কতবার চোখ মুছিয়ে চুম্বন করেছিলেন—সে কথা ধাবমান গাড়ির মধ্যে ঘটেছিল—তা শুধু তাঁরাই জানতেন। গঙ্গাচরণ ছিলেন শুষ্ক কাষ্ঠ ধরনের মানুষ, নিজে ডায়েরী রাখতেন; ওই পথের কথায় শুধুমাত্র লিখেছেন—" 'হনিমুন' পর্বটা ভাল জিনিস। এবং ট্রেনে হনিমুন বোধ হয় সবচেয়ে ভাল।" তারপর—খরচের ফর্দ। কুলি, খাবার, পান, ভিক্ষা, চা, দফে কুলি, দফে খাবার ইত্যাদি। না বাইরের দৃশ্যের কথা—না দুটো মান-অভিমানের কথার নিদর্শন—কিছু নাই।

যাই হোক—একটি খারাপ ব্যবহার করেছিলেন রজনীর সঙ্গে; তাঁর পা টিপবার জন্য

দুটো ঝি রেখে দিয়েছিলেন। এবং সে পা না টিপিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। তবে রজনীর আসার পর থেকে গঙ্গাচরণের পসার হুহু করে বেড়ে গিয়েছিল। একটা খুনের মামলায়—যেখানে আসামীর ফাঁসির হুকুমের আশঙ্কা ছিল শতকরা নিরেনব্বুই, সেখানে তিনি ওই এককেই একশো করে তুলে আসামীকে বেকসুর খালাস করেছিলেন। তারপর লক্ষ্মী যেন পায়ে হেঁটে তাঁর ঘরে এলেন। লোকে বলে—রজনী দেবীর পিছন ধরে। বাড়ি স্ফীত-কলেবর হলো, সম্পত্তি কিনলেন, কয়েক বছর পর কলকাতায় বাড়ি করলেন—রজনী দেবী বাড়িতে আসার দু বছরের মধ্যে জন্মাল ছেলে। নাম রাখলেন—বিজয়।

ছেলের বিজয় নাম রেখেছিলেন নিশ্চয় সচেতনভাবে নিজের জীবনের ইতিহাসের ছাপটা মূর্তিমন্ত করে তুলবার ইচ্ছে থেকেই। বোধ হয় আরও কিছু ছিল—অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে বেঁধে দেবার ইচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে সে আর কার না থাকে। কিন্তু সেইটে আর তাঁর ভাগ্যে ঠিক ঘটল না। ভাগ্যে বলছি এই কারণে যে, শক্তি এবং সামর্থ্যে তাঁর কোনখানে এতটুকু কমতি বা ঘাটতি পড়েনি—পসার নামডাক অর্থসমাগম সবই তেমনি বজায় রইল—বজায় রইল নয় বাড়তে থাকল—কিন্তু মারাত্মক আঘাত এল অন্যদিক থেকে—যে আঘাত তাঁর নামডাক সম্পদ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও তাঁকে ভেঙে দিলে।

অতীত কথায়—ঘটনাই বড়; এমন ক্ষেত্রে তো বটেই। বিজয়ের পর রজনী দেবীর তিনটি সন্তান হলো এবং তিনটিই মারা গেল। একটি সূতিকাগৃহে, একটি তিন বছর বয়সে, একটি মাস কয়েকের হয়ে। শেষেরটিই মারা গেল সূতিকাগৃহে—এবং রজনী দেবী অসুস্থ হলেন ও কয়েক মাস ভুগে কলকাতার বাসায় মারা গেলেন। বিজয়ের বয়স তখন বারো।

নিমতলায় স্ত্রীর সৎকার শেষ করে গঙ্গাচরণ বিজয়কে নিয়ে বাড়ি ফিরে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে সারা রাত্রিটা আকাশের দিকে তাকিয়ে পায়চারি করেছিলেন। ছেলেমানুষ বিজয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত মায়ের জন্য কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গঙ্গাচরণ শেষরাত্রে অকস্মাৎ নিজের ডাইরীখানা নিয়ে লিখতে বসেছিলেন। ডাইরী তিনি অনেকদিন থেকেই রাখতেন। সেই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে আসার সময় থেকেই। সে দিন লিখলেন—

"আজ রজনী আমাকে ছাড়িয়া গেল। বড় অনিচ্ছাতেই তাহাকে যাইতে হইল। এইখানেই আজ ডাইরী লেখা শেষ করিলাম। কারণ প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যে একটা সত্য আজ আমি উপলব্ধি করিতেছি। বুঝিতেছি—শীতলহাটী যখন ত্যাগ করি তখন শ্বশুর মহাশয় শাশুড়ী ঠাকরুন ও রজনী যে দুঃখ আমাকে দিয়াছিল—তাহার জন্য এ দেশের ও সমাজের ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার প্রতিপালনে ও পরিপুষ্টিতে পালিত ও পুষ্ট তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী হইলেও—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের পিছনে প্রমটারের আর কিছু বা কেউ আছে ;—অর্থাৎ প্রমটিংয়ের ফিসফিসানি শুনিয়া অভিনেতার অ্যাকটিং করার মত আর একটা কোন শক্তি কাঁদায়-হাসায়-নাচায়। পর পর তিনটি সন্তানের মৃত্যুতেও তাহা বা তাহাকে ধরিতে পারি নাই। আজ রজনীর মৃত্যুতে যেন আড়ালটা সরিয়া গেল—এবং তাহা বা তাহার স্পষ্ট অস্তিত্ব বুঝিলাম। অনুভব করিলাম। বিজয়—সংসারে যদি কেহ কখনও আঘাত করে তখন এই কথাটা মনে করিয়ো। আঘাতকারী পুতুলের মত আঘাত করে, তাহাকে দিয়া আঘাত কেহ করায়। তোমাকে আমি উকিল করিব। যদি তাহা পারি—তুমি যদি উকিল হও তবে মার্ডার কেসে আসামীর মোটিভ বিচার করিতে হইবে। এই বস্তু বা সত্তা সেই মোটিভের মত রহস্যময়। আজ মনে হইতেছে—এই আমার শেষ উপলব্ধি। তোমাকে বলিয়া যাই যে, এই কেহ বা কিছু, কি বা কেন ইহা জানা যাক বা না যাক—ইহাকে সত্য মানিয়া—আঘাত সত্ত্বেও আঘাতকারীকে দায়ী করিয়ো না ; তাহাকে ভালবাসিয়ো। আজ আমি বলিতেছি—রজনীকে এবং তাহার বাপ-মাকে আঘাতের জন্য দায়ী করিয়া সেদিন যদি

শোধ লইবার সংকল্প না করিতাম তবে আমি এত বড় অবশ্যই হইতাম না। এত নামডাক সম্পদ হইত না। কিন্তু জীবনে সুখী হইতাম। আমিও সুখী হই নাই ; রজনীও হয় নাই। এমনই ভাবে শোধবোধের পালা পুরুষানুক্রমে মানুষের সংসারে দুঃখের অশান্তির বিষবাষ্প ছড়াইয়া সংসারকে বিষ করিয়া দিয়াছে। আজ শোধবোধের পালা শেষ, ডাইরীও শেষ।"

* * *

চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে আবার কাজে মন দিয়েছিলেন। ওকালতির পসার দিন দিন বাড়ছিল—তবুও ছেলের পড়াশুনা দেখা—তাকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া গল্প করাকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন সর্বাগ্রে। চরিত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। পাথরের মত মানুষ কাদার মত নরম হয় না—কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যেন নরম মখমলের মত শ্যাওলার স্তর জমেছিল। দানধ্যান তো ছিলই—সেটা বেড়ে গিয়েছিল। গভীর রাত্রে সেতার বাজাতেন। বছর চারেক পরে বিজয় স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করলে। বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে তিনি রাত্রে বাড়িতে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন। সেইদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া চলছে এমন সময় এল এক টেলিগ্রাম। গঙ্গাচরণ বড় উকিল—মফঃস্বল কোর্টে যেতেন—গোটা জেলায় বড় বড় মক্কেল—দিনে দু-একখানা টেলিগ্রাম আসতই। এবং গঙ্গাচরণের আপনজন বলতে কেউ বাইরেও থাকত না। আপনজন বলতে শ্বশুর-শাশুড়ী এবং শ্যালক শম্ভুর বিধবা স্ত্রী—কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো সর্বজনবিদিত ; রজনী দেবীর মৃত্যুর পর গঙ্গাচরণের পরিবর্তন হলেও এখানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ শ্বশুর-শাশুড়ী মনের দিক থেকে পালটাননি। জামাইয়ের অপমান ভোলা দূরের কথা—তাঁরা তাকে পালন করে বিষবৃক্ষে পরিণত করেছিলেন। শম্ভুচন্দ্র লিভার পেকে মারা গেলে খবর দেননি। শম্ভুচন্দ্র মারা গেছেন অনেক দিন আগে, বিজয়ের বয়স তখন পাঁচ। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে সে ওই সম্পত্তির চিহ্নিত উত্তরাধিকারী। কিন্তু গঙ্গাচরণ শ্বশুরকে লিখেছিলেন—"কোন একটি সদ্বংশের সন্তানকে শম্ভুর স্ত্রীর দ্বারা পোষ্য লওয়াইবেন। তাহাতে মঙ্গল হইবে। কারণ বিজয় কখনও যাইবে না। এবং শম্ভুর বিধবারও একটা অবলম্বন হইবে।" শ্বশুর শিবচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন—"তাহাই করিব। শুধু রজনীকে বলিও সে যেন একটা মত দেয়। তোমার সন্তান বলিয়া তো তাহার সঙ্গে সম্পর্ক নয়। সম্পর্ক রজনীকে লইয়া। তোমার জন্য আমার কাছে রজনী, রজনীর পুত্র—সব তিক্ত।"

গঙ্গাচরণ রজনীকে বলেছিলেন—উত্তর লিখে দাও। ছেলের জন্যে শীতলহাটির সম্পত্তির লোভ করলে আমার সম্পত্তি সব দান করে দিয়ে যাব। রজনী বাপকে তাই লিখে দিয়েছিলেন—"পোষ্যপুত্রই লওয়াইবেন। আমার ছেলের ও-সম্পত্তি লইবার উপায় নাই।" এরপর শিবচন্দ্র আর রজনীকেও পত্র দিতেন না। রজনীর মৃত্যুতেও তাঁরা শ্রাদ্ধে লৌকিকতা পাঠিয়ে লিখেছিলেন—"রজনী খালাস পাইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। অতঃপর মা আনন্দময়ীর কাছে প্রার্থনা যেন তাহাকে পরজন্মে সুখী করেন।"

গঙ্গাচরণ লৌকিকতার মনিঅর্ডার ফিরিয়ে দেননি ; বিষণ্ণ হেসে গ্রহণ করে—ওই ডাইরী খুলে যেখানে লেখা শেষ করেছেন সেইখানটিতে কুপনটি রেখে দিয়েছিলেন। সুতরাং টেলিগ্রামের সঙ্গে তাঁদের কথাও কারুর মনে হবার কথা নয়। গঙ্গাচরণেরও মনে হয়নি। টেলিগ্রামে কিন্তু ছিল তাঁদেরই কথা। মধুপুর থেকে টেলিগ্রাম করেছে শীতলহাটীর নায়েব ; তীর্থভ্রমণ করে ফিরবার পথে শিবচন্দ্রবাবু ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে সপরিবারে মারা গেছেন। পৌত্র, পুত্রবধূ চৌধুরী গিন্নী কর্তা চারজনেরই দেহ মিলিয়াছে ; সৎকার করিয়া নায়েব শীতলহাটী রওনা হইতেছেন। এখন দৌহিত্র বিজয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

বিজয়কে লইয়া তিনি যেন অবিলম্বে শীতলহাটী আসেন। শ্রাম্ধাদি করিতে হইবে—ইত্যাদি।

গংগাচরণ কাউকে কিছু বলেননি; টেলিগ্রামটি ডাইরীর সেই পৃষ্ঠায় পুরে রেখে দিয়েছিলেন। শুধু ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি যেন আজ রাত্রে কিছু খেয়ো না। কেন—কি বৃত্তান্ত কোন প্রশ্ন করো না।

সব শেষ হলে বলেছিলেন—কালই আমরা শীতলহাটী যাব।

একটু পরে বলেছিলেন—না পরশু। কাল তোমাকে—

আরও একটু থেমে থেকে বলেছিলেন—তোমার দাদামশাই দিদিমা মামীমা মামাতো ভাই ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন। তোমার ত্রিরাত্রির শ্রাম্ধ। কালই শ্রাম্ধ করতে হবে।

শ্রাম্ধ করিয়ে বিজয়কে নিয়ে তিনি শীতলহাটী এসেছিলেন। মাত্র দিন কয়েক থেকে অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা গহনাপত্র বুঝে নিয়ে—খাতাপত্রের বোঝা বেঁধে—বর্ধমানে আদালতে যা কিছু করণীয় করে চট্টগ্রামে ফিরেছিলেন। সংগে এসেছিল নায়েব। চট্টগ্রামে বসে তিনি শীতলহাটীর ব্যবস্থা করেছিলেন। পাকা উকিল—ব্যবস্থায় ফাঁক রাখেননি। ব্যবস্থা করেছিলেন—শীতলহাটীর সম্পত্তি হলো দেবোত্তর। কুলদেবতা মা মুক্তকেশী কালীর নামে এই সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হলো। সেবায়েত হলো নাবালক বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিভাবক পিতা গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। মা কালীর নিত্যসেবার বরাদ্দ করেছিলেন যৎসামান্য। বাকী আয় থেকে চলবে কর্তা শিবচন্দ্রের নামে--ছেলেদের হাইস্কুল। গিন্নীর নামে—মেয়েদের উচ্চপ্রাইমারি স্কুল। শ্যালক শম্ভুচন্দ্রের নামে—দাতব্য চিকিৎসালয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর তৈরির ও প্রাথমিক আনুষংগিক খরচ সম্পত্তি থেকে হওয়া সম্ভবপর ছিল না, সে টাকা—প্রায় তিরিশ হাজার টাকা তিনি নিজে দান করেছিলেন বিজয়ের নাম দিয়ে।

কর্মচারীদের কাছে জামিননামা নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনারা আদায় করবেন; মাসে মাসে প্রতিষ্ঠানগুলির খরচ দেবেন। দেয় রেভেন্যু, দেয় খাজনা—এ আমি এখান থেকে পাঠাব। আমার উকিল দাখিল করবে। আপনাদের আদায়-খরচ—আমি বছরের শেষে আপনাদের কাছ থেকে বুঝে নেব। উদ্বৃত্ত থাকলে ব্যাংকে জমা হবে। ঘাটতি পড়লে —আমি দেব। পরে ব্যাংকের সুদসুদ্ধ শোধ নেব। কোন্ মহলের খাজনা কোন্ প্রতিষ্ঠানের খরচ চালাবে—তাও বেঁধে দিলেন। এক বছরের খরচের টাকা ব্যাংকে জমা করে দিলেন প্রতি প্রতিষ্ঠানের নামে। চেকবইয়ে দু'জনের সইয়ে টাকা বের হবে—তার মধ্যে তিনি নিজে রইলেন একজন বিজয়ের অভিভাবক হিসেবে। প্রতি প্রতিষ্ঠান দেখবার জন্য ভার দিলেন স্থানীয় ব্যক্তিদের বেছে বেছে—তাঁদের সংগে রইলেন শীতলহাটীর নায়েব এবং এক একজন সরকারী কর্মচারী। শুধু মা কালীর ভার দিলেন তাঁর সেই মতামহের শিষ্যের স্ত্রীর উপর, মামার বাড়ি থেকে গিয়ে যার বাড়িতে আশ্রয় ও অন্ন ভিক্ষা করে পড়তে শুরু করেছিলেন।

মাতামহের শিষ্য তখন মারা গেছেন—বেঁচে ছিলেন তাঁর বিধবা। সমাজে সংসারে মাথা হেঁট করেই বাস করছিলেন তিনি। তার কারণ দারিদ্র্যই নিশ্চয় প্রথম এবং প্রধান, কিন্তু ও ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল। তাঁর ছোট ছেলেটি মিশনারীদের ইস্কুলে চাকরি নিয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে। অন্য ভাইরা প্রায়শ্চিত্ত করে তার সংগে সংস্রব ছিন্ন করেছে কিন্তু মা করেননি। সেই হেতু তারা মায়ের সংগে পৃথক। বিধবা বলেছিলেন—"প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে ত্যাগ করব কি করে, আমি যে তাকে গর্ভে ধরেছি। তা আমি পারব না। আর সে তো কৃশ্চান হয়ে যায়নি। গেলে না হয় ভাবতাম মরে গেছে। কুশপুত্তলী দাহ করে শ্রাম্ধ করতাম।"

এই মহিলাটিকে ডেকে তিনি কালীমায়ের সেবাপূজার প্রায় মালিক করে দিলেন। বলে

গেলেন—আপনার অন্তে এ পদ আপনি যাকে দেবেন সেই পাবে। মায়ের ব্যবস্থা কিন্তু অল্প। বামুন পণ্ডিতদের ঘরের কুলীন কন্যার মত। খাওয়া আর পরা। নিত্যপূজায় হবে পাঁচ জনের মত আয়োজন—মা, আপনি, পূজক, পরিচারক আর একজন অতিথি। মায়ের ভাগটা দেবেন কোন একজন সধবা কুলীনকন্যাকে। বাৎসরিক পূজোয় একশো টাকা বরাদ্দ রইল। পঞ্চ উপচারে পূজোর বরাদ্দ—ষোড়শ উপচার হবে না। মা মদ খেতে পাবেন না, মাংস খেতে পাবেন না, মাছটা রইল—বাংলাদেশে থাকবেন সধবা মেয়ে—মাছটা বারণ করব না।

গ্রামের কেউ কেউ সাহস করে প্রতিবাদ করেছিল, বলেছিল—যাকে সমাজে একরকম পতিত করেছে তাকে এ ভার দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—তোমাদের ওই ন্যাংটা মেয়েরই বা জাতটা তা হলে থাকে কি করে হে? যত বেটা মাতাল গাঁজালের মা। তারপর বলেছিলেন—দেখ যে মেয়ে ছেলের জন্যে সব দুঃখ সইতে পারে, সেই হল আসল মা। মা-ই ছেলের জন্যে প্রাণ দিতে পারে। এ মহিলা প্রাণের চেয়ে বড় মান দিতে পেরেছে ছেলের জন্যে। ছেলে মিশনারীর চাকরি নিয়েছে—উনি তার পয়সা নেননি, তার অন্ন খাননি—শুধু ছেলেকে ছেলে হিসেবে ত্যাগ করেননি। তোমরা পতিত করেছ, তোমাদের ইচ্ছে—তোমরা সব দেব-জানিত ব্যক্তি। আমি বাপু মায়ের সেবার ভার এই মেয়েকেই দেব; তোমরা ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে কালীঠাকরুনকেও পতিত করতে পার।

এরপর আর কেউ কথা তোলেনি।

*

এরপর আর তিনি শীতলহাটীতে আসেননি, প্রকৃতপক্ষে নিজেও কোন সংস্রব রাখেননি। চট্টগ্রামে একটা শীতলহাটীর দপ্তর খুলে দিয়েছিলেন—তাঁর প্রথম মহুরিকে তার ভার দিয়ে বলেছিলেন—যা হয় তুমি দেখো করো। আমাকে আর ও নিয়ে ভাবিয়ো না।

বন্ধ ডাইরীটা খুলে লিখেছিলেন—'যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। শীতলহাটীর কর্তা গিন্নী শম্ভুর স্ত্রী পুত্র মরিল হয়তো নিয়তির পাকচক্রে—অথবা অবিশ্বাসী মতে একান্তভাবে কাকতালীয় অর্থাৎ অ্যাকসিডেণ্ট ধরলেও একটা হিসেবনিকেশের ব্যাপার যেন রয়েছে। মনে হচ্ছে, যে দুঃখ পেয়েছিলাম সেই অন্তরালবর্তী বা বর্তিনীর কাছে সে যেন দুঃখ দেওয়ার মাশুল দিচ্ছে। উশুল নিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু বেশী নিচ্ছি কিনা বুঝতে পারছি না। বিজয়, তুমি হিসাবটা ভাল করিয়া দেখিয়ো। শিবচন্দ্র চৌধুরীর দৌহিত্র হিসাবে তুমি দেনদার নও—কোন দায় তোমার নাই। কিন্তু আমার পুত্র হিসাবে নিশ্চয় আছে। যে আঘাত করাইয়াছিল সে তোমাকে শীতলহাটীর দেনার পাকে বাঁধিতেছে না তো? সেই সন্দেহেই তোমার প্রাপ্য মাতামহের সম্পত্তি তাঁহাদের নামাঙ্কিত ইস্কুল হাসপাতালে দান করিয়া তোমাকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিলাম।"

ডাইরী বন্ধ করে শীতলহাটীর ব্যাপার দপ্তরের খেরো কাপড়ে জড়িয়ে র‍্যাকে তুলে তিনি আবার বসেছিলেন নিজের কাজ নিয়ে। তাঁর ওকালতি আর বিজয়ের দেখাশুনা। কাজ তাঁর এই দুটি। আসলে অবশ্য একটি—বিজয়কে মানুষ করে তোলা। ওকালতিও তারই জন্যে। অর্থের প্রয়োজন খুব বড় ছিল না। যা উপার্জন করেছিলেন—বিজয়ের তাতেই চলত; অর্থের জন্য নয়, বিজয়ের কর্মক্ষেত্রের জন্য ওকালতির পরগনায় তাঁর অধিকারটা বজায় রেখেছিলেন। বিজয় ওকালতি পাস করলে তাকে তাঁর পাটে বসিয়ে ছুটি নেবেন। তার আগে নয়। আরও কারণ ছিল। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের গাজনের পাগল শিবের ফুলখেলার আঙিনা। গাজনে শিবের যে আঙিনায় ভক্তেরা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নাচে খেলা করে, তাকেই বলে ফুলখেলার আঙিনা। চাটগাঁয়ের ছেলে মানেই পুলিসের খাতায় নামলেখানো ছেলে। চাটগাঁয়ের ছেলে মানেই তার ভবিষ্যৎ হয় জেলে, নয় আন্দামানে, নয় ফাঁসিকাঠে দড়ির সঙ্গে

গাঁথা। গঙ্গাচরণ ভয় পেয়েছিলেন—বিশেষ করে যে দৈব্য দুর্ঘটনায় শীতলহাটীর সম্পত্তি পেলেন সেই ঘটনায় দারুণ ভয় পেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল যেমন করে শীতলহাটীর পালা শেষ হলো, তারই সঙ্গে তাল-লয়ের সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ইতিহাসের বিজয় স্তম্ভটির মাথায় বজ্রাঘাত না হয়। তাই তিনি ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বললেন—দেখ, দেশের সেবা—দেশের স্বাধীনতা—স্বর্গসাধনা স্বর্গসুখ চেয়েও বড়। সে আমি জানি। আমি বরাবর এই কাজ যারা করেছে করে—তাদের সেবা করে আসছি। এখানকার সব স্বদেশী মামলায় সরকারের বিপক্ষে আসামীদের ওকালতনামা নিয়েছি। পুলিসের আক্রোশ আছে আমার ওপর দারুণ। নজর রেখেছে তোর ওপর। তোকে সামান্য সূত্রে পেলে একেবারে শেষ করে দেবে। তোর যেমন দেশবাসীর ধর্ম একটা আছে, তেমনি পুত্র-ধর্মও আছে। সেই ধর্মটা মেনে চলিস—এইটেই আমার ভিক্ষে তোর কাছে। তুই উকীল হবি—আমার মতই তুই ওদের সেবা করবি।

বিজয় বাপের কথা অমান্য করেনি। যারা এই কর্মের কর্মী তারাও তাকে টানতে চেষ্টা করেনি। গঙ্গাচরণবাবুর দপ্তর তাদের মস্ত বড় ঘাঁটি।

বিজয় কথা রেখে—বাপের মুখ উজ্জ্বল করে চট্টগ্রাম থেকে বি এ পাস করে—কলকাতায় গেস্ট্রীটের বাড়িতে তিন বছর থেকে এম. এ. ল. পাস করে চট্টগ্রামে ফিরলো। বাপের কাছে শিক্ষানবিসী সেরে উকীল হলো। গঙ্গাচরণবাবু তাঁর বাড়ির কম্পাউণ্ডে তাঁর আপিসের সামনেই দুকুঠরি আপিস বানিয়ে বিজয়কে বসিয়ে দিলেন।

বন্ধুবান্ধব হিতৈষীরা বললেন—আর বিয়ে না দেওয়াটা ভাল দেখায় না।

গঙ্গাচরণ বললেন—হ্যাঁ। এবার দেব। তবে আমার কথা তো জানেন। রাঢ়ের মেয়ে ছাড়া আনব না। এ দেশে থাকি—এখানকার অন্নে-অর্থেই আমার লক্ষ্মী! অগাধ ভক্তি আমার। নেমকহারামও আমি নই। কিন্তু ভাটিয়ালি গান থেকে কীর্তন রামপ্রসাদী আমার ভাল লাগে। বাইরে চাটগাঁয়ের বুলি শুনি—নিজেও চাটগাঁইয়ার মত বলি। ঘরে—আমার রাঢ়ের বুলি শুনতে চাই—বলতে চাই। বুঝেছেন না! তা এইবার আনব—রাঢ়দেশ থেকে এবার খুঁজেপেতে আনব। এই বছরই।

•

তাই তিনি করেছিলেন। সেই বছরই,—সেটা উনিশ শো পঁচিশ সাল—সেই বছরেই তিনি একটা কাজে দিল্লী গিয়ে ফেরবার পথে নেমেছিলেন প্রয়াগে স্নান করবার জন্য—সেই-খানেই ত্রিবেণীসঙ্গমে কেল্লার কোণের ঘাটে দেখলেন একটি বাঙালী কুমারীকে। তারা ছিল তিনজন, দেখেই বোঝা যায় মা এবং দুই মেয়ে—একটি বিবাহিতা অন্যটি কুমারী। পাণ্ডা তিনি নেননি। উঠেছিলেন ধর্মশালায়। তখন এখনকার মত হোটেল হয়নি। ওটা সাহেব-জনদেরই একচেটে ছিল। দেশী হোটেল ছিল ভদ্রজনের ব্যবহারের অনুপযুক্ত; ভদ্রজনদের অরুচিও ছিল। যাই হোক তিনি টাঙা নিয়ে ঘাটে এসে স্নান সেরে উপরে উঠছিলেন—তারাও উঠছিল। তারা চলছিল আগে আগে—তিনি পিছনে। ওদের বড় ভাল লেগেছিল তাঁর। চমৎকার সপ্রতিভ। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই আবার একবিন্দু চঞ্চলতা বা প্রগলভতাও নেই। সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল পরনের খদ্দর শাড়ি। উপরে টাঙা-একার স্ট্যাণ্ডে এসে তিনি টাঙাওলাকে বললেন—দেখো, কোই লোহাকা কড়াই খন্তার দোকান হ্যায় তো লে চলো। হামারা পেরেক দরকার হ্যায়।

টাঙাওলা সবিস্ময়ে বললে—কেয়া দরকার? উ কোন্ চিজ হ্যায়?

নিজের একটা আঙুল অন্য হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ধরে দেখিয়ে বললেন—পেরেক। পেরেক। তারকাঁটা। দেওয়ালমে পুঁতেগা।

টাঙাওলা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে বললে—সমঝা নেহি।

—কেয়া তাজ্জব! পেরেক সমঝাতা নেহি?

সে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না।

—গজাল! গজাল! সরু গজাল!

সে তবুও ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না।

তারপর তাঁর ভাণ্ডারে যতপ্রকার ভাষায় পেরেকের প্রতিশব্দ জানা ছিল তিনি বলে চলেছিলেন—গজাল, পেরেক, তারকাঁটা, কাঁটি, nail—

দেখতে দেখতে ভিড় জমেছিল দু'একজন করে। সবাই প্রশ্ন করে—ক্যা মাংতে হে আপ? ক্যা চিজ হ্যায় উ? এই সংকট মুহূর্তে মেয়েটি বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসে বলেছিল—আপনি মশারি টাঙাবার জন্যে পেরেক খুঁজছেন তো?

হাঁফ ছেড়ে দুঁদে গঙ্গাচরণ কৃতার্থ বালকের মত বলেছিলেন—হ্যাঁ মা। বলে আমি বিপদে পড়েছি। এখন চাই না বললেও এরা ছাড়ছে না, বলছে—নিশ্চয় চাই; কি চাই বোঝাও!

মেয়েটি সম্ভ্রমের সঙ্গে একটু হেসে বলেছিল—ওরা কীল বলে। বলেই সে টাঙাওলাকে চমৎকার এলাহাবাদি হিন্দীতে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ও'র কীল চাই।

তারা বড় বড় হাঁ করে সমর্থন জানিয়ে বলেছিল তার অর্থ—আরে তাই বললেই তো হতো। কীল চাই!

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন—কে জানে মা—কীল বলে—না খিল বলে—কি বিদঘুটে ব্যাপার—

মেয়েটি বলেছিল—না বিদঘুটে ঠিক নয়। সংস্কৃত কীলক থেকে কীল।

—তাই তো মা! বাঃ চমৎকার ভাষাজ্ঞান তো তোমার! তা—তোমরা বুঝি এখানে থাক? বাসিন্দে?

ওই গঙ্গার ঘাটে পরিচয় হয়েছিল। মেয়েটির নাম মনোরমা। বাপ ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্জে—এখানে অধ্যাপক ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। এক ছেলে—তিন মেয়ে। ছেলেটিও অধ্যাপক হয়েছেন। সধবা তরুণীটি ছেলের বউ। বড় দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, এটি ছোট মেয়ে মনোরমা। বাড়িতে পড়ছে, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। ভুবনবাবুর দেশ ছিল বীরভূমের নানুর থানায়। ওইখানেই বাসার ঠিকানা নিয়ে কীলক কিনে তিনি ধর্মশালায় ফিরেছিলেন। এবং সন্ধ্যাবেলা গিয়ে হাজিরও হয়েছিলেন ভুবনবাবুর বাসায়।

বাসা নয়—ভুবনবাবুর নিজের বাড়ি। ছোট্ট একখানি বাড়ি সবে করেছেন। উপরে নীচে খান-পাঁচেক ঘর। নীচে একটি প্রশস্ত বারান্দা; ১৯২৪/২৫ সালের হালতম ফ্যাসানের ছাপ সেখানে। ভিতরটা কিন্তু প্রাচীন মতে; অন্দর বাহিরের সম্ভ্রম মর্যাদা বজায় রেখে পৃথক্। অধ্যাপক ভুবনবাবুর ঘরে একখানি খোল ঝুলছিল। ওই দেখেই বিমোহিত হয়ে গেলেন গঙ্গাচরণবাবু।—খোল? খোল বাজায় কে মশায়?

ভুবনবাবু বলেছিলেন—আমিই বাজাই। ঘরে বসে একটু কীর্তন করি। নানুর থানার লোক। চণ্ডীদাসের পদ ভুলতে পারিনি। আমি বাজাই গাই—ছেলেমেয়েও দোয়ারকি করে। বড় নাতিটি পাঁচ বছরের শ্রীমান ভুনিচন্দ্র—সে নাচে।

—বা-বা-বা। তাহলে তো আনন্দময়ীর সংসার আপনার। তা মায়ের নাম করেন না? রামপ্রসাদ কমলাকান্ত?

—তাও হয়। জানি। একসময়ে গানবাজনায় আমার ঝোঁক ছিল খুব। তা ছাড়া

আমরা দীক্ষায় শাক্ত। দেশে পিতামহ গুরুগিরি করতেন। শ্যাম-শ্যামা-শিব—কারবার আমাদের ওসব নিয়ে ছিল। তবে কীর্তনটা ভালবাসি। বৈষ্ণবের ছেলে কালীর কারণ-প্রসাদের স্বাদ পেলে মজে যায়। আমারও তেমনি এই কীর্তনের স্বাদ।

—তা শোনান মশায় একটু!

—তা বেশ তো! কিন্তু আমার গলার বেশ একটু ডিফেক্ট হয়েছে। আর ওপরে ওঠে না। বলেন তো মেয়েকে ডাকি।

—আপনার মেয়ে। ডাকুন—ডাকুন!

মনোরমা এসে সলজ্জভাবেই বাপের পাশে বসেছিল। এবং কীর্তন শুনিয়েছিল। খুব ভাল লেগেছিল গঙ্গাচরণবাবুর। গান শেষে বলেছিলেন, মা আমার একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী!

এই সময়েই এসেছিল ভুবনবাবুর ছেলে—আনন্দমোহন। পরনে খদ্দর, সুন্দর সবল স্বাস্থ্যবান যুবা। বছর পঁচিশেক বয়স। দেখবামাত্র চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। আলোচনা অন্যপথে ঘুরে গিয়েছিল। রাজনীতির পথে। গান্ধীজী এবং বাংলাদেশ। এলাহাবাদ এবং চট্টগ্রাম। ভায়লেন্স এবং নন-ভায়লেন্স। আনন্দমোহন খাঁটি গান্ধীপন্থী। গঙ্গা-চরণ বড় উকীল এবং জেদী মানুষ, দীক্ষায় শাক্ত, দীর্ঘদিন চট্টগ্রামের যুবকদের দেশসেবা ও স্বাধীনতা-যুদ্ধের পিছনে থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, চোখে দেখেছেন তাদের মৃত্যুভয়হীন দৃষ্টি—কানে শুনেছেন তাদের মৃদু দৃঢ় কথা—ফাঁসি? তা হয় হবে। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সশস্ত্র বিপ্লববাদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন—কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হলো, উচ্চ হলো, কিন্তু আশ্চর্য ওই তরুণটি—বারেকের জন্যও উত্তেজনায় উচ্চকণ্ঠে কথা বললে না। রাত্রে তাঁকে ধর্মশালায় পেঁাছে দিল।

রাত্রে গঙ্গাচরণ মশারি খাটিয়ে আরাম করে শুয়েও ঘুমুতে পারলেন না বা ঘুমোলেন না। সকাল বেলায় উঠেই ভুবনবাবুর বাড়ি এসে উঠলেন।

—মশায়, একটা কাজের কথা নিয়ে এসেছি।

—বলুন।

—দেখুন, কাল উপর উপর পরিচয় দিয়েছি কিন্তু ডিটেলস কিছু বলিনি। সেটা আগে বলি। নইলে কথাটা পাড়া অন্যায় হবে।

বলেই তিনি বলে গেলেন নিজের পরিচয়। সমস্ত বলে বললেন—দেখুন, আপনার মেয়েকে আমার বড় ভাল লেগেছে। কীর্তন ভাল লেগেছে, ওর আচার-ব্যবহার ভাল লেগেছে, কি জানেন—কাল এই ঘরে বসে শুনতে পেলাম বোধ হয় আপনার গৃহিণী মনো-মনো বলে ডাকছিলেন—মনোরমা সাড়া দেয়নি; তা আপনার গৃহিণী এসে চাপা গলায় একটু তিরস্কার করেই বললেন—দাঁড়িয়ে আছিস—ডাকছি—রা কাড়িস না কেন? আপনার মেয়ে বললে —যাচ্ছিলাম তো, উনি এই ঘরে রয়েছেন, তুমি কানে খাটো, চেঁচিয়ে রা কাড়লে শুনতে পাবে না, তা আমি কাড়ি কি করে? আপনি বোধ হয় বিয়ে করেছেন খাস রাঢ়ে। গৃহিণীর কল্যাণে রাঢ়ের ভাষাও বজায় আছে। এই মেয়েই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি মশাই খটরোগা জেদী লোক—কিন্তু খারাপ লোক নই। অসৎ নই। ছেলে আমার আরও ভাল। কারণ সে খটরোগা নয়, কটুভাষী নয়; সৎ—বুদ্ধিমান। আর আমি মশাই বাঙালী, মফঃস্বলের উকীলদের মধ্যে বেশ টাকাপয়সা সম্পত্তিওলা লোক। বছরে বারো হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দি। তাও বোধ হয় পুরো টাকার ওপর দেওয়া হয় না। উকীলের ফী—তার উপর জিতলে মক্কেলের কৃতজ্ঞতার সওগাত—সব হিসেব থাকে না। দু লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আমার আছে। আপনি নিজে চলুন। ছেলেটিকে দেখুন। পছন্দ

নিশ্চয় হবে। আর এই মশাই ভবিতব্য। নইলে যেমন মেয়ে আমি চাই, আপনার মেয়ে মনোরমা ঠিক তেমনিটি হয় কি করে? আপনি গৃহিণীকে নিয়ে চলুন—চন্দ্রনাথ দর্শন করে আসবেন—কক্সবাজার দেখবেন—আমার বাড়িঘর ছেলে দেখে বিবাহের দিন স্থির করে ফিরবেন। অবশ্য ইচ্ছা হলে। তা ইচ্ছা আপনার হবেই।

ভুবনবাবু নিজে আসেননি। পাঠিয়েছিলেন ছেলে আনন্দমোহনকে। আনন্দমোহনের সব থেকে ভাল লেগেছিল বিজয়কে। কথা দিয়েই সে ফিরেছিল। এবং মাসখানেকের মধ্যেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল।

* * * *

বিয়ের সময় মনোরমা চট্টগ্রামের বাড়িতে এসে প্রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বিরাট তিনমহলা বাড়ি—ভিতর মহল—বাহির-মহল—ক্ষেত-খামার-গরুবাছুর-গাড়িঘোড়ার আর একটা মহল! ভিতর-মহলে দোতলাতেই আটখানা ঘর। মনোরমার কল্পনাতীত ঐশ্বর্য। সব থেকে বড় ঐশ্চর্য তার স্বামী।

বিজয়চন্দ্র দেখতে সুপুরুষ ছিলেন না—লম্বা ঢ্যাঙা কালো মানুষ ছিলেন—কিন্তু এমন মিষ্টভাষী মধুর প্রকৃতির মানুষ আর হয় না। তার মনে হয়েছিল ব্রতপালন সম্পর্কে এই অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষার যুগে যে যত প্রমাণ দিয়ে অবিশ্বাসের কথা বলুক সব মিথ্যা। ব্রতপালন সত্য। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নইলে সে বিজয়চন্দ্রকে পেলে কি করে? এমন গুণ। এত গুণ! এত ভালবাসা! এত নির্ভরতার আশ্রয়!

এত বাড়ির গৃহিণীপনা—সে এক বিরাট দায়িত্ব। বিশেষ করে যেখানে শ্বশুর গঙ্গাচরণের মত মানুষ গৃহের কর্তা।

ভোর হতে-না-হতে গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর শোনা যেত। তার আগে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়েছেন, এবং নিজের শোবার ঘরের সঙ্গে যুক্ত পুজার ঘরে বসে পুজাপাঠ করতেন। নিজেকে বলতেন তিনি শাক্ত কিন্তু জীবনে দীক্ষা তিনি নেননি। সে দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল। ভগবান মানতেন, গুরু-দীক্ষা এসব মানতেন না। পুজায় উৎসাহ ছিল। দেব-দেবীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ভক্ত ছিলেন না। বেদে উপনিষদে সে যুগের শ্রদ্ধা হেতু ব্রহ্মসন্ধ্যা করতেন, খানিকটা স্তোত্র পাঠ করতেন। আর চণ্ডীর "যা দেবী সর্বভুতেষু" স্তোত্রটি পাঠ করতেন। আর গীতার খানিকটা। এর পরই ছিল চা পান। নিজে হাতে চা তৈরি করতেন—ছোলা আদা ছানার মিষ্টি সহযোগে সেই চা পান করতেন। ছেলেকে খাওয়াতেন—তারপর বাইরের গোশালা তদারক করে গিয়ে আপিসে বসতেন।

মনোরমা এসেই গৃহিণীপনার দায় ঘাড়ে করে—নিজে থেকেই শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনবামাত্র উঠে স্নানটান সেরে চা তৈরি করে এসে শ্বশুরের সামনে দাঁড়াত। তারপর স্বামীর চা।

এর পর থেকে-মহোৎসব। সকালেই প্রায় শতখানেক কাপ চা। সে অবশ্য চাকরেরাই করত। তদ্বির তাকে করতে হতো। সকালেই দোকান থেকে দোকানের লোক এসে মিষ্টান্ন পৌঁছে দিত—আড়াই সের মিষ্টান্ন—আড়াই সের সিঙাড়া কচুরি। ভদ্র বিদেশী মক্কেল, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রজন এলেই চাকর এসে দাঁড়াত। রেকাবি সাজিয়ে রাখত মনোরমা। খানবিশেক রেকাবিতে সিঙারা কচুরি এবং মিষ্টি জালের আলমারিতে বন্ধ থাকত। প্রয়োজনমত নিয়ে যেত। ফুরিয়ে গেলে চাটগেঁয়ে বাঙলায় বলে যেত—ফুরিয়েছে বউমা।

তারপর দুপুরে অন্নপর্ব। সেও কম নয়। সংসারে প্রকৃতপক্ষে লোক তারা তিনজন,

কিন্তু চাকর ঝি পিওন মুহুরি ড্রাইভার নিয়ে তারা প্রায় চৌদ্দ-পনের জন, তার উপর আহুত জন-চারেক, অনাহুত জন-দুয়েক—রবাহুত উচ্ছিষ্টভোজীর হিসাব বাদ থাক। এ সব আরম্ভ হতো দশটায়, চুকত তিনটেয়। আবার চা জলখাবার আরম্ভ হতো পাঁচটায়, শেষ হতো বারোটায়। তারপর ঘরে তালা দেওয়া পর্ব। না দিলে গঙ্গাচরণ রাত্রে বাইরে উঠে প্রতি ঘর ঘুরে তালা টেনে দেখতেন। খোলা থাকলে—পরের দিন ভারপ্রাপ্ত চাকরের চাকরি যেত। এ সব ছাড়াও গঙ্গাচরণের ছিল পরিচ্ছন্নতার বাতিক। কোন না কোন সময়ে হঠাৎ ইনস্পেকশন শুরু করতেন। জানালা খড়খড়িতে আঙুল ঘষে দেখতেন কতখানি ধুলো আছে। সিঁড়ি ঘরের কোণ দেখতেন কোথায় জঞ্জাল জমে আছে। তারপর একহাতে ঝাঁটা অন্যহাতে ন্যাকড়া নিয়ে নিজেই কাজ শুরু করতেন। সুতরাং মনোরমার দায় এবং এ দায়ের আতঙ্ক ছিল কতটা এ যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারে; কিন্তু—স্বামী বিজয়চন্দ্রের অভয় এবং আশ্বাস—প্রেরণা এবং উৎসাহ এত বড় দায়কে যে কত সহজ করে দিয়েছিল এ কেউ বুঝতে পারবে না। বিজয়চন্দ্র প্রথমেই তাকে বলেছিলেন—মনো, এতদূরে তোমার বিয়ে হলো, হয়তো মনে কষ্ট হবে তোমার বাপ-মার জন্যে কিন্তু আমাকে ভালবেসে এখানেই থেকো। জান এতটা কাল শুধু একাই কাটিয়েছি।

মনোরমা সত্যই অষ্টমঙ্গলায় দ্বিরাগমন সেরে এসে আর যায়নি। যাওয়ার অবকাশ পায়নি। প্রায় এক বৎসর পর তার যাবার কথা গঙ্গাচরণই তুলেছিলেন। পুজোর ছুটিতে বিজয় তাকে নিয়ে এলাহাবাদ যাবে। তিনিও যাবেন। তীর্থগুলি ঘুরে আসবেন। কিন্তু সে আর হলো না।

হঠাৎ ভোরবেলা উঠে পা পিছলে পড়ে গেলেন গঙ্গাচরণ। সাত দিন ভুগেই মারা গেলেন। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছিল বুকে। প্রথম এক দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও জ্ঞান হারাননি। বলেননি বেশী কিছু। উপদেশ আদেশ কিছু না। শুধু বলেছিলেন—আমার পালা শেষ। তোমার পালা শুরু। যা শেখাবার যা বলবার—সবই কতশতবার বলেছি শিখিয়েছি। আজ শেষ সময়েও নতুন কিছু মনে হচ্ছে না যা নতুন করে বলে যাই। আমি যা পারিনি তা আপনা থেকেই পেরেছ—হয়তো নিয়েই জন্মেছ। মিষ্টি স্বভাব। ভালবাসার ক্ষমতা। বলব কি?

আর বলেছিলেন—দেখ কিছু কিছু লোককে অন্যায়ের জন্যে কঠিন ব্যবহার করেছি। আমার ডাইরীতে পাবে। অবশ্য তাদের সবাই প্রায় গত। যারা আছে—তাদের পারলে খুশী করো।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—একজনের নাম ডাইরীতে নেই। ডাইরী লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন। তোমার বিয়ের সময় এলাহাবাদে তোমার শ্বশুরের এক বন্ধুকে অপমান করেছিলাম। কেউই জানে না। নাম হারান ভট্টাচার্য। ব্যাপারটা ঘটেছিল সকলের অজ্ঞাতে। তাঁরা পিতাপুত্রে আলাপ করতে এলেন। কিন্তু আমি ঝট করে অপমান করে বসলাম। অপরাধ তাঁর ছিল। কিন্তু আমি কি দুনিয়ার শাসনকর্তা? ভদ্রলোক কাউকে কোন কথা না বলে না-খেয়েই চলে গিয়েছিলেন। তোমার শ্বশুর লোক পাঠালে বলে পাঠিয়েছিলেন যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে একখানা পত্র লিখে দিয়ো তো—লিখো যাবার সময় ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি।

এর পরও দিন-কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কথা বলেননি।

হারান ভট্টাচার্য মনোরমার হারান কাকা। এণ্ট্রান্স পাস—সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ—মিশনারীদের চাকরি করতেন। বড় ভাল মানুষ আর বড় ন্যায়বান মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও কোন গোঁড়ামি ছিল না। ব্রাহ্মধরনের মানুষ। এলাহাবাদের ব্রাহ্মসমাজে

আচার্যের কাজও করতেন—আবার ডাকলে হিন্দুসমাজেও ক্রিয়াকর্ম করে দিতেন। হিন্দুরা বড় ডাকত না। বিলেতফেরত হিন্দুরা অবশ্য নয়। তারা ডাকত। হারান কাকার ছেলে শিবেনদা বি. এ পাস করে ওই মিশনারী ইস্কুলেই তখন মাস্টার হয়েছে। সেও বড় ভাল লোক। বাবার মতই।

মনোরমার বাবার সঙ্গে হারান কাকার বড় সদ্ভাব ছিল। ওদের বাড়ির পাশেই খানিকটা জমিও কিনেছেন হারান কাকা—বাড়ি করে পাশাপাশি থাকবেন। তিনি এবং শিবেনদা তার বিয়েতে না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন—তা জানত মনোরমা, বিজয়ও শুনেছিল; কিন্তু এই কথাটা জানত না। কেউই জানে না বোধ হয়। মনোরমা বিস্মিত হয়েছিল—কি অপমান করেছিলেন শ্বশুর? গঙ্গাচরণবাবু নিজেও সে কথা বললেন না, এরাও সে প্রশ্ন করে তাঁকে কথা বলে ক্লান্ত করতে চাইলে না। কিন্তু গঙ্গাচরণের মৃত্যুর পর বিজয় অত্যন্ত সবিনয়ে তাঁকে পত্র লিখেছিল। হারানবাবু উত্তরও দিয়েছিলেন—"না—না—না। তিনি আমার কোন অপমান করেন নাই। তিনি কয়েকটি সত্য উক্তি করেছিলেন মাত্র। তাঁহার কোন অপরাধ হয় নাই। জীবনকালে তিনি তাহা না বুঝিয়া থাকুন—আজ স্বর্গ হইতে অবশ্যই বুঝিতেছেন। আমার একটা অমার্জনীয় অপরাধ তিনি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন মাত্র। এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে।"

বিজয়চন্দ্র এলাহাবাদে গিয়ে হারান কাকার সঙ্গে দেখাও করেছিল। হারান কাকার বাড়ি তৈরী সবে আরম্ভ হয়েছে মনোরমাদের বাড়ির পাশে। সকালবেলায় তিনি কাজ দেখতে এসেছিলেন। বিজয় মনোরমা দুজনেই গিয়ে প্রণাম করে কথাটা তুলেছিল। হারানবাবু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন—না—না—না।

অবশেষে এইটুকু বলেছিলেন—দেখ,—অপরাধের ক্ষতে কেউ যখন আঙুল সোজা এবং শক্ত করে ছুঁয়ে দেখিয়ে দেয় তখন আঘাত লাগে ভয়ও পায়। সেই জন্যে আমরা সেদিন চলে এসেছিলাম। তিনি তো মহা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন! অপরাধ তাঁর কিছু হয়নি! না—না—না! এর পর হেসে বলেছিলেন—তাঁর ভাষা তীব্র ছিল—তাতে জ্বালা কিছুটা অবশ্য হবারই কথা। তা আজ তোমার মধুর মত কথার প্রলেপে মুছে গেল জুড়িয়ে গেল। গঙ্গাচরণবাবু জীবনের মধুভাণ্ডটা নিজে খরচ না করে সবটা দেখছি তোমাকেই দিয়ে গেছেন। আহা কি মিষ্ট কথা! দীর্ঘজীবী হও। উন্নতি হবেই। মনো মা রাজরানী হয়েছেন—রাজমাতা হোন!

আশীর্বাদের আর বাকী রাখেননি। তার ফাঁকে ফাঁকে ওই কথা—কি মধু!

কথাটা হারান কাকা মিথ্যে বলেননি।

এতকাল পরে অজয়ের পড়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মনোরমার অতীত কথা আগাগোড়া মনে হচ্ছে। তার মধ্যে এইখানে এই কথাটাই তার মনে হলো। বার বার এক কথাই মন বলে উঠল। কথাটা হারান কাকা মিথ্যে বলেননি। শ্বশুর গঙ্গাচরণ তাঁর সারা জীবনে মধুভাণ্ডটি একবিন্দু খরচ না করে ছেলের জন্যই রেখে গিয়েছিলেন। লোকেও তাই বলত।

বিজয়চন্দ্র নিজেও বলতেন—ভেবে আমি দেখেছি। কথাটা খুব সত্যি। ওই ভাবেই বল—আর বিজ্ঞানের যুগে তার মত করেই বল। বাবার এমন রুক্ষ প্রকৃতির কঠিন ধাতুর প্রতিক্রিয়ায় আমি এমন নরম মানুষ। জান, বাবা যখন নিষ্ঠুর সত্যকে নিষ্ঠুরতর করে বলতেন তখন আমার মনটা কেমন আকুলি-বিকুলি করে উঠত। মনে হতো এমনি কঠিন করেই কি বলে! দুঃখ হতো। লজ্জা হতো বাবা দুঃখ দিলেন বলে। চিত্ত হায় হায় করত! তবে মানুষ ছিলেন তো সত্যবাদী ঋষির মত। সাধারণ মানুষকেই তো শুধু এমন করে বলতেন না;—বড়মানুষকেও বলতেন, অপ্রতিহত-ক্ষমতা দণ্ডদাতা তাকেও বলেছেন এ অন্যায়ের আমি

প্রতিবাদ করি। এ অন্যায়। অন্যায় সর্বদাই অন্যায়, সবার পক্ষেই অন্যায়—রাজার অন্যায়ও অন্যায়—প্রজার অন্যায়ও অন্যায়। আমি রাজার অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারি, অবশ্য তাঁর মত শক্তভাবে বলতে কিছুতেই পারি না, আর প্রজা মানে সাধারণ মানুষ অন্যায় করলে সবার সামনে তিরস্কার করে সেটা অন্যায় বলতেই পারিনে। কেমন লাগে। মন আহা করে ওঠে। সেই জন্যে ক্রিমিন্যাল কেস নিয়ে প্র্যাকটিস আমি গোড়া থেকেই নিইনে। জেরাতে লোককে যা-তা বলতে হয়, অপ্রস্তুত করতে হয়। দেওয়ানী স্যুটে ল-পয়েণ্ট নিয়ে বেশী কারবার। ওই আমার ভাল।

ভাল মানুষ মিষ্টভাষী বিজয়চন্দ্র সিভিল স্যুট নিয়ে সিভিল কোর্টে প্র্যাকটিসই পছন্দ করেছিলেন। তাতে গঙ্গাচরণের দপ্তরে সংসারে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এবং তাঁর মিষ্টভাষিতা প্রকৃতির কোমলতা হেতু চট্টগ্রাম সমাজে প্রতিপত্তি প্রাধান্যেরও কমতি কিছু হয়নি। গঙ্গাচরণবাবুর মক্কেল ছিল অনেক—ফৌজদারী মামলা ছাড়াও অন্য মামলার জন্যও তারা অনেকে তাঁর কাছেই আসত, তিনি এর জন্যে জুনিয়রও রেখেছিলেন আলাদা। নিজেও বড় বড় স্বত্বের মামলায় কাজ করতেন। বিজয় তাঁর প্যাটার্নটা বজায় রেখেই সদরটা মফঃস্বল করে মফঃস্বলটাকে সদর করে তুললেন। আর সহজ করে বিজয়বাবু নিজেই বলতেন—দাঁড়িপাল্লার মাল বাটখারার দিক পালটে দিলাম। বাবা ফৌজদারীতে বেশী ঝোঁক দিতেন, আমি দেওয়ানীতে ঝোঁক দিয়েছি। ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

ক্ষতি হয়নি। দেওয়ানীর সিঁড়ি ধরেই অল্পদিনের মধ্যে বিজয়চন্দ্র যথেষ্ট উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন। প্রথম কিছু দিন চায়ের এবং জলখাবারের আসরে ভাটা পড়লেও অল্প দিনের মধ্যেই আবার জোয়ার ধরল। সমান লোকজন—সমান খাওয়া-দাওয়া—সমান সমারোহ। গঙ্গাচরণবাবুর আমলের ধারাধরনের মধ্যে বাইরেটা কিছু পালটাল না—ভিতরটা কিছু পালটাল। সে কড়া শাসন—সে ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। আর শীতলহাটীর কথা-প্রসঙ্গ প্রায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। গঙ্গাচরণের ভিতরে যে সচেতনতা ছিল শীতলহাটী প্রসঙ্গে, তা বিজয়চন্দ্রের ছিল না। মাসান্তে দু'চারখানা স্টেটমেণ্ট দেখা—সই করে দেওয়া এই মাত্র। ইস্কুল চলছে—গার্লস ইস্কুল ভাল চলে না। হাসপাতাল আছে—রোগী বড় আসে না, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী চলে; মধ্যে মধ্যে সরকারী বায়নাক্কার কপি আসে—এটা করা হোক—ওটা করা হোক। এই পর্যন্ত। তাও বিজয়বাবু এখন মনোরমার উপর চাপিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এগুলোর ভার তোমাকে নিতে হবে মনো। নইলে আমি মরে যাব। আর একটা সংযোগ আছে। মাসে একখানি খাম আসে—কাঁচা বাঙলা হরফে ঠিকানা লেখা আর তাতে তেল সিন্দুরের ছাপ। বিজয়চন্দ্র সেখানি মনোরমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কালী ঠাকরুনের নির্মাল্য এসেছে। মনোরমা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে রেখে দিত।

মনোরমার মনে আছে বছর খানেক পর, সে দিন যে চিঠিখানি এসেছিল, সেদিন রাখতে গিয়েও সে না রেখে খুলে নির্মাল্য বের করে নিজের কপালে মাথায় ঠেকালে। পরের দিনই সকালবেলা বিজয়চন্দ্র বাড়ির ডাক্তারকে ডাকলেন। ডাক্তার শুনে বললেন—আমি মিসেস কর্নেলিকে তাহলে একটা কল দি। উনি দেখুন। বুড়ী রিটায়ার করেছে বটে—তবে বড় কল পেলে আসে। আর ও যা বলে যাবে তা নির্ভুল।

অজয় মনোরমার গর্ভে এসেছে তখন। মিসেস কর্নেলি তাই বলে গেলেন।

অজয় নামকরণ সেই দিনই হয়েছিল। কোর্ট থেকে বিজয়চন্দ্র একটা বড় মামলার সওয়াল করে ডাক্তারের রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে বলেছিলেন—নিশ্চয় ছেলে। আমি বলে রাখলাম। মনোরমার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। বিজয়চন্দ্র বলেছিলেন—নাম রাখব অজয়। বিজয়-

চন্দ্রের পুত্র অজয়চন্দ্র। এবার মনোরমা বলেছিল—আমার ইচ্ছে—মেয়ে।

—তোমার ইচ্ছে হলে হবে কি? আসছেন যিনি—তাঁকে তো জানি।

—মানে?

—মানে, বাবা আসছেন। গত জীবনে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সারা জীবনটা যুদ্ধই করেছেন। এবার ভোগ করতে আসছেন। মধ্যে মধ্যে বলতেন—ভগবান দিতে তুমি কম কর নি, দিয়েছ সব। কিন্তু দাওনি দুটি শ্রেষ্ঠ বস্তু। মায়ের কোল আর বাপের আদর। এবার যেন ও দুটো দিয়ো। মনোরমাও একথা শুনেছিল কিন্তু তার মনে হয় নি।

বিজয়বাবু বললেন—মামলার আর্গুমেন্ট করলাম—মনে বুঝলাম—হার পাল্লা জিত পাল্লা হয়ে যাবে। কোর্ট থেকে ডাক্তারের ওখানে রিপোর্ট পেলাম। নামটা ধাঁ ক'রে মনে এসে গেল। আসছেন পুরুষসিংহ গঙ্গাচরণ, এবার নাম হবে অজয়।

খুব পরিতৃপ্ত হয়েছিল মনোরমা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি এলাহাবাদে একখানা চিঠি লিখে দিয়ো। আমি বউদিকে লিখতে পারি কিন্তু লজ্জাও করবে—তা ছাড়া আমার একবারেই চিঠিপত্র লেখা হয় না। মধ্যে মধ্যে বউদি লেখে—আমাদের ভুলে গেলি। এবার বলবে—এইবার নিজের গরজে লিখেছে—ছেলে হতে আসতে হবে তো। তোমার চিঠি আগে যাক—তারপর আমি তিন চার দিন পরে লিখব। কাজের বোঝা টানার ব্যাপারে এই শরীরে রেহাই নেই বউদি। তোমাকে যে পত্র লিখব একখানা—তার ফুরসৎ হয় না। আর শীতলহাটীতে মা মুক্তকেশীর পুজোর জন্যে কাল টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে। এখন ষোল টাকা। ছেলে হলে একশো টাকা।

তারপর পড়েছিল সমারোহ। পরদিন গৃহ-চিকিৎসক এসে—খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা হাসা কাঁদা ওষুধ আহারের এক লম্বা ফর্দ হাতে হাজির হয়েছিলেন—মিসেস কর্নেলি এটা পাঠিয়েছেন। বিব্রত হয়ে পড়েছিল মনোরমা। এই মেনে কি তার চলে? তার এতবড় সংসার। এত দায়িত্ব! তার সমস্ত জীবন এমন পরিপূর্ণ করে দিয়েছে যে বাইরের বিশ্ব পৃথিবীই একরকম বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার কাছে। মেয়ের কাছে বাপের বাড়ির সংসার বড় প্রিয়। মা-বাপ-ভাই-বোন—এদের সঙ্গে যে জন্মলগ্নের মাহেন্দ্রযোগে পরিচয় ঘটে; সূতিকাগৃহের অমৃত মাধুরীতে মধুর, সে তাদেরও ভুলেছে। মধ্যে মধ্যে নিজেকে স্বার্থপর মনে হয় কিন্তু এ স্বার্থপরতাও যেন আরও গাঢ় অমৃতে মধুর। পাকা ফলের অতি উর্বর মাটিতে আপনি খসে পড়ার মত তার জীবন। খসে পড়েছে—এতটুকু মমতার বেদনা রস ক্ষরিত হয় নি; উর্বর মাটিতে পড়ে—অঙ্কুরের স্বপ্নে বিভোর; নীরস কঠিন মাটিতে পড়লেও হয় তো মনে পড়ত গাছের বোঁটায় সুখে দোলখাওয়ার কালের কথা!

উর্বর সরস ক্ষেত্র; উপর থেকে অবারিত সূর্যের উত্তাপের স্পর্শ—অবাধ বাতাসের স্নিগ্ধতা: এর উপরে আবারও রাসায়নিক খাদ্য—জল সেচন! বাপ রে বাপ, এত সইবে কেন?

সে দিন মনোরমার মনে হয়েছিল—ছেলের নাম অজয় নয়—জয়জয়কার বা জয়জয়ন্ত হওয়া উচিত।

বিজয়চন্দ্র বলেছিলেন—জয়ন্ত নামটা মন্দ নয় মনো। একটু থেমে মুখ টিপে হেসে বলেছিল—ওটা দ্বিতীয় জনের জন্যে রিজার্ভ রইল। তারপর যিনি তার নাম দেব সঞ্জয়। মেয়ের নাম জয়ন্তী। সব জয় জয় ব্যাপার।

মনোরমা বলেছিল—রক্ষে কর! একজনের আগমনেই আমার যা হাল করছ—মনে হচ্ছে যেন তোমাদের পেনাল কোডের ধারায় বাঁধা পড়েছি। কলবেরুনো ছোলা বা মুগ, মুরগীর ডিম, কাঁচা সন্দেশ, একগ্লাস দুধ আন্দাজ আধসের,—প্রাতরাশ। না—এত আমি

পারব না খেতে। আমি কি রাক্ষস নাকি? না, আমার পেটে যে এসেছে সে রাক্ষস?

—রাক্ষস নিশ্চয় নয় কিন্তু সে বিজয়ের পুত্র অজয়। তাকে অজেয় হতে হবে। স্বাস্থ্যে বুদ্ধিতে সবে। নইলে কেউ অজেয় বা অজয় হতে পারে না!

কথাগুলি আজ মনোরমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। এই অজয়ের আগমনের সমারোহ।

অজয় নয় দুর্জয়। এ ভয়ংকর ছেলে।

আরও মাস তিনেক পরে এই কথাটাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলেছিলেন। দু-জনেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

মিসেস কর্নেলি মাসে মাসে একবার করে এসে মনোরমাকে দেখে যেতেন। পরীক্ষা করতেন। পঞ্চম মাসে এসে দেখে শুনে বেরিয়ে এসে—বিজয়বাবুর আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—মিস্টার মুকুর্জি, আপনাকে কয়েকটা কথা বলা আমার দরকার বলে মনে করছি। জরুরী কথা। হাঁ খুব জরুরী।

আপিসে বসে বলেছিলেন—দেখুন কথাটা আগেই আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু খুব সঠিক বুঝিতে পারি নাই বলিয়া বলি নাই। এবার আমি অনেকটা ঠিক বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

—কি বলুন তো?

—আপনার স্ত্রী তো এলাহাবাদে যাইবেন প্রসব হইতে?

—হাঁ। আমাদের তাই নিয়ম। এবং এটা ছ মাস—এই মাসের শেষেই যাবেন।

—এলাহাবাদ অবশ্য ভাল জায়গা। বড় বড় ডাক্তার আছেন। কিন্তু আমার উপদেশ—আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় গিয়া ওখানকার বড় গায়নোকোলজিস্টদের দ্বারা আপনার স্ত্রীকে পরীক্ষা করাইয়া লউন। কেন না—।

—বলুন।

—আমার মনে হইতেছে—আপনার স্ত্রীর প্রসব স্বাভাবিকভাবে হইবে না।

—মানে?

—আপনি সিজারিয়ান অপারেশন করিয়া ডেলিভারীর কথা অবশ্যই জানেন।

চমকে উঠেছিলেন বিজয়বাবু—পেট কেটে প্রসব?

—হাঁ। আপনার স্ত্রীর শরীর গঠনে খুঁতের জন্য স্বাভাবিক প্রসব হইবে না। অন্যথায়—।

বাকী কথাগুলি বলেননি মিসেস কর্নেলি। কিন্তু বুঝতে বাকী এক্ষেত্রে কারুরই থাকে না—বিজয়বাবু তো শিক্ষিত মানুষ।

সে রাত্রে উদ্বেগে স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই ঘুম হয় নি। বিজয়বাবু ডাক্তারী বই আনিয়ে গোটা অধ্যায় নিজে পড়ে শেষে মনোরমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন—যত ভয় আমরা পাচ্ছি তত ভয়ের কিছু নয়।

তবু কি আশ্বস্ত হওয়া যায়? মনোরমার সুখের সংসার। এত সুখ এত ঐশ্বর্য—এত গৌরব পরিপূর্ণ জীবন! যদি—।

* * * *

কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা পনের দিনের মধ্যেই। এবং সব থেকে বড় বড় গায়নো-কোলজিস্টদের দেখিয়ে মতামত নিয়েছিলেন।

মিসেস কর্নেলি পাকা বহুদর্শী অভিজ্ঞ মেয়ে ডাক্তার—তাঁর ভুল হয়নি। সিজারিয়ান অপারেশনই প্রয়োজন হবে। অন্যথায়—

তাঁরা হেসে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—এতে ভয়ের কি আছে? ভয়ের কিছু নেই।

শতকরা নব্বই-পঁচানব্বইটি কেস সাকসেসফুল হয়। এ কেসেও হবে। আপনার স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

বিজয়বাবু বলেছিলেন—সাহস পাচ্ছিনে কিন্তু সাহস না করেও উপায় নেই। তবে ডেলিভারির পরই ওর আর যাতে সন্তান না হয় সে অপারেশনও করে দিন।

ডাক্তাররা বলেছিলেন—কেন? আর একটি-দুটি হোক তারপর করে নেবেন। তিনবার সিজারিয়ান ডেলিভারী—সহজ। নর্ম্যাল বলতে পারেন।

বিজয়চন্দ্র বলেছিলেন—না। ওতে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তাই হয়েছিল। বাকী কয়েক মাস কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটের বাসায় থেকেছিল মনোরমা। লোকজন ছিল—একজন ডাক্তারকেও মাইনে করে রাখা হয়েছিল। বিজয়বাবু আসা-যাওয়া করতেন। দশ মাসের মাসে—তিনি সব ছেড়ে কলকাতাতেই থেকেছিলেন। আজকের দিনে এটা বাড়াবাড়ি মনে হবে কিন্তু সেকালে ১৯২৭ সালে—অর্থশালী বিজয়চন্দ্রের পক্ষে এটা আদৌ বাড়াবাড়ি ছিল না। সিজারিয়ান অপারেশন ডাক্তারদের কাছে কঠিন ছিল না—ভয়ংকর কিছু মনে হত না, কিন্তু অনভ্যস্ত এদেশের মানুষের কাছে তা কঠিন এবং ভয়ংকরই মনে হত।

যেদিন ব্যথা ওঠে সেদিন মনোরমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল স্বামীর কোলে মুখ লুকিয়ে। স্বামীও কেঁদেছিলেন।

সাহস দিয়েছিল বউদিদি।

খবর পেয়ে মনোরমার বাপ ভুবনবাবু পুত্রবধূকে নিয়ে এসে গ্রে স্ট্রীটের বাসায় ছিলেন শেষের তিন মাস। পুত্রবধূ আনন্দমোহনের স্ত্রী নলিনী শহরের মেয়ে এবং বড় পারংগমা মেয়ে। সে লেখাপড়াও করেছে—বাড়িতে স্বামী শ্বশুরের কাছে পড়ে আই-এ পাস করেছে। তাকে নিয়েই তিনি এসেছিলেন। মনোরমার বউদি নলিনীর কোলে তখন দুনি—দু বছরের; শুধু তাকে নিয়েই এসেছিল—বড়—ছ-সাত বছরের ভুনিকে শাশুড়ীর কাছে রেখে এসেছিল।

নলিনী মনোরমাকে সাহস দিয়ে বলেছিল—কাঁদিস নে। হাসতে হাসতে যা। এত ভয় খাস কেন? দূর। তোর স্টেরিলাইজেশন হয়ে যাক—আমিও করিয়ে এখান থেকে যাব। দুটো হয়েছে—ওই ঢের। আর কেন? চল—ওঠ।

অজয়কে কোলে নিয়ে মাসখানেক পর যখন সে বাড়ি ফিরেছিল—তখন বউদিদি গালে টোকা মেরে বলেছিল—কি রে—বড় কেঁদেছিলি যে!

মনোরমা হেসেছিল—বলেছিল—যা ভয় পেয়েছিলাম! কি করব? বইটই পড়েও তো ভয় ঘুচল না।

—তা তো হবেই মনো। তোর এত বড় ভাগ্য!

অজয়ের অন্নপ্রাশনে—এই "তোর এত বড় ভাগ্য" কথাটাই বিষিয়ে কটু হয়ে উঠেছিল। সেও অজয়কে নিয়ে। অজয়ই তার কারণ।

খুব সমারোহ করেছিলেন বিজয়বাবু। লোকে বলেছিল—চট্টগ্রামে অন্ততঃ এত বড় সমারোহের অন্নপ্রাশন আর হয়নি। এলাহাবাদ থেকে বাবা মা—বউদি দাদা—দুনি ভুনি—বড়দি, মেজদি, তাদের ছেলেমেয়ে সকলে এসেছিলেন। এখানকার ব্যাপার দেখে মা বাবার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। বউদি দিদি মেজদি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।—এ যে বিরাট কাণ্ড! রাজা-রাজড়া দেখিনি। সে আর এ যে কত বেশী?

মনোরমা হেসে বলেছিল—অনেক বেশী।

মেজদি বলেছিল—সে জানি মনো। কিন্তু আমরা যে অবস্থার লোক—তাতে এই রাজবাড়ির—। যার যেমন ভাগ্যি। তোর ভাগ্যি রে। নইলে যে সময়ে বিজয়ের বাবা

তোকে দেখেন—তার ক-মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে। তোর থেকে মনো আমি সুন্দরও ছিলাম। আজ না হয়—সরকারী আপার গ্রেড কেরানীর বউ হয়ে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলে—এই ক'বছরে তিনটে ছেলের মা হয়ে তোর কাছে হেরে গেছি—সেদিন কিন্তু গংগার ঘাটে আমরা দুজনেই থাকতাম আর Priorityর দাবীতে রূপের দাবীতে আমি জিতে যেতুম। কি বউদি—তুমি বল ভাই!

মেজদি বড় আনন্দময়ী। খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নিজের রসিকতায় নিজেই।

বউদি বলেছিলেন—তা বিজয়বাবুর হাতে ব্রিফ দিয়ে একটা টাইটেল স্যুট জুড়ে দে। আমারও কিছু অংশ পাওয়া উচিত বলে। হারবি নে আমি বলে দিলাম। অবিশ্যি বিজয়বাবু যদি ব্রিফ নেন।

এমন আনন্দে শুরু হয়ে হঠাৎ যেন একটা ঝড় এসে রঙীন কাগজে কাপড়ে সাজানো একটা প্যাণ্ডেলের সব কিছু ছিঁড়ে-খুঁড়ে দড়ি আর বাঁশের জোড়াতাড়া দেওয়া কুৎসিত কাঠামোটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল।

ওই অজয়কে নিয়েই। তার ওই একটি সন্তান। আর হবে না। এবং কলকাতার শিশু-চিকিৎসা বিশারদ বলে দিয়েছিলেন—এসব সিজারিয়ান অপারেশনের ছেলেরা একটু প্রবলেম চাইল্ডের মত হয়ে থাকে। রক্ত-কণিকা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। অল্পেই অসুখ করে। বলে একটা চার্ট করে দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে ঘড়ি ধরে খাওয়ানো নাওয়ানো বেড়ানোর ব্যবস্থা কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে মনোরমা পালন করত। এটা ওটা নাড়া-ছোঁয়া ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার। অতি সতর্ক। তার এতটুকু এদিক-ওদিক তো হতই না—উল্টে মাত্রা অত্যন্ত বেশী হয়ে গিয়েছিল। আট মাসে অন্নপ্রাশন হয়েছিল অজয়ের—এই আট মাসে পাঁচটা ঝি বরখাস্ত হয়েছিল। কেউ হাতে একটা কাগজ দিয়েছিল। কেউ চুমু খেয়েছিল। কেউ বিছানার চাদর নিয়মমত বদলায় নি। কেউ বিরক্ত হয়েছিল অজয়ের কান্নায়।

ওই মেজদিদিই অজয়ের হাতে দিয়েছিলেন একটুকরো মিষ্টি। তাঁরই কোলে ছিল অজয়। মনোরমা কর্মান্তরে যাবার পথে তার হাতে মিষ্টি দেখতে পেয়ে বাঘিনীর মত ছুটে এসে তাকে টেনে কোলে নিয়ে—হাতের মিষ্টি কেড়ে ফেলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—মুখে আঙুল পুরে মুখের মিষ্টিও বের করে ফেলে দিয়ে বলেছিল—কে—কে দিলে মিষ্টি?

অপ্রতিভ মেজদিদি বলেছিলেন—কেন রে? আমি!

—ছি-ছি ছি বড় অন্যায় করেছ মেজদি। ওর এসব সহ্য হয় না। ওকে ডাক্তারের নিয়মমত রাখা হয়েছে—এখন কিছু ইনফেকশন হলে কি হবে বল তো?

কথায় উত্তাপ ছিল—তাকে সে সংবরণ করতে পারে নি। অভ্যাসটা তার ছিল না।

—ইনফেকশন কেন হবে? এই তো আমার ছেলেরাও খাচ্ছে।

—ওদের সঙ্গে ও সমান নয় মেজদি। তুমি জান না।

বলে ছেলেকে কোলে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা গড়িয়েছিল অনেক দূর। অপরাহ্নে বউদি বলেছিলেন—তুই মেজদিকে বলিস—মেজদি, কিছু মনে করো না। আমি ভাই ইচ্ছে করে তো করিনি। পাঁচ ঝঞ্চাটে মেজাজ খিঁচড়ে ছিল—ওটা হঠাৎ হয়ে গেছে। ও বড় দুঃখ পেয়েছে।

সে তা বলেও ছিল। কিন্তু মেজদি বলেছিলেন—মনে করব কি রে? কি মনে করব? আর তুই যা করেছিস—সে ঠিক করেছিস। তোর এত বড় বাড়ি—এত ঐশ্বর্য—তোর ওই একটা ছেলে—তোর ওই রকম করাই তো স্বাভাবিক। কি মনে করব তাতে? আমার পক্ষে কিছু মনে করা স্বাভাবিক নয়!

মনোরমার ক্ষোভে অভিমানে চোখ ফেটে জল এসেছিল। বলতে ইচ্ছে করেছিল স্বাভাবিক

হয়তো নয় মেজদি কিন্তু আমার বাড়িতে এসেছ তোমরা, অতিথি। বলতে হয় বলেই বলছি। কিন্তু দাঁতে দাঁত টিপে আত্মসম্বরণ করেছিল এবং মেজদির মনের এই নগ্ন প্রকাশের পর ওই কথা বলার জন্য একবিন্দু অনুতাপ হয় নি। তার অজয়ের জন্য সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পর করতে পারে। অজয় তার জীবনমূল্যে দিয়ে পাওয়া। অজয় তার স্বামীর জয়ধ্বজা।

* * *

অজয়কে নিয়েই তার জীবন ফুলে ফলে আশায় কল্পনায় কল্পতরুর মত হয়ে বেড়ে চলেছিল তের বৎসর ধরে।

তের বৎসরে বাহিরের জগতে কত কি ঘটল কিন্তু অজয়কে নিয়ে তার জীবনে সে পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে মনোরমা দেয় নি। তার অজ্ঞাতসারে পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু তার জ্ঞাতসারে পড়তে পায় নি। যে মেঘই এসেছে অজয়কে আচ্ছন্ন করতে—বাতাসের মত ধেয়ে গিয়ে সে তাকে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ তের বৎসর—প্রচণ্ড গতির বৎসর। অনেক কিছু ঘটে গেছে। তাদের পারিবারিক জীবনে—বাবা গেলেন—মা গেলেন—দাদা গেলেন। আগে মা তারপর দাদা—তারপর বাবা। চার বছরের মধ্যে তিন জন। দুবার সে গিয়েছিল—মায়ের মৃত্যুতে সে যেতে পারে নি। অজয়ের তখন অসুখ করেছিল। বিজয়চন্দ্র গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন—তোমার যাওয়া উচিত ছিল। অজয়ের অসুখ এমন তো বেশী ছিল না। পাঁচ কথা কইলে পাঁচজনে।

মনোরমা কথা বলে নি। বিজয়চন্দ্র বলেছিলেন—কিম্বা আমারও উচিত ছিল না-যাওয়া। তাহলে তাঁরা অজয়ের অসুখের উপর গুরুত্ব দিতেন; বলতেন বাপ মা যখন দুজনেই আসেন নি তখন অসুখটা সত্যিই বেশী। অন্ততঃ আসতে না-পারার মত।

এবার সে বলেছিল—নিন্দে যা হয়েছে—সে তো আমারই হয়েছে। তোমার নিশ্চয় হয় নি। সুতরাং তোমার দুঃখের কিছু নেই। এবং যা বলবার মেজদিই বলেছেন নিশ্চয়।

—শুধু মেজদি কেন? বড়দিও বলছিলেন।

—বলুন। শুধু বাবা দাদা বউদি কিছু না বললেই হল।

প্রথমেই মা মারা গিয়েছিলেন। তারপর দাদা। সেবার সে গিয়েছিল। বিজয়চন্দ্র যাবার সময় যেতে পারেন নি; পরে আনবার সময় গিয়েছিলেন।

বউদির সে-মূর্তি সে ভুলতে পারবে না। সে যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির, যেন কোন পরিত্যক্ত বা প্রাচীনকালের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মধ্যে সেই প্রাচীনকালেরই একটি পাথরের নারীমূর্তি আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে ঠিক আপনার সেই প্রতিষ্ঠার স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর মন্দির ভেঙে গেছে—আকাশ মাথায় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেকে নিয়ে মনোরমা যেতেই বলেছিলেন—তাই তো মনো—তুই এলি কিন্তু তোর যে অসুবিধে হবে অনেক। অজয় এসেছে।

সে বলেছিল—সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি বউদি। সব আমি খুঁটিয়ে এনেছি। লোক এনেছি। এখানে সব পাওয়া যায়। তুমি ভেবো না।

বড়দি মেজদি কেউ আসেন নি। বড়দির স্বামী তখন সদ্য বদলী হয়েছেন। মেজদি সূতিকাগৃহে।

বাবার মৃত্যুর পর সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অজয় তখন বারো বছরের। ১৯৩৯ সালে। অজয়কে দেখে সকলেই অবাক না হয়ে পারেনি। তারা ভেবেছিল—চেহারার দিক থেকে অজয় হবে নাদুস-নুদুস, স্বভাবে আবদেরে, বুদ্ধিসুদ্ধিতে বাঙাল। কিন্তু তা মনোরমা হতে দেয় নি। এবং স্বামী বিজয়বাবুরও এদিকে ছিল আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আধুনিক এবং সুস্থ দৃষ্টি। সেখানে স্নেহের আবেগ মমতার আতিশয্য একবিন্দু অধিকার পায় নি। বোধ করি

উকিল ছিলেন বলেই একটি সুস্থ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতেন। শরীরে স্বভাবে শিক্ষায় ছেলেকে তিনি নামের যোগ্য করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। একসারসাইজ সাঁতার লেখা-পড়া সবের জন্যই তিনি লোক রেখেছিলেন।

বিধ্বস্ত হোমকুণ্ডের মত অবস্থা তখন চট্টগ্রামের। অথবা স্বামী বিজয়চন্দ্র যে কথাটা বলতেন সেইটেই বোধহয় শ্রেষ্ঠ উপমা। তিনি বলতেন—ভারতবর্ষ খাণ্ডববন—চট্টগ্রাম তার আগুন-লাগা কোণ। ভারতরূপী সারা খাণ্ডববনে দাবাগ্নি আজ অরণিবৃক্ষগুলি ফেটে বেরিয়ে জ্বলতে চাচ্ছে, জীবন-বহ্নি আজ স্তিমিততেজ, দাউ দাউ করে জ্বলে সে তেজকে ফিরে পেতে চান তিনি। তিনি বলেন অরণ্য তাঁর সম্পত্তি ; কিন্তু ভারত খাণ্ডব আর ইন্দ্ররাজার দখলে ; আগুন জ্বলছে আর তিনি পাঠাচ্ছেন মেঘরূপী সৈন্যবাহিনী, তারা এসে নিভিয়ে দিচ্ছে। একবার উনিশশো আঠারোতে জ্বলেছিল পাঞ্জাবের কোণে জালিয়ানওয়ালাবাগে, তারপর উনিশশো তিরিশে জ্বলল—দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চট্টগ্রামে। এখন সাহায্য চাই নরনারায়ণের ; তিনি আসবেন। চট্টগ্রামের কোণে জ্বলন্ত আগুন নিভেছে কিন্তু তাপ যায় নি। এখনও বনের গাছের মত যে কোন গাছের বুকে হাত দিয়ে দেখ, তাপ অনুভব করবে।

ভারতবর্ষ খাণ্ডববন—চট্টগ্রাম তার আগুন-লাগা-কোণ। সে কোণে যে গাছগুলির ভিতরের আগুন বাইরে জ্বলে তাদের ছাই করে দিয়ে গেল—তাদের জায়গায় যে নতুন গাছ জন্মেছে তারাও যে অগ্নিবহ বনস্পতি শিশু।

বিজয়চন্দ্র সযত্নে লালন করছিলেন—উপাদান ছিলই—চট্টলের মাটিতে ছিল জলে ছিল বাতাসে ছিল, বিজয়চন্দ্র তার উপর তার গোড়ায় ঢেলেছিলেন অগ্নিবহ সার। স্বাস্থ্যের জন্য একজন এসে সপ্তাহে দুদিন শিক্ষা দিয়ে যেত ; অভ্যাস সে নিজে করত। সাঁতার শেখাতেন বিজয়বাবু নিজে, রবিবার রবিবার নিয়ে যেতেন সমুদ্রস্নানে। লেখাপড়ার ব্যাপারেও তাই ছিল। মাস্টার ছিল—কিন্তু তিনি ঠিক আগলে বসে পড়াতেন না—তিনি পাশের ঘরে বিজয়বাবুর লাইব্রেরী গোছাতেন—দরকার হলে অজয় ডাকত। এর উপর বিজয়বাবু দিনান্তে যখন হোক একবার বসতেন কাছে। মনোরমার আদর ছিল যথেষ্ট—কিন্তু কড়া নজর ছিল ছোঁয়াচের দিকে। সে খাবার বিষয়ে—ধরা-ছোঁয়ার বিষয়ে—আর বাইরের মেলামেশার ব্যাপারে।

আজ মনোরমা বুঝতে পারছে—খুঁত হয়েছে ওইখানেই। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বেড়ে-ওঠা অজয়ের ছোঁয়াচ প্রতিহত করবার স্বাভাবিক শক্তি জন্মায় নি। পরীক্ষা করে দেখে নি কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

যাক সে কথা। বাবার শ্রাদ্ধে বড়দি মেজদি অজয়কে দেখে বিস্মিত হয়েই বলেছিলেন—ও বাবা! তুমিই সেই মিষ্টি মিষ্টি চেহারার গেল-গেল গোপাল অজয়? এ যে ঢ্যাঙা তালগাছ হয়েছ? এঁ্যা? শক্ত শক্ত চেহারা। কি কাণ্ড!

অজয় প্রণাম করে সলজ্জ হাসি হেসে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমা পাশের ঘরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিল। বাবার শ্রাদ্ধে সাহায্য কি ভাবে করা যায় সেই কথা।

মেজদিদি বোধ করি পুরাতন প্রসঙ্গ স্মরণ করে নীরবই রইলেন কিন্তু বড়দি ছাড়েন নি। তিনি বলেছিলেন—বাপ লম্বা ঢ্যাঙা—ছেলে ঢ্যাঙা হয়েছে—কিন্তু মনো বুঝি অসুখের ভয়ে মেপে মেপে খেতে দেয়?

অজয় এবার বলেছিল—আমি একসারসাইজ করি যে!

—ও বাবা! একসারসাইজ? বাঙলা দেশের বীর, পালোয়ান? কি কি পার? এ্যাঁ?

অজয় মিষ্টি করেই ফিরিস্তি দিচ্ছিল। বৈঠক—ডন—স্কিপিং—সাঁতার—

—সাঁতার? বল কি? আমাদের এখানে গঙ্গা আছে—যমুনা আছে—যমুনার ব্রিজের

উপর দিয়ে এসেছ—নিশ্চয় দেখেছ ; সাঁতার দিতে পার ?

এবার আর মনো থাকতে পারে নি ! ভেজানো দরজা খুলে এ ঘরে ঢুকে একেবারে বঙ্গজ ভাষা ব্যবহার করে বলেছিল—হাঁ গো ঠাঁইরান—চাটগাঁইয়া পোলায় গঙ্গা-যমুনা কি দেখাও ? চাটগাঁইয়া জোয়ান খালাসী হইয়া হমুন্দুরে ভাসে—জাহাজ চালাইয়া হাত হুমুন্দুর চষ্যা বেড়ায়। আকাশে একটুকরা ম্যাঘ উঁকি মারে—নদীর জল অইতো কালো কালো দৈত্য—লাফ মাইরা উঠে। অরে গঙ্গা যমুনা কি দ্যাখাও গো ! আর বইলা দে তো বাপ—আখনো সায়েব ম্যাম লোগেরা পোলা কাঁদলে কি কয় ?—Stop—Stop—Sing is coming ! অনন্ত সিং ! হুঁ—হুঁ। সেই দেশের ছেলে দিদি - আমি ওকে ননীগোপাল করতে চাইলে হবে কি—ও হবে না। তবে হ্যাঁ তুমি ভাই লাহোরে থাক—তুমি গামাটামার কথা বলতে পার !

কতদূর যেত বলা যায় না। কিন্তু বিজয়বাবু শঙ্কিত হয়ে বউদিকে ডেকে দিয়েছিলেন। তিনি এসে বলেছিলেন—একবার এস ভাই তোমরা, তোমাদের সুখদুঃখের কথা পরে কইবে এখন—শ্রাদ্ধের কি হবে না হবে সকলে বসে ঠিক করে নাও।

শ্রাদ্ধের কথা ঠিক হয়েই ছিল। ব্যবস্থা করছিলেন হারাণকাকা। সেই হারাণকাকা। তিনিই বউদির প্রকৃতপক্ষে সব এ বিপদে। বড় ছেলে ভুনির বয়স মাত্র পনের ষোল, দুনি অজয় থেকে আড়াই বছরের বড়—তেরোতে পড়েছে সে। হারাণকাকার স্ত্রী মারা গেছেন—তাঁর পুত্রবধূ—তার তিনটি সন্তান—বড়টি মেয়ে, মেজটি ছেলে, ছোটটি মেয়ে ; রমা, রবীন, উমা ; ছোট বছর চারেকের উমা, তাকে বাদ দিয়ে বাকী সকলেই ফাইফরমাশ খাটছিল। হারাণকাকার ছেলে তখন লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছে সেখানকার মিশন ইস্কুলে। না হ'লে সেও থাকত। হারাণকাকাকে ডেকে শ্রাদ্ধের ফর্দটা শুনিয়ে দিয়ে বউদিদি তখনকার মত সব চাপা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বলেছিলেন, বাড়িতে জায়গা কম। সকলে এক জায়গা হয়েছি। একটু অসুবিধে করে থাকা যায় অবিশ্যি—কিন্তু একজন কেউ হারাণকাকার বাড়ির উপরেই নতুন ঘরে থাকলে সব বেশ সুবিধে করে থাকা যায়। আমি বলি—মনো গিয়ে থাক ওখানে। কি মনো ?

বড়দি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—খুব ভাল কথা। মনোও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ওর খোলামেলায় আরামে থাকা অভ্যাস। নতুন ঘর। কোন রোগটোগের ভয় নেই ; নোংরা নয়। আমরাও বাঁচব—কোথায় কি খুঁত হল—কি অপরাধ হল—এ ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না !

মনোরমা বলেছিল—খুব ভাল কথা বড়দি। খুব ভাল কথা। আমিও খুশী হব। তোমাদের যেমন ভয়—ভয় তেমনি আমারও আছে। তোমরা বড়—গুরুজন—কোথায় আমার অপরাধ হয়ে যাবে—হয় বিনাদোষেই হয়ে যাবে ; যার জন্য আমি হয়তো দায়ীই নই—দায়ী আমার ভাগ্য ; অথচ তার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে শাস্ত্রের পেনালকোড অনুসারে। কারণ তোমরা বড়।

বড়দি বলেছিলেন—মনো !

হাত জোর করে মনোরমা বলেছিল—মাফ কর বড়দি, কথাটা তুমি আগে তুলেছ। বড় যা বলে ছোটতে তাই শেখে - তাই বলে !

এবার বউদি হাত জোড় করে বলেছিলেন—আমি হাত জোড় করছি।

বড়দি তবু বলেছিলেন—ধন ঐশ্বর্যের এত অহংকার ভাল নয় মনো।

মনো বলেছিল—তুমি আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছ বড়দি ! কিন্তু অপরাধ আমি করিনি—ও আমার লাগবে না আমি জানি।

*   *   *   *

মনোরমা আজও জানে না, আজও মানে না এই অভিসম্পাতই ফলল কি না! তিন বছর পর—১৯৪০ সালে—স্বামী বিজয়চন্দ্র মারা গেলেন। হঠাৎ কোর্টে আর্গুমেণ্ট করতে করতে বুকে বেদনা নিয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। সেখানেই ডাক্তার ডেকে দেখানো হল। বাড়ি এনে পৌঁছে দিল অ্যাম্বুলেন্স। বাড়িতে নামিয়ে ঘণ্টা কয়েক বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কথা মাত্র চারটি শব্দ বলেছিলেন—বার বার। বা—যতবার কথা বলেছেন—ওই চারটি শব্দেরই একটি বা দুটিই বলেছেন।

—বাবা? যাই!

—মনো! অজয়—অজয়—

বাবা যেন এসেছিলেন—ডেকেছিলেন, তাঁকে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন—যাই!

আর তিনি নিজে যেন মনোরমাকে ডেকে অজয় রইল বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। শেষ করেই বা কি হত? ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর—আশ্বিন মাস—মহালয়ার ঠিক পাঁচ দিন আগে। মনোরমার পনের বছরের বিবাহিত জীবন একেবারে চরম আর পরম সৌভাগ্যের সময়। অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাত হল—ক্রমাগত উঁচুদিকে বাড়তে থাকে সৌভাগ্যের মাথায়। সে মুহ্যমান হতচেতন হয়ে গেল অন্তরে অন্তরে। বাইরে কিন্তু সে আশ্চর্য স্থির রইল। কেমন করে রইল সে তা জানে না। মনে পড়েছিল কয়েকবার—সদ্যবিধবা বউদির ছবি। আর শক্তি পেয়েছে শোকাহত অজয়কে দেখে। তের বছরের কিশোর—সে তো শুধু বাপকে হারায়নি সে তার সঙ্গী হারিয়েছে—চড়াই উঠবার পথে হাতের দণ্ড হারিয়েছে, প্রখরতম রৌদ্রে ছায়াহীন প্রান্তরপথে মাথার ছাতা উড়ে গেছে। একবার ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছিল—তার থেকে বাঁচা এক জোয়ান মাঝিকে দেখেছিল মনোরমা। ঠিক যেন তার মত অবস্থা—মুখের চেহারা হয়েছে অজয়ের। মনোরমা বাইরে চেতনা হারিয়ে কিছুতেই অচেতন হতে পারে নি। সে ছেলেকে—ভয় কি! এ কথা বলে সান্ত্বনা দিতে পারে নি, শুধু নীরবে শীতের রাত্রের শীতার্ত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরার মত জড়িয়ে ধরেছিল। শীতপ্রধান দেশে শীতের রাত্রে—যেন বরফ পড়তে শুরু হয়েছে আর তার মধ্যে চাল উড়ে যাওয়া ঘরের দাওয়ায় মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে।—হে ভগবান কথাটিও মুখে বের হয় নি!

বড়দির কথাটাও বারেকের জন্য মনে কোন সংশয়ের খোঁচা মারে নি।

তবে খবর সে দিদিদের দেয় নি। ঠিক ইচ্ছে করে দেয় নি এ নয়; দেওয়ার কথা মনে হয় নি। খবরের কাগজে—কলকাতার খবরের কাগজে খবরটা বের হয়েছিল। আর যথা-নিয়মে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছিল। পত্র বউদিকে লেখা হয়েছিল মৃত্যুর পরদিনই; শীতলহাটীর দপ্তর আর এখানকার সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত শ্বশুরের আমলের কর্মচারী এসে বলেছিলেন—বউমা, খবরটা আত্মীয়স্বজনদের তো দিতে হয়! এলাহাবাদে—?

মনোরমা বলেছিল—দিয়ে দেবেন।

তিনিই এলাহাবাদে পত্র লিখেছিলেন। মনোরমার দিদিদের পত্র কদাচিৎ আসত, ভুবন-বাবুর মৃত্যুর পর আর আসেই নি—সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরও লেখার কথা মনে হয় নি। শীতলহাটীতে পত্র লিখেছিলেন।

বউদি এলেন দুনিকে নিয়ে। তার করেছিলেন, গাড়ি গিয়েছিল। বউদি এসে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাকে কিছুক্ষণ দেখেছিলেন। তারপর কাছে বসে তার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন—তুই কেঁদেছিস মনো?

—না বউদি, অজয়ের জন্যে কাঁদতে পারি নি!

—কাঁদ খানিকটা কাঁদ।

—না।

—না রে। না কাঁদার বড় যন্ত্রণা! .

—তোমার কথা আমার বার বার মনে হয়েছে বউদি!

—আমার আর তোর মনো? আমি তো জানি সব। বিজয়বাবু—

এতক্ষণে কেঁদেছিল মনোরমা!

অনেকক্ষণ কান্নার পর প্রশ্ন করেছিল—দুনির সঙ্গে এলে? ভুনিকে আনলে না কেন?

—সে ভাই গান্ধীজীর চ্যালা। গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের ভার নেবেন ঠিক হয়েছে। সে সেই কাজে ব্যস্ত। সে যদি কাগজে দেখেছে তো দেখেছে নইলে সে খবরও জানে না। তার ঠিকানাও জানি না। রমার মাকে বলে এসেছি—যদি ফেরে খবরটা দেবে।

চকিতে মনোরমার মন বোধ করি জীবনে প্রথম বাইরের জগতের ঘূর্ণাবর্তের প্রচণ্ড বেগের এবং গতিধ্বনির গর্জনের আভাস অনুভব করলে।

স্বামী বিজয়চন্দ্র ছিলেন এ দুর্গের সিংহদ্বার। সে সিংহদ্বার একটা বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাহিরের সমগ্র জগৎ চক্রের আবর্তনের সঙ্গে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। টানছে।

* * * *

বউদিকে সে বিদায় দেবার সময় বলেছিল—বউদি, বল তো কি করব?

—কিসের মনো?

—তোমার নন্দাই থাকতে ভাবি নি। তিনি নেই। ওদিকে যুদ্ধ লেগেছে। এদিকে গান্ধীজী আবার আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। এটা চট্টগ্রাম। অজয় আমার বয়সে তেরো হলেও দেখতে ষোল বছরের মত! যদি—

থমকে গিছলেন বউদি। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—কিছু দিন থেকে দেখ। ভেবে দেখ! আমি হট করে বলতে পারব না—তোর স্বামী-শ্বশুরের গড়া এত বড় কীর্তিসম্পত্তি তুই ভয়ে ছেড়ে পালা। সেটা ঠিক হবে না। তোর তো ভয় করলে চলবে না। এত বড় বিরাট সংসার সম্পত্তির সব ভার যে তোর!

মনোরমা মনকে ভিতরে ভিতরে বাঁধছিল—এ কথায় সে জোর পেয়েছিল তখন।

বউদি চলে যাবার পর সে জোর নিয়েই কাজ শুরু করেছিল। প্রধান সহায় করেছিল—শ্বশুরের বুড়ো মুহুরী—যিনি প্রায় ম্যানেজারের কাজ করতেন তাঁকে এবং তাঁর স্বামীর মুহুরীকে—সে লোকটিও প্রৌঢ় এবং সজ্জন মুসলমান। বিজয়চন্দ্র থাকতেই মনোরমা সম্পত্তির অনেক কিছুই কাজকর্ম করেছে; শীতলহাটীর কাগজপত্র দেখা থেকে তার শুরু, পরে বিজয়বাবু অনেক কিছু চালিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে সম্পত্তির মধ্যে জমিদারী তালুক ছিল না—ধানীজমি ছিল, শহরে বাড়ি ছিল—আর সব কাগজের কারবার, চট্টগ্রামের কয়েকটা কলকারখানা ব্যবসায়ে শেয়ার, আরও বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট থেকে কেনা শেয়ার, কোম্পানির কাগজ, নগদ টাকা ব্যাংকে, ঘরে তৈজসপত্র গহনাগাঁটি।

ব্যবসা করতে বসে নিজের শক্তিতে কর্মকুশলতায় নিজেই প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিল। বুড়ো মুহুরী ভবতোষবাবু বলেছিল—মা, কোন ভয় করো না, তোমার যা বুদ্ধি তুমি রাজ্য চালাতে পার।

শীতলহাটী থেকে ইস্কুলের হেডমাস্টার, সেক্রেটারি, হাসপাতালের সেক্রেটারি, গার্লস স্কুলের সেক্রেটারি এঁরা এসেছিলেন—নায়েব এসেছিলেন—আর এসেছিলেন কালীমায়ের সেবা যিনি দেখতেন তিনি। শ্বশুর গঙ্গাচরণবাবু যে বিধবাকে নিযুক্ত করে গিছলেন এ কর্মে তিনি গত হয়েছেন—তাঁর স্থলে তিনিই তাকে নিযুক্ত করে গেছেন। তিনিও একজন অনাথা বিধবা।

কাজকর্ম চুকে যাবার পর তাঁরা একদিন ভবতোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন। চলে যাবেন। যাবার আগে একটা প্রস্তাব তাঁরা দিলেন, বললেন—শীতলহাটীতে যে কীর্তি তাতে কর্তার আমল থেকে অনেক দিয়েছেন আপনারা। কাল ভবতোষবাবুর সঙ্গে হিসেব হচ্ছিল—সেই প্রথম পত্তনের সময় বাড়িঘর তৈরী বাবদ তিরিশ হাজার টাকা থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত তা হাজার ষাটেক হবে। আমরা নিয়েছি। দরকার হয়েছে চেয়েছি। চাই। দিন। কারণ লক্ষ্মীকে তো তাঁরা পিতাপুত্রে কর্মের জোরে বেঁধে রেখেছিলেন। এখন আমরা বলি কি—।

বলি কি বলেও বলতে পারলেন না, চুপ করে গেলেন।

মনোরমা বলেছিল—বলুন। সংকোচ করছেন কেন? আমি জানি আপনারা যা বলবেন আমার হিতের জন্য বলবেন।

—হ্যাঁ মা, হিতের জন্যে বলব। নিশ্চয় হিতের জন্য। কারণ আমরা হিত চাই।

—বলুন।

তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন—দেবোত্তরের সেবায়েত হিসেবে এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকার বামিত্ব যদি এখনকার বিধিবিধান অনুযায়ী সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে মোটামুটি আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ন্যূনতম অধিকার থাকবে অথচ কোন দায় আর থাকবে না। অজয়ের এখন বাঁধা দায়—।

চুপ করে ছিল মনোরমা। একটু পরে বলেছিল—আজ উত্তর দিতে পারলাম না। আমি ভেবে দেখি।

—হ্যাঁ দেখবেন। আমরা যাই। আরও বিশদভাবে ভবতোষবাবু বুঝিয়ে বলবেন।

—একটা কথা। আপনারা ইস্কুল থেকে একটি বোর্ডিংয়ের দরকার বলে লিখেছিলেন। ইস্কুলের সায়েন্স সেকশনেরও যন্ত্রপাতি দরকার। যা টাকা আছে—

—তাতে সায়েন্স সেকশনের দরকার মিটে যাবে। গভর্ণমেণ্ট দেবেন—

—হ্যাঁ। বোর্ডিংয়ের টাকা চাই। ওঁর মৃত্যুর দু দিন আগে আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আপনারা জানেন কিনা জানি না—আমি শীতলহাটীর কাগজপত্র দেখতাম—ব্যবস্থা করতাম ওঁকে জিজ্ঞাসা করে নিতাম। তা—

—না মা। এখন আর আমরা টাকা চাইব না। আপনি বরং বসতবাড়ির নিচেতলাটায় এখন বোর্ডিং করতে অনুমতি দিন। অবশ্য মেরামত প্রয়োজন—অনেকদিন হয় নি।

মনোরমা বলেছিল—না, টাকাটা দেওয়া আমাদের স্থির হয়েছিল। টাকাটা আমি দেব। বোর্ডিং হবে।

—তা হলে বোর্ডিং আমরা দুটো ব্লক ক'রে করব—একটা হবে কর্তার নামে, অন্যটা বিজয়বাবুর নামে করব। কিংবা সায়েন্স ব্লকটা একজনের নামে, বোর্ডিং একজনের নামে।

—না। উনি বলে গেলেন—বোর্ডিং হবে আমার শাশুড়ীর নামে—ওঁর মায়ের নামে। এ বংশের কারুর নামে শীতলহাটীতে কিছু করতে নিষেধ আছে। সায়েন্স ব্লক ইস্কুলেরই সামিল থাকবে—দাদাশ্বশুরের নামেই যোগ হবে।

শীতলহাটীর ঋণ নিতে মানা আছে। শ্বশুরও বলতেন—স্বামীও বলতেন।

শুধু তাই নয়। গোটাবাড়িটা আবার মেরামতের কথাও বলেছিলেন।

নায়েব ভবতোষ ওটাকে ঠেলে রেখেছিলেন সুকৌশলে। কিন্তু এমন করে যে হঠাৎ শীতলহাটীতে এসে আশ্রয় নিতে হবে এ কথা মনোরমা ভাবে নি।

* * * *

একেবারে হঠাৎ। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন হঠাৎ এক অতি আকস্মিকতার ঝোঁকে বা তালে চলতে শুরু করল। সবই যেন এক অতি ভয়ংকর পাগলের খেয়ালের চালে চলা। কবে কখন কি হবে অনুমানও করা যায় না। আবার একসময় মনে হল পৃথিবীতে রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে এতকাল ধরে ছোট বড় যা কিছু ঘটে এসেছে তার সমস্ত কিছুর কারণ হয়ে আজ এই আকস্মিকতার ছন্দে দ্রুততম তালে কার্যের সংঘটন শুরু করে দিয়েছে। সবগুলিই যেন টাইম বোমার মত পাতা ছিল। অথবা সবই যেন বারুদের বাজির মত করে তৈরি করা ছিল। একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠির স্পর্শে জ্বলে উঠে ফাটতে শুরু করে দিয়েছে।

নভেম্বর মাসে সেদিন খবর এল কংগ্রেস যেখানে যেখানে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল, সব ছেড়ে দিয়ে নতুন আন্দোলনে নেমেছে। ওদিকে যুদ্ধে ইংরেজদের দুর্দশার আর শেষ নেই। ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে জার্মানী। ইংরেজদের মিত্রপক্ষকে নিয়ে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দিয়েছে। তারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ইংলণ্ডে এসে নেমেছে। সৌভাগ্যক্রমে ইংলিশ চ্যানেল ছিল তাই এটুকুও রক্ষা হয়েছে। জলের ব্যবধান না থাকলে জার্মানী তেড়ে গিয়ে ইংলণ্ডেই ঢুকে পড়ত।

শিকারীর গুলির ঘা খেয়ে খোঁড়া বাঘের পালিয়ে বনে ঢুকে হরিণের পালের উপর গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ইংরেজ এখানে গর্জন করে লাফ দিচ্ছে। গোটা দেশ জুড়ে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। কাগজে খবরটা দেখে তাঁর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।—এই আরম্ভ।

পরের দিন চট্টগ্রামে একদফা খানাতল্লাশী চলল, গ্রেফতার হল জনকতক। বিকেলবেলা অজয় ফিরল পুলিসের লাঠি খেয়ে। একটা সভায় পুলিস লাঠি চালিয়েছে। অজয় সেই সভায় ছিল।

তিনি চমকে উঠলেন—পৃথিবীর দ্রুত আবর্তনের ছন্দের মধ্যে অজয় গাঁথা পড়ছে।

অজয়কে তিনি বললেন—তুই যদি নিজেকে এই পাকে জড়াবি তবে যে পাকে জড়ানো আছিস কেটে ফেল।

বিস্মিত হয়ে অজয় বললে—মা!

মা বললেন—আমি। আমি তোর সেই পাক। তুই না পারিস আমাকে বল। আমি কেটে দেব তোর পাক।

অজয় এবার বুঝল। চুপ করে রইল। মাসখানেক ঘরেই রইল। কিন্তু সিংহদ্বার ভাঙা মুখুজ্জে-বাড়িতে পৃথিবীর দুর্দান্ত ঝড়ো বাতাসের ঢোকা কি করে বন্ধ হবে? লীগের পাণ্ডারা আস্ফালন করে যায়। একা তাদের বাড়িতেই, নয়—সকল কংগ্রেসী হিন্দুর বাড়ি বাড়ি। পথে পথেও ঝাণ্ডা নিয়ে বেড়ায়। তাঁর বাড়ি অভিভাবকহীন বলে চিৎকার করে বেশী।—লীগের ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ!

বদমাইশেরা চেঁচায় তাও কানে আসে। এক রোজ দেখেঙ্গে!

ছোটখাটো গোটাকয়েক সংঘর্ষও হয়ে গেছে সম্পত্তি নিয়ে। একটা পতিত জমিতে জোর করে কবর দিয়ে কবরখানা বলে দাবি করেছে। তাঁরা জোর করেন নি, মামলা করেছেন।

মাসখানেক পর আবার চমকে উঠলেন—সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্হিত হয়েছেন।

কয়েকদিন নানান গুজব। কেউ বলছে—গেছেন হিমালয়ে। তপস্যা করবেন। কেউ বলছে—লুকিয়েছেন, এইবার সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক বিরাট আয়োজন করেছে—নানান স্থানে, গভীর জঙ্গলে। কেউ বলছে—চলে গেছেন ভারতবর্ষের বাইরে।

চট্টগ্রামে একদিন একদল তরুণ ছেলে গ্রেফতার হল। তারপর একদিন একটি ছেলে খুন হল। শোনা গেল ছেলেটি কম্যুনিস্ট। লোকে বলছে—ফরোয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা করেছে। দুইয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ। দিনকয়েক পরেই অজয়ের ঘরে তিনি পেলেন একখানা হাতে

লেখা ইস্তাহার। ফরোয়ার্ড ব্লকের।

বুকখানা ধক্ করে উঠল—বললেন—অজয়!

অজয় বলল—বিশ্বাস কর মা, পা ছুঁয়ে বলতে পারি—একজন দিলে—নিয়ে এসেছি, কোন সম্বন্ধ আমার সঙ্গে নেই।

না থাক। অজয়ের দৃষ্টিতে বিচারে না থাক। তাঁর বিচারে আছে—তিনি দেখতে পাচ্ছেন। লোহার ঘরে সূচের মুখে একটি তেমনি সূক্ষ্ম ছিদ্র হচ্ছে। পাথরে বাঁধা বাঁধে একটি চুলের রেখায় জলের ধারা এপারে গড়িয়ে এসেছে। সারারাত্রি ঘুম হল না তাঁর। শেষরাত্রে স্বামীকে স্বপ্ন দেখলেন, শ্বশুরকে দেখলেন। তাঁরা কথা বললেন না। উদ্বেগভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শুধু।

সকালে উঠেই বৃদ্ধ ভবতোষবাবুকে বললেন—আমি একবার কলকাতায় যাব। কালই। আমার বুকে একটা ব্যথা মনে হচ্ছে।

ভবতোষ বললেন—এখানে ডাক্তারকে দেখান একবার।

—না। আমার মনে হচ্ছে আমি এখানে থাকলে বাঁচব না। অজয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি কলকাতায় যাব। আজ হয় আজ। না হয় কাল।

অজয় বুঝতে পারে নি। সে চিন্তিত হয়েছিল মায়ের জন্য।

মনোরমার চিন্তা অজয়। অজয়কে তাঁকে বড় করতে হবে, উকিল করতে হবে। দেশ পৃথিবী আদর্শ কোন কিছুর বিনিময়ে তিনি স্বামীর আশাভঙ্গ করতে পারবেন না। অজয় তাঁর অজয়। আসবার আগে নগদ টাকা, গহনা, কোম্পানির কাগজ, দলিলপত্র সিন্দুক খুলে বাক্সে ভরে নিলেন। ভবতোষকেও বললেন না।

কলকাতার গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির উপরতলা খালিই আছে। নিচেরতলায় ভাড়াটে আছে। থাক। উপরতলাতেই চলবে তাঁদের মা-বেটার।

উনিশশো একচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাঘ মাসে এলেন কলকাতায়।

ভবতোষবাবুকে বললেন—আপনি গিয়ে জরুরী কাগজপত্র এখানে আনুন। অজয়ের পড়া শেষ যতদিন না হবে আমি ততদিন চট্টগ্রামে ফিরব না। অজয়ের ট্রানসফার আনুন, সে এখানে পড়বে। তাকে উকিল করে নিয়ে ফিরব আমি।

সেবার পুজোর সময় শীতলহাটীর নায়েব এসে বললে—মা, এত কাছে এসেছেন—একবার শীতলহাটী আসুন না।

বউদি বললেন—তুই পালিয়ে এসেছিস আমার ভাল লাগে নি। তা যখন এসেছিস—তখন ঝঞ্ঝাট কম, এখন পুজোর ছুটি, আয় না এখানে। বলিস তো হারাণকাকার বাড়িখানাও ভাড়া নিতে পারি। হারাণকাকার মৃত্যুর পর ঠাকুরপো ছেলেমেয়েদের লক্ষ্ণৌ নিয়ে চলে গেছে।

মনোরমা লিখলে—না। আমি চাটগাঁয়ে একবার যাব। দেখে আসি বাড়িঘরদোর। আমার ঘুম হয় না। কোন রাত্রে হাওয়ার গোঙানি শুনে মনে হয়—চাটগাঁয়ের বাড়ি থেকে কেউ যেন কেঁদে কেঁদে ডাকছে আমায়।

মাসখানেক থেকে বাড়িঘরের প্রতিটি কোণ ঝেড়ে মুছে ফিরলেন কলকাতা। ক'দিন পরেই কাগজে দেখলেন—পার্ল হারবারে জাপান বোমা বর্ষণ করেছে। রণদেবতা ইয়োরোপে মদপদক্ষেপে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ পুরাণের দৈত্যের স্ফীত কলেবর হয়ে একখানা পা ইয়োরোপে রেখে অন্য পা-খানা বাড়িয়ে দিলে পূর্বদিগন্তে। যুদ্ধ হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।

পার্ল হারবারে বোমা পড়ল—জাপান নিজে যুদ্ধে নামল, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাকে

নামালে—এ সংবাদে প্রথম দিনটা এমন কিছু ভয় হয় নি। বরং ইস্কুল থেকে ফিরে এসে অজয় যখন খুব উল্লাসভরে বলেছিল যে, 'সকলেই বলেছে ইংরেজ এবার খতম', তখন তাঁরও উল্লাস জেগেছিল। রাজা মহারাজা সম্পত্তিবান লোকেরা ছাড়া এ উল্লাস তো সবার হয়েছিল। রাজা মহারাজাদের ভয় ছিল—ইংরেজ গেলে তাঁদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। হাতিদের লাঞ্ছনা করে লাথি মারবে ব্যাঙেরা। মনোরমা দেবীর অর্থ ছিল, সম্পত্তি ছিল—কিন্তু ওই দলের ছিল না এবং ভারত খাণ্ডববনের আগুনলাগা পূর্ব-দক্ষিণ-কোণাংশ চট্টগ্রামের অরণ্য-বৃক্ষের উত্তপ্ত দাহ্যশক্তি ছিল। সুতরাং উল্লাস তার হয়েছিল। অত্যাচারীরা যাক! কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই মুখ শুকিয়ে গেল। সিঙাপুরে দুখানা বিরাট যুদ্ধজাহাজ চোঙায় বোমা মেরে ডুবিয়ে দিয়ে জাপানী পাইলট আশ্চর্য নির্ভুল লক্ষ্যভেদের দিয়েছে। তারপর একে একে হংকং সিঙাপুর পড়ল—রেঙ্গুনের দিকে জাপানীরা এগুতে লাগল। ইংরেজরা উর্ধ্বশ্বাসে পালাল। পল্টনেরা খেতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে সারাদিন জুজুর ভয়ে ছুটে পালিয়ে বেড়ানো বাচ্চা ছেলের মত। গোটা ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বাংলাদেশ চমকে উঠল। কলকাতায় এয়ার-রেড হলে কি ভাবে কি করতে হবে তার তোড়-জোড় পড়ে গেল। রেঙ্গুন পড়তেই কলকাতার বর্ধিষ্ণু সমাজ মধ্যবিত্ত সমাজ একেবারে কলকাতা ফাঁকা করে দিয়ে পালাল।

মনোরমা ভয়ে আকুল হল। এর উপর হঠাৎ খবর এল চট্টগ্রামে মিলিটারি বেস হচ্ছে। তাদের বাড়ি রিকুইজিসন করেছে। সকলেই বলছে—মাসখানেকের মধ্যেই চট্টগ্রাম চলে যাবে জাপানীদের হাতে। তারপর কলকাতা।

কলকাতা দেখতে দেখতে ইংরেজ আমেরিকান সৈন্য-বাহিনীতে ভরে গেল। দক্ষিণে লেকের ধার থেকে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর এঁড়েদা পার হয়েও চলে গেছে (কিন্তু সে-সব এলাকার কথা সঠিক মনোরমা শোনে নি)—এই এলাকায় রাতারাতি ব্যারাক তৈরী হয়ে গেল। সাদা কালো হলদে সেপাই কলকাতার পথঘাট কাঁপিয়ে দিলে। শুধু কলকাতা কেন, গোটা বাংলাদেশই কাঁপতে লাগল। যুদ্ধে যা হবে তা হবে কিন্তু যুদ্ধের আগেই কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার জাত ধর্ম সব যেন একটা সাইক্লোনের দাপটে গ্রাম নগর বসতি ক্ষেত খামারের মত ধুয়ে মুছে গিয়ে পরিণত হল পঙ্ককুণ্ডে আর বালুস্তূপে এবং তাতে যারা সঞ্চরণ করতে লাগল তারা পরিণত হল পঙ্ককীটে, বালুকীটে, পঙ্গপালে। বিদেশী সৈনিকেরা পকেটে নোটের গোছা নিয়ে ঘোরে—তারা ভাবে তারা খুব ভাল মানুষ, এদেশের বন্ধু—জানে বাঁচাতে এসেছে—সুতরাং এ সময়ে জাতের বিচার কিসের এবং একটু ওদের সঙ্গে আনন্দ করলে জাতই বা যাবে কেন? সন্ধ্যেবেলা পাগলার মত বের হয় এবং মেয়েদের দেখলেই ডাকে—বলে, গুড্ ইভিনিং হনি, চল না বেড়িয়ে আসি। জয় রাইড! এনজয় ইভনিং! হিয়ার ইজ সামথিং ফর ইউ! সঙ্গে সঙ্গে একশো টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে দেয়।

বেশী মদ খেয়ে পাড়ায় ঢুকে ভদ্রবাড়িতে ধাক্কা মারে—ওপেন্ হনি। হাম গুডম্যান। ফ্রেণ্ড। বয়ত্ রুপী। বয়ত্। ওয়ান টু থ্রি হাণ্ড্রেড!

দরজা খোলা পায় না বলে বন্ধুত্বের অপমানে রাগ করে। কোথাও কোথাও দরজা ভাঙতে চেষ্টা করে।

এ দেশে তার ছোঁয়াচ লাগে নি তা নয়। ভদ্রলোকের ছেলেরা নারী যোগানের ব্যবসায় দালালি করছে। বিশিষ্ট বড় বড় লোকের ছেলেরা সুকৌশলে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে মিলিটারি কন্ট্রাক্ট পেয়ে ছিনিমিনি খেলছে টাকা দিয়ে। মেয়ে আর মদ তার উপকরণ। এই তো কাছাকাছি থাকেন একজন মস্ত লোক—গুণী লোক ধনী নন—লোকে শ্রদ্ধা করে, বিদেশীদের মধ্যে গুণের সমাদরকারী লোকও আছে—তাদের সমাদরের সুযোগে ওই লোকের

ছেলে কিসের পারমিট পেয়েছে এবং তারই ব্ল্যাকমার্কেট করে নাকি লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে। ছেলেটি নাকি সেদিন গালিফ স্ট্রীটের এক জুয়ার আড্ডায় মদটদ নিয়ে ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে। অবশ্য ছাড়া নিশ্চয় পেয়েছে। এখানেই শেষ নয়—যারা ভাল ছেলে, এতে যারা পড়ে নি তারা সব কংগ্রেসের মুভমেণ্টে জেল যাচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লক হলে তো কথাই নেই। তাদের কঠিন নির্যাতন। লালঝাণ্ডারা জনযুদ্ধের জন্য মিছিল করছে। চট্টগ্রামে যা দেখে পালিয়ে এসেছিল তাই এখানে শতগুণে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। যেন একটা সাইক্লোনের সূচনা দেখে পালাতে আরম্ভ করেছিল—সাইক্লোনটা পূর্ণ বেগে ও প্রচণ্ডতায় মাঝপথে ধরে ফেলেছে। এখন যাবে কোথায় অজয়কে নিয়ে ?

প্রথম মনে পড়েছিল এলাহাবাদের কথা।

এলাহাবাদ কলকাতা থেকে অনেক দূর। কলকাতা থেকে অনেক নিরাপদ। এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ অনেক কম কলকাতা থেকে। দলে দলে ছুরি মারামারি এবং ধরিয়ে দেওয়ার হাওয়া সেখানে নেই। দাদা নেই বউদি আছেন এবং বউদি তাঁর কাছে আশ্চর্য মহীয়সী। তাঁর বুকে মমতার সঙ্গে মনুষ্যত্বের ভাণ্ডার—সাক্ষাৎ সতী—সততার খনি। তাঁর কাছে থেকে সন্তান নিরাপদ; বিপদ থেকে নিরাপদ—অসৎ-মন্দ যা কিছু তা থেকেও নিরাপদ। শুধু ভাবনা আছে—বউদির ছেলেদের নিয়ে—তারা বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সক্রিয় গান্ধীবাদী। অজয়কে সে জীবনে বাঁচিয়ে রেখে বড় করতে চায়—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃত সন্ধানের মহিমা সে বোঝে না তা নয়—কিন্তু তাতে যে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে—স্বামীর কাছে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ হবে। মুখোপাধ্যায় বংশে যে কেউ থাকবে না। তবুও সে চিঠি লিখেছিল বউদিকে।

"এই অবস্থার মধ্যে অজয়কে নিয়ে কোথায় যাই বউদি ভেবে পাচ্ছিনে। বাংলাদেশে এসে অনেক কথা শিখেছিলাম শ্বশুরের কাছে। তার মধ্যে একটা কথা তিনি বলতেন—তাঁর ছেলেকে মানুষ করা সম্পর্কে। বলতেন—ওকে নিয়ে যে কি ভাবনায় আমার দিন কেটেছে মা, সে আমি জানি আর আমার ভগবান জানেন। আমাদের কথা আছে—রাঢ়ের কথা—'অমৃতের কণা—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায়—তাকে তা হলে রাখি কোথায়। বুকটা মা সিন্দুক হলে ভাল হত, তার মধ্যে রাখতাম কিন্তু বুক সিন্দুক নয়।' আমার আজ সেই ভাবনা। কোথায় যাই বলতে পার ? তোমাদের ওখানকার হালচালটা আমাকে জানিয়ো। এলাহাবাদ অনেক দূর আর তোমার কাছে থাকলে বুকে বল পাব।"

উত্তর আসতে দেরি হয় নি। বউদি লিখেছিলেন—তোর বড্ড ভয় মনো, এত ভয় করিসনে। অজয়কে নিয়ে তোর এত দুশ্চিন্তার কারণ আমি বুঝি—সেটা অন্যায়ও বলতে পারি না। তোর সেই সিজারিয়ান ডেলিভারি থেকে এর সৃষ্টি। আমার তো আর হবে না! এ কথা তো সত্যি—এর উপর তো কোন কথা চলে না—শুধু একটা কথা চলে—সেটা হল এই ভাই যে, বিপদ মাথায় করেই মানুষ বেঁচে রয়েছে। বিপদ এলেই ভয় পেতে নেই, বিপদ অহরহ মানুষ উত্তীর্ণ হচ্ছে। তোর অজয়ের বিপদ হবেই বা কেন। একজন বুঝি দেবার নেবার মালিক আছেন। তার উপর ভরসা রাখিস। তাতে আর কিছু না হোক মনে বল পাবি, ধৈর্য পাবি। কিন্তু উপদেশ থাক;—এখন কাজের কথা বলি। এলাহাবাদে তুই যদি অজয়কে নিয়ে আসিস তবে আমি খুব খুশী হব। এবং ভালও হবে। কলকাতার মত বিপদের মেঘ এখানে ভেঙে পড়ো-পড়ো নয়। ঘনও নয়। এখানে ঝাণ্ডা নিয়ে কলকাতার মত ডাণ্ডাবাজি ছোরা মারামারি নেই। অন্য বিপদও কম। পাশের হারান কাকাদের বাড়ি খালি আছে। শিব ঠাকুরপোর মেয়েছেলে এখন লক্ষ্ণৌতে। ওদের

বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় কিন্তু তার দরকার নেই—আমাদের বাড়িতে দুখানা ঘর নিয়ে তুই তো ইচ্ছেমত ব্যবস্থা করে থাকতে পারিস। বাড়িতে এখন আমি আর দুনি। ভুনিচন্দ্র তার গান্ধী মহারাজের হুকুমে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে করতে গিয়ে মরে নি—জেলে ঢুকেছে। তার দোসর এবং সো-দর দুনিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রেখেছি। মনে হচ্ছে—হয়তো থাকবে বাড়িতে মায়ের উপর অনুগ্রহ করে। ওরা ছেলে ভাল। ওদের সংস্পর্শেও অজয়ের তোর উপকার হবে। চলে আয়। তোর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—বউদি।

চিঠিখানা পেয়ে মনটা খুঁতখুঁত করেছিল। ভুনি জেলে গেছে। দুনি তার সো-দর এবং দোসর। বউদি লিখেছে—ওরা ছেলে ভাল। বউদি, চাটগাঁয়ের ছেলেরাই কি মন্দ ছেলে! সৎ অসতের পরীক্ষায় যদি আগুন জেবলে বল—যে সৎ হবে সে এ আগুনে হেঁটে গেলে পায়ে ফোসকা পড়বে না—তাহলে ওরা নাচতে নাচতে চলে যাবে এবং সত্যিই ফোসকা পড়বে না। কথা তো তা নয়। তার দায়িত্ব স্বামীর আছে—শ্বশুরের কাছে। যাই হোক আর পথ নেই যখন তখন সে তাই যাবে। সেই আয়োজনই সে করলে এবং যাবার আগে চট্টগ্রাম ও শীতলহাটীর কর্মচারীদের ডেকে পাঠালে। পাকা ব্যবস্থা করে যাবে। বলে যাবে—যা হয় করবেন। আপনাদের ধর্ম আপনারা পালন করবেন—এ ছাড়া তার আর কিছু বলবার নেই। কর্মচারীরা এলেন, কথাবার্তা হল। মনোরমার ইচ্ছে ছিল একবার চট্টগ্রাম গিয়ে বাড়িঘরটা দেখে আসে কিন্তু পুরানো কর্মচারী বললো—না মা। আমি বারণ করছি। বাড়ি মিলিটারির হাতে; সেখানে ঢুকতেও পারবেন না, আর যদিই পান—ঢুকে দুঃখ পাবেন। সে-সব পাঁচিল গেঁথে, কাঠের পার্টিশন দিয়ে—অদলবদল—তা ছাড়া—জাতধর্মহীন আচার-আচরণ, মদের হল, নাচের হল—মেয়েপুরুষে মাতামাতি—সে দেখে কি করবেন? যাবেন না।

নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল মনোরমা। শীতলহাটীর নায়েব বলেছিলেন—একটা নালিশ কিন্তু আমার আছে। একবার আপনি শীতলহাটী এলেন না। আপনাদের কত কীর্তি সেখানে, স্বয়ং কুলদেবতা মা রয়েছেন—তাঁকে একবার প্রণাম করুন!

কথাটা খচ করে লেগেছিল মনে। বলেছিল—যাব। এলাহাবাদ যাবার আগেই যাব। আপনি যান। আমি অজয় এখানকার সরকারকে নিয়ে ওখানে যাব—একটা দিন দেখুন, অশ্লেষা মঘা তেরস্পর্শ না হয়—। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

দিন স্থির হয়েছিল তিন দিন পর। শীতলহাটীর নায়েব সেই দিনই চলে গিয়েছিলেন। তিন দিন পর মনোরমা অজয়কে নিয়ে বর্ধমান পেঁচৈছিল। দশ বারো মাইল পথ। আগে ছিল কাঁচা সড়ক, কাদা হর্ত। রাস্তায় ঠেঙাড়ে ছিল। তারপর হয়েছিল ডি বি রোড। পাকা রাস্তা অর্থাৎ পাথর বিছিয়ে কাঁকড় ফেলা। এই যুদ্ধের কয়েক বছরে সে ভেঙেচুরে খানায় ডোবায় কাঁচায় পাকায় কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত হয়েছে। গরুর গাড়ি—অবশ্য ভাল গাড়ি ভাল গরু ছিল। কিন্তু তাতেও সারা অঙ্গে ব্যথা ধরিয়ে পেঁচৈছিল শীতলহাটী। অজয় সারা রাস্তাটা গজগজ করেছিল।—বাপরে বাপরে—এ হাত-পাগুলো শেষ পর্যন্ত খুলে খুলে না পড়ে যায়। তোমার যেমন কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত ধাক্কার চোটে চাটগাঁয়ের বুলিও বেরিয়ে গিয়েছিল।

শীতলহাটীতে এসে কিন্তু মন খুশী হয়েছিল। শ্বশুরের কীর্তি দেখে মন ভ'রে গিয়েছিল।

অজয় সবিস্ময়ে বলেছিল—সব দাদু করে গেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর কীর্তি তোমাকে বজায় রাখতে হবে। এবং ছেলেকে সব বিবরণই বলেছিলেন। অজয়ের মনটা ভরেই ছিল। ইস্কুল—গার্ল ইস্কুল—দাতব্য চিকিৎসালয়—টোল—কালীবাড়ি এসব তাদের! দেবোত্তর হলেও মালিক তো তারাই। সে তো চোখেই দেখেছে—দলে দলে লোকেরা তাদের দেখতে এসেছে। মাকে পর্যন্ত একবার পুরুষদের মজলিসে এসে দেখা দিতে হয়েছে। তাকে তো বসে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। নায়েব জলখাবার চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে কত ভাল ভাল কথা। কত প্রশংসা। ইস্কুলের হেডমাস্টার অন্য মাস্টারেরা—বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণিরা—ডাক্তার—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে না এল কে—এবং গুণগানই বা না করলে কে! ইস্কুলের ছেলেরা এসে তাকে দেখে গেছে। আলাপ করে গেছে। মধ্যে মধ্যে খারাপও লেগেছে অজয়ের। মনে হয়েছে যেন তোষামোদ করছে এরা।

কালীমন্দিরে মেয়েরা এসেছিল দলে দলে মনোরমাকে দেখতে। চৌধুরীদের আত্মীয়-গোষ্ঠী—তাদের থেকে শুরু করে এদেশের হরিজন সমাজের মেয়েরা পর্যন্ত। সকলেই এক-বাক্যে বললে—না—না—না। কলকাতায় কি আর এখন থাকে!

প্রবীণারা বললে—ও তুমি ঠিক ভেবেছ মা। চলে যাও। ওই এলাহাবাদ চলে যাও। এখানে তোমাদের বাড়িঘর—সোনার রাজ্যপাট আছে—তা এখানে তোমরা থাকতে পারবে ক্যানে? চলে যাও—ওই এলাহাবাদ চলে যাও। তুমি এখানে এলে তো আমরা বাঁচতাম মা। কিন্তু তা বলব না। এ কষ্ট আমরাই সইতে পারছি না। দুর্ভিক্ষ—মড়ক। চোর ডাকাত। তা ভাল মতলব করেছ।

বেশী করে বার বার বললে—কালীমায়ের নতুন সেবা দেখবার জন্যে নিযুক্ত ভদ্রমহিলাটি।

পুরুষদের কেউ কেউ বললেন—হ্যাঁ, ওঁদের এলাহাবাদই ভাল। এখানে ঠিক—। বুঝেছ না, কষ্ট হবে।

হেডমাস্টার বললেন—না—না। কষ্ট হোক না একটু। কিন্তু আমি বলি কি এখানেই আসতে। Back to village-গাঁয়ে ফিরতে হবে। ওঁরা এখানে থাকলে কষ্ট ওঁদের হবে কিন্তু আমাদের মঙ্গল হবে।

—সেটা স্বার্থপরের মত কথা হল মাস্টারমশাই।

—মত নয়। স্বার্থপরেরই কথা। আমরা যে মরে যাচ্ছি মশাই, স্বার্থপর এখন হতে হবে আমাদের। একটু অধিক পরিমাণে। সমবেত ভাবে। জোরালো ভাবে। সবাই বলুন, আসতে হবে।

এর কোনটাই মনে দাগ কাটেনি মনোরমার। তবে ঘুরে ফিরে দেখেশুনে শীতলহাটী ভাল লেগেছিল। সুগম রাস্তা হলে—একটু বাজারহাট—ইলেকট্রিক আলোটালোর সুবিধে থাকলে বেশ জায়গা। চট্টগ্রামের আয়োজন বিপুল—সম্মান আলাদা ধরনের। এখানকার আয়োজন কম নয়। সম্মান এখানে শুধু সম্মান অর্থাৎ প্রশংসা ও সম্ভ্রম নয়, এখানকার সম্মানে কর্তৃত্বের অধিকার আছে, তার সঙ্গে আছে ভালবাসা। প্রশংসাও আছে—সবিস্ময় সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। এর স্বাদ আলাদা। বাজারের রাংতামোড়া প্যাকেটের মিষ্টান্নের মিহি তার নেই, এ মোটা তার—কিন্তু ঘরের তৈরী মিষ্টি। ছানার সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধ আছে স্বাদ আছে। কথাটা মনে হল ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে। তাদের দেখতে এসেছিল একটি বাগ্দীর মেয়ে। প্রায় ক্রোশখানেক দূর থেকে। যখন সে এসেছিল তখন মনোরমা কালীবাড়ি থেকে বাড়িতে এসে ভিতরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। একদল এসে খবর দিল—মা, একটি মেয়ে আপনাকে দেখতে এসেছে। বসে আছে। দূর থেকে এসেছে, ফিরে যাবে। একবার—

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে বলেছিল—দেখ তো এসব কি! দেখবার কি আছে? এমন হবে

জানলে আসতাম না। চল।

ভেবেছিল কিছু চাইবে। কাপড় কি পয়সা কি চাল।

মেয়েটিকে দেখে বলেছিল—কি চাও বাছা?

মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলেছিল—আহা মা! এই নইলে আজরানী!

একটু হেসে মনোরমা বলেছিল—তা কি চাও বল?

সে বলেছিল—কি চাইব মা! চাইতে আসি নাই। দেখতে এসেছি। এই দেখ মা এই তোমার মা কালীর থানে দোর ধরে আমার ছেলে হয়েছেন। আমি পেরাই আসি। এই সব দেখি শুনি—আর ভাবি। নোকে বলে ইস্কুল—মেয়ে ইস্কুল—ডাক্তারখানা সব তোমরা দিয়েছ। বাড়িঘর খাঁ খাঁ করে। ভাবি—যারা করেছে তারা কেমন মানুষ। দেখলে জেবন ধন্য হয়। মা কালী মা খুব জাগ্রত। তোমাদের উপর কেরুপাতেই তো। তাই দেখতে এসেছিলাম। কেমন মা তাই দেখব। তা ভাল মা—খুব ভাল, নয়ন সাথক হল।

মনোরমা অভিভুত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—এখানে খেয়ে যাবে, কেমন?

শুধু খাওয়া নয় বিকেলে তাকে একখানা লালপেড়ে শাড়ি কিনে দিয়ে বিদায় করেছিল। কালোকালো লম্বা মেয়ে—একপিঠ চুল—সিঁথিতে সিঁদুর—লালপেড়ে শাড়িতে বড় চমৎকার মানিয়েছিল।

যাবার সময় বলেছিল—একটা কথা বলি মা।

—বল।

বেশ স্মিত মুখে হেসে বলেছিল সে—কিছু খরচের কথা বলব মা। উপু হয়ে বসেছিল—এবার হাঁটুর উপর কনুই রেখে হাত দুটি জোড় করেছিল।

মনোরমার কপালে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছিল—এটা অবশ্যই তার প্রশ্রয় দেওয়ার ফল। সত্বর ছেদ টানবার জন্যই এবার বিরক্তিভরেই বলেছিল—ওরে নায়েববাবুকে বল তো একে কিছু দিতে। বলেছিল চাকরকে।

—না মা। তাড়াতাড়ি মেয়েটি বলেছিল—না মা, তা লয়। আমি কিছু চাই নাই গো। আমাকে খেতে দেলা, কাপড় দেলা, আবার কি দেবা। তা লয়।

—তবে?

—এই মা। আপনকাদের মন্দিরে মা কালী আছেন। সনজের পর এলে আর দর্শন হয় না। ঠিক সনজেতে আরতি হয়, বাস তারপরই সব আনার হয়ে যায়। তা মা তো আনারেও থাকে আলোতেও থাকে—ওনার তো কিছু লয়। আমি তিন চার দিন ফিরে যেয়েচি। আমার মতন ধরেন আর নোকে যায়। তা যদি একটি পিদীমের ব্যবস্থা করে যান।

চমকে গিয়েছিল মনোরমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে। সংসারে ভগবানে বিশ্বাস কমে গেছে। একটি এই যাদের অশিক্ষিত বলি তাদের একজন এই যুগে নিজের জন্য কিছু না-চেয়ে—চাইছে দেবতার জন্যে? আলো! যাতে তাঁকে দেখতে পায় সে!

মেয়েটি বোধ হয় শঙ্কিত হয়েছিল। বলেছিল—মা, এ থানের মা আপনার সাক্ষাৎ বিরাজ করেন মা। তাই বলছিলাম। অপরাধ নিয়ো না।

মনোরমা বলেছিল—না—না—না। অপরাধ তোমার নয় অপরাধ আমাদের। নিশ্চয় কাল থেকে প্রদীপের ব্যবস্থা করব। কাল থেকেই। না—আজ থেকেই। ওরে নায়েববাবুকে ডাক তো!

মেয়েটি গদগদ হয়ে বলেছিল—তুমি তো কখনও এস নাই মা। জান না। মা আমার এখানে সাক্ষাৎ মা গো। সাক্ষাৎ মা। আর কি দয়া! তোমাদের ওপর কি দয়া! আরও খুশী হবেন। কলকাতায় বলে বোমা ফেলে সব মেরে ফেলাবে। তা তুমি এখানে চলে এস ক্যানে! দেখবে—মায়ের দয়া কত দয়া!

ফিরে এসে সেইদিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখেছিল। ওরই হেরফের। ওই কালো মেয়েই যেন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন—কি, চিনতে তো পারলি নে! কেমন ঠকালাম! তা শোন—তোদের ভালবাসি—তোরা আমার কাছে আয়। আমি রক্ষা করব। আমাকে ফেলে দূরে যাস নে।

ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসেছিল মনোরমা। তারপর আর সারারাত্রি তার ঘুম আসে নি। নিজের মনকে সে হাজার প্রশ্ন করেছিল—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান দিক থেকে যাচাই করে দেখেছিল। একেবারে সে আমলের মন হলে বোধ হয় কোন প্রশ্নই জাগত না, উঠত না। কিন্তু তাও তো নয়। পরের দিন সমস্ত দিনটা ভেবেছিল। রাত্রিবেলা একটা মীমাংসায় পেঁচেছিল। না—সে আর এলাহাবাদ যাবে না। সেখানে হাজার হলেও অজয়ের কোন্ অধিকার আছে? খানিকটা ঋণে পড়তেই হবে। শ্বশুর গঙ্গাচরণ শ্বশুরবাড়ির ক'বছরের অন্নঋণ সারাজীবন ধরে শোধ করেও—ঠিক দেনা শোধ হয়েছে ভাবতে পারেননি। তা ছাড়া কবে কখন মেজদি আসবে—তার ছেলেরা আসবে, বড়দি আসবে—কে কখন কোন্ একটা কথা বলবে—তখন আর আপসোসের শেষ থাকবে না। সে স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও এড়ানো যাবে না। এদের উপকার তো নিতেই হবে! অন্যদিকে শীতলহাটীতে তাদের সর্বময় অধিকার—মান সম্মান সম্ভ্রম সমাদর—সর্বোপরি ওই দেবতার আশ্রয়! বাংলাদেশে বিপদ আছে। কিন্তু মিলিটারির বিপদ—বোমার বিপদ শীতলহাটীতে যাবে না। জাপানীরা যদিই আসে, তবে ইংরেজরা সব ছেড়ে বোম্বাই করাচীর দিকে ছুটবে। শীতলহাটীর আগেই ট্রেনে চেপে জাপানীরা এলাহাবাদ দখল করে বসবে। তার শীতলহাটীই ভাল। হ্যাঁ, শীতলহাটীই ভাল। তখনই ছেলেকে ডেকে বলেছিল মনোরমা—এলাহাবাদ যাব না অজয়।

অজয় খুশী হয়েছিল—কতবার তোমাকে বলেছি—এত ভয় কিসের! কলকাতাই ভাল।

—না, শীতলহাটীতে গিয়ে থাকব। ওখানে পড়বি তুই।

—শীতলহাটীতে পড়ব? না। সে আমি পারব না। ওই পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে—

—পাড়াগাঁয়ের হলেই ইস্কুল খারাপ হয় না। ওখানেই পড়তে হবে তোমাকে। ও তোমার ঠাকুরদা'র প্রতিষ্ঠা করা ইস্কুল। তুমি পড়ে স্কলারশিপ নিয়ে ইস্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে, তবে তো!

মনোরমার কণ্ঠস্বরে বাক্‌ভঙ্গিতে এমন এক মনোরমা আত্মপ্রকাশ করলেন—যাকে 'করলে' বলা চলে না, 'করলেন' বলতে হয়, যিনি নিজেও তুই বলেন না ছেলেকে—তুমি বলেন, যাঁর মুখের উপর কোন অভিব্যক্তি ফোটে না, মনে হয় পাথরের মুখ। অজয় তাঁর সেই মুখ দেখে ভগ্নোৎসাহ হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল—তারপর বললে—একবার চট্টগ্রাম থেকে এখানে এলাম, এখান থেকে আবার—। খানিকটা থেমে আবার বললে—ইস্কুলে পড়ানো ভাল না হ'লে, ছেলেতেও তো পড়ে স্কলারশিপ পায় না।

—পায়। তুই পাবি। না পাস ক্ষতি নেই। আমরা শীতলহাটীতেই যাব। শোন। ছেলেকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—শীতলহাটী আমাদের বাড়ি—হ্যাঁ, দেবোত্তর হলেও আমরাই সেবায়েত। আমাদের মা—আমাদের বাড়ি—আমাদের সব। এলাহাবাদে আমাদের কি আছে? কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ—শহর আর পাড়াগাঁ। তা হোক অজয়, আমি স্বপ্ন দেখেছি, শীতলহাটী চোখে দেখেছি। সারাদিন ভেবে দেখলাম—ওখানেই যেতে হবে। না বলিস নে। বলতে নেই।

বউদিকে মনোরমা পত্র লিখলে—বউদি ভাই, এলাহাবাদ যাবার জন্যে মোট পেঁটলা বেঁধে খুলে ফেললাম না কিন্তু এলাহাবাদ যাওয়ার মতলব বদলে ফেললাম। কারণ ভাই

স্বপ্ন দেখলাম—। ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে লিখলে-মনে কিছু করবে না নিশ্চয়। মনে হচ্ছে এতেই অজয়ের মঙ্গল হবে।

বউদি লিখলেন—ভাল করেছিস মনো। তোর স্বপ্নের কথা শুনে ভারী ভাল লাগল ভাই। এ স্বপ্ন সত্য মিথ্যে যাচাই যে করতে যায় সে মূর্খ। শীতলহাটী তোদের প্রথম ভিটে। ওই ভিটে এতকাল তোদের অপেক্ষা করে আছে—এতকাল ধরে তোদের ডেকেছে, কামনা করেছে—তা মিথ্যে বলে তো বলুক লোকে—তোর তো ভাবতে ভাল লাগে। সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। তুই অজয়কে নিয়ে চলে যা সেখানে। মায়ের সেবায় মনের বল পাবি। সেখানে তোদের এত পুরুষের সুনাম তোদের চট্টগ্রামের ঐশ্বর্যের চেয়ে কম নয়। সেই ঐশ্বর্য ভোগ করবি। দেবতার কৃপায় নিরাপদে থাকবি। স্বপ্ন দেখেছিস—মা নিজে ডেকেছেন। কল্যাণ হবে। চলে যা। এখানে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে বাড়ছে রে। দুনিয়াটাও যদি ভাগে মনো, তবে আমি যে কি করব জানি নে! চলে যা মায়ের নাম নিয়ে।

* * *

চলে এসেছিল মনোরমা অজয়কে নিয়ে দু বছর আগে। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে। এবার অজয় এই ইস্কুল থেকে পাস করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে ক'টা লেটার নিয়ে। এখন সমস্যা হয়েছে অজয় পড়বে কোথায়?

কলকাতায়—? না। বর্ধমান—? না। শান্তিনিকেতনও না। মনে মনে সে দেবতাকে ডেকে বললে—মা, বলে দাও কোথায় পাঠাব অজয়কে।

দু বছরে সারা পৃথিবীর অস্তিত্বই যেন অনিশ্চিত হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে কিছু থাকবে না—কিছু রাখবে না। মানুষের পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে, মানুষ নিজে হাতেই সব ধ্বংস করে দেবে—চুরমার করে দেবে।

বাংলাদেশের জীবন বোধ হয় অধঃপাতের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে। ভগবানের রোষদৃষ্টি পড়েছে—১৯৪২ সালের সাইক্লোনে গোটা দেশটায় ধ্বংসের তাণ্ডব—সেই তাণ্ডবের ফলে ১৯৪৩ সালে মড়ক—তার সঙ্গে মানুষ-রাজার জাতের মানুষের প্রশ্রয় এদেশের কতকগুলি পিশাচের যোগাযোগে দুর্ভিক্ষ। মানুষ মরেছে লক্ষ লক্ষ। ফেন ভাত নয়, খুদ নয়—মানুষ ভাতের ফেনের ভিখিরী হয়েও তা পেলে না, পথে পড়ে মরল। স্বামী স্ত্রী বেচলে—বাপ মেয়ে বেচলে—মেয়ে দেহ বেচলে—তবু প্রাণ বাঁচল না। চুরি করে জোচ্চোরি করেও বাঁচা গেল না! ব্ল্যাক-মার্কেটিংয়ের অভিনব গলিপথ—সরকারী কন্ট্রোলের তাঁবুর সারির মধ্য দিয়ে। মিলিটারি সান্ত্রী পুলিস পাহারা তাঁবুর দরজায় দরজায়, তাদের পিছন দিয়ে পথ। সেই পথে সাহস করে তাদের পিছন দিকে বাড়ানো পথে টাকা গুঁজতে গুঁজতে যাবার মত সাহস এবং চতুরতা যাদের আছে তারাই ফাঁপছে। দেশের জোয়ান ছেলেদের কিছু জেলে—কিছু লালঝাণ্ডা উড়িয়ে—ইংরেজকে যুদ্ধ জিততে সাহায্য করছে—বাকী—তারাই বেশির ভাগ—তারা বিভ্রান্ত—উদ্‌ভ্রান্ত—তারা দেশজোড়া দুর্নীতির জোয়ারে খড়কুটোর মত ঢেউয়ের মাথায় ফেনার সঙ্গে মিশে নাচছে। এ সব থেকে সারা বাংলাদেশে অন্ততঃ কোথাও পরিত্রাণ নেই। শীতলহাটীতে বহুকষ্টে অজয়কে সে রক্ষা করেছে—তাও সে পূর্ণ যৌবন পায়নি বলে। এবার সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে, গ্রাম থেকে শহরে যাবে, কৈশোর শেষ হয়েছে, যৌবনে পা দিয়েছে, এবার তাকে সে কি করে রক্ষা করবে?

মা ছাড়া কে এর উত্তর দেবে?

সেই মেয়েটি যদি একবার এখন আসত? সে অনেকবার এসেছে এর আগে। তার কথা মনোরমা মায়ের কথা বলে মনে করত। কয়েকবার ঠকেছে অর্থাৎ তার কথামত কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তবুও মেনেছে। ক্ষতি স্বীকার করেও ভেবেছে—এই মায়ের ইচ্ছে। কিন্তু

সে আর নেই। এই মড়কে সে মারা গেছে।

সেদিন এমনি ভাবনার মধ্যেই চিঠি এল। এলাহাবাদের চিঠি—বউদির লেখা। এলাহাবাদের কথা তার মনে হয় নি তা নয়, হয়েছিল, কিন্তু এবার সংকোচ হয়েছিল। সেবার যাব বলে যায় নি। তা ছাড়া অজয়কে কারও বাড়ির অন্ন খাওয়াতে সে প্রস্তুত নয়। এবার এখন যা অবস্থা হয়েছে তাতে তার আর শীতলহাটী ছাড়া চলবে না। কারণ দু বৎসরে তার হাতের নগদ টাকা দিয়ে এখানে জমিজেরাত কিনেছে অজয়ের জন্য। শ্বশুরের উপদেশ সে ভোলে নি। দেবোত্তরের প্রসাদ, কণিকা ছাড়া, পেটভরে খাওয়ার অধিকারও সে গ্রহণ করবে না। ওদিকে চট্টগ্রামের সম্পত্তির আয় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে, যুদ্ধ-বিভাগ থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ইচ্ছামত জমি দখল করে নিয়েছে—শোনা যায়—ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে—কিন্তু কবে তা কেউ বলতে পারে না। বাকী অর্ধেকের অবস্থাও তাই। জমি পড়ে আছে—চাষ করবার লোক নেই। কতক মরেছে কতক পালিয়েছে, যারা আছে তারা জীবন্মৃত—চাষ করবার শক্তি নেই। পাওয়া যায় সরকার থেকে ভাড়া-নেওয়া বাড়িগুলির ভাড়া। ইতিমধ্যেই কয়েকবারই বোমা পড়েছে—চট্টগ্রামে—ফেনীতে। ওদিকে আরাকানের দরজায় জাপানীরা ঠেলা মারছে। চট্টগ্রামের বৃদ্ধ মুহুরি এসে টাকাকড়ি দিয়ে সেবার বলেছিলেন—মা, চাটগাঁ শ্মশান হয়ে গেল। ওখান থেকে পোড়া কয়লা আর হাড় ছাড়া আর কিছু মিলবে না। কবে সুদিন আসবে তাও জানি না। আমার পরামর্শ মা—এখানে জমিজেরাত কেনো। কলকাতাও খাঁ খাঁ করেছে—নইলে কলকাতার বাড়ি সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দাদন। এখানে জমি কেনো। ওখানকার কম্পেনসেশন দেখি যদি ঘুষঘাষ দিয়ে বের করতে পারি দিয়ে যাব। এখানে লগ্নী কর। কিংবা সোনা কিনে রাখ।

সেই পরামর্শে এখানে মাটি কিনতে গিয়ে নিজে মাটির সঙ্গে আটকে গেছে মনোরমা। তা ছাড়া দেশে এখনও চলছে মড়ক দুর্ভিক্ষ—এ অবস্থায় এখানকার দরিদ্র অসহায় মানুষদের ছেড়ে যাবেই বা কি করে! কালী মায়ের উঠানে এখন নিত্য প্রসাদ বিতরণ চলে। চল্লিশ পঞ্চাশ যাট যেদিন যেমন, খিচুড়ি রেঁধে ভোগ দিয়ে তাই দেওয়া হয়।

দেবসেবা দায় যতক্ষণ মনে হয় ততক্ষণ তাকে সুযোগ পেলেই ঝেড়ে ফেলার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু দেবসেবা আর তার কাছে দায় নয়, এর মধ্যে নগদ বিদায় পায় মনে মনে। পুণ্যের স্বাদ বিচিত্র আনন্দ। তাই একে ফেলা তার পক্ষে অসাধ্য। যেখানেই পড়ুক অজয় তাকে একলাই যেতে হবে। হোস্টেলে থেকে পড়তে হবে।

এই ভাবনা পরীক্ষার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হল। দেনাপাওনার খাতায় যে টাকাটা এল সেই টাকাটা জমা করবার জন্যে হিসেবটা খুলবামাত্র ওদিকের অঙ্কগুলো চোখে পড়ার মত চোখে পড়ল—মনে পড়ল। মাকেই সে বার বার বলছিল—পথ বলে দাও মা। ঠিক এই সময়েই এল একখানা চিঠি। খবর পাওয়ার দিন তিনেক পর সেদিন মন্দিরে বসে এই ভাবনাই ভাবছিল। এমন সময় চাকর চিঠি দিয়ে গেল। উপরের চিঠিখানাই এলাহাবাদের চিঠি ; বউদির হাতের দেখা। মাকে প্রণাম করে চিঠিখানা না খুলেই সে ঠিক করে ফেললে—এই মায়ের ইঙ্গিত। এলাহাবাদেই পাঠাতে হবে অজয়কে। পথ সে পেয়েছে। মনে হল নিশ্চয় বউদি এতে অজয়কে পাঠাবার জন্যে লিখেছেন। নিশ্চয় কোন সূত্রে অজয়ের পাসের খবর পেয়ে আগেভাগেই লিখেছেন—কাগজে অজয়ের পাসের খবর পেলাম। কিছু মনে করিস নে মনো, অজয় ওখানে পড়ে তিনটে লেটার পেয়েছে—এখানে থাকলে নিশ্চয় স্কলারশিপ পেত। আমার ভুনি দুদিন গান্ধীমহারাজের চেলাগিরি করুক—পরীক্ষায় ওরা বৃত্তি ছাড়ে না। ওদের কাছে থাকলে আর এখানকার ইস্কুলে পড়লে অজয়ের জয়-জয়কার পড়ত। তা বেশ হয়েছে। এবার অজয় বড় হয়েছে। কলেজে পড়বে—এবার ওকে তুই

এখানে পাঠিয়ে দে। নিজেও আসিস ভাল কথা। না পারিস—তুই তোর শ্বশুরকুলের কালী মা-ঠাকরুনের দেবাংশিনী হয়ে স্বর্গের পথ বাঁধিয়ে নে। অজয়ের জন্য আশীর্বাদ চেয়ে নিস। আর একটা কথা মনে করিয়ে দি। এলাহাবাদের জলহাওয়া বড় ভাল রে, এখানে ডালরুটি খুব হজম হয়। ও নইলে পেটই ভরে না। তোর দাদার শরীর মনে আছে! ভুনি দুনিকে তুই দেখিস নি। ভাই দুজনের দিকে তাকিয়ে আমারই যেন নজর লাগে। মনে মনে বার বার ষাট ষাট বলি। অজয়ের শরীর ভাল হবে। এখানে নিশ্চয় পাঠাবি। ভয় নেই। সব মামীমারা খারাপ লোক হয় না। আমি তো নইই।

কল্পনা করতে করতেই মনোরমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এলাহাবাদেই সে পাঠাবে অজয়কে।

এইপঠভূমিতে গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা বংশটির উত্তরাধিকারী শ্রীমান অজয়ের জীবন আরম্ভ হল। জীবন অবশ্য আরম্ভ হয়েছে আজ ষোল বৎসর। যেদিন সে জন্মেছে সেই দিন থেকেই। এই যে মুখুজ্জে বংশের খাতে প্রবাহিত জীবনস্রোত—যার সঙ্গে আরও কত বংশের কত ব্যক্তির বিদ্বেষ-প্রীতি যুক্ত হয়েছে—যার ফলে কত আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে—কত গতি স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দ ও বেগ মধুর কল্লোলধ্বনির সৃষ্টি করেছে—ধারারতটভূমিতে তীর্থস্থলের স্নানঘাটের মত ঘাট গড়ে উঠেছে, সেই ধারায় সে এসে পড়েছিল নূতন একটি ঝরনাধারার মত ষোল বছর আগে। গঙ্গাচরণের জীবনস্রোত বিজয়চন্দ্রের জীবন-স্রোতের উৎস-মুখ নিরুদ্ধ—এলাহাবাদ থেকে মনোরমা এসে সেই ধারায় নিজেকে মিশিয়েছিল, শ্বশুর স্বামীর জীবনস্রোতোধারার উৎস শুষ্ক হয়ে গেলেও—নিজের জীবন জলস্রোত দিয়ে এই বংশ-স্রোতোধারাকে সে যথাসাধ্য গতিতে ছন্দে বেগে টেনে নিয়ে এসেছে সম্মুখের পথে। তার সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়েছে অজয়। নিজের জীবনে অপর একটি বংশধারা থেকে এসে এই মুখোপাধ্যায় বংশের সঙ্গে মিশেছে—প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমের যমুনার ধারার মত। যমুনার নীলধারা গঙ্গার সঙ্গে মিশবার সময় তাঁর নীল রং এবং গতির বেগ যেমন সামান্য একটু দূর পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য বজার রেখে চলে, ধীরে ধীরে নিঃশেষে গঙ্গার মধ্যে নিজের সব সত্তা হারিয়ে গঙ্গার জলেই পরিণত হয় ঠিক তেমনি করেই সে নিজেকে মুখোপাধ্যায় বংশের গুণ অগুণ সবকিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। অজয়ের জীবনস্রোতের উৎস-মুখ পরিপূর্ণতায় প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত তাকে এইভাবে প্রবাহিত হতে হবে। অন্তরের গভীর ভালবাসার জন্যই হোক আর শ্বশুর গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী বিজয়চন্দ্রের কর্মপন্থায় সার্থকতার জন্যই হোক—তাঁদের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্যগ্রতার আর অন্ত ছিল না। সে ব্যগ্রতা নদীর স্রোতের সাগরসঙ্গমে যাবার ব্যগ্রতার মতই একাগ্র। লোহার চুম্বকের দিকে ছোটার মত। এক্ষেত্রে সাগর বা চুম্বক একেবারে নিছক মাটির দুনিয়ার সম্পত্তি সম্পদ সম্মানই হোক আর কোন প্রকার আত্মিক ও আধ্যাত্মিকই হোক। মোট কথা, রাজনৈতিক বা নৈরাজ্যনৈতিক দুর্নৈতিক সকলপ্রকার প্রভাবের বাইরে রেখে—ছেলেকে মনের দিক থেকে শ্বশুর স্বামীর মিলিত মনে এবং বাইরের জীবনে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থক উকিলে পরিণত করাই ছিল তার সাধনা। তাই চিন্তা কোথায় অজয়কে পড়তে দেবে।

ঠিক এই এমন সময়টিতেই এলাহাবাদ থেকে বউদির হাতে লেখা খামের চিঠিখানা এল। তার কাছে মনে হল এটাই যেন দেবতার নির্দেশ। ক্রমে ক্রমে মনোরমা যে দেবদেবীতে বিশ্বাসের ব্যাপারে দৃষ্টিতে ছানিপড়া মানুষের মত হয়ে আসছিল—তা সে বুঝত কিন্তু উপায় তার ছিল না। ব্যাধি বিশেষ করে ছানিটা একবার পড়তে শুরু করলে যেমন থামে না—এবং কোন ওষুধে তাকে নিবারণ করা যায় না—এও ঠিক তেমনি। তাই চিঠিখানা পেয়েই সে ভেবে নিল—এবং প্রায় স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেল যে—এই চিঠিতে নিশ্চয় বউদি অজয়কে ওখানে

পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। এতদিনে কাগজ মারফৎ অজয়ের পাসের খবর পেয়ে গেছেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন –'অজয়কে এবার এখানে পাঠাতে না করিস নে মনো।' চিঠিখানা না খুলেই সে মনে মনে পড়েই নিলে চিঠিখানা। ইনানীং মা-কালীর প্রতি অগাধ অন্ধ বিশ্বাসে এমনিই মনে হত তার। এই লোকটা আসছে—এই বলবে। এই ঘটনাটা ঘটেছে—এর ফলে এই হবে। মিলতও কিছু কিছু। না মিললেও সে না-মেলার একটা কারণ সে বের করে নিত। কয়েকটা আশ্চর্য ঘটনা মিলে গেছে, যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে বাস্তব বিচারে। সে মনে মনে পড়ে গেল বউদি লিখেছেন—'এবার চলে আয় এখানে। অজয় তিনটে লেটার নিয়ে পাস করেছে ওখান থেকে; এখানে থাকলে পড়লে সে নিশ্চয়ই প্রথম দশজনের একজন হতে পারত। ওর যে দুকুল উজ্জ্বল। বাপকুলে বিজয়চন্দ্র গঙ্গাচরণ মাতুলকুলে তোর দাদা তোর বাপ দু'জনেই স্কলারশিপ-পাওয়া ছাত্র। আমার ভুনি দুনি কম নয়।' কল্পনায় অনেক বড় চিঠি পড়ে গেল এবং স্মিতহাস্যমুখে চিঠখানা খুললে।

"ভাই মনো—

অনেকদিন তোকে পত্র দিই নি, তুইও দিস নি। আমি না হয় সংসারে একলা। সংসারে একটা দাঙ্গি আছে কিন্তু কাজ তো অনেক। ভুনি জেলে যাবার আগে কতকগুলো বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মেয়েদের নিয়ে সমিতি। কি করব করতে হয়। তার উপর রান্নাবান্না ঘরসংসার। দুনি ঘরে ছিল—তার জন্যে ভাবনা। জেলে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু তুই তো শীতলহাটীর সর্বময়ী দেবী মা-কালীর দেবাংশনী। তোর মাথার উপরে স্বয়ং মা, তোর অধীনে ঝি চাকর ঠাকুর চাপরাসী আছে। তার উপর আছে তোর নিজের কর্মচারী—ওখানকার দেবোত্তরের নায়েব গোমস্তা। তোদের ইস্কুল—তোদের ডাক্তারখানা। তুই তো খোঁজ নিতে পারতিস—বউদি বেঁচে দুঃখু পাচ্ছে না মরে জুড়িয়েছে। যাকগে ভাই, ভুনি ঘরে ফিরেছে। বলছে—এখন আর কিছুদিন জেলে যাবে না, শরীরটা খারাপ হয়েছে। এবং এখন যা দেশের অবস্থা তাতে ঠিক কি করতে হবে বুঝতেও পারছে না। ওর গুরুমণ্ডলী জেলে রয়েছেন।"

ভুনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে এ খবরটা মনোরমা জানত, অন্ততঃ হিসেবমত তার বের হওয়া উচিত এটা বোধ হয় মনে ছিল। তবে ওর ধারণা—ও দেবীর প্রসাদেই জানতে পেরেছে। হাসতে হাসতেই চিঠিখানা খুললে সে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। বউদি অজয়ের পাশের খবর জানে না। প্রথম লাইনেই সে কথা রয়েছে।

"ভাই মনো,

অজয়চন্দ্র কেমন আছে—সে পরীক্ষা কেমন দিয়েছে? তুই কেমন আছিস? অনেকদিন পর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তোর কাছে কিছু টাকা চেয়ে চিঠি লিখছি।"

টাকা চেয়ে চিঠি লিখছে বউদি! অজয় পরীক্ষা কেমন দিয়েছে? একটু বিষণ্ন হাসি ফুটে উঠল মুখে। সংসারে নিজে ছাড়া সবাই পর। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। যাকগে। সেই বা বউদির খোঁজ কত নিয়েছে! কিন্তু বউদির টাকার দরকার হল কেন? আর হলেও বউদি তার কাছে টাকা চাইবে—এ যে তার কাছে বিস্ময়ের কথা! তবে কি বিপদ? রুদ্ধনিশ্বাসে বাকীটা পড়ে গেল সে। না—বউদির নিজের বিপদ নয়। পরের বিপদ বউদির ঘাড়ে চেপেছে।

হারাণ কাকার ছেলে শিবেনদার মেয়ের বিয়ে।

বউদি লিখেছে—"হারাণ কাকার ছেলে শিবেন ঠাকুরপো—তোদের শিবেনদার কন্যাদায় উদ্ধার করতে হবে। সে সাতখানা কাণ্ড করে বিয়ে। এ বিয়ে না হলে রমার বিয়ে আর হবে না। শিবেন ঠাকুরপো ইদানীং লক্ষ্ণৌতে থাকত—সে একেবারে অন্যরকম মানুষ হয়ে

গেছে। একেবারে বিশ্বপ্রেমিক বললে হয়। না-হিন্দু না-মুসলমান না-কৃশ্চান। আবার মিশনারীদের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়েছে। তারা নাকি হিন্দুদের আক্রমণ করে কি সব কাগজে লিখেছিল। আবার গান্ধীজী সুভাষবাবু এদের দলদেরও বিরোধী। হিন্দুদের তো শ্রাদ্ধ করে থাকে। বিয়ে হচ্ছে প্রেমের বিয়ে। মেয়েদের মেমসাহেব করেই গড়ে তুলছিল। যাই হোক সে অনেক কথা মনো। লিখতে গেলে একটা ছোটখাটো উপাখ্যান হয়। তবে সৎ মানুষ। চোর নয়—চরিত্রবান—সত্যবাদী। তবে ভাষা কটু। এমন মানুষের বন্ধু নেই। কাজেই আমাকে একটু উদ্যোগী হতে হয়েছে ওর স্ত্রী আর মেয়েদের মুখ চেয়ে। টাকাকড়ি লাগছে না তবে খরচখরচা তো আছে। তোর তো ভাই অভাব নেই। আর তুই আর ঠাকুরজামাই যখন তোর শ্বশুরের মৃত্যুর পর এসেছিলি তখন বলেছিলি—তোর শ্বশুর কিসের জন্য যেন হারাণ কাকার কাছে ত্রুটি স্বীকার করতে বলেছিলেন। উপকারে সেটাও শোধ হবে তোর। অজয়ের কল্যাণ হবে। পরলোক থাকলে হারাণ কাকা এবং তোর শ্বশুর নিশ্চয় আশীর্বাদ করবেন। এইখানেই রাখলাম। তোরা ভাল থাক। অজয় চট্ চট্ পাস করে উকিল হয়ে বাপঠাকুরদার পাটে বসুক। যা দিবি শত সহস্রগুণ হয়ে ফিরে আসবে। তুই শীতলহাটীর কালো মা ঠাকরুনের দেবাংশিনী হয়ে তাঁর দয়া লাভ কর। বউ বেটা নাতি-পুতি হোক। অবশেষে স্বর্গ থেকে পঞ্চশব্দের বাদ্য বাজিয়ে রথ নেমে আসুক। তার আগে খবর দিস, ছুটে যাব। ভুঁনি দুনি জেলেই থাক—আর ঘরেই থাক—আর অসুখ হয়ে হাসপাতালেই থাক, বিয়ে না করে ঘরে আর কেউ না থাকে না-থাক—সব ফেলে দিয়ে ছুটব এবং একটা চামর হাতে নিয়ে—রথের পায়া চেপে ধরে বলব—আমি মনোরমার সখী, আমাকে নইলে ওর চলে না—আমাকে যেতেই হবে—তুলে নাও আমাকে। ইতি বউদি।"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

ভাল লাগে নি চিঠিখানা। টাকা দিতে তার আপত্তি নেই। তবে তোর অনেক আছে কথাটা ভাল লাগে নি। কত আছে? কত গেল তা তো খোঁজ কেউ রাখে না। মুল চট্টগ্রামের বাস গেছে—পাটই গেছে একরকম। কত কাল পরে যুদ্ধ মিটবে এবং যুদ্ধের পর চট্টগ্রামের বাড়ি থাকবে না থাকবে না—তা জানেন ভগবান।

অজয় সম্পর্কে অনেক আশীর্বাদ করেছে বউদি, সে তো ওই—তার স্বর্গে যাওয়া সম্পর্কে যে রসিকতার ছলে পরিহাস করেছে তার সঙ্গে এক নিশ্বাসে লিখেছে।

সংসারটাই এই। স্বার্থ ছাড়া কথা নেই। বউদি এখানে তার সাহায্যে তার পরার্থ-পরতা চরিতার্থ করতে পারবে এইটেই তার স্বার্থ। উঠে দাঁড়াল সে চিঠি হাতে করে। তার শ্বশুরের কথা মনে পড়ছে, হারাণ কাকাকেও মনে পড়ছে—সাহায্য সে করবে; শ'আড়াই টাকা এবং একটা আংটি সে পাঠিয়ে দেবে। তা সে দেবে। কিন্তু অজয়কে সে পাঠাবে না এলাহাবাদে। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। না—তাই বা পাঠাবে না কেন? পাঠাবে। এলাহাবাদেই পাঠাবে। কিন্তু মামীর বাড়িতে নয়। অজয় থাকবে কলেজ-হোস্টেলে। হ্যাঁ তাই পাঠাবে। সে নিজেও অজয়কে নিয়ে সেখানে গিয়ে বাসা করে থাকতে পারে।

ঘণ্টা কয়েক পর মনের উত্তাপটা কমে এলে মনে হল—না। এতটা করে কাজ নেই। একবার অজয়ের শৈশবে—অজয়ের হাতে মিষ্টি দেওয়া নিয়ে বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে। আবার বউদির সঙ্গে এ নিয়ে মনান্তর সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। অজয়কে নিয়ে সে অন্য কোথাও বাসা করবে।

নায়েব বললে—বর্ধমানে বাড়িভাড়া ক'রে আপনি অজয়বাবুকে নিয়ে থাকুন।

না। বর্ধমান তার কাছে ভাল জায়গা নয়। তা ছাড়া কলকাতার কাছে। মনোরমা বললে—না, বাংলদেশের বাইরে কোথাও যাব আমি।

হেডমাস্টার বললেন—তা হলে আপনি এলাহাবাদ যাচ্ছেন না কেন ? সেখানে আপনার ভাইপোরা রয়েছে। জায়গা ভাল। বাংলার বাইরে বলতে গেলে তো গোড়াতেই পাটনা—তা পাটনার চেয়ে এলাহাবাদ অনেক ভাল।

—এলাহাবাদ !

নায়েব বললে—এত দূরে যাবেন মা ! চট্টগ্রাম থেকে এখানে এলেন। কম দূর নয়। আবার এখান থেকে এলাহাবাদ ! এই তো দু বছরে এখানে একটা নতুন আস্তা করলেন। চট্টগ্রামে কবে যাবেন—সেখানে যুদ্ধের পর কি পাবেন তা জানেন ভগবান। ছেলেটির একটি বাসস্থান করতে হবে তো !

হেডমাস্টার হেসে বললেন—নায়েববাবু, অজয় গঙ্গাচরণবাবুর পৌত্র। আস্তানা গড়ে নিতে ওকে ভাবতে হবে না। এক বস্ত্রে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—রাত্রিকালে। সেই রক্ত তো অজয়ের দেহেও আছে। আর অজয় কলেজে পড়তে যাবে—তার সঙ্গে মা যাবেন কেন ? অজয় একলা যাবে। মামাদের বাড়ি আছে—সেখানে গিয়ে উঠবে—তারপর কলেজ-হোস্টেলে থাকবে। এটা যে কলেজের বইয়ের শিক্ষার চেয়ে বড় শিক্ষা। দুনিয়াতে একলা বেড়ে ওঠার শিক্ষা তার শক্তি অর্জন সব থেকে বড় কথা।

একটু থেমে আবার বললেন—কিছু মনে করবেন না মা। অজয়কে আপনি বাক্সের তুলো মোড়া আঙুর করে তুলছেন। বলেই আবার বললেন—রাগ করছেন না তো ?

হেসে ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে মনোরমা বললে—না, না। আপনি তো সত্য কথাই বলছেন। কথা তো মিথ্যে নয়। আচ্ছা ভেবে দেখি !

—ভেবে কি দেখবেন ? আপনি এখানে থাকবেন। এখানে এই সাইক্লোন গেছে। তারপর মড়ক। দুর্ভিক্ষ। আপনি থাকতে কত সাহায্য হয়েছে গ্রামের লোকের। ধান চাল —অন্ন—খড় বাঁশ এ তো কম পায় নি। আপনাকে ওই উনি এনেছেন। উনি কত প্রসন্ন হয়েছেন দেখুন তো ! মা-কালীর স্থানটি এমন মনোরম ছিল আগে ? এমন ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতা ছিল ? আমার তো মা মনে হয়—মায়ের বিগ্রহের মুখে যে হাসিটি এখন দেখা যাচ্ছে আগে এটি ছিল না !

একটি টিকটিকি টকটক শব্দে কোথায় কোন্ কোণে ডেকে উঠল। হেডমাস্টার বললেন—এই দেখুন টিকটিকিটাও বলছে—ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্।

সেই মুহূর্তেই বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাইসিক্ল থেকে নামল অজয়—মা ! মামীমা টেলিগ্রাম করেছেন।

মনোরমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—টেলিগ্রাম ?

—হ্যাঁ। লিখেছেন—আশীর্বাদ ! কাম হিয়ার ফর ফারদার স্টাডিজ। আমার পাশের খবর পেয়ে করেছেন আর কি !

চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মনোরমার। বুকটা হাল্কা হয়ে গেল। স্মিত হেসে ছেলেকে বললে—তুই যাবি তো ?

—নিশ্চয় যাব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বাড়ি এলাহাবাদ। আনন্দভবন—

—উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ ! হেডমাস্টার ঘাড় নেড়ে বললেন—উহুঁ ! Past থেকে Presentএ এস। Present আগে নয়। ওতে এক ধরনের anachronism হয়—প্রথম প্রয়াগতীর্থ——গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমতীর্থ—স্মরণাতীত—Prehistoric যুগ থেকে কত দাতা দান করেছে, কত সাধু ধ্যান করেছে। মহারাজ হর্ষবর্ধন এখানে সর্বস্ব দান করে চীরবস্ত্র পরিধান করতেন। তারপর প্রতিষ্ঠান দুর্গ। তারপর ইলাহিবাদ। তারপর ইংরেজ করলে U. P.র রাজধানী। এইখানেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আনন্দভবন করলেন। সেই ভবনে

জন্মালেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ! কালে কালে প্রয়াগের সংগমতীর্থের পুণ্যে কুম্ভমেলা হয়। এলাহাবাদ is a great place—a sacred place. ওখানে পড়তে যাওয়া খুব কাম্য। কিন্তু একলা মা ছেড়ে থাকতে পারবে তো ?

লজ্জিত হল অজয়। কষ্ট তার হবে। কিন্তু স্বীকার করতে পারে তাই ? তাছাড়া জীবনে স্বাধীনতার একটা হাতছানি দেখেছে সে। মুখ লাল হয়ে উঠল তার—কিন্তু মুখে সে বললে—কি যে বলেন স্যার ! আমি কি খোকা নাকি ? নিশ্চয় পারব। এলাহাবাদ কি ? আপনি দেখবেন আমি বিলেত চলে যাব বি-এ পাস করে।

মনোরমাও লজ্জিত হল। কিন্তু সমস্যার সমাধান তার ষোল আনার বারো আনা হয়ে গেল। বাকি চার আনাটা মার খচ্ছে। মা সেটা জানালেই হয়।

* * *

তাও তিনি জানালেন। কি করে বা কি ভাবে তিনি জানালেন বা মনোরমা জানলে—সে ওই দুপক্ষই জানেন। হয়তো স্বপ্ন দিয়েছিলেন—অথবা কোন কালো-মেয়ের চেহারা নিয়ে এসে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসে বলে গিয়েছিলেন—আঃ—মা এখানে সাক্ষাৎ বিরেজ করছেন রানীমা। আহা-হা ! আপনকার সেবাতে, আঃ, মায়ের মুখে কি হাসি গো ! যেন আদরিণী কন্যের মত ধরধর ভাব গো ! একটি কথা বলি মা, মাকে ছেড়ে যেন কোথাও যেও না, বুঝেছ ! সেই গানে আছে না—আমার কাজ কি গয়া কাজ কি কাশী – মায়ের রাঙা চরণতলে গয়া-গঙ্গা-বারাণসী।

কথাগুলি ঠিক কোন একটি কালোমেয়ে বলে নি। বলেছে কয়েকজনে মিলে। তারা শুনেছিল—রানীমা ছেলেকে নিয়ে কলেজে পড়াতে যাচ্ছেন। তারা সকলেই একে একে কোন এক সময় এসে বলেছে, না মা, তুমি যেয়ো না। ছেলে তোমার বড় হয়ে পাস করেছে—তাকে পাঠাও। তুমি থাক। মায়ের এমন যত্নটি হবে না তুমি গেলে !

এরই মধ্যে থেকে মনোরমা দেবতার আদেশ বা নির্দেশ শুনেছে। ঠিক কাকে যে এর মধ্য থেকে দেবী বলে মনে হয়েছে তা ঠিক স্পষ্ট না বুঝলেও, একজন যে তাদের মধ্যে তিনি এ ধারণা তার হয়েছিল। অজয়ও এতে সহযোগিতা করেছে। সে যেখানে পড়তে যাবে সেখানেই মা যাবেন রক্ষক হয়ে এটা তার ভাল তো লাগেই নি, বরং এতে সে কেমন লজ্জা বোধ করেছে। সেও বলেছে—তুমি কেন যাবে ? তুমি গেলে এখানকার সব দেখবে কে ?

মনোরমা তাকিয়ে ছিল মা-কালীর মুখের দিকে। ইশারা বা ইঙ্গিত চাচ্ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে থেকেই মনোরমা বলেছিল—তুই ? তোকে দেখবে কে ?

অজয় বলেছিল—কেন, তোমার ওই মা দেখবে। তুমি তার সেবা নিয়ে থাকবে—আর সে তোমার ছেলেকে দেখবে না ?

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে—প্রতিমার মাথায় যে জবাফুলটি পুরোহিত দিয়েছিল সেইটি খসে পড়ে গেল পায়ের তলায়। চমকে উঠল মনোরমা। এই তো আদেশ হয়ে গেছে।

অজয় কথাগুলি বলেছিল মায়ের মনের বিশ্বাসের কথা জেনে, তার মনের বিশ্বাস ঠিক এই বিশ্বাস নয়। সে জানত—তার মায়ের মধ্যে একটি শক্ত একগুঁয়ে মন আছে, যে মন জাগলে তাকে মানানোর সাধ্য কারুর নেই। তবুও তার কথাগুলির মধ্যে অবিশ্বাসের অতিপ্রচ্ছন্ন যে ব্যঙ্গ ছিল তা তার কণ্ঠস্বরের সুরে ও বলার ভঙ্গীর নিরীহতায় চিন্তাকুল মনোরমা বুঝতে পারে নি। ফুল পড়তেই মনোরমা বললে—ডেকে আন তো পূজারী ঠাকুরকে। শীগ্‌গির।

—পূজারী ঠাকুরকে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—কোথায় তাঁকে খুঁজতে যাব এখন ! সে পুজো ভোগ সেরে বেরিয়েছে—এ পাড়া ও

পাড়া ও গ্রাম ঘুরছে গামছার খুঁটে প্রসাদী ফুল নিয়ে। তুমি তো জান না তার ব্যবসা। জ্বরজ্বালা—মামলা মকদ্দমা—সব তাতেই সে মায়ের ফুল দেয় পয়সা নেয়।

—বেশ করে। খুব করে। চটে উঠল মনোরমা।—যত সব অবিশ্বাসী নাস্তিক কোথাকার! কত লাখ টাকা দেয় রে তারা? মায়ের আশীর্বাদী বয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসে——হয়তো পাঁচটা পয়সা দেয়—নয় পাঁচ আনা দেয়। এইটে ব্যবসা হল? তোরাই বা কত টাকা মাইনে দিস তাকে? মায়ের প্রসাদ আর কুড়ি টাকা মাইনে। তার আবার কথা শোন! ব্যবসা! মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার হয় না?

অজয় থতমত খেয়ে গেল। মনোরমা বললে—যা তুই, চট্ করে চান করে কাপড় ছেড়ে আয়। এক্ষুনি। গরদের কাপড়।

—কেন?

—কথায় কথায় কৈফিয়ৎ আমার দেওয়া অভ্যেস নেই। যা বললাম, করবি কি না? যা।

অজয় কথা বাড়াতে সাহস করলে না। স্নান করে মায়ের গরদের কাপড়খানা প'রে এসে দাঁড়াল।—বল কি করতে হবে?

—মাকে প্রণাম করে—যা, ওই পায়ের কাছে যে জবাফুলটি পড়ে আছে নিয়ে আয়। না—না, ওগুলি নয়। ওগুলি পায়েই দেওয়া হয়েছিল। ওই যে শিবের বুকের উপর পড়ে আছে,—হ্যাঁ, ওইটি—ওইটি নিয়ে আয়। চল বাড়ির মধ্যে চল। দু'দিন পর ত্রয়োদশী—আজ দশমী—তুই ত্রয়োদশীর দিন এলাহাবাদ যাবি। বউদিকে টেলিগ্রাম করে দে। আজই এক্ষুণি। ডাক নায়েববাবুকে।

নায়েব আসতেই বললেন—আমি পাঁজি দেখেছি—পরশু ত্রয়োদশী দিন খুব ভাল। অজয় ওই দিন এলাহাবাদ যাবে। ওখানে হোস্টেলে থেকেই পড়বে। মেল তো বর্ধমানে রাত্রে, তুফানে যাবে। দিনের বেলা ট্রেন। আপনি একবার বাগাল স্বর্ণকারকে ডাকুন—একটা আংটি গড়তে দেব। কালকের মধ্যে গড়ে দিতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখুন। আমি যাব বর্ধমান পর্যন্ত। বুঝেছেন!

অজয়ের যাত্রা

অজয় যখন ট্রেনে চড়ে বসল তখন কিন্তু তার চোখ ছল ছল করে উঠল, বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। মাকে ছেড়ে কখনও সে যায় নি—কখনও থাকে নি—কি করে এলাহাবাদে গিয়ে থাকবে? কোথায় এলাহাবাদ! মামীমা কেমন—ভুনিদা দুনিদা কেমন। সে দেশ কেমন। সে দেশের মানুষ কেমন। ধারণাগুলো অস্পষ্ট কিন্তু তালগোল পাকিয়ে একসঙ্গে জাগল। ভয় এবং মায়ের প্রতি মমতা মিশিয়ে দুরন্ত একটা আবেগ যেন বুকের ভিতর ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। একসময় ইচ্ছে হয়েছিল—লাফ দিয়ে নেমে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'আমি যাব না মা। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।' হয়তো তাই বলত এবং করত কিন্তু মা মনোরমা তা হবার অবকাশ দেয় নি। মনোরমা এদিক দিয়ে খানিকটা দুর্বোধ্য। অজয়কে নিয়ে চিন্তা যতক্ষণ করেছে ততক্ষণ করেছে, নানান উদ্ভট চিন্তা করেছে; রাতে ঘুম হয় নি; অন্নও প্রায় ত্যাগ করেছিল দিন তিনেকের জন্যে। কিন্তু তিন দিন আগে যে মুহূর্তে মায়ের মাথার ফুল পায়ে পড়েছে সেই মুহূর্ত থেকে সে মনকে শক্ত করে ফেলেছে। একেবারে যেন পাথরের মত শক্ত। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—খবরদার মনকে দুর্বল করবি নে। ব্যাটাছেলে—এত বড় দুর্দান্ত ঠাকুরদার নাতি—ষোল বছর বয়সে—রাত্রি দশটায় বাড়ি থেকে এককাপড়ে বেরিয়ে পথ হেঁটে বর্ধমান এসেছিলেন। পায়ে হেঁটে কলকাতা গিয়েছিলেন। চোর ডাকাত ভুত প্রেত সাপ শেয়াল কিছুকে ভয় করেন নি। তাঁর নাতি—তুমি ট্রেনে চড়ে এলাহাবাদ যাচ্ছ—মামীমার বাড়ি। কাল ভোরবেলা নামবে। স্টেশনে ভুনি আসবে। খুব মন দিয়ে পড়বে। উকিল হতে হবে। যুদ্ধ থামবেই একদিন। রাজ্য যার হবে হবে, আইন থাকবে আদালত থাকবে, চট্টগ্রাম থাকবে। সেখানে ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ আর শোন, মুখটা বাইরে আন।

অজয় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল—ভেবেছিল—মা বোধ হয় থুতনি ধরে চুমু দেবেন। তাও মা দিয়েছিল কিন্তু সে পরে; আগে নিজে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলেছিল—হারাণ কাকার নাতনীর বিয়ের খরচের জন্যে যে আড়াইশো টাকা দিয়েছি ওটা তোর মামীমার হাতে দিবি। আর আংটিটা তুই নিজে গিয়ে ওঁদের বাড়িতে দিয়ে আসবি—বলবি আমার মা দিয়েছেন। কেমন?

তারপর থুতনিতে হাত দিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে হেসে বলেছিলেন—কোন ভয় নেই। আমার মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। দেখো তুমি—ট্রেনে যেতে যেতে ঠিক বুঝতে পারবে—মনে হবে আশেপাশে কেউ যেন রয়েছে।

অজয় আর অবকাশ পায় নি তার মনের ভয় এবং মমতা মেশানো সেই আবেগটুকু প্রকাশ করতে। ট্রেন ছেড়ে দিল, গাড়ি প্ল্যাটফর্ম পার হল—অজয় জানালার ভিতর থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। এই সময়ে তার চোখ ফেটে জল বের হল—কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারলে না। ভাগ্যিস জানালার ধারটিতে জায়গা পেয়েছিল তাই কামরার লোকের কাছে সে কথা গোপন রইল। অজয়দের নায়েব খাঁটি জমিদারী সেরেস্তার লোক, আদালত থেকে থানা রেল প্রভৃতি কঠিন কঠিন স্থানে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় কেমন করে কাজ নিতে হয়—সে বিষয়ে ধুরন্ধর ব্যক্তি। তার উপর সে সময়টা যুদ্ধের সময়—তখন গোটা যুদ্ধটাই চলছে টাকার চাকার রথে; এরোপ্লেন-মোটর-রেল-ট্যাঙ্ক সবের চাকা টেনে নিয়ে চলে টাকার চাকার রথ। এ সময়ে গোটাপাঁচেক টাকা খরচ করে ইন্টার ক্লাসের একটি ছোট কামরায় জানালার ধারে একটি জায়গা এবং উপরে একটি বিছানা বিছানো ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। রেলের বাবুরাই একজন উপরে শুয়ে এসেছিল, একজন বসে এসেছিল।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাবার কথা হয়েছিল, তুলেছিল নায়েব কিন্তু মনোরমা আমল দেয় নি। ওখানে তার আবার নিজের নিয়ম-নীতি আছে। যতক্ষণ অজয় রোজকার না করবে ততক্ষণ এক অসুখ ছাড়া ইণ্টার ক্লাসের চেয়ে উঁচু ক্লাসে যাবে না। যেতে হলে ফার্স্ট ক্লাসে যাবে—সেকেণ্ড ক্লাসে কদাচ না। ওই শ্রেণীটাতে ওই সাদা চামড়ার জাতের যত নীচু চাকরে—ছোটলোক-গুলোর অবাধ অধিকার। স্নেহের আবেগ মনোরমার ঘনই বটে। অজয়ের জন্মকাল থেকে কার্যকারণে এবং অর্থশালী স্বামীর প্রশ্রয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এটা হয়েছিল—কিন্তু তবু মনোরমা বিচারবুদ্ধি হারায় নি।

*　　　　*　　　　*　　　　*

গাড়ি টানা চলেছিল—বর্ধমান থেকে। আগে বরাবর আসানসোলে গিয়ে থামতো, এখন পানাগড়ে থামে। পানাগড়ে বিস্তৃত অঞ্চল সামরিক বিভাগ দখল করে ছাউনি করেছে। এরোড্রোমের ব্যবস্থা থেকে সব আছে। গ্রাম উঠে গেছে, কৃষিক্ষেত্র পতিত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। রাস্তাঘাটে বিজলী আলো, লোকে বলে আমেরিকান টাউন। পানাগড় স্টেশনে গাড়ি থামে। আমেরিকান সৈন্যেরা নামে ওঠে। বর্ধমান থেকে এসে নামে, আসানসোল যায়। কাজে অকাজে। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাংক রোড ধরে জীপ ওয়েপন-কেরিয়ার ছুটছেই ছুটছেই। পথের ধারে জীপ উলটে আছে। রাস্তার ধারের গাছ ধাক্কা মেরে ভেঙেছে। তবু ছুটছে—ছুটছে। পানাগড় থেকে অণ্ডাল, অণ্ডাল থেকে আসানসোল। আসানসোল পর্যন্ত আসতে আসতে অজয় পালটে গেল। তার মনের সেই বিমর্ষ ভাব কেটে গেল। উল্লসিত হয়ে উঠল সে। হঠাৎ তার ভারী ভাল লাগল। সে আজ স্বাধীন। খাঁচা-খোলা পাখির মত স্বাধীন। সে মুক্ত। চঞ্চল অধীর হয়ে উঠল সে। পা দুলিয়ে গম্ভীর হয়ে সে গান গাইতে চেষ্টা করলে। প্রথমেই বাংলাদেশের ছেলেরা যা গেয়ে থাকে—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

তারপর সে কবিতা আবৃত্তি করলে—

সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।

আসানসোলে এসে হঠাৎ তার কি মনে হল ; কি আর মনে হবে—মনের মধ্যে এতকালের সেই দমিত ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। গাড়িতে সকলেই প্রায় সিগারেট খাচ্ছে, তার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হল। নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে কিন্তু একবারে সরাসরি গিয়েই কিনতে পারলে না। গিয়ে ফিরে এল। পান খেলে। তারপর বার দুয়েক ঘুরে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ও একটা দেশলাই কিনে গাড়িতে গিয়ে বসল। এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে টানবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু টানা সহজ নয়। কেশে সারা হল। খানিকটা খেয়ে ফেলে দিতে বাধ্য হল। মাথা ঘুরছিল। সে বাংকের উপর পাতা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে ভাবতে লাগল—স্বাধীন জীবনে সে আর কি করতে পারে। অনেক ভেবে মনে হল সে মুর্গী খেতে পারে। গাড়ির ডাইনিং-কারে খেতে গেলে অনায়াসেই মুর্গী খেতে পারে। কিন্তু সে জানে না ডাইনিং-কারে তাকে ঢুকতে দেবে কিনা।

এটাও তার স্থায়ী হল না। সন্ধ্যা হতে না-হতে ক্লান্ত হয়ে সিগারেট প্যাকেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ; মনে খানিকটা ভয়ও হল যদি কাল সকালেও এর গন্ধটা থাকে। কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল দেশলাইটার কথা। সেটাও ফেলে দিলে। যে সিগারেট খায় না তার পকেটে দেশলাই থাকার অর্থ কি ! পকেট ঝাড়লে যদি সিগারেটের তামাকের কুটিও সেখানে পড়ে থাকে। বার বার গন্ধ শুঁকে দেখলে। ডাইনিং-কারে মুর্গী খাওয়ার উৎসাহ

আর রইল না। সঙ্গে মা একটা পিতলের সুন্দর কৌটায় যে খাবার করে দিয়েছিল তাই খেয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য উঠেছে—ছটা বেজে গেছে—গাড়ি এলাহাবাদের এপারে যমুনা ব্রিজের ওপর।

আবার তার কান্না পেল। কোথায় এল সে? ভুনিদা যদি না আসে স্টেশনে? জিনিস-পত্র বাঁধতে লাগল সেই অবস্থাতেই। বিছানা বাঁধা হল না; ব্রিজের উপর থেকে এলাহাবাদ ফোর্ট দেখে। সে যেন এক বিস্ময়। অনেক ছোটবেলায় দেখেছে সে। স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই অস্পষ্ট স্মৃতির ছাপের উপর অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি ফেলে সামনে যমুনার উপর বিরাট দুর্গ। নীল যমুনা। যমুনার জলে বিশাল দুর্গটার ছায়া পড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

ব্রিজ শেষ হল। এবার সে বিছানাটা গুটিয়ে নিলে। মূল বিছানাটা বাঁধাই ছিল। এটা বাঙ্কের উপরে ফালতু বিছানা। একখানা শতরঞ্জি একখানা চাদর একটা বালিশ। ট্রেন এসে দাঁড়াল এলাহাবাদ স্টেশনের আইল্যাণ্ড প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে ছোটখাটো একটা জনতা। অনেক লোক। সবই টুপি পাগড়ি—পাগড়ি টুপি। এর মধ্যে কোথায় ভুনিদা বা দুনিদা? ট্রেন লেট এসেছে প্রায় তিন ঘণ্টা। লোকজন হুড়মুড় করে ঢুকছে। এরপর নামাই কষ্টকর হবে। সে কুলী ডেকে মাল নামালে এবং প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলে। কোথায় ভুনিদা? কুলী তাকে প্রশ্ন করলে—কাঁহা যাইয়ে গা?

সে বললে—একটু ঠারো। হামরা আদমী আয়েগা!

—কেতনা ঠারবে বাবু? হামার কাম নেই? কুলীটাও বুঝতে পেরেছে—সে বাঙালী। যথাসাধ্য তার আয়ত্ত করা বাঙলায় বলছে।

অজয় বললে—হম নয়া আদমী—

—কেয়া হ্যায়। টাঙা কর লিজিয়ে। পতা বাতা দিজিয়েগা—উ পেঁছা দেগা! চলিয়ে বাহার। নহি তো মুঝে পৈসা দে দিজিয়ে।

ঠিক এই সময় কে পিছন থেকে বললে—উঠায়ো মাল।

পিছন ফিরে অজয় দেখলে—একজন খদ্দরপরা খালিমাথা তরুণ, সে নিশ্চয় বাঙালী এবং নিশ্চয় ভুনিদা। বললে—আপনি—

সে বললে—ভুনিদা। তুমি অজয়!

দুঃস্বপ্ন ভেঙে গিয়ে যেমন স্বস্তি হয় তেমনি স্বস্তি অনুভব করলে সে। এবং বললে—হ্যাঁ।

—চল।

অজয় বিস্মিত হয়ে দেখছিল, ভুনিদার কাপড়জামা ধুলোয় কাদায় ময়লা—চুল উস্কখুস্ক যেন কেমন বিপর্যস্ত অবস্থা। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। টাঙাতে উঠতে গিয়ে ভুনিদা বললে—তুমি চা খাও তো?

—হ্যাঁ খাই।

ভুনিদা বললে—তবে খেয়ে নাও এখানে। বাড়িতে আজ বড় গণ্ডগোল। সেখানে গিয়ে চা-টা পাবে না বোধ হয়। হয়তো আজ ভাতও জুটবে না। এমন দিনে এলে তুমি!

—গণ্ডগোল? কিসের গণ্ডগোল ভুনিদা? কার কি হয়েছে?

—আমাদের বাড়ির কিছু নয়। পাশের বাড়িতে বিয়ে আছে—সেই বিয়ে নিয়ে গণ্ডগোল।

—মায়ের হারাণকাকার বাড়িতে তো?

—হ্যাঁ। কি করে জানলে? ও, মা লিখেছিলেন বুঝি পিসীমাকে?

—হ্যাঁ। মা একটা আংটি দিয়েছে আর বিয়ের খরচের জন্যে আড়াইশো টাকা দিয়েছে।

—ভাল। মা সেটা জমার ঘরে ধরেই রেখেছেন। কিন্তু চা খেয়ে নাও। চল তাড়াতাড়ি। ওখানে যে কি হচ্ছে তা জানিনে।

বাড়িতে গিয়ে পেঁছিল। বাড়িটা ফাঁকা। মামীমা নেই, দুনিদা নেই। ভুনিদা দাঙ্গটাকে বললে—মা বুঝি ও বাড়িতে?

—হ্যাঁ। তুমি যাও শীগ্‌গির।

—যাচ্ছি। অজয়, তুমি এস আমার সঙ্গে।

উপরতলায় একটি ঘরে তাকে বসিয়ে বললে—ওই ওদিকে বাথরুম। তুমি মুখটুখ ধোও। আমি আসছি। Make yourself comfortable—এ তোমার বাড়ি। বুঝেছ? এই তোমার বাক্সটা রইল। বিছানা পরে উঠিয়ে দেব। দাঙ্গ, বাবুকে ঘরে কি আছে দেখে খেতে দাও। এ তোর মনুয়াখোকাীর বেটা। আচ্ছাসে খিদ্‌মত করনা! হাঁ।

—হাঁ হাঁ। উ হমি জানে। মনুয়াখোকীর বেটা। তু যা। জলদি যা ভুনি ববুয়া। বহুমা হমকো সব বোলকে গিয়েসে। তু যা।

ভুনি চলে গেল দ্রুতপদে নেমে।

অজয় ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল। সামনের জানালাটা বন্ধ ছিল। ওইটেই এ ঘরের একমাত্র বাইরের জানালা। সেটা খুলে দিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখবার ইচ্ছে হল। ঘরে যখন কোন কিছু আকর্ষণের থাকে না তখন বাইরের দিকেই মনটা ছড়িয়ে পড়তে চায়। জানালাটা খুলে দিল সে। খুলেই তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। ওপাশে হাত তিনেক গলির ওধারে দোতলার খোলা জানালায় একটি তরুণী। মাটির মূর্তির মত স্থির। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। চমৎকার সুন্দরী মেয়ে। এবং বেশেবাসে একটা কিছু বিশেষ মাধুর্য আছে যেন। হ্যাঁ বিশেষ মাধুর্য। একরাশি ঘন কালো চুল খোলা পড়ে আছে। মুখটি ঈষৎ শীর্ণ। চোখে যেন কাজল আঁকা রয়েছে। হাতে একটা কাজললতা। ও—এই মেয়েই কনে। এরই তা হলে বিয়ে হবে। আশ্চর্য অপরূপ মনে হল তার। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি একবার ঘুরে তাকালে। চোখে মুখে যেন বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। অজয় অত্যন্ত লজ্জা পেলে—এবং নিতান্ত অপ্রতিভের মতই জানালাটা বন্ধ করে দিলে তাড়াতাড়ি। ছি—ছি—ছি! এ কি করলে সে! অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে তার। অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

কয়েক মিনিট চুপ করে বিছানার উপর বসে রইল। ছি—ছি—ছি। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তার আবার ইচ্ছে হল মেয়েটিকে দেখতে। জানালা সে খুলবে না। কিন্তু কোন ছিদ্র বা তক্তার জোড়ের ফাঁক কি নেই?—আছে। এগিয়ে গেল সে। এবং জানালায় তক্তার জোড়ের ফাঁকে চোখ রাখলে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওই যে—মেয়েটি এবার ঘরের ঠিক মাঝখানে বসে আছে। কি করছে? একটা ছোট টিন নিয়ে কি করছে! উঠে দাঁড়াল। টিনটা মাথার উপর উলটে ধরলে। কি করছে? কি ঢালছে? কি? জল? প্রয়াগের সঙ্গমতীর্থের জল? না। এ কি? ও কি! ও কি! ফস করে দেশলাই জ্বাললে। মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ বহ্নিমান হয়ে উঠল। দাউ দাউ করে জ্বলছে—মেয়েটি তবু স্থির দাঁড়িয়ে আছে। নীরবে। অজয়ই চিৎকার করে উঠে জানালাটা খুলে ফেললে। আগুন, আগুন, আগুন! ভুনিদা!

মেয়েটি নীরবে দাঁড়িয়ে পুড়ছে।

হঠাৎ সে একটা মর্মান্তিক চিৎকার করে মেঝের উপর পড়ে গেল একটা অগ্নিস্তূপ বা অগ্নিকুণ্ডের মত। জ্বলছে আগুন। কেরোসিনের ধোঁয়ার গন্ধ—কালো কালো ধোঁয়ার আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ঘরটা।

অজয় চেঁচাচ্ছে—ভুনিদা! ভুনিদা! আগুন আগুন আগুন। হঠাৎ ওদিক থেকে ঘরের বন্ধ দরজাটা ভেঙে পড়ল। কে চিৎকার করে উঠল—রমা! এ কি করলি রমা! রমা পুড়ছে তখনও।

অনেক বৎসর আগে কলকাতায় স্নেহলতা বাংলার কুমারী মেয়েদের বিয়ের সমস্যা সমাধানের এই পথটা খুঁজে বের করেছিলেন। পণপ্রথার প্রতিবাদে অগ্নিকুণ্ড জেলে তিনি তাতে প্রবেশ করেছিলেন। সে পথ আজও খোলা আছে—মাঝে মাঝে বাংলার কুমারী মেয়েরা ওই পথে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি খোঁজে।

শিবেনবাবুর মেয়ে রমা সেই পথে পা বাড়াল—বিয়ের দিনের সকালে।

খবর এসেছে বিয়ে ভেঙে গেছে—এ বিয়ে হবে না।

গতকাল বিকেলবেলা পাত্রপক্ষের টেলিগ্রাম এসেছে।

শিবেনবাবু শিক্ষিত মানুষ—লেখাপড়াজানা লোক—কিন্তু অধীরতায় উগ্র, ধৈর্যহীন। তিনি প্রথমেই চিৎকার করে উঠেছিলেন—আমি—আমি এর জন্য দায়ী! আমি একজন পদস্থ ব্যক্তির ছেলেকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমি যাব—আমি সেই ভণ্ড উদার আধুনিকের কাছে যাব—তাকে খুন করে আমি এর শোধ নেব। শয়তান, পিশাচ, ব্যভিচারী—!

সংসারে স্ত্রী আর দুটি কন্যা। আত্মীয়স্বজন নেই। থাকবার মধ্যে নিজের শ্বশুরকুলের বাস কানপুরে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ রাখেন নি শিবেনবাবু। তারা কেউ আসে নি। এলাহাবাদের বাঙালী সমাজেও তিনি শতকরা নিরেনব্বুই জনের অপ্রীতিভাজন। সংসারে কারুর সঙ্গেই তাঁর মতের মিল হয় না। ভুনির মা ননদ মনোরমাকে লিখেছিলেন—"শিবেন ঠাকুরপো এক হিসেবে বিশ্বপ্রেমিক—কিংবা বিশ্বমানব। না-হিন্দু, না মুসলমান, না-কৃশ্চান।" কথাটার মধ্যে একটু অস্পষ্টতা আছে। প্রেম নামক বস্তু বা ভাব বা বৃত্তিটি তাঁর অন্তর থেকে যেন কাঠের অসার অংশের মত র‍্যাঁদা দিয়ে চেঁচে ছুলে—বাদ দিয়ে—বাস্তববাদিতার সার অংশটুকু রেখে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সারবান বলে মনে করেন। হিন্দুদের আসরে বলেন—আমি নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জা বোধ করি। ওর কিছু মানতে প্রস্তুত নই—মানি নে। সেই কারণে এ দেশের ইতিহাসে আমার কাছে বলিষ্ঠতম পুরুষ কালাপাহাড়। অকালে সে জন্মেছিল। এ কালে জন্মালে এ দেশে এ জাত অনেক এগিয়ে যেত তার নেতৃত্বে। এ কালে জন্মালে সে মন্দির আর মূর্তি ভেঙে জেলখানার কয়েদীর পাথরভাঙা কাজ নিত না। হাতুড়ি মেরে ও গান্ধীর মত ভণ্ডদের নেতৃত্ব ভেঙে চুরমার করতে পারত।

মুসলমানদেরও ঠিক এমনি সমালোচনা করেন। বলেন—ফ্যানাটিসিজিম আর ন্যাশানালিজিমের মধ্যে দূরত্ব অনেক। মিস্টার জিন্না শ্রুড পলিটিসিয়ান—একজন উচ্চশ্রেণীর আইনজীবী; কিন্তু তিনি নিজে মুসলমান এই বোধের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না বলে তাঁর প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

মধ্যে মধ্যে হেসে—অবশ্য বক্র ধারালো শ্লেষাত্মক হাসি, বলেন—আমার বীফ্ খেতেও আপত্তি নেই হ্যাম খেতেও নেই—সুতরাং ওই দুই দলের সঙ্গে আমার মতবিরোধ স্বাভাবিক। ওদের আমি কেউ নই। আই পিটি দেম, হেট দেম।

কৃশ্চান মিশনারীদের চাকরি করতেন—গোড়ার দিকে তাদের সম্পর্কে সহানুভূতি ছিল—তারপর তাও ঘুচে গিয়েছিল—এখন বলেন—ওদেরও আমি করুণা করি। কারণ সংসারে সর্বাঙ্গে ক্রশ এঁকেই ওরা পবিত্র শুদ্ধ—নির্ভয়। সংস্কারের সমস্ত কমা-সেমিকোলন-ড্যাস-হাইফেনের থামার জায়গায় না থেমে মাড়িয়ে পেরিয়ে এসে গড নামক ফুলস্টপের বিন্দুটিতে থেমে গেছে।

পার হল শুধু রাশিয়া। রেড আর্মির মার্চের পায়ে পায়ে বা বুটে বুটে গুঁড়ো হয়ে

মুছে গেল। কিন্তু এদের মুছল না। অবশ্য ইচ্ছে করেই মোছে না। ওই ফুলস্টপের আড়াল না থাকলে ইম্পিরিয়েলিজম নোঙর ছেঁড়া বা হারা নৌকো হয়ে যাবে। ওই ফুলস্টপের বিন্দুটিকে কেন্দ্রে রেখেই এম্পায়ার, এক্সপ্লয়টেশন, জগৎজোড়া ট্রেড, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ঘূর্ণমান। মিশনারীরা ওই বিন্দুটির খিদমতগার, অনবরত চর্বি তেল যুগিয়ে লুব্রিকেট করছে। দে আর দি এজেন্টস অব দি ইম্পিরিয়ালিস্টস—এক্সপ্লয়েটারস—বুর্জোয়াস!

আবার মধ্যে মধ্যে রাশিয়ার সমালোচনাও করে থাকেন। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিকে মধ্যে মধ্যে বলেন—ওরাই হল নতুন বুর্জোয়া। ষড়যন্ত্রকারী। নইলে ট্রটস্কির মত জিনিয়াসকে তাড়াত না, হত্যা করত না।

অর্থাৎ পৃথিবীর বা মানব সমাজের একমাত্র সত্যের একমাত্র চাবিকাঠিটি তাঁর কাছেই আছে। তিনি তা দিয়ে বাক্সটি খুলে সত্য বিতরণে প্রস্তুত কিন্তু মূর্খ পৃথিবী কিছুতেই নেবে না। এমন ব্যক্তি যিনি তিনি বন্ধু বলে কাউকে গ্রহণ করবেন কি করে এবং মানুষই বা বন্ধু হবে কি করে? হতে পারত ভক্তের দল—কিন্তু মূর্খ মানুষ তা হতে চায় নি বা হয় নি। একমাত্র ভুবনবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক প্রীতিটুকুকে শিবেনবাবু অস্বীকার করতে চান নি—এবং এঁরাও এঁদের বিচিত্র পারিবারিক ধর্ম বা সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁকে অপ্রীতির কটুতায় কখনও ক্ষুণ্ণ করেননি বলেই সেটা আজও টিকে আছে।

সেই কারণে বাড়িতে বিবাহ আসন্ন হলেও লোকজন কেউ ছিল না। শিবেনবাবু নিমন্ত্রণও বিশেষ করেন নি। বিশেষ কেন—এক ভুনিদের বাড়ি ছাড়া কোন বাড়িতেই বলেন নি। তার উপর অসবর্ণ বিবাহ। পাত্রের আজই রাত্রে এসে পৌঁছুবার কথা। তার বদলে এল টেলিগ্রাম। শিবেনবাবু পড়েই সোজা দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন—আমি—আমিই এর জন্য দায়ী! একজন পদস্থ লোকের ছেলেকে বিশ্বাস করেছিলাম! আমি যাব—সেই ভণ্ড আধুনিকের কাছে যাব—তাকে খুন করে এর শোধ নেব। শয়তান পিশাচ ব্যভিচারী—!

দুই কন্যা এবং স্ত্রী চমকে উঠল চিৎকার শুনে এবং ছুটে বেরিয়ে এল আপন আপন কাজ ছেড়ে। মেয়েরা কথা বলতে সাহস করলে না। স্ত্রী সভয়ে প্রশ্ন করলে—কি হল?

শিবেনবাবু দেখতে সুপুরুষ ছিলেন—দাড়ি গোঁফ এবং বিশৃঙ্খল চুলেও তাঁকে খারাপ দেখায় না—কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মুখে রক্তোচ্ছ্বাসের রক্তাভায় চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাঁকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল—তিনি স্ত্রীর কথার উত্তরে বললেন—বজ্রাঘাত! তারপরই তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন কন্যা রমার দিকে—বললেন—you—you—you are also responsible for this. নিজের সর্বনাশ তুমি নিজে ডেকেছ! তাকে বিশ্বাস করেই শুধু আমি ঠকিনি—তোমাকে বিশ্বাস করেও আমি ঠকেছি।

স্ত্রী আবার প্রশ্ন করলেন—ওগো কি হল তাই বল?

—বলেছি তো। বজ্রাঘাত! রমেনের বাপ তার করেছে—বিয়ে হবে না হতে পারে না!

স্ত্রী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন—ও মা কি হবে!

কন্যা রমা স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইল—শুধু নত করলে চোখের দৃষ্টি।

ছোট মেয়ে উমা দশ বছরের মেয়ে—সে ছুটে বেরিয়ে গেল—জ্যাঠাইমা! অর্থাৎ ভুনির মা নলিনী দেবীর কাছে। আর্তনাদ করেই সে এসেছিল। নলিনী দেবী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কি হল রে? এই তো পনের মিনিটও হয় নি আমি এসেছি। এর মধ্যে—

—আপনি আসুন জ্যাঠাইমা। টেলিগ্রাম এসেছে। বিয়ে হবে না। বাবা পাগল হয়ে গেছেন। কি হবে জ্যাঠাইমা!

হাতের কাজ ফেলেই চললেন নলিনী দেবী। যাবার সময় ডেকে গেলেন—ভুনি!

ভূমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেও ঘণ্টাখানেক আগে বিয়ের জিনিসপত্র কিনে এনে ওদের বাড়ি তুলে দিয়ে এসে খেয়ে শুয়েছিল। দিনে সে ঘুমোয় না, একখানা বই পড়তে শুরু করেছিল—কিন্তু ক্লান্তির জন্যই ঘুমিয়ে পড়েছিল। উমার উচ্চকণ্ঠের জ্যাঠাইমা আহ্বানেই বোধ হয় ঘুম ভেঙেছিল কিন্তু ঘোর কাটে নি। কিন্তু মায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার চেতনা ও চৈতন্যের তার যেন সুরে বাঁধা আছে, ওই কণ্ঠের ডাকে তার চৈতন্যের তারে প্রতিধ্বনি উঠবেই। সে সাড়া দিলে—মা!

মা বললেন—একবার শিবেন ঠাকুরপোর বাড়ি আয়। উমা এসেছে। কি টেলিগ্রাম এসেছে—নাকি বিয়ে হবে না। শিবেন ঠাকুরপো চিৎকার করছেন।

* * * *

টেলিগ্রামখানা পড়েই ছিল বারান্দায়। নলিনী দেবী পড়ে দেখলেন। সংক্ষিপ্ত বার্তা —ম্যারেজ ক্যানসেল্‌ড্‌। রমেনস ফাদার।

নলিনী দেবী বললেন—কি হয়েছে তাতে?

—কি হয়েছে তাতে? পালটা প্রশ্ন করলেন শিবেনবাবু।

—হ্যাঁ। আজ তো আর লগ্নভঙ্গের দিন নেই।

—তা নেই। কিন্তু—। শিবেনবাবুও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু বলে যা বলতে গেলেন তা বলতে পারলেন না।

নলিনী দেবী বললেন—এতে আবার কিন্তু কিসের? বিয়ে যদি নাই হয়—হবে না। এমন অনেক বিয়ে ভাঙে। আবার অন্য পাত্রে বিয়ে হয়।

শিবেনবাবু বললেন—এ তো সব বিয়ের মত নয়, আপনি জানেন।

—জানি। ও'দের দুজনের ভালবেসে হচ্ছিল এ বিয়ে—তাও আজ এ দেশে তো কম হচ্ছে না। একসঙ্গে মেলামেশা পড়া—হতেই হবে। আবার ভালবেসে—দুদিন পর বিচ্ছেদ হয়; এও অনেক হচ্ছে। দুদিন দশদিন হয়তো বা দু' একবছর বিয়ে না করে থাকছে একজন—তারপর ভুলছে—বিয়ে হচ্ছে। এতে এত উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত নয়। তুমি নিজে অন্ততঃ নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে কর না।

—তা করি না। কিন্তু করা উচিত ছিল। আজ বুঝছি সেটা। আমি সাধারণ মানুষের অধম।

—না। এমন অধীর হয়ো না। গোটা বাড়িটাকে তুমি অস্থির করে তুলেছ। রমা কোথায় লুকিয়েছে। সুষমা কাঁদছে। উমা কি শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন শিবেন ভট্টাচার্য।—বউদি আপনি বুঝতে পারছেন না—কেন আমি এত অধীর অস্থির হয়েছি? ছি—ছি—ছি!

আশ্চর্য হয়ে গেলেন নলিনী দেবী। বললেন—কি? কি বলছ তুমি—

কথাটা শেষ করার মুহূর্তেই একটা নিষ্ঠুর সত্য যেন অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তের ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখার মত ঝলসে উঠল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে শিবেনবাবুর দিকে তাকালেন—তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন—তুমি বলছ—?

শিবেনবাবু ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ।

তারপরই আবার বলে উঠলেন—আমি—আমি—আমি এর জন্য রেসপনসিবল। ওঃ! তার কথায়বার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমার মেয়েকে আমি যোগ্য করে গড়তে পারি নি—তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। শয়তান রমেনের অসুখ করলে তাকে বাড়ি এনেছিলাম। রমাকে তার সেবার ভার দিয়েছিলাম।

নলিনী দেবী রমার মা সুষমাকে ডেকে নিয়ে ঘরের ভিতর গেলেন।

কথা সত্য। কুমারী রমা বিবাহের পূর্বেই আত্মদান করেছিল। তার অঙ্গে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

পিছনের ইতিহাস—তাঁদের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে। মা সন্দেহ করুন বা না করুন—আশংকা করেছিলেন। কিন্তু শিবেনবাবু তাঁকে ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মেয়ে রমা দৃঢ়স্বরে বলেছিল—আমার দায়িত্ব আমি জানি মা। আমাকে তুমি সাবধান করো না।

রমেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র অর্থবান পিতার সন্তান। পিতা ছিলেন সরকারী বিচার বিভাগের বড় চাকুরে—বিচারক। পেনসনের পূর্বেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসে কাশীবাস করেছিলেন; লোকাপবাদ—তিনি একটা উইলের কেসে প্রচুর টাকা—বোধ করি লক্ষাধিক—ঘুষ নিয়ে একপক্ষের পোষকতা করে কাগজপত্র পালটাবার সুযোগ দিয়েছিলেন—এবং চাকরি ছেড়ে ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। উকিল হিসেবেও তাঁর উপার্জন ছিল প্রচুর। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র ছেলে ওই রমেন। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সমাদর ছিল অনেক। রমেন ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক। ছেলেবেলায় পড়েছিল মিশনারী ইস্কুলে। তারপর কলকাতায় প্রেসিডেন্সীতে। তিন বছর আগে—যুদ্ধ শুরু হতেই লক্ষ্ণৌতে এসে ভরতি হয়েছিল। সেইখানেই আলাপ হয়েছিল শিবেনবাবুর সঙ্গে। মিশনারীদের কাগজে হিন্দু-ধর্মকে গাল দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে শিবেনবাবু তাদের সঙ্গে কলহ করে চাকরি ছেড়ে দিলেন যখন তখন এই ছেলেটি এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল—"ওই যে আপনি লিখেছেন—লেখক ঈশ্বরভক্ত ধর্মানুরাগী নন - ওটা তাঁর মুখোশ, ওর অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাংগ জাতির একজন বর্ণবিদ্বেষী দালালের ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু ব্যক্তির অস্তিত্ব হল আসল সত্য।"—বড় খাঁটি কথা লিখেছেন।

ওই কথাটিতেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন শিবেনবাবু। বলেছিলেন—আমার বাবা এদের কাজ করেছেন। সেকালে আমরা চিন্তায় ধারণায় সত্য বিশ্লেষণে অনেক পিছিয়ে ছিলাম। জ্ঞান সন্ন্যাসী সেজে প্রলাপ বকতে পারলেই সে ঈশ্বরজানিত সিদ্ধপুরুষ হত। আজও তার জের এদেশে আছে—দেখতে পাবে আঠা আর ছেঁড়া চুল শন পাট দিয়ে তৈরী করা ইয়া বিশ হাত লম্বা জটা তৈরি করে সাধুরা পথে ঘুরে বেড়ায়—ভক্তি পায় শ্রদ্ধা পায়। কেউ প্রশ্নও করে না—সাড়ে তিন হাত মানুষের মাথায় বিশ হাত জটাটা গজালো কি করে? ঘিউ আটা মুংকে দাল মিঠাই নিবেদন করে সাতপুরুষ আমাদের আজও কৃতার্থ হয়। এই সেদিন দেখলাম—জটাধারী এমনই একজন জটা নিংড়ে দুধ বের করছেন। বেটা ভিতরে সুকৌশলে একটা স্পঞ্জ পুরে রেখেছে। সেটা দুধে চুবিয়ে নেয়। কিন্তু তারা নিজের পেট ভরিয়ে সন্তুষ্ট, বড় জোর একটা আধটা টাকা নিয়ে ভাগে।

আর এরা মানবসেবাব্রতী সেজে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে—তাদের দেশের গবর্নমেন্টের এজেন্ট হয়ে। মানুষের সেবা অবশ্য করে, ইংরিজী লেখাপড়া শেখায়, জামা জুতো কোট পেণ্টালুন পরিয়ে সভ্য করে তোলে। বলে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিলাম। বাবার আমলে লোকে একে অকপট বলে বিশ্বাস করেছেন। আমিও করেছি। কিন্তু আজ সমাজতন্ত্রবাদ ওদের স্বরূপ ধরে দিয়েছে। ঈশ্বর নেই তা ঈশ্বরের সেবক! সাম্রাজ্যবাদীর এজেণ্ট—ওরা এসেছে মানুষকে ওদের জাতের নিজেদের অনুরাগী পুজো তৈরি করতে। ওরা হচ্ছে রাজমিস্ত্রী—ভিত গাড়ছে। যত ফাটল ধরছে ভিতে তত সিমেণ্ট ঢেলে মেরামত করছে। ওরা ভয়ানক। ওরা ফিফ্‌থ কলামিস্ট! স্নাইপ। ওপিয়ম স্মাগলার, স্মাগলার বলতে আপত্তি থাকে ডীলার বল।

রমেন উৎসাহিত হয়ে বলেছিল—আপনি লিখুন।

শিবেনবাবু বলেছিলেন—লিখব কিসে। ওদের হাত সুদীর্ঘ প্রসারিত। আমাদের সাধুদের জটা—আর এদের হাত। সমস্ত কাগজের আপিস পর্যন্ত পেঁছোয়। কোথাও ঘুষ দেয়—যেখানে ঘুষ চলে না সেখানে রাজসরকারের শক্তি নিয়ে ঘুঁষি চালায়। দরকার হলে গলা টিপে হত্যা করতেও পিছপাও নয়। একখানা কাগজ যদি পেতাম হাতে তবে দেখতাম।

দিন কয়েক পর রমেন এসেছিল। সেদিন প্রশ্ন করেছিল—কাগজ বের করতে কত টাকার দরকার হবে? একটা প্ল্যান আর এস্টিমেট করুন।

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিবেনবাবু বলেছিলেন—টাকা দেবে কে?

—সে যোগাড় করব আমরা।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন শিবেনবাবু। বলেছিলেন—ভেরি গুড। পরমুহূর্তেই বলেছিলেন—টাকা তো তামাশা নয়। তুমি ছাত্র। তুমি কোথায় পাবে টাকা?

—সে আপনি ভাববেন না। আমার বাবা বলেছেন—তিনি হাজার পাঁচেক টাকা দেবেন। লোকসান হলেও কিছু মনে করবেন না। তাঁর মক্কেলদের কাছ থেকেও কিছু কিছু টাকা তুলে দেবেন। বাবা নিজেও লিখবেন।

—কি করেন তোমার বাবা?

—আগে ছিলেন সাবজজ। কি হয়েছিল—চাকরি ছেড়ে হাইকোর্টে ওকালতি করতেন কলকাতায়; এখন রিটায়ার করেছেন—তবে লিগাল ওপিনিয়ন দেন। চলুন না একদিন কাশী। এখন তো কলকাতা ছেড়ে আমরা কাশীতে রয়েছি।

পরিচয় পেতে দেরি হয় নি। খ্যাতনামা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল; নামজাদা লোক। বোমার আতংকের সময় থেকে কাশীবাস করছেন—সপ্তাহে মক্কেলদের সুবিধার জন্য দুদিনের জন্য কলকাতায় যান।

শিবেনবাবু গিয়েছিলেন একদিন। মহেন্দ্র বোসের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হয়ে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ মিশনারীদের চেয়েও মহেন্দ্রবাবুর মুখের মুখোশ অনেকগুণে বেশী স্বাভাবিক—যাতে সেটাকে মুখোশ বলে ধরা যায় নি। অথবা চোখের দৃষ্টি তাঁর কাগজ বের করার মোহে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল—মহেন্দ্রবাবুর লোকাপবাদও মিথ্যা। কারণ মহেন্দ্রবাবুর কথায়বার্তায় বুদ্ধি ও যুক্তির দীপ্তিতেই শুধু তাঁকে ভাল লাগে নি—তাঁর সরলতার জন্যেও তাঁকে তাঁর ভাল লেগেছিল। গোড়াতেই তিনি বলেছিলেন—দেখুন, রমেনই আমার প্রকৃতপক্ষে এখন একমাত্র ছেলে। আমার প্রথম পক্ষের দুই ছেলে এক মেয়ে আছে, তারা চাকরি করে—পৃথক ভাবেই থাকে; তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক এখন নেই। তাদের যা দেবার দিয়ে দিয়েছি। পৃথিবী বড় বিচিত্র শিবেনবাবু, আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর—তারা—

একটু থেমে নিয়ে—বোধ হয় ভূমিকার প্রয়োজন অনুভব করেই সেটা করে নিয়েছিলেন—বলেছিলেন—দেখুন, সংসারে যারা সত্যকে রেখে ঢেকে কথা বলে আমি মশাই তাদের দলের নই। এমন কি ইজ্জত মর্যাদা ফ্যামিলি সিক্রেট ওসবের জন্যেও মিথ্যে আমি বলি নে। সাবজজ ছিলুম—আমার পেশকার-টেশকারেরা মিলে একটা উইলের কেসে ঘুষ খেলে—এবং আমি তাদের বিশ্বাস করতাম সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমার নামে গেল। গেল ঠিক নয়। তা হলে ইংরেজ গবর্নমেন্ট আমাকে ছাড়ত না—ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিত। লোকে আমার নামে চালালে। হাইকোর্ট কৈফিয়ত চাইলে। এমনটা হয় কি করে? আমি মশাই চিরকাল একটু একবগ্গা মানুষ—আমি রিজাইন দিলুম। এবং হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করলুম। প্র্যাক্‌টিস জমে গেল। বছরে লাখখানেক টাকা উপার্জন করতুম। সেটা দেড়লাখও কখনও

কখনও হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্সের রসিদ আছে।

তারপর স্ত্রী গেলেন মারা। তিনি বড় টারবুলেণ্ট ওয়াইফ ছিলেন। আই ওয়াজ নেভার হ্যাপি। তিনি মারা যান যখন, তখন আমি ফিফ্‌টি। স্বাস্থ্য ভাল—আজও দেখছেন। রোজ আজও তিন চার মাইল হাঁটি। এখন সেভেণ্টি আমি। সুতরাং ফিফ্‌টিতে কেমন ছিলাম বুঝতেই পারছেন। একা হয়ে গেলুম। বড় ছেলে ডেপুটি, ছোট এঞ্জিনীয়ার, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি—জামাই বিজনেস-ম্যান। দে ডিড নট কেয়ার ফর মি! বুঝেছেন!

এই সময় আমার সঙ্গে আলাপ হল যিনি আমার সেকেণ্ড ওয়াইফ—তাঁর সঙ্গে। একটি গার্লস স্কুল হয়েছিল আমাদের পাড়ায়—তিনি তাঁর হেডমিস্ট্রেস হয়ে এলেন—আমি ছিলাম সেক্রেটারি। তিনি আসতেন যেতেন, এণ্ড উই বিকেম ফ্রেণ্ডস। ইট ওয়াজ ইন দি ইয়ার নাইনটিন টোয়েণ্টি-টু। বালিগঞ্জের পত্তন সবে শুরু। একে আমাদের দেশ তার উপর বিশ বছর আগের কাল। তিনি আমার ওখানে এলে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দিতুম। আমিও তাঁর ওখানে চা খেতে গল্প করতে যেতুম। আমি মশাই সত্য গোপন করি নে। এর মধ্যে লাইফের একটা নতুন টেস্ট পেলুম। বুঝেছেন। জীবন কত সুখের হতে পারে। তবে ইট ওয়াজ ফ্রেণ্ডশিপ। কিন্তু লোকের রসনা মুখর হয়ে উঠল। এণ্ড ওয়ান ডে হঠাৎ আমার বড় পুত্রবধূ ছোট পুত্রবধূ এসে হাজির হলেন। কি? না—আমার কষ্ট হচ্ছে—তাঁরা সেবা করবেন। বুঝুন একই দিনে দু'জন। আমার সন্দেহ হল। বললুম না কিছু বটে, কিন্তু আমার মনীষার সঙ্গে মেলামেশা একবিন্দু কমালুম না। কেন কমাব? বলুন আপনি কেন কমাব? এতে যা হবার হল। অতঃপর পুত্রেরা এলেন। কলহ করলেন। জামাতা কন্যা এলেন, সারমন্ ঝাড়লেন। কিন্তু আমি মহেন্দ্র বোস। আমি মাথা খাড়া করে বললাম—দেখ সারমন্ আমি পছন্দ করি না। বড় ছেলে বললে—কিন্তু লোকের কথা কি কানে যায় না আপনার?

বললাম—যায়। কিন্তু কান দুটো যখন যথাস্থানে আছে তখন চিলে কান নিয়ে গেল কথাটা না শোনার জন্য কানে তুলো গুঁজে রাখি। শুনি নে।

তখন বললেন—আপনি কি চান না যে আপনার কন্যা পুত্রবধূ এরা আপনার কাছে থাকে?

আমি বললাম—ওদের থাকবার স্থান আপন আপন স্বামীর কাছে। তবে এখানে থাকতে চাইলে আপত্তি এখনও করিনি কখনই করব না।

—কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা এ বাড়িতে এমন করে এলে ওঁরা কি করে থাকতে পারেন?

বললাম—কেন থাকতে পারেন না বলতে পারি নে। উনি তো কারও রাইটের উপর এনক্রোচ করেন নি।

এবার বললে কি জানেন—বললে—আপনি মোহান্ধ—

আমি বললাম—ভেবে কথা বলাই ভাল। দ্বিতীয়বার বললে বলব—শাট্ আপ্। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু সে সো।

শেষ ক্লাইম্যাক্স শুনুন—দিন কয়েক পর—রাত্রে মনীষার বাড়ি থেকে ফিরে দেখি—ওঁরা পত্র লিখে রেখে যে যার যথাস্থানে চলে গেছেন। লিখে গেছেন—আপনার সঙ্গে সংস্রব রাখা সম্ভবপর হল না, আমরা চলে যাচ্ছি। তবে অসুখ-বিসুখ হলে সংবাদ দেবেন।

গুড। সেই ভাল। আমার নিমন্ত্রণ ছিল মনীষার বাড়ি। খেয়ে এসেছিলাম। তবে চিরদিনের অভ্যাস শোবার আগে এক গ্লাস পুরু দুধ খাওয়া। সেটা না খেলে ঘুম হয় না। শোবার ঘরে ঢাকা থাকে। খেয়ে শুয়ে পড়ি। মশাই ঘরে ঢুকে দেখি—দুধের গ্লাসটা উলটে পড়ে আছে এবং একটা বেড়াল—বাড়িতেই থাকত সেটা—সেটা মরে পড়ে আছে। অনেকদিন

বিচার বিভাগে কাজ করেছি, ওকালতি করি, মানুষ কি পারে আর কি না পারে আমি তা জানি। টু এণ্ড টু মেক ফোর। ঠিক তাই। ঠাকুরটা বললে—বহুমাজী দুধ জ্বাল দিয়ে রেখে গিয়েছেন। দরদটা বুঝুন। সম্পর্ক ছিঁড়ে চলে যাবার সময় আমার জন্যে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে রেখে গেছেন। ইচ্ছে হল দুধটা একবার পরীক্ষা করাই। কিন্তু ভাবলাম—থাক বেনিফিট অব ডাউটটা থাকা ভাল। কিন্তু আমি জানলাম—স্থির নিশ্চয় জানলাম। কেসটা কি দাঁড়াতো জানেন? দাঁড়াতো—ছেলে মেয়ে বউ নাতি চলে যাবার পর বিষ খেয়ে আমি লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

দেখুন—ভগবান-টগবান মানি নে। কিন্তু একটা শক্তিকে মানি। সেটা যেন সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে কাজ করে। সেটা সেদিন প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলাম। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মহেন্দ্র বোস নিবানো চুরোটটা ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন পরের দিন একটা হিসেব করলুম—আমার এসেটস কত। হিসেব করে—অর্ধেক টাকা এবং বাড়ি এগুলি নিজের রেখে অর্ধেককে ভাগ করে দুই ছেলেকে চেক কেটে পাঠিয়ে দিলুম। মেয়েকেও একটা চেক দিয়েছিলুম। লিখে দিয়েছিলুম—দিস ইজ অল। ইয়োর একাউণ্টস ক্লোজড। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে মনীষাকে বিবাহ করলুম। আমি এখন সুখী। হ্যাপি ম্যান। বুঝেছেন! পিছনের একাউণ্ট ক্লোজ করে দেওয়াই হল সুখী হবার একমাত্র পথ।

মহেন্দ্রবাবুর এই বিচিত্র সত্যবাদিতার মুখোশ আশ্চর্য নিখুঁত মনে হয়েছিল শিবেনবাবুর। একবিন্দু সন্দেহ হয় নি।

শিবেনবাবু বলেছিলেন—ইউ আর রিয়েলি এন আইডিয়াল মডার্ন ম্যান।

মহেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—ইয়েস। মহত্ত্ব-টহত্ত্ব বা ধর্ম-টর্ম আমি বুঝি নে—ওতে রুচি নেই। মডার্নইজম—ওইটেই আমার একমাত্র পছন্দ, এই যুগ মানেই মডার্ন টাইমস। আমি মডার্ন মানুষ। ছেলেকেও তাই করে গড়ে তুলেছি। তবে ওকে আমি আমার চেয়ে বড় করতে চাই। টাকা আমার আছে। শুধু উপার্জনক্ষম নয় ওকে পলিটিক্সে নামাব আমি। ও কাগজ বের করবে। গুড আইডিয়া। কাগজ নইলে পলিটিক্স হয় না। আপনার লেখা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি সম্পাদক হয়ে কাগজ বের করুন। রমেনের পড়াটা শেষ হোক তারপর নাম দেওয়া যাবে। আমি পাঁচ হাজার দিচ্ছি, মক্কেলদের পাকড়ালে আরও পাঁচ দশ হাজার পাওয়া যাবে। লেগে পড়ুন আপনি। আপনি মাসে এখন দেড়শো করে নেবেন। না হয় দুশো!

মনীষা দেবীকে খুব ভাল লাগে নি শিবেনবাবুর। ভদ্রমহিলা যেন একটু বেশী নাক-উঁচু। এবং স্বভাবে আচারে আচরণে আজও স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। খবরদারি করছেনই। শিবেনবাবুকে এমনই জেরা শুরু করেছিলেন যে, শিবেনবাবুর মনে হয়েছিল তিনি যেন নতুন ছাত্র, স্কুলে এডমিশন নিতে এসেছেন এবং মনীষা দেবী তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন। তবে ছেলে রমেন সম্পর্কে অত্যন্ত কোমল এবং গৌরবান্বিত। বলেছিলেন—ওকে আমি আইডিয়াল মানুষ করবার উপযোগী ব্যবস্থায় গড়ে তুলেছি। ও যখন একমাসের হল তখন নানান রঙের বেলুন ঝুলিয়ে রেখে শুইয়ে রাখতাম। রঙ চেনাবার জন্য। কখনও কোন ইচ্ছে সাধ্যমত অপূর্ণ রাখি নি। এত জিনিস নষ্ট করেছে। কিন্তু সে তো নষ্ট নয়—তা থেকে ও শিখেছে। একবার দার্জিলিংয়ে হোটেলে ছিলাম। আমি সেলাইয়ের কাজ করছিলাম। কাঁচি সুতো ছুঁচ পড়ে ছিল। দরজায় একটা সুন্দর পর্দা ঝুলছিল। ও ধরলে—ওইটে ও কাঁচি দিয়ে কাটবে। প্রথমটা বোঝালাম কিন্তু কিছুতেই শুনবে না; তখন হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে বললাম—পর্দাটার যা দাম—নিন, ওটা ও কাটবে। ভদ্রলোক একটু ভালু—হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে মুখচ্ছবি মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়।

হেসেই ফেলেছিলেন মনীষা দেবী। তারপর ও কথাটা ছেড়ে বলেছিলেন—কাগজ খুব ভাল আইডিয়া। খুব ভাল। খুব স্ট্রংলি লিখুন। ওই মিশনারীগুলো—হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাণ্ডা—মৌলভী মোল্লা কংগ্রেস—ইওরোপ—রাশিয়া—জার্মানী—জাপান—কাউকে রেয়াত করবেন না। ইংরেজ সম্পর্কে একটু রেখে চলবেন—খোঁচা খাওয়া বুড়ো সিংহ-বুঝেছেন না! মধ্যে মধ্যে রমেনকে দিয়ে লেখাবেন। আরম্ভ করুন।

মহেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—লেখার অভাব হবে না। আমি লেখা পাঠাব। মনীষাও লিখবেন। আরম্ভ করুন।

ওই কাগজ থেকে সূত্রপাত। মহোৎসাহে কাগজ আরম্ভ করেছিলেন শিবেনবাবু। রমা তখন আই. এ. পাস করে বি. এ. তে ভরতি হয়েছে। ওকেও উনি কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রুফ দেখতে শিখিয়ে নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিয়েছিলেন। প্রথম বিনা বেতনেই। রমেনই দেখে বলেছিল—সে কি—উনি যখন কাজ করবেন তখন মাইনে নেবেন না কেন? চল্লিশ টাকা বেতন স্থির হয়েছিল। বিকেলবেলা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত কাজ করত রমা। রমেন আসত। সে পড়ে যেত রমা প্রুফ করেকশন করত। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রীতির সম্পর্ক।

তারপর হঠাৎ একবার রমেনের হল জ্বর। প্রায় দশ দিন একনাগাড়ে জ্বর ছাড়ে নি। তিনদিনের দিন শিবেনবাবু তাকে নিজের বাড়ি এনে রেখেছিলেন এবং রমা করেছিল সেবা। উমা তখনই দেখেছিল—এবং মাকে বলেছিল—দিদি রমেনবাবুর কপালের উপর মুখ রেখে কথা বলে।

সুষমা রমাকে সাবধান করেছিলেন। রমা বলেছিল—আমার দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট আছে মা। সাবধান আমাকে নাই বা করলে। আমি তোমাদের সেকালের মেয়ে নই; ঘোমটা দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলিনে।

সুষমা শিবেনবাবুকে কিছু বলতে সাহস করেন নি। কিন্তু একদিন আর উপায় রইল না। একদিন শুনলেন—মেয়ে রমেনের সঙ্গে ঝগড়া করছে। কাঁদছে।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে যা শুনলেন তাতে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। স্বামীকে না বলে পারলেন না।

শিবেনবাবু রমেনকে ডাকলেন। রমেন একলা এল না, রমা এবং সে দুজনে এল। প্রণাম করে বললে—তারা দুজনে দুজনকে ভালবাসে -বিয়ের অনুমতি চায়।

খুশী হয়ে শিবেনবাবু আশীর্বাদ করলেন। বললেন—তাহলে আমি তোমার বাবার কাছে যাই! বা তাঁকে লিখি!

রমেন বললে—না। ও ভারটা আমার উপর রইল। আমার মাকে জানেন না। আপনি গেলেই বলবেন—না। খুব রূঢ়ভাবে বলবেন। এবং হয়তো এমন বেঁকে বসবেন যে গণ্ডগোল বেধে যাবে। ও পারি আমি। আমি যথাসময়ে ওঁদের বলব।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—সমস্ত প্রগ্রেসিভ আইডিয়া সত্ত্বেও দেশের একটা প্রভাব আছে তো! তাঁরা মেয়ে পছন্দ করবেন। তারপর আমাকে বলবেন—তুই দেখে আয়। মা আগে ব্রাহ্ম ছিলেন এখন তো তা নেই। বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো করেন। বিশ্বনাথের মন্দিরে যান না তবে পঞ্জিকা কেনেন। মঘা অশ্লেষা কবে দেখে রাখেন। ওটা আমি বলব।

কথাটায় অবিশ্বাসের কিছু ছিল না, বিশ্বাস করেছিলেন শিবেনবাবু। বিয়ের দিন স্থির করে এসেছিলেন এলাহাবাদে। স্থির করেছিলেন এলাহাবাদ থেকেই বিয়ে দেবেন। প্রতিবেশী ভুনিদের ভরসা করতেন—বিশেষ করে নলিনী দেবীর।

রমেন কাশী চলে গিয়েছিল মাত্র তিন দিন আগে। শেষ সে বলেছিল বিয়ে করে রমাকে

নিয়ে সে যাবে। তারপর তিন দিন আগে বলেছিল—না, সেটা বড় খারাপ হবে। আমি যাই। ও'দের বলে—মত করে বিয়ের দিন সকালের ট্রেনে বাবা মা আমি এসে পে'ছিুব। নিশ্চিন্ত থাকবেন।

শিবেনবাবুর মনে পড়েছিল—দার্জিলিংয়ের হোটেলে বালক রমেন দরজার পর্দা কাটতে আবদার ধরেছিল—সে আবদার মনীষা দেবী উপেক্ষা করেন নি।

বিয়ের ব্যাপারটা তার থেকে গুরুতর বলে তিনি মনে করতে পারেন নি। বিশেষ করে যাঁরা ছেলের কথায় পাঁচ হাজার টাকা বের করে দিয়েছেন কাগজ বের করতে। এবং কাগজে মহেন্দ্রবাবু ও মনীষা দেবীর যে সব লেখা তিনি ছেপেছেন তাও তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল।

হঠাৎ কাল বিকেলে এসেছিল টেলিগ্রাম। বিহ্বল হয়ে গেল গোটা পরিবারটি।

উন্মত্তের মতই অধীর হয়ে উঠেছিলেন শিবেনবাবু। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—তাকে খুন করতে না পারি নিজেকে খুন করব আমি। তার আগে খুন করব মেয়েকে।

ভুনির মা নলিনী দেবী সুষমার কাছে সব জেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ শান্তভাবেই বলেছিলেন—আপনি এসব কি বলছেন পাগলের মত ?

—পাগলই তো হয়েছি—পাগলের মত কেন বলছেন ?

—না। থামুন একটু। শেষ পর্যন্ত লড়তে দিন।

—কি লড়বেন ? কার সঙ্গে ? বাতাসের সঙ্গে ?

—না। ভুনি যাক -এই চারটেতেই চলে যাক কাশী। ও'দের সঙ্গে কথা বলে আসুক। দরকার হয় এর জন্য কোর্ট পর্যন্ত যাব আমরা। দেশে আইন আছে। প্রতারণার জন্য শাস্তি আছে।

—তাতে আমার কি লাভ ? ওই হতভাগীর কি লাভ ? ওর সন্তান -

নলিনী বলেছিলেন—তারই মধ্যেই রমার সন্তানের পিতৃপরিচয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। আপনি তাকে পালন করবেন—আপনার দৌহিত্র বলে। সত্যকাম জাবাল যদি জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে—ঋষি গৌতম যদি তাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করে থাকেন—তবে আপনি মাতামহ আপনি তার জন্যে লজ্জিত হবেন কেন ? রমা চাকরি করবে। এরই মধ্যে তার বিবাহ হয়ে গেছে।

শান্ত হয়েছিলেন শিবেনবাবু।—বেশ, তাই দেখুন।

ভুনি এবং দুনি দুই ভাই কাল চারটেতে কাশী গিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কাশীর বাড়িতে তাঁরা কেউ নেই। খবর যা নিয়ে এসেছে তা আরও মর্মান্তিক। কালই তাঁরা ছেলেকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। কলকাতায় রমেনের বিয়ে হবে আজই। এবং এ বিবাহে রমেনের আগ্রহই অধিক। রাত্রি দশটায় পে'ছে বাড়ির চাকরের কাছে খবর সংগ্রহ করে ভুনি। রমেনের বিয়ের কথা বাপ-মায়ে আগে থেকেই চালাচ্ছিলেন কলকাতায়। প্রায় ঠিক হয়েই ছিল। বিয়ে সেখানেই। রমেন বিয়ে করেই ওখান থেকেই বাইরে চলে যাবে। কোথায় যাবে তা চাকর জানে না তবে সুযোগ পেলেই বিলেত যাবে ব্যারিস্টারি পড়তে। মেয়ে বড়লোকের মেয়ে—টাকা অনেক পাবে। রমেন বলেছিল—বিয়ে যদি তিনদিনের দিন হয় তবেই হবে—নইলে শিবেনবাবুরা তাকে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। ওরা জাল পেতে ওকে আটকেছে।

সারারাত্রিটা গোটা পরিবারটি জেগেই ছিল। নলিনী দেবী বসেছিলেন রমাকে নিয়ে। শিবেনবাবু পায়চারি করেছেন আর মধ্যে মধ্যে ইংরিজী উর্দু বাংলা সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

ভুনি খবর নিয়ে এলাহাবাদ ফিরেছে কিন্তু দুনিকে সে কলকাতায় পাঠিয়ে এসেছে। সেখানে শেষ চেষ্টা করবে দুনি।

ভুনি বাড়ি ফিরে খবরটা দিয়েই ছুটেছিল স্টেশনে। অজয় আসছে। গাড়ি ছিল তিন ঘণ্টা লেট।

নলিনী দেবী বসেই ছিলেন, নড়েন নি। খবর পাবার পর আবার শিবেনবাবু জ্বলে উঠেছিলেন। পাগলের মত উন্মত্ত ক্রোধে নিজের জুতোটা নিয়ে নিজের মাথায় মুখে বার বার আঘাত করেছিলেন।

নলিনী দেবী বলেছিলেন একটা পথ আছে ঠাকুরপো!

—পথ? হেসে উঠেছিলেন শিবেনবাবু। বলেছিলেন—হ্যাঁ আছে। পথ আছে জাহান্নমের। আর কোন পথ নেই।

—আছে। আমার ভুনির সঙ্গে দেবেন বিয়ে রমার?

—ভুনির সঙ্গে? আপনি দেবেন?

—দেব। আসুক ভুনি, সে স্টেশনে গেছে। সে আমার কথা কখনও অমান্য করবে না।

শিবেনবাবু অকস্মাৎ তাঁর পা দুটো চেপে ধরে বলেছিলেন—আপনি দেবী!

রমা সেখান থেকে উঠে উপরে চলে গিয়েছিল। কেউ কোন সন্দেহ করেন নি। সকলেই ভেবেছিলেন—স্বস্তিতে শ্বাসরোধী দুঃস্বপ্নের অবসানে সে উপরে গিয়েছে—হয়তো একটু কাঁদবে। প্রাণভরে সকালের বাতাসে নিশ্বাস নেবে। কিন্তু তা নয়, রমা আত্মগ্লানিতে লজ্জায় ঘৃণায় মরে যাচ্ছিল। তার উপর এই অনুগ্রহ তার সম্মুখে একটা বিভীষিকার মত হয়ে উঠেছিল। ভুনিদা! তার সামনে এই লজ্জার বোঝা নিয়ে দাঁড়াবে কি করে? একদিন নয় সারাজীবন।

না। সে তা পারবে না। চোখে পড়েছিল ছোট কেরোসিনের টিনটা। ঘরের কোণে ছিল দেশলাই। মুহূর্তে সে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। একটা নাম তার মনে পড়েছিল। স্নেহলতা।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে শিবেনবাবুর বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। বাঙালীরা তো এসেই ছিলেন—এলাহাবাদের হিন্দীভাষী লোকেরা বহুজন এসেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম মমতা তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল পণপ্রথার উপর কঠোর বিরূপতা। কথাটা তাই প্রথম প্রচারিত হয়েছিল, শিবেনবাবুর মেয়ের বিয়ে টাকার জন্য ভেঙে গেছে; বিবাহের দিনে ভেঙে গেছে—মেয়ে স্নেহলতার মত সমাজকে অভিসম্পাত দিয়ে পুড়ে মরেছে। দু-তিনজন বিশিষ্ট বাঙালী গাড়ি থেকে বলতে বলতেই নামলেন—এ কি কথা? ব্যাপারটা আমাদের জানানো উচিত ছিল। কত টাকা চেয়েছিলেন? আমরা তুলে দিতাম টাকা!

একজন বললেন—বিয়ের দিনে বেশী টাকা চেয়ে বিয়ে ভেঙে দেওয়া এ তো ব্রিচ অব কণ্ট্রাক্ট!

কয়েকজন প্রৌঢ় সহৃদয়ের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন সমস্বরে বললেন—পিশাচ! লোকটা পিশাচ!

বাড়িটা কিন্তু নীরব স্তব্ধ। সমস্ত বাক্য সমস্ত আবেগ যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। শিবেনবাবু মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে আছেন। মাথা তুলবারও শক্তি নেই। ভুনি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ভিতরে দগ্ধদেহ মৃতা কন্যার পাশে আর একটি মুমূর্ষুর মত পড়ে আছেন তার মা—তাঁর পাশে বসে আছেন ভুনির মা, শুধু অঝোরঝরে কাঁদছে উমা, শিবেন-বাবুর ছোট কন্যা—এগারো-বারো বছরের মেয়েটি। সে কাঁদছে কিন্তু সে কান্নায় কোন রব নেই ভাষা নেই।

বাইরের জনতারও অধিকাংশই নীরব। ওই দু-চারজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কিছু তরুণ যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছে—বলছে—আমরা দল বেঁধে যাব কাশী। দেখব সে কেমন জজসাহেব! বেটাচ্ছেলে বিচারক!

এরই মধ্যে এসে দাঁড়াল পুলিসের গাড়ি। পুলিস এসেছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু, পোস্টমর্টেম—তদন্ত–অনেক হাঙ্গামা! এইটেই আইন; শুধু এদেশের আইন নয়—সব দেশের আইন। কিন্তু যেখানে আইন আছে সেখানেই মকুব আছে। পুলিসের কাছে এগিয়ে গেলেন—এলাহাবাদের বিশিষ্ট বাঙালী, এককালে হাইকোর্টের জজ ছিলেন।

কয়েক মিনিট কথা বলেই তিনি সরে এলেন—মাথা হেঁট করে এসে সঙ্গীদের বললেন—আমি চললাম নগেনবাবু।

—চললেন?

—হ্যাঁ, শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না।

—পুলিস—

—হ্যাঁ বললাম তো! তবে—। আর কিছু না বলে তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

—কি ব্যাপার?

ব্যাপারটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। যে ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল—যিনি মেয়েটির অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন–তিনি পুলিসকে ফোন করে জানিয়েছেন—কন্যাটি সন্তানসম্ভবা ছিল।

দেখতে দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ার চেহারাটা দেখতে দেখতে পালটে গেল—ঠিক বলতে গেলে উলটে গেল বলতে হয়। প্রবীণেরা অধিকাংশই নিঃশব্দে চলে গেলেন। দু-চারজন মৃদুস্বরে ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করে গেলেন—রাম! রাম! রাম! ছিঃ! ছি-ছি-ছি!

একজন বৃদ্ধ শুধু বলে গেলেন—বাঃ, ভট্টাচার্য বংশের কন্যার চমৎকার পরিণাম!

আর একজন বললেন–অনেক দিন—অনেক দিন আগে থেকে আমি জানতাম। বলেছিলাম শিবেনের বাপকে।

একজন তরুণের অসহ্য হয়ে উঠেছিল বোধ হয়। সে এসে বললে—কি বলছেন এসব?

বৃদ্ধ ঘৃণার সঙ্গে বললেন–বলছি, ইওরোপের এঁটো খেয়ে সাহেব সেজে যারা জাত খোয়ায় তাদের ঘরে এমনই হয়!

ছেলেটিও রূঢ়স্বরে বললে—আপনি অত্যন্ত হৃদয়হীন।

—তা হবে। তোমরা তরুণ, তোমাদের হৃদয় সমুদ্রের মত উথলাচ্ছে। ওই কন্যাটির এই যে দশা—এও—ওই কোন এক তরুণ হৃদয়ের উথলানোর ফল বাবা। তার থেকে হৃদয়-হীন হওয়া ভাল।

—একজন খারাপ বলে সকলকে এভাবে কথা বলতে পারেন না।

—তা অন্যায় বটে। এ কথাটা সত্য—নিশ্চয় সত্য। কারণ আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাবা যে ছেলেটি এর জন্যে দায়ী সে খারাপ বটে তো?

—সে কে না বলবে? তাকে পেলে তার শাস্তি দিতাম আমরা।

—যে কারণে তুমি ছেলেটির নিন্দা করছ, সে কারণে আমি মেয়েটির নিন্দা করছি। এবং মেয়েটিকে এইভাবে যারা মানুষ করেছে তাদের নিন্দা করছি। এতে তুমি হৃদয়হীন বলে আমাকে খেঁকিয়ে তেড়ে এলে কেন?

—না, মারতে উনি আপনাকে যান নি। আপনার প্রতিবাদ করেছেন–ঠিকই করেছেন।

কারণ যে ছেলেটি এর জন্য দায়ী সে কাপুরুষ—সে পলাতক। মেয়েটি এ লজ্জা ঢাকবার জন্য গৃহত্যাগ করতে পারত, খারাপ জীবন জীবিকা গ্রহণ করতে পারত কিন্তু তা সে করে নি—না করে নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুড়ে মরেছে।—অজয় দাঁড়িয়েছিল ভুনির পাশে—সে এবার এগিয়ে বৃদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে কথা ক'টি বললে।

বৃদ্ধ এবার অবাক্ হয়ে এই নতুন ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভুনি ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল এবং অজয়ের হাত ধরে বললে—তর্ক করে না অজয়। এখন নানান জনে নানান কথা বলবেন। তা ছাড়া উনি বৃদ্ধ লোক। তুমি জান না—ওঁর মতামত হয়তো সেকেলে কিন্তু উনি সৎ লোক, সত্যবাদী মানুষ। পণ্ডিত মানুষ। সংস্কৃতে মস্ত পণ্ডিত।

অজয়কে সে সরিয়ে আনবার জন্য টানলে। কিন্তু বৃদ্ধ ছাড়লেন না, অজয়ের অন্য হাতখানা চেপে ধরে বললেন—দাঁড়াও।

ভুনি বললে—থাক মুখুজ্জে মশাই—ছেলেমানুষের সঙ্গে কি তর্ক আপনার সাজে! এস অজয়!

—না। ও ছেলেমানুষের মত কথা বলে নি। আমাকে ও যা বলেছে তা খাঁটি সত্য এবং আমি স্বীকার করছি—কথাটা ঠিক ভাবতে পারি নি আমি। ঠিক বলেছে—অন্যায় না-করা সব থেকে বড় কথা। কিন্তু ভ্রমবশতঃ অন্যায় করে যে অন্যায় সংশোধন করতে প্রাণ দেওয়া তার থেকে ছোট কথা নয়। শাস্ত্রে সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে—তার মূল্য দিই আমরা রৌপ্য কাঞ্চনে কিন্তু প্রাণের মূল্য দিয়ে এ প্রায়শ্চিত্ত এ তো ভগবানের পায়ে ঢেলে দেওয়া গো! ঠিক কথা বলেছে ও! ওকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

অজয় বললে—বলুন।

—এ তো ওর কথা গেল। মানলাম। কিন্তু ওর শিক্ষা ওর বাপ-মায়ের দায়িত্ব? তা কি ওর প্রাণের মূল্য কমে গেছে—মুছে গেছে? এই শিবেন ভটচাজ—কৃশ্চানদের চাকরি করত—আমাদের সমাজকে ঘৃণা করত ব্যঙ্গ করত; মেয়েদের মেমসাহেব করে তৈরি করছিল—তার ফল এই পরিণতি—তার দায়টা কোথায় যাবে বল? তোমাকে আমি ঠিক চিনি না। এখানকার ছেলে কিনা সঠিক জানি না। এখানকার ছেলে হলে তোমার জানা উচিত যে, এ নিয়ে আমাদের বাঙালী সমাজে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ওঁরা কান দেন নি। ব্যঙ্গ করেছেন উলটে। ঘৃণা করেছেন।

অজয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি তো আশ্চর্য নিষ্ঠুর! এবং নিষ্ঠুরতা যুক্তিতর্কের আবরণের মধ্যে দিয়ে ন্যায়বাদীর মুখোশ পরে উপস্থিত করার নৈপুণ্য তো অসাধারণ! ভুনিদা মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে সে বোধ হয় ঠিক এমনিভাবেই নিষ্ঠুর কথা বলত তাঁকে।

অজয়কে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধ মুখুজ্জে বললেন—কথার জবাব দাও। দেওয়া উচিত তোমার। ওই মেয়েটি সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা আমি যখন আমার অন্যায় বলে স্বীকার করেছি—তখন এই বাপ-মার দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের অন্যায় হয়েছে কিনা সেটা তোমাকে বলতে হবে।

প্রথম ছেলেটি—যে প্রথম প্রতিবাদ করেছিল—সে বললে—অন্যায় হয়তো বটে কিন্তু সে নিয়ে এই সময়ে—

বাধা দিয়ে মুখুজ্জে বললেন—তুমি থাম বাপু। আমি ওকে বলছি!

অজয় বললে—আমি তো উত্তর দিয়েছি—নতুন করে কি দেব?

—মানে?

—মানে—ওই মেয়েটি যদি তার বাপ-মায়ের শিক্ষা এবং পড়াশোনার শিক্ষার ফলেই এ ভ্রম করে থাকে—এই যদি আপনার যুক্তি হয় তবে সেই শিক্ষাতেই তো সে প্রাণ দিয়ে ভ্রম অন্যায় সংশোধন করতে হয় এই শিক্ষাও পেয়েছিল। তাঁরা হয়তো বিবাহের পূর্বে প্রেম হওয়াটা অন্যায় ভাবেন নি। মিশতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁরা কোন অন্যায় করতে উৎসাহিত করেন নি। বা সেটা অন্যায় নয় এমন বলেন নি বা শিক্ষা দেন নি। দিলে সে অন্যায় প্রাণ দিয়ে সংশোধন করার কথা সে ভাবত না – এবং এমনটা ঘটত না।

মুখুজ্জে বললেন – ভাল। আমার বলবার কিছু নেই। যুক্তিতর্ক তুমি অকাট্যই দিয়েছ। কিন্তু সেটা শুধু যুক্তিই। মন থেকে বুকে হাত দিয়ে কথাটা বললে না।

শিবেন ভটচাজ হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেন—আমি স্বীকার করছি। চিৎকার করে স্বীকার করছি – অন্যায় আমার—হাজারবার আমার লক্ষবার আমার! আমি অপরাধী! হয়েছে মুখুজ্জে মশাই?

—অপরাধী তুমি পাঁচ লক্ষবার ভটচাজ। কিন্তু সেটা ওইভাবে রাগ করে স্বীকার না করলেই পারতে। ওতে অপরাধের স্খালন হয় না, হয়ও নি, অপরাধের ফল তুমি পেয়েছ বজ্রাঘাতের মত। আমি ক্রোধ করে বলি নি। মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েই বলছি। এমন একটি মেয়ে – !

একটু আবেগ যেন তাঁকে বিচলিত করলে – তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন —দেখ, মনে করে দেখ, তোমার বাবার সঙ্গে মতবিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুত্ব ছিল। আসতাম তোমাদের বাসায়—ওই মেয়ে ফ্রক পরে এসে আমাদের কাছে বসত। বকবক করে বকত। নিজের নাতনীর মতই মায়া ছিল হে! তারপর তুমি হলে সাহেব। তোমার বাবা শুরু করেছিলেন কৃশ্চানদের চাকরি নিয়ে—তুমি তা পূর্ণ করলে। তোমার বাবা দুঃখ করতেন— বলতে কিছু পারতেন না। আমি তোমাদের সংস্রব ছাড়লাম। রমার ওপর মায়া ছিল আমার। দুঃখ পেয়েই বলছি।

ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার। দুটি জলধারা নেমে এল দুই চোখের কোণ থেকে। চাদরের খুঁটে চোখের কোণ মুছে তিনি অগ্রসর হলেন; হঠাৎ থেমে বললেন – ভুনি, তুমি একবার আমার সঙ্গে এস। আমি পুলিস সাহেবের কাছে গিয়ে দেখি। আমার কাছে সংস্কৃত পড়েছিল—ত্রিপাঠী। পোস্টমর্টেমটা না করেই যাতে সৎকারের অনুমতি দেয়! কোন চিঠিপত্র লিখে রেখে যায় নি?

—গেছে। আমার কাছেই আছে।

—এস সেইটে নিয়ে এস।

চিঠি একখানা লিখে গিয়েছিল রমা। সেটা ওই ঘরেই কুলুঙ্গিতে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল। লিখে গিয়েছিল—আমি আত্মহত্যা করছি। আমার পাপ আমার। ভুনিদার মা আমার পাপ ভুনিদাকে নিতে বলছেন – ভুনিদা হাসিমুখে নেবেন তা জানি। কিন্তু আমি? আমি কোন্ মুখে—কোন্ দাবিতে ভুনিদার মুখের পানে মুখ তুলে চাইব? মৃত্যু ছাড়া আমার পাপ থেকে লজ্জা থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। ঘরে কেরোসিনের টিন রয়েছে—দেশলাই রয়েছে। এছাড়া মৃত্যুর উপায় নেই। আমি পুড়ে মরছি। আমার পাপ পুড়ে ছাই হোক।

রমা।

* * * *

বৃদ্ধ মুখুজ্জে এলাহাবাদের প্রবীণতম বাঙালীদের একজন। দেশের টোলে কাব্যতীর্থ উপাধি নিয়েও যজমানজীবী পুরোহিত হয়ে এসেছিলেন এখানে। এখানে এসে এই

একরোখা বদমেজাজী মানুষটি একে একে এণ্ট্রান্স, এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। কিন্তু যজমানসেবা পৌরোহিত্য ছাড়েন নি। এর কারণ মুখুজ্জেমশায়ের বিচিত্র চরিত্র। এখানে যখন প্রথম আসেন তখন এখানকার বাঙালীরা ঘোরতর ইংরেজীনবীশ। তাঁদের সমাজে ক্রিয়াকর্মে তিনি অপরিহার্য হলেও - তাঁর স্থান বা মর্যাদা বিবাহ অন্নপ্রাশনে ব্যাণ্ড-রোশনচৌকি-স্বর্ণকার-হালুইকরদের সমপর্যায়-ভুক্ত ছিল—তার থেকে বেশী কিছু ছিল না। একবার একজন তাঁকে বলেছিলেন—শোন পণ্ডিত, ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়া—সে ওয়েলারই হোক আর দেশীই হোক—আসলে এক—ভাড়াটে ঘোড়া। বকো না বেশী।

কারণ ছিল এই। ভদ্রলোক বড় সরকারে চাকরে—মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন এক বিলেত-ফেরত পাত্রের সঙ্গে।

মুখুজ্জে প্রশ্ন করেছিলেন—পাত্র প্রায়শ্চিত্ত করেছে তো?

ঘটনাটা ১৯১১।১২ সালের। ভদ্রলোক বলেছিলেন—তুমি দক্ষিণে নেবে, বিবাহে মন্ত্র পড়াবে—এসব খবরে দরকার কি?

মুখুজ্জে বলেছিলেন—আজ্ঞে না, ওই রকম অর্থলোভে পৌরোহিত্য আমি করি না। করব না।

সরকারী চাকরেটি ক্রুদ্ধ হয়ে ওই কথা বলেছিলেন। এবং আরও বলেছিলেন—অনুস্বার বিসর্গ লাগিয়ে—আবোলতাবোল অং বং লং আউড়ে—দেশে গামছায় চাল কলা মণ্ডা আর দু আনা চার আনা দক্ষিণে নিয়ে বাঁচতে গিয়েও বাঁচতে পার নি। পেটের দায়ে এখানে এসেছ। তা এখানে এসে ওসব বামনাই ফলাতে যেয়ো না মরবে।

মুখুজ্জে বলেছিলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি এ বিবাহেও পৌরোহিত্য করব না এবং আপনার বাড়িতে কোনদিনই কোন প্রয়োজনে যাব না। মানে পুরোহিত হিসেবেও না ভিক্ষে করতেও না।

সেই বিবাহেই হারাণ ভটচাজ এলাহাবাদের ইঙ্গবঙ্গ হিন্দু সমাজের পুরোহিত হলেন। তিনি মিশনারীদের কাজ করতেন, অনুবাদের কাজ এবং সংস্কৃত শেখাতেন দু'জন পাদরীকে। এবার হিন্দু সমাজের বর্ধিষ্ণু সমাজে তিনি পুরোহিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজও তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালে।

মুখুজ্জে হারাণ ভটচাজ থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন, দু'জনের মধ্যে প্রীতি না-থাকাও ছিল না, কিন্তু মুখুজ্জে সেদিন নিজে ভটচাজের বাড়ি গিয়ে বলে এসেছিলেন—ভটচাজ, তোমাকে দাদা বলি, কৃশ্চানদের অনুবাদের কাজ করছিলে—পাদরীদের সংস্কৃত শেখাচ্ছিলে—চাকরি করছিলে। কিন্তু পৌরোহিত্য হল কুলধর্ম। ওই সব অর্ধম্লেচ্ছদের পুরোহিত হবে তুমি? পাপ তোমার ঘাড়ে চাপবে। বলে দিলাম।

এরপর মুখুজ্জে বি-এ পাস করে সংস্কৃতের লেকচারার হয়েছিলেন, সরকারী চাকরেদের সঙ্গে সাধারণ সভা-সমিতিতে একসঙ্গে উঠেছেন বসেছেন এবং ক্রমান্বয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়, কোন সামাজিক ব্যাপারে নিজের গোঁড়া হিন্দুত্ব ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বজায় রেখে তাঁদের অবজ্ঞাই করে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে-মাঝে হারাণ ভটচাজকে সাবধানও করেছেন।—হারাণদা সাবধান! হারাণ ভটচাজের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেন নি, যেতেন। এবং ওই কটু সাবধানবাক্য উচ্চারণ করতেন। হারাণ ভটচাজ বড় সহিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি হাসতেন। ওই নাতনী রমাকে নিতান্ত বালিকা বয়সে কোলেও করেছেন আবার ইংরেজ বাচ্চা মেয়েদের মত চুল ছাঁটা দেখে বলেছেন—ভটচাজ বাড়ির জাতটা হারাণদা খোয়ালে চার আনা—শিবেনের মতিগতি যা দেখছি—ও ঘোচাবে আট আনা, বাকী বাড়ির ভেতরের চার

আনা—সে দেখছি তুই ঘোচাবি রমা।

হারাণ ভটচাজের মৃত্যুর পর শিবেনের সঙ্গেও তাঁর মনান্তর হয়েছিল। তিনি শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করেন নি এবং এদের বাড়ি এসেও না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন।

বাঙালী সমাজে এর জন্যে তাঁর অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল—ব্যাখ্যাও হয়েছিল বিবিধ প্রকারের। তার মধ্যে হারাণ ভটচাজ যে একদা তাঁর যজমানের সমৃদ্ধতম গোষ্ঠী কেড়ে নিয়েছিলেন এ কথাও ছিল।

কথাটা মুখুজ্জের কানেও পেঁচৌছিল। তিনি বলেছিলেন—তার মুখ আছে জিভ আছে—বলেছে বলতে পারে বইকি। কিন্তু শিবেনকে বলো—আমি পৌরোহিত্য করি সত্য কিন্তু দক্ষিণে আমার বাঁধা—এক মুদ্রার বেশী নয়। দরিদ্র যজমানের ক্ষেত্রে তাই আবার আশীর্বাদী দিয়ে আসি আমি। সুতরাং জজ বল ব্যারিস্টার বল—ডাক্তার বল উকিল বল—যজমান হাতছাড়া হয়ে ক্ষতি খুব হয় নি আমার।

সেই মুখুজ্জে আজ রমার এই কলঙ্ক-রটানো মৃত্যুতে এসে কতকগুলি বিষাক্ত বাক্যবাণ প্রয়োগ করবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু সেই মুখুজ্জে যখন ভুনিকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের পুলিস সাহেবের কাছে গেলেন—পোস্টমর্টেম না করে শব সৎকারের অনুমতির জন্য তখন একটু বিস্ময়ের সঞ্চার করলে বইকি! পুলিস সাহেব উত্তরপ্রদেশের ছেলে; এককালে মুখুজ্জে মশায়ের ছাত্র ছিল সুতরাং অনুমতি পেতে বেগ পেতে হয় নি। ছাত্রটি এই গুরুকে শ্রদ্ধা করত অকৃত্রিম ভাবে। শুধু তাই নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই অনুমতি নিয়ে ফিরে এসে ভুনিকে বললেন—তুমি এদিকের আয়োজন কর ভুনি—আমি খুব শীগ্‌গির ফিরছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে।

ভুনি বললে—আর কেন কষ্ট করে এত তাড়াতাড়ি আসবেন? আসবেন বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে।

মুখুজ্জে বললেন—না হে। আমি যাব সঙ্গে।

—সে কি? আপনি কেন যাবেন? দরকার তো হবে না।

—হবে। মুখাগ্নি মন্ত্রটা আমি পড়াব।

ভুনির বিস্ময়ের অবধি রইল না।

মুখুজ্জে বললেন—ওই ছেলেটি আমাকে যা বলেছে তারপর না গিয়ে আমার উপায় নেই বাবা। না গেলে প্রমাণ হবে আমার হারাণদার শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করি নি শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধারণার জন্যে নয়—করি নি বিদ্বেষবশতঃ। ছেলেটি কে হে?

—ও মনো পিসীমার ছেলে। অজয় ওর নাম।

—চট্টগ্রামের? গঙ্গাচরণবাবুর পৌত্র?

—হ্যাঁ। এখানে পড়বার জন্য এসেছে।

—ওর মার বিবাহ আমি দিয়েছিলাম। আনন্দ হচ্ছে। ভাল ছেলে।

অজয় বিস্মিত হয়ে এই বিচিত্রচরিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। বিচিত্র মানুষ। তিনি চলে গেলেন। অজয় চুপ করে বসে রইল।

—তোমাকে ধন্যবাদ!

চমকে উঠল অজয়। কে?—ও শিবেনবাবু। শিবেনবাবু উঠে এসে তার কাছে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন—ধন্যবাদ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! তুমি আমাকে আজ লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ!

* * *

ঘটনার পরিসমাপ্তি যদি এখানেই ঘটত তো ভাল হত। কিন্তু তা হল না। বোধ করি

এই ঘটনাবর্তে যে গতিবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তাই এখানে থামল না বা পরিবারটিকে থামতে দিল না। অন্তত: শিবেনবাবু থামতে পারলেন না।

তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে। শব নিয়ে ভুনিরা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় পাঁচটা নাগাদ। বাড়িতে ভুনির মা বসেছিলেন রমার মায়ের পাশে। তিনি সেই নিথর হয়েই পড়ে আছেন। ডাকলে সাড়া নেই, একবিন্দু জল মুখে দেন নি, মুখের উপর কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে-ছিলেন—সে কাপড়ের ঢাকা খোলেন নি; শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ও স্পন্দন ছাড়া আর কোন সাড়াই তাঁর ছিল না।

ঘরদোর পরিষ্কার করছিল এ-বাড়ির আর ও-বাড়ির দুই দাই বা ঝি, তাদের কাছে দাঁড়িয়েছিল শিবেনবাবুর ছোট মেয়ে উমা। আর দূরে এক জায়গায় বসেছিল অজয়।

সে বসে শুধু ভাবছিল সকাল থেকে এই পর্যন্ত এই একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের পালার মত এই বিপর্যয়টার কথা। বিচিত্রভাবে সে এসে পড়েছে এর মধ্যে এবং জড়িয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে ভাবছিল—এলাহাবাদে তার ভাবী জীবনের এই যদি ভূমিকা হয় তবে আসল নাটকটা না-জানি কি ভয়ংকরই হবে। কিন্তু প্রশ্নই জাগছিল—কোন প্রতিক্রিয়া হবার মত মনের সাড় ছিল না। মনটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। সারাদিন আজ খাওয়াও হয় নি। কথাটা তার মামীমার মনে অবশ্যই হয়েছিল—কিন্তু নলিনী দেবী মেয়েটির জাতই আলাদা, নিজের ছেলেরা জেলে যায়—হাসিমুখে নলিনী দেবী বলেন—আমার জন্যে ভাবিস নে যেন! ছেলেরা বলে—তুমি ভেবো না যেন! মা বলেন—আমি ভাবব না। পাড়াপড়শীর বাড়ি মেয়ের বিয়ে—মেয়ে বউয়ের প্রসববেদনা বা যুবতী মেয়ের অসুখ সংবাদ পেলে চলে যান বাড়ি ফেলে—ছেলেরা বাড়ি থাকলে বলে যান—দাইকে নিয়ে যা হোক রান্নাবান্না করে নিস। ছেলেরা বাড়ি না থাকলে দাইকেই বলেন—দাই, ভুনি ববুয়াকে নিয়ে যা হোক করে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করিস। সুতরাং আজকের ক্ষেত্রে অজয়কেও তাঁর ভুনি-দুনির সঙ্গে তৃতীয়জন করে নিতে দ্বিধা হয় নি—অত্যন্ত সহজভাবেই দুইয়ের সঙ্গে এক যোগ করে তিন করে নিয়েছিলেন। অজয়কে ডেকে বলেছিলেন—অজয় শোন্।

—মামীমা!

—বিপদ দেখছিস তো। খিদে পেলে বাড়ি গিয়ে যা হোক নিজে নিয়ে খেয়ে নিস বাবা। দাই-এর কাছে চাবি রইল। কেমন?

—হ্যাঁ মামীমা।

আর কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ও বাড়ির দাই এসে তাকে ডেকেছিল—আসো মনুমাঈর খোকা—খাবে আসো।

অজয় বলেছিল—না, এখন আমার খিদে পায় নি।

—উঁহু। সেই দোকানে কখন খেয়েছ ববুয়া—আসো।

—না দাই, আমার খিদে পায় নি!

নলিনী দেবী বলেছিলেন—তুই যা দাই, ও ডাকবে তোকে।

উমা মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল—চা করে দেব জেঠীমা?

নলিনী দেবী বলেছিলেন—তুই পারবি? তা কর। আমাকেও একটু দিস। তুইও একটু খা।

তারপরই ডেকে বলেছিলেন—শোন্!

—কি?

—তুই কি—আমরা তোদের জন্যে উপোস করে রয়েছি বলে চা করতে চাচ্ছিস?

চুপ করে রইল উমা।

নলিনী দেবী বললেন—না, তা হলে চা করিস নে। মন থেকে ওসব সরিয়ে দে, মুছে দে।

উমা এবার বললে—আপনার জন্যে নয় জেঠীমা। উনি তো আপনাদের কুটুম্ব। আপনারা কষ্ট করছেন—কিন্তু উনি কষ্ট করবেন কেন? ও'র জন্যে অস্বস্তি হচ্ছে বৈকি!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে একটু হেসে নলিনী বললেন—তুই একটু বস তোর মায়ের কাছে। আমি ওকে একটু খাইয়ে আনি।

অজয়কে ডেকে বাড়িতে কিছু খাইয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন।

পাশাপাশি বাড়ি, বাড়ি ঢুকবেন এমন সময় একটু দূরে পথ থেকেই কে যেন ডাকলে—মা!

—কে—ভুনি?

ভুনিই বটে। একখানা টাঙ্গা থেকে সে লাফ দিয়ে নামছে।

নলিনী দেবী একটু শঙ্কিত হলেন—তার লাফ দিয়ে পড়া এবং দ্রুত এগিয়ে আসা দেখে।

—কি রে? তুই একলা এই ভাবে? শ্মশানে আবার গোলমাল করেছে পুলিস? না কি?

—না। শিবেন কাকা—

—কি?

—শিবেন কাকা আসেন নি?

—মানে? শিবেন ঠাকুরপো তোদের সঙ্গে গেলেন—তোদের সঙ্গে ফিরবেন; আসেন নি মানে?

—শ্মশানে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না?

—মানে—শ্মশানে চিতা সাজিয়ে মুখাগ্নি হল—উনিই মুখাগ্নি করলেন। বেশ শান্তভাবেই করলেন। বারকতক শুধু বললেন—অপরাধ আমার। অপরাধ আমার। প্রায়শ্চিত্ত করলে রমা! মুখুজ্জে মশাই সান্ত্বনা দিলেন। লোকটি আজ আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিলেন। উনি মুখাগ্নি করিয়েই চলে আসবেন, আমি শিবেন কাকাকে অন্য সকলের কাছে বসিয়ে—মুখুজ্জে মশাইকে নিয়ে ঘাটের মাথায় একায় বসিয়ে দিলাম। ফিরে এলাম। তখন চিতাটা শুধু জ্বলেছে। আমি চিতার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। রমার ওই পুড়ে যাওয়া দেহ-মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। কতক্ষণ—মিনিট দশেক। তার আগে মুখুজ্জে মশাইকে ঘাটে পৌঁছুতে দশ-বারো মিনিট। এই। তারপর গিয়ে বসলাম—সকলে যেখানে বসেছিল সেখানে। প্রথমেই শিবেন কাকাকে খুঁজলাম। তিনি নেই। জিজ্ঞেস করলাম—শিবেন কাকা কোথায়? তাঁকে এখানে বসিয়ে রেখে গেলাম যে! তারা আশ্চর্য হয়ে বললে, সে কি, তুমি মুখুজ্জে মশাইকে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিতে গেলে—উনিও উঠে বললেন—'আমারই যাওয়া উচিত ও'কে বিদায় করতে। আমি আসছি।' চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, বললেন—'আমিও বরং ও'র সঙ্গে চলে যাই। শরীরটা বড় খারাপ করছে। স্নান করব না, জ্বর আসবে হয়তো। আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।' এতে আর কে কি মনে করবে! সকলেই বলেছে—'হ্যাঁ হ্যাঁ। চলে যান আপনি। ভুনি রয়েছে—আমরা রয়েছি—সব শেষ করে আমরা চলে যাব। আপনি চলে যান ও'র সঙ্গে।' শিবেন কাকা হনহন করে চলে এসেছেন ঘাটের মাথার দিকে। তারপর আমি ফিরে গিয়ে চিতার পাশে দাঁড়িয়েছি। ওরা ভেবেছে—ও'দের দু'জনকে তুলে দিয়েই আমি ফিরেছি। শুনেই ঘাটের মাথা আশপাশ চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—তারা এখনও খুঁজছে। আমি ছুটে এলাম দেখতে যদিই তিনি আলাদা একা করে বাড়ি এসে থাকেন।

আঘাতের উপর আঘাত।

একদিনে একটা পরিবার যেন অভিশাপের ঝড়ঝঞ্ঝায় অথবা ভূমিকম্পে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সারারাত্রি খুঁজেও শিবেনবাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার পরদিনও না। গোটা সপ্তাহেও না।

হয়তো, হয়তো কেন—সুনিশ্চিতরূপেই শিবেনবাবু গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। গলায় দড়ি, বিষ খাওয়া, গাড়ির তলায় ঝাঁপিয়ে পড়া হলে খবর পাওয়া যেত। এ বোধ হয় ভেসে গেছেন। জুলাই মাস। গঙ্গা যমুনা এখন ভরেছে, স্রোত প্রবল হয়েছে। ভেসে গেছেন শিবেনবাবু! মর্মান্তিক দুঃখে আক্ষেপে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন।

যা ঘটবার তা ঘটে গেল, রমা পুড়ে মরল, তার বাপ শিবেন ভটচাজ জলেই ঝাঁপ দিক অথবা কোন দূরদূরান্তরে রেললাইনের নীচে মাথা দিয়ে মরুক বা যাই করুক—করলে, তার খোঁজ পাওয়া গেল না কিন্তু তার জের এত সহজে মরল না। সাধারণ এমন ক্ষেত্রে ঘরে ঘরে কিছু আলোচনা হয়—তারপর চাপা পড়ে, শুধু যে সংসারে এমন ঘটনা ঘটে তারা তাদের অসহনীয় বেদনার সঙ্গে এই সব আলোচনা মুখ বুজে সহ্য করে। ঘরে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। এক্ষেত্রে এত সহজে মিটল না।

তার কারণ দুটি। একটি কারণ মুখুজ্জে মশাই, অপর কারণটি—এই ঘটনাটি নিয়ে বাঙালী সমাজের বাইরে অন্য সমাজেও আলোচনার অন্ত ছিল না।

বাঙালী সমাজের অহংকার আছে—তারা প্রগতিশীল, তারা ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের লোক থেকে শিক্ষিত, তারা নবযুগের অগ্রদূত, তারা উদার ; এ কথা অন্য প্রদেশের লোকে স্বীকারও করে আবার ঈর্ষাও করে—তাই এমন একটি ঘটনা ঘটতেই তাদের মধ্যে ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের যারা তারা প্রগল্ভ হয়ে উঠল।

বার লাইব্রেরি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এই নিয়ে আলোচনা ব্যঙ্গ-পরিহাস অনেকই চলতে শুরু করল। মধ্যে-মাঝে শোনা যায় মুদির দোকানেও এই আলোচনা চলছে।

প্রবীণেরা বললেন—তোমরা বাবা সাহাব বনেছ, জাত ধরম বিলকুল বরবাদ দিয়েছ সুতরাং এ ঘটবেই।

এ পক্ষ থেকে এর উত্তর যথেষ্ট কড়া করে দিয়েও ঠিক যেন উত্তর দেওয়া হয় নি। তাঁরা এ সব অঞ্চলে—মুসলমান আমল থেকে এ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে যে সব কাণ্ড ঘটে তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। বড় বড় জমিদার আমীরদের বাড়ির অনেক কেচ্ছা শুধু তাঁদের জানা আছে তাই নয়, প্রমাণস্বরূপ আদালতের নথিও বের করে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে ও পক্ষ দমে না, বলে—আরে বাবা, আদালত খুঁজলে নথি বাংলাদেশেও মিলবে। ও সব দেশে সব সমাজেই আছে। কালে-কালেই ঘটে থাকে। কিন্তু তোমরা বুকে হাত দিয়ে বল না—আমাদের দেশের ছোকরা-ছোকরী তোমাদের দেশের ছোকরা-ছোকরীর মত এমনতর মহব্বতীতে পাকা হয়েছে? হাঁ—বলতে পার, বম্বই হয়েছে।

স্থানীয় হিন্দী কাগজেও এ নিয়ে কিছু লেখা বেরিয়েছে। তার মধ্যে কিছু সুচিন্তিত মতামতও আছে কিছু আক্রমণাত্মকও আছে। একজন তো লিখেছে—"আমাদের তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের আচার-আচরণের সংস্পর্শ থেকে তাদের দূরে থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। ইংরেজ সমাজ সম্পর্কে আমরা আজও সাবধান আছি। তারা বিদেশী তারা ভিন্নধর্মী—এ সত্য আমরা বিস্মৃত হই নি, কিন্তু স্বদেশী এবং স্বধর্মী বাঙালীদের অনুকরণে সে বাধা অনুভব করি না, বিপদ সেখানেই।"

দু-চারটে হিন্দী ছড়া এবং গানও শোনা গেল এবং দেওয়ালে লেখা দেখতে পাওয়া গেল।

দু-এক জায়গায় বাঙালী অবাঙালী ছেলেদের মধ্যে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেল। কিন্তু এ সবই মুখ বুজে সহ্য না করে উপায় ছিল না। মুখুজ্জে মশাই অবশ্য গোড়া থেকেই চুপ করে ছিলেন না, তিনি এই পরিবারটির খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, কি করা যায় ভাবছিলেন ; এ নিয়ে মধ্যে মধ্যে ভুনিকে তিনি ডেকে পাঠাচ্ছিলেন। নিজের যাবার শক্তিও ছিল না এবং যেতে যেন সংকোচও ছিল। সেদিন শ্মশান থেকে ফিরে অবধি তাঁর স্থায়ী ব্যাধি হাঁপানিতে পড়েছিলেন, শক্তি ছিল না সেই কারণে এবং সংকোচ বোধ করছিলেন—দীর্ঘকাল শিবেনের উপর বিরূপ ছিলেন—সেই কারণে। ভুনি তাঁকে বলেছিল—উপস্থিত কিছুদিন মানে মাস দুই আড়াই ভাববার কিছু নেই, তারপর ভাবতে অবশ্যই হবে। তা আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর হবে। এখন কিছু টাকা ও'দের হাতে আছে। টাকাটা এই বিয়ে উপলক্ষ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছিল ; শিবেন কাকার নিজের কিছু ছিল—মানে খুড়ীমার কিছু গয়নাটয়না আর কিছু নগদ বোধ হয় শ'তিনেক হাতে ছিল—কিছুটা এদিক ওদিক থেকে সংগ্রহ আমার মা করেছিলেন—সেও শ'চারেকের মত। সে-সবগুলোও রয়েছে।

মুখুজ্জে বলেছিলেন—আমি শুয়ে শুয়েই ব্যবস্থা একটা করতে চাই। শুয়ে শুয়েই সব শুনছি, সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। সহ্য করতে পারছি না। গোটা সমাজের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছে হে! তুমি যা হিসেব দিলে তাতে হাজার বারোশো টাকা। তা আর এই যুদ্ধের বাজারে ক'দিন? আর তোমরা দু ভাই—তোমরা তো গান্ধীরাজার চেলা—কবে আছ বাইরে কবে নেই তা তুমিও জান না। যদি হঠাৎ ধরেই নিয়ে যায়—তখন কি হবে?

ভুনি বলেছিল—শিবেন কাকার স্ত্রীকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। তিনি কোন কথার উত্তরই দেন না। চুপ করে থাকেন, কাঁদেন। সেদিন আর এন. বোস উকিলের বাড়ি থেকে একটা ব্রতের ছুতো করে একটা সিধে—বেশ ভাল রকম সিধে,—চাল ডাল নুন তেল ঘি ময়দা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কুমারী মেয়েকে মানে উমাকে দেবার নাম করে—তা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—আমার স্বামী তো এসবগুলো ঠিক মানতেন না, আমরাও না ; তা ছাড়া হিন্দু সমাজেও এসব নেবার মত জাত আমরা রাখি নি। ওসব নিয়ে যান—কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে দেবেন। ওসব আমরা নিতে পারব না।

—তা সত্যের দিক থেকে বলতে গেলে—মিথ্যে বলেননি, তার জন্যে প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু এটা যদি সমাজের উপর বিদ্বেষ হয় ক্রোধ হয় তবে অন্যায় শুধুই নয় আশঙ্কার কথাও বটে। মানে ভবিষ্যতে কি করবেন—একথা ভাবতে গেলে অনেক দূরে যেতে হয়।

ভুনি এই পাগল মানুষটিকে জানে। সে বাদ-প্রতিবাদ করে তাঁকে উত্তেজিত করতে চায় নি। সে চুপ করেই ছিল। কিন্তু মুখুজ্জে ছাড়েন নি। উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করে উত্তর না পেয়ে বলেছিলেন—আমি জানি হে, আমার উদ্বেগ-আশঙ্কার কথা তোমার মিথ্যে মনে হচ্ছে। তোমরা কংগ্রেসী ; ধর্মনিরপেক্ষ। আবার শুধু ভারতবাসী। ধর্মের কথা বলতে গেলে সেটা হয় কম্যুন্যালিজিম, বাঙালীত্বের কথা বলতে গেলে সেটা হবে প্রভিন্সিয়া-লিজিম। আমি কম্যুন্যালও বটে প্রভিন্সিয়ালও বটে। তোমরা গণ্ডার—তোমাদের পিঠে আজ জ্বলন্ত টিকে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা পর ছ্যাঁকা লাগে তোমাদের। আমি তোমাকে বলছি ভুনি—তুমি দেখে নিয়ো—সময় থেকে যদি এই অসহায়া মেয়ে দুটিকে স্নেহে সাহায্যে দরকার হলে শাসনে ধরে না রাখ তবে ওদের হিন্দুত্ব বা বাঙালীত্ব কিছুই থাকবে না। তুমি বলো, তোমার মাকে বুঝিয়ে বলতে বলো ও'দের। বলো—সব যেন ভাল করে বিবেচনা করেন শিবেনের স্ত্রী। বিবেচনা করেন—দোষটা কোন্ পক্ষের বেশী। বুঝেছ! শিবেন হিন্দুকে বাঙালীকে বেশী ঘেন্না করত, না বাঙালীরা হিন্দুরা তাকে বেশী ঘৃণা অবজ্ঞা করত?

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন মুখুজ্জে, বলেছিলেন, শিবেনের স্ত্রী নিশ্চয় জানেন—আর কেউ না জানুক, তাঁর শ্বশুর আমাদের হারাণদা দেশ ছেড়ে ঘর ছেড়ে এ দেশে এসে কৃশ্চানদের চাকরি নিয়েছিলেন—বিলেত-ফেরতদের ব্রাহ্মদের পুরোহিত হয়েছিলেন—দেশে ভাইরা তাঁকে ছেড়েছিল—সমাজও ছেড়েছিল কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ছাড়েন নি। তিনি ছেলের জন্যে পতিত হয়েই ছিলেন। ভিক্ষে করে খেতেন। তিনি মারা গেলে হারাণদা গঙ্গার ঘাটে গোপনে শ্রাদ্ধ সেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর অপরাধ তাঁকে ক্ষমা করে নি। তাঁকে টপকে শিবেন—শিবেনের মেয়ের উপর সেটা ফলে গেছে। কাজ যা করবেন তা ভেবেচিন্তে করতে বলো। আমি খবর রাখি। আমি খবর পেয়েছি—হারাণদা শিবেন যে মিশনে কাজ করত সেই মিশনের ফাদার এবং সিস্টারদের টনক নড়েছে। তারা উদার হস্ত প্রসারণ করে সাহায্য দিতে চেয়েছে। ফলটা ভাল হবে না। লবণ বড় খারাপ জিনিস ভুনি। সাবধান করে দিয়ো।

ভুনি অবাক হয়ে গিয়েছিল শেষের কথাগুলি শুনে।

কি বলছেন মুখুজ্জে মশায়? তারা প্রতিবেশী হয়ে এ কথা জানে না?

মুখুজ্জে মশায় বলেছিলেন—কথাটা বলে ভাল করলাম না ভুনি; সত্যভঙ্গ হল আমার। হারাণদার কাছে আমি সত্যবদ্ধ ছিলাম। আজ মনের দুঃখে জ্বালায় বলে ফেললাম। হয়তো আমি রিঅ্যাকশানারী, হয়তো আমি গোঁড়া। হয়তো আমি ভীরু। ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে একবস্ত্রে পথে নেমে দিগ্‌বিদিকে দৌড়ুই না, জীর্ণ আশ্রয়কেও নিরাপদ ভাবি—কিন্তু আশ্রয়হীন দিগ্‌বিদিকই সম্মুখের প্রশস্ত পথ নয়, সেখানে খানা আছে খন্দক আছে—ডুবে মরতে হতে পারে। কলকাতা থেকে শুরু করে গোটা বাংলাদেশটা বিয়াল্লিশের সাইক্লোনে দহ হয়ে গেছে। আমি কলকাতা গিয়ে দেখে এসেছি; প্রলয়পয়োধি জল—থইথই করছে। বাঙালীর জাত গেছে—লঙ্গরখানায় বসে একসঙ্গে খিচুড়ি খাচ্ছে। এস্‌প্লানেডের মাঠে খানিকটা জমি জেগে আছে—সেখানে বাপভাইরা এসে যুবতী মেয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। যার বাপ ভাই নেই সে এসে নিজে ঝাঁপ খাচ্ছে। তাই উত্তেজনায় কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। বলে ফেললাম তোমাকে।. কথাটা হারাণদা কাউকে বলেন নি—বলেছিলেন আমাকে—তাঁর মা মারা গেল। বলেছিলেন—ভাই, আমার মাতৃশ্রাদ্ধটা তুমি গোপনে আমাকে করিয়ে দাও। শিবেনের ঘোর আপত্তি, সে এসব মানে না। তোমার ঠাকুরদাকেও কখনও বলেন নি হারাণদা তাঁর পরিচয়। কথাটা তুমি গোপন রেখো ভাই। তবে ওদের সাবধান করো, বলো—শিবেন শ্মশানে মেয়ের মুখাগ্নি করে গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়েছে, শিবেনের বউ এখন যা করবেন তা যেন বিবেচনা করে করেন। আমি অবশ্য চেষ্টা একটা করব। দু চার দিনের মধ্যেই হরিসভায় গিয়ে প্রবীণদের ডাকব। বলব—যদি মনে করেন বাঙালীর বাঙালী হয়ে হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজন থাকে তবে এদের একটা ব্যবস্থা করুন।

* * * *

সংসারে মুখুজ্জেদের মত বাতিকগ্রস্ত মানুষেরা বাতিক ছাড়েন না। বাতিকই তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই হরিসভায় এসে প্রবীণদের ডেকে কথাটা বলে বললেন—শুনুন—আমার প্রস্তাব—শিবেনের স্ত্রী-কন্যার জন্য উপলক্ষ্য করে একটা ফান্ড তৈরি করুন। এই প্রবাসে আমরা আজ যদি বাঙালীকে রক্ষা করতে না পারি, তা হলে আমরা কেউ বাঁচব না।

শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না—গোটা জাতটি যে কত নীচে নেমে গেছে তার একটা ভয়াবহ হিসেবও তিনি উপস্থিত করলেন। সে হিসেবে লোকসান যাঁরা বাড়িয়েছেন তাঁরা বাংলাদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। প্রায় কেউই বাদ গেলেন না। বাদ গেলেন শুধু কয়েকজন—পরমহংসদেবের মত কয়েকজন সাধক। পরিশেষে বললেন—দোষই বা দেব

কাকে—এটা আমাদের জাতের ধাতুর দোষ। ধর্ম আমরা রাখি নি, রাখবার ক্ষমতা নেই আমাদের -আমরা দুর্বল, আমরা দাসের জাত—যে শক্তিমান আসে তারই ভক্ত হই। নইলে মুসলমান এল খাইবার পাস দিয়ে, পাঞ্জাবে আড্ডা গাড়লে—সেখান থেকে ছড়ালে ভারতবর্ষময়, এখন দেখুন হিসেব করে—পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশটায় মুসলমান হল মেজরিটি—তারপর ইউ. পি.—বেহার—কোথাও দাঁত ফোটাতে পারে নি কিন্তু বাংলাদেশ একপ্রান্তে—সেখানে হল মেজরিটি।

মুঠি বেঁধে হাতখানা তুলে মুখুজ্জে বললেন—কি করে হয়? কেন হয়? বলতে পারেন?

আর কৃশ্চান ধর্মের তো কথাই নেই। ইংরেজ এসে নেমেছিল পশ্চিমঘাটে, সেখান থেকে মাদ্রাজ, সেখান থেকে কলকাতার জলায়। ইংরেজ রাজত্বের ভিত পত্তন হল কিন্তু বাংলাদেশে, কলকাতা তার রাজধানী। কৃশ্চান ধর্ম সেখানে পাট চাষের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে। এখান থেকে পাটকলে বস্তা তৈরি করে—টাকা বোঝাই করে নিয়ে যায় আর সেই বস্তায় ওদের দেশের এঁটো কাঁটা বোঝাই করে এদেশে পাঠায় - আমরা অমৃত বলে খাই। জাত যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন তাই আজও আছি কিন্তু আর থাকবে না।

এ মানুষটা যেন সেদিনের সে বিবেচক মানুষই নয়। যেন পাগল একজন। বকে গেলেন উন্মাদের মত। শুধু বকেই গেলেন না, শেষটায় কেঁদেও ফেললেন।

আর এন. বোস—রাঘবেন্দ্রনাথ বোস—বড় উকিল—ইংরিজীনবীশ হলেও ধর্মে অনুরাগ আছে তবে লোকটি বিবেচক দূরদর্শী মধ্যপন্থী—তিনি অনেক কষ্টে মুখুজ্জেকে শান্ত করে বললেন—আগে আপনি একটু শান্ত হোন মুখুজ্জে মশায়। হবে সবই হবে।

রিটায়ারড জজ সাহেব মিস্টার সেন বললেন—প্রস্তাবটি খুবই সমীচীন এবং কল্যাণজনক কিন্তু যে ভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে তা ঠিক সংগত বলে মনে হচ্ছে না। প্রস্তাবটিতে ধর্ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, সেটুকু বাদ দিয়ে করুন, বাঙালীর বাঙালীত্বের ওপর জোর দিন। অসহায় বাঙালীকে রক্ষা করবার জন্য ফাণ্ড তৈরি করুন। সে হিন্দু হোক কৃশ্চান হোক—সেটা বড় কথা নয়—বড় কথা—অসহায় বিপন্ন বাঙালী। বিপন্ন বাঙালী পরিবারকে সাহায্য করবার জন্য ফাণ্ড।

মুখুজ্জে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন, বললেন—উঠলাম মশাই।

এবং হরিসভার দেবগৃহে প্রণাম করে বললেন—মানে মানে পথ দেখ গোবিন্দ। এখানকার রুটি তোমার মরেছে। আর দিন কতক, দিন কতক বাদেই প্রস্তাব পাস হবে - তুমি এখানে থাকলে ব্রাহ্ম-কৃশ্চানরা আসবে না সুতরাং হরিকে নোটিশ দেওয়া হোক -হরি এক মাসের মধ্যে তুমি চাটিবাটি নিয়ে এখান থেকে প্রস্থান কর। নেহাতই পাথরের হাত-পা—যদি যেতে নাই পার তবে একটা কুলুঙ্গিতে কিউরিয়ো হিসেবে থাকতে পার। কিন্তু ফুল জল তুলসী চন্দন নৈবিদ্য এসব পাবে না। কেত্তন গানটা চলবে প্রেমের গান হিসেবে। আচ্ছা চলি।

মিস্টার সেন বললেন—মুখুজ্জে মশাই—

—কি বিপদ! পিছনে কেন ডাকছেন বলুন তো? আমার কুসংস্কার আছে। আমি মানি।

ফিরলেন মুখুজ্জে। মানে ফিরে দাঁড়ালেন।

—যাচ্ছেন—কিন্তু কয়েকটা কথার জবাব আমি আপনার কাছে চাই।

—বলুন! তবে ভগবান ধর্ম এ নিয়ে তর্ক আমি করব না।

—না—তা আমিও করতে চাই না। আমি সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বেশ বলুন।

—আপনি বলছেন ফাণ্ড হিন্দু এবং বাঙালীর জন্যে খুলতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। না-হলে ওতে আমি নেই।

—ভাল। এখন আমার প্রশ্ন—ধরুন কোন ব্রাহ্ম বাঙালী পরিবারে যদি এমন বিপদ ঘটে তাহলে কি সাহায্য করা হবে না তাকে ?

চমকে উঠলেন মুখুজ্জে। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—মানে ?

—মানে কি খুব জটিল মিঃ মুখার্জী ?

—জটিল না হোক—প্যাঁচালো। অর্থাৎ ওকালতির প্যাঁচ রয়েছে।

—না, নেই। সাহায্যভাণ্ডার তৈরি করছি—

—হ্যাঁ, বিপন্ন বাঙালী হিন্দুকে সাহায্য করতে—

—সেই বলছি–কোন বাঙালী পরিবার যদি বিপন্ন হন—এবং তিনি যদি ব্রাহ্ম হন বা কৃশ্চান হন—কি মুসলমান হন—তাঁকে কি সাহায্য করা হবে না, করব না আমরা ? আমার প্রশ্ন হল সেইটে।

—দাঁড়ান মশায় ভেবে দেখি। ভেবে দেখতে হবে। বুঝতে হবে।

—ওর সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন আছে আমার, সেটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে ভেবে দেখুন।

—আবার কি ?

—আপনি ধার্মিক লোক, সে সম্পর্কে অন্যে যে যাই বলুক—গোঁড়া রিঅ্যাকশানারী যাই বলুক—তাতে আপনার ধর্মপ্রাণতার সততার এক বিন্দু হানি হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওই সঙ্গে আমার প্রশ্ন এই যে—আপনি হিন্দু আপনি ব্রাহ্মণ—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আপনি—পথে যেতে যেতে যদি পথের ধারে কোন মৃতপ্রায় বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখতে পান—সে সাহায্য সেবা না পেলে মরে যাবে—সেখানে আপনি কি করবেন ? সে কোন্ জাত তার কোন কুল—সেই খবর আগে নেবেন · নিয়ে তাকে সাহায্য করবেন—অথবা সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে জল দেবেন সেবা করে বাঁচাবেন ?

মুখুজ্জে মশায় এবার ফিরে এসে মজলিসে বসলেন। এবং বললেন—বামুনেরা খুব রগচটা লোক হয় মশায়। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না। ওঃ! ভাগ্যে আমি জজ-টজ হই নি, তা হলে অনেক লোককে হয়তো বেমক্কা সাজা দিয়ে দিতাম। নিন—তাই লিখুন—লিখুন শুধু বাঙালী সাহায্য ভাণ্ডার। দুঃস্থ বাঙালী সাহায্য ভাণ্ডার। অবশ্য যে যুক্তি মিস্টার সেন দিয়েছেন তাতে বাঙালী শব্দটাও রাখা উচিত নয়।

—কিন্তু ওটা থাকুক। কারণ আমরা শুধু ভাষার সূত্রেই প্রবাসী, হিন্দু বা মুসলমান বা কৃশ্চান হিসেবে নই ; ধর্মগুলি সব প্রদেশেই আছে। এবং সেখানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্মগত সমাজ আছে। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভিত্তিটুকুই মূল ভিত্তি থাক।

মুখুজ্জে মশাই আবার নড়ে সোজা হয়ে বসলেন—বললেন—তা হলেই হল। এবং হেসে বললেন—আপনি হেরে গেছেন জজ সাহেব। আমি জিতেছি।

জাস্টিস সেন ধীর এবং মধুর প্রকৃতির মানুষ, তিনিও হেসে বললেন—সেটা কি রকম ?

মুখুজ্জে বললেন—যদি কেউ কৃশ্চান হয়ে ভাষা পালটায় তখন আর বাঙালী থাকবে না। এবং ধর্ম পালটালেই ভাষা পালটাবে। মুসলমান হলে উর্দু বলতে শুরু করবে ঘরে। কৃশ্চান হলে ইংরিজী। এ দেশে চাটুজ্জে মুখুজ্জে ঘোষ সেন কৃশ্চান—অনেক না হোক আছে—তারা বাংলা বলে না—বোঝে না। দেখতেই পাচ্ছেন। সুতরাং আমি জিতেছি। এখন টাকা তুলুন এবং ফাণ্ড কমিটির প্রেসিডেণ্ট আপনি। টাকা একবারে দেওয়া হবে না। মাসে মাসে নিয়মিত সাহায্য। এবং সাহায্য দেওয়া হবে—মেয়েটির পড়ার জন্য আর কিছুটা সাংসারিক সাহায্যের জন্য।

টাকা তুলতে বা উঠতে কষ্ট হল না, প্রায় বাৎসরিক বারোশো টাকার মত প্রতিশ্রুতি ওই সন্ধ্যার মজলিসেই পাওয়া গেল। এবং আরও হাজার বারোশো পাওয়া যাবে—এতে সন্দেহ রইল না। মাসে তিরিশ টাকা হিসাবে শিবেন ভট্টাচার্যের স্ত্রী ও কন্যাকে সাহায্য দেওয়াও স্থির হয়ে গেল ওই মজলিসেই।

* * * *

পরদিন সকালেই মুখুজ্জে ভুনির বাড়িতে এলেন সংবাদটা নিয়ে। বললেন—কাল সন্ধ্যেতে তুমি গেলে না কেন হে? না,—তুমি বুঝি প্রভিন্সিয়াল নও? ন্যাশানাল? বাঙালী নও—ইণ্ডিয়ান? চ্যালা অব গান্ধী দি গ্রেট, জওহরলাল দি ইণ্টারন্যাশানাল? বাঙালীর ব্যাপার তার ওপর—স্থান হল হরিসভা—কমুন্যাল প্রেস, গেলে জাত যেত?

ভুনি হেসে বললে—বেরুব বলে তৈরী হয়েও বেরুতে পারি নি।

—কেন হে, সেই প্রশ্নই তো করছি।

—সে বলব বলে আজ সকালেও বেরুব মনে করেছিলাম কিন্তু কালকের সন্ধ্যের জের আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে।

—আবার কোন্ হাঙ্গামায় জড়ালে?

—ওই শিবেন কাকাদেরই ব্যাপার।

—আবার কি ঘটল?

ভুনি বললে—কাল সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্ণৌর মিশন থেকে ফাদার ব্রাউন এসেছিলেন। শিবেন কাকাদের এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য ও'রা খুব দুঃখিত হয়েছেন। হারাণ দাদু ও'দের ওখানে দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন—শিবেন কাকাও করেছেন—মিশন অনেক কাজ তাঁদের থেকে পেয়েছেন।

অসহিষ্ণু মুখুজ্জে মশাই বলে উঠলেন—জানি, এ খবর আমি পেয়েছি, তারা শিবেনের স্ত্রী এবং কন্যার ভরণপোষণ শিক্ষার ভার নিতে চায় তবে জাতটি দিতে হবে—

—না। তা তারা বলে নি। তারা মেয়েটির শিক্ষার সব ভার নিতে চায় আর কাকীমাকে একটা কাজটাজও দিতে চায় যদি করেন।

—কি সে কাজ?

—এই এ দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা মিশনে থাকে তাদের দেখাশুনা, কিছুটা হিন্দী পড়ানো—এই আর কি!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যার নাম ভাজাচাল তারই নাম মুড়ি। মোট কথা জাত দিতে হবে না—তবে ও'দের মিশনের আয়রন কার্টেনের মধ্যে বাসা গাড়তে হবে। তা কি ঠিক হল? ও'রা তো এতদিন প্রায় তাই বসবাস করে এসেছেন শিবেনের সঙ্গে, আর তুমিও তো উদার মহৎ—কংগ্রেসী—ননকমুন্যাল—ননপ্রভিন্সিয়াল—। সব খতম করে দিয়েছ তো?

হেসে ভুনি বললে—না। ও'রা তা যাবেন না। সে বলে দিয়েছেন। তাতেও তারা বলেছিল—বেশ, তা হলে তারা মাসিক সাহায্য করবে—তাতেও খুড়ীমা বলেছেন—না। তা তিনি নিতে রাজী নন। শুধু দাবি করেছেন—শিবেন কাকার হিসেবমত কিছু মাইনের টাকা বাকী আছে—সেইটে।

—বাঃ! বাঃ! বাঃ! মুখুজ্জে মশাই খুশী হয়ে বলে উঠলেন—এই তো! এই তো! এই তো মানুষ! এই তো এদেশের শিক্ষা। এই জন্যেই তো বলে—সনাতন ধর্ম! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহঃ। যাবে কোথায় অমৃত ধর্মের শিক্ষা। তা চল—বউমা মানে তোমার মাকেও ডাক, চল একবার শিবেনের স্ত্রীর কাছে যাব। আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি।

ভুনি বললে—সে খবরও কাল পেয়েছি। কাল রাত্রেই বলে গেছে আমাদের পাড়ার প্রশান্ত। কিন্তু সকালবেলা থেকে সেই নিয়েই কথা হচ্ছে। খুড়ীমা আমার মায়ের কাছেই রয়েছেন। তিনি কারুর কোন সাহায্য নেবেন না, নিতে চান না।

—মানে? দিন চলবে কি করে?

—উনি খেটে খেতে চান।

—খেটে খাবেন? ভাত রান্না করে?

—না। উনি বলছেন—উনি একটি মেয়েদের আর ছোট ছেলেদের নিয়ে পাঠশালা গোছের করতে চান। তা ছাড়া কিছু সেলাই-ফোড়ের কাজ তাও করতে চান। বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন, কিছু টাকা ব্যাঙ্কে দেনা আছে বাড়ির দরুন সেটা শোধ দিয়ে বাকীটা নিয়ে ছোটখাটো খাপরার চালের বাড়িভাড়া নিয়ে উঠে যাবেন।

—কিন্তু তাতেই কি চলবে বলে মনে করেন? তুমি মনে কর?

—আমার কথা ছেড়ে দিন। এক্ষেত্রে ও'র কথাটাই বড়। উনি একেবারে যেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। মানে কিরকম ব্যাপার শুনুন—রমার বিয়ের যখন ঠিক হয় তখন মা মনো-পিসীমাকে কিছু টাকার জন্য লিখেছিলেন, মনোপিসীমা ও'র ছেলে অজয়ের হাত দিয়ে নগদ আড়াইশো টাকা একটা আংটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; মা সেটা ও'দের দিয়েছিলেন—তখন খুড়ীমার অবশ্য খুব বিহ্বল অবস্থা। ও'র খুঁট থেকে চাবি নিয়ে বাক্সে রেখে দিয়ে এসে-ছিলেন। আজ সকালবেলা খুড়ীমা সেই টাকাটা আর আংটিটাই এনে প্রথম কথাটা তুললেন। বললেন—এটা দিদি মনো ঠাকুরঝির সেই টাকাটা আর আংটিটা। এগুলো তুমি ওর ছেলেকে দিয়ে দিয়ো। মা বললেন—সে কি? সে তো ভাই রমার বিয়ের জন্য তোমাদের দিয়েছে। তা ও'কে বলতে হল না—ও'র ছোট মেয়ে উমা বললে—কিন্তু দিদির বিয়ে তো হয় নি জেঠীমা! দিদির বিয়ে হলে—টাকাটা নিলে—তবু ওটাকে যৌতুক বলা চলত কিন্তু এখন যে ওটাকে ভিক্ষে ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। ভিক্ষে যারা দেয় তারা মহৎ লোক—তাদের অনেক পুণ্য হয়। কিন্তু যারা নেয়—তাদের চেয়ে ছোট আর সংসারে কে আছে বলুন! মা চুপ করে গেছেন। সামনে টাকা আর আংটিটা রেখে খুড়ীমাও বসে আছেন। মা ভেবে পাচ্ছেন না—কি বলবেন অজয়কে? কি বলে ফেরত দেবেন!

—কেন? যা বলেছে শিবেনের মেয়ে তাই বলে দেবে! সে তো খুব খাঁটি কথা বলেছে গো।

—কিন্তু মা যে নিজে চেয়েছিলেন পিসীমার কাছে।

—ভাবতে হবে না। টাকাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি আমাদের ফাণ্ডে জমা করে নেব। ফাণ্ডের টাকা যখন তুলেছি—তখন ওসব তো আর ফেরত দিচ্ছি না। ফাণ্ডটা থাকছে। ওরা নিচ্ছে না—অন্যদের দরকার হবে। কিন্তু চল তো—একবার দেখা করে যাই শিবেনের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে। আশীর্বাদ করে যাই। আর বলে যাই—হরিসভাতে আমি বাঙালীর ছোট মেয়ে আর ছেলেদের নিয়ে একটা পাঠশালা করে দিচ্ছি। চল।

শিবেনবাবুর স্ত্রী বিশীর্ণা হয়ে গেছেন কয়েকদিনে। শান্ত শ্রীমতী মেয়ে। দুঃখ কষ্ট তাঁর গৌরবর্ণ ললাটে মুখে রেখা টেনে ইতিহাস লিখে রেখে গেছে শিলালিপির মত। এর আগে কখনও মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলেন নি। আজ মুখুজ্জের সামনে মাথায় ঘোমটা রেখেও অনাবৃত মুখেই দাঁড়ালেন। প্রণাম করে বললেন—আমি সব শুনেছি। আমি তো আপনাদের সকলের—গোটা সমাজেরই দয়ার পাত্রী। আর তো কেউ নেই আমার। আমি আপনাদের দয়া প্রত্যাখ্যান করছি না, জমা রাখছি। আমি এখন খাটতে পারব, ক্ষমতা আছে

—এখন খেটে খাই—যখন দরকার হবে আমি হাত পাতব !

অবাক্ হয়ে গেলেন রূঢ়ভাষী মুখুজ্জে।

হারাণবাবুর বাড়ি তিনি আসতেন। কিন্তু কখনও এ মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনেন নি। আজ সেই মেয়ে এক আশ্চর্য দৃঢ় মূর্তিতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে। উমা একখানা আসন এনে পেতে দিয়ে বললে—আপনি বসুন।

এ মেয়েটিও শীর্ণ ক্লান্ত হয়ে গেছে।

ঝড় জল প্লাবনের পর নতুন মাথা তুলে দাঁড়ানো একটি চারা।

মুখুজ্জে তার মাথায় হাত রেখে বললেন - রাজরানী হবি তুই।

উমা বললে - তার থেকে অন্য আশীর্বাদ করুন না !

—কি আশীর্বাদ ?

—এম. এ. পাসটাস করে বেশ বড়সড়ো একটা চাকরি পাই যেন !

—কেন ? রাজরানীর চেয়ে চাকরি বড় ?

—আপনিই বলুন !

—হুঁ। তা কি চাকরি করবি ? পছন্দটা কি ? বড়সড়ো চাকরি মেয়েদের—সে হয় প্রফেসারি—না হয় ডাক্তারি ! বেশ তাই হবি তুই।

মাসখানেক পর। সেদিন ওই পাঠশালা খোলার নির্দিষ্ট দিন। মুখুজ্জে মশাই পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করে দিয়েছেন ; আশ্বিন মাসের দোসরা। বৃহস্পতিবার ; বিদ্যারম্ভে গুরুবার শ্রেষ্ঠ বার। ছোট ছেলেমেয়ে পঁচিশটি নিয়ে আরম্ভ হবে। সকাল সাতটা থেকে এগারটা পর্যন্ত পাঠশালা। ছেলেদের বেতন মাসে এক টাকা হিসেবে এবং হরিসভা থেকে মাসিক দশ টাকা দেওয়া হবে খরচখরচার জন্য। হরিসভার কাজকর্ম করে যে ঝি—সেই পাঠশালার সময় উপস্থিত থাকবে, কাজকর্ম করে দেবে। শিবেন ভট্টাচার্যের স্ত্রী সাধনা দেবী চেয়েছিলেন—এঁদের সঙ্গে কিছু হিন্দীভাষী ছেলেদেরও ভরতি করেন। বাঙালীর ছেলে এখানে প্রথমতঃ কম, দ্বিতীয়তঃ যাঁরা এখানে বর্ধিষ্ণু উচ্চপদস্থ তাঁদের বাচ্চারা গোড়াতেই প্রাইমারি শিক্ষাটা নেয় সাহেবী ইস্কুলে। মিশনারীদের স্কুল আছে। দু-চার ঘরের ছেলে তো দেরাদুনে পড়ে। হিন্দীভাষীর দেশ, নিম্নমধ্যবিত্ত তারাই, তিনি নিজেও হিন্দী ভাল জানেন, এদেশে জন্মেছেন, বাড়িতে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে পথে দাঁড়িয়ে হিন্দী শিখেছেন ; প্রথম জীবনে হিন্দী পড়েছেন—লিখতেও পারেন সুতরাং তাঁর অসুবিধে নেই। কিন্তু মুখুজ্জে মশাই এবং আরও অনেকেই আপত্তি করেছেন। যুক্তিবিহীন আপত্তি নয় ; বলেছেন—যেই হিন্দীভাষী ছাত্র নেওয়া হবে সেই ছুটে আসবে ইস্কুল ইনস্পেকট্রেস—বলবে —সরকার খুশী হয়েছেন—এড তো লে লিজিয়ে। তারপর এড নেওয়া হলেই তখন গর্দান পাকড়কে হুকুম জারি হোগা যে হিন্দীই একমাত্র ভাষা, ওই ভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে। অন্য কোন ভাষা চলবে না। কথাটা সাধনা দেবীকে মানতে হয়েছে।

মুখুজ্জে মশাই সিধে লোক। তিনি সিধে বাতই বলে দিয়েছেন দেখ মা, আমি বুঝতে পারি—এসব হল ওই নিদারুণ ন্যাশানাল এবং গান্ধী রাজার চ্যালা ভুনি এবং ভুনির মায়ের পরামর্শ। ও পরামর্শ যদি নাও তবে যা খুশী কর। কিন্তু তোমার ওতে ভাল হবে না। বছর দুইয়ের মধ্যেই আসবে হিন্দী এড তারপর আসবে হিন্দী হুকুমনামা। অতঃপর ওটি ভুক্তান হবে এডেড সরকারী বা মিউনিসিপাল ইস্কুলের মধ্যে। তারপর, আসবে হুকুম—যেহেতু তুমি বাঙালীর মেয়ে, হিন্দী তোমার মাতৃভাষা নয়, সেই হেতু হিন্দী প্রাইমারি ইস্কুলে তোমাকে রাখা যেতে পারে না। হিন্দুস্তানী ছেলে সংখ্যায় বেশী হয়ে গেলে সে কথা তারা নিশ্চয় বলতে পারবে। এমন কি যদি ভালটাই ধরা যায়, তোমার

চাকরি যদি নাই যায়—তবুও ছেলে বেশী হলে—আরও মাস্টার দরকার হবে—তারা আসবে হিন্দীভাষী মাস্টার বা মাস্টারনী। তাদের সঙ্গে বনাবন্তি না হলে তখন কি করবে। তা ছাড়াও আছে—আমাদের হরিসভায় পাঠশালা বসছে—ওরা পাঠশালার বাড়ি বলে এটা নিয়েও হাঙ্গামা বাধাতে পারবে। আরও আছে—আমাদের বাঙালীর মধ্যে এখানে হরিজন নেই; কিন্তু ইউ পি জওহরলালের দেশ—কংগ্রেসের সব থেকে শক্ত ঘাঁটি—এখানে হিন্দী পাঠশালা হলে হরিজন ভরতি করতে হবে; এ সব নানানতর সমস্যা মা। তুমি ও-সব মতলব ছাড়। ভুনি সৎ শুদ্ধ কিন্তু হি ইজ এ ফু—ল। খাঁটি বাংলায়—একটি গর্দভ। অথবা উল্লুক। এদেশী ভাষায় এক লম্বরকা বেওকুফ। আমি বলি হি ইজ এ ফুল লাইক দ্যাট ধর্মপরায়ণ বিভীষণ। বিভীষণ ধার্মিক—অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধার্মিক—রাক্ষসদের ধ্বংস তার ফুলিশনেসের ফল।

মুখুজ্জে মশায়ের কটুকাটব্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে, ঝাল আছে জ্বালা নেই। কোনখানে প্রচ্ছন্ন মিষ্টতা আছে কটুস্বাদের মধ্যে। ও'র এই গালাগালি শুনে যে গালাগালিটা খায় সেও মৃদু মৃদু হাসে।

হেসে সাধনা দেবী বলেছিলেন—না, না—ভুনি আমাকে কিছু বলেনি। আপনি বিশ্বাস করুন।

—তা হলে জগজ্জননীরূপিণী সবজাতের মা—ভুনির গর্ভধারিণী নলিনী বউমা।

—না, তিনিও বলেননি।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার ক্রুদ্ধভাবে মুখুজ্জে বলেছিলেন—তা হলে তোমার মাথায় সেই মিশনারীদের ঢোকানো পোকার কর্ম। ধাক্কা খেয়ে চুপ করে ছিল ক'দিন—এবার কিলবিল করে নড়ে উঠেছে। শোনো বাছা—আমার সোজা কথাটা শোনো—আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি—আমি ছোটখাটো ব্যক্তি, হিন্দু বাঙালী, আমার ওসব বিশ্বপ্রেম সহ্য হয় না। তোমার ভাল লাগে তুমি কর; আমার বারণ করা কর্তব্য, করব; না শোনো, আমি সরে যাব। তবে চুপচাপ যাওয়া আমার স্বভাব নয়, গালাগাল দিয়ে যাব, আর ভবিষ্যদ্বাণী করে যাব—ভবিষ্যতে তুমি ঠকবে—তুমি ঠকবে—তুমি ঠকবে।

এ কথায় সাধনা দেবীর ক্ষোভ হয় নি—তিনি এ থেকে বরং স্নেহের স্পর্শই অনুভব করেছিলেন—মৃদু হেসে বলেছিলেন—না, না—আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক—তাই করব আমি।

বৃদ্ধ মুখুজ্জে সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন—আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি মা।

—সে কি আমি জানি না? জানি।

—ওই! মা, ওই! লোকে যে নিজের জানা আর বোঝাটাকেই নির্ভুল মনে করে!

—না, আমি তা মনে করি না। করবও না কখনও।

পরিতুষ্ট হয়ে মুখুজ্জে মশাই চলে গিয়েছিলেন এবং উদ্যোগ আয়োজন সবই প্রায় তিনিই করেছেন; সহানুভূতি অবশ্য সকলেরই পেয়েছেন; ওই হরিসভা অঞ্চলের বাঙালীর বাড়ির ছোট ছোট ছেলেদের সকলকেই প্রায় ভরতি করে দিয়েছেন।

পাড়ায় বড়রাস্তার পুরনো আমলের সিনহা সাহেবদের বাড়ির ছেলেরা সায়েবী ইস্কুলে পড়ে—তাঁরা ছেলে পাঠান নি, কিন্তু স্বেচ্ছায় কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলেন—তা মুখুজ্জে নেন নি। বলেছিলেন—আপনি বোধ হয় শোনেন নি মিস্টার সিনহা যে—প্রথম যখন আমরা ফান্ড তুলে ও'কে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম তখন মেয়েটি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—যখন অক্ষম হব তখন নিজেই গিয়ে হাত পাতব। যতক্ষণ খেটে খেতে পারি ততক্ষণ খেটে খেতে চাই। পাঠশালার আইডিয়া তখন হল। আমার মনে হচ্ছে—এ সাহায্য উনি নিতে চাইবেন না। আর আমিও নিতে তো বলতে পারব না। থাক না। যখন দরকার

হবে তখন দেবেন।

সিনহা সাহেব হেসে বলেছিলেন—কেন? দোষটা কি? ধরুন হরিসভায় তো ঠিক আমার যাকে ইণ্টারেস্ট বলে তা নেই; ক্বচিৎ কখনও বড় কীর্তনগায়ক কি পণ্ডিত এলে যাই। আধঘণ্টার বেশী থাকি নে। হরির লুটের বাতাসাও খাই নে। কিন্তু চাঁদা দি।

হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন মুখুজ্জে। হেসে বলেছিলেন—কি যে বলেন মিস্টার সিনহা—কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন? হরির সঙ্গে শিবেন ভটচাজ্জির স্ত্রীর? হরিটা হল নির্লজ্জ অথবা হরি হলেন মহারাজার মহারাজা। নির্লজ্জ ভিক্ষুককে কড়া কথা বলে ভিক্ষে দেন—সে নেয়—তার মান-অপমান-বোধই নেই। যত সব শুয়ারের বাচ্চা বলে পয়সার বদলে ডবল পয়সা দিলে—কুড়িয়ে নিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে যায়। আর রাজা মহারাজা যিনি—তাঁর ট্যাক্স খুশী হয়ে জয় মহারাজ বলে দিলেও নেন আবার মনে মনে শালার জ্বালায় জীবনটা গেল বলে দিলেও তিনি নেন। না দিলে—সার্টিফিকেট করে আদায় করেন। তখন আবার আমলা-পেয়াদাদের ঘুষ দিয়ে সময় নিতে হয়—মহামহিম মহিমার্ণব বলে দরখাস্ত করতে হয়; দেখেছেন তো—সংসারে শান্তি স্বস্ত্যয়নে নবগ্রহ ইত্যাদি পেয়াদাগুলোকে ঘুষ তো কম দিই নে আমরা। এ যে মানুষ স্যার। রক্তমাংসের মানুষ। মধ্যবিত্ত।

ডান হাতের অনামিকায় ও কনিষ্ঠায় একটা নীলা ও একটা পলার আংটিতে বাঁ হাতের আঙুলগুলি আপনি এসে পড়েছিল সিনহা সাহেবের। মুখে কিছু বলেন নি—তবে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলেছিলেন—তা হলে আর একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আমাদের বাচ্চাগুলো তো মিশনারী ইস্কুলে প্রায় ইংরিজীতে হাতেখড়ি নেয়। তার সঙ্গে এ দেশ বলে হিন্দীও রেখেছে। বাংলাটা ঠিক ছেলেবয়সে লেখাপড়া শেখার মত শেখা হয় না। আমার বড় দুটো নাতি এবার স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে—বাঙলা আছে। বলতেও পারে—শেখা বাঙলা; নাটক-নভেলও পড়ে। কিন্তু লিখতে বললেই সর্বনাশ। ওদের জন্যে একশো টাকা দিয়ে আজ ছ মাস একজন প্রফেসর রেখেছি। তাও কি করবে ভগবান জানেন। তা ওঁকে বলুন—উনি সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টাখানেক করে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগটা পড়ান না। চারটে বাচ্চা আছে—কুড়ি টাকা দেব।

—বলে দেখি উনি কি বলেন!

—আরে মশায়, আপনি যা বলবেন তাই হবে। অন্ততঃ হওয়াবেন। ওখানে তো আপনি সে আমলের ন্যায়রত্ন স্মৃতিতীর্থ—আরও পুরনো আমলের দুর্বাসা অগস্ত্য। এ আমলে—বাঙালী সমাজের গ্রেট ডিক্টেটর!

হেসে মুখুজ্জে বলেছিলেন—না মিস্টার সিনহা, মেয়েটির জাত আলাদা।

—বলেন কি?

—নিশ্চয়! যে মানুষ অভাবের সময় দিলে নেয় না, যে ক্ষুধার্ত আহার্য দিতে গেলে বলে আমি স্বপাক খাই সুতরাং মাপ করবেন খেতে পারব না—তার জাত আলাদা—এ তো সে বলেই দেয়। এদের জানের চেয়ে জাত বড়। বলুন ঠিক বলেছি কি না?

সিনহা একটু চুপ করে থেকে বললেন—হ্যাঁ, তা ঠিক।

আবার একটু ভেবে বললেন—তা হলে বলার দরকার নেই। কারণ কি জানি পড়াতে এসে কোথায় কোন খুঁতে বা ছুতোয় অপরাধ ধরে বসেন। তাই নিয়ে—। নাঃ, দরকার নেই। জাত ভাল জিনিস। কিন্তু জাত কমপ্লেক্স ডেঞ্জারাস মুখুজ্জে মশায়।

—সেও মিথ্যে নয়। ওদের মন এখন বড় 'টাচি' হয়ে আছে। তবে আইডিয়াটা ছাড়বেন না। বাচ্চাদের বাংলা পড়ান।

সিনহা বললেন—আমি নেহাত দয়াবশে বলিনি, মুখুজ্জে মশায়। গরজ ছিল। ওঁর মেয়ে আমার এক নাতনীর সঙ্গে পড়ে। সে নাকি বড় ভাল মেয়ে। পড়াশোনাতেও বটে আচার-আচরণেও বটে। শুনেছি—ওর মা ওকে পড়ান বাড়িতে। আমার বাড়িতে দু-একদিন এসেছে, নাতনীর জন্মদিনে এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল। ওয়েল-বিহেভ্ড। ম্যানারস্ খুব ভাল। বোধ হয় এই সব কাণ্ডের পর আমার নাতনীর সহানুভূতি বেশী হয়েছে। ছেলেমানুষ—ইস্কুলে আলাপটা একটু গাঢ় করে তুলেছে। জন্মদিনে আমাকে না জানিয়েই নিমন্ত্রণ করেছে। আমি জানলে কখনই করতে দিতুম না।—Ah—no—no sir—মুখুজ্জে মশাই আপনি ভুল বুঝবেন না আমাকে। আমাদের এইসব সোফিস্টিকেটেড সমাজে নিমন্ত্রণ রাখতে খরচ হয়। তা ছাড়া সদ্য ঘটেছে ব্যাপারগুলো ; কে জানে কে কি কমেণ্ট করবে, সেই জন্যে।

মুখুজ্জে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই লক্ষ্য করেই কথাগুলো বললেন মিস্টার সিনহা।

মুখুজ্জে মশাই কৈফিয়ত শুনে শান্ত হলেন। এবং একটু ফাঁক পেয়েই আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা। কিন্তু সিনহা বললেন—আগে গল্পটা শুনুন মশাই। মেয়েটি আমাকে বাংলা শিখিয়ে গেল। কোথাকার একটা Test Paper-এ বাংলার কোশ্চেন দেখছিল। তাতে রয়েছে—অর্থ লিখ—জিঘাংসা, জিগমিষা, বিজিগীষা, জুগোপিষা, জুগুপ্সা। কি কাণ্ড বলুন দেখি! ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র কবে বিগত। আমি বাংলাদেশ ছেড়েছি কবে। এদিকে শরৎচন্দ্রও ব্যাকডেটেড হয়ে গেছেন—এখন নাকি ওই সব মানে আর মনে থাকে! জিঘাংসা-জুগুপ্সাটা মনে ছিল। ও মেয়েটি কিন্তু সব বলে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমার মত একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে বিচারক মান্য করে—আমার কাছে জিগমিষা, বিজিগীষা, জুগোপিষা নিয়ে আমার মহাসংকট, তখন মান্যরক্ষার্থে বললাম - ভাল—তুমি লেখ কাগজে মানেগুলো। এবং নাতনীকে বললাম—তুমি অভিধান খোল। দেখ—প্রত্যেকটি মিলিয়ে দেখ। মিলে গেল, আমি কাগজখানা টেনে নিয়ে পরীক্ষকের গাম্ভীর্য নিয়ে পেনটা খুলে—একটা বড় R বসিয়ে 100 নম্বর দিয়ে বললাম—দিস ইজ ইওর প্রাইজ, বলে পেনটা ওকে দিলাম কিন্তু কিছুতেই নিলে না। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। ভারী ভাল লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—এসব শব্দের অর্থ শিখলে কেমন করে? এসব তো পড়ার বইয়ে থাকে না। বললে—বাড়িতে বাইরের বই পড়ি। মা মানেগুলো ডিক্সনারি থেকে দেখে নিতে বলেন। 'বিজিগীষা' পেয়েছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র—মানে দেখছিলাম—ভুনিদা এসে বললেন—বল তো জিঘাংসা জিগমিষা জুগোপিষা মানে কি? জুগোপিষার নীচেই আছে জুগুপ্সা। তাতেই শিখেছিলাম। খুব ভাল লাগল। ভেরী শার্প—তেমনি ডিগ্‌নিফায়েড। কিন্তু নাতনী এনে দেখালে ও একখানা সুন্দর রুমাল প্রেজেণ্ট দিয়েছে। সিল্কের কাপড় কিনে নিজে তৈরি করেছে অবশ্য কিন্তু কাপড়ের দামটা তো লেগেছে! যাবার সময় কিছু মিষ্টি দিতে চেয়েছিলাম—তাও সে নেয় নি।

—নেবে না। আপনি ঠিক বলেছেন—একটা কম্‌প্লেক্স জন্মাচ্ছে বোধ হয়। আমার মতন। বুঝলেন মিঃ সিনহা—আমি বুঝতে পারি—আমার সেই পুরনো কালে যখন আমি পুরোহিতেরই কাজ করি তখন যে সেন বলেছিলেন—পুরুতগিরি করছ—দক্ষিণে নেবে মন্ত্র পড়বে—চলে যাবে। এ সব বিচার-টিচার ছাড়। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার আবার কে সওয়ার হচ্ছে তার বিচার! সেইটের ধাক্কায় পাসটাস করে প্রফেসর হলাম, সমাজে একেবারে চাবুক হাতে করলাম। সেটা বুড়োবয়সেও গেল না। আপনার এখানেই বারকয়েক শিরাগুলো টান হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা, আমি ওকে বলব।

বলেছিলেন মুখুজ্জে। শিবেনবাবুর স্ত্রী রাজী হয়েছিলেন। হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে

এসে দাঁড়িয়েছিল উমা। এবং বলেছিল—না।

দুজনেই সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।—মা বলেছিলেন—কি ?

উমা বলেছিল—না। ও'দের বাড়িতে তুমি পড়াতে যেয়ো না। ও চাকরি তুমি নিয়ো না।

—কেন ?

অনবুঝের মতই উমা বলেছিল—না।

হেসে মুখুজ্জে বলেছিলেন—তোর বন্ধুর ভাই-বোনদের মাস্টার হবে—গুরু হবে—চাকর তো হবে না! লজ্জা কিসের হচ্ছে তোর ?

মাও তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—ছি! আমরা গরিব। আমরা তো ও'দের সমকক্ষ নই। পড়িয়ে মাইনে নেব তাতে তার কাছে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত নয়।

এবার উমা হঠাৎ ঘাড়টা তুলে সোজা তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—না, আমার বন্ধুর কাছে আমার কোন লজ্জা হবে না এতে। আমার বন্ধুর মা—তোমাকে অনেক দয়া করতে চাইবে—সেও তোমার সহ্য হবে না—আবার চটলে হয়তো ঝি-চাকরকে যেমন করে বলে তেমনি করে বলবে। তুমি ওদের চাকরি করো না।

মুখুজ্জে মশাই এবং উমার মা সাধনা দুজনেই চুপ করে গিয়েছিলেন।

একটু পর প্রথম কথা বলেছিলেন মুখুজ্জে মশাই। বলেছিলেন প্রথম ছোট্ট একটি - হুঁ। তারপর একটু পরই জজসাহেবের মত রায় দিয়েছিলেন বা বাড়ির কর্তার মত হুকুমজারি করেছিলেন—ঠিক বলেছে তোমার মেয়ে। এ কাজ তোমার করা হবে না। কষ্ট তোমাদের হবে। পাঠশালার মাইনেতে আর সেলাইয়ের উপার্জনে তোমাদের ঠিক কুলোবে না, তা হোক—কষ্ট করতে হবে। এ কাজ করা হবে না। আর দু-একটা প্রাইভেট টিউশন দেখি। এখন পাঠশালা তো আরম্ভ কর। দোসরা আশ্বিন পাঠশালা খোলার দিন। বৃহস্পতিবার। বিদ্যারম্ভ গুরুবারেই প্রশস্ত।

* * *

পয়লা আশ্বিন—নলিনী দেবীর, ভুনির মায়ের, কথাটা মনে হল।—সকালে আটটায় পাঠশালা শুরু, সাধনাকে সাড়ে সাতটায় অন্ততঃ পেঁছুতে হবে। ফিরতে এগারটা। উমার স্কুল দশটায়। এগারটায় ফিরে সাধনা স্নান করে রান্না করতে পারে, খেতে দেড়টা হোক সে এমন কিছু মারাত্মক হবে না কিন্তু মেয়েটার খাওয়ার কি হবে ? কথাটা তাঁর আগেই ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এ কয়েক-দিন নানান কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন—ভাববার মত মনই ছিল না। নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন। এবং শিবেনবাবুর বাড়ি এসে বিনা ভূমিকায় বললেন—হ্যাঁরে সাধনা, তুই তো পাঠশালায় মাস্টারনীগিরি করতে চলেছিস—কিন্তু উমার খাওয়ার কি হবে ? ভোররাত্রে উঠে ভাতেভাত রান্না সেরে নেওয়া হয়তো হয়, উমাও না হয় দশটায় খেয়ে যেতে পারে কিন্তু পাঠশালা সেরে তোর বেলায় তো সে গয়াসুরের মাথার বস্তু হয়ে যাবে। সে তো আর নিত্যি গেলা যায় না। আর পাঠশালা থেকে ফিরে রান্না করলে তুই না হয়, চাকরি পেয়েছিস, যেমন তেমন চাকরী—ঘি ভাত খেতে পারিস কিন্তু উমা তো ইস্কুল থেকে এসে টিফিনে খেতে পারবে না। দূরটা তো কম না। দাঈটাকেও তো চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিস।

সাধনা হেসে ফেললেন নলিনীদির একসঙ্গে এতগুলো কথা হুড়হুড় করে বলার ভঙ্গীটা দেখে। অবশ্য নলিনীদির ভঙ্গীটা চিরকালই এই রকম ; হয়তো বা সংসারে যাঁরা নিজেদেরই একমাত্র সাবালক ভেবে দুনিয়াসুদ্ধ নাবালকদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজে থেকে তাঁদের সবার ভঙ্গীটাই এই ধরনের। এবং নলিনীদি তো ভালবাসার জোরে—তাদের প্রায় সার্টি-ফায়েড গার্জেন—তবুও আজকের এই দুশ্চিন্তা এবং হুড়মুড় করে তাদের মা-মেয়ের খাওয়ার

সমস্যাটাকে জটিল থেকে জটিলতর করে নেওয়ার ধরন দেখে না হেসে পারলেন না।

নলিনী দেবী বললেন—হাসির পরে। এখন ঠিক করেছিস কি শুনি ?

—পাকাপোক্তভাবে কিছুই এখনও ঠিক করি নি—তবে দুটো ভেবে রেখেছি। একটা হল—রাত্রে রুটি তরকারি যা হবে তাই রেখে দেব—উমা নিজে গরম করে নিয়ে খেয়ে ইস্কুল যাবে। আর একটা হল—ভোরে উঠে রান্না করে নেব। অথবা দুটোই চালাব। একটা শীতে অন্যটা গ্রীষ্মে।

—তার মানে তো মেয়েটার ছ মাস ভাত বন্ধ।

—তার আর কি করব ?

—আমার বাড়িতে তো উমা খেয়ে যেতে পারে। না, তাতে তোর লজ্জা হবে !

—লজ্জা না হয় নাই হল দিদি। সে তুমিও জান—তোমার কাছে লজ্জা আমি সত্যিই করি নে—কিন্তু বল তো—তুমিই বা সকাল সকাল রান্না করে নিয়ে নিজেদের খাদ্য অখাদ্য করে তুলবে কেন ? তোমরা নিজেরা মা—দুই ছেলে কেউ একটার আগে খাও না। গয়াসুরের মাথার বস্তু মরে যারা হিমরাজ্যে যায় তাদের জন্যে—সে আমার না সইলে তোমাদের সইবে বা ভাল লাগবে কি করে বল শুনি ?

নলিনী দেবী বললেন—আমাদের সংসারের কথা ছাড়। সে সব তুই ভাল করেই জানিস। ভুনি দুনি তো মাসের মধ্যে পনের দিন বাইরে, কোন দিন এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন কোন দিন সেন্ধমেন্ধ, কোন দিন ডাল রুটি কোন দিন ছাতু কোন দিন উপোস। জেলে থাকলে—লপ্‌সি। আমার নিজেরও তাই। চক্ষুলজ্জাও নেই। ওই দেখ না—মনোর ছেলেকে পড়তে আনালাম এখানে নিজে লিখে-লিখে, তারপর দেখি—ও বাবা, কুটুমের ছেলে নিয়ে যে বিপদ। তার উপর ভাল খাওয়া অভ্যেস মনোর ছেলের। ভেবেচিন্তে ওকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিলাম। ওখানে থাকগে বাবা। সে-সব নয়। তোকে দয়াও করতে আসি নি, তবে মেয়েটা যে নেহাৎ কচি—এগার বারো তো বয়েস ; এখন এক বেলা তাও দিনের বেলা উপোস বা আধখাওয়া সইবে কেন ? সকালে আমার দাঈ ওকে চারটি ফুটিয়ে ভাতেভাত করে দিতে পারে। তাতে তোর লজ্জা হওয়া উচিত নয়।

চুপ করে রইলেন সাধনা—উমার মা।

নলিনী প্রশ্ন করলেন—চুপ করে রইলি যে ! সকলের বেলায় হয়তো মৌনং সম্মতিলক্ষণং কিন্তু তোর বেলায় ঠিক তা নয়। অনিচ্ছে থাকলেও অনেকে চুপ করে থাকে চক্ষুলজ্জায়। চক্ষুলজ্জার সুযোগ তুই শেষ পর্যন্ত দিবি নে সেও জানি, আর তুইও জানিস যে আমি চক্ষুলজ্জার সুযোগ নিই নে। বল তোর মনের কথাটা বল।

সাধনা বললেন এবার—তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি; যা হোক ব্যবস্থা হয়ে যাবে, করে নেব।

—বেশ। তাই করে নিস। আমি আর বলব না। তবে—

—বল। তবে বলে চুপ করলে যে ! 'তবে' বলে তুমি চুপ করলে ভয় পাই। সবার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়তে পারি—তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কাকে নিয়ে থাকব বল।

—তুই ছাড়লেও আমি ছাড়ব না। সে ভয় করিস নে। ভয় তোর নিজের জন্যে সাধনা। সংসারে সব লোককেই পর ভাবা একটা ব্যাধি। ওতে দুঃখ বাড়ে নিজেরই। মনে হচ্ছে সেই ব্যাধি তোকে চেপে ধরছে। আমার কাছেও তোর কিন্তু—?

সাধনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কথাটা তুমি সত্যিই বলেছ দিদি। তবে একটু হয়তো অন্যরকম। আমি সকলকেই পর ভাবি নে। আমার বরং ঠিক উলটো, মনে হচ্ছে সকলের কাছেই আমাদের অপরাধ পাহাড় হয়ে জমে উঠেছে—ওঁর ব্যবহারে। সকলকে আঘাত করে গেছেন—কটু কথা বলেছেন, অবজ্ঞা করেছেন। তাঁদের কাছে আজ উপকার নেব

কোন্ অধিকারে ? কটু কথা বলতেন তোমাদেরও। অবজ্ঞা করতেন তোমাদেরও। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু আমি তো জানি।

—না। সে আমিও জানি। কিন্তু তার অপরাধ তোরা ঘাড়ে নিচ্ছিস কেন ?

—না নিলে বড্ড ছোট হয়ে যাই দিদি। ভাবতেও দুঃখ পাই, মর্মান্তিক দুঃখ—মৃত্যুর পর যদি পরলোক থাকে তবে সেই লোকে থেকে যে দুঃখ পেয়ে সংসারে থেকে গেছেন—যার জন্যে হয়তো আত্মহত্যা করেছেন—যা রাখবার তাঁর জায়গা নেই—তার উপরে এই কঠিন দুঃখ তাঁকে দেওয়া হবে। বল তুমি—হবে না ?

নলিনী বললেন - এটা তোর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হচ্ছে যেন সাধনা।

সাধনা একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে আর শাকটা সরিয়ে মাছখানা বের করে লজ্জা দিয়ো না দিদি। গরিবের সদাই ভয়—বুঝি মর্যাদা গেল—হারালাম, নিজের দোষে হারালাম। আমার সেই মর্যাদাটুকু রাখতে দাও।

নলিনী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বোধ হয় আত্মসম্বরণ করলেন। তারপর বললেন—কিছু মনে করিস নে ভাই। যা ভাল বুঝিস, কর। আচ্ছা চলি।

চলে গেলেন তিনি।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সাধনা। ভেবে বোধ হয় দেখলেন—তাঁর কথাগুলো অন্যায় এবং রূঢ় হয়েছে কিনা। না। কিছু অন্যায় হয় নি। রূঢ় হয়তো হয়েছে। কিন্তু উপকার নিয়ে করুণা নিয়ে মাথা হেঁট করে ছোট হয়ে বাঁচতে চান না—বাঁচবেন না তিনি ! না, বাঁচবেন না। তার থেকে মরা ভাল। এই তো মধ্যে মধ্যে একজন ভিখিরী বাঙালীর ছেলে বাঙালীদের দোরে দোরে ভিক্ষে করতে আসে। কথা বলবার একটা সকরুণ অথচ মর্যাদাসম্পন্ন সুর ও ভঙ্গী আবিষ্কার করে অভ্যাস করেছে—"শুনছেন দাদা, শুনছেন ; আমি ভাল ঘরের ছেলে, একদিন আমাদের অনেক ছিল, আমিও চাকরি করতাম, অন্যায় করে এদেশের হিন্দুস্থানী উপরওয়ালা আমার চাকরি খেয়েছে। এখন আমি বেকার। আজ তিন চার দিন স্ত্রীপুত্র নিয়ে উপবাসে কাটাচ্ছি। আপনি বাঙালী ভদ্রলোক, আমিও বাঙালী ভদ্রলোক। আপনি বাঙালীর ইজ্জত বাঁচান। কিছু দেবেন আমাকে ! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—বাঙালী ছাড়া বাঙালীকে কে রক্ষা করবে ?"

উপকার নিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত মনকে ইজ্জতবোধকে পিটিয়ে পিটিয়ে ভোঁতা করে কি ওইরকম করে ফেলবেন ?

না। তা তিনি পারবেন না।

পৃথিবীতে সংসার দেনা-পাওনার সংসার। কিছু নিলে কিছু দিতে হয়। কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিছু পেলে কিছু দিতে হবে। সে-দেনা তিনি করবেন না। সুদে আসলে পাহাড় হয়ে বুকে চেপে শ্বাস রোধ করবে। তিনি তা কিছুতেই করবেন না। যে যাই ভাবুক। ওই বড়লোকের ছেলেটা কাগজ বের করতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল তাঁর স্বামীকে। টাকাটা লোকসান গেল। তাই তাদের কাছে নিজেদের অজ্ঞাতসারে খত লিখে দিতে হয়েছিল। তাঁদের সংসারে এসে সে ঢুকেছিল—অন্যায় মনে হয় নি। এত বড় পাষণ্ডকে ভাল ছেলে মনে হয়েছে। যে পাষণ্ড পল্লীগ্রামের মহাজন যেমন খাতকের বাড়ির ক্ষেতের ফসল গাছের ফল গরুর দুধ পাওনার অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে নিয়ে যায়—তেমনি ভাবেই রমার পবিত্র কৌমার্য নিয়ে চলে গেল ; গোটা সংসারের বংশের মুখে কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়ে গেল। সে ভুল তিনি আর করবেন না।

* * * *

ভোরবেলাতেই রান্না সারলেন। ভাত নয় ; রুটিই করলেন। রুটিই ভাল। দুপুরবেলা

ফিরে এসে ওই রুটিই খাবেন। তরকারিটা একটু গরম করে নেবেন। উমাও রুটি খেয়েই যাবে এবং ওই রুটিই দুখানা টিফিনের কৌটোয় ভরে নিয়ে যাবে। সব সেরে আটটায় তৈরী হয়ে তিনি স্বামীর ফটোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। বললেন—তোমার মর্যাদা যেন বজায় রাখতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। তোমাকে যেন আর দুঃখ না দিই—অপমান না করি।

চোখে জল এল। রোধ করতে পারেন নি। সে জল মুছে ফেলে একখানা চাদর জড়িয়ে নিয়ে ছোট একটি সুটকেসের মধ্যে বই খাতা কলম কাগজ পুরে নিয়ে সেইটি হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন।

উমা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল হাসিমুখে। তার এ ভারী ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। মা যে তার এমন মা তা সে আগে জানত না। বাবার সময়ের সে মা আর এ মা যেন সম্পূর্ণ আলাদা। সে মা মাটির পৃথিবীর মতই বোবা আর সহনশীলা। এ মা তার যেন মাটির আবরণ কাটিয়ে উপরে উঠেছেন। আর কারুরই তাঁকে মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

সাধনা বললেন—তুই তা হলে ঠিক সময়ে নেয়ে খেয়ে তৈরী হয়ে নিস। তাগিদ দেবার জন্যে আমি রইলাম না। আর চাবিটা নলিনীদির বাড়ি দাঈকে দিয়ে যাস।

—দেব। তুমি কিসসু ভেবো না। আমি পেট ভরে খেয়ে নেব। টিফিন-কেরিয়ারে রুটি তরকারি নেব।

—একটু চিনি আছে। নিয়ে নিস।

—নেব। ঠিক সময়ে চান করব। চাবি ভুনিদাদের দাঈকে দিয়ে যাব।

—আচ্ছা। বলে একটু হাসলেন সাধনা।—বলেও আবার বললেন—যাই।

—এস। কিসসু ভেবো না। কিছুতে যেন ভড়কে যেও না। ছেলেগুলো গোলমাল করলেও চটো না। মাথা খারাপ করো না। হ্যাঁ?

হাসিটা বিস্তৃততর হল মায়ের মুখে; বললেন—তুইও ভাবিস নে। সে আমি ঠিক করব।

—হ্যাঁ খুব ভাল করে পড়িয়ো।

সাধনাদের বাড়ি থেকে হরিসভা নেহাত কাছে নয়। তবু পায়ে হেঁটেই গেলেন সাধনা। হরিসভায় তখন ছোট ছেলের দলকে মুখুজ্জে মশাই সারিবন্ধভাবে বসিয়েছেন; এবং কৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করাচ্ছেন। সাধনা আসতেই বললেন—নাও মা, তোমার গোধনদের আমি এতক্ষণ কোন রকমে আটকে রেখেছি। এইবার তোমার ভার তুমি নাও। তা বড় ভাল দিনে পাঠশালা খুলছ মা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোহিমার ধারে কাছে এসে পৌঁছে গেছেন। ইংরেজ রাজত্ব নড়ো নড়ো। পড়লো বলে!

মাস চারেক পর, জানুয়ারী মাস; রাত্রি তখন দশটা। পশ্চিমের শীতার্ত রাত্রির প্রথম প্রহর। রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে পড়েছে। এক পুরানো শহরে রাস্তায় বাজারে কিছু লোকজন তখনও ঘুরছে। দোকানদানী আগেই বন্ধ হয়েছে; কালে কালে নানান পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দোকান আইন হয়েছে। আগের কালের মত ইচ্ছামত যতক্ষণ খুশী দোকান খোলা থাকে না। এক দেহব্যবসায়ের পল্লী শুধু জেগে থাকে। বন্ধ দরজার মধ্যে হই-হুল্লোড় গানবাজনা চলে। বসতির পল্লীগুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘরের আলোও নিভে গেছে।

ভুনিদের বাড়িতে কেউ ছিল না; ভুনি দুনি মা নলিনী দেবী তিনজনেই বাইরে গেছেন। ঘরে আছে শুধু পুরানো দাঈ। বিচিত্র সংসার এদের, মা ছেলে সবাই উৎকণ্ঠিত; ২৬শে জানুয়ারী আসছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণের পবিত্র দিন, এ দিনে

কি করা হবে—কেমন করে করা হবে তারই পরামর্শের জন্য কোথাও গেছেন। বলে যান নি।

দেশের নেতারা কারারুদ্ধ। মহাত্মাজী, পণ্ডিত জওহরলাল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—সকলেই বন্দী। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে আন্দোলন চালিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ অশোক মেটা রামমনোহর লোহিয়ার দল। যুদ্ধ-বিপর্যস্ত ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতিতে নিদারুণ অত্যাচারে সে আন্দোলন স্তিমিত - স্তব্ধপ্রায়। তাঁদেরও অনেকে ধরা পড়েছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে এসে করাঘাত করছেন।

এক কম্যুনিস্টেরা যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা ভিন্ন মত পোষণ করে।

এ যুদ্ধে একপক্ষে স্বেচ্ছাচারী—মানবসভ্যতার পক্ষে ভীতিপ্রদ নাৎসী শক্তি—অন্যপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নবজাগ্রত শক্তির মূলকেন্দ্র রাশিয়া জড়িয়ে গেছে—বাধ্য হয়ে। আজ মিত্রপক্ষের পরাজয়ের অর্থ—রাশিয়ারও পরাজয়; এবং সে পরাজয়ের অর্থ—বহু জীবনমূল্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক শক্তির ধ্বংস। তাতে মানবসভ্যতার চরম অকল্যাণ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আজ যদি জাপান জার্মানীর সহযোগিতায় সম্ভবপরও হয় তবে তার অর্থ হবে—ভারতবর্ষে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাদের মতে সুভাষচন্দ্র নাৎসীদিগের সহযোগিতা গ্রহণ করে অমার্জনীয় দোষদুষ্ট হয়েছেন। ইংরেজই শুধু ফরোয়ার্ড ব্লককে মারাত্মক শত্রু মনে করে না; এরাও করে। ছাত্র মহলে কর্মী মহলে এ নিয়ে মধ্যে মধ্যে বিরোধ হয় সংঘর্ষও হয়। কম্যুনিস্ট কর্মী ও ছাত্র এবং ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী ও ছাত্রের মধ্যেই শুধু নয়—দুই পক্ষের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যেও হয়। শেষের শ্রেণীতেই লোক বেশী সুতরাং ওখানেই কলরব হয় বেশী। আসল কম্যুনিস্ট এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী ও ছাত্র মহলের উভয়পক্ষে যে কলহ সংঘর্ষ হয় সেখানে কলরব কম কিন্তু সে সংঘর্ষ হয় মারাত্মক।

যুদ্ধ ওদিকে পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। জার্মানীর গতি স্তব্ধ হয়েছে ইউরোপে। ইংরেজ মার খেয়েছে প্রচণ্ড। সে প্রহার সহ্য করেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকা তার অফুরন্ত সাহায্যসম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম পূর্ব সীমান্তের সর্বত্র। জাপানের গতিও স্তব্ধ। সব যেন থমথম করছে।

ভারতবর্ষে মানুষের বুকে অবরুদ্ধ ক্ষোভ টগবগ করে ফুটছে। সাধারণ লোক - সমাজ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় ভয় পায়। কারণ তাদের বিশ্বাস—এ বিরোধিতার সংবাদ অবিলম্বে ইংরেজদের পুলিসদপ্তরে পেঁছে যাবে। তার ফল শুভ হবে না। ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস—দুই প্রতিষ্ঠানই নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

এ ক্ষেত্রে ২৬শে জানুয়ারীর জন্য ভুনি দুনি এবং নলিনী দেবীর কর্তব্যের উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। কোথায় গিয়েছেন কাউকেই বলে যান নি। সাধনা দেবীকেও বলে যান নি। উমা ছেলেমানুষ, তাকে বলার কথা ওঠেই না। রাজনীতিতে মন্ত্রগুপ্তির মত উদ্দেশ্যগুপ্তি যেন অপরিহার্য। কংগ্রেস নেতাদের এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য এবং বিরোধ বাঙালীদের অন্তরে একটা সক্ষোভ বেদনার মত সঞ্চিত হয়ে আছে। কংগ্রেসের সমর্থক অনেক বাঙালী আছেন এখানে অর্থাৎ এলাহাবাদে তবু অন্তরে অন্তরে সুভাষচন্দ্রের বীর্য এবং দুঃসাহসের মুগ্ধভক্তই বেশী। তরুণদের মধ্যে কিছু রাশিয়ার ভক্ত আছে। সুতরাং এ কথা কাউকেই তারা বলে যায় নি। ওই বুড়ী দাঈটা হয়তো জানে কিন্তু তার কাছ থেকে এ কথা

বের করতে পুলিসেরও সাধ্য নেই। বুড়ী সদর দরজার পাশেই একটা ঘরে শুয়ে আছে। যদি রাত্রে তারা ফেরে তবে দরজা খুলে দেবে।

রাত্রি তখন দশটা।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। বুড়ীর সবে ঘুমটি এসেছিল। সে উঠে বসল বিছানার উপর। আবার কড়া নড়ে উঠল। শব্দটা যেন দ্রুত—অত্যন্ত ব্রস্তভাবে কেউ কড়া নাড়ছে। বুড়ীর—দাঈটার ডাকনামই বুড়ী দাঈ; ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল।—কে? কি ব্যাপার? ভুনি দুনি বহুমার মধ্যে কেউ নয়। এ কড়ানাড়ার শব্দের মধ্যে যতই ত্রস্ততা থাক—সে সংকেত তো নেই!

কিন্তু কেউ তো তাদের কোন সংবাদ এনে থাকতে পারে। কড়ানাড়ার শব্দে মনে হয়—সে খবর শঙ্কার, সে খবর জরুরী।

কিন্তু—। হ্যাঁ—আবার এ দ্রুত কড়ানাড়ার শব্দ তো অসহিষ্ণু উদ্ধত হাতের কড়ানাড়াও হতে পারে! দরজা খুললেই হয়তো কোন উর্দিপরা পুলিস দরোগা রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারে—কাঁহা হ্যায় ই লোক?

তবে তারা হলে এখুনি দরজায় প্রচণ্ড লাথি পড়বে এবং উদ্ধত উচ্চকণ্ঠে হুকুম হবে—কেঁয়াড়ি খোলো। এই! কিন্তু তা পড়ল না। তবে এবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ভুনিদা, ভুনিদা! দুনিদা! মামীমা! মামীমা!

মামীমা? কে? অজয় ববুয়া? মনুয়া বেটীর বেটা? হাঁ। সে তো কালিজে পড়ছে। কালিজে পড়নেওয়ালা লেড়কা লোকের সঙ্গে হোস্টেলে থাকে! বুড়ী তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার পাশে দাঁড়াল।

* * *

অজয় এখানে মাসখানেক থেকেই হোস্টেলে চলে গেছে। হোস্টেলেই থাকে। একটু জোর করেই সে চলে গেছে। মনে মনে সে আঘাত পেয়েছিল। নইলে মনোরমা সেখান থেকে পরে ভেবেচিন্তে লিখেছিলেন—অজুমণি, তুই মামীমার কাছে থাক। সেটাই ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে। বউদির কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। অসুখবিসুখ—তোর অল্প-বয়সে স্বাধীনতার সুযোগ পাওয়া—সব ভেবে আমার তাই মনে হচ্ছে। তোর জীবন তোর চরিত্র—এর চেয়ে তো মানসম্মান বড় নয়! তুই ওখানেই থাক। কিন্তু অজয় থাকে নি। যেদিন মামীমা তাকে ডেকে বললেন—ওরে অজয়—বাবা, উমা এই টাকাটা আর আংটিটা ফিরে দিয়ে গেল। বললে—দিদির বিয়ের যৌতুক—কি করে নেব? দিদি তো নেই!

অজয় বলেছিল—কিন্তু টাকাটা ওঁদের যে মা দিয়েছেন। আর মেয়ের বিয়ের খরচ না থাক টাকার তো ওঁদের অনেক প্রয়োজন। ফিরে নেবার জন্যে তো কেউ দেয় না সংসারে!

উমা কাছেই বসেছিল চুপ করে। সে বলেছিল—দানের টাকা দিয়ে কেউ ফিরে নেয় না। তা হলে যৌতুক বলে আপনারা ওটা দেন নি? দান বলে দিয়েছিলেন? কিন্তু দান আপনারা করলেই আমরা নেব কেন?

বলেই সে উঠে চলে গিয়েছিল।

অজয় মনে মনে অত্যন্ত আহত হয়েছিল, অপমানিত বোধ করেছিল। বেদনা বোধ করেছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভুনি এসে বলেছিল—টাকাটা মুখুজ্জেমশাই চেয়েছেন। ওটা উনি ওই নতুন সাহায্যভাণ্ডারে জমা করে নেবেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই উমা আবার ফিরে এসে আংটিটা নলিনী দেবীর সামনে নামিয়ে দিয়ে

বলেছিল—এইটে জেঠীমা, টাকা আনবার সময় ভুলে গিয়েছিলাম।

নলিনী দেবী বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কি বলবেন ভেবে পান নি। ভুনি বলেছিল—ওটা তুমিই রেখে দাও মা, উমার বিয়ের সময় দিয়ে দেবে। জমা থাক।

—আমার বিয়ে? উমা হেসেছিল।—এর পরেও? তার থেকে ওই মুখুজ্জে দাদুকেই দিয়ে দাও, উনি জমা রাখুন; গরিবের অভাব নেই, গরিবের মেয়ের বিয়েও হয়; সেই রকম কোন বিয়েতে দিয়ে দেবেন।

মেয়েটি হয়তো আরও কিছু বলত কিন্তু তার আগেই অজয় সেটা তুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরে নিয়ে বলেছিল—না; এটা আমি ফিরেই নিলাম।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নলিনী দেবী শঙ্কিত হয়েছিলেন, বুঝেছিলেন অজয় আঘাত পেয়েছে। এর কয়েকদিন পরেই সে প্রস্তাব করেছিল—সে হোস্টেলে যাবে। কারণ অপমান এবং আঘাত সাধনা দেবীদের তরফ থেকে এলেও—এর হেতু যে মামীমা! তিনিই তো পত্র লিখেছিলেন মাকে। সে ক্ষমা করতে পারে নি। নলিনী দেবী যদি ওই একফোঁটা মেয়েটার এই উদ্ধত প্রগল্‌ভতার উত্তরে কয়েকটা কড়া কথা বলতেন তবে না হয় সে বুঝত—হ্যাঁ, তিনি অজয়ের অপমানে নিজেকে অপমানিত বোধ করেছেন। অজয় তাঁর কাছে ওদের থেকে আপন। কিন্তু তিনি তো তা করলেন না। নলিনী দেবী অজয়ের হোস্টেলে যাওয়ার প্রস্তাবেও খুব আপত্তি করেন নি। শুধু বলেছিলেন—এখানে তোর অনেকরকম অসুবিধে হচ্ছে এবং হবেও; কিন্তু তার প্রতিবিধান তো করতে পারব না। তার থেকে তোর হোস্টেল ভাল। তা যা—তাই যা! এখানে তো আমরা রয়েছিই, খোঁজখবর করবই। শুধু মান অপমান অভিমানের উপদ্রব থেকে তুই রক্ষে পাবি। হোস্টেলে একলা না থাকলে ওটা তোর যাবে না। স্বাধীনভাবেও থাকতে শিখবি। তাই যা।

দু তিন দিন পরেই মায়ের চিঠি এসেছিল। সে চিঠি সে মামীমা বা ভুনিদাকে দেখায় নি। হোস্টেলে চলে গিয়েছিল। এবং প্রথম প্রথম আসা-যাওয়া করলেও ইদানীং আসা-যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিল। হোস্টেলে ছেলেদের মধ্যে মিশে সে একটা নতুন স্বাদ পেয়েছে। হইহই করবার অবাধ সুযোগ পেয়েছে। তর্ক-তকরার উল্লাস প্রকাশের অবাধ অধিকার। ভারী ভাল লেগেছে এ জীবন। বিশেষ করে—সচ্ছল আর্থিক অবস্থার জন্য সে একটা প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে ছাত্রসমাজে। আরও একটা বড় মূলধন তার আছে। সে কথায় কথায় বলে—I am from Chittagong—Chittagong of Armoury Raid. আজাদিকে ঝাণ্ডা ময়লোক পহেলে উঠায়া—নাইন্টিন থার্টিমে। ইউনিয়ন জ্যাক উখাড় দিয়া।

ছেলেরা সত্যই এরপর স্তব্ধ হয়ে যায়। অনেকে প্রশ্ন করে—তুমি সূর্য সেনকে দেখেছিলে? অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল? গণেশ ঘোষ? দেখেছ? টেগরা জালালাবাদ পাহাড় ফাইটের?

অজয় খানিকটা সত্য বলে—খানিকটা বাড়িয়ে বলে। সে অনন্ত সিং এবং লোকনাথ বলকে আইনতঃ দেখেছে। উনিশশো তিরিশ সালে তার বয়স তিন-চার বছর। শুনেছে তাঁরা ওদের বাড়িতে আসতেন। তার বাবা, তার পিতামহ ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন না শুধু, রাজনৈতিক মামলা-মকদ্দমায় তাঁরা তাঁদের জন্য লড়েছেন সেবা করেছেন। কিন্তু টেগরা ছেলেমানুষ ছিলেন তখন তিনি আসেন নি। যদি কোনদিন নিঃশব্দে কোন পত্র নিয়ে এসে পত্রখানি তাঁরা বাবার হাতে দিয়েই চলে গিয়ে থাকেন তো তার কোন সাক্ষী নেই। সেই ধরেই সে বলে—আমি তখন খুব ছোট তো। তাঁদের সবাইকেই দেখেছি। আমাকে আদরও করেছেন তাঁরা। আমার মনে আমার মাথায় তাঁদের স্পর্শ আছে।

এতে কম্যুনিস্ট কংগ্রেস ফরোয়ার্ড ব্লক সকল দলেরই সমান আগ্রহ—সমান বিস্ময়।

কারণ অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ আন্দামান থেকেই কম্যুনিজমকেই একমাত্র পথ ঘোষণা করে তাদের দলে যোগ দিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস—এর মধ্যেও অনেকে আছেন। তা ছাড়া ১৯৪৩-৪৪ সালে কর্মীরা নানান দলে বিভক্ত হলেও ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম আর্মারি রেইডের গৌরব যে সকলের। সে কালের এই কর্মীদের দল—কোন বিশেষ দলের একক নন—তাঁরা সেদিন সকল দলের সঙ্গে এক ছিলেন। আজ তাঁরা নিজেরা ঘোষণা করে কোন বিশেষ দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেও সে-গৌরব আজকের দলকে দিতে পারেন নি। এবং একালের ছেলেরা যারা তাঁদের নাম শুনেছে—দেখে নি—তারা একদলের লোক হয়েও নিজেদের—অজয়ের চেয়ে এঁদের নিকটতর আত্মীয়তা যেন দাবি করতে পারে না। শুধু এই মূলধনের গৌরবে অজয় ছাত্রমহলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে বাধ্য হয়ে নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী বলে ঘোষণা না করলেও প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি স্বীকার করে নিয়েছিল। তার উপর সে ভুনির পিসতুত ভাই।

কেউ তাকে সে কোন্ দলের এ প্রশ্ন করলে সে হাসত। কোন জবাব দিত না।

চট্টগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মীয়তার গৌরবে গৌরবান্বিত সে কংগ্রেসের অহিংসার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করত। নেতাজী বড় না গান্ধীজী বড়—এ তর্কে সে নেতাজীকে সমর্থন করত। এমনি ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সে নিজেই অনুভব করলে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দল ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছে। তাতে সে ভয় পায় নি, বরং উন্মাদনাই অনুভব করেছিল। এবং তার বিরোধ বেধে গিয়েছিল পিউপল্‌স্ ওয়ার-এর সমর্থকদের সঙ্গে।

একদিন তার একজন অধ্যাপক তাকে ডেকে গোপনে বলেছিলেন—তোমার মামা আমার প্রফেসর ছিলেন, ভুনি আমার ছোটভাইয়ের মত। সে আমাকে তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে বলেছে। আমি জানি কোন পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ তুমি—। চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি। কারণ কি তিনিই জানেন। বোধ হয় অজয়কে মিথ্যাবাদী বলে আঘাত করতে চান নি। তার বদলে একটু ভেবে বলেছিলেন—তুমি বড় বেশী লাউড হয়ে যাচ্ছ। ইট ইজ ডেঞ্জারাস। অকারণ বিপদ ডেকে আনা হবে তোমার।

অজয়ের ভয়ও হয়েছিল রাগও হয়েছিল। কপাল তার কুঁচকে উঠেছিল। বলেছিল—আমি সত্য কথা বলি, মিথ্যে কিছু বলি নে। আমি কখনও বলি নি যে আমি পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার।

—তা বল নি, কিন্তু তুমি সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে বড্ড বেশী তর্ক কর।

—আমার বিচারে নেতাজীই ভারতবর্ষের greatest man—greatest political leader—এরা বলে—গান্ধীজী জওহরলাল—

প্রফেসর হেসে ফেলেছিলেন—you are a child—এ সব নিয়ে তর্ক করতে নেই। ব্রহ্মা বড় না বিষ্ণু বড় না রুদ্র বড় এ নিয়ে লড়াই যখন মানুষেরা করে, তখন নিজের নিজের ভক্তের জন্যে তাঁরা লজ্জা পান। না-হয় কৌতুকে হাসেন। আমি তোমাকে বলতে পারি—তুমি যার জন্যে এত তর্ক কর সেই নেতাজী এ কথা শুনলে প্রচণ্ড লজ্জা পাবেন। তুমি জান না—এঁদের পরস্পরের প্রতি কত শ্রদ্ধা কত ভালবাসা কত স্নেহ। এ সব করো না, কেমন?

অজয় তবুও মানে নি। বলেছিল—তারপর প্রগ্রেসিভ দলওয়ালারা নেতাজীকে কুইসলিং বলে।

—বলুক। লেট দেম—। তার প্রতিবাদেও তোমার তর্ক করবার প্রয়োজন নেই। ইতিহাস একদিন বলবে—সুভাষচন্দ্র কি! কোথায় তাঁর স্থান! My boy—this is not the time.—এটা সময় নয়। তুমি জান না—ছাত্রদের মধ্যে পুলিসের spy আছে। তারা

রিপোর্ট করে দেবে। তুমি তাদের হাতে অকারণ দুঃখ পাবে।

এর দু-একদিন পর ভুনিদা এসেও তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম যৌবনে পদার্পণের কাল বড় ভয়ানক কাল। এ কাল সাবধান হওয়ার কাল নয়, সকল সাবধানতাকে উপেক্ষা করে লঙ্ঘন করে দুঃসাহসের নেশায় মাতার কাল। দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে চিৎকার করার কাল নয়, তাকে ধমক দেওয়ার কাল। অজয় তার কথা শোনে নি। বলেছিল—কথাটা বলছ ভুনিদা তুমি কংগ্রেসী বলে! গান্ধীজীর নিন্দে করলে তুমি চুপ করে থাকতে পার?

ভুনি মায়ের কাছেও কথাটা প্রকাশ করে নি, শুধু মনোরমাকে লিখেছিল—পিসীমা, তুমি এখানে এসে বাসা কর না কেন? অজয়ও তোমার কাছে থাকে—আমরাও তোমাকে কাছে পাই।

মনোরমা লিখেছিলেন—তোমার অনুরোধ ভারী মিষ্টি, খুব লোভনীয় কিন্তু আমার যে উপায় নেই বাবা, আমার মাকে ফেলে আমি যাই কেমন করে? তা ছাড়া চট্টগ্রামে বিষয়সম্পত্তি অর্থের দায়িত্ব ছিল—সে ছেড়েও যাওয়া চলত; চলত কেন—চলেছে, সে সব ফেলেই প্রাণের মায়ায় চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে দায়িত্বের দায়ে বাঁধা পড়েছি; শ্বশুর কীর্তি করে গেছেন এখানে; আর আছেন আমাদের কুলদেবতা মা-কালী; তিনি যে কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। এখান থেকে চলে যাবার কথা মনে উঠলেই তিনি বলেন—তুই গেলে আমিও চলে যাব। কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে না। আমিও তোমাদের বিশ্বাস করাতে পারব না কিন্তু আমি যে স্বকর্ণে শুনি—প্রত্যক্ষ শুনি। অজয় আছে—তার নিজের ভাগ্য আছে—আমার মা আছেন—তার উপর তোমরা আছ—তার জন্য আমি ভাবি নে। অজয় পুজোতে বাড়ি এসেছে, তাকে পাঠাবার সময় অনেক ভয় করেছিলাম, এবার দেখলাম সে অনেক বদলে গেছে। শক্ত হয়েছে, নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে শিখেছে, বড় হয়ে গেছে, এ ক'মাসে তার চরিত্র গড়েছে। সৎ করে তাকে গড়তে চেয়েছিলাম, এতদিন আমি তাকে কোনটা সৎ কোনটা অসৎ বুঝিয়েছি; এবার দেখলাম তার একটা বোধ হয়েছে। সব থেকে ভাল লাগল—নিজের কাপড় নিজে কাচছে, গেঞ্জিতে সাবান দিচ্ছে, বিছানা পেড়ে নিচ্ছে, নিজের ঘর নিজে গোছাচ্ছে। ভগবানে বিশ্বাস হারায় নি। বলে, নেতাজী ভগবানে বিশ্বাস করেন, গান্ধীজী করেন—আমি করব না কেন? তার জন্যে আর ভাবি নে।

এ পত্রখানা ভুনি তার মাকে দেখিয়েছিল এবং এবার সে সব কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করে বলেছিল। অনুরোধ করেছিল—মনো পিসীমাকে সব কথা জানিয়ে পত্র লিখতে। কিন্তু নলিনী দেবী বলেছিলেন—না। মনো যা লিখেছে ঠিক লিখেছে। অজয়ের পথ অজয় করে নিক। তোকে দুনিকে তো আমি কখনও বাধা দিই নি। তোরাও তো এই করেছিস। সুভাষচন্দ্রের পথ আমাদের পথ থেকে ভিন্ন কিন্তু উলটো মুখে তো যায় নি।

ভুনিও আর কোন কথা বলে নি। পুজোর ছুটির পর এসে অজয় মামার বাড়িতে এসেছিল; বাংলা দেশের পুজোর মিষ্টান্ন—নারকেল নাড়ু, খই নাড়ু, টানার মেঠাই, তিলের ছাঁই, বর্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ-এর উপঢৌকন পোঁছে দিয়ে বিজয়ার প্রণাম করে গিয়েছে, তারপরও দু-তিনদিন এসেছে কিন্তু এ সব নিয়ে নলিনী দেবী কোন কথা বলেন নি। কথা ভুনির সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু অজয় বলেছে—ভারতবর্ষে যারা সমাজে বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বিপ্লব হলে—অবস্থা বিপর্যয় হবে বলে কংগ্রেসেরও বিরোধী নেতাজীরও বিরোধী। নইলে এমন কে আছে বল ভুনিদা যে মনে মনে বলছে না—এস নেতাজী, তুমি এস তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে? বল বুকে হাত দিয়ে? আমি শুধু প্রকাশ্যে যারা তাঁর নিন্দে করে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি—সবাইকে দেখিয়ে তাঁকে হাত জোড় করে প্রণাম করি। ভগবানকে প্রণাম করে বলি—

ভগবান, নেতাজীকে নিরাপদে রাখ, তাঁকে জয়যুক্ত কর। এ আমি ছাড়তে পারব না। এতে আমার যা হবে হোক।

এরপর সে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। এই বাইরে যাওয়ার আগেই নলিনী দেবী ভুনি-দুনিকে বলেছেন—'ওরে অজয় আসছে না, তাকে একবার তোরা দেখে আয়। ডেকে আন।

ভুনি দু দিন গিয়েও তার পাত্তা পায় নি। হোস্টেলে তার দেখা মেলে নি। চিঠি লিখে এসেছিল আসবার জন্যে কিন্তু সে পেয়েও অজয় আসে নি।

আজ এই রাত্রি দশটার সময় চাপা গলায় আর্তভঙ্গীতেই সে কড়া নাড়ছে, ডাকছে—ভুনিদা —ভুনিদা! দুনিদা! মামীমা! মামীমা!

লণ্ঠনটা নিয়ে বুড়ী দাঈ দরজা খুলে দিয়ে বললে - অজয় ববুয়া! এতদিনে তোমার আসবার খেয়াল হল? এই শীতে এই এত রাতে—

এই পর্যন্ত বলেই সে চমকে উঠল—কথা সে শেষ করতে পারলে না।

অজয়ের কপালে একটা গভীর ক্ষত, তা থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে চিবুক পর্যন্ত এসেছে, বার বার রুমাল দিয়ে মুছেছে কিন্তু তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নি।

—কি হয়েছে ববুয়া? অজয়!

—চোট লেগেছে দাঈ। মামীমা কোথায়? ভুনিদা? বলেই সে ঘরে ঢুকে বললে—দরওয়াজা বন্ধ করে দে দাঈ। জলদি।

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল অজয়। এবং দাঈকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বন্ধ করে দিয়ে খিল এঁটে দিয়ে বললে—কেউ আর ডাকলেও যেন দরজা খুলে দিয়ো না দাঈ।

দাঈ শিউরে উঠেছিল তার কপাল থেকে বেয়ে নামা রক্তের ধারা দেখে। সে চাপা গলায় বললে—এ কি হয়েছে রে—মনুয়ার বেটা এ যে—

—চুপ কর দাঈ। কপালটা কেটে গেছে। আমাকে সাবান আর খানিকটা তুলো ন্যাকড়া দিতে পার?

দাঈ তার মুখের দিকে তিরস্কারভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—হায় রে হায় আমার নসিব! এ বাড়ির রক্ত যেখানেই গেল—তার স্বভাব আর বদলাল না। গঙ্গাজীর পানি যে খালেই যাক সেই খালেই বান ডাকায়। দুনি ববুয়া ভুনি ববুয়ার হালচাল তুইও ধরলি? পুলিস কত দূরে—আগে তাই বল!

দাঈ এ বাড়ির তিন পুরুষকে দেখেছে—ভুনি-দুনির বাপ যখন খদ্দর পরতে শুরু করে তখন আপসোস করেছে—হায় হায়—কি মতি দেখ তো! এমন দেওতার মত রূপ নওজোয়ানের—মিহি ধুতি পাঞ্জাবিতে লাগে যেন রাজকুমারের মত। সে পরলে কিনা ঠেঁটি ধুতি—খাটো কুর্তা—দেহাতি চাষার মত! কত আপসোস যে সে করত! আপসোসের উপর আপসোস—তার এই আপসোস করা দেখে এই বাড়ির সকলেই মিঠি মিঠি হাসত। কর্তা-বাবু হাসতেন—গিন্নী হাসতেন—তিন বেটী হাসত—ভুনির বাবা—তার বুকে করে মানুষ করা ববুয়া সে হাসত—এমন কি এই ভুনির মা—তখন সে বাড়ির নতুন বহু—সে সমেত হাসত।

সে বলত—তোমরা হাস কেন? জান, আমার গা জ্বলে যায় হাসি দেখে। এমন লিখা-পাঢ় শিখলে—কালিজে নোকরী মিলেছে—ইয়া কোট পিহিনবে—পাতলুন পিহিনবে—হেট টোপী মাথায় চড়াবে—কেমন লাগবে বল তো!

এরা আরও হাসত। ওই যে ভুনির মা ওই যে নতুন বহু—সে চিমটি কেটে কথা

বলতো—হাঁ—হাঁ ; হারাম খাবে—মুরগী খাবে—বিলাইতি দারু পিবে—বিলায়েত যাবে—মেম বহু ভি আনবে। সে বলবে—এই ডাঙ্গি—এই আয়া ইধর আও! তুম্ বলড্যান্স জানতি হ্যায়? আও—হামারা পাশ বলড্যান্স শিখ লাও। আর দাঙ্গি এই সেলাম ঠুকবে আর বলবে—মেহেরবান কদরদান—আপকা মর্জি—মুঝকো গহরজান বনা দিজিয়ে।

শুধু বলেই ক্ষান্ত হত না, শাশুড়ী শ্বশুর না থাকলে নাচটাও দেখিয়ে দিত; কোন ননদকে টেনে নিয়ে তার হাতে হাত বুকে বুক মিলিয়ে দু'জনে একসঙ্গে চার পায়ে নাচতে শুরু করে দিত। এবং সুর করে—সে এক আচ্ছা অদ্ভুত সুর—মিহি গলায় লম্বা টানা সুরে গাইত—

আংরেজকো জিন্দগীমে বিবি গহরজান
নাচতি হ্যায় সাথ সাথ নাচে সাহেবান—

সে প্রায় খেপে যেত। সে মা শাশুড়ীর মতই গালাগাল দিত—বে-সরমী, সরম নেহি—? তারপর ধীরে ধীরে গান্ধীমহারাজকে চিনেছিল—কাংগিরিসকে জেনেছিল—খদ্দরকে সম্মান করতে শিখেছিল। তার মানুষ-করা বহুয়া জেলে গেলে যত কেঁদেছিল তত গৌরব অনুভব করেছিল। উত্তর প্রদেশের মেয়ে—মিউটিনির মাত্র তিরিশ বছর পরে তার জন্ম; ইংরেজকে যত তার ভয় অন্তরের সুগভীরে তত তার বিদ্বেষ ঘৃণা, সে এই নতুন মার খেয়ে মারনে-ওয়ালাকে হার মানানো যুদ্ধপন্থায় যত অনুভব করেছিল বিস্ময় তত পেয়েছিল সাহস। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাও হয়েছিল গান্ধীমহারাজের শিষ্যদের উপর। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এত বড় ব্যারিস্টার—এত সম্পদ এত নাম—তাঁর বেটা এমন সুন্দর জওহরলাল সব জেলে যাচ্ছে। হিন্দুস্তানের আজাদী আসবে; গোরালোক ভাগবে দেশ থেকে—তাদের হাতের বন্দুকের গুলি হাতেই থেকে যাবে—এ যে পরমাশ্চর্য ঘটনা; এ দেশের দেবতা জাগবে তা হলে। তা না হলে কি এমন ঘটনা ঘটতে পারে!

খাস বিলায়েত থেকে সাহেবানদের একদল বড় বড় আমির বাদশাহী উজির-টুজীর এসেছিল। জওহরলাল গোবিন্দবল্লভ পন্থজী—তাদের সঙ্গে বহুত বহুত আদমী গিয়েছিল 'টিশন' এলাকায়—কালা ঝাণ্ডা নিয়ে দেখাবার জন্যে গিয়েছিল; আংরেজীতে বুলি উঠিয়েছিল—যাও—ঘুমকে যাও। পুলিস সিপাহীরা তাদের মাথার ওপর ডাণ্ডা মেরেছিল। সে দলে তার মানুষ-করা ছেলে—এই ভুনির বাপও ছিল; সে গিয়েছিল দেখতে। ওঃ, সে কি ভীষণ কাণ্ড! জওহরলাল গোবিন্দবল্লভ পন্থ মার খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল—তবুও সেই বুলি ছাড়ে নি। সে দেখে তার সাহস আরও বেড়েছিল। এবং এক অপরিমেয় সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে কর্তা গিন্নীকে প্রণাম করে বলেছিল—তোমরা ধন্য পিতা ধন্য মাতা—এমন ছেলে তোমাদের। শুধু বীর নয়, পুণ্যবান ধর্মাত্মা।

গিন্নী বলেছিলেন—তুই তো তা হলে ধন্য রে দাঙ্গি। তুই তো ওকে মানুষ করেছিস।

সে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল এর পর। বলেছিল—হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়। তোমার বেটাকে মানুষ করে আমিও ধন্য হয়েছি।

এখানেই তার জীবন বিকাশের শেষ নয়। সে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর আনন্দভবনে গিয়ে তার ইট ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়েছিল—ফটকের পথের ধুলো মাথায় নিয়েছিল। গান্ধীজী যখনই এলাহাবাদ এসেছেন এরপর তখনই সে তাঁকে দর্শন করে এসেছে। এবং নিজে সে এক সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সে বলে—মিউটিনির সময়েই হয়ে যেত আজাদী—হিন্দুস্থান থেকে আংরেজকে তল্পী গুটিয়ে পালাতে হত। কিন্তু নসিব আর কর্মদোষ। কর্মদোষে পাপ করে ফেললে নানা সাহেব কুমরসিং আর সিপাহীলোক। আংরেজদের মেয়েদের কাটলে। বাচ্চালোককে কাটলে। পাপ হয়ে গেল। হিন্দুস্তান ধরমস্তান—এখানে অধরম

করলে কি রক্ষা আছে।

তারপর এই ভুনি-দুনির আমলে আবার তার হল বিপদ। ভুনি ঠিক আছে—কিন্তু দুনি ছেলেটা নানান ধরনের আশ্চর্য কথা বলে। সে প্রায় বলে—ঈশ্বর-টিশ্বর সে মানে না। সে বলে—অহিংসা দিয়ে গান্ধীজী আজাদী আনতে পারবেন না। আংরেজের সঙ্গে লড়াই হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

একবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিস; বলেছিল সে বোমা তৈয়ার করে, সে পিস্তল লুকিয়ে রাখে, সাহেবদের সরকারী নোকরদের মারবে বলে। সে শুনে তার বড় আপসোস হয়েছিল। –একি মতি হল দুনি ববুয়ার! হে ভগবান—হে রামজী! মামলায় তার কালাপানি হবার কথা। কেউ কেউ বলত—হয়তো ফাঁসিও হতে পারে! সে মানত করেছিল অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের কাছে—মথুরা বৃন্দাবনে কিষণজীর কাছে। কত দিন জল ঢেলেছে মহাবীরজীর পায়ে। বলেছে—মহাবীরজী, তুমি দুনিকে বাঁচিয়ো। পাপীর পাপের সাজা তুমিও তো দিয়েছ লংকা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে, রাক্ষসদের তো তুমিও মেরেছ। তুমি বাঁচিয়ো দুনিকে। আর লংকা লড়াইয়ের পর তোমার যেমন শ্রীরামজী সীতা মাঈয়ের কিরপায় মতি বদলেছিল, আর যেমন কাউকে তুমি মার নি—তেমনি করে মতি বদলে দিয়ো দুনির—তার খালাসের পর। ভগবানের দয়া–রামচন্দ্রজীর করুণা—কিষণচন্দ্রের কিরপা —আর মহাবীরজীর মরজি—এতেই দুনি সে মামলা থেকে খালাস পেয়েছিল। এবং এর পর থেকে সে খুবই সাবধান হয়ে গেছে, মতি তার বদলেছে। তবু তার দুনির উপর সতর্ক দৃষ্টি। ছেলেবেলা থেকেই এই দুনি মারপিট করে, কপাল ফাটায়। সে জানে—এই কপাল ফাটানোর মানে সে জানে! এর মানে তাদের গাঁওঘরে জমিন নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়া লাঠিবাজি নয়—এর মানে—এই সব বাঙালী ববুয়াদের—বোমা আর পিস্তল। তার মানে —আন্দামান আর ফাঁসির ডুরি!

এই শীতের রাত্রে অকস্মাৎ চোরের মত ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করা আর ফিসফিস করে কথা বলার মানে বুঝতে তার তাই ভুল হল। এ বাড়িকে সে চেনে। বুঝতে তার ভুল হল না যে এর পরই আসবে পুলিস। হয়তো এল বলে! হয়তো গলি ভুল করে একটু ঘুরছে। কিন্তু তারা যে আসছে তাতে আর ভুল নেই—তাই সে প্রশ্ন করলে—পুলিস কত দূরে—তাই বল? তুলো ন্যাকড়া অইডিনের ব্যবস্থা পরে হলে চলবে। অজয় বললে—না। পুলিস নয়। তবে—

—কি তবে?

—হয়তো ছেলেরা আসবে।

—ছেলেরা?

—হ্যাঁ। ছেলেদের সঙ্গে মারপিট হয়েছে। তারা হয়তো আসবে। তারা দলে ভারী। আমি ছটকে বেরিয়ে এসেছি। মেরেও এসেছি। একটা ছেলের দাঁত উখড়ে গেছে। একজনের নাক ভেঙেছে। আমার কপালে মেরেছে! হোস্টেলে আমাকে না পেয়ে হয়তো এখানে আসবে। তারা জানে—এটা আমার মামার বাড়ি।

* * *

নেতাজীর বিপক্ষ দল—যারা প্রকাশ্যে নিন্দা করে—তাদের সংগে মুখের ঝগড়া আজ হাতাহাতি রক্তারক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ তারা সঙ্গমের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে তার সঙ্গীদের কায়দায় পেয়েছিল। তারা—যারা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিমুগ্ধ ভক্ত—তারা রাজনৈতিক কারণেই অন্যদের সঙ্গ এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষের। এবং এই যুদ্ধের সময় ছাত্রদের মধ্যেও যখন পুলিসের চরের অভাব নেই, তখন তারা এ সব আলোচনা

করে নিজেদের মধ্যে—নির্জনে নিরালায়। এমন কয়েকটি নিরালা স্থান তাদের বাছাই করা আছে। ঘুরে ঘুরে সেই সব স্থানেই তারা মিলিত হয়, পরামর্শ করে আলোচনা চলে। কয়েক দিন আগে একটি সভায় নেতাজীর বিপক্ষ দলকে—দু পুরুষ উকিল বংশের ছেলে অজয় বিদ্রুপ এবং ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছিল। খানিকটা বিরোধেরও উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপকেরা সে বিতর্কসভায় উপস্থিত ছিলেন বলে কিছু হতে পায় নি। কয়েক দিন থেকেই তারা তাদের—বিশেষ করে তাকে সন্ধান করে ফিরছিল। আজ গঙ্গার ধারে তাদের পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মারামারি করেছে। তারা দলে সত্যই ভারী হয়েই গিয়েছিল। ঘুষোঘুষির মধ্যে অজয় দু'জনকে মুখে মেরেছে—একজনকে ঠোঁটে—অন্যজনকে দাঁতে। তাদের একজন একটা লোহার বোলো বসানো লাঠি মেরেছিল তারা মাথায়। ভাগ্যক্রমে মাথায় লাগে নি। ফসকে কপালে একপাশে লেগে পিছলে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অজয় লাফ দিয়ে পড়েছিল একটা খদে। গঙ্গার ভাঙা কিনারার একটা গর্তে। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে সরে খানিকটা দূরে এসে একখানা নৌকো ভাড়া করে যমুনায় পড়ে একটা ঘাটে নেমে গলিপথ ধরে এসে উঠেছে এখানে।

দাঈ তাকে দোতলার ঘরে এনে বসিয়ে বললে—এইখানে তুই বোস্। আমি পানি গরম করে আনি। তুই ধুয়ে ফেলবি—আমি চা করে দেব। খাবার দেব। বাতি জ্বালিস নে। অন্ধকারেই বসে থাক।

দাঈ নেমে গেল।

এখানা সেই ঘরখানা। যে-ঘরে সে প্রথম দিন এসে বসেছিল। সামনেই গলির ওপারে ভটচাজদের সেই ঘরখানা—যে-ঘরে ওদের বড় মেয়ে বধূবেশে সেদিন জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল প্রতিমার মত। অজয় তাকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তারপর লজ্জিত হয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই মেয়েটি নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ঘরখানায় ঢুকলেই তার সেই স্মৃতিটি মনের মধ্যে মুহূর্তে জেগে উঠতো; সেই কারণে পরের দিনই সে অন্য ঘরে সরে গিয়েছিল। দুনি তাকে ঠাট্টা করেছিল—ভুতের ভয়ের জন্য। বলত—কি? যদি হঠাৎ জানালা খুললেই রমাকে ঘরের ভেতর ঘুরতে দেখতে পাও—কিংবা নাকী সুরে যদি বলে—অজয়, তুঁই বিঁয়েতে পঁণ নিঁবি নাঁ বঁল—নঁইলে তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙব।

প্রথম প্রথম সে চটত। তারপর অবশ্য হাসত। কিন্তু এই স্মৃতির খেলাটুকু আশ্চর্য। এতদিন পর এ ঘরটায় ঢুকতেই—এই অবস্থাতেও সেই কথা তার মনে পড়ে গেল।

ছেদ পড়ে গেল, বাস্তব জগতের শব্দে।

কে ডাকছে—দরজায় কড়া নড়ছে। কে? কারা? হ্যাঁ—অনেকগুলি লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ—তা হলে তারাই এসেছে।

কি করবে সে? চিৎকার? ভয়ার্তের মত সাহায্য ভিক্ষে করে চিৎকার। আমাকে ওরা দল বেঁধে মারতে এসেছে—তোমরা বাঁচাও? ছি! ছি! সে চট্টগ্রামের ছেলে।

কি? কি বলছে দাঈ? সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করলে।

দাই বলছে—নেহি—নেহি জী—ভুনিবাবু দুনিবাবু—তাঁদের মা—কেউ বাড়ি নেই। বন্ধ হ্যায় বাড়ি। আমি বাড়ির দাঈ আমি বাড়ি আগলাচ্ছি। আমি তো এই রাত্রে বাড়ির কেঁওয়াড়ী খুলব না।

সে খুট করে দরজাটি খুললে। একটু ফাঁক করতেই—বাইরের মিউনিসিপ্যালিটির আলো এসে পড়ল। সামনে খানিকটা খোলা ছাদ। ছাদে বের হলেই আলো পড়বে

সর্বাঙ্গে। নীচে থেকেও তাকে লোকে দেখতে পাবে। মুহূর্তে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে নীচে থেকে ভারী গলায় কেউ বলছে—খোলো—খোলো। আমরা পুলিস! পরওয়ানা আছে। জলদি খোলো—নেহি তো দরজা ভেঙে ঢুকবো আমরা।

পুলিস! এরা তা হলে পুলিসে গেছে! কিসের জন্য? দাঁত ভেঙেছে নাক ভেঙেছে বলে?

না—?

না—খবর দিয়েছে—সে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দলের ষড়যন্ত্রী কর্মী বা গুপ্তচর বলে?

বুকখানা তার চমকে উঠল! মনে পড়ল মায়ের মুখ! তার মা—এ খবর পেলে—। কি করবেন? হয়তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা নেবেন।

হঠাৎ টুপ্ করে একটি ঢেলা এসে পড়ল। চমকে উঠল সে।

ওদিকে দরজায় আঘাত পড়ছে। দাঈ এদিক থেকে বললে—পরওয়ানা থাকে কাল সকালে এস। রাত্রে আমি দরওয়াজা কিছুতেই খুলব না। কভি না। কারুর হুকুমে না। আর বাড়িতে কেউ নেই। শুধু আমি আছি। আমাকে ধরতে চাও তো কাল সকালে ধরো। আমি একটা বুড়ী দাঈ—দেহাতী মেয়েছেলে—আমাকে ধরবার জন্যে পরওয়ানা! হায় রে সরকার!

আবার একটি ঢেলা এসে পড়ল। এবার বসে বসেই চারিদিক তাকিয়ে দেখলে সে। একটা দুর্দান্ত ভয়ে সে অভিভূত হয়ে গেল। কে?

ওই যে-ঘরে মেয়েটি কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল—সেই ঘরের সেই জানালায় একটি মেয়ে। আবছা তাকে দেখা যাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে। ঘরে আলো নেই; বাইরের আলো গিয়ে পড়ছে মেঝেতে তেরছাভাবে। তারই আবছা আভায় দেখা যাচ্ছে—মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই তার ভ্রম ভাঙল। এ উমা। রমার সেই ছোট বোনটি। তার পাশে আর একজন। তার মা। তারাই ঢেলা ছুঁড়ে তাকে ডাকছে। কিন্তু কি করে ওদিকে যাবে? কথাই বা কি করে বলবে? পরক্ষণেই মেয়েটি জানালা দেখিয়ে কিছু জানাবার চেষ্টা করলে। সে বুঝলে ছাদ থেকে তাকে ঘরে জানালায় আসতে বলছে তারা।

হামাগুড়ি দিয়েই সে ঘরে এসে জানালায় দাঁড়াল।

মেয়েটি এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালে—হাতে একখানি ছড়ি। ছড়ির ডগায় একখানা চিঠি বাঁধা। খুলে নিল সে চিঠিখানা।

চিঠিখানা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল লাঠিটার সঙ্গে। সে খুলে নিলে। অন্ধকার ঘর। শুধু রাস্তার আলোর একটা ফালি এসে পড়েছে একটা দেওয়ালের গায়ে—ঠিক মাঝখানটায়। সেই-খানে গিয়ে নিলডাউন হয়ে বসে সে চিঠিখানা খুলে পড়লে। অনেকটা দূরের আলো—জোর নেই; অনেক কষ্টেই পড়তে হল।

"যারা এসেছে তাদের সঙ্গে পুলিস নেই। মিথ্যে করে বলছে পুলিস আছে। আমরা ওপাশের জানালা থেকে দেখেছি। দু-তিনজন খুব বদমাশ গুণ্ডা আছে। আমরা একজনকে চিনি। ওরা সব পারে। তুমি পালাও। বাড়ির উত্তর দিকে খোলার বাড়ি। ওই বাড়ি আর এ বাড়ির মধ্যে একটা নোংরা কানা গলি। খোলার বাড়িটার জন্য মেথর যাবার পথ। এ বাড়ির বাথরুমের পাইপ ধরে নেমে পড়। ওখানে আমাদের বাড়ির দাঈ তোমাকে ওই খোলার বাড়িতে নিয়ে যাবে। বাড়ির মালিক আমাদের দুই বাড়ির খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি তোমাকে আশ্রয় দেবেন। যে গুণ্ডা ওদের সঙ্গে আছে সে খুনে, সব করতে পারে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে হয়তো, তুমি পালাও। আমাদের বাড়ির দরজায় ওদের একদল পরামর্শ করছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি। দাঈকে পাঠিয়েছি।"

পড়া শেষ করে সে ওদের বাড়ির জানালার দিকে তাকালে। ঘরের জানালা বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যে। ওরা চলে গেছে। আলো থেকে সরে এসে সে অন্ধকার কোণে দাঁড়াল। কি করবে সে? যা লিখেছে ওরা তাই করবে? বুড়ী দাঈকে জিজ্ঞাসা করবে না? ওপারের ওই বন্ধগলিটা সে জানে; এ বাড়িতে মাসখানেক ছিল সে; গলিটা তার অজানা নয়। পাইপ বেয়ে নেমে পড়া খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু—। একটা অনিশ্চতের কিন্তু তার সামনে এসে দাঁড়াল। যদি—।

যদি বাড়ির মালিক আশ্রয় না দেয়।

যদি ওরাও এর মধ্যে ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা এখানকার লোক—ওরা কি ওই গলির খবরটা জানে না? বিশেষ করে ওই গুণ্ডা প্রকৃতির লোক যেখানে সঙ্গে আছে।

কি করবে সে? দ্বিধার মধ্যে পড়ে সে অধীর হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন মাথা কুটছে। এক এক সময় একটা দুরন্ত ক্রোধ বিদ্রোহের অভিপ্রায় ঘোষণা করে বলছে—চট্টগ্রামের ছেলে—তুমি এইভাবে পালাবে? তার থেকে বেরিয়ে পড় দরজা খুলে; ওরা তোমাকে মেরে ফেলুক, তুমি মর; তার পূর্বে চিৎকার কর—নেতাজী জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ! বেইমান লোক মুর্দাবাদ! ধ্বংস হোক দেশদ্রোহীরা! এই রাত্রির আকাশ মথিত করে এই ধ্বনি তুলে তুমি মর।

ওদিকে নীচে এখনও বাক্‌যুদ্ধ চলছে। বাইরে থেকে কেউ বুড়ী দাঈকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করছে। গুণ্ডার উপযুক্ত ভাষা। অবশ্য ইংরেজের পুলিসও এ ভাষা প্রয়োগ করে। খাস ইংরেজ পুলিস কর্মচারীও প্রয়োগ করে। ড্যাম নিগার নয়—ওরা এদেশে এসে প্রথম শেখে শালা, শুয়ার কি বাচ্চা বুলি। শেখানো হয়। কিন্তু তবুও কেন মনে হচ্ছে—এ ভাষা এ বুলি তাদের থেকেও নিম্নস্তর কারুর মুখের ভাষা। সারা দেহের ভিতরে রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। দেহে উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন জ্বর আসছে তার।

এমনই একটি মুহূর্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ছুটে বেরিয়ে পড়ল। চিৎকার করে 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলেই সে ছুটল। দুড়দুড় করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এসে বুড়ী দাঈকে সরিয়ে দিয়ে দরজার খিলে হাত দিলে। বুড়ী দাঈ তাকে টেনে ধরে চিৎকার করে উঠল—নেহি—নেহি—নেহি! অজয়! ববুয়া! বেটা!

অজয় গ্রাহ্য করলে না। দরজা খুলে ফেললে সে। এবং আবার চিৎকার করে উঠল—আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ!

সামনে দরজার ওপাশে একদল লোক; চিনলে সে তাদের মধ্যে অনেক কয়েকজনকে—তার বিরোধী দলে তারা। সঙ্গে আরও লোক। তারা তাকে দেখেই হল্লা করে উঠল। হিংস্র উল্লাস,—আ! ইয়ে মিলা হ্যায়।—

সে আ-শব্দটি সমবেতকণ্ঠে। এবং সামনে ছুটে এল বিরোধী দলের কয়েকটি ছেলে। কিন্তু দলের মধ্যে সত্যই পুলিস নেই।

তাদের চিৎকারের মধ্যে অজয়ের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। তারপরই সে পেলে মাথায় আঘাত। চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে—সেই হারিয়ে একেবারে অচেতন হওয়ার মুহূর্তটুকুর মধ্যে সে শুনতে পেলে নারীকণ্ঠ। এবং আরও একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে।

চিৎকার করেছে—বুড়ী দাঈ। ওদিকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন সাধনা দেবী এবং উমা। তাঁরাও থাকতে পারেন নি। অজয় তো দুনি ভুনি থেকে আলাদা নয়। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যে তাঁদের অন্তরের—মর্মের।

প্রচণ্ড আঘাতে সাধনা দেবী বর্তমানে যে অবস্থায় পড়েছেন সে অবস্থা শয্যাশায়ী আহত মানুষের মত। সেটা উপলব্ধি করেই তিনি মেয়েটিকে নিয়ে বাইরের জগতে যার যা হোক—তার সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না রেখে—শুধু তাঁর পাঠশালা অবলম্বনটিকে দণ্ডের মত ধরে ধীরে ধীরে জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। আজ কিন্তু এই ঘটনায় নিজের অবস্থা ভুলে—হাতের দণ্ডটি ছেড়ে প্রাণের তাগিদে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর সঙ্গে এসেছেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী একজন। সবলকায় দীর্ঘ পুরুষ। রঘুনন্দন সিনহা—ছাত্র—জমিদারবংশের ছেলে। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, সাধারণ সামাজিক মানুষ; বিষয়ী মানুষ। সাধারণ মানুষের উপর তাঁর প্রভাব অনেক। প্রথম এদের চিৎকার শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সবই চোখে দেখেছেন। নেতাজী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে যে ছেলে ছুটে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে এতগুলো মানুষের মধ্যে—তাকে রক্ষা করতে তিনিও ছুটে না বেরিয়ে এসে পারেন নি। ওই গুণ্ডাদের তিনি চেনেন। ওরা পয়সা খেয়ে কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই তা তিনি বুঝেছেন। কিন্তু ওই গুণ্ডারাও তাঁকে জানে। গুণ্ডাদের বিপদে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি এসে হাঁকলেন—এই—কাল্লু—গণেশ—! খবরদার! গম্ভীর কণ্ঠস্বর!

অজয়ের চেতনা সেই মুহূর্তেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে জলে পড়া মানুষের জলতলে ডুবে যাওয়ার মত ডুবে গেল।

* * *

—একদল মানুষ বাড়ি চড়াও হয়ে একটি ছেলেকে আক্রমণ করেছে—মনে হচ্ছে মেরে ফেলবে—তাই দেখে আমি স্থির থাকতে পারি নি—আমি বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম, বারণ করেছিলাম। সে রাজদ্রোহী না-চোর না-ডাকাত এ আমি বিবেচনা করি নি।

একটু থেমে সাধনা দেবী আবার বললেন—মানুষের চামড়া গায়ে নিয়ে কোন মানুষই বোধ হয় এ চোখে দেখতে পারত না।

—কিন্তু রাস্তায় এমনি ধারার কোন হল্লা দেখেও কি এমনি করে ছুটে যেতেন? না—সে-হল্লা এড়িয়ে অন্যদিকে চলে যেতেন?

সাধনা দেবীকে প্রশ্ন করছিল আই-বি পুলিসের লোক।

সেদিন রাত্রে পুলিস ঘটনাটার মধ্যে ছিল না—কিন্তু পরদিন সকালেই তারা এসে এর মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খবর এ সব ক্ষেত্রে পুলিসকে দিতে হয় না—পুলিস খবর রাখে।

যাদের সঙ্গে ঝগড়াটা হয়েছে অজয়ের তারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, তারা বিরোধীদলের সমর্থক। অজয় নিজে যেমন নেতাজীর দলের সঙ্গে যুক্ত নয় মাত্র সমর্থক তেমনি। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বড় সম্পত্তিবান ঘরের ছেলে যারা তাদের পরিবারের মতানুযায়ী কোন অশান্তি কোন পরিবর্তনের বিরোধী; কর্তারা ইংরেজের সমর্থক; ছেলেরাও তাই; এবং সেই কারণেই এই রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ যাই হোক—তার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও শুধু নেতাজীর বিরোধী—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গেরও বিরোধী। যারা সত্যকার রাজনৈতিক কর্মী তারা অপ্রয়োজনে চিৎকার করে না—এদের চিৎকার করেই কর্ম শেষ। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মীরা চিৎকার করবার কাজটা এদের দিয়েই সেরে নেয়, প্রতিদানে বাঁশের ডগায় তোলা পুতুলনাচের পুতুলের মত নানান উচ্চপদের ঠেকার ডগায় তুলে ধরে এদের খুশী করে, এরাও খুশী হয়ে দড়ির টানে কর্মীদের ইচ্ছামত অঙ্গভঙ্গী করে নাচে।

বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে যাদের নাক এবং দাঁত ভেঙেছে তাদের একজন ধনী জমিদার বাড়ির ছেলে তার উপর বাপ ব্যারিস্টার এবং লীগের উৎসাহী সভ্য। মুসলীম লীগ ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তিকামনা করত না এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য নয় কিন্তু কংগ্রেস বা নেতাজীর দল যে

পথে মুক্তি আন্দোলন ও যুদ্ধ করছিল সে পথ থেকে শুধু সরেই থাকে নি বিরোধিতাই করত —এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। এই ছেলেটি সেদিন হাঙ্গামার পর বাড়ি ফিরতেই তার দাঁতভাঙা রক্তাক্ত মুখ দেখে বাপ মা শঙ্কিত হয়ে সমস্ত কথা জেনে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে খবরটা জানিয়েছিলেন। পুলিস সকালবেলাতেই এসে ভুনিদের বাড়ি সাধনা দেবীর বাড়ি এবং রঘুনন্দন সিংয়ের বাড়ি খানাতল্লাশী করে অজয়কে অ্যারেস্ট করেছে। অজয় এখন পুলিস হাসপাতালে। মাথায় তার আঘাতটা নেহাত সামান্য নয়।

রঘুনন্দন সিংয়ের হাঁকে ভাড়াকরা গুণ্ডারা চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে সেলাম করে তাঁর আদেশমত ফিরে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও সরে পড়েছিল। রঘুনন্দন সিং বাড়ির লোক দিয়ে অজয়কে তুলে দিয়েছিলেন ভুনিদের বাড়ি; ডাক্তার ডেকে দিয়েছিলেন, দুজন চাকরকে ও-বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যও বলে দিয়েছিলেন। ডাক্তার মাথার ক্ষত দেখে অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন—আজ ঠিক বুঝতে পারলাম না। মাথায় হয়তো ফ্র্যাকচার হয়ে থাকতে পারে। ব্রেনেও—। একটু থেমে বলেছিলেন—কনকাশন অব দি ব্রেন হলে তো সিরিয়াস হবে। দেখুন কি হয়। একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। প্রথম লক্ষণ বমি হবে—তাতে। যদি হয় বরফ দিতে হবে—।

আবার একটু থেমে বলেছিলেন—কাল সকালে আমাকে খবর দেবেন।

রঘুনন্দন সিং বলেছিলেন—ভয় করবেন না, দরকার হলে—যত রাত হোক—আমার চাকর রইল—ওদের বলবেন—আমাকে ডেকে তুলবে। আমি ব্যবস্থা করব।

ডাক্তার রঘুনন্দন সিং দুজনেই কথাগুলি বলেছিলেন সাধনা দেবীকে। সাধনা দেবী প্রাণের আকুতিতে সেই যে না-না বলে বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে—আর অজয়কে ফেলে ঘরে চলে যেতে পারেন নি। এঁরাও বুড়ী দাঈকে কথাগুলি না বলে বলেছিলেন সাধনা দেবীকে। যেন তাঁর উপর ভার দিয়েই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। সাধনা দেবীও ভারটা নিয়েছিলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে—কোন আশঙ্কা তাঁর হয় নি। এই ধরনের কোন পুলিস হাঙ্গামায় তিনি পড়বেন—এ কথাও তিনি ভাবেন নি। ভুনি দুনি কতবার অ্যারেস্টেড হয়েছে কিন্তু তাদের মাকে তারা বিব্রত করে নি। সারারাত্রি তিনি শিয়রে জেগে বসেই কাটিয়েছেন। উমা একদিকে একটা বিছানা করে শুয়েছিল। বুড়ী দাঈ বসেছিল অজয়ের পায়ের দিকে। কনকনে শীত। একটা মাটির পাত্রে আগুন করে মধ্যে মধ্যে সেটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে দাগিয়ে তুলেছে আর আপন মনে বকেছে। বলেছে—জান বহু মাঈ—এই যে বাড়ি এই বাড়ির একটা কেউ যতক্ষণ না ফাঁসিকাঠে ঝুলছে বা খুন না হচ্ছে ততক্ষণ এর শান্তি নেই। দেখ না, কোথায় এর দেশ—সেখান থেকে এল এখানে। এখানে না এলে এমনটা কখনও হত না! আঃ, মনুয়াবেটীর নসিব ভাব তো! একমাত্র ছেলে! আর দেখ না—এদের মা-বেটাদের কাণ্ড। কোথায় যে গেল, কি যে মতলব—জানেন সেই পরমাত্মা! আঃ হায়, হায়, হায়! আর আমার ললাট দেখ না। এই এদের মায়াডুরিতে কি বাঁধনেই যে পড়েছি—তা আর এ জনমে কাটল না, কাটবে না।

সাধনা দেবী নির্বাক স্তব্ধ হয়ে চেতনাহীন অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। উদ্বেগ এবং গাঢ় মমতার একটি বেদনা যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নারী-হৃদয়ের শয্যাশায়িনী শাশ্বত জননীর মনের যে কোন কিশোরের এমন অবস্থা দেখে বিচলিত হবারই কথা; এ ক্ষেত্রে অজয়ের সঙ্গে সম্পর্কবোধ তাকে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছিল। মনে পড়েছিল রমার মৃত্যুর দিন—সদ্য আগত এই ছেলেটি শবযাত্রায় শ্মশানে গিয়েছিল। যখন রমার মৃত্যুর দায়িত্বের সকল দোষ তার স্বামীর উপর—তাদের পরিবারের উপর চাপিয়ে মুখুজ্জে মশায় নিষ্ঠুর তিরস্কার করেছিলেন তখন এই ছেলেটি তার প্রতিবাদ করে তর্ক করেছিল।

ওর মা মনোরমা বড় মধুর প্রকৃতির। তাদের আত্মীয় মনে করেই রমার বিয়েতে যৌতুক পাঠিয়েছিল। কথাগুলি এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে জেগে উঠছিল। এবং মধ্যে মধ্যে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠে তাকে বাষ্পভারাকুল করে তুলছিল। বিশেষ করে—অজয়ের যদি কিছু হয়—এই আশঙ্কা মনে জাগলেই মনে পড়ছিল মনোরমার মুখ, তখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ হয়ে উঠছিল অশ্রুসজল।

ভোরবেলা তাঁর একটু ঘুম এসেছিল; একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বলেই বিছানায় বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজেছিলেন। রাত্রির মধ্যে অজয় বমি করে নি। জ্বর এসেছে —জ্ঞানও হয় নি, কাতরাচ্ছে এখনও; তবে যেন কমে এসেছে। এই নিশ্চিন্ততায় তিনি চোখ বুজতে পেরেছিলেন। ঘুমও এসেছিল সংগে সংগে। এরই মধ্যে বুড়ী দাঈ তাঁকে ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—বহু মাঈ!

চমকে জেগে উঠেছিলেন সাধনা দেবী—কি? দাঈ?

বুড়ী দাঈএর মুখটা তাঁর মুখের কাছে। তিনি বিহ্বলভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন—বমি করছে?

বুড়ী দাঈ বলেছিল—পুলিস।

—পুলিস?

—হাঁ। দেখো।

জানালার একটা ছিদ্রপথ দেখিয়ে দিয়েছিল। সাধনা দেবী উঠে সেই ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে দেখেছিলেন। শীতকালের ভোরবেলা। কুয়াশা হয়েছে। সেই কুয়াশার মধ্যেও পুলিসের পাগড়ি দেখা যাচ্ছিল।

অনেক পুলিস। এ বাড়ি, তাঁর বাড়ি, রঘুনন্দন সিংয়ের বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে।

* * *

পুলিস তিনজনকেই নিয়ে গিয়েছিল।

অজ্ঞান অজয়কে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে পুলিস হাসপাতালে পাঠিয়েছিল; রঘুনন্দন সিং এবং সাধনা দেবীকে আই-বি অফিসে নিয়ে গিয়েছিল।

অজয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কি?

অজয় নেতাজী জিন্দাবাদ বলে চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই দলের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছিল—সেই নেতাজী জিন্দাবাদ-ধ্বনি তারা শুনেছিল কি না এবং শুনেও তারা এসে অজয়ের পক্ষ নিয়ে সাহায্য করেছিল কি না?

খানাতল্লাশীতে কোন কিছুই পাওয়া যায় নি। শুধু অজয়ের পকেটে সাধনা দেবীর লেখা চিঠিখানা পাওয়া গিয়েছিল। আর হোস্টেলে অজয়ের ঘর সার্চ করে কিছু লেখা পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকটি কবিতা; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্তুতি; বন্দনা। কয়েকটি প্রবন্ধ। নেতাজী-বিরোধী পক্ষকে আক্রমণ করে তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা।

রঘুনন্দন সিং ঘোরতর বিষয়ী ব্যক্তি; তাঁরা মারাত্মক ভাবে সাম্প্রদায়িক কিন্তু রাজনৈতিক ঠিক নয়। বিষয়-কর্মে মামলায়-মকদ্দমায় পারঙ্গম লোক। ওখানে ন্যায় অন্যায় নীতি দুর্নীতির বিচার তিনি করেন না। গান্ধীজীর অহিংসার সমর্থকও তিনি কোন কালে নন। ইংরেজের খয়ের খাঁও তিনি নন।

তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন—আমার বাড়ির সামনে হল্লা। শীতকালের রাত। এতগুলো আদমী একটা বাড়ির দরজায় হল্লা করছে। বাড়িটা মাস্টারজীর। ভুনিবাবুর দাদো ভুবনবাবু আমার মাস্টার ছিলেন। ও'র লড়কা আনন্দবাবু ছিল আমাদের হামজুটি। এক পাড়ায় বাড়ি। এরা লোক ভাল। এরা কংগ্রেস করে জেল খাটে—কিন্তু সাচ্চা আদমী।

কি হল দেখতে এসে দেখলাম তিন-চারজন বদমাশ গুণ্ডা নিয়ে ওই ব্যারিস্টার সাহেবের লড়কা ওদের বাড়ির উপর চড়াও হয়েছে। হাঁ—ওই নওজওয়ান হাঁক দিয়েছিল—নেতাজী জিন্দাবাদ বলে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কিছু নেই। আমি দেখলাম—মুসলমান ব্যারিস্টারের লড়কা গুণ্ডা নিয়ে এ বাড়ির একটা মাত্র ছেলেকে মারতে এসেছে—খুন করে ফেলবে। হাঁ, খুন জরুর করত। গণেশ আর কাল্লু এ দুনো গুণ্ডাকে আমি জানি। খুব ভাল করে জানি। সেই জন্যেই আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, একটা জান – লড়কার জান নোকসান হয়ে যেত—সেই নোকসান রুখবার জন্যে আমি এসেছিলাম। হ্যাঁ, নেতাজী জিন্দাবাদ বলে ওই নওজওয়ান আওয়াজ উঠিয়েছিল, কিন্তু নেতাজী জিন্দাবাদ আওয়াজ উঠালে কি আংরেজ সরকার গুলি চালায় কারুর উপর—বিচার না করে? তার হাতে পিস্তোল ছিল না, বোমা না, তলোয়ার না—একটা ডাণ্ডা পর্যন্ত ছিল না। আর তাকে দেখলেই মেরে ফেলবে—এমন হুলিয়াও সরকার জারি করে নি। সুতরাং তার জান বাঁচিয়ে আমি কি অন্যায় করেছি—আপলোক সমঝ দিজিয়ে!

রঘুনন্দনের স্টেটমেণ্ট যাই বা যেমনই হোক তাঁর জীবনের রেকর্ড পরিষ্কার। তিনি রাজনীতিক লোকই নন। বিষয়নীতি নিয়েই থাকেন—তারই মধ্যে আছে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক নীতি বা গোঁড়ামি—কথাবার্তার মধ্যে এটুকু আপনাআপনি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে নেতাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি যেটুকুই থাক,—তার থেকে বেশী এ ক্ষেত্রে ওই ভিন্নধর্মী ব্যারিস্টার সাহেবের পুত্রের প্রতি বিরাগ। স্টেটমেণ্ট নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলে আই-বি পুলিস। শুধু বললে—কেস হলে সাক্ষী দিতে হবে। ও যে নেতাজী জিন্দাবাদ বলে দরজা খুলে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেটা বলতে হবে।

—জরুর। নিশ্চয় বলব। লেকেন ওর হাতে কিছু ছিল না—বোমা না, পিস্তোল না, ছুরি না—ডাণ্ডা ভি না।

বলে চলে গিয়েছিলেন রঘুনন্দন সিং। কিন্তু সাধনা দেবীকে সহজে নিষ্কৃতি দিলে না পুলিস। সাধনা দেবীও প্রায় ওই কথাই অর্থাৎ রঘুনন্দন সিং যা বলেছিলেন তাই বললেন। এবং তাই তো সত্য! কিন্তু পুলিস সন্দেহ না করে পারলে না। তার কারণ অবশ্য ছিল। পুলিস অফিসার সেটা খুলেই বললেন।

কৈফিয়ত হিসাবে সাধনা দেবী "মানুষের চামড়া গায়ে নিয়ে কোন মানুষই বোধ হয় এ চোখে দেখতে পারত না",—বলতেই অফিসার বললেন—কিন্তু রাস্তায় এমনি ধারার হল্লা দেখলেও কি এমনি করে ছুটে যেতেন? না—সে হল্লা এড়িয়ে অন্য পথে ঘুরতেন?

সাধনা দেবী থমকে গেলেন। তাই তো!

অফিসার বললেন—বলুন?

সাধনা দেবী একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ—তা ঘুরেই যেতাম। কিন্তু এ আমার বাড়ির দরজায়; আর ভুবনবাবু আনন্দবাবু ভুনি দুনিদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ ভালবাসা। একবাড়ির মত। এই অজয়ের মা আমার ননদের মত। পথের মধ্যে এমনি ঘটনায় অজানা একটি ছেলেকে এইভাবে বিপন্ন দেখলে ছুটে যেতাম না ঠিক—কিন্তু দুঃখ হত। আবার সে ছেলে যদি আমার আপনার হত তবে পালিয়ে আসতাম না, এমনি করেই ছুটে যেতাম—নয় বুক চাপড়ে কাঁদতাম।

—ভাল। এই পত্রখানা আপনার লেখা? আপনার যা হাতের লেখা তার সঙ্গে অবিকল মিল। এটা আমরা ছেলেটির পকেটে পেয়েছি।

—হ্যাঁ আমার লেখা। ওকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। ওতে তা লেখাও আছে।

—হ্যাঁ, সে দেখেছি। অন্য ক্ষেত্র হলে কথাগুলো মেনেই নিতাম। কিন্তু আনন্দ-

মোহনবাবুর আমল থেকে এ বাড়ির ছেলেমেয়ে সব কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এই ছেলেটির বাড়ি আবার চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা—সেখান থেকে এখান। এবং এখানে সে ছাত্রদের মধ্যে সুভাষ বোসের প্রপাগাণ্ডা করছে বেশ কিছুদিন থেকে। আমাদের নজরে সেটা পড়েছে। অজয় সুভাষ বোসের ফলোয়ার ব'লেই সে আনন্দবাবুর ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে না থেকে হোস্টেলে গিয়েছিল। পুজোর পর থেকে সে তাঁদের বাড়িতে আসে নি একদম। এঁদের সঙ্গে আপনাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা—সুতরাং ধরে নেব এটা আপনিও জানেন। আচ্ছা। এরপর আপনার নিজের কথা। আপনার শ্বশুর হারাণবাবু ক্রশ্চান মিশনারীদের স্কুলে পড়াতেন। আপনার স্বামী শিবেনবাবু এঁদের গোঁড়াভক্ত ছিলেন। আপনাদের পরিবারকে লোকে বলত আধাক্রশ্চান। বলুন বলত কি না?

শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠছিলেন সাধনা দেবী। তাঁর মনে হচ্ছিল ওই লোকটি কথার গাঁথুনি দিয়ে একটি জাল বুনে চলেছে; তার কেন্দ্রস্থলে তিনি দাঁড়িয়ে; আর ওই কথার জাল গ্রন্থির পর গ্রন্থিতে বজ্রবন্ধনে সংকঠিন হয়ে কেন্দ্রে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। অফিসার তাঁকে প্রশ্ন করলেন—বলুন বলত কি না?

তিনি ক্লান্তভাবে বললেন—হ্যাঁ—বলত।

—আচ্ছা। এরপর শিবেনবাবু কোন কারণে ক্রশ্চান মিশনারীদের বিরোধী হন। এদের ইম্পিরিয়েলিস্ট ইংরেজদের গুপ্তচর বলে ধারণা করে এদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কাগজ বের করেন। নয় কি?

—হ্যাঁ।

—মিশনারীরা ইংরেজের গুপ্তচর। রাগটা তাঁর মিশনারীর উপর ইংরেজের উপর বিচার করলে—ইংরেজের উপরই দাঁড়ায়। এর জন্যে তিনি চাকরি ছাড়েন। তারপর দুর্ঘটনা ঘটল—মেয়ে আত্মহত্যা করল। তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। কিন্তু তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষ আপনিও পেয়েছিলেন। তার প্রমাণ মিশনারীরা আপনার এবং আপনার মেয়ের ভার নিতে চেয়েছিল—আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা চাকরিও দিতে চেয়েছিল—তাও নেন নি। তার জায়গায় পাঠশালা খুলে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

এবার শ্বাসরুদ্ধ মানুষের মত সাধনা দেবী বলে উঠলেন—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? কি বলছেন এ সব?

—বলছি—আপনি যা জানেন এ সম্পর্কে সত্য করে বলুন। এই অজয় সম্পর্কে কি জানেন? আমাদের ধারণা, ভুনিবাবু দুনিবাবু তাঁর মা গোঁড়া কংগ্রেসী—গান্ধীভক্ত বলে এখানে তার কাগজপত্র আর্মসও আছে নিশ্চয়, তাও সে রাখত আপনার কাছে। আপনি সব জানতেন।

—না। না। মিথ্যে কথা।

—সে আপনাকে টাকা দিয়েছে—

—না।

—দিয়েছে—আড়াইশো টাকা।

—সে মেয়ের বিয়ের যৌতুক, পাঠিয়েছিল তার মা। তাও আমরা ফেরত দিয়েছি। শুধু আড়াইশো টাকা নয়—আরও একটা আংটি পাঠিয়েছিলেন মনোরমা। সে আমি ফেরত দিয়েছি। ভুনিকে দিয়েছিলাম। সে টাকা গরিব বাঙালী পরিবারের সাহায্য-সমিতি যেটা হয়েছে তাতে দিয়েছেন তাঁরা। নিয়েছেন এখানকার মুখুজ্জে মশায়।

বলতে বলতেই উত্তেজনায় ভয়ে সাধনা দেবী উঠে দাঁড়ালেন।

অফিসার বললেন—বসুন।

—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব। আমার মেয়ে একলা আছে। আমার পাঠশালা আছে।

—অত্যন্ত দুঃখিত। ছেড়ে আপনাকে দিতে পারব না এখন।

—আমি আর কোন কথা জানি না।

—বেশ আমাদের তদন্ত শেষ হোক ; এখন আপনাকে আটক থাকতে হবে।

মাথাটা ঘুরে উঠল সাধনা দেবীর, তিনি টলে পড়ে যেতে যেতে টেবিলের কোণাটা দু হাতে চেপে ধরলেন।

অফিসার শান্তভাবে বললেন—উত্তেজিত হবেন না আপনি। শান্ত হয়ে বসুন। আমি কর্তব্যে বাধ্য। নিরুপায়।

চেয়ারে ব'সে টেবিলে মাথা রেখে সাধনা দেবী এবার কেঁদে ফেললেন।

একজন সিপাহী এসে সাহেবকে একখানা স্লিপ দিলে। তিনি সিপাহীকে পাহারায় রেখে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন—আপনার মেয়েকে নিয়ে গেছেন আপনাদের মুখুজ্জে মশায়। তার জন্য কোন চিন্তা করতে বারণ করেছেন। তিনি আমার প্রফেসর ছিলেন কলেজে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে ?

—তিনি এসেছেন ?

—হ্যাঁ। বাইরে আছেন।

—হ্যাঁ, একবার, একবার দেখা করতে চাই।

সিপাহীকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বৃদ্ধ মুখুজ্জে মশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে সাধনা আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। মুখুজ্জে মশাই এসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন—উমার জন্যে তুমি ভেবো না। তাকে আমি নিয়ে গেছি বাড়িতে।

সাধনা কাতর কণ্ঠে বললেন—আমি কিছু জানি না কাকা—আমি নির্দোষ। বিশ্বাস করুন।

মুখুজ্জে বললেন—ভেঙে পড়ো না মা! নিজেকে শক্ত করে বাঁধ। রাজদ্বার! এ স্থান অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং সহানুভূতিহীন। তবে—তবে যিনি অফিসার রয়েছেন তিনি সৎলোক। আমি জানি—আমার ছাত্র। শান্ত হও। শক্ত করে নিজেকে বাঁধো।

এবার আঁচলে চোখ মুছে সাধনা দেবী মুখ তুললেন।

মুখুজ্জে মশাই বললেন—তা হলে আমি যাই।

সাধনা হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। মুখুজ্জে বললেন—অকপটে সত্য কথা বলো মা। সেইটেই আমার একমাত্র উপদেশ। এঁদের দৃষ্টিতে দোষী হলেও সেটা তোমার কলঙ্ক নয়, আর না হলে নিশ্চয় তোমাকে ছেড়ে দে'বন এঁরা। তবে মিথ্যে কোন কথাই যেন বলো না। কারুর কোন প্ররোচনাতেই না।

—আসুন স্যার। আপনি ওঁর জন্যে ভাববেন না। কেউ ওঁকে মিথ্যে কথা বলাবে না। একটু হেসে বললেন অফিসার।

—রাগ করলে ?

—না। আবার হাসলেন অফিসার।—এ তো হামেশাই হয়। তবে আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।

—তা আমার আছে। ওর খাবারটা বল তো আমি পাঠিয়ে দেব।

—আমি যদি আমার বাড়ি থেকে আনাই!

—তাই দিয়ো।

চলে গেলেন মুখুজ্জে মশাই।

অফিসার সাধনা দেবীকে বললেন—আপনি ও-ঘরে বসুন। একটু বিশ্রাম করুন। বিশ্বাস করুন—অকারণে অন্যায় করে আপনাকে আমরা এক মিনিটও আটকে রাখব না।

*   *   *

দু দিন এক রাত্রি পর—দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা অফিসার বললেন—আপনাকে কর্তব্যের খাতিরে এতক্ষণ আটকে রেখেছি। কোন উপায় ছিল না। মাফ করবেন সেজন্যে। আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। তবে একটি শর্ত রইল।

দু দিনেই সাধনা দেবী যেন দশ বৎসরের ধৈর্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। মুখে চোখের দৃষ্টিতে তা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সাধনা দেবী বললেন—অনেক ধন্যবাদ। কি শর্ত বলুন।

—শর্ত এই যে পুলিসকে না জানিয়ে আপনি এলাহাবাদ ছেড়ে কোথাও যাবেন না, বা নিজের ঠিকানা বদল করবেন না।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে সাধনা দেবী বললেন—এর মানে বোধ হয় এই যে পুরো মুক্তি আমাকে এখনও দিলেন না।

—হ্যাঁ, কতকটা তাই। কারণ এখনও আমাদের তদন্ত শেষ হয় নি। অজয় ছেলেটির পুরো রিপোর্ট এখনও আসে নি। এবং সে এখনও ঠিক সুস্থ হয় নি। তার ফাইন্যাল স্টেটমেণ্ট আজো নেওয়া হয় নি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সাধনা দেবী বললেন—বেশ।

—এই কাগজখানায় সই করুন। পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখলেন সাধনা দেবী; তাতে ওই কথাই অর্থাৎ ওই শর্তই আরোপ করা আছে। তিনি সই করে দিলেন। অফিসার বললেন—বাইরে প্রফেসার সাব - আপনাদের মুখুজ্জে মশায় বসে আছেন। তাঁকে আমি খরর দিয়েছিলাম—তিনি আপনাকে নিয়ে যাবেন। আসুন।

অনুসরণ করতে করতে সাধনা দেবী প্রশ্ন করলেন—অজয় কেমন আছে?

—ছেলেটিকে আপনি স্নেহ করেন, না?

—তা করি। তবে এইভাবে জড়িয়ে গিয়ে যেন সেটা গাঢ় হয়েছে।

—আপনি সত্য কথা বলেছেন বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। ছেলেটির জ্ঞান হয়েছে, ডাক্তার বলেছেন—আউট অব ডেঞ্জার—কিন্তু সুস্থ ঠিক হয় নি। মাথার চোটটা একটু বেশীই হয়েছে।

—ওর মা খবর পেয়েছে?

—জানি না।—এই যে। অর্থাৎ সামনেই তাঁর প্রফেসর—এলাহাবাদের মুখুজ্জে মশাই।

তিনিই সম্ভাষণ করলেন—এই যে মা। এই নাও—তোমার উমা।

উমাকে সঙ্গে করেই এসেছিলেন মুখুজ্জে মশাই। উমা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে। সাধনা দেবী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—দু চোখের কোণ থেকে দুটি ধারা তাঁরও নেমে এল, কোনক্রমেই তার গতিরোধ করতে পারলেন না।

—এস মা। আর না এখানে। চল।

সাধনা দেবী হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন অফিসারকে, বললেন—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার ভদ্র ব্যবহার আমি কখনও ভুলব না।

মুখুজ্জে বললেন—থাক মা থাক। এ কথাটা ওর ওপরে রিপোর্ট হলে ও যে ও, ওরও ব্ল্যাকমার্ক পড়বে হয়তো।

হাসতে লাগলেন অফিসার।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন ভুনির মা—নলিনী দেবী। তাঁর পিছনে বুড়ী দাই। ভুনি-ভুনিও অ্যারেস্টেড হয়েছে। এলাহাবাদ স্টেশনেই পুলিস তাদের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু নলিনী দেবীর মুখে সেই অনুদ্বিগ্ন শান্ত হাসি। আজই দুপুরে তাঁরা ফিরেছেন। বললেন—মনোর ছেলে এমনি একটা কিছু করবে তা অনুমান করেছিলাম। ভেবেছিলাম—ওকে এখান থেকে জোর করেই দেশে পাঠিয়ে দেব। তা—হয়ে গেল তার আগেই। দুঃখ তুই এতে জড়িয়ে পড়লি।

—না। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই দিদি। যদি আমি সেদিন সব দেখেশুনে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতাম, তবে ভগবান কোন দিন আমাকে ক্ষমা করতেন না।

—কিন্তু—। বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে নলিনী দেবী বললেন—আয় চা খাবি আয়। এ দুদিন নিশ্চয় খাওয়াও তোর হয় নি। শুনেছি বটে—এস-পি নিজের বাড়ি থেকে খাবার পাঠাচ্ছেন কিন্তু তুই তো খাস নি! আয়। তবে উমা তোর শক্ত বটে। ও কাঁদে নি।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে নলিনী দেবী বললেন—দাঁড়া মিষ্টি নিয়ে আসি।

উঠে গেলেন তিনি। অবসর পেয়ে উমা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—মা!

—কি?

—আমাদের পাঠশালায় আর কেউ ছেলে পড়াবে না মা। পাঠশালা উঠে যাবে।

কেঁদে ফেললে সে।

কি? চমকে উঠে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন সাধনা দেবী।

পাঠশালায় আর কেউ ছেলে পড়াবে না? পাঠশালা উঠে যাবে? সাধনা দেবী যেন পঙ্গু হয়ে গেলেন। মাটির পুতুলের মত বসে রইলেন। সব যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। জীবনের দিগন্ত থেকে অন্ধকার যেন বলয়াকারে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে। নিঃশেষে তাঁকে এবং উমাকে গ্রাস করে ফেলবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়াই বোধ হয় নিয়তি।

নলিনী দেবী এসে বসলেন, মিষ্টির প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—নে—খেয়ে নে।

সাধনা দেবী চুপ করেই বসে রইলেন।

—সাধনা!

—অ্যাঁ!

—খা।

—হ্যাঁ। একটুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে—বাকীটা ঠেলে দিয়ে বললেন—আর থাক। আর পারব না।

—কি হল তোর? সাধনা? উমা? নলিনী দেবী বিস্মিত হয়েছিলেন, হঠাৎ কি ঘটে গেছে।

সাধনা দেবী চুপ করেই রইলেন। উমা বললে—ওদের বাড়িতে বাঙালীরা এসেছিল—বলছিল—

—কাদের বাড়ি! ও—! মুখুজ্জে খুড়োর বাড়ি?

—হ্যাঁ। সব এসে বলছিল—

—কি বলছিল?

—মাকে যখন পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে তখন ওই পাঠশালায় আর কি করে ছেলেদের

পড়তে দেবে ? আর হরিসভাতেই বা পাঠশালা কেন করতে দেওয়া হবে ?

নলিনী দেবীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজই সবে পেঁৗছেছেন তিনি ; স্টেশন থেকেই ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছে। বাড়িতে এসে দাঈয়ের কাছে শুনেছেন অজয়ের বিবরণ ; সাধনার কথা শুনেছেন। তার বেশী আর কোন খোঁজ তিনি করেন নি। রাজনৈতিক-কর্মে তিনি নিজেও লিপ্ত হয়েছেন অনেকদিন থেকে। এ সব সহ্য করবার একটা শক্তি ও অভ্যাস তাঁর হয়ে গেছে। মনোরমাকেও তিনি এখনও অজয়ের সংবাদ জানান নি। কি হয় দেখা যাক, তারপর জানাবেন ! শুধু অজয় এখন জীবনের দিক থেকে নিরাপদ এইটেতেই তিনি নিশ্চিন্ত। রঘুনন্দন সিং অবশ্য এসেছিলেন। তিনি নিজে যতটুকু জানেন বলেছেন—তার সবটাই আইনের কথা। আর কোন সংবাদ তাঁর কাছে আসে নি। নলিনী দেবীও এ সব ভাবেন নি। এতক্ষণে শুনে তিনিও স্তব্ধ হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর তিনি বললেন—তার জন্যে ভাবছিস কেন ? আবার একটা পথ হবে !

কিন্তু সে কোন্ পথ ! সব যে অন্ধকার মনে হচ্ছে। সে কথা মুখে এল না সাধনার—শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল ! নলিনী দেবী আবার বললেন—আর ভেঙেই বা পড়ছিস কেন ? কথা ওঠে, উঠতেও পারে, অনেকে অল্পেই ভয় পায়। তা বলে সেইটেই সব নয়। মুখুজ্জে খুড়ো তো এখনও কিছু বলেন নি। দেখ না কি হয় !

উমা বুঝতে ভুল করে নি।

সে যা শুনেছিল ঠিক তাই বলেছিল, এবং তার সঠিক অর্থও সে বুঝতে পেরেছিল। মুখুজ্জে দাদু তাকে বাড়ি এনে রেখে বলেছিলেন—কাঁদিস নে ভাই, নিশ্চিন্তি থাক তুই। আমি যাচ্ছি পুলিস সাহেবের কাছে—সে আমার ছাত্র। কিন্তু তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো—অজয় তোদের বাড়ি আসতো যেতো ?

সে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না।

—ঠিক !

সে এবার দাদুর দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—মিথ্যে কথা বলছি নে দাদু। সেই দিদি যেদিন মারা যায় সেই দিন ছাড়া কোন দিন সে আমাদের বাড়ি আসে নি। একদিন আমি গিয়ে তার মা দিদির বিয়েতে যে টাকা আর আংটি দিয়েছিলেন তাই ফেরত দিয়ে এসেছিলাম জেঠীমার কাছে।

অজয় অপরাধী কি না তা মুখুজ্জে মশায় জানতেন না—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগলেও তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হন নি। তাঁর উৎকণ্ঠা সাধনা বউমার জন্য—সেই সাধনা বউমার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি তাঁর ছাত্রের কাছে গিয়েছিলেন। সঙ্গে উমাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে যখন এসেছিলেন তখন কয়েকজন বাঙালী সেখানে বসে ছিলেন তাঁর জন্য। এঁরা সকলেই সরকারী চাকরি করেন। দু'জন পেন্সনভোগীও ছিলেন। খবরটা তাঁরা পেয়েছেন। এখন মুখুজ্জে মশায়কে বলতে এসেছেন—এরপর তাঁরা কি করে ওই পাঠশালায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়তে দেবেন ? তাঁরা সরকারী চাকরে।

সংসারে অন্ন পরম বস্তু। উপনিষদে আছে—ব্রহ্ম কি—এই নির্ধারণ করতে গিয়ে ঋষির প্রথম মনে হয়েছিল 'অন্নই ব্রহ্ম'। গোটা সংসার অন্নের তপস্যায় রোদে পোড়ে জলে ভেজে উদয়াস্ত খাটে, মানসম্মান শিকেয় তুলে অন্নদাতাকে প্রভু বলে, অন্ন যদি ব্রহ্ম হয় তবে অন্নদাতা যে ব্রহ্মেরও মালিক তাতে আর সন্দেহ কোথায় ?

এঁরা প্রবাসী—চাকরিই সম্বল—অন্য কোন সংস্থান নেই। বাপ সাহেবকে ধরে ছেলের চাকরি করে দেন, নাতি বড় হওয়া পর্যন্ত বাঁচলে নাতির জন্যও পুরনো সাহেবকে চিঠি লেখেন। দেশ সাহেবদের সাম্রাজ্য—আইনসম্মতভাবে নীতিসম্মতভাবে এমন কি বিধাতার

সম্মতি অনুসারে এ না মেনে তাঁদের উপায় কি ?

স্বাধীনতা চান না এঁরা এ কথা কে বলবে ? কারণ মানুষ তো তাঁরা। কিন্তু সে চাওয়াকে মনের গভীরতম এক কুপে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার মুখে ঢাকনা-চাপা দেওয়া হয়েছে।

তার উপর এই ভিন্ন প্রদেশে যেখানে প্রদেশবাসীর দাবি—এ প্রদেশের চাকরি এখানকার লোকে পাবে তখন তাঁরা অহরহই চাকরি যাওয়ার ভয়ে ত্রস্ত। কে কোথায় কোন্ খোঁচা তুলবে এবং সেই খোঁচায় সামান্য ব্রণ বিষিয়ে উঠে প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে তার তো স্থিরতা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে কি করে এর পর—? বাকীটা তাঁরা বলেন নি—সেটা বুঝতেও উমার কষ্ট হয় নি ভুল হয় নি।

মুখুজ্জে মশায় অবশ্য তাঁর স্বভাবমত প্রথমটায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং বাছা বাছা বাক্য প্রয়োগে তাঁদের বিপর্যস্ত ও অপদস্থ করে তুলেছিলেন—কিন্তু এক পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধের চোখ থেকে অকস্মাৎ জল গড়িয়ে এসে তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। একবার মুখুজ্জে বলেছিলেন—তোমার লজ্জা করে না বোস—বুড়ো বয়সে ছিঁচকাঁদুনের মত কাঁদতে ?

তিনি বলেছিলেন—না। আপনি ভুলে গেছেন—আমার ভুলবার নয়। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হল—জামাই যে স্বদেশী করত তা জানতাম না। ধরা পড়ল জামাই, আমি মেয়েটাকে বাড়ি আনলাম—পুলিস করলে রিপোর্ট। সাহেব ডেকে বললে—এই দেখ পুলিস রিপোর্ট। কি বলবার আছে। তুমি এনার্কিস্টকে ঘরে রেখেছ স্থান দিয়েছ! বললাম—সাহেব, জামাই যা করেছে তার সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক কি ? কিন্তু কে শোনে ? বললে—হয় তুমি মেয়েকে ছাড় নয় মেয়েকে বল সে বলুক পুলিস যা তাকে বলতে বলে। শেষে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলাম তার মামার বাড়ি। সেখানে সে মেয়ে আমার বিষ খেয়ে মরে! না কেঁদে করি কি ? ছেলেটার চাকরি যদি যায়—তবে—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—চাকরি না যাক—সার্ভিস রিপোর্টে যদি লেখে যে, সিক্রেট সিমপ্যাথাইজার অব সুভাষ বোস—! তাতেই যে দফা খতম। কোথায় বদলি করে দেবে! কি ফেসাদে ফেলবে—!

এরপর চুপ করে গিয়েছিলেন মুখুজ্জে।

দু-একজন অন্য সুরে কথা বলেছিল। একজন তরুণ কেরানী—আড়ালে ছিল—সে হঠাৎ সামনে এসে বলেছিল—তা ছাড়াও কথা আছে। ওই ছেলেটি যে সুভাষ বোসের দলে তাতে তো সন্দেহ নেই। এবং ওর সঙ্গে এদের যোগাযোগও রয়েছে। এতে আমাদের চাকরির কথা বাদই দিন। কিন্তু আমরা ওঁকে কেন সাহায্য করতে যাব যখন উনি জাপানীদের এদেশে আসবার পথে সহযোগিতা করছেন! বোস মানেই তোজো—!

মুখুজ্জে ঘৃণাভরে বলেছিলেন—যাও। সাহায্য তুমি করো না। করতে হবে না। মুঠো বেঁধে হাত ছুঁড়ে জাপানীদের রোখোগে যাও।

* * * *

উমা ভুল বলে নি। পরের দিন ভোরবেলা নিজেই এলেন মুখুজ্জে মশাই! তিনি নিজেই বললেন—তোমাকে কি করে বলব বুঝতে পারছি নে। তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে —কিছু লোক—

সাধনা দেবী বললেন—আমি শুনেছি। উমা বলেছে।

—হ্যাঁ, উমা শুনেছে। এরা চাকরির ভয়ে বিব্রত। কিছু লোক—তাদের চাকরির ভয় নয়—তাদের পুলিসের ভয়—আবার কিছু লোক—যাক—তাদের কথা মুখে আনতেও রাগ হয় আমার। বলে পঞ্চমবাহিনী।

সাধনা দেবী বললেন—আমি আর পাঠশালায় যাব না। ওর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব

রইল না। আপনারা অন্য কাউকে রেখে ওটা চালান।

—সে পরের কথা। তোমার জন্যে করেছিলাম। তুমি ছেড়ে দিচ্ছ—এখন ওটা থাকে থাক যায় যাক—আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পথ তো একটা চাই।

হেসে সাধনা দেবী বললেন—পথ এখন দুনিয়ার ধুলোর পথ ছাড়া আর কিছু নেই। এইটে দেখুন। আমি ছিলাম পুলিসের হাতে—উমা ছিল আপনার বাড়ি—এর মধ্যে এই নোটিশটে জারি করে গেছে।

আদালতের নোটিশ। বাড়ি করবার সময় ব্যাংকের কাছে জায়গা ও বাড়ি মর্টগেজ রেখে টাকা নেওয়া হয়েছিল, সেই টাকার জন্য ব্যাংক নালিশ করেছে। দরজায় লটকে জারি করে গেছে—সেটা রেখেছিল বুড়ী দাঈ—সে দিয়ে গেছে এই সকালবেলা। কুড়ি হাজার দুশো তিরিশ টাকা দশ আনা ন পাই দাবি।

মুখুজ্জে সবিস্ময়ে বললেন—তোমার শ্বশুর তো আট হাজার টাকা নিয়েছিলেন। তারপর টাকা দেন নি?

সাধনা দেবী বললেন—দিয়েছিলেন। সুদ দিতেন, মধ্যে মধ্যে বাকী পড়ত। তখন সুদের সুদ লাগত। তারপর তিনি মারা যাবার পর উনি দলিল পালটে দিয়েছিলেন। তখন হয়েছিল দশ হাজার। উনিও দিয়েছেন টাকা কিন্তু তাতেও সুদ শেষ হয় নি। শেষের দিকে সবই বাকী পড়েছে। সুদের সুদ জড়িয়ে হয়েছে এমন। উনি বলতেন—অন্ততঃপক্ষে ন' দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন।

মুখুজ্জে বললেন—ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, উকিলকে দেখাব। কিন্তু তুমি ভেবো না। ভগবানে ভরসা রেখো, একটা কিছু হবেই।

ভগবানে ভরসা! তা হলে তো বলতে হবে এই অবস্থাটাই চরম কল্যাণের অবস্থা। কারণ ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে—তাতেই হবে মঙ্গল। পাঠশালাটা উঠে যাবে উপার্জনের পথ বন্ধ হবে—তাও মঙ্গলের জন্য। শেষে পথে মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে—তাতেই হবে বোধ করি চরম মঙ্গল। জয় ভগবান!

সাধনা দেবীর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছিল।

মুখুজ্জে মশায় চলে যেতেই উমা শুকনো মুখে প্রশ্ন করলে - মা? সম্বোধনের মধ্যেই প্রশ্নটা জড়ানো ছিল—কি হবে মা?

মা সাধনা দেবী—ভাগ্য বল ভাগ্য, কর্মফের বল কর্মফের—যাই কিছু হোক—তার হাতে মার খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গেছেন—ভেঙে পড়ার অবস্থা তিনি পার হয়েছেন। যা হবার হবে, মনের এমনই একটা অবস্থা। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—খিদে পেয়েছে, না-রে?

—না, ক্ষিদে পায় নি।

—তোর না পেলেও আমার পেয়েছে। আয় দুটো ময়দা মাখবি আয়। উনোনের আঁচ তো বয়ে যাচ্ছে। দাঈ আঁচ দিয়ে চলে গেছে কখন।

—কিন্তু কি হবে মা?

—কি হবে? একটা কিছু হবে। তুই ভাবিস নে। লক্ষ্ণৌ গিয়ে রেভারেণ্ড রিচমণ্ডের ওখানে দিয়ে আসব। আমি এখানে বা ওখানে খেটেখুটে খাব।

কিছুক্ষণ পর নলিনী দিদি এলেন, বললেন—সকালবেলাতেই আমি বেরিয়েছিলাম এস-পির ওখানে, ছেলে দুটোর কাপড়চোপড় দিয়ে এলাম। অজয়ের খোঁজ করলাম। ফেরার পথে মুখুজ্জে খুড়োর সঙ্গে দেখা করে এলাম। তিনি তো তোর এখানে এসেছিলেন।

—হ্যাঁ এসেছিলেন। বলে গেলেন—ভেবো না—ভগবানে ভরসা রাখো। কিন্তু অজস্র

কেমন আছে দিদি ?

—অসুখের দিক থেকে ভাল। কিন্তু পুলিস ওকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। কি ফেসাদ বল তো। অথচ ছেলেটা সত্যিই কোন কাজের কাজী নয়। তবে কি জানিস ? আমার ছেলে হলে ভাবতাম না। ছেলে মনোর। সে একেবারে ছেলে-অন্ত-প্রাণ ! মার পেটের বোনেদের সঙ্গে ওই ছেলে নিয়ে বিচ্ছেদ। ওই ছেলেটার যত বয়স ঠিক ততদিন থেকে মুখ-দেখাদেখি নেই। সে যে কি করবে তাই ভাবছি। টেলিগ্রাম তো করে দিলাম আসবার জন্যে। অজয়ের নাম দিয়ে করলাম—অজয় জানাচ্ছে—মামীমার অসুখ—তুমি এস।

উমা বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়াল—জমাদারনী এসেছে—ঝাড়ুসাফাইয়ের কাজ করতে সে গিয়েছিল জল দিতে ; কথার মাঝখানেই সে এসে দাঁড়িয়েছিল—নলিনী জেঠীমার কথা শেষ হতেই সে বললে —মা, জমাদারনী বলছে—লোকে বলছে তোমাদের ঘরে সব বোমা পিস্তোল লুকোনো আছে—সে সব যেন সাবধানে রেখো —পাখানা-টাখানার মধ্যে রেখো না।

হেসে উঠলেন নলিনী দেবী। বললেন—'ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ' খ্যাতি রটে গেছে ! তা যাক। ওকে কাল আমি বলে দেব। এখন শোন—আমি ভাবতে ভাবতেই আসছি। একটা কথা আমার মনে হয়েছে। আমার মনে হয় এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

—কি ?

—মনো আসছে। তার ছেলেকে নিয়ে যা হবার সে হবে। সহ্য তাকে করতেই হবে। একটু স্থির হলেই আমি ভাবছি ওকে বলব—তুই সাধনা আর উমাকে তোর ওখানে নিয়ে যা। ওর শ্বশুর ওখানে হাই স্কুল গার্লস স্কুল করে গেছেন—সেই গার্লস স্কুলে তোকে একটা চাকরি দিক। আমার মনে হয় এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

একটু চুপ করে থেকে সাধনা দেবী বললেন—মনোরমাকে বলবেন তা হলে—অজয়ের জন্যই ওদের যখন এই অবস্থা তখন ওকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেওয়া তার উচিত ! এই দাঁড়াচ্ছে না—দিদি ?

—দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কি সাধনা ? তোর যদি কাজে যোগ্যতা না থাকত তবে কথাটার মানে দাঁড়াতো—উপকার করেছি—প্রত্যুপকার চাই। এখানে তো তা নয়।

চুপ করে রইলেন সাধনা দেবী।

নলিনী দেবীই বললেন বলতে পারিস—একজনকে ছাড়িয়ে রাখতে হবে তো ! কিন্তু তাও না—পুজোর ছুটির পর এসে অজয় প্রণাম করতে এসেছিল—সেদিন সে বলেছিল তাদের বালিকা বিদ্যালয়টা এল. পি. আছে, সেটাকে ইউ. পি. করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তা এই তো বছরের আরম্ভ। তুই তো গলগ্রহ হতে যাবি নে ! কারুর অন্ন মারতেও যাবি নে !

তবুও চুপ করে থাকলেন তিনি।

চার দিন পর মনোরমা যেদিন নিজে প্রস্তাব করলে সেদিনও প্রথমটা চুপ করেই রইলেন, তারপর বললেন—বেশ যাব। নিলাম কাজ।

মনের মধ্যে একটুখানি মানসম্মানের প্রশ্ন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেদিন মনোরমা প্রথম পৌঁছয় সেদিন তার প্রতি তাঁর মন খানিকটা বিরূপ হয়েছিল। নলিনীর কথায় তিনি যে মনোভাববশে চুপ করে ছিলেন সেটা সেদিন শক্ত হয়ে এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

স্টেশনে কেউ যায় নি। ইচ্ছে করেই নলিনী দেবী পাঠান নি। প্রশ্ন তো সে অনেক করবে—তার জবাব কি দেবে সে ? বাড়িতে নেমে মনোরমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁরই। তিনি বলেছিলেন—আসুন ঠাকুরঝি ! দিদি ভাল আছেন।

মনোরমা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—সাধনা বউদি ?

—হ্যাঁ।

—স্টেশনে কেউ যায় নি, কি যে ভাবতে ভাবতে আসছি –

—কে যাবে ? ভুনি দুনি দু'জনই আজ পাঁচ দিন আগে অ্যারেস্টেড হয়েছে।

—অজয় ? সে টেলিগ্রাম করে বসে রইল—করছে কি ?

চুপ করে রইলেন সাধনা দেবী। মনোরমা তাঁর পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে নলিনীকে সুস্থ অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। চোখ দুটির দৃষ্টির বিচিত্র একটা খেলা খেলে গেল যেন, বিস্ময়—তারপর প্রশ্ন -এবং তারপর উত্তরের আভাস পাওয়ার সব কিছুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়ে গেল যেন। তারপর সে বললে—একেবারে সোজা প্রশ্ন –অজয় কোথায় ? তার কি হয়েছে বল ? বউদি !

-- পুলিস তাকে অ্যারেস্ট করেছে।

পাথর হয়ে গেল মনোরমা। কিছুক্ষণ পর বললে—নিজের ছেলেদের জেলে পাঠিয়ে মাথা খেয়ে তৃপ্তি তোমার হল না। শেষে—আমারও খেলে !

হেসে নলিনী দেবী বললেন—বস—একটু মুখ হাত ধো। তারপর সব শোন, শুনে যদি তোর ওই রায়ই হয় তো মাথা পেতে নেব।

—তুমি না খেয়ে থাক তোমার ভুনি-দুনি খেয়েছে।

— না রে। তুই ভুলে যাচ্ছিস—ও চাটগাঁ থেকে এসেছে।

পুতুলের মত মনোরমা আউড়ে গেল—চাটগাঁ থেকে এসেছিল।

তারপর সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, নলিনী দেবী বলতে লাগলেন। বলে গেলেন আগাগোড়া সেদিনের ঘটনা পর্যন্ত। তারপর বললেন—আমি হাসপাতালে গিয়েও দেখে এসেছি, সে সুস্থ হয়েছে আমাকে দেখে একটু লাজুক হাসি হাসলে। বললে—ভাল আছি মামীমা। মাকে একটু সামলে নেবেন।

নিজের মনেই তিক্ততাভরে মনোরমা আউড়ে গেল—মাকে একটু সামলে নেবেন। এ ছাড়া যখন সেদিনের রাত্রের ঘটনা বলেছিলেন নলিনী দেবী সেদিন বারেকের জন্য সাধনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র। তা ছাড়া আর কিছু না। একটা কৃতজ্ঞতার কথা না, একটু বিনীত হাসিও না। নলিনীর কথা শেষ হতেই সে বলেছিল—বাথরুমে জল আছে ? চান করব। নায়েবকে ডেকে বলে দাও বউদি উনি যেন-তৈরী হয়ে থাকেন। আমি উকিলবাড়ি যাব।

এখানকার সব থেকে বড় ক্রিমিন্যাল প্র্যাক্‌টিশানারকে নিযুক্ত করে তাঁকে নিয়ে পুলিস আপিস কোর্ট করেছিল দু দিন। এগুলি তার যেন পড়া বইয়ের মত সড়গড়। অজয়ের সঙ্গে দেখা করে কাল ফিরে এসে আবার একটা বেলা স্তব্ধ হয়ে শুধু বসেই থেকেছে। নলিনীকে শুধু বলেছিল—নাঃ, তোমার দোষ নেই বউদি। ছেলেটা সাধ করে নিজের বিপদ টেনে এনেছে। তবে তুমি যদি আমাকে সময়ে এটা জানাতে !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। এই ক'দিনে সাধনা দেবী কতবার গেছেন—কিন্তু কথা বলে নি। বড়জোর বলেছে—আসুন বউদি ! কখনও তো তাঁকে দেখেই ডেকে বলেছে—বউদি, সাধনা বউদি তোমাকে খুঁজছেন বোধ হয়।

প্রথম দিন উমা তার পরিচর্যা করেছিল। নলিনী দেবীর ঘর স্বরাজপন্থীর ঘর, সেখানে এক বুড়ী দাঈ তার তিনপুরুষের চাকরির দাবিতে বাহাল আছে, নইলে বাকী সব নিজেরা করেন ও'রা। কাজেই মনোরমার ঘরখানাকে ঝেড়ে মুছে—তার জিনিসপত্র গুছিয়ে সাজিয়ে উমাই দিয়েছিল। বলেছিলেন নলিনী দেবী—তুই একটু দেখেশুনে দিগে মা উমা। মনোর তো এসব নিজের হাতে করা অভ্যেস নেই। যা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকে মনোরমা তাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল—তুমি কে খুকী ?

—আমি উমা।

—ও সাধনা বউদির মেয়ে!

—হ্যাঁ।

বাস্ ওই পর্যন্ত, তারপর আর কোন কথা নয়। কোন কথা না ঠিক নয়—বরাতের কথা ছাড়া কোন কথা না।

এই উকিল কোর্ট পুলিস পর্ব শেষ করে যেদিন সে ফিরে এল সেদিন বউদিকে ওই কথা বলে বাকী সময়টার জন্য বিছানা নিয়েছিল। সন্ধ্যায় সেদিন গিয়ে সাধনা দেবী শুনেছিলেন—মনোরমা কাঁদছে। খায় নি। দরজাও খোলে নি।

তার পরদিন থেকে সে উঠে বসেছে। সেটা আজই। এর মধ্যে একটি বিরূপ মনই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সাধনা দেবীর মধ্যে। অজয়কে তিনি বিশেষ জানেন না। সবসুদ্ধ হয়তো বা দশ-পনের দিন। তার মধ্যে দুটি দিন বাদ দিয়ে বাদবাকী দিনগুলির দেখা সে শুধু দেখাই।

একদিন—সে রমার মৃত্যুর দিন—অজয় মুখুজ্জে খুড়োর সঙ্গে তর্ক করেছিল। শোকে তিনি তখন ঝড়ে ভাঙা গাছের মত লুটিয়ে পড়েছেন—তার মধ্যেও ঘোমটাটা ঈষৎ খুলে তিনি দেখেছিলেন—কে বলছে এমন কথা এমন জোরের সঙ্গে! দেখেছিলেন—একটি ছেলে। বাচ্চা ছেলে। বাচ্চা ছেলে ঠিক নয়—একটি কিশোর।

তারপর শুনেছিলেন—সে মনোরমার ছেলে।

আর দেখেছিলেন সেদিন। নেতাজী জিন্দাবাদ বলে ছেলেটা ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাথায় আঘাত পেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখনও চিৎকার করছে—নেতাজী জিন্দাবাদ!

সেই ছেলের এই মা!

প্রথম দিন মনোরমার কাজকর্ম করে দিয়ে বাড়ি ফিরে উমা মাকে বলেছিল—অজয়দার মা যেন কেমন—নয় মা?

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সাধনা দেবী বলে ফেলেছিলেন—অবস্থা যে খুব ভাল ওদের!

এরপর দু দিন ধরে মনোরমার কার্যকলাপ দেখে ধারণাটা আরও খারাপ হয়েছিল শুধু তাঁরই নয়—নলিনীরও।

উকিল নিয়ে পুলিস অফিস ঘোরাঘুরি করা দেখে নলিনী দেবী যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন—সাধনাকে বলেছিলেন—ছেলেটাকে না বণ্ড দেওয়ায়। কেস তো কিছু নেই - তবু মিথ্যে স্বীকার করিয়ে বণ্ড দিয়ে না খালাস করে।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সে আদালতে হাজির হল। পুলিস ছেলেকে ছেড়ে দিক অথবা কেস দায়ের করুক।

চতুর্থ দিনে অজয়কে আটক আইনে এলাহাবাদ জেলে পাঠিয়ে সে ফিরে এল। নলিনী দেবী সেদিন বলেছিলেন—হ্যাঁ, তুই বড় উকিলের পুত্রবধূ বড় উকিলের স্ত্রী বটিস। উত্তর দেয় নি মনোরমা—সে ঘরে গিয়ে শুয়েছিল।

তার পরের দিন সে তাঁর বাড়িতে এল।—বউদি, রয়েছেন ভাই?

একলাই এসেছিল মনোরমা। অভ্যর্থনায় তিনি ত্রুটি করেন নি তবু আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন মনে মনে—এই বড় উকিলের পুত্রবধূ—বড় উকিলের স্ত্রী—একান্তভাবে সন্তানস্নেহে অন্ধ এই বড়লোক মেয়েটি তাঁকে কি বলতে এসেছে। উকিলের পরামর্শে তাঁর মুখ থেকে কোন মিথ্যা কথা বলাতে নয় তো! কিন্তু মনোরমা সোজাসুজি বললে—কথাটা আপনাকে আগেই

আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু অজয়কে নিয়ে আমার মাথায় যেন গোলমাল বেধে গেল। অজয়ের জন্য আপনি যা করেছেন তা প্রায় মায়ের কাজ!

একটু হেসে সাধনা দেবী বললেন—আমিও তো মা ঠাকুরঝি!

—আমিও মা কিন্তু আমি বোধ হয় অন্যের ছেলের জন্য এতটা পারতাম না বউদি!

—বাড়িয়ে বলছেন ভাই, আপনিও পারতেন—করতেন।

এরপর সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর মনোরমা আবার বললে—আপনি যে দুঃখভোগ করলেন অজয়ের জন্যে—পুলিস হাজতে কষ্ট পেলেন। আপনার পাঠশালাও নাকি বন্ধ হয়েছে। কি কৃতজ্ঞতা যে জানাব—

—কর্তব্য করেছি; না ভাই, কর্তব্য বলেও ঠিক করিনি। অজয় আমার বড় মেয়ের মৃত্যুর দিন আমাদের হয়ে এখানকার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তারপর এ বাড়ির ভাগনে—আপনার ছেলে। তার উপর সেদিন রাত্রে তার সেই বীরের মত মূর্তি—মনে হল—এ ছেলে কে গো! থাকতে পারলাম না—না—না—না বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করলাম? শুধু চিৎকারই করলাম। তার বেশী কিছু নয়। করেছেন—রঘুনন্দন সিং সাহেব। উনি না থাকলে সেদিন অজয় বাঁচত না।

মনোরমা বললে—ও'র কাছেও গিছলাম। উনি বললেন—আমি কি করেছি, বহেন। করেছে ভটচাজ বাড়ির বহুমাঈ! বললেন—হল্লা শুনে আমি বারান্দায় বেরিয়ে দেখি—একঠো ষোলা-সতরা বরিষকা লেড়কা নেতাজী জিন্দাবাদ বলে আওয়াজ তুলছে—কাল্লু গুণ্ডা ছুটছে ডাণ্ডা নিয়ে—মুসলমান ব্যারিস্টারের বেটা হাঁকছে—মারো কুত্তাকো। ওদিক থেকে দু হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে এক মা। পহেলে তো আমি ভেবেছিলাম তুমি। আমি ওখান থেকেই হাঁক মারতে মারতে ছুটে নেমে এসেছিলাম। তখন অবশ্য এক চোট খেয়েছে তোমার বাচ্চা—খুন ঝরছে—তবু আওয়াজ থামে নি। আর ভটচাজ বহুমাঈ আগলেছে বুক দিয়ে। অবিশ্যি আমার হাঁকে ওরা পালাল। কিন্তু বহুমাঈ বুক দিয়ে না পড়লে আর এক ডাণ্ডা পড়ে যেত। পড়লে কি হত জানেন পরমাত্মা। তারপর সারারাত ওই ছেলেকে প্রায় কোলে করে উনি বসেছিলেন। সকালে তো পুলিস নিয়ে গেল।

সাধনা দেবী প্রসন্নতায় বিনীত হয়ে ঘাড় নাড়লেন—অর্থহীন ঘাড় নাড়া যেমন সকলে নাড়ে। মনের অপ্রসন্নতা বিরূপতা এরই মধ্যে ধুয়ে গিয়েছিল তাঁর অজ্ঞাতসারে। তারপর অনেক কথাবার্তা। এরই মধ্যে পান ফুরিয়েছিল মনোরমার। হেসে বললে—এই যা, নেশা ফুরিয়েছে। উঠতে হল।

সাধনার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে হেসে বললে—পান ভাই! এ তো বউদিও খায় না—তুমিও না। আমার ঘরে আছে—তাও সাজতে হবে। এই দেখ না, রঘুনন্দনবাবুর বাড়ি গিয়ে ছাঁদা এনেছি—সুরতি আর লক্ষ্ণৌএর জর্দা। যাই এখন।

সাধনা দেবী বলেছিলেন—বসুন। ভাল লাগছে আপনাকে। কতরকম কত কথা ও বাড়িতে শুনেছি—কিন্তু এ তো আপনি মাটির মানুষ। উমা—যা পান সেজে আন।

হাঁ-হাঁ করে উঠল মনোরমা—না—না—না। এমন কাজও করো না। তুমি বরং বাটা-খানা নিয়ে এস, সেজে নেব আমি। গালে চুন লাগলে মরব। চুন কম হলে বিরক্ত হব। মেয়ে আপনার বড় ভাল কিন্তু পান সাজা যার বাড়িতে নেই তার পান সাজা তো খারাপ হলে ভাল বলে খেতে পারব না।

উমা গিয়েছিল বাটা আনতে।

মনোরমা এর পর জিজ্ঞাসা করলে—বউদি বুঝি? কি বলে? ভীতু—বড়লোকের বাড়ির গিন্নী? ও বলতে পারে। ওর মত হতে পারলাম কই? আমার স্বামী মৃত্যুর সময়

বলেছিলেন—দেখ অজয়কে মানুষ করে উকিল করো। আমাদের ঘর-পাট বজায় রেখো। এ বংশের একটা ছেলে। এটা চট্টগ্রাম। তা—।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—কাল তাই ফিরে এসে কাঁদলাম আর তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম—মানুষের চেয়ে কাল বড়। তার শক্তির সঙ্গে আমি পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করো। চট্টগ্রামের পাট কালই তছনছ করে দিলে, কি আছে কি নেই জানিনে। আবার অজয়কে সেই কালই নাচিয়ে নামিয়ে দিলে মরণ-বাঁচনের লড়াইয়ে।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক কেটে গেল। পুরনো কথা নূতন কথা অনেক কথা।

যাবার সময় সে পাড়লে কথাটা। বললে—কিছু যেন দোষ নেবেন না। একটা কথা বলব।

—বলুন। দোষ ধরব কেন?

—না, দোষ ধরে অনেকে। আপনার এখানে পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি চলুন—আমাদের ওখানে বালিকা বিদ্যালয় বড় হচ্ছে। কাজ করবেন।

চুপ করে রইলেন সাধনা।

মনোরমা বললে—দেখুন এটাকে ঋণ শোধ যদি ভাবেন তাতেও দোষ নেই। ঋণ দিয়ে সে ঋণ খাতক শোধ করতে চাইলে যদি না নেয় তবে সে মহাজনকে দেউলে হতে হয়। কল্যাণ হলে দেবতার পুজো দিই, তিনি ফিরিয়ে দেন? তবে?

হেসে সাধনা দেবী বললেন—দেবতা ফিরিয়ে দেন না, মানুষ দেয়। মানুষ হয়তো দেবতার চেয়ে বড়।

—না—না—না। ওটা কোন কথাই হল না। তা হলে আপনিই বা উপকারের ঋণ আমাকে দিয়ে ঋণী রাখবেন কেন? দেবেন—নেবেন, যে দিতে পারবে না তার কাছে জোর করে চাইবেন না। আপনার কাছে আমার ঋণ, আপনার শ্বশুরের কাছে আমার শ্বশুরের ঋণ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি বলে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে—আমি পাশে বসেছিলাম। সে ঋণের কি বৃত্তান্ত আমি জানি নে। তিনি তা বলেন নি। তা ছাড়া আপনার কর্মে যোগ্যতা আছে—তার জন্যই বলছি। এমনই তো বলছি না—চলুন আপনার ভরণপোষণের ভার আমি নেব! কেন না বলবেন? আমি শুনব না। চলুন।

এবার সাধনা দেবী বললেন—বেশ যাব। নিলাম কাজ।

—বেশ—আমার সঙ্গে যাবেন। আর একটা কথা, আপনাদের বাড়ি নিয়ে ব্যাংক যে নালিশ করেছে ওটার ভারও আমাকে দেবেন। আমার লোকজন লড়ে দেবে। ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। ওরা কি ভেবেছে কি? আট হাজার টাকা দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা আদায় করবে!

সাধনা দেবী অবাক্ হয়ে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মনোরমা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল বোধ হয় তাঁর দৃষ্টি দেখে—অপ্রস্তুত হয়েই বললে—আমার পাটোয়ারী বুদ্ধিতে অবাক্ হচ্ছেন, না? উকিলের বাড়ির বউ তো—শুনে শুনে অনেক জানা হয়ে যায়।

সাধনা দেবী বললেন—দেখুন, নলিনীদিকে দেখে ভাবতাম আশ্চর্য মেয়ে। কিন্তু আপনি তো কম না ভাই। আপনিও আশ্চর্য মেয়ে।

মনোরমা বললে—আপনি? আপনি কি কম আশ্চর্য বউদি?

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি। যে লড়াই আপনি করছেন দুর্যোগ মাথায় করে সে যার চোখ আছে সেই বলবে। আপনি আমার চোখে আশ্চর্য। বউদি, এই বিপদ আমি মাথায় করতে পারতাম না। ভেঙে পড়ে যেতাম।

* * * *

পরের দিন তিনি নিজেই গিয়েছিলেন মুখুজ্জে মশাইয়ের বাড়ি। তাঁকে বলতে আর ওই নোটিসটা সম্পর্কে উকিল কি বলেছেন জানতে আর মনোরমা যা বলেছে জানাতে।

সব শুনলেন মুখুজ্জে খুড়ো। তারপর বললেন—মনোরমা ঠিক কথা বলেছে বউমা। উকিলের পুত্রবধু উকিলের স্ত্রী নিজে বিষয় নাড়েচাড়ে, ঠিক বলেছে। উকিলও তাই বলছে। এত টাকা ব্যাংক ডিক্রি পাবে না লড়লে। ওদের কাছে গেলে ফল অবশ্য হবে। নিজেরাই কমিয়ে-সমিয়ে নেবে। কিন্তু টাকাটা তো দিতে হবে।

বিষণ্ন হেসে সাধনা দেবী বললেন—তার থেকে আপনারা থেকে বাড়ির দাম করে ওদের পাওনা ঠিক করে ব্যবস্থা করে দিন। লোকে তো বলে এখন বাড়িটার পঁচিশ হাজার দাম হবে।

—তারপর ?

—তারপর ওই তো মনোরমা ঠাকুরঝি নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ওঁদের গ্রামের ইস্কুলের চাকরি দিয়ে। ব্যাংকে টাকাটা রেখে ওখানেই চলে যাব। যদি মনে হয় গ্রামটা ভাল—এরা লোক ভাল—তা হলে—

বাধা দিয়ে মুখুজ্জে খুড়ো বললেন—তার থেকে তোমাদের যেখানে বাড়ি ছিল—মানে তোমার শ্বশুরের পৈতৃক ভিটে সেখানে একটা বাড়ি করে নাও না কেন ? চাকরি অবশ্য করতে পার এখানে।

সাধনা দেবী বললেন—আমি তো জানি না কোথায় এঁদের বাড়ি ছিল।

– জান না ?

—না। কখনও তো শুনি নি। শ্বশুর কখনও এ গল্প করতেন না। উনিও না। জিজ্ঞাসা করেছি দু-চারবার তো বলতেন—সেখানকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জানতেন তো প্রকৃতি !

—হুঁ।

বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মুখুজ্জে মশায়। নীরবতার মধ্যেই সাধনা দেবী একসময় বললেন—তা হলে যাই এখন—যা হয় করবেন।

—না - বস।

—বসব !

—হ্যাঁ, বস। তুমি জান একটা কথা ? ওই মনোরমার বিয়ের সময় কি কারণে তোমার শ্বশুর শরীর খারাপ বলে না-খেয়ে বাড়ি চলে এসেছিলেন ! তোমার স্বামীও এসেছিল—তুমি এসেছিলে কি না জানি না।

—হ্যাঁ জানি।

—শ্বশুরের শরীর কিন্তু খারাপ ছিল না।

—শুনেছি—পরে অবশ্য—মনোরমার বর শ্বশুরের কাছে এসেছিলেন কি যেন মাপটাপ চাইতে—মনোরমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর। কি হয়েছিল দুজনে।

মুখুজ্জে বললেন—সেই রাত্রে গঙ্গাচরণবাবুর সঙ্গে যা ঘটেছিল তার কারণ হল তোমার শ্বশুর তাঁর স্বগ্রামবাসী। বাসী নয়—গ্রামত্যাগী। গ্রামে প্রচার ছিল তোমার শ্বশুর ক্রিশ্চান হয়েছেন। ভাইরা সমাজে ঘোষণা করে বলেছিল—তাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। কিন্তু মা তা পারেন নি। লোকেরা মাকে পতিত করেছিল। গঙ্গাচরণবাবু তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পর ওই গ্রামে গিয়ে কালী প্রতিষ্ঠা করে তোমার শ্বশুরের মাকে ঠাকুরের পরিচর্যায় নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। লোকের কোন আপত্তি শোনেন নি। তারও কারণ ছিল -গঙ্গাচরণবাবু কুলীনের ছেলে—মামার বাড়ির পোষ্য—মামীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে মামাদের ওই শিষ্যবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে—বছর দুই তিন ভাত খেয়ে ইস্কুলে

পড়েছিলেন। মনোর বিয়েতে তোমার শ্বশুরকে চিনতে পেরে জ্বলে উঠেছিলেন আগুনের মত। নিষ্ঠুর অপমান করেছিলেন।

অবাক্ হয়ে শুনছিলেন সাধনা দেবী।

মুখুজ্জে মশায় বললেন—আমি জানতে চাচ্ছিলাম মা তুমি সব জেনেশুনে ওখানে যাচ্ছ—না না-জেনেই যাচ্ছ! গেলে সব জেনেই যাওয়া উচিত। তোমার শ্বশুরের হাতে লেখা একখানি পত্র আমার কাছে আছে। সেখানাই তোমাকে দেব। পড়ে যা হয় স্থির করো।

শ্বশুরের হাতের লেখা চিঠি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগের তারিখ। লিখেছেন মুখুজ্জে মশাইকেই। ওই মনোরমার বিবাহের কিছুদিন পর। মনোরমার বিবাহের কথার উল্লেখ রয়েছে। বিচিত্র চিঠি।

বন্ধুবরেষু,

তোমার সঙ্গে মতামতে ধ্যানধারণায় অনেক প্রভেদ। কিন্তু তুমি তবুও আমাকে পরিত্যাগ কর নাই—শত্রুতা কর নাই—সাধ্যমতে আমাকে তোমার কল্যাণ পরামর্শ দিয়া আসিতেছ। এবং আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু। আজ আমি আমার অতি দুর্ভাগ্যের দিনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি কি আমাকে রক্ষা করিতে পার? লিখিতে পারিতাম ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে মনে হইতেছে যে তাহা লিখিবার আমার অধিকার নাই। অন্ততঃ তোমাকে লিখিবার অধিকার নাই। তোমার আমার মধ্যে যে শাস্ত্রবিচারের ভঙ্গীর পার্থক্য তাহা সুবিদিত। তুমি বহুবার রূঢ়ভাবে আমাকে এজন্য তিরস্কার করিয়াছ—তাহা আমি স্বীকার করি নাই। কিন্তু বাদপ্রতিবাদ করিয়া বিসংবাদও করি নাই—তাহার কারণ বিসংবাদ করিবার মত প্রকৃতি আমার নয়। বিসংবাদ করিতে গেলে চরিত্রে ও প্রকৃতিতে একটি কাঠিন্যের প্রয়োজন হয়, তাহার অভাব আছে আমার মধ্যে। মাটিতে ও লোহাতে বিসংবাদ হয় না, পাথরে এবং লোহাতে ঠোকাঠুকিতেই আগুন জ্বলে। তাহাতে আমার লোকসান হয় নাই—আমি হারিয়াই জিতিয়াছি। তুমি রূঢ় কথা বলিয়া অনেক সময় মাফ চাহিয়াছ। আমি নিজেও আমার ওই প্রকৃতির জন্য গৌরব অনুভব করিয়াছি; ভাবিয়াছি এই সহ্যশক্তি আমার সত্ত্বগুণেরই লক্ষণ। কিন্তু আজ রূঢ় বাস্তব পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া দেখিতেছি—না—তাহা তো ঠিক নয়। আমার জীবনে যে কাজগুলি করিয়াছি—কষ্টিপাথরে তাহার যে দাগ পড়িয়াছে তাহাতে সেগুলি তো সোনার দাগ হইয়া উঠে নাই। খাদের দাগ জ্বলজ্বল করিতেছে।

কাল সংবাদ পাইয়াছি আমার মাতাঠাকুরানী দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার মাতাঠাকুরানী আজও জীবিত ছিলেন। এবং আমার জন্যই অশেষ অসম্মান ভোগ করিয়াছেন। শেষজীবনে তাঁহাকে অপরের অনুগ্রহের অন্নে জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। আমি যৌবনে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিয়াছি—কোনদিন সংবাদ লই নাই। আমার সহোদরেরা আমার সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছে—ত্যাগ করিয়াছে; কারণ গ্রামের সমাজ আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু মা আমাকে ত্যাগ করেন নাই। সেই কারণে গ্রামের সমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পতিত করিয়াছিল।

সমস্ত কথা তোমাকে আজ খুলিয়াই লিখিব।

বর্ধমান জেলায় শীতলহাটী গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। যে শীতলহাটীতে ভুবনদাদার কন্যা মনোরমার শ্বশুর গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ি। তিনি অবশ্য কুলীনের ছেলে; শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে তাঁহার পুত্র। মনোরমার স্বামী। আমি প্রথম টোলে সংস্কৃত পড়িয়া কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় পাস করি। পড়িয়াছিলাম বর্ধমান শহরে—রাজবাটীর টোলে। পাস করার পর চাকরি লইয়াছিলাম রানীগঞ্জের ইস্কুলে। সেকেন্ড পণ্ডিতের চাকরি।

সামান্য বেতন। বড় ভাই উকিলের মুহুরী ছিলেন। রানীগঞ্জ সম্বন্ধ এবং বিচিত্র অঞ্চল। একদিকে কয়লাকুঠির সম্বন্ধ—অন্যদিকে কুঠিয়াল সাহেব ও পাদরীদের প্রভাব। ওখানেই রেভারেণ্ড স্মিথ আমাকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য নিযুক্ত করেন। তখন আমার নবীন বয়স। মাত্র বাইশ-তেইশ। আঠারো বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রী বিগত হইয়াছেন। মনের অবস্থায় মুক্ত। চোখে নতুন কালের পৃথিবীর রঙ লাগিয়াছে। রেভারেণ্ড স্মিথ আমাকে ইংরাজী শিখিতে উৎসাহিত করিলেন। নিজে যত্ন করিয়া শিখাইতে ব্রতী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। যদি শুধু শিক্ষার প্রভাবে যুক্তিতর্ক দিয়া এটা ঘটিত তবে আজ এত কথা লিখিতাম না। আমি এই সময় প্রেমে পড়িলাম। মেয়েটি বিধবা এবং অব্রাহ্মণ। সেকালের প্রগতিশীল পরিবার। না হিন্দু না ব্রাহ্ম না কৃশ্চান অর্থাৎ জীবনে নাস্তিটাই ধর্ম। বাপ মুখে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী কিন্তু নিজের কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। রেভারেণ্ড স্মিথ তাঁহাদের বাড়ি যাইতেন। মেয়েটি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—তাহাকে পড়াশুনায় সাহায্য করিতেন। আমার সে বাড়িতে প্রবেশাধিকার ঘটিল মেয়েটিকে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য। আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু পথ পাই না। এ অবস্থায় তরুণ বয়সে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল। ভাবিলাম আত্মহত্যা করিব। তাহার পর ভাবিলাম—তাহাকে লইয়া পলাইয়া যাইব। কথাটা ইতিমধ্যে মেয়ের মা-বাপ জানিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেভারেণ্ড স্মিথও জানিলেন। রেভারেণ্ড উৎসাহিত হইলেন—আমাকে উৎসাহিত করিলেন। পথ দেখাইলেন—নিরাপদ পথ -কৃশ্চানধর্মের আশ্রয়গ্রহণ। আমি তখন উন্মাদ। মেয়েটি মত করিলে হয়তো তাহাই করিতাম। কিন্তু মেয়েটি রাজী হয় নাই। রেভারেণ্ড তখন হিন্দুমতে বিধবা বিবাহের পথ দেখাইলেন। কিন্তু মেয়ের বাপ-মা নিষ্ঠুরভাবে বিরোধী হইলেন। তাঁহারা পদস্থ লোক। ভদ্রলোক ছিলেন একজন সাবডেপুটি। তখনকার দিনের সাবডেপুটি। শেষ মীমাংসা হইল বিচ্ছেদ। আমাকে ওখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। রেভারেণ্ড স্মিথ তখন আমাকে চাকরি দিয়া পাঠাইলেন কলিকাতা। আমি হিন্দুধর্মের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। দাদা গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। তাহা করিলাম না, দেশের সঙ্গে ঘরের সঙ্গে মায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। বৎসর দুয়েক পর এই মেয়েটির বাপ হঠাৎ মারা গেলেন। ভাইদের সংসারে স্থান হইল পরিচারিকা বা পাচিকা হিসাবে। মেয়েটি রেভারেণ্ড স্মিথের নিকট আমার ঠিকানা লইয়া কলিকাতায় আসিল। আমরা রেভারেণ্ড স্মিথের পরামর্শ অনুযায়ী তিন আইন মতে বিবাহ করিলাম এবং রেভারেণ্ড স্মিথকে ধরিয়াই বাংলাদেশ ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌতে আসিলাম। লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ। বাংলাদেশ—সমাজ সমস্ত কিছু হইতেই দূরে আসিলাম—তাহার মধ্যে কতটা ছিল ভয় এবং লজ্জা, কতটা ছিল একটি নীতিবোধ তাহা আজও বলিতে পারিব না। তবে ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ধর্মবিরোধী হইয়া উঠা স্বাভাবিক—তাহা হইয়াছিলাম। মিশনারীরা চাকরি দিয়াছিল—তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাহাদের প্রভাবও স্বাভাবিক। সুতরাং আমার এবং আমার পরিবারের ধর্ম সম্বন্ধে ধ্যানধারণা স্বার্থনিরপেক্ষ বিচারসম্ভূত নহে। ইহা আমার ও আমাদের জীবনে নানান ঘাত-প্রতিঘাত হইতে এমন চেহারা লইয়াছে। মনে মনে স্বীকার করিতেছি—আমার একটা ক্রোধ আছে আমার পিতামাতার সমাজ ও তাঁহাদের আচরিত ধর্মের উপর। এই ক্রোধবশতঃই যেদিন তুমি জজ সাহেবের বাড়িতে বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে আপত্তি করিয়াছিলে সেদিন আমি আগাইয়া গিয়াছিলাম। নতুবা এই যে সমাজ—এ সমাজের যে আলো সে আলো তো সূর্যের আলো নহে। এখানে জ্বালা আলো আমাদের দেশের সরিষার তেলের প্রদীপ নয়—কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প। আলোর দীপ্তি কিঞ্চিৎ বেশী কিন্তু কালির শিখা তো কম

নয়। চিমনিতে যেদিন কালি পড়ে সেদিন সেটা ধরা পড়ে। ইহাদের মদ্যপান—ইহাদের সমাজের অন্য আচারবিচার—অন্য কেলেংকারি সে তো কম নয়। ইহাদের তো আমিও ঘৃণা করিতাম। আজও করি। পুরোহিত সকল সমাজেই আদরণীয় সম্ভ্রমের পাত্র। যাহারা তোমাকে পুরোহিত হিসাবে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার পর্যায়ে ফেলিল তাহাদের কাছে তুমি বা আমির প্রভেদটা কি? বড় জোর আদর করিয়া বাড়ির গাড়ির ঘোড়ার মর্যাদা দিতে পারে। তাহাতে তফাতটা তো দানাপানির। দানাপানির কথায় মনে হইতেছে—সেদিন পৌরোহিত্য করিতে আগাইয়া আসার মধ্যে ওই লোভটাও ছিল।

তুমি গোঁড়া যতখানিই হও—তোমার নির্লোভ মানসিকতা তোমার ধর্মকে সত্য করিয়াছে। তুমি পৌরোহিত্যের দক্ষিণা করিয়াছ এক টাকা। আমি ক্ষেত্রবিশেষে একশো টাকাও পাইয়া থাকি। তুমি ইংরাজী বিদ্যায় জেদবশতঃ এম-এ পাস করিয়া তোমার নিজেকেই শুধু মর্যাদা দাও নাই, পৌরোহিত্য কর্মকেও দিয়াছ। ইহা প্রশস্তি পাঠ করিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নহে—সত্য বলিয়া মনে করি বলিয়াই তোমাকে লিখিলাম। তোমার নিন্দা করিবার অল্প কিছু আছে—তাহাও বলিয়া লইব, না লইলে সত্যের গৌরব থাকিবে না। তোমার আচারবিচার সম্পর্কে যে গোঁড়ামি তাহার কিছু-কিছুকে তুমি বাহুল্য এবং অর্থহীন জানিয়াও কর। এবং এ সম্পর্কে অন্যকে আঘাত দিবার প্রবৃত্তি তোমার আছে।

এখন থাক এ কথা। এখন যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। ঘরসংসার—মা ভাইদের পরিচয়—গ্রামের নাম—এ সব এই কারণেই কখনও প্রকাশ করি নাই। তাঁহারা আমাকে পতিত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমিও ছিলাম। কোন সংবাদ আদান-প্রদানই ছিল না। ভুবনদাদার বাড়িও বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমায়—তাঁহাকেও বলি নাই। ধরিয়া ফেলিলেন মনোরমার বিবাহের সময় গঙ্গাচরণবাবু। তিনি আমার খবর পাইয়াছিলেন আমার মায়ের নিকট হইতে। আমি সব খবর জানিতাম না; তিনিই আমাকে জানাইয়াছিলেন সেদিন বিবাহের রাত্রে। আমি জানিতাম না যে, গ্রামে যখন রটনা হয় যে আমি পাদরীদের চাকরি লইয়া কৃশ্চান হইবার সংকল্প করিয়াছি—তাহাদের সহিত উঠি বসি—তাহাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়াও করিয়া থাকি তখন গ্রাম্যসমাজ আমাদের সংসারকে পতিত করে। ভাইরা আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ ঘোষণা করিয়া পাতিত্য হইতে মুক্ত হয়। আমি জানিতাম—আমার মা—তিনিও তাঁহার অন্য ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ঘোষণা করিয়াছেন। এবং অপর ছেলেদের সংসারে মায়ের মতই আছেন। কিন্তু গঙ্গাচরণবাবুই আমাকে সংবাদ দিলেন যে, সমাজ যখন পতিত করিল তখন অপর সন্তানেরা আমার সহিত সম্পর্ক ছেদ ঘোষণা করিলেও তিনি করেন নাই। তিনি স্ত্রীলোকের মতই অথবা মায়ের মতই বলিয়াছিলেন—তাহা কি করিয়া বলিব। আর বলিলেই বা তাহা কি করিয়া সত্য হইবে? তাহাকে আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম—এ কি করিয়া মিথ্যা হইবে। কি করিয়া বলিব—তাহাকে পেটে ধরি নাই। আর সে যদি আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকে তবে কি করিয়া বলিব—আমি তোর মা নহি। সে কোনদিন গ্রামে আসিলে কি করিয়া বলিব—আমার ঘরে তোর স্থান নাই।

দাদা শিখাইয়াছিলেন—মুখে বলিলেই হইবে।

মা বলিয়াছিলেন—তাও যে মিথ্যা বলা হইবে। মিথ্যা কি করিয়া বলিব?

দাদা বলিয়াছিলেন—তবে পতিত হইয়া থাকিতে হইবে।

মা বলিয়াছিলেন—থাকিব। কি করিব?

তিনি পতিত হইয়াই ছিলেন। দুঃখেই দিন কাটিত। এই সময় শ্বশুরের মৃত্যুতে শীতলহাটীর সম্পত্তির মালিক হইয়া গঙ্গাচরণবাবু গ্রামে আসেন এবং এক কালী প্রতিষ্ঠা

করিয়া আমার এই মাকেই দেবীর সেবা পূজা দেখাশুনা করিবার ভার দিয়া যান। গ্রামের লোক পতিত বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু তিনি শোনেন নাই। বলিয়াছিলেন—তোমাদের মত পাষণ্ডদের মা হইতে যাঁহার অরুচি নাই তাঁহার সেবা করিবার জন্য এমন একটি মায়েরই প্রয়োজন। ইচ্ছা হয় তোমরা মা কালীকেও পতিত করিতে পার। আমার মায়ের কথা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। যতটা ভাল লাগিয়াছিল আমার মাকে ততটা মন্দ লাগিয়াছিল আমাকে। প্রথম যখন তিনি ভুবনবাবুর বাড়িতে আসেন সেদিন সেখানে আমিও ছিলাম—কিন্তু যখনই তিনি শীতলহাটীর কথা উল্লেখ করেন তখনই আমি কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলাম। ভুবনদাদার পরিবারকে তুমি জান। তাঁহারা ধর্মের গোঁড়ামি বর্জন করিয়াও ধার্মিক। তাঁহারা জাতিভেদ, অন্ততঃ খাওয়া-দাওয়া ছুঁত-পবিতের ব্যাপারে ওসব না-মানিয়াও ব্রাহ্মণ। এ কথা তুমিও অস্বীকার করিতে পারিবে না। মধ্যে মধ্যে আমিও তাঁহাদের বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম করিয়াছি। এই বিবাহে ভুবনদা আমাকেই পৌরোহিত্য করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু গঙ্গাচরণবাবুর ইতিহাস তাঁহার প্রকৃতি আমার জানা; তাঁহার চেয়ে দশ-বারো বৎসরের ছোট আমি, একসময় তিনি বৎসর দুয়েক আমাদের বাড়িতে থাকিয়াই পড়িয়াছিলেন—তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বৎসর। বিশ-বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গঙ্গাচরণবাবুর গল্প শুনিয়াছি। শ্বশুরের বাড়ি ছাড়িয়া মুদীর দোকানে খাতা লিখিয়া—পড়িয়া উকিল হওয়ার কথা শুনিয়াছিলাম। শ্বশুরের নামে মামলা করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে যখন চট্টগ্রামে লইয়া যান তখন সে সব দৃশ্য চোখে দেখিয়াছি। সুতরাং আমি ভয়ে বলিয়াছিলাম—না। ভুবনদা পরে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিবাহের রাত্রে আমি ভয়ে প্রথমটায় যাই নাই। পাছে শীতলহাটীর কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। ভুবনদা নিজে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে গঙ্গাচরণবাবু। তাঁহাকে কয়েকটা কথার পর প্রশ্ন করিয়াছিলাম—কতজন বরযাত্রী আসিয়াছে? চট্টগ্রামের কতজন? তাঁহার দেশের কতজন? দেশের কেহ আসে নাই শুনিয়াই ভুবনদার বাড়ি নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর ভুল করিলাম নিজে। আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিয়া বসিলাম—শীতলহাটীর নারান ভট্টাচার্য নামে একজনকে জানিতাম। তাঁহাদের বংশে এখন কে আছে?

ভুবনদা এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হারান, শরীর খারাপ তোমার, নিমন্ত্রণ খাইতে বলিব না—কিন্তু দই-মিষ্টি একটু খাইতে হইবে।

গঙ্গাচরণবাবুর চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ভুবনদা দেখেন নাই। কিন্তু আমি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম। গঙ্গাচরণবাবু আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বসুন। এবং ভুবনদাকে বলিলেন—আপনি একটু বাহিরে যান বেহাই মহাশয়, হারানবাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।

ভুবনদা কিছু ভাবিতে পারেন নাই, চলিয়া গিয়াছিলেন; গঙ্গাচরণবাবু দরজাটা বন্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন—নারান ভট্টাচার্য মহাশয় দু বৎসর আমাকে অন্নদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—পরান ভটচাজ—হারান ভটচাজ—ছোট সুরেন ভটচাজ—লোকে তাহাকে কাড়ান বলিয়া ডাকিত। তাহাদের মা আজও জীবিত। তুমি হারান ভটচাজ—সেই হারান ভটচাজ! লক্ষ্মৌ হইতে এলাহাবাদ আসিয়াছ। মাতৃত্যাগী—মহাপাষণ্ড—কৃশ্চানদের উচ্ছিষ্টভোজী। আমি তোমাকে চিনিয়াছি। নরকের কীট তুমি। তোমার মা তোমাকে ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া সমাজে পতিত হইয়া বাস করিয়াছেন—আর তুমি—ঘৃণিত জীব—তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিধবার প্রেমকে মাথায় করিয়া এখানে পণ্ডিত সাজিয়াছ, পৌরোহিত্যও কর শুনিয়াছি। ধিক্ তোমাকে! ধিক্!

চোখ দিয়া আমার জল পড়িতে শুরু করিয়াছিল।

যাক সে সব বিবরণ। ধরা পড়িলাম গঙ্গাচরণবাবুর কাছে। আমি হাত জোড় করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তবু মার্জনা করেন নাই। পরিশেষে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর চট্টগ্রামে তাঁহাকে পত্রযোগে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে আমি তাঁহাকে কিছু টাকা পাঠাইব যদি তিনি দয়া করিয়া আমার মাকে পাঠাইয়া দেন! কারণ আমি সরাসরি পাঠাইতে সাহস করি না। এক দুরন্ত ভয় সংকোচ আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমার পুত্র এলাহাবাদের সমাজ ইহাদের কাছে সত্য প্রকাশ হওয়ার কথা আমি ভাবিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী সৌভাগ্যক্রমে জীবিত ছিলেন না—থাকিলে আমার এই অবস্থা তাঁহাকেও পীড়িত করিত। জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিত। যাক, কিছুদিন পর উত্তর পাইয়াছিলাম—আপনার মা বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার সেবার সর্বময়ী কর্ত্রী,—মোটামুটি তিনি খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া আছেন। যথাসাধ্য সামান্য ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। তবে আমি তাঁহাকে ছলনা করিয়া এই অর্থ গ্রহণ করাইতে পারিব না। মাতৃত্যাগ করে জন্তুতে। স্তন্যপান ত্যাগ করিলে মাও খেদাইয়া দেয়—সন্তানও পলায়ন করে। মানবীর গর্ভে শুধু মানুষই জন্মায় না; দেবতা জন্মায় দৈত্য জন্মায় আবার কখনও কখনও জন্তুও জন্মায়। কথাগুলি আমার কিন্তু তাঁহার অনুমোদনক্রমেই লিখিতেছি। আপনার পত্র পাইয়া আমি তাঁহাকে এখানে আনাইয়াছিলাম। সব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–বলুন কি লিখিব। তিনি বলিলেন—টাকা আমি লইব না বাবা। ধর্ম আমাকে ক্ষমা করিবেন না। তবে একটু কড়া করিয়া লিখিয়া দাও বাবা। কারণ এতকাল পরে মায়ের ভাবনা কেন তার? আমি যে কথাগুলি লিখিলাম তাহা তাঁহাকে বলিতেই বলিলেন—ঠিক হইয়াছে বাবা। ওই কথাই ঠিক। তবে আর একটি কথা। বলিলাম—কি বলুন? তিনি বলিলেন—সে যেন আমার মৃত্যু হইলে এক গণ্ডূষ জল দেয়। তাহার অকল্যাণ হইবে এক কথা। দ্বিতীয় কথা—জন্তুই যখন গর্ভে ধরিয়াছি তখন জন্তুর জলপিণ্ড না পাইলে যে আমার জীবনের ক্ষুধা পিপাসা মিটিবে না। এবং বলিলেন—আমার মৃত্যু-সংবাদটা তোমার নিকট আসিবেই—ওটা তাহাকে জানাইবার ভার তোমার উপরেই রহিল। আপনি এ সংবাদ পাইবেন। আমি জীবিত থাকিলে আমি লিখিব—যদি জীবিত না থাকি তবে এখান হইতে যে কেহ সংবাদ দিবে—আপনি পাইবেন।

গতকাল পত্র আসিয়াছে—আজ আট দিন হইল মা জীবনের দুর্ভোগ শেষ করিয়াছেন। ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এখন আমার কর্তব্য তাঁহাকে জলদান ও পিণ্ডদান।

এ কথা বলিতে সাহস হয় নাই। পুত্রকেও বলিতে পারি নাই। কোন্ মুখে বলিব? পত্র পাইয়াই গঙ্গায় স্নান করিয়াছি। অশৌচ পালন করিতেছি, উপবাসের মধ্য দিয়া কাটাইতেছি। অজুহাত দেহ। এখন শ্রাদ্ধকর্মটা যদি তুমি করাইয়া দাও তবেই জীবনে আমার মায়ের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি। মন্ত্র জানি। কিন্তু পুরোহিত ভিন্ন সুফল হয় না। মন্ত্রোচ্চারণ সিদ্ধ হয় না। সবই তুমি জান। তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না। তুমি সত্যবাদী। ধার্মিক। অনুতপ্ত ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে ধর্মে প্রতিষ্ঠা করাও ধার্মিকের কর্তব্য। তবে দোহাই ভাই, এসব কথা প্রকাশ করিয়ো না। করিলে—মৃত্যু ছাড়া পথ থাকিবে না। আত্মহত্যা করিতে হইবে।

ইতি—অনুগ্রহপ্রার্থী
ভাগ্যহীন হারানচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পত্রখানি পড়িয়া সাধনা দেবী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

মুখুজ্জে বলিলেন—তুমি যেতে চেয়েছ। কিন্তু শীতলহাটীর মাটি যদি এই উত্তপ্ত সত্যের উত্তাপে তপ্তহাটী হয়ে ওঠে মা—তবে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভাল বলে পত্রখানি তোমাকে পড়ালাম।

সাধনা দেবী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—আমি যাব না কাকা। আমারও ভয় করছে।

মুখুজ্জে খুড়োকে ওই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি দিয়ে চলে এসেছিলেন সাধনা দেবী। কিন্তু তাতেও তো সমস্যার সমাধান হয় নি। কি করবেন এরপর আসল সমস্যা যে সেইটে। ওই সত্যটা প্রকাশ পেলে হয়তো লজ্জার কথা হবে, এখানকার বাঙালী রসনা ক্ষুরধারে শাণিত হয়ে সমালোচনায় প্রখর হয়ে উঠবে, তার জন্যে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে অনেক কিন্তু অন্ন— ; অন্ন না হলে যে উমাকে নিয়ে হয় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতে হবে, নয় তার হাত ধরে প্রথমটা অভিজাত ভিক্ষার্থীর মত এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাড়িতে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে·· একখানা হাতে লেখা আবেদনপত্র নিয়ে ; তারপর ক্রমে পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে।

উমাকে এসব কথা বলবার নয়, শুনবার মত তার বয়স হয় নি। মনের আলোড়নের প্রকাশ যথাসম্ভব মনে চেপে রেখে তাকে খাইয়েদাইয়ে শুইয়েছেন—সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাধনা দেবী একা জেগে বসে ভাবছেন। রাত্রি বেড়ে চলেছে। শহরের এ অঞ্চলটা নতুন কলোনী, এ অঞ্চলটা সন্ধ্যের পরই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। জেগে বসে থাকলে একটু দূরের পুরোনো বসতিঘন শহরের অংশটার কোলাহল শোনা যায়। সে কোলাহলও শোনা যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে শুধু যমুনা ব্রিজের উপর ট্রেন চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। যমুনা ব্রিজ এ অঞ্চলটা থেকে নিকট। বোধ হয় একটা মালগাড়ি যাচ্ছে, মন্থর গতিতে ধ্বনিত গুরুগুমু গুরুগুমু শব্দ আর শেষই হচ্ছে না। প্রকাণ্ড লম্বা একটা মালগাড়ি যাচ্ছে বোধ হয়। গাড়িটা ব্রিজ পার হয়ে গেল। শব্দটা অন্য রকম হয়েছে—ক্ষীণতর হচ্ছে ক্রমশঃ।

ওই শব্দটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন সাধনা দেবী কয়েক মিনিটের জন্য। চিন্তায় কুলকিনারাহারা মন শব্দটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। শব্দটা হারিয়ে যেতেই আবার সেই দিশাহারা অবস্থা ফিরে এল। উদ্বেগে জর্জর কুলকিনারাহারা একটা অসহনীয় অবস্থা।

হঠাৎ মনে হল—কেন ? কিসের এত উদ্বেগ ? উপায় তো রয়েছে। মিশনের ফাদার রিচমণ্ড তো উমার ভার নিতে চেয়েছেন। তাকে চাকরি দিতে চেয়েছেন। এ প্রস্তাব তিনি উপেক্ষা করেছেন তাঁর স্বামীর কথা ভেবে। তাঁর স্বামী তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাকরি ছেড়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আজ সেই মিশনারীদের সাহায্য নিলে স্বামীকে হেয় করা হবে বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নইলে তাঁদের অর্থাৎ তাঁর নিজের এবং উমার দিক থেকে তো কোন আপত্তির কারণ ছিল না। তাঁরা তো কোন শর্ত আরোপ করেন নি ! আর—আর তাঁর স্বামী নিশ্চয় তাঁর মা-বাপের এসব কথা জানতেন না। জানলে কখনই তিনি মিশনারীদের সঙ্গে এমনভাবে বিরোধ করতেন না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চরের কাজ হয়তো করে এই ধর্মপ্রচারকেরা কিন্তু তার সঙ্গে তো এই ধর্মটির কোন সত্য সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া মনোরমার গ্রামে চাকরির প্রস্তাব আসবার আগে তো তিনি রিচমণ্ড সাহেবের কাছে যাবার কথাই ভেবেছিলেন। সেই ভাল। হ্যাঁ, সেই ভাল।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। অনুশোচনায় আক্ষেপে দীর্ঘনিশ্বাসটা না ফেলে পারলেন না। মনে হল, গোড়াতেই যখন মিশনের কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই সহৃদয় প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তখনই তাঁর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত ছিল। খানিকটা অবশ্য নিয়েছেন, মিশন ইস্কুলে উমার ফ্রিশিপটুকু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। কেনই বা করবেন ? সেখানে যে

উমার দাবি ছিল—উমা যে ক্লাসে প্রথম তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি। মাসে মাসে ওদের যে ক্লাস-পরীক্ষা হয় তাতে উমা ছ মাসের মধ্যে দুবার ফার্স্ট হয়েছে—তিনবার সেকেণ্ড হয়েছে—একবার থার্ড। সুতরাং ফ্রিশিপ ঠিক করুণার দান নয়। যে কোন ইস্কুলেই সে এ সুবিধা পেত।

জীবনে এই ছ মাসে তাঁর নিষ্ঠুর আঘাত এসেছে। রমার মৃত্যু; তার সঙ্গে সংসারের লজ্জা—তাঁদের পিতৃ-মাতৃত্বর অপরাধ রমার মৃত্যুতে কাঁদবারও অবকাশ দেয় নি। স্বামী সেই বেদনায় লজ্জায় কোথায় হারিয়ে গেলেন। তাঁর খোঁজ হল না, খবর হল না—একান্ত-ভাবে অবহেলিত অবজ্ঞাত ঘৃণিত জনের মত তিনি নিজেকে নির্বাসিত করলেন। হয়তো বা গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের লজ্জা জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি নিলেন কুরুক্ষেত্রে পরাজিত দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপনের মত। তাঁকে থাকতে হল সহ্য করতে, লোকসমাজের অবজ্ঞা-ঘৃণার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে। উমার মুখ চেয়ে থাকতে হল। প্রকাশ্যে কোন-দিন কাঁদতে পান নি, পারেন নি। রাত্রে উমা ঘুমিয়ে গেলে—মধ্যে মধ্যে কেঁদেছেন। মনে মনে চেয়েছেন—তিনি যেন বেঁচে না থাকেন! বেঁচে আছেন কল্পনা করতে শিউরে ওঠেন সাধনা দেবী। তিনি যে কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আছে এক জেদী—নিষ্ঠুর জেদী মানুষ—যে মানুষ সব পারে—সব পারে। সংসারের সব-পারার চরম-পারা হল নিজেকে নাশ করা। তাই করেই যেন বেঁচে থেকে আর সবছোট-কিছুর সব-পারার দুঃখ থেকে তিনি যেন নিষ্কৃতি পান।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি আঁচল দিয়ে মুছে ফেলছিলেন। এরই মধ্যে ক্লান্তিবশে অবসাদ দেহকোষগুলির কেন্দ্র থেকে শীতের দিনের জলাভূমি থেকে ওঠা কুয়াশার মত উঠে মস্তিষ্ক-কোষগুলিকেও আচ্ছন্ন করে তাঁকে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুম পাড়িয়ে দিলে। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে, রোদ্দুর উঠেছে। শীতের সকাল, বোধ করি আটটা বেজে গেছে। উমা উঠে গেছে। বাইরে দাঈ জমাদারনীর সঙ্গে কলহ বাধিয়েছে। ক'দিন থেকে সে পাইখানার দিকের গলিটা—যেটা ভুনিদের আর তাঁদের বাড়ির মধ্যে—সেটা কিছুতেই সাফ করছে না।

দাঈ বকছে—হাঁ—হাঁ—বম্ব আছে—পিস্তোল আছে—কামান ভি আছে। তু যাবি ঝাড়ু লিয়ে আর তুকে সিপাহীসান্ত্রী ধরে লিয়ে দনাদন্ গোলাগুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। তু হামার আংরেজ জাঁদরেলের মেমসাব তো; তোর লেগে সব বসে বসে ক্ষণ গুনছে।

জমাদারনী বলছে—না—না—হামি জাঁদরেলের বহু হতে গেলাম কেন? তুই বুড়ীয়া নিজেই জাঁদরেল—হিটলারের ফুফু। দরকার হয় তুই সাফা কর গিয়ে, হামি কভি সাফা করব না। কভি না। নোকরি ছেড়ে দেব হামি।

কথাটা পুরনো কথা। কাল বলেছিল উমা।

পাশের বস্তির কয়েকটা ছেলে ওদের দু'জনের কলহ শুনছে আর হি-হি করে হাসছে। উমা বোধ হয় রান্নাঘরে ঢুকেছে, মা ঘুমুচ্ছে দেখে জাগায় নি, ময়দা মাখছে বা তরকারি কুটে নিচ্ছে। মায়ের ইস্কুল নেই, কিন্তু তার আছে; আজ কয়েকদিন সে ইস্কুলে যায় নি—আজ যাবার কথা।

সাধনা দেবী বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন—দাঈ!

—কি বহুমা?

—শোন একবার, জমাদারনীকেও ডাক এখানে।

দু'জনেই দু'জনকে হাত মুখ নেড়ে তিরস্কার করতে করতে এসে সামনে দাঁড়াল। দাঈ বলছিল—দেখ, এই মাগীর করণ দেখ। বলে বোমা পিস্তল আছে, কখন ধাঁইসানি ফট যাবে তো জান চলে যাবে—

জমাদারনী একেবারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললে—হাঁ বলেছি, জরুর বলেছি। যা লোকে বলছে, কানে শুনছি তাই বলছি। আরে বাবা তলব তো মহিনে মে চার রুপেয়া। কিন্তু মেথর হলেও জানের দাম হামাদের চার রুপেয়া তো নয়।

দুই হাত নেড়ে দাঈ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা দিয়ে সাধনা দেবী বললেন—চুপ কর দাঈ। ওর যদি এমনই ভয় হয় তবে ওকে গলি সাফা করতে হবে না। সে আমি নিজে কিংবা উমা করে নেব। ঝগড়া করো না।

—হ্যাঁ, তাই করে নিয়ো। তোমাদের রাখা জিনিস তোমরা বুঝবে চিনবে—হুঁশিয়ারির সঙ্গে নাড়াচাড়া করবে—ভাল হবে।

সাধনা দেবীর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হল না কিন্তু দাঈ ছাড়বার পাত্রী নয়, সে বললে—তবু তো তোকে তলব কম নিতে হবে।

জমাদারনী মুড়ো খ্যাংরাটা নেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কাহে?

সাধনা দেবী বিরক্তভরে বললেন—থাম দাঈ। আর ঝামেলা বাড়িয়ো না তুমি।

তারপর প্রশ্ন করলেন—উমা কোথায় দাঈ? তার সাড়া পাচ্ছিনে কেন? সে গেল কোথায়?

—সে গেছে ভুনিবাবুদের বাড়ি।

—ও। আচ্ছা, আমাকে তুমি জল দাও, আমি গলিটা সাফ করে স্নান করে নেব। যা তুই বাড়ি যা—তোকে গলি সাফ করতে হবে না।

জমাদারনী এবার অসহায়ের মত বললে—চিরকাল তোমাদের বাড়ি কাম করছি—বল, তুমি বল বহুমায়ী, কখনও না বলেছি কোন কামে? কিন্তু কি করব বল! সিপাহীরা বলছে—হুঁশিয়ারির সঙ্গে কাম করিস, না তো কোই রোজ বম্বকে পর তোর ঝাড়ু গিরবে—উলটু যাবে—আর দমু আওয়াজ দিয়ে ফাটবে। বাস্—তুই ধুলো হয়ে যাবি! সুভাষ বোসের ভেজা হুয়া জাপাইনী বম্ব—দেখতে ছোট—কিন্তু, বাপু রে—সাক্ষাৎ যম। ওই দেখ না তোমার বাড়ির খানিকটা দূরে এক আদমী বৈঠা হুয়া—আবার বস্তির মধ্যে এক আদমী। হরদম নজর রাখছে!

মর্মান্তিক বেদনার মধ্যেও একটি কৌতুক বোধ না করে তিনি পারলেন না। কলকাতায় আগের আমলে সত্যিই নাকি ঘটেছিল এমনি কৌতুককর ঘটনা;—"একজন দন্তহীন বৃদ্ধ তাঁর বউমাকে ডেকেছিলেন—বো-মা! বো-মা! পাশের বাড়ির অধিবাসী একজন সরকারী কর্মচারী শুনেছিলেন—বোমা! বোমা! সঙ্গে সঙ্গে তিনি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে খবর দিয়েছিলেন পুলিসকে। দেখতে দেখতে বাড়ি ঘেরাও—খানাতল্লাশী—গ্রেফতার। তারপর প্রশ্ন—কেন বোমা বোমা বলে চেঁচাচ্ছিলে? বৃদ্ধ বলেছিলেন—বোমা কোথায়? বো-মা—এই এঁকে ডেকেছিলাম। আমার বো-মাকে।" এটাও ঠিক তাই। কিন্তু এ কৌতুকে হাসতে গিয়েও তিনি হাসতে পারলেন না। বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। ওঃ—এ কি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে তিনি পড়েছেন!

হে ভগবান!

* * * *

উমা কয়েকদিনই ইস্কুল যায় নি—আজ ইস্কুল যাবে তাই গিয়েছিল নলিনী জেঠীমার কাছে। এ ক'দিনে অনেকটা পড়া হয়ে গেছে। পাতাগুলি উলটে কয়েকটা জায়গা কঠিন মনে হওয়ায় বুঝে নিতে গিয়েছিল—মা ওঠেন নি বলে। সকালে উঠে মায়ের শোয়ার ভঙ্গী দেখেই সে বুঝেছিল মা কাল রাত্রে ঘুমোনো দূরের কথা ভালো করে শোবারও অবকাশ পান নি বা ইচ্ছে করেই শুতে চান নি। মাথার বালিশটা তাঁর বালিশের পাশে নিটোল হয়ে

পড়ে আছে। একপাশে বেঁকে শুয়ে আছেন লেপটা তেরচাভাবে টেনে নিয়েছেন। দুঃখের একটা শিক্ষা আছে—সে মানুষকে একটি দৃষ্টিভঙ্গী দেয় যার ফলে দুঃখ বেদনার তুচ্ছ চিহ্নটুকুও তাদের চোখে আগে পড়ে।

নলিনী দেবীর বাড়ির ধারাধরন স্বতন্ত্র—সেখানে পড়াশোনা কাজকর্ম একসঙ্গে চলে। জেঠীমা সকালে উঠে স্নান পুজো সেরে কাজ করতে করতেই তাকে পড়াচ্ছিলেন। যে জায়গাটা বোঝাবার সে জায়গাটা পড়ে নিয়ে এ ঘর ও ঘর বা এ কাজ ও কাজ সারতে সারতেই বলে যাচ্ছিলেন—উমা বসে শুনছিল। কখনও বা উমাকেও একটা বরাত করছিলেন। সুতরাং দেরি হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে উমা দেখলে মা স্নানের ঘর থেকে স্নান সেরে বেরুচ্ছেন। সে একটু লজ্জিত হল—এখনও কোন উদ্যোগ হয় নি। সে বললে—কাল তুমি ঘুমোও নি দেখলাম। একপাশে এমন বেঁকেচুরে শুয়েছিলে। তাই তোমাকে সকালে ডাকি নি। ইস্কুল যাব তাই পড়াটা একটু বুঝে নিতে গিয়েছিলাম জেঠীমার কাছে। আমি এক্ষুনি ময়দা মেখে ফেলছি।

সাধনা দেবী বললেন - না। খাওয়াদাওয়ার উয্যুগ থাক। বেলা হয়ে গেছে—বোধ হয় ন'টা বাজে। শীতের দিন। তুই চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে চান করে ফেল। কালকের রুটি আছে—খেয়ে নে। তোকে ইস্কুল পেঁছে দিয়ে আমি একবার বেরুব। দরকার আছে।

উমা বললে—মনোরমা পিসীমা জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাদের গোছগাছের কি হল। এই সপ্তাহেই উনি যাবেন। আমাদের সঙ্গেই যেতে বলছিলেন।

—হুঁ। সেজন্যে তো পুলিসের হুকুম লাগবে। না বলে তো যাবার উপায় নেই। কথাটা তো আগে মনেই হয় নি।

—পুলিসের হুকুম ছাড়া আমরা কোথাও যেতে পাব না? বিস্মিত হয়ে গেল উমা।

—হ্যাঁ। সেই শর্তেই ছেড়ে দিয়েছে।

উমা স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের ভেতরটায় আতংকের এক অসহনীয় উদ্বেগে ভরে উঠল।

সাধনা দেবী চা তৈরি করতে করতে বললেন—যা তুই চান করে তৈরী হয়ে নে। তোকে পেঁছে দিয়ে আমি এস-পির কাছে যাব।

স্নান সেরে ইস্কুলের কাপড়জামা প'রে মায়ের পাশে বসল উমা। তার চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। হঠাৎ সে চুপিচুপি বললে—মা!

চা ছাঁকতে ছাঁকতে সাধনা বললেন—কি?

—রাত্রে উঠে চুপিচুপি পালিয়ে চল না মা এখান থেকে!

সাধনার কাজ করা হাত থেমে গেল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—ইংরেজের রাজত্ব গোটা ভারতবর্ষে। পালিয়ে যাব কোথায়?

—কেন মা? এই তো দুনিদা ভুনিদা পুলিসের চোখের ওপর লুকিয়ে থাকে। নেতাজীর দলের কত লোক লুকিয়ে কাজ করছে পুলিস তাদের তো ধরতে পারে না। কত জায়গায় কত ভাঙা বাড়ি - কেউ যায় না ভুতুড়ে বাড়ি বলে।

মা বললেন—খাব কি?

চুপ করে গেল উমা।

মা বললেন—তুই এত ভয় করছিস কেন! ভয় পেয়ে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে মরা ভাল। পুলিসের কাছে যাই—অনুমতি চাই—দেখি কি বলে!

* * * *

একলাই সরাসরি সাধনা দেবী এস-পির কাছে গেলেন, দরখাস্ত একখানা লিখেই নিয়ে গিছলেন। দরখাস্ত করেছিলেন লক্ষ্ণৌ যাবার অনুমতির জন্য। বাংলাদেশে চাকরি

পেয়েছেন, সেখানে যেতে চান—এ দরখাস্ত তিনি করেন নি। ফাদার রিচমণ্ডের কাছে যাবেন। চাকরি চাইবেন—উমার জীবনের ভার নিতে অনুরোধ করবেন। অতীত কালের শ্বশুর ও শাশুড়ীর জীবনের ইতিহাস জেনে এইটুকু তিনি বুঝেছেন যে, এই সমাজ তাঁকে ক্ষমা করবে না। যদি সাধারণ জীবন হত তবে হয়তো স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁদের পাশে সরিয়ে দিত। কিন্তু তিনি যে এখানকার বিদগ্ধসমাজে পৌরোহিত্য করেছেন। বিচিত্রচরিত্র মুখুজ্জে খুড়ো যেটা ক্ষমা করেছেন সেটা বিলেতফেরত বিদগ্ধজনেরা জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরা ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আশ্রয় চাই।

ধর্মান্তরের কথা উঁকি মেরেছে। তাতে অন্ন আশ্রয় মিলবে এবং এই রাজরোষ থেকেও হয়তো নিষ্কৃতি পাবেন।

দরখাস্ত নিয়ে এস পির টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন—এইটুকু অনুগ্রহ না করলে আমাকে যে অনাহারে মরতে হবে। আমার পাঠশালা উঠে গেল—আর তো আমার জীবিকার্জনের কোন উপায় নেই।

পুলিস বিভাগ বিস্ময়করভাবে তৎপর বিভাগ, দৃষ্টি তাদের যার উপর পড়ে তার সকল খবর তাদের নখদর্পণে থাকে। এস-পি ডাকলেন আই বি অফিসারকে। তিনি বললেন—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। ওঁর পাঠশালা উঠে যাচ্ছে, যাচ্ছে কেন আজ থেকেই বন্ধ। হয়তো অন্য শিক্ষক রেখে চলবে কিন্তু উনি থাকলে চলবে না। উনি সেই জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন ওখানকার সংস্রব।

এস-পি বললেন—এই জন্যেই উনি লক্ষ্ণৌ যেতে চাচ্ছেন রেভারেণ্ড রিচমণ্ডের কাছে। সেখানে চাকরির চেষ্টা করবেন। পারমিশন চাচ্ছেন সেখানে যাবার।

একটু চুপ করে থেকে অফিসার বললেন—ওঁর তো বাংলাদেশে যাবার কথা শুনেছিলাম। ওই অজয় মুখার্জীর মা নিয়ে যাচ্ছেন ওঁদের গ্রামে গার্লস স্কুলে চাকরি দিয়ে।

সাধনা অবাক্ হয়ে গেলেন। এ খবরও জানে এরা!

এস-পি বললেন—গেলে আমাদের অনুমতি নেবেন। না নিয়ে যাবেন ধরে নিচ্ছ কেন? ওঁকে একটা পারমিশন দিয়ে দাও। ইচ্ছে হলে সঙ্গে লোক দিতে পার। ওঁর পক্ষে এটা তো মস্ত একটা সমস্যার কথা।

—ডি-আই-জি আই-বিকে না লিখে—

এস-পি এবার তাঁর মুখের দিকে চাইলেন, বললেন—আমি লক্ষ্ণৌতে তাঁকে টেলিফোন করে বলব। তুমি সঙ্গে লোক দিতে চাও দাও। পারমিশন ওঁকে দিতে হবে। আমি বুঝতে পারছি উনি ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন। অন্য সময় হলে আমিই ফাইলটা ক্লোজ করে দিতাম। কিন্তু—। থাক, যা বললাম তাই কর।

* * *

মুখুজ্জে খুড়োর ছাত্র—ধার্মিক মানুষ—সেই জন্যই পারমিশন মিলল, কিন্তু পৃথিবী যে এমন কঠোর এবং জটিল এ কথা এমনভাবে জানলেন সাধনা দেবী এই প্রথম। মনে হল এলাহাবাদের যে বাঙালী সমাজকে তিনি হৃদয়হীন বিদ্বেষপরায়ণ ভেবেছিলেন তা এই বাইরের পৃথিবীর তুলনায় আরামের শয্যাতল। আর এ পৃথিবী নিষ্ঠুর, মাটি শক্ত কঠিন —উপরে সূর্য উগ্র—উত্তপ্ত।

লক্ষ্ণৌতে ফাদার রিচমণ্ড তাঁর প্রার্থনা শুনে ভাবলেশহীন মুখে চুপ করে বসে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সাধনা দেবী বললেন—ফাদার!

হঠাৎ মাটির দিকে তাকালেন রেভারেণ্ড রিচমণ্ড। যেন তাঁর জুতোর তলায় একটা কিছুকে অকস্মাৎ অনুভব করেছেন। এরই মধ্যে উত্তর দিলেন—Yes madam!

সাধনা ফাদার রিচমণ্ডের এই মুখের ছবি—এই গলার স্বর—এই অতিমাত্রায় ধীরতা ঠিক প্রত্যাশা করেন নি। যখন এলাহাবাদে গিয়ে ফাদার রিচমন্ড ও'দের সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন তখনকার সে মানুষটাই যেন আলাদা। প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখ—কণ্ঠস্বরে সে কত মমতা! বার বার উমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—সংসারে ডুঃখকে জয় করিটে ডর করিটে নাই। ঈশ্বর আছেন উপরে—পৃথিবীটে টাঁহার ভৃট্যরা আছে। টাহারা ডুঃখীকে সাহায্য করে। ডর কিসের?

আজ সে কথার একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হল না। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। গম্ভীর তিনি।

সাধনা এসব অনুভব করেও বললেন—ফাদার!

রিচমণ্ড আবারও সেই উত্তর দিলেন—Yes madam!

—কি বলছেন আমাকে? আজ আপনারা রক্ষা না করলে যে পথ দেখতে পাচ্ছি নে। উমার বাপ আপনাদের কাজ করেছেন—

—হ্যাঁ। করিটেন—কিণ্টু শেষ ডিকে টিনি আমাডের সাম্রাজ্যবাডীর চর বলিটেন। আমাডের বিরুড্যে বিড্রোহ করিয়াছেন। টাহা আমরা টুচ্ছ করিয়াছিলাম। বুঝিটে পারি নাই ইংরাজ রাজ্যটা উলটাইবার জন্য টিনি সুভাষ বোসের ডলে ভিড়িয়াছেন।

—না—ফাদার—না। আমি শপথ করে বলতে পারি।

—আপনিও স্বামীর কাজ চালাইটেছেন। যাহারা এ কাজ করে টাহারা ঈশ্বরের নাম লইয়াও মিঠ্যা বলে। আমরা জানি। আপনাডিগকে শিক্ষিট সভ্য আমরা করিয়াছি, আপনাডের জাটের চরিট্রের ইটিহাস আমরা জানি।

রুঢ়স্বরে সাধনা বলে উঠলেন—ফাদার!

ফাদার বললেন—আপনি মিঠ্যা গোসা করিটেছেন! আমি যাহা সট্য টাহাই বলিয়াছি।

সাধনা আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, বললেন—আমার স্বামীই আপনাদের স্বরূপটা সত্য দেখেছিলেন। আমরাও তখন ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ভেবেছিলাম। কিন্তু না। তিনিই সত্য, ভুল আমাদের! মাফ করবেন আমাকে—অকারণ আপনাকে বিরক্ত করলাম। নিজেও অপমানিত হলাম। এ অপমান আমার প্রাপ্য। নমস্কার!

জবাবে ফাদার রিচমণ্ড তাঁর গমনপথের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে শুধু তাকিয়েই রইলেন—একটি শব্দও উচ্চারিত হল না তাঁর মুখ থেকে।

সাধনা চলে যাবার পর মৃদুস্বরে বললেন—Ungrateful creatures!

* * *

সংসারে মানুষের মধ্যে যে সনাতন মানুষ আছে, তার প্রকাশ সকল জনের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই এক; শুধু পরিপুষ্টি এবং পারিপার্শ্বিকের তারতম্যে ভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে। যে আগুনে কাঠকুটো আছে বাতাসে সে আগুন জ্বলে—যেখানে জ্বালাবার সামগ্রী নেই সেখানে একটু ঝিকমিক করে ওঠে—আবার যেখানে ছাই চাপা সেখানে ছাই উড়িয়েই পালা শেষ হয়। আঘাতের ফলে মানুষ আহত হয়—তার বেদনায় সে কোথাও রাগে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কোথাও কাঁদে, কোথাও সভয়ে নির্বাক্ হয়ে মাথা হেঁট করে পালায় বা আঘাতকারীরই পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে;—তাকেই বলে, রক্ষা করো।

সাধনা দেবীর জীবনটায় খানিকটা ইন্ধন অবশিষ্ট ছিল—পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে অল্প কিছু অবশিষ্ট ইন্ধনের মত। এটুকু তাঁর শিক্ষার ইন্ধন। গোটা বাঙালী জাতেরই যা অবস্থা তাই। গত দেড়শো বছর ধরে সে নিজের জীবনকে জ্বালিয়েছে। শাল হিমালয়ের ধারে আছে, সেগুন মেহগনি নেই, সমতল ভূমিতে আছে যে অরণ্য তাতে আছে সুঁদরী কাঠ

আর আছে বট-অশ্বত্থের গাছ। এই জীবন ইন্ধনে আগুন যখন লাগল তখন পড়ল তাতে শিক্ষার ঘৃতে আহুতি। এদেশের মধ্যবিত্তেরা ধন অর্জন করে নি, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয় নি, অর্জন করেছিল শিক্ষা,—বিদেশী শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে এদেশের পুরোনো শিক্ষাকে আবিষ্কার করেছিল—পুরাতন কালের সংরক্ষিত ঘৃত ও মধুর এক বিশাল ভাণ্ডারকে। তারই আহুতির প্রসাদে আগুন হোমাগ্নি হয়ে উঠেছিল—এবং তার জীবন-বৃক্ষকে জ্বালিয়ে অঙ্গারে পরিণত করতে পারে নি। হৃতসর্বস্ব বাঙালী মধ্যবিত্ত নিদারুণ দুর্দিনেও মর্যাদাবোধে ধোঁয়াচ্ছিল। খোঁচা সে যেখানে খায় সেখানেই জ্বলে ওঠে, নিতান্ত অঙ্গারের মত কালো নিরুত্তপ্ত অস্তিত্ব প্রকট করে ছড়িয়ে পড়ে না। এই ভটচাজ পরিবারে তেমনি একটি ঘৃতভাণ্ড ছিল যার ঘৃতাবশেষের সঙ্গে ভেজাল মিশেও ঘিয়ের অস্তিত্ব একেবারে নিঃশেষ হয় নি, যার ফলে সাধনা ফাদার রিচমণ্ডের কাছে হাত জোড় করে মার্জনা চেয়ে বললেন না—ফাদার, আপনি বিশ্বাস করুন আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না; শুধু মানুষের স্বভাববশে একটি ছেলেকে অনেক দুর্দান্ত মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে ছুটে গিয়েছিলাম। আপনি ভেবে দেখুন আপনি কি করতেন? আপনি ঈশ্বরের সেবক। আপনার সামনে যদি এমনি ঘটনা ঘটত তবে আপনি কি প্রশ্ন করতেন—তুমি কোন্ দলের লোক? আপনারা অনেকে কুষ্ঠ-রোগীর সেবা করেন—বলুন, এ ছেলেটি কি কুষ্ঠরোগীর চেয়েও ঘৃণিত অস্পৃশ্য?

মাথা উঁচু করেই চলে এলেন। যা হয় হবে! এই কোটি কোটি মানুষের সংসারে তাঁদের মা ও মেয়ের মত দুঃখী তো অনেক আছে। দুঃখকষ্ট তাদের যতই থাক, তাদের যত অংশই জীবনের মর্যাদা টুকরো টুকরো করে খাইয়ে আসুক—মর্যাদাকে অটুট রেখে লড়াই করে বেঁচে থাকার মত মানুষ কম হলেও একেবারে না-থাকা নয়! তেমনি করে বাঁচবেন তিনি। রেভারেণ্ড রিচমণ্ড যদি এমন রূঢ়ভাবে গোটা জাতকে গাল না দিয়ে সুকৌশলে মিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন তবে সাধনা এ মনের জোর পেতেন না। হয়তো ভেঙে পড়তেন। কাঁদতেন। এতে তিনি যেন জোর পাচ্ছেন। তাঁর মনে পড়ল—ছেলেবেলা কানপুরে তাঁর বাপের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা বাঙালী মেস ছিল, সেই মেসে রান্নার কাজ করত এক মহারাজিন্ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কন্যা—বিধবা। কানপুরে অনেক কল অনেক কারখানা, সেখানে অনেক কাজ, উপার্জন অনেক,—ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে সকল জাতের পুরুষেরা সেখানে কাজ করে, ঘরের কাজের লোকের অভাব, পুরুষ চাকর রাঁধুনীর মাইনে অনেক—তাই মেয়েরা সেখানে এ সব কাজ করে; সকালে আসে, কাজকর্ম করে দিয়ে চলে যায়, আবার বিকেলে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ সেরে বাড়ি যায় ওই মহারাজিনের মত। বাংলাদেশেও সে শুনেছে—অনাথারা আগের কালে সচ্ছল গৃহস্থের বাড়িতে এইভাবে কাজকর্ম করেছে। আজও করে। তাই—তাই করে অন্নসংস্থান করবে সে, মেয়েকেও পড়াবে। ভয় কিসের?

এলাহাবাদে এসে বাড়ি পৌঁছে তিনি উমাকে ডাকলেন।

রাত্রি তখন বারোটা।

উমা বাড়িতে ছিল না, সে নলিনী জেঠীমার বাড়ি গিয়ে শুয়েছে। সাধনা দেবীর আজ ফিরবার কথাও ছিল না। দাঈ ছিল বাড়িতে, সে উঠে দরজা খুলে দিল। এবং বিস্মিত হয়ে বললে—বহুমাঈ! এতনা রাতমে—

—হ্যাঁ। বলেই সঙ্গের পুলিস কর্মচারীটিকে বললেন—নমস্তে সাব। আমার জন্যে বহুত তকলিফ হল। মাফি মাঙছি আমি।

—না—না—না। এ তো হামার কাম! আচ্ছা নমস্তে। সে চলে গেল।

সাধনা দেবী এসে বিছানার উপর বসলেন স্তব্ধ হয়ে। আকাশ ভেঙে পড়েছে মাথায়।

দাঈ জিজ্ঞাসা করলে—উমা লেড়কীকে ডাকি?

—না।

একটু চুপ করে থেকে দাঈ আবার বললে—খেয়েছ-দেয়েছ কিছু ?

—না।

—তবে ? কিছু খেতে তো হবে !

—না। তুই শুয়ে পড়।

খেতে হবে। বাঁচতে হবে। উমাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আজকে আর খাওয়া থাক।

সত্যের থেকেও সমাজের লজ্জা সামাজিক প্রতিষ্ঠা বড় ?

বড় বই কি ! নইলে রমা এমন করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে পুড়ে মরল কেন ? তাঁর স্বামী শ্মশান থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে পালিয়ে গিয়ে মরে বাঁচলেন কেন ? তিনি মরেছেন। বেঁচে তিনি নেই। লোকের দু'চারটে কথা তাঁর কানে এসেছে —তারা বলেছে—এটা শিবেনের নিছক দুর্বলতা। বলের অভাব হলেই দুর্বল হয় ; শুধু কি সাধারণ মানুষেই হয় ? এ দুর্বলতা পুরাকাল থেকে বড় ছোট সবার আছে। নল আর দময়ন্তী। বনে পালিয়ে গেলেন। রাজ্য হারিয়ে লোকের কাছে লজ্জা হল। অথচ নলের তো কোন অপরাধ ছিল না ! তারপর বন থেকে কলির চক্রান্তে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হল—নল পালালেন দময়ন্তীকে ফেলে ; পালালেন—ছদ্মবেশে। ছদ্মনাম নিয়ে ছদ্মবেশে গিয়ে অন্য রাজার কাছে সারথির চাকরি নিলেন। সত্য কথা বলতে পারলেন না। একে কি মিথ্যা মর্যাদাবোধ বলা যায় !

সত্যকাম জাবাল সংসারে একজন। না, আর একজন আছেন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

কি করে তিনি বলবেন—আমার শ্বশুর এই অপরাধ করে গেছেন—তিনি গোপন করেছিলেন —আমি প্রকাশ করছি। বড়জোর তার সঙ্গে তিনি বলতে পারেন—তিনি গোপন করেছিলেন কেন বলতে পারি না কারণ অন্যায় তো তিনি কিছু করেন নি। অন্যে যে যা ভাবুক আমি তা ভাবি না। অন্যায় তাঁর যদি কিছু হয়ে থাকে তা এই সত্যকে গোপন করে যাওয়ার অন্যায়।

না, তিনি তা পারবেন না। এ প্রকাশ হলে লোকের রসনা যে প্রখরভাবে মুখর হয়ে উঠবে তা তিনি জানেন।

একটা কথা যেন কোথা থেকে তাঁর মনে এসে ব্যঙ্গ গুঞ্জনে গুঞ্জন করে যাচ্ছে ;—কথাটা এই ;—"তাই—তাই এই পরিবারটির এই মতিগতি ; এই পরিণাম ! রমার এই প্রবৃত্তি তার বংশের রক্তের মধ্যে ছিল। শিবেনের এই ধর্মদ্রোহিতা সমাজদ্রোহিতা—সেও তাই।"

উমা ঘুমুচ্ছিল—সাধনা জেগেই শুয়ে ছিলেন। আর মনের মধ্যে এই চিন্তা পাক দিয়ে যেন শ্বাসরোধ-করা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছিল—নীচে থেকে উপরে—উপর থেকে নীচে।

মনে হল—সমাজের বাইরে বোধ হয় মাটি নেই—বসতি নেই। ইংরেজের রাজ্যে অপরাধ করলে, অন্ততঃ তাদের বিরুদ্ধে অপমান করলে দেশে যেমন ঠাঁই হয় না, ঠাঁই হয় সমুদ্রঘেরা আন্দামানের মধ্যে—এও যেন তাই—সমাজের বাইরে ওই আন্দামানের মত দুটো আন্দামান। একটা মুসলমান সমাজের আন্দামান—একটা কৃশ্চান সমাজের আন্দামান। কৃশ্চান সমাজের আন্দামানে ফটক বন্ধ। ফাদার রিচমণ্ড বলে দিয়েছেন—রাজদ্রোহীকে তিনি আশ্রয় দিতে পারবেন না।

কৃশ্চান সমাজ—অন্ততঃ ইংরেজের ধর্মযাজকেরা যার কর্তা সে সমাজ আন্দামানেও তাঁর পদার্পণ নিষিদ্ধ। মুসলমান সমাজে আশ্রয় নেওয়ার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। না। কৃশ্চানদের সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গের একটা প'রচয় ছিল—দেওয়া-নেওয়া ছিল—এবং —। এবং ইংরেজ আর ইওরোপকে খুব ভালবাসি—ওদের কোট প্যাণ্ট টাই, ওদের ভাষার প্রতি মোহ

আছে—প্রচণ্ড মোহ। আর ভয় থেকেও একটা মোহ আছে। ওরা বিদ্যুতের বাতি এনেছে, রেলগাড়ি এনেছে, ওরা এরোপ্লেনে ওড়ে, ওরা বোমা মেরে দেশ ছারখার করে দেয়। ওদের রং সাদা! কথাগুলো তাঁর স্বামী বলতেন। শেষের দিকে বলতেন—যখন পাদরীদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল তখন। বলতেন,—আমি বুঝেছি—তবুও আমি মোহ ছাড়তে পারি না। না—পারি না। সব বুঝেও পারি না। মাতালের মত। সভ্যতাটাই মদ। নেশা আছে। হুইস্কীর মত কড়া তেজী।

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসেছিলেন সাধনা দেবী। কি চিন্তা থেকে কোথায় কোন্ অতীত স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছেন তিনি! মাথার ভিতরটা যেন দপদপ করছে। কিন্তু এসব কি ভাবছেন তিনি?

মুসলমান কেন হতে যাবেন তিনি? কৃশ্চান হবার কথা মনের কোণে উঠেছিল সেটাই তাঁর অপরাধ হয়ে গেছে। ওসব কল্পনা কেন?

মাথাটা ধুয়ে এসে চুপ করে বসেছিলেন।

বাঁচতে হবে। উমাকে বাঁচাতে হবে। এবং মর্যাদার হানি না করেই বাঁচতে হবে।

নার্সিং শিখলে হয় না? মেয়েদের জন্যে এই কয়টা পথই খোলা—শিক্ষয়িত্রীবৃত্তি—নার্সিং - ঝিবৃত্তি—রাঁধুনীবৃত্তি। আরও কয়েকটা কাজ আছে—জামা সেলাই, কাগজের ঠোঙা তৈরি।

আরও আছে—

অন্তর তাঁর চিৎকার করে উঠল—না—।

নিজেকে বিক্রি করা, সেটা বোধ করি আদিম বর্বর যুগের পথ। সে পথটা আজও বন্ধ হয় নি।

না—না। তার থেকে উমাকে খুন করে তিনি নিজে খুনী হবেন।

হয়তো তাই পরিণাম। বিধিলিপি। কিন্তু বিধিলিপিতে সাধনা বিশ্বাস করেন না। কার্যকারণে পরিণামে একটা নির্ধারিত পরিণামে পোঁছুনোতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তার আগেও তিনি যুদ্ধ করবেন। প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন।

ভিক্ষে তিনি করবেন না। মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন তিনি করবেন না। নিজেকে বিক্রি তিনি করবেন না। না। ভাবতে ভাবতে বসেই সেই অবস্থায় শেষরাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ঘুম ভাঙল দাঈয়ের ডাকে।

দাঈ ডাকলে—ওই বাড়ির মনুয়া দিদি ডাকছেন।

—কোথায়?

—ওই ভুনি ববুয়াদের বাড়িমে। আর কোথা!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহভাবে সাধনা বললেন—বলে দে, যাব পরে; শরীরটা খারাপ আছে—একটু বেলা হলে যাব।

বলে আবার তিনি মাথাটা নুইয়ে দিলেন। মিথ্যে কথা বলা হয় নি, শরীরটা খারাপই লাগছে, গায়ে ব্যথা, মাথার ভিতরটা সারারাত্রি অনিদ্রায় এবং দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে রয়েছে—ঝিমঝিম করছে—মন হয়ে রয়েছে কেমন সব-হারানো নিঃস্ব অসহায়; বুকের ভিতরটায় উদ্বেগের একটা চাপ; সারা বিশ্বসংসারে এখন তাঁকে চকিত বা প্রাণচঞ্চল করে দেবার মত কোন রঙের দীপ্তি কোন আহ্বানের স্বর কোন স্পর্শের মমতা কোথাও কোন দিকে এতটুকু আভাসেও বোধ করি নেই।

সব যেন শূন্য।

পর পর ঝড় এসে তাঁর জীবনের সব আশ্রয়—মাথার উপরের সব চালগুলি উড়িয়ে ভেঙে

দিয়েছিল ; নিরাশ্রয় হয়ে ভাবছিলেন কোথায় যাবেন ! হঠাৎ মনোরমা ডেকে বললে—এস এখানে। শীতলহাটীতে একখানা চালাঘর দেখালে। কিন্তু মুখুজ্জেখুড়োর হাত দিয়ে এল শ্বশুরের চিঠিখানা। চিঠি নয়—ওটাও একটা ঝড়। ঝড়টা ঘূর্ণির মত চালাঘরখানাকে নেহাতই একখানা পাতার মত পাক দিয়ে ঘুরিয়ে তুলে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। তবে হ্যাঁ—রক্ষা পেয়ে গেছেন আরও অনেক দুঃখ দুর্গতি ও লজ্জা থেকে। ঝড়টা ওই চিঠির আন্দোলনে উঠে আগেভাগে না এলে, পরে আসতই। ওই চালার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতেন, উনোন পেতে রান্না চড়াতেন—হয়তো বা রান্না শেষ করে পাতা পেড়ে উমাকে নিয়ে খেতে বসতেন—ঠিক সেই সময়ে উঠত ঝড়টা, চাল উড়ত খাবারসুদ্ধ পাতা উড়ত—তাঁদের সর্বাঙ্গে উড়ে লাগত উনোনের ছাই আর কালি। ওঃ, সে দুর্গতি সে লজ্জা থেকে বেঁচেছেন। এতেও স্বস্তি আছে সান্ত্বনা আছে।

ভালভাবে হাত পা মেলে ছড়িয়ে তিনি শুলেন। পারলে আর একটু ঘুমোবেন।

উমা এসে ডাকলে—উঠবে না মা ? আবার শুলে ? দাঁড়ি বললে, শরীর খারাপ। কি হয়েছে মা ?

—রাত্রে একটুও ঘুম হয় নি উমা। গায়ে হাতে কোমরে পিঠে ব্যথা হয়েছে। মাথাটা ভারী হয়ে আছে। একটু ছাড়িয়ে নিই হাত-পাগুলো। ইচ্ছে হচ্ছে ঘুমুই।

—জ্বরটর হয় নি তো ? সে মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলে।

কপালটা সরিয়ে নিলেন না সাধনা দেবী। মেয়ের হাতের এই স্পর্শটুকু ভাল লাগল তাঁর। যেন কোন প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, দিগন্ত পর্যন্ত কোন ছায়া বা আশ্রয়ের হাতছানি নেই, সব ধুধু করছে, মাথার উপরের প্রখরতম সূর্যের উত্তাপে সব জ্বলছে—তাঁকে জ্বালিয়ে শেষ করবার জন্যই যেন এত সব আয়োজন ! এরই মধ্যে যেন হঠাৎ কোথা থেকে কপালে পড়েছে একফোঁটা জল। কোন পাখির চোখের জল। ভারী ভাল লাগল। মনে হল পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশের বুক পর্যন্ত অন্ততঃ একটি ছোট্ট প্রাণীও আছে মমতায় তাঁর জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলবার জন্য।

মেয়ে হাত দিয়ে কপালের উত্তাপ দেখেই হাত সরিয়ে নেয় নি, হাতখানা রেখেই দাঁড়িয়ে ছিল—বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করছিল উত্তাপ যেটুকু সেটুকু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী কি না ; মা নিজের হাত দিয়ে তার হাতখানা চেপে ধরে বললেন—আঃ, ভারী ঠাণ্ডা রে তোর হাত ! বলে একটু হাসলেন, এবং বললেন—না—তা বলে জ্বর নয় ! ভাবিস নে।

মেয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। সে তাঁর ভিতরটাকে বুঝতে পারছে ; মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া আগুনের উত্তাপের মত হাত দিয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবছে যে মাটি চিরদিন ঠাণ্ডা সে মাটি এমনভাবে উত্তপ্ত মনে হচ্ছে কেন ?

মা বললেন—তুই ভাবিস নে। যা চা করে খেগে যা। রুটি তো আছে। একবার তাওয়ার উপর দিয়ে একটু ঘি মাখিয়ে নিস। একটু আচার নিয়ে নিস। আমাকেও একটু চা দিস। আমি বরং মুখটা ধুয়ে নিই। চা খেয়ে আবার একবার শোব। আজ ছুটি।

ঠিক এই মুহূর্তে নলিনী দিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—সাধনা !

উমা বেরিয়ে গেল। অপ্রসন্ন মুখেই সাধনা উঠে বসলেন এবং কাপড়চোপড় সামলে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। আসুন—এইখানেই আসুন—সে বেরুবে না। পরক্ষণেই মনে হল, না—ঘরের বিছানাপত্র এমন ছড়িয়ে পড়ে আছে এত বেলা পর্যন্ত।—নাঃ—। বলেই বাইরে এলেন।

নলিনী উমাকে প্রশ্ন করছিলেন—কি হয়েছে—। এমন সময় সাধনাকে দেখে বললেন—এই যে, কি হয়েছে রে ? শরীর খারাপ ?

—অসুখবিসুখ নয়—তবে ওই গা-গতরে ব্যথা। মাথা ভার। ভাল ঘুম হয় নি।

—কাল তুই গিয়েছিলি কোথায়? আমি তো ভেবেই পাই নে কি ব্যাপার! দাঙ্গি বললে—বহুমাঙ্গি কুছ বললে না। স্রিফ বললে—পুলিস সাহেবকে পাশ যাচ্ছি। কি করব—শেষে মুখুজ্জে খুড়োকে ধ'রে সাহেবের কাছে খবর নিলাম। ভয় তো নানারকম হচ্ছিল, পুলিস আফিস থেকে নিখোঁজ—তবে কি পুলিসের হেপাজতে অজ্ঞাতবাস! যা কাল আর আইনের নামে যা বেআইনী—বিশ্বাস তো নেই! পুলিস সাহেব খবর দিলেন—লক্ষ্ণৌ গেছিস—সঙ্গে ও‌ঁদের লোক গেছে। তাঁরা যদি নির্বাসনে পাঠিয়ে না থাকেন তবে যাবার কি দরকার হল ভেবেই পাই নে। কি ব্যাপার বল তো?

একটু চুপ করে রইলেন সাধনা; তারপর বললেন—ফাদার রিচমণ্ডের কাছে একবার গিছলাম দিদি। একটু জরুরী কাজ ছিল।

নলিনী বললেন—পুলিসের কাছে জামিন হবার জন্যে বলতে গিছলি?

—না।

—তবে?

খানিকটা আবার চুপ করে রইলেন সাধনা—কি বলবেন? সত্য বলতে চান না; অনেক কথা এসে পড়বে। যা প্রকাশ করবার উপায় নেই। মিথ্যে বলতে জিভে আটকাচ্ছে। কি বলবেন?

নলিনী তাঁর নীরবতার অন্তরালে দ্বিধা এবং তাঁর কপালে ফুটে ওঠা ক'টি রেখার মধ্যে তাঁর লিপিরেখা লক্ষ্য করে বললেন—থাক। ঠাকুরপোর কথা বোধ হয়। বলতে হবে না। কিন্তু এদিকে কাণ্ড হয়েছে—মনো তো আজই রাত্রে দেশে ফিরছে। সকালবেলা টেলিগ্রাম এসেছে বর্ধমান থেকে। ওর ছোটনায়েব টেলিগ্রাম করেছে—পুলিস শীতলহাটীর বাড়ি সার্চ করে একাকার করেছে। ইস্কুল মাস্টার—অজয়ের বন্ধু ক্লাসফ্রেণ্ডদের ডেকে স্টেটমেণ্ট নিয়েছে—সে মস্ত বড় টেলিগ্রাম। শেষে লিখেছে গ্রে স্ট্রীটের বাড়িও খানাতল্লাশ হয়েছে এইমাত্র খবর এসেছে। মনো বলছে তা হ'লে কি চাটগাঁর বাড়িও হয় নি? নিশ্চয় হয়েছে। তবে সব এখন মিলিটারীর দখলে—ভাড়া আছে। শুধু একটা আউটহাউসে ওদের সেরেস্তা আছে। ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সেখানকার জন্যে। তা তুই তো যেতে পারবি নে হুকুম না হলে। তাই তোকে বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে।

একটু হেসে সাধনা বললেন—ব্যস্ত হয়ে কি করবেন মনো ঠাকুরঝি? বারণ করবেন ব্যস্ত হতে। পুলিস হয়তো আদৌ পারমিশন দেবে না। যাওয়াই হয়তো কোনকালে ঘটবে না আমার।

—পারমিশন হবে। মুখুজ্জেখুড়ো রয়েছে। এস. পি. লোকটি ভাল। তা ছাড়া—কোন দোষ তোর নেই। সে পুলিসের জানতে বুঝতে বাকী নেই। নইলে—সাধনা দেবী যতই দুঃখী অসহায়া হোন তাঁকে ছেড়ে তারা দিত না। দয়া ক্ষমা ও দুটি শব্দ ওদের ডিক্‌সনারিতে নেই।…সে তুই ভাবিস নে। নইলে কাল তোকে অনুমতি চাইবামাত্র লক্ষ্ণৌ যাবার অনুমতি দিত ভাবছিস? কাল মুখুজ্জেখুড়োর সঙ্গে সে কথাও এস. পি.-র হয়েছে। বলেছেন, ও‌ঁর কোন দোষ নেই সংস্রব নেই সে রিপোর্ট চলে গেছে; সব বাধানিষেধ তুলে নেবার কথা আই. জি.র কাছে লিখেওছেন।…শুধু অর্ডার আসার অপেক্ষা। এক সপ্তাহ কমপক্ষে—বেশীর পক্ষে এক মাস; বলে দিয়েছেন তিনি। তার বেশী লাগবে না।…এখন মনো ব্যস্ত হয়েছে—তোর দরখাস্ত লিখিয়ে নেবে তোর কাছ থেকে আর যাবার ভাড়া—দরকার হলে এক মাসের অগ্রিম মাইনে দিয়ে যাবে। তোকে বুঝিয়ে ভালো করে বলে যাবে।…সেই এক কথা, বউদি আমার অজয়কে সেদিন বুক দিয়ে ঢেকে রক্ষা করেছেন; না-হলে গুণ্ডারা সেদিন তাকে

হয়তো খুন করেই ফেলত। আর সেই জন্যেই বউদির এই অসহায় কুলকিনারাহীন অবস্থা। তুমি ওঁকে ডাক বউদি, শরীর যদি খারাপ বেশী হয়ে থাকে তবে গোছগাছ করে নিয়ে নিজেই যাব আমি।

এতগুলি কথা একলাই বলে গেলেন নলিনী দেবী সাধনার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার জন্য। নইলে মধ্যে মধ্যে তিনি কয়েকবারই থেমেছেন সাধনা কিছু বলবেন ভেবে। অথবা বক্তব্যটা তাঁর ওখানে এসে থামবার মত বলে। কিন্তু সাধনা কিছু বলেননি বলেই তিনি তার সুতো টেনে টেনে বলেই গেছেন। এবার যেন এরপর টানবার মত সুতোর এতটুকুও বেরিয়ে নেই।

তবুও সাধনা কিছু বললেন না।

নলিনী দেবী বললেন—ওবেলা কি এবেলা যখন হোক এসে ওর সঙ্গে দেখা করিস। কেমন? ওকে আর এবাড়ি ওবাড়ি না করানো ভাল। আমার বাড়ি না হয়ে নিজের বাড়ি হলে হয়তো মাথার চুল ছিঁড়ত রাগে। বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়ে ওর ওই স্বভাবটা খারাপ হয়ে গেছে। যখন হোক আসিস।

এবার সাধনা যেন জোর করে বলে ফেললেন—আমি ওখানে যাব না দিদি, আপনি মনোরমা ঠাকুরঝিকে বুঝিয়ে বলবেন। ওখানে—। মানে—সে হবে না। সম্ভবপর নয়। আর—। আর অজয়কে রক্ষা করেছি আমি—এটাও ঠিক নয়। আমি ছুটে গিয়েছিলাম প্রাণের ব্যাকুলতায়।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন নলিনী দেবী। হঠাৎ আবার এ মত পরিবর্তনের হেতু কি? নিজে সাধনা বলেছে· আমি মাথায় নিলাম আপনার এ অনুগ্রহ। খেটে খাবার সুযোগ দেন বিধাতা; এ তাই। নিশ্চয় যাব আমি। তারপর আবার কি হল? এ কি বলছে সাধনা! কি হল?

সাধনা নীরব হতেই নলিনী বললেন—কেন হঠাৎ তোর এ মত পালটাল সাধনা? যেতে পারবি নে, যাওয়া সম্ভবপর নয়—এসব কথার মানে কি? যেন একটু দাবির ভঙ্গীতেই কৈফিয়ত চাইলেন তিনি।

সাধনা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—যাওয়াও আমার সম্ভবপর নয় দিদি এবং সে কথা বলাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; আপনাকে বলাও সম্ভবপর নয়।

—আমাকেও বলতে পারবি নে? আমি সে-কথা মনোকে বলতাম না, বা বলব না।

—না। আপনাকেও বলতে আমি পারব না।

একটু আহত হলেন নলিনী দেবী। জীবনে সকল আঘাতকে হাসিমুখে গ্রহণের তাঁর যে আশ্চর্য শক্তি তিনি অর্জন করেছেন—যার জন্য তিনি সংসারে অপরাজিতার মত সহজ ছন্দে ও গৌরবে অপ্রতিহত গতিতে চলেন—তা সত্ত্বেও তিনি আহত হলেন। পরক্ষণেই হেসে বললেন—বেশ, তাই বলব।

—ওঁকে আপনি বুঝিয়ে বলবেন, উনি যেন নিজে এসে অনুরোধ করে আমাকে আর বিব্রত না করেন।

—সে আমি শুনবো না বউদি।

চমকে উঠলেন সাধনা দেবী। নলিনী দেবীও থমকে দাঁড়িয়েছেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মনোরমা। বাড়িতে ঢুকে সে বললে—আমি কথাবার্তার খানিকটা শুনেছি। কিছু মনে করো না, তবে কথাটা যখন আমার প্রসঙ্গেই তখন অন্যায় হয় নি। আমার কথা তোমাকে বলি বউদি। তোমার কথা আমি শুনব না। তোমাকে যেতেই হবে।

—আমি হাত জোড় করছি—আমাকে মাপ করুন আপনি।

—আমি না খেয়ে আপনার দরজায় হত্যে দেব বউদি! আমার অজয়ের জন্যে আপনাদের

এই কষ্ট এই বিপদ, এতে আপনাদের য'টি দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে ত'টি অকল্যাণ হবে অজয়ের—স্বর্গে আমার শ্বশুরকে ততটি হাহাকার করতে হবে! আমার শ্বশুর আপনার শ্বশুরের কাছে অপরাধী। তিনি ক্ষমা চেয়ে যেতে পারেন নি।

চুপ করে রইলেন সাধনা।

মনোরমা বললে—আপনি বোধ হয় সেই জন্যে যেতে চাচ্ছেন না। না?

চোখ দুটিতে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল সাধনার। নিষ্পলক চোখে সেই দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন। ভয় হল—এইবার—এইবার বোধ হয় মনোরমা বলবে- আপনার শ্বশুর যা করেছেন সে আমি—

সত্যই মনোরমা বললে—আপনার শ্বশুর কি করেছিলেন তা আমি জানি না। তবে আমার শ্বশুর নিশ্চয় অপরাধ করেছিলেন—নইলে তিনি মৃত্যুকালে ছেলেকে ও কথা বলে যেতেন না। সে মানুষই তিনি ছিলেন না। যেতে আপনাকে হবে। নইলে আমাকে আপনাদের খরচ চালাতে দিন। সব ভার আমার।

—না।

—তবে আপনি যাবেন বলুন।

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন সাধনা দেবী। বললেন—যাব।

—যাবেন—?

—যাব।

—যাবেন?

—যাব।

—বলুন উমার দিব্যি—যাব।

—ওরে মনো—কি বলছিস? বলে উঠলেন নলিনী। একটু চমকে উঠলেন সাধনা।

অপ্রতিভের মত মনোরমা বললে—ভুল হয়ে গেছে আমার। বলুন আমার দিব্যি যাবেন?

হেসে সাধনা বললেন—বলছি—উমার দিব্যি করেই বলছি—যাব।

* * * *

মনোরমা সেই দিনই সন্ধ্যার পর রওনা হয়ে গেল শীতলহাটী। বর্ধমানে নামল পরের দিন বিকেলবেলা। লোক কেউ ছিল না। থাকবার কথা নয়। আসবার কথা টেলিগ্রাম করে জানানো হয় নি। টেলিগ্রাম করলেও পেঁছুতো না। যুদ্ধের কাল। যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়ে সাধারণের দিকে তাকাবার অবসর হয় না। হাজারে হাজারে লাখ দরুণে লোক মরে গেল ঝড়ে বন্যায় দুর্ভিক্ষে মহামারীতে; কে দেখলে? দেখবার প্রয়োজন কি ইংরেজের? তাদের প্রয়োজন নিজেদের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষার; লাখে লাখে সৈন্য এসেছে নানান দেশ থেকে। তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে আয়োজন করতেই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে উদ্যম ফুরিয়ে যাচ্ছে; টাকার অভাব হচ্ছে না, কোটি কোটি টাকার নোট ছাপা হচ্ছে। এই তো তিরিশ মাইল আগে মনোরমা পার হয়ে এল পানাগড় মিলিটারী বেস। কয়েক হাজার বিঘা সোনাফলানো জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করে বিরাট ছাউনি পড়েছে। মাঠের মধ্যে এরোড্রোম তৈরী হয়েছে; মাঠের উপর পিচঢালা রাস্তা—মাকড়সার জালের মত। তার উপর চলছে অতিকায় গাড়িগুলো। পানাগড় স্টেশনে মেল থেকে সব গাড়ি থামছে; স্টেশনে বলির পশুর মত সেপাইগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে; চোখে নারীলোলুপ দৃষ্টি—পদক্ষেপে ঔদ্ধত্য - কথায় হাসিতে বর্বর অসভ্য উল্লাস। বিয়ের পর সে সেকেন্ড ক্লাসেও চড়ে নি, গঙ্গাচরণবাবুর হুকুম ছিল—ফার্স্ট ক্লাস—নয়তো থার্ড ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাস অসভ্য ইংরেজদের জন্যে; ইন্টার ক্লাসে অসভ্য বাবুরা থাকে বেশী, তার সঙ্গে ফিরিঙ্গীও দেখতে পাবে। ফার্স্ট ক্লাসে ইংরেজ বাঙালী ভারতীয়

যারা থাকে তাদের কাছে ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পার ; থার্ড ক্লাসে সাধারণ মানুষ যায়, তাদের মধ্যে অসতের চেয়ে সতের সংখ্যাই বেশী। সেখানে আরাম নেই কিন্তু নিরাপত্তা আছে। তুমি নিরাপদে থাকবে। সঙ্গতি যতদিন আছে—দেহের জন্য প্রয়োজনীয় আরামটুকু কেনার সামর্থ্য যতদিন আছে—কেনা উচিত আমার মতে—কিনো। নইলে ইণ্টার ক্লাসে যাও। পয়সা কিছু বাঁচবে—আরামও কিছু মিলবে থার্ড ক্লাসের চেয়ে কিন্তু ইজ্জৎ তোমার যে কোন মুহূর্তে যেতে পারে। মনোরমার স্বামী বিজয়ও এই কথা মেনে চলত। মনোরমাও ছেলেকে নিয়ে প্রথম প্রথম ফাস্ট ক্লাসেই ঘুরেছে। কিন্তু যুদ্ধ লাগার পর থেকে সে ফাস্ট ক্লাসে চড়ে নি। ছেলে ইণ্টার ক্লাসে যায় আসে কিন্তু সে থার্ড ক্লাসে যায়। কিন্তু এই বর্বরদের কুৎসিত দৃষ্টি থেকে কোথাও নিস্তার নেই। তার থার্ড ক্লাস কামরাটার সামনে কয়েকটা সাদাচামড়া বলির পশু শুধু লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই ক্ষান্ত হয় নি,—হে—হে বলে তার দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিল, কিন্তু সে দৃষ্টি ফেরায় নি ; তবুও নিষ্কৃতি পায় নি—তারা কলার খোসা ছুঁড়ে মেরেছে। উচ্ছিষ্ট কলার খোসা। চোখে মনোরমার আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু কি করবে? নিরুপায়ে সহ্য করতে হয়েছে। মনে মনে অজয়কে বলেছে—ওরে অজয়, তোর বন্দীদশার জন্যে সব দুঃখ আমি এই মুহূর্তে মুছে ফেললাম। তুই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মনে মনে জীবনের অধিনায়ক হিসেবে বরণ করেছিস এতেই আমার এ দুঃখ এ লজ্জা সহ্য হবে।

শেষটায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

নায়েব মাথা হেঁট করে বসেছিল—তারও দুঃখ এবং ক্ষোভের সীমা ছিল না ; কিন্তু সে প্রৌঢ় তার উপর গ্রামের মানুষ, ইংরেজের রঙ—ইংরেজের উদ্ধত ভঙ্গী—তার রূঢ় ভাষা—তার বন্দুক পিস্তল—পুলিস তাকে নিদারুণ ভয়ে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে শতাব্দী ধরে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালীর ছেলের সাহসে তার নির্ভয় মৃত্যুবরণে চমৎকৃত হয়েছে—সাময়িকভাবে উত্তেজনা অনুভব করেছে—কিন্তু তার ক্ষণ নিতান্তভাবে স্বল্পক্ষণ। অনাবৃষ্টির বর্ষায় দূর দিগন্তে কচিৎ বিদ্যুচ্চমকের আভাসের মত। তারপর আবার যে অন্ধকারকে সেই অন্ধকার। সেই ছিলকের মত ক্ষীণ জলহীন মেঘের আস্তরণে ঢাকা আকাশ এবং তার নীচে গুমোটে ভরা শস্যহীন পৃথিবী। বাতাসের মধ্যে ওই হতাশ মানুষের বুক থেকে ঝরা দীর্ঘনিঃশ্বাস। সে আর কি করবে। কিন্তু এই যুদ্ধের কালে এদের এই অনাচার অত্যাচারে সে আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারছে না। বেচারা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল মনোরমার চোখে জল দেখে। বলেছিল এও দেখতে হল—সইতে হল?

মনোরমা বলেছিল—কাঁদবেন না। সীতা যে সীতা—তারও চুলের মুঠো ধরে টেনে তার অপমান করেছিল রাক্ষসে। এরা রাক্ষস, এরা ধ্বংস হবে।

একটু থেমে থেকে আবার বলেছিল—জানেন—প্রথমটা অজয়ের উপর আমার রাগ হয়েছিল। আর আমার রাগ নেই ; আমি তাকে মনে মনে আশীর্বাদ করছি।

ট্রেনটা বর্ধমানে আসতেই নেমে মনোরমা বলেছিল—চলুন আমাদের উকিলের বাসায় যাব। ছোটনায়েব টেলিগ্রাম করেছিল বর্ধমান থেকে, সে নিশ্চয় উকিলবাবুর কাছে এসেছিল। তিনি খবর নিশ্চয় জানবেন। খবরও সব জানা হবে ; আর স্নান করতে হবে আমাকে, শরীরটা সেই তখন থেকে কেমন রি-রি করছে।

উকিলবাবুটি এ বাড়ির পুরানো উকিল, এঁর বাবা ছিলেন গঙ্গাচরণবাবুর উকিল, তিনি গঙ্গাচরণবাবুর শ্বশুরকে নোটিশ দিয়েছিলেন ; তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে উকিল হয়েছেন ; এঁদের এস্টেটের একসময়ে প্রায় সর্বময় কর্তা ছিলেন। এখনও আছেন—ইস্কুল কমিটিতে,

এস্টেটের ট্রাস্টি বোর্ডে, অনেক কিছুতে বা সব কিছুতে। আয়ও এতে মন্দ নয়। উকিলবাবু বিকেলবেলা কোর্ট থেকে ফিরে বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর কাছে সব খবরই পেলেন। পুলিস শীতলহাটী সার্চ করেছে– সেখানে অবশ্য দাপাদাপি বেশী করে নি। তাঁর ঘর আর অজয়ের ঘরটাই সার্চ করেছে। অজয়ের কয়েকখানা কবিতা লেখা খাতা নিয়ে গেছে। তাঁর ঘর থেকে নিয়ে গেছে কয়েকখানা ডায়রী। গঙ্গাচরণবাবুর ডায়রী এবং বিজয়বাবুর ডায়রী। চট্টগ্রামের কেসের অনেক কথা আছে। তার মধ্যে দেখবেন—এ বাড়ির সঙ্গে চট্টগ্রামের বিপ্লব চেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলার ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের যোগাযোগ কতটুকু। গ্রে স্ট্রীটের বাড়িও সার্চ করেছে। সেখানে কিছু নেয় নি, তবে উপদ্রব সেখানে করেছে বেশী। সেখানকার চাকরটাকে নিয়ে গিয়ে বড় বেশী কষ্ট দিয়েছে। লোকটি চট্টগ্রামের লোক এই তার বেশী অপরাধ। পরে সংবাদ এসেছে চট্টগ্রামে আউটহাউসে তাদের যে ছোট আপিসটা ছিল সেখানে আর কিছু রাখে নি। কাগজপত্র যা কিছু ছিল সব নাকি তছনছ করে প্রায় ছড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পুলিস এতটা করে নি, করেছে মূল বাড়িতে যে ইংরেজ মিলিটারী অফিসাররা ছিল তাদেরই কয়েকজন। পুলিসদের সার্চ করতে দেখে প্রশ্ন করেছিল—হেলো মিস্তার, হোয়াট্স্ দি ম্যাটা– ? এঁ ? হোয়াট রং ? থেফ্ট ? অর ব্লাক মার্কেটিং ?

অফিসার বলেছিল নো। ইট্স্ পলিটিক্যাল।

—পলিটিক্যাল ? গ্যান্ডি ?

—নো। বোস !

—হোয়াট্ ? বোস্ ? সুভাস্ বোস্ –

—ইয়েস।

—হোয়ের ইজ দ্যাট বাগার দ্যাট সোয়াইন - সন অব এ বিচ্ ? হোয়ের ইজ হি ?

—হি ইজ নট হিয়ার। অলরেডি ইন পুলিস্ কাস্টডি ইন এলাহাবাড ! উই আর সার্চিং হিজ হাউস হিয়ার।

বাস্, তার কিছুক্ষণ পরই জনকয়েক মদ্যপ্রমত্ত ইংরেজবীর এসে কাগজপত্র যা ছিল টান মেরে বাইরে ফেলে ছিঁড়ে ছড়িয়ে তার উপর মিলিটারী বুটপরা পায়ে ফুটবল খেলতে শুরু করেছিল– খাতা কাগজ বই নিয়ে।

সমস্তই আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে মনোরমা নীরবে শুনে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—এর বিরুদ্ধে কেস করা শুধুই অর্থব্যয় নয় ?

—হ্যাঁ। নিরর্থক। উচিত নয়।

—উচিত নয় কেন বলছেন ? সার্চ করা মানে জিনিসপত্র নষ্ট করে ক্ষতি করা নয়।

—না– তা নিশ্চয় নয়। তবে অজয় যদি সত্যিই এ সবের মধ্যে—মানে এই স্যাবোটেজ যারা করছে তাদের মধ্যে থাকে তবে তো সেটা ওরা অন্যায় বলতে পারে !

—হ্যাঁ, ওদের দিক থেকে অন্যায় বলতে ওরা অবশ্যই পারে।

—শুধু ওদের দিক কেন বলছেন ? জাপানীদের নিয়ে আসা,—এ অন্যায় এ কথা সকলেই বলবে, এদেশের লোকও বলবে। কংগ্রেসও বলেছে। আমি বলি—এক কাজ করুন—অজয়কে দিয়ে একটা বণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করে এসব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলুন। বলেন তো আমি— ।

মনোরমা তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, উকিলটি উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন। এবার বাধা দিয়ে মনোরমা বললে—আপনি পারবেন ?

—বলেন তো নিশ্চয় চেষ্টা করব। এবং—এবং পারব। হ্যাঁ, তা পারব।

মনোরমা বললে– বেশ আমি ভেবে দেখি !

—ভাববার এতে কিছুই নেই।

—আমি আপনাকে ক'দিনের মধ্যেই জানাব। নায়েববাবু, আপনি ট্যাক্সি একখানা এখুনি নিয়ে আসুন। নইলে দেরি হয়ে যাবে। রাস্তা তো খুব ভাল নয়, রাত্রিতে কষ্ট হবে।

—আপনি স্নানটা সেরে নিন মা! একটু কিছু—

—না, শরীরটা যেন শিরশির করছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসতে পারে। আপনি ট্যাক্সি আনুন।

নায়েব চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনোরমা বললে—তার থেকে এক কাজ করুন না। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিন। রাস্তা দিয়ে তো যাচ্ছেই। তাতেই চলে যাই ট্যাক্সির আড্ডায়।

উকিলটি বললেন—আজ তো থেকে গেলেই পারতেন। আগে তো দু'চারবার থেকেছেন।

—হ্যাঁ থেকেছি। এবারও থাকতাম। কিন্তু শরীরটা—। না—জ্বরটর এসে গেলে আপনি—বিপদে পড়ছি মুখে হয়তো বলবেন না, কিন্তু পড়বেন; আর আমি পড়ব বেশী।

উকিলবাবুর স্ত্রী এলেন চায়ের কাপ এবং মিষ্টির প্লেট নিয়ে।—খান! হাসলেন তিনি। আপ্যায়নের হাসি। মনোরমার থেকে বয়স কম—বোধ হয় আটাশ-তিরিশ।

প্লেট চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে মনোরমা বললে—শুধু একগ্লাস ঠাণ্ডা জল। শরীরটা বড্ড খারাপ করছে। কেমন যেন একটা বমি-বমি ভাব।

—না—না। একটু কিছু খান। একটা মিষ্টি।

—তাতে আমার শরীর আরও খারাপ হবে।

ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে জল এনে নামিয়ে দিলেন। মনোরমা জলের গ্লাসটিতে চুমুক দিয়ে খানিকটা খেয়ে নামিয়ে দিলে। ভদ্রমহিলা বললেন—আপনি ওখানে মেয়েদের ইস্কুল বড় করবেন শুনলাম। খুব ভাল। তা—এলাহাবাদ থেকে একজন কাকে আনছেন শুনলাম! কেন? এই দেশে কত মেয়ে রয়েছে।

চমকে উঠল মনোরমা। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। প্রশ্ন করলে—এ খবর আপনারা পেলেন কোত্থেকে? হ্যাঁ, আমার আত্মীয়া একজন। আমার বউদি হন সম্পর্কে। আর অজয়কে তিনি রক্ষা করেছেন—নইলে তাকে মেরে ফেলত অন্য একদল ছাত্র।

—হ্যাঁ। তাঁকেও তো পুলিস অ্যারেস্ট করেছিল। তিনিও তো ওই দলের।

—করেছিল অ্যারেস্ট কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে।

—দিয়েছে। কিন্তু এসব যিনি শেখাবেন তিনি তো ইস্কুলের দেশের সর্বনাশ করবেন।

উকিলবাবুটি বললেন—থাক এখন ওসব কথা। আমি অজয়ের বণ্ড দেওয়ার কথা বলেছি। সে হলে তো ওসব প্রশ্নই উঠবে না।

চুপ করে রইল মনোরমা। এবং ভাগ্যক্রমে বাইরে থেকে নায়েবের গলা শোনা গেল—রোখো, এই কোচোয়ান রোখো।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল—যাক্‌ গাড়ি পাওয়া গেছে। তারপরই হেসে বললে—বাড়ি পৌঁছে অসুখ হলে তো আলাদা কথা, না হলেও তিন দিন অন্ততঃ বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। আচ্ছা—নমস্কার, আসি।

গাড়িতে উঠে বললে—আগে মহেন্দ্রবাবু উকিলের কাছে চলুন।

—তাঁর কাছে?

—কাজ আছে। খুব জরুরী কাজ।

মহেন্দ্রবাবু উকিল এখানকার সব থেকে বড় উকিল দু'তিনজনের একজন। তিনি

শীতলহাটীর এস্টেটের শক্ত কাজগুলি করেন ; মানী লোক ; এককালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতেন—এখনও মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক। তবে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে নেই। তার কারণ প্রথম বয়স, দ্বিতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মাজীর মতভেদের ফলে সুভাষচন্দ্র দল ছেড়ে ফরোওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন, মহেন্দ্রবাবুও রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দিলেন বেদনার্ত অন্তরে। যোগ কোন দলে দিলেন না। এখানে সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

গাড়ি চলছিল। নায়েব কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় নি। মনোরমার মুখশ্রী বড় কোমল কিন্তু সেই মুখ এক এক সময় কঠিন পাথরের মত হয়ে ওঠে। সেই মুখ দেখেছে নায়েব উকিলবাবুর বাড়িতে। তাই জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলে না।

বললে মনোরমা নিজেই—উকিলবাবুর এই পরিচয় তো জানতাম না নায়েববাবু।

নায়েব বললে—কি পরিচয় বলছেন মা ?

—গভর্নমেন্টের জন্যে ওকালতি। সুভাষবাবুকে দেশদ্রোহী বলা। তারও চেয়ে বড়—ও'রা কি করে জানলেন যে সাধনা বউদিকে আমার এখানে আনতে চাচ্ছি। পুলিসের কাছ ছাড়া কার কাছে জানবেন ? আর উনি 'বণ্ড' লিখিয়ে খালাস করবেন অজয়কে—এ ক্ষমতা কি করে পেলেন ?

নায়েব বললে—হ্যাঁ, ইদানীং ও'র পুলিসের সঙ্গে সরকারের সঙ্গে দহরম একটু বটে। অনেক রকম করছেন আজকাল। সরকারী নজরে পড়েছেন। ও'র স্ত্রীও খুব মেতেছেন।

—অজয়কে যে বণ্ড দিতে বলে—সুভাষচন্দ্রের মত দেবতাকে যে দেশদ্রোহী বলে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। অন্ততঃ সংস্রব রাখতে পারব না। ওদের বাড়িতে স্নান করতে ইচ্ছে হল না আমার। চা মিষ্টি দূরের কথা। মহেন্দ্রবাবুর কাছে যাচ্ছি উনি ওই লোকটির হাত থেকে রক্ষা করুন আমাকে। আমি সইতে পারছি নে।

মহেন্দ্রবাবু উকিল বৃদ্ধ হয়েছেন, কোর্টে সাধারণতঃ যান না। তবে শক্তিধর মানুষ। আইন জ্ঞানে, দৃঢ়তায় এবং সততায় বিচক্ষণ ব্যক্তি। একসময়ে কংগ্রেসের কাজ করেছেন। ১৯১৬।১৭ সালে তিনি আটক আইনে বন্দী ছিলেন—১৯২১ সালেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি ওকালতি নিয়েই আছেন কিন্তু দেশের কাজ সম্পর্কে গাঢ় অনুরাগ আছে। সে অনুরাগ পেট্রিয়টিজ্‌ম নয় সে অনুরাগ ধর্মাশ্রয়ী। এ দেশের সে কালের সমাজ এবং মানুষ সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাই জানেন গান্ধীজীর রাজনীতিতে পদার্পণের পর থেকেই রাজনীতিতে মানুষ দলে দলে যোগ দিয়েছিল—তারা অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও আচারকে গ্রহণ করেছিল ব্রতের মত। এ'দের অনেকে রাজনীতি ছেড়েছেন কিন্তু অহিংসা এবং সদাচার ও ধর্মকে কোন দিন পরিত্যাগ করেন নি। অনেকের মধ্যে আবার গোঁড়ামি দেখা দিয়েছিল—টিকি রেখেছিলেন তাঁরা নতুন করে, সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজাপাঠ করেছেন নিয়মিত। এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা মিথ্যা পর্যন্ত বলতেন না ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রথম যুগের গোঁড়া ব্রাহ্মদের মত। মহেন্দ্রবাবু এই শ্রেণীর মানুষ হলেও গোঁড়া খুব নন। তবে তেজস্বী সত্যবাদী নীতিবাদী মানুষ।

মহেন্দ্রবাবু সমস্ত শুনে বললেন—তুমি এ লোকটিকে জানতে না এ তো আমি জানতাম না মা। সত্যিই তুমি জানতে না ?

—না। আপনি পিতৃতুল্য মানুষ। আপনি বিশ্বাস করুন। আমি কিছুই জানতাম না।

একটু চুপ করে থেকে মহেন্দ্রবাবু বললেন—হ্যাঁ, ভুল আমারই হচ্ছে। সম্পর্ক তো চিন্ময়ের সঙ্গে নয় তোমাদের, সম্পর্ক যে ওর বাবার সঙ্গে প্রথম তোমার শ্বশুরের। তারপর চিন্ময় তোমাদের উকিল হয়েছে ওর বাপের পর। হ্যাঁ, চিন্ময়ও তো এরকম ঠিক ছিল না

প্রথমটা। মোটামুটি একটু উগ্র আধুনিক ছিল। তারপর ওর কি মতি হল—বিয়ে করলে বুড়ো বয়সে এক ইস্কুল মিস্ট্রেসকে। তিনিই সকল কিছুর মূল। তাঁর প্রভাবেই চিন্ময় এই রকম হয়ে গেল। তা—। তুমি এসেছ—আমি তোমাকে সাহায্য করব। এটা তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ওর হাত থেকে তোমার বিষয়ব্যাপারের সংস্রব আমি ঘুচিয়ে মুক্ত করে দেব। তুমি এসেছ, তুমি গঙ্গাচরণবাবুর পুত্রবধূ। নিশ্চয় করব।

মনোরমা বললে—তা হলে আমি উঠি। আপনি অনুমতি করুন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শীতলহাটী রওনা হই।

—না মা। আমি তোমার নায়েবের কাছে সব শুনেছি। স্নান করেও তুমি কিছু খাও নি। ও বাড়ি থেকে না খেয়েই চলে এসেছ। খেয়ে তোমাকে যেতে হবে। এইটে আমার ফিজ্। চল বাড়ির ভেতর চল। আরও বলব—যদি পার তো রাত্রিটা থেকেই যাও। কাল সকালে যেয়ো।

—না। আপনি খেতে বলছেন খাব বইকি। কিন্তু শীতলহাটী আমি আজই ফিরব।

* * * *

মহেন্দ্রবাবু নিষেধ করেছিলেন যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে। ভোর তিনটের সময় মনোরমা শীতলহাটী পৌঁছুল, পাঁচটায় পুলিস এল।

স্বয়ং এস পি. এবং আই বি. অফিসার, তার সঙ্গে শীতলহাটী থানার দারোগা কনেস্টবলেরা তো ছিলই। আর একদফা সার্চ হল। খুব ব্যাপক সার্চ নয়। তবে মনোরমার জিনিসপত্র সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলে। তারপর জেরা।

—আপনার ছেলের যদি মঙ্গল চান তবে আপনি সব খুলে বলুন।

মনোরমা বললে—কি খুলে বলব? সত্য কথার মধ্যে তো গোপন কিছু নেই—থাকে না। আমার ছেলে এলাহাবাদে কি করেছে জানি না। তবে তার আগে পর্যন্ত সে এসব কোন আন্দোলনে যুক্ত ছিল না। এইটুকু আমি জানি।

—না, আপনি জেনেছেন। এবং নিজেও এতে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে আমরা খবর পেয়েছি।

অবাক্ হয়ে গেল মনোরমা।

—আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি? আমি জানি?

—হ্যাঁ। জানেন। প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সাধনা দেবী বলে একটি মহিলাকে, যিনি ওখানে আপনার ছেলের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন, ইউ. পি. পুলিস তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু বেঙ্গল পুলিস ইউ. পি পুলিস নয়। আপনি তাঁকে চাকরি দিয়েছেন।

—হ্যাঁ দিয়েছি!

—তবে?

ক্রোধ হয়ে গেল মনোরমার। সে আত্মসংবরণ করতে পারলে না। বললে তাঁকে চাকরি দেওয়ার জন্য যদি এই প্রমাণ হয় যে আমি জানি সব কথা, তবে জানি। কিন্তু তাঁর কোন কথাই আমি বলব না।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক জেরা করে পুলিস তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নায়েব এসে বললে—মা, দারোগাবাবু বললেন মেয়েটিকে এখানে আনলে এরা অনেক ফেসাদ করবে। তার চেয়ে তাকে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করা ভাল। চাকরিটা—

দৃঢ়স্বরে মনোরমা বললে—না।

বলেই সে কাগজ কলম নিয়ে বসল। জেদের মাথায় বসল। বসেও কিন্তু রেখে দিলে। কালীমাকে প্রণাম করা হয় নি। মানুষের জেদ অহংকার এমনিই বটে। স্নান করে মাকে প্রণাম করে ফিরে চিঠি লিখল। দুখানা চিঠি। একখানা নিজের বউদিকে, অন্যখানা

সাধনা বউদিকে।

নিজের নিরাপদে পেঁছুনোর খবর জানিয়ে শেষে লিখলে—বউদি, বড় একলা মনে হচ্ছে। অজয় তোমার কাছে ছিল তাতে একলা থেকেও একলা মনে হত না! আজ মনে হচ্ছে আমি বড্ড একলা। আমি একা, বিশ্বসংসারে কেউ নেই। তুমি বউদি সাধনাকে বলো সে ওখানে পারমিশন পেলেই যেন চলে আসে। আমি জেনে এসেছি সাধনা নির্দোষ এ কথা ওখানকার পুলিস বিশ্বাস করেছে। তারা ছেড়ে দেবে তাকে। ছাড়া পেলেই যেন সে একদিন বিলম্ব না করে এখানে চলে আসে।

সাধনাকেও সেই কথা লিখলে।—সাধনা বউদি, তুমি চলে এস ভাই। এলে আমাকে বাঁচানো হবে। তোমার দুঃখের মধ্যে অভাবের মধ্যেও উমা আছে। আমার অজয়কে কেড়ে নিয়ে এরা আমাকে নিঃসম্বল করে দিয়েছে।

দিন দশেক পর নলিনী দেবীর পত্র পেলে মনোরমা।

"তোর পত্র পেয়ে যে কি দুঃখ পেলাম মনো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তুই এতখানি ভেঙে পড়েছিস? তবে সান্ত্বনার কথা—সাধনা এতদিনে তোর ওখানে পেঁচেছে নিশ্চয়। তোর খবর বা অনুমান সত্য—পুলিস তাঁর উপর যা বাধানিষেধ ছিল তুলে নিয়েছে। নিয়েছে তোর যাবার দু'দিন পরই। পরের দিনই সাধনা উমাকে নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়েছে। সেও আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল। সাধনা পেঁছে চিঠি দেয় নি। বোধ হয় ব্যস্ত আছে। তাকে চিঠি দিতে বলিস। ভুনি-দুনির সঙ্গে কাল দেখা করে এসেছি। অজয়ের সঙ্গে ইণ্টারভিউয়ের দরখাস্ত করেছি। কালই দরখাস্ত নিয়ে এস. পির ওখানে গিয়েছিলাম। এস. পি হেসে বললেন—দেখুন তো এ ছেলেটির কাণ্ড! নিছক মুখে বাহাদুরি করে—নেতাজী জিন্দাবাদ বলে চেঁচিয়ে বিপদটা ঘাড়ে চাপালে। আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু কি করব? এ ব্যাপারটা একেবারে সেণ্ট্রাল আই. বি. পর্যন্ত চলে গেছে। তাদের হুকুম না এলে আমাদের কিছু করবার এক্তিয়ার নাই। তুই ভাবিসনে। তারাও বোকা নয়। অজয়কে ওরা খুব বেশীদিন আটকে রাখবে না, ছেড়ে দেবে। আমার আশীর্বাদ জানিস।

ইতি—
আশীর্বাদিকা
তোর বউদি নলিনী দেবী।"

অবাক্ হয়ে গেল মনোরমা।

সাধনা পাঁচ দিন আগে রওনা হয়েছে এলাহাবাদ থেকে। এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান তের-চোদ্দ ঘণ্টার পথ। প্যাসেঞ্জারেও সতেরো-আঠারো ঘণ্টার বেশী লাগবার কথা নয়। তার জায়গায় পাঁচ চব্বিশ ঘণ্টা—একশো কুড়ি ঘণ্টা।

তা হলে? কোথায় গেল সাধনা?

হঠাৎ একটা ধারণা বিদ্যুতের মত খেলে গেল তার চিন্তালোকে।

বর্ধমান স্টেশনে—বর্ধমান পুলিস—?

এতে আর কোন সন্দেহ নেই। এবং—

এ সবের মূলেই নিশ্চয় ওই উকিল চিন্ময়। কোন সন্দেহ নেই। তিনি ডাকলেন নায়েবকে।

—একবার বর্ধমানে যাব।

—আপনি নিজে?

—হ্যাঁ, নিজে।

—আমায় দিয়ে হবে না ?

—না। নিজে না গেলে আমি শান্তি পাব না। গাড়ি সাজাতে বলুন। এই বেলাতেই—

—এ যে অবেলা মা, এখন বেলা সাড়ে চারটে। রাত্রি হয়ে যাবে।

—হোক। চলুন আপনি। মহেন্দ্রবাবুর ওখানে উঠব।

মহেন্দ্রবাবুর বাসায় এসে যখন পৌঁছুল তখন রাত্রি আটটা।

মহেন্দ্রবাবুর কাছে কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেললে—নিশ্চয় এখানে স্টেশনেই তাকে এরা অ্যারেস্ট করেছে। আপনি খবরটা আমাকে আনিয়ে দিন। তার সঙ্গে দশ-এগার বছরের মেয়ে উমা। সেই বা কোথায় গেল ? যে করে হোক—ঘুষ দিয়ে হোক বা যে করে হোক খবরটা চাই আমার।

মহেন্দ্রবাবু সেই রাত্রেই লোক পাঠালেন। চতুর লোক। তাঁর মুহুরী এবং আরও অন্য লোক। স্টেশন, থানা—এ ছাড়াও গোপনে কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর কাছে।

বসে রইল মনোরমা মাটির মূর্তির মত।

এ কি করলে সে ? কেন সে তাদের এই বাংলাদেশে এনে আবার পুলিসের বন্ধনদশায় ফেলে দিলে ! ছি—ছি—ছি !

রাত্রি এগারটায় সব লোক ফিরে এল।

সাধনার কোন খোঁজ তারা পায় নি। কিন্তু সাধনাকে পুলিস অ্যারেস্ট করে নি। গোটা বর্ধমান জেলার মধ্যে না। এদিকে মেন লাইন ওদিকে গ্র্যাণ্ড কর্ড—মিহিজাম বরাকর থেকে বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত কোন মেয়ে কোন দিন অ্যারেস্টেড হয় নি।

তবে সাধনা গেল কোথায় ? আরও দশ দিন গেল বিশ দিন—এক মাস দু' মাস গেল সাধনা এল না। হারিয়ে গেল সাধনা ?

আট মাস পর।

বর্ষাকালের রাত্রি। গভীর রাত্রে দোতলায় জান্‌লার ধারে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসেছিল মনোরমা। আজ খবর এসেছে বন্দী অবস্থায় অজয়ের মাথার বিকৃতি ঘটেছে। আজও অজয়কে ছাড়ে নি পুলিস। সম্প্রতি কয়েক মাস তাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। গত বৎসর পুজোর পর নভেম্বরে তাকে অ্যারেস্ট করেছিল—এখন জুন মাস। আষাঢ়ের বারোই।

ভুনির মা নলিনী বউদি লিখেছিলেন—এলাহাবাদের এস-পি মিঃ শর্মা তাঁকে বলেছিলেন —তিনি নিজে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে অজয় রাজনৈতিক দল থেকে সর্বপ্রকারে সংস্পর্শহীন ; কেবল আবেগবশে সুভাষচন্দ্রের জয়গান করে এবং উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করে এইভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তিনি নিজে সে কথা লিখে তাকে ছেড়ে দেবার কথাই লিখেছেন কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে বোস জড়িত বলে সমস্ত ব্যাপারটাই সেণ্ট্রাল আই-বির হাতে গিয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর রিপোর্টের পর তারা তাকে ছেড়েই দেবে। কিন্তু তা সত্য হয় নি। বরং এই মনোভাব পোষণের ফলে এস পি মিঃ শর্মাকে অপদস্থ হতে হয়েছে। তাঁকে এলাহাবাদ থেকে বদলি করে একটি ছোট জেলায় পাঠিয়ে প্রকারান্তরে অপদস্থ এবং দণ্ডিত করা হয়েছে। জেলাটা শুধু ছোটই নয়—সব রকমে অসুবিধার স্থান।

মনোরমা নিজে আবার এলাহাবাদ গিয়েছিল। কিন্তু সেবার আর অজয়ের সঙ্গে দেখা করতেও দেয় নি পুলিস।

নলিনী বউদি বলেছিলেন—ধৈর্য ধরতে হবে মনো। অধৈর্য হলে চলবে না। ওরা এখন ক্ষ্যাপা জানোয়ার। রেডিয়োতে সুভাষচন্দ্রের গলা আসছে। আজাদ হিন্দ পল্টন

এগ্চ্ছে। এরা হারছে। এখন—।

মনোরমা হেসে বলেছিল—জানি বউদি। ধৈর্য না ধরে উপায় কি? ধরতেই হবে।

নলিনী বলেছিলেন খবর অবশ্য পাবই। সব লোহার বাসরঘরেই ছিদ্র থাকে। এদের লোহার ঘর দুশো বছরের হতে চলেছে, জং ধরেছে। তুই জানিস নে—ওদের এদেশী কর্মচারীদের মধ্যে কত লোক ওদের বিপক্ষে। ভয়ে তারা মুখ বুজে কাজ করে যায়। কিন্তু এমন লোকও এখন বেশ বেড়েছে যারা খবর দেয় গোপনে। তুই জানিস নে—আমার বাড়ি সার্চ হবার কথা থাকলে আগে থেকে আমি খবর পেয়ে যাই।

মনোরমা বলেছিল—আমি ভাবছি কি জান?

—কি?

—ভাবছি—ওরা যদি চরম হার হারে, ওদের যদি পালাতে হয়—তবে—সেই পালাবার সময়?

কথাটা তো তার মিথ্যে নয়। সেদিন সত্যই এ আশঙ্কা মিথ্যা ছিল না। ইতিহাস যদি অন্য রকম হত যদি হিরোসিমা নাগাসিকিতে অ্যাটম বোমা না পড়ত এবং জাপানীরা আত্মসমর্পণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্যম ব্যর্থ করে না দিত তবে কোহিমা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ফিরত না। তারা অগ্রসর হত। ইংরেজকে যদি পালাতে হত তবে যাবার সময় বহু হত্যাকাণ্ড করে যেত। জাতিগত ভাবে না করলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ কিছু কিছু ইংরেজেরা দলবদ্ধ হয়ে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে আক্রোশ মেটাতে চেষ্টা করত। তারা কলকাতায় অন্ধকূপে হত্যার মনুমেণ্ট গড়েছিল—পাটনায় সেটা আজও আছে—কানপুরেও আছে। এ হত্যায় অজয়দেরই মারত সর্বাগ্রে।

মনোরমার মনে সেদিন সেই আশঙ্কাই তার প্রাণপুত্তলীর শ্বাসরোধ করতে চেয়েছিল। নলিনী দেবী বলেছিলেন—ভাবিস নে মনো। ওদের আর একটা দিক আছে—সেটা হল হিসেবের দিক রে। ওরা বেনের জাত। দুনিয়া জুড়ে রাজ্য করেও ওরা ঠিক ক্ষত্রিয় হয় নি। সব হারাবার আগে ওরা সন্ধি করে নেবে। আর ওদের বুদ্ধি আছে।

কথাটার মধ্যে সত্য আছে। এবং তার সঙ্গে আরও কিছু আছে যেটা সত্যই মহৎ। কিন্তু সেদিন ওই কথার আসল অর্থ এবং মূল্যটা ছিল নেহাতই সান্ত্বনাবাক্যের মত।

মনোরমা বলেছিল—আমি একবার এখানকার সব থেকে বড় ব্যারিস্টারের কাছে যাব। ইন্টারভিয়ু দেবে না কেন?

উকিলের পুত্রবধূ উকিলের স্ত্রী—সে আইনকে বোঝে এবং বড় করেই দেখে।

ব্যারিস্টার বলেছিলেন—আইনের কাল এবং এলাকা যুদ্ধের কালে এবং ধাক্কায় আজ আর বজায় নেই মা। সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তবে চেষ্টা করে দেখব।

নলিনী দেবী বলেছিলেন - দেখা করে কি করবি? সে যদি ভেঙে পড়ে থাকে—

—ভেঙে সেও পড়বে না, আমিও পড়ব না। যদি সে পড়ে থাকে তবে বলব সাহস করে থাক অজয়—যেটা শর্মা বলেছে মিথ্যে সেটা সত্যি হোক। কিছুতে যেন হার মানিস নে।

দেখা হয়েছিল। দিল্লী পর্যন্ত গিয়ে মনোরমা ইন্টারভিয়ু আদায় করেছিল। ইন্টারভিয়ু-এর সময় সত্যসত্যই এ কথা বলে এসেছিল। অজয় ছিল জালের ঘেরার ওপারে। সেইখান থেকেই মাকে প্রণাম করে বলেছিল—তোমার আশীর্বাদ আমাকে বল দিলে মা। তোমার জন্যে আমার ভাবনা ছিল। তুমি যেন বেশী ভেবো না।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে একসময়ে সকলের অগোচরে বলেছিল—তোমাকেও এরা হয়তো বিরক্ত

করবে।

বিস্মিত হয়েছিল মনোরমা কিন্তু সে অল্পসময়ের জন্য—হয়তো ক্ষণিকের জন্য—তার পরমুহূর্তেই সে বিস্ময় তার কেটে গিয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কি আছে ?

মৃদুস্বরে সেও বলেছিল—তার জন্যে তুই ভাবিস নে !

তখন একদিকে তার দুই চোখ থেকে জল ঝরছে। বার বার মুছছে। চোখের জলের একটা ছোঁয়াচ আছে—মানুষের মনকে ভিজিয়ে দেয়। যারা পর্যবেক্ষক ছিল—পাহারায় ছিল তারা বোধ হয় এই ছোঁয়াচের জন্যে একটু উদাস হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

অজয় আবার একসময় এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বলেছিল—এঁরা—উমার মা কোথায় জান ? এরা এই কথাটাই বার বার জিজ্ঞাসা করছে।

সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ঘাড় নেড়েছিল—জানি না তো।

ইণ্টারভিয়ু এখানেই প্রায় শেষ হয়েছিল।

তারপর আর ইণ্টারভিয়ু পায় নি মনোরমা। চিঠিপত্র পেতে পেতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর অনেক চেষ্টা করে খবর পেলে মনোরমা যে অজয়ের মাথার বিকৃতি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তিন মাস আগে। তিন মাস তাকে চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছে। খবর সরকার দেয় নি, দিয়েছে জেলখানার ডাক্তার। দিয়েছে নলিনী দেবীকে একজন সাধারণ কয়েদী মারফৎ। কয়েদীটি জেল থেকে খালাস পেয়ে এলাহাবাদে এসে নলিনী দেবীকে খবরটা দিয়ে গেছে। সে নিজেও অজয়কে দেখেছে। লোকটি হাসপাতালেই কয়েদী নার্স ছিল। সে বলে গেছে—বাচ্চা ছেলে মাঈজী - এতনা জুলুম সইতে পারে নি। একদম চুপ মেরে গিয়েছে। মালুম হয় কি গুংগা হয়ে গিয়েছে। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কেউ কাছে এলেই বলে—ওরা কোথায় গেছে আমি জানি না। বাস, তারপর চুপ করে যায়। চুপ করে যায় তো আর কিছুতেই মুখ খোলে না। আবার যদি কোন লোক আসে তবে আবার ওই কথাটি বলে আবার চুপ হয়ে যায়।

নলিনী দেবী এরপর সন্ধান করেছেন গোপনে। আট মাসের মধ্যে নলিনী দেবীরও ভাগ্যে বিপদ কম ঘটে নি ; ছোট ছেলে দুনী জেল থেকে টি-বি নিয়ে ফিরেছে মাস তিনেক আগে। কিন্তু নলিনী বউদি সে সত্ত্বেও সব খবর নিয়ে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন অজয়ের। ও দেশের অধিবাসী। হিন্দীভাষী। আজ হঠাৎ বিকেলবেলা থানকাপড় ও আলখাল্লা বুকে রুদ্রাক্ষের মালা পরা একজন প্রৌঢ় আধা সন্ন্যাসী বৈরাগী এসে মনোরমার কালীবাড়িতে অতিথি হয়েছে। বলেছিল সে বাংলার শক্তিপীঠ ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছে। আজ আসছে বরাকর কল্যাণেশ্বরী থেকে। নেমেছে বর্ধমানে। ইচ্ছা পায়ে হেঁটে এখান থেকে উজানিতে মঙ্গলচণ্ডীর আটন দেখে যাবে কাটোয়া, সেখান থেকে কেতুগ্রাম। পথে দিন শেষ হয় হয় দেখে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, ভোর ভোর উঠে চলে যাবে। বর্ষা বাদলার দিন—রাত্রিকাল - বাংলাদেশ, এখানে নাকি বড় বড় সাঁপ তাই চলতে ভয় হয়েছে।

সন্ধ্যার সময় মনোরমা ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যারতি দেখে প্রণাম সেরে চলে আসছিল এমন সময় একটি পেঁড়া তার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী বলেছিল—মাঈজী, মহাদেবীর প্রসাদ কিছু আমার কাছে আছে—এটি তুমি নাও তোমার মঙ্গল হবে।

মনোরমা হাত পেতে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল। সন্ন্যাসী ডেকে বলেছিল—ভেঙে একটু অবশ্য মুখে দিয়ো মা। এ প্রসাদ দুর্লভ। এ হল শক্তির কমলারূপিণী মায়ের প্রসাদ। কমলা নলিনী-দল-বিহারিণী মাতাজী কমলা। বুঝেছ !

একটি শব্দ চকিতে চঞ্চল করেছিল মনোরমাকে।

কমলা? লক্ষ্মী ঠিক নয়। দশমহাবিদ্যার শেষ মহাবিদ্যা কমলা। নলিনী-দল-বিহারিণী। হ্যাঁ, তিনি পদ্মের উপর আসীনা বটেন্। কিন্তু—এ দেবী কোথায় আছেন? কখনও তো শোনে নি সে! নলিনী-দল-বিহারিণী—। কোথায় যেন কি একটা সংকেত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। অন্ততঃ ওই শব্দটা তাই বলছে। কমলা কমল-দল-বিহারিণী ছত্রটিকেই যেন ইচ্ছে করে বদল বললে—কমলা নলিনী-দল-বিহারিণী।

সে তার মুখের দিকে একবার প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সন্ন্যাসী হাত তুলে বলেছিল—একটি জীবের জন্য তোমার মন অহরহ ব্যাকুল মাতাজী। ওই প্রসাদে তুমি জীবের সংবাদ পাবে। সংসারে বিপদ আসে মা—চিন্তা হয়। সব কাটে দেবতার দয়াসে। যাও মা বাড়ি যাও। প্রসাদ ভেঙে মুখে দাও। লগ্ন যাচ্ছে মা।

কেমন একটা অভিভূত ভাব নিয়ে মনোরমা বাড়ি ফিরে পেঁড়াটি ভেঙেই চমকে উঠেছিল। পেঁড়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ছোট একটি আংটি। চট্টগ্রামের গড়ন। আংটির উপরে লেখা দুনীকে। কুটুম্ববাড়ির ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনে ছেলেদের পৈতেতে এই ধরনের আংটি দেওয়ার রেওয়াজ করে গিয়েছিলেন তার শ্বশুর গঙ্গাধরবাবু। এ আংটি মনোরমা দিয়েছিল দুনীকে।

কমলা নলিনীদলবিহারিণীর প্রসাদ পেঁড়ার মধ্যে এই আংটি। তা হলে? মনোরমা নিজেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল। নীচে পর্যন্ত নেমে এসে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। হয়তো ঠিক হবে না। এ বাড়িতে চাকরবাকর কর্মচারীদের মধ্যে দু'তিনজন অন্ততঃ একজনও এমন আছে যার জন্য এখানকার প্রায় সকল খবর বর্ধমান আই-বি আপিসে পৌঁছোয়। সাদা পোশাকে একজন আই-বি তো নিত্য দুবেলা এখানকার থানা থেকে আসে এবং দু'তিন ঘণ্টা করে কাটিয়ে যায়। চিঠিপত্রের কথা তো স্বতন্ত্র—সবই যে দেরিতে আসে এবং খোলা হয় এ তো সকলেই জানে। পোস্টাপিসে এই আই-বি লোকটি চিঠি সর্টিং-এর সময় বসে থাকে। প্রকাশ্যেই চিঠিগুলো দেখে এবং যেখানা ইচ্ছে আটক করে। সুতরাং সে নিজেকে সংবরণ করে উপরে উঠে গিয়েছিল। ঝিকে ডেকে বলেছিল নায়েবকে ডাকতে। নায়েবকে ডেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে সব বলে বলেছিল—ওকে একবার আপনি গোপনে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। তারপর আপনার বিশ্বাস হলে আমি দেখা করব।

কিছুক্ষণ পর নায়েব ফিরে এসে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন—এই সে বললে। দেখা সে করবে না। কারণ সে ধরা পড়লে হয়তো শেষ পর্যন্ত যিনি খবর পাঠিয়েছেন সেই ডাক্তারটির চাকরি যাবে।

নায়েব বলেছিলেন—নলিনী বউমা চিঠি লেখেন নি এই কারণে। চিঠি ধরা পড়তে পারে। তিনি নিজে আসেননি দুটো কারণে। দুনীর অসুখ আর তিনি এলে পুলিস এখানে ব্যস্ত হবে কি খবর এনেছেন তিনি জানবার জন্যে। যাঁকে পাঠিয়েছেন উনি একজন আগের কালের কর্মী। আপনার দাদার আমলের—তাঁর বন্ধুও বটেন। আজ সাত-আট বৎসর এসব ছেড়ে দিয়ে ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। নলিনী বউমা ভাবছিলেন সংবাদটা কিভাবে পাঠাবেন আপনার কাছে। উনি সব শুনে খবরটা নিয়ে এসেছেন। বললেন—মিথ্যা আমি বলি নি। অনেকদিন থেকেই বাংলাদেশের শক্তিপীঠগুলি দেখবার ইচ্ছা। তা সেটাও এই সুযোগে পূর্ণ হয়ে যাবে। কয়েদীটি খবর দিয়ে যাওয়ার পর বাকী সব খবর উনিই আগ্রা গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছেন। বললেন—সন্ন্যাসীদের অনেক সুবিধা, অন্ততঃ এদেশে—সে পুলিসই হোক আর হাকিমই হোক—একটু-আধটু শ্রদ্ধা করে; তার উপর যদি সামান্য কিছু শক্তির পুঁজি থাকে তবে তো আর বাকী থাকে না। উনি গণনাবিদ্যা কিছু জানেন। সেই

বিদ্যার বলেই সব সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। শুধু জেলখানা নয় পুলিস পর্যন্ত খবর নিয়েছেন। বললেন—সবকিছু জটপাকানোর মূলে হল শিবেনবাবুর স্ত্রীর অন্তর্ধান। নইলে মিঃ শর্মা যা বলেছিলেন তাই সত্য হত। অজয়কে ছেড়ে দিত। এবং ওদের মানে সাধনা দেবীকেও ছেড়ে দিত। শর্মা একটু হঠকারিতার কাজ করে সাধনা দেবীর উপর একটু বেশী বিশ্বাস করে ফেললেন। তাঁকে বললেন—চাকরি নিয়ে আপনি বাংলাদেশে যেতে পারেন, চলে যান। শুধু স্থান পরিবর্তনের কথা পুলিসকে জানাবেন। সাধনা দেবী মেয়েকে নিয়ে রওনা হলেন। তারপর আর এখানে এলেন না। কোথায় গেলেন কেউ জানতে পারলে না। সঙ্গে তাঁর গোপনে পুলিসের লোক ছিল—অন্য গাড়িতে থেকে তাঁর উপর নজর রেখেই আসছিল। মোগলসরাইএ রাত্রি নটা হয়েছিল। সেখানেও পুলিসের লোকটি কামরা থেকে নেমে ও'দের কামরার জানালায় এসে তাঁদের দেখে গিয়েছিল। তাঁরা খাওয়াদাওয়া সেরে আধশোওয়া মত করে ঘুমুচ্ছিলেন দেখেছিল। তারপর আর সেরাত্রের মধ্যে নেমে দেখে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। ধানবাদে সকালে এসে দেখে তাঁরা কেউ নেই। আসানসোলে এসে সে ওখানকার পুলিসকে জানায়। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এলাহাবাদে। এখানে ট্রেনের পর ট্রেন তল্লাশ। স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ মেলে নি। কামরার যাত্রীরাও কেউ কিছু বলতে পারে নি। তারা সকলেই ঘুমুচ্ছিল। কোথায় তাঁরা নেমে গেছেন কেউ জানে না। লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে তাঁরা আসছিলেন। থার্ড ক্লাস। সব সাধারণ হিন্দুস্থানী মেয়ে। সুতরাং পুলিস এসে চেপে ধরলে অজয়কে। ওদের সন্দেহ হল শর্মা অত্যন্ত বোকা—তাকে এরা যা বিশ্বাস করাতে চেয়েছে তাই বিশ্বাস করেছে। তাই রিপোর্ট করেছে। তাকে সরিয়ে দিলে—সে একরকম ডিগ্রেড করা। ওদিকে অজয়কে জিজ্ঞাসা, হয়তো—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনোরমা বললে—হ্যাঁ, মারধর। নির্যাতন। তারপর হেসে বললে—চট্টগ্রামে ছিলাম, তিরিশ সাল দেখেছি, সে তো না জানা নই।

—হ্যাঁ। তা অজয় শুধু একটি কথাই বলত ওরা কোথায় গেছে আমি জানি না। আমি জানি না। তারপর চুপ করেই থাকত। কোনক্রমেই কথা বলাতে পারত না। এলাহাবাদেই ওর প্রথম মাথার গোলমাল দেখা দেয়। তারপর ওখান থেকে ওকে নিয়ে যায় আগ্রায়। সেখানকার ডাক্তার একজন খালাসী কয়েদীকে দিয়ে খবরটা নলিনী বউমাকে পাঠিয়ে দেন।

কথা শেষ করে চুপ করলেন নায়েব।

মনোরমা শুনেও চুপ করে বসে রইল। আর কোন প্রশ্ন করলে না। তার সকল প্রশ্ন যেন শেষ হয়ে গেছে।

অজয় পাগল হয়ে গেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে করে—শেষে স্তম্ভিত হয়ে—বাক্যহীন বোধহীন হয়ে গেল! ফিরে হয়তো একদিন আসবে। তাকে দেখে তো সে আর প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে না! 'মা' বলে চিৎকার করে উঠবে না!

এ পৃথিবী যেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের ভগ্নাংশ থেকে, সেই দিন থেকেই ঘূরন্ত পৃথিবীর কোন-না-কোন রেখায় উদয় দিগন্তের আভাস ফুটিয়ে একটা গোটা দিক আলোকিত করে রেখেছে। আজ তার ভাগ্যাকাশের এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ অন্ধকারকে গাঢ় - গাঢ়তর—গাঢ়তম করে হিমপ্রবাহে সব কিছুকে জমাট পিণ্ডে পরিণত করে দিলে।

নায়েব বললেন—তবে উনি ভাবতে বারণ করলেন।

মনোরমা শূন্য দৃষ্টিতেই তাকালে নায়েবের দিকে।

নায়েব বললেন—উনি বললেন—ডাক্তার বলেছেন ছাড়া পেলেই সেবাযত্নে সেরে যাবে অজয়। আর পুলিস মনে করছে শিবেনবাবুর স্ত্রীর খোঁজ তারা পেয়ে যাবে।

বাঘে হরিণকে তাড়া করে—হরিণ ছোটে প্রাণভয়ে—সামনে যে পথ পায় তাই ধরে ছোটে—পথ না থাকলে বনের মধ্য দিয়েই ছোটে। ছুটতে ছুটতে হয়তো এসে পড়ে খদের ধারে, তখন ফেরার পথ থাকে না—লাফ দিয়ে পড়ে খদের মধ্যে। এমনই একটা অবস্থাই প্রায় হয়েছিল সাধনার। সেই অবস্থার মধ্যেই ওই হরিণের খদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই সে বর্ধমান আসার পথে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছিল।

এলাহাবাদের এস-পি তার বর্ধমান যাবার অনুমতি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুখুজ্জে খুড়ো তার শ্বশুরের সঙ্গে মনোরমার গ্রামের সম্পর্ক এবং অতীত ইতিহাস তাকে যখন বললেন—এবং বললেন—ভেবে চিন্তে যেয়ো মা। প্রকাশ হয়ে পড়লে গ্রাম্য সমাজে যে কি কঠিন অবস্থায় পড়বে আর মনোরমাই বা কি দৃষ্টিতে দেখবে সেটা বোধ হয় ভগবানও বলতে পারেন না। সে দমে গিয়েছিল। ছুটে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ। সেখানে আশ্রয় মেলে নি। এই অবস্থার মধ্যে বর্ধমান যাওয়া ছাড়া আর পথ সে দেখতে পায় নি। ভেবেছিল সেখানে গিয়ে যা হয় করবে। সুবিধা সুযোগ মত সব কথা মনোরমাকে বলে পরিষ্কার করে নেবে। সব শুনে সে যদি বলে থাক তবে থাকবে, নইলে স্থানান্তরে কোন ব্যবস্থা করে নেবে। কিংবা তাকে বলবেই না কোন দিন—মাত্র এই কাজটা আশ্রয় করে গিয়ে অন্য আশ্রয় খুঁজে নেবে। এমনি দ্বিধার মধ্যেই সে বর্ধমান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এলাহাবাদে থাকা তার পক্ষে আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। বাড়ি ব্যাংক দখল করবে, তার মামলা-মকদ্দমা সে চালাতে পারবে না। জীবিকা নেই। এক জীবিকা দেখতে পায়—সে ভিক্ষা। তার উপর যদি কোন দিন মুখুজ্জেখুড়োই এই ইতিহাস প্রকাশ করে যেন তবে আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা থাকবে না। তার শ্বশুর তার স্বামী এখানকার বাঙালী সমাজের কাছে জাতিচ্যুতই শুধু নয় প্রতারক বলে প্রতিপন্ন হবে। কি করবে সে তখন? সে কি সইতে পারবে? রমা মরেছে—আগুনে পুড়ে। উমাকে কি তাকেই নিজে হাতে গলায় কলসী বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে? তাই এলাহাবাদ থেকে চলে যাওয়ার জন্যেই সে বর্ধমান যাবার উদ্যোগ করেছিল। এখন কিছুদিন শান্তিতে থাকতে পারবে। মুখুজ্জেমশায়কে নিয়েই সে ব্যাংকের কাছে গিয়েছিল। বাড়িটা লিখে দিয়ে, দেনা শোধ করে কিছু টাকা যদি প্রাপ্য হয়—সেটা একশো দুশো পাঁচশো যা হয়—সে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও বাধা হয়েছিল। বাড়ির মালিক তার স্বামী—স্বামী নিরুদ্দেশ—মৃত তা প্রমাণ হয় নি সুতরাং বাড়ি বিক্রির অধিকার তার নেই—ব্যাংক তা নেবে না। ব্যাংকের একমাত্র পথ আদালত—আদালতে মামলা করে তারা নিলাম করে নেবে বাড়ি। সুতরাং বাঁচবার পথ তার কোথায়? কি করে সে বাঁচবে এই এলাবাবাদে?

শেষে মুখুজ্জেখুড়োর সাহায্যেই বাড়িটা একজনকে ভাড়া দিয়ে, ন'মাসের ভাড়া অগ্রিম নিয়ে এক বছরের ভাড়ার রসিদ দিয়ে, সাড়ে চারশো টাকা সম্বল করে বর্ধমান রওনা হয়েছিল। মুখুজ্জেখুড়োও শেষ পর্যন্ত বর্ধমানে যাওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাঙালী, বাঙলাদেশে যাচ্ছ—সেই ভাল। তবে মনে করে যেয়ো যে ওখানে তুমি থাকবে না। ওখানে থাকা ঠিক হবে না। মনোরমাকে এবার দেখলাম সেও বোধ হয় এসব কথা প্রকাশ পেলে সহ্য করতে পারবে না। তা ছাড়া গ্রামের সমাজ তো আছেই। এরপর একটু চুপ করে থেকেছিলেন মুখুজ্জেখুড়ো; তারপর আবার বলেছিলেন—দেখ মা, আমি ক'দিন ধরে ভেবেছি—অনেক বুঝেও দেখেছি। মানে নিজেকে বুঝে বুঝলাম সব। দেখ, প্রথম জীবন থেকে আমার বাল্যবিশ্বাস বংশবিশ্বাস বশে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেছি। এখানে এসে এই ইংরেজীওলাদের ধাক্কায় একদিকে ইংরেজী শিখে এম. এ. পাস করলাম—প্রফেসর হলাম—

অন্যদিকে ওই ওদেরই বেশী করে ঘেন্না করবার জন্য নিজের বিশ্বাসকে আরও গোঁড়া করলাম। সংস্কৃত জানতাম—আরও ভাল করে শিখে শাস্ত্র পড়লাম। পড়ে এটা জানলাম বুঝলাম— আচার আচরণ ছুত পবিত এসবগুলির আসলমানে কিছুটা আর নকলমানে,— তার বহ্বাড়ম্বর অনেক। পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু তবু ছাড়ি নি। আজ অবস্থা হয়েছে এমন যে আসল বিচার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও বুঝেও মানতে পারি না। দেখ, বিধবা-বিবাহ করেছিলেন তোমার শ্বশুর, তাঁর মাতৃবিয়োগে আমি ঘাটে শ্রাদ্ধও করিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর এমনই মন খুঁতখুঁত করল যে কাশী গিয়ে গোপনে প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম। এরপর তোমাদের বাড়ি গিয়ে কখনও জল খাই নি। দেখেছ বোধ হয় তোমার জন্যে সত্যি সত্যি আপনার জনের মত কিছু করেছি, কিন্তু কোনদিন তোমার বাড়ি এসে তেষ্টা পেলেও বলি নি মা, একগ্লাস জল খাওয়াও তো!

অবাক্ হয়ে শুনেছিলেন সাধনা দেবী।

মুখুজ্জেখুড়ো আবার বলেছিলেন—আমার এ দু'নৌকোয় পা দেওয়া জীবন এবারের পালায় এমনিই থেকে গেল। এ কাটিয়ে আর উঠতে পারলাম না। নইলে বলতাম—বউমা, উমাকে নিয়ে আমার বাড়ি চল। কিন্তু তা পারলাম না। অবশ্য আর একটা কারণও আছে মা। ঘুণাক্ষরে তুমি কারুর কাছে বলো না। তোমার উপর সম্ভবতঃ রাজরোষের আর একটা ঝাপটা আসবে বলে মনে হচ্ছে। শর্মা এস-পি আমার ছাত্র—তার উপর ধার্মিক ছেলে। সংস্কৃতে অনুরাগী ধার্মিক ছেলে এস-পি হবে এ আমি ভাবি না। যাক সে কথা মা। ও আমাকে ডেকে বলেছে মাস্টার সাব, মনে হচ্ছে ওই লেডীর আরও ঝঞ্চাট আসছে। এখানকার যে ব্যারিস্টারের ছেলে সেদিনের হাঙ্গামার লীডার সেই ব্যারিস্টারটি খাপ্পা হয়েছেন শর্মার উপর। কারণ সে রিপোর্ট দিয়েছে—এর ভিতরে কোন আসল পলিটিক্স নেই। অজয় আসলে একটি বাহবা কুড়ানো মুখফোড় ছেলে—সে আজাদ হিন্দ মুভমেণ্ট সুভাষ বোস বা ফরোয়ার্ড ব্লক কিছুর সঙ্গে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তোমার জন্যে লিখেছে—এই মহিলা অতি নিরীহ মহিলা কিন্তু সী ইজ মাদার—এ রিয়াল মাদার—সেই জন্যেই একটি ছেলেকে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি, চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এদের আটকানো—এদের নিয়ে পুলিসের এনার্জি নষ্ট করা অত্যন্ত ভুল হবে। ডি-আই-জি আই জি এরাও মোটামুটি মেনে তাকে সমর্থন করেছেন। তার জন্যেই তুমি এখন ছাড়া পেয়েছ—বর্ধমান যাবার কথাতেও পুলিস কিছু বলে নি। কিন্তু সেই ব্যারিস্টার দিল্লী গিয়ে সেণ্ট্রাল আই-বিতে খোঁচাখুঁচি করেছেন বোধ হয়—। তা শর্মা বললে—দেখুন আমার অসুবিধে হবে। কৈফিয়ত চাইবে। কিন্তু আমার যা করবার তা তো করা হয়েই গেছে। আপনি আর বেশী জড়াবেন না। ও'কে এখানে নিজের ঘরে আনবেন না। তা হলে—বৃদ্ধবয়সে আপনাকে কষ্ট দেবে। ও'কে বর্ধমানেই যেতে বলুন।

এতটা বলে তিনি থেমেছিলেন। বোধহয় শুনতে চেয়েছিলেন সাধনার মতামত।

সাধনা কোন উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি নির্বাক্ হয়ে মুখুজ্জেখুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মুখুজ্জেখুড়ো আবার বলেছিলেন— সংসারে আমার এক স্ত্রী, সেও রুগ্ন। এই ধাক্কা সইবার মত আমার নিজের অবস্থাও নয় সংসারের অবস্থাও নয়। নইলে জাতধর্ম বাঁচিয়ে কোনরকমে আলাদা করে রেখেও তোমাকে আমার কন্যাবধূর মত রাখতে পারতাম। কিন্তু সে সাহস আমার নেই। বেচারী দুনি-ভুনিদের উপরেও খানিকটা ঝাঁজ পড়বে। তবে তারা সামলাবার ক্ষমতা রাখে! নলিনী বউমাও রাখেন। কিন্তু এই জটে জড়িয়ে নলিনী বউমাকেও যদি ধরে তবে সেটা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার হবে।

সাধনা এবার বলেছিলেন—আমি বর্ধমানেই যাই খুড়োমশাই।

স্টেশনে মুখুজ্জেখুড়ো আসেন নি। নলিনী দেবী এসেছিলেন। নলিনী দেবীকে আভাসে তিনি পুলিসের খবরের কিছুটা জানিয়ে বলেছিলেন—আপনার স্টেশনে গিয়ে কাজ নেই দিদি, আপনি যাবেন না। কিন্তু নলিনী দেবী সে কথা শোনবার লোক নন—তিনি এসেছিলেন। তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলেছিলেন আমার মনে হয় তুই এ ভালই করলি সাধনা। বর্ধমানে মনোর ওখানে ভালই থাকবি। তিনি হেসেছিলেন।

থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট—জেনানা কামরা। ডাউন কলকাতা মেল। নলিনী দেবী স্টেশনের কর্মচারীদের বলে জায়গা করে দিয়েছিলেন। এখানে নলিনীদি দুনি-ভুনির মা হিসেবে খুব পরিচিত। ভুনি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে পাণ্ডাগিরি করে। তা ছাড়া নলিনী দেবীও একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নন—শ্রদ্ধার পাত্রী। থার্ড ক্লাস মেয়েদের গাড়িতে ভিড় খুব থাকে না। ভয়েই যেতে চায় না। একটা গোটা বেঞ্চই পেয়েছিলেন দুজনে। নলিনী দেবীই বিছানা বিছিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ট্রেন ছাড়লেই শুয়ে পড়বি। এই গাড়ির চাবিটা রাখ। ট্রেন ছাড়লে দরজায় চাবি দিয়ে দিবি। বর্ধমান সকালবেলা। বোধ হয় আটটা—নেমে পড়বি।

উমা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক সেই সময় কামরার সামনে একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। নলিনী দেবী হেসে বলেছিলেন—আমি ভাবছিলাম। আর ভাবনা নেই, তোর রক্ষক এসে গেছে।

চমকে উঠেছিল সাধনা।—রক্ষক?

—মানে পুলিসের লোক। ওই যে। দাঁড়া তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। জনাব! ইধর ইধর! শুনিয়ে—ইধর আইয়ে!

লোকটি ফিক্ করে একটু হেসে ফেলেছিল। তারপর জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—নমস্তে।

—নমস্তে। আপনি যাচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ।

—তা হলে পথে একটু দেখবেন। সে দেখা নয়। সে তো দেখবেন সবাই জানে—দেখার মত দেখা। অসুবিধে-টসুবিধে হলে ব্যবস্থা করে দেবেন।

—সে নিশ্চয় দেব।

—আচ্ছা। নমস্তে।

লোকটি চলে গেলে উমা প্রশ্ন করেছিল—ও কে জেঠীমা?

—ও হল প্লেন-ড্রেস পুলিস। তোদের সঙ্গে যাচ্ছে। বর্ধমানে তোরা নামবি—সেখানে তার গেছে—সেখানকার পুলিস আসবে—তাদের কাছে তোদের দিয়ে উনি ফিরে আসবেন। তোর মা যে রাজদ্বারে মাননীয়া না হোক গণনীয়া হয়ে উঠেছে। এখানে ইদানীং তোদের বাড়ির দোরে লোক থাকতো দেখিস নি?

ট্রেনের হুইসিল দিল সেই মুহূর্তেই। নলিনী দেবী নেমে গেলেন। সেই লোকটি দরজা বন্ধ করে, তাতে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়ে পিছনে বোধ হয় ঠিক পাশের কামরাতে উঠে বসল। সাধনা জানালার দিকে মুখ লাগিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুকের ভিতরটায় কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছিল। এই যেন চিরকালের জন্য এলাহাবাদ ছেড়ে যাচ্ছেন! ওঃ, কত সাধ করে কত দুঃখ কত কষ্ট করে বাড়ি করেছিলেন শ্বশুর তাঁর সামান্য আয় থেকে। কত স্নেহ কত আত্মীয়তা বাঙালী সমাজের! কত চেনা এলাহাবাদ! এখানকার গঙ্গা এখানকার যমুনা—ত্রিবেণীসঙ্গম—এখানকার গাছপালা—মানুষজন—। ওঃ, আসবার সময় দাইটা কি কম কাঁদল! প্রতিবেশী রঘুনন্দন সিং! কত মমতা কত স্নেহ!

বললেন—কোন কষ্ট হলে আমাকে লিখো বহুমায়ী। একসঙ্গে বিপদে জড়িয়ে পড়ে যেন বেশী আপনার হয়ে গেছি।

ঝমঝম শব্দে ট্রেনখানা যমুনার পুলের উপর উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপারে যাবে ট্রেনখানা—যমুনা পিছনে পড়ে থাকবে, হয়তো বা জীবনে এলাহাবাদের সঙ্গে চিরকালের একটা ছেদরেখার মত। হয়তো এ পুল আর পার হয়ে তারা ফিরবে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ ফেরালেন সাধনা। ওপারে শহরের আলো দূরে পড়ছে। যমুনা তার কালো জল নিয়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়েছে। হঠাৎ এতক্ষণে তাঁর নজর পড়ল উমার উপর। একটি জানালার বাজুতে মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে উমা। আর তার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। মধ্যে মধ্যে চিবুক থেকে বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে কোলের উপর। কাছে মেয়েকে টেনে নিয়ে সাধনা বললেন—কাঁদছিস ?

উমা উত্তর দিল না।

সাধনারও চোখে জল এল এবারে। এ জল এতক্ষণ অনেক সংযমে বাঁধ দিয়ে বাঁধা ছিল। এবার উমার চোখের জলের স্রোত মিশে তাকে ভাসিয়ে দিল। মেয়েকে বুকে করে কিছুক্ষণ তিনি কাঁদলেন। হঠাৎ উমা তাঁকে প্রশ্ন করলে—কি হবে মা ?

বিস্মিত হয়ে গেলেন সাধনা।—কেন ? কিসের কি হবে ?

—পুলিস যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায় ?

—পুলিস ধরে নিয়ে যাবে ? চমকে উঠলেনসাধনা। এ তো তিনি ভাবেন নি। তাই তো !

—এখানে মুখুজ্জে দাদু ছিলেন—তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। সেখানে যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায়—? তবে কি হবে মা ?

স্তব্ধ হয়ে রইলেন সাধনা। উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। এ কথা তাঁর মনে হয় নি। তিনি ভাবেন নি। তাই তো—যদি ধরে নিয়ে যায় ? বিশ্বাস তো নেই। তাই বা কেন ? মুখুজ্জেখুড়ো তো তাই বললেন। ঝাপটা আবার আসছে। হ্যাঁ, আবার আসছে। ধরে নিয়ে যাবে নিশ্চয়। উমা কার কাছে থাকবে ? মনোরমার কাছে। মনোরমা যদি জানতে পারে উমার বাপ-পিতামহের পরিচয়—তখন ? তখন কি হবে ? অস্পৃশ্যের মত অচ্ছ্যুতের মত উমাকে বাইরের একখানা ঘরে—। অথবা হয়তো পাঠিয়ে দেবে ফিরে এলাহাবাদে। নলিনী বউদির কাছে !

হে ভগবান ! পৃথিবীতে কি আজ বেঁচে থাকবারও অধিকার হারিয়েছেন তাঁরা ? নেই—সে অধিকার নেই ?

জলস্রোতের মত শ্বাসরোধ-করা হতাশা বাইরের রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সাধনাকে ঘিরে ফেলেছে। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে।

ছোট একটা কামরা। মেয়ে-যাত্রীর সংখ্যাও বেশী নয়। সব সমেত তাঁরা জন দশেক। সকলেই রাত্রির ঘুমের জন্য জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। দু'চারজনের নাক ডাকছে। সাধনাও মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে নীরবে শুয়ে পড়ে বললেন—ভাবিস নে, তোকে ছেড়ে আমি ধরে নিয়ে গেলেও যাব না। বলব—আমার মেয়ে আমার কাছে থাকবে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল মির্জাপুরে। কামরার সামনে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল সেই লোকটি। একটু ঘুরে আবার এসে দাঁড়িয়ে বললে—মাঈজী, চা-টা খাবেন ? উত্তর দিলেন না সাধনা। হাতের চাপে উমাকেও নীরবে তাঁর বুকের কাছে যেমন শুয়ে ছিল—তেমনি শুয়ে থাকবার জন্য ইঙ্গিত জানালে। এ যে তিনি কেন করলেন তা সাধনা জানেন না। ইচ্ছে হল না ওর সঙ্গে কথা বলতে। কি অস্বস্তি—কি যন্ত্রণা—কি বিরক্তিকর—এ অন্যে বুঝবে না। ওঃ ! এ যেন ঘরের দরজায় একটা গর্তে সাপ বাসা বেঁধেছে, মধ্যে মধ্যে মুখ বের করছে——চেরা জিভ দুটো লিকলিক করে উঠছে, আবরণহীন দুটো চোখ তাঁদের দিকে নিবদ্ধ হয়ে

রয়েছে। কি যন্ত্রণা! হে ভগবান!

* *

হে ভগবান, এ পাপযুদ্ধ কবে শেষ হবে—কবে শেষ হবে এই পাপ রাজত্ব! তুমি ধ্বংস করো এই অত্যাচারী এই বলদৃপ্ত দাম্ভিক জাতের এই দম্ভ—এই শক্তি! ধ্বংস করে দাও। বাঁচতে দাও—তুমি আমাদের বাঁচতে দাও। সব নিয়েছ। রমা গেল—স্বামী—। ওঃ, আশ্চর্য এই লোকটি! আত্মহত্যাই করে থাক আর নিরুদ্দেশ হয়েই নিষ্কৃতি নিয়ে থাক—সে আশ্চর্য মানুষ। একবার তাঁর কথা ভাবলে না—একবার উমার কথা ভাবলে না—নিজেকে সে হারিয়ে দিল কেন?

এ কথাটি ভাবতে ভাবতে তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন। কতদিন কতরাত্রি তিনি এই কথা ভেবেছেন। ভাবতে ভাবতে মন যেন দিশাহীন এক প্রান্তরে এসে হারিয়ে গেছে। দিগন্তে শুধু মাটি আর আকাশের একটি রেখা—তাও কুয়াশায় বা ধুলোর ধূসরতায় বিলুপ্ত। নিরুদ্দেশ সে হয়নি। নিরুদ্দেশ হয়ে সে করতে পারত বা পারে কি? এক সেই ধনীপুত্র—যে রমার সর্বনাশ করেছে—তার উপর শোধ নিতে পারে। হয়তো খুন করতে পারে—খুন করে ফাঁসি যেতে পারে। হ্যাঁ, তাতে তৃপ্তি আছে। তার স্বামী যে মানুষ তার তাতে তৃপ্তি হতে পারে। জীবনে কারুর কোন অন্যায় সে সহ্য করে নি—কারুর অপমান সে ক্ষমা করে নি। যে হোক যত বড় হোক শোধ সে নিয়েছে। নিজের বাপের সঙ্গে কতবার সে তর্ক করেছে। নিষ্ঠুর তর্ক! বাপের কথা বলে সে স্বীকার করে নি। বাঙালীসমাজে হিন্দু-সমাজে যে সমালোচনা করেছে—যে আঘাত করেছে তার প্রতিফল উঁচু মাথায় সে ভোগ করেছে। সে নেই আজ—আজ তারা ভোগ করছে। শ্বশুর চিরকাল প্রগতিশীল হিন্দুদের ব্রাহ্মদের ঘরে পৌরোহিত্য করতেন—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী বলেছিল—আমি ওই দুটি ধর্মের কোন ধর্মেই বিশ্বাস করি না। যাতে বিশ্বাস করি না পয়সার জন্য পুরুত সেজে বসে মন্ত্র পড়াতে পারব না। মিশনারীদের ইস্কুলে চাকরি করত—তাদের বই অনুবাদ করত—সেই ছিল একমাত্র জীবিকা, তাও ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল—তোমাদের ফাদার বলা পাপ। তোমরা সাম্রাজ্যবাদীর গুপ্তচর। স্পাইজ! সে লোক যদি রমার সঙ্গে প্রতারণা করে যে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারলে তাকে খুন করবার সংকল্প নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আজ তা হলে সাধনা বলবে—তুমি যেন তা পার, তুমি যেন তা পার, তুমি যেন তা পার।

ট্রেনের গতি কমে আসছে।

আবার গাড়ি থামবে। এবার মোগলসরাই। কাশী! ওঃ, আগের কালে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিল কাশী। অন্নপূর্ণার রাজত্ব। ছত্রে ছত্রে অন্নপ্রসাদ পেত যে দাঁড়াত সে-ই। বাঙলা-দেশের সহায়সম্বলহীন বিধবায় কাশী ভরে গিয়েছিল। কোথাও যার আশ্রয় না মিলত তার আশ্রয় মিলত কাশীতে। কিন্তু সে দিনও আর নেই আর তারও উপায় নেই। সঙ্গে তাঁর পুলিসের লোক পাহারা চলেছে। মোগলসরাইয়ে গাড়ি দাঁড়াবে—সে তার গাড়ি থেকে নেমে তাদের গাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবে। দরজায় সে চাবি দিয়ে গেছে। তার পকেটে চাবি আছে। অন্য কোন যাত্রী যদি আসে তবে খুলে দেবে। গাড়ি থেমে আসছে। মোগলসরাই এল। সে লোকটি আসবে এবার। সাধনা ডাকলেন—উমা!

উমা উত্তর দিলে—উঁ!

ঘুমোয় নি উমা। ঘুম আসে নি। আসতে পারে না যে! এই পাপ রাজত্বে, এই অত্যাচারের রাজত্বে কত কত লোক—কত অসহায় স্ত্রী কন্যা জেগে আছে—ভগবান তুমি নিজে গুনে গুনে দেখ। অন্ধ ভগবান বধির ভগবান—পঙ্গু অসাড় ভগবান!

—মা!

—হ্যাঁ।

—কিছু বলছ ?

—চুপ করে শুয়ে থাকবি। সাড়া দিবি নে কিছুতেই।

ওদিকে ক'জন যাত্রী উঠে বসেছে। তারা বোধ হয় নামবে। জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।

গাড়ি দাঁড়াল। মোগলসরাই। মোগলসরাই !

দেহাতী মেয়ে কটি দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। এ—মা ! এ—বাপু ! ইয়ে বন্ধ কর দিয়া। হে ভগবান ! গার্ট সাব—গার্ট সাব। মাস্টার সাব—

—আরে মাত চিল্লাও ! ইয়ে লেও ! উত্‌রো !

—এ লছমী—এ বেটী—উত্‌রো—তুম পহেলে উত্‌রো। বেটী—

—লোটা—মাইয়া—লোটা কাঁহা—

—হামারা পাশ। উত্‌রো ! উত্‌রো !

—মিসেস ভট্টাচারিয়া ! সেই লোকটি।

চুপ করে পড়ে রইলেন। আবার সে ডাকলে—মিস্‌ ভট্টাচারিয়া !

সাধনা মাথাটা তুললেন—হাঁ জী !

—চা পিয়েগী ?

—বহুত মেহেরবাণী আপকে ! নেহি। নেহি পিয়েঙ্গে !

—আচ্ছা। নিদ্‌ যাইয়ে।

নিদ্‌ যাইয়ে ! নিদ্রা চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে ! ঘুমোনো ! হায়— ! কিন্তু ওই বা কি করবে ? ওর কি অপরাধ ? চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই পথ নেই। অনিবার্য পরিণাম নির্ধারণ করবার হাত ভগবানেরও নেই—সে হাত অত্যাচারী রাজ-শক্তির। মানুষের। ভগবান মৃত ! পরিত্রাণের হাত তারই আছে যার হাতে শক্তি আছে। শক্তিশালী হাত যে এই অত্যাচার যন্ত্রের চাকা বিকল করে দিতে পেরেছে জীবন-পণে—সেই পেরেছে। তিনি দুর্বল স্ত্রীলোক—তাঁর হাতে শক্তি নেই—তিনি— ।

বুকের ভিতরটা ক্ষোভে মোচড় দিয়ে উঠল। গাড়ির হুইসিল পড়ল। গাড়ি নড়ল। চলল। সে লোকটির সাড়া পাওয়া গেল না। সে আগেই চলে গেছে। গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়ল। সাধনা উঠে বসলেন। ওঃ, কোন পথ নেই নিষ্কৃতির। কোন পথ নেই !

গাড়ির চাকায় সেই শব্দ উঠছে—কোন পথ নেই। কোন পথ নেই। কোন পথ নেই। কোন পথ নেই ! কোন পথ নেই !

কোনক্রমে যদি নেমে পড়তে পারেন ? এই অন্ধকারের মধ্যে উমার হাত ধরে—ওই লোক-টার দৃষ্টি এড়িয়ে এত বড় দেশের কোন এক কোণে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন না ? পারা যাবে না ? যাবে। নিশ্চয় যাবে। কিন্তু ওই লোকটি !

পথে গাড়ির চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে— । তাতে লোকটা জেগে উঠে ছুটে আসবে। গার্ড আসবে, খুঁজবে কোন্‌ গাড়ি থেকে চেন টেনেছে। ট্রেন পুলের উপর উঠেছে। ঝম ঝম ঝম— । শোন ব্রিজ।

—উমা !

—উঁ।

—ওঠ—শোন ব্রিজ পার হচ্ছি।

উমা উঠল না।

—ঘুমুস নি !

গাড়ি এসে ডেহরী অন শোনে দাঁড়াল। মস্ত কারখানার জায়গা। হঠাৎ মনে হল লোকটা

এখ্‌নি আসবে। এসে দেখবে জেগে রয়েছেন তিনি। দেখ্‌ক। একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠল তাঁর মনের মধ্যে। থাকুক, জেগে থাকুক সমস্ত রাত্রি। কাটুক, উৎকণ্ঠায় কাটুক রাত্রি। মাইনে খায়, পাহারা দেবার জন্যে এসেছে—দিক, পাহারা দিক সারারাত জেগে। নাঃ! তিনি আবার শ্‌য়ে পড়লেন। ট্রেন ছাড়ল। লোকটা এসে এবার আর ডাকলে না। উঁকি মেরে দেখে চলে গেল।

এরপর তিনিও ঘ্‌মিয়ে গেলেন। কতক্ষণ ঘ্‌মিয়েছিলেন তিনি জানে না। হঠাৎ ঘ্‌ম ভেঙে গেল। গাড়ির ভিতরটায় সমস্ত লোক অঘোরে ঘ্‌মুচ্ছে। তিনি যেন চমকে জেগে উঠেছেন। কে যেন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। তাঁর নিজের অন্তরের অন্তর জাগিয়ে দিয়েছে।

গাড়ি ছ্‌টছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। দ্‌দিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে তারাগ্‌লি ঝিকমিক করছে। গাড়ি ছ্‌টছে। উমা ঘ্‌মুচ্ছে।

গাড়িটা হঠাৎ হ্‌ইসিল দিলে। গতি মন্থর হয়ে আসছে যেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হঠাৎ তাঁর মনের ভিতরটায় যেন কেমন এক উন্মাদ কামনা জেগে উঠল। তাঁর কাছে চাবি আছে গাড়ির। নলিনীদি দিয়েছিলেন। গাড়ির দরজা খ্‌লে এই চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই নিষ্কৃতি। উমা নিরাপদ। তার কোন ক্ষতি হবে না। সে ফিরে যেতে পারবে—কোন রকমে ফিরে যাবে নলিনীদির কাছে।

সেই ভাল—। তিনি উঠে এসে জানালার ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজার চাবি খ্‌লে ফেললেন। ঠিক সেই ম্‌হ্‌র্তেই ব্রেক কষে গাড়িটা থেমে গেল। জানালা দিয়ে ম্‌খ বাড়িয়ে তিনি দেখলেন সামনে সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে। দরজাটা একবার খ্‌লে সন্তর্পণে ম্‌খ বাড়ালেন। না—লোকটা ম্‌খ বাড়ায় নি।

নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মনের ভিতর থেকে কে বলে উঠল—এই লগ্ন। পালাও! কেউ জেগে নেই। এই লগ্ন। পিছন থেকে উমা ডাকলে—মা! কি করছো? সে ছ্‌টে এল।

—চুপ কর। শোন। নেমে পড়ব এখানে। ব্‌ঝেছিস! চুপ করে চলে আয় আস্তে আস্তে। সিগন্যাল থাকতে থাকতে নামতে হবে। আমি আগে নামি। যেন পড়িস নে। পড়ে গেলেও চেঁচাস নে। নেমেই ঐ পাশের ঝোপে—ওরই মধ্যে, ব্‌ঝলি? ওরই মধ্যে। থাক জিনিসপত্র পড়ে থাক। শ্‌ধ্‌ ছোট স্‌টকেসটা। হ্যাঁ। আয়। দাঁড়া আগে আমি নামি। নীচে থেকে তোকে ধরব। ব্‌ঝলি! নামবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিবি। হ্যাঁ। নাম—নাম! এই ঝোপে। হ্যাঁ। চুপ—কোন ভয় নেই। ওই সিগন্যাল পড়ছে। পড়ল। ওই হ্‌ইসিল বাজছে। গাড়ি চলছে।—যাক চলে গেল।

—চল এবার লাইন ধরে চল্‌, যেখানে হোক। চল্‌।

—ওগ্‌লো কি মা?—ওই বড় বড়! মাথায় আগ্‌ন জ্বলছে।

—ওগ্‌লো?

অতিকায় কোন দৈত্যের সবল বাহ্‌ ঊর্ধ্বলোকে উদ্ধত ভঙ্গিতে উদ্যত হয়ে রয়েছে—তার সেই উদ্যত উদ্ধত হাতে আগ্‌নের পাত্র। ধকধক করে আগ্‌ন জ্বলছে।

—ওগ্‌লো চিমনি বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চিমনি।

—এ কোথায় এলাম মা? এত চিমনি!

—যেখানে হোক উমা—এখানে এখন প্‌লিস নেই। চল্‌—খ্‌ঁজে নেব। খ্‌ঁজে নেব জায়গা। দরকার হলে—প্‌থিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত। সেখানেও যদি প্‌লিস আসে তখন সেখান থেকে—আজ যেমন ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিলাম—সেই রকম করে ঝাঁপ দেব। সাহস কর।

ধানবাদ অঞ্চল। ধানবাদের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের আগে ট্রেনখানা সিগন্যাল না পেয়ে

দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনখানা চলে যেতেই সাধনা মেয়ের হাত ধরে চারিদিক দাঁড়িয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন কলিয়ারীর চিমনিগুলো। সব কলিয়ারীতে চিমনি নেই, সেখানে বয়লারের মাথায় খাটো লোহার চিমনির মুখে আগুনের শিখা ওঠে। অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে আসছে, রাত্রি-শেষের বিলম্ব নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাধনা দেবী অনুমান করতে পারলেন ওগুলি চিমনি এবং অঞ্চলটি শিল্পাঞ্চল। বাল্যকাল তাঁর কেটেছে কানপুরে—তিনি ফ্যাক্টরীর চিমনি চেনেন—বিশেষ করে তার মাথায় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী মুহূর্তে তার সত্য পরিচয় বলে দেয়। কিন্তু আর দাঁড়াবার সময় নেই—অল্পক্ষণ পরেই আলো ফুটবে—ট্রেনে তাঁর ওয়াচারের ঘুম ভাঙবে; এবং তাঁকে দেখতে এসে না পেয়ে মুহূর্তে শোরগোল তুলবে। তারে বার্তা ছড়িয়ে পড়বে; স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ হবে; পুলিস ছুটবে। সুতরাং সময় নেই।

—চল উমা—এগিয়ে চল তাড়াতাড়ি রে—তাড়াতাড়ি।

—কোথায় যাবে মা? এ কোথায় পথের মাঝখানে নামলে?

—ভয় করিস নে—আমি সঙ্গে রয়েছি। কোথায় নেমেছি জানি না। কোথায় যাব জানি না। কিন্তু এখানে এই সুযোগে না নামলে ওদের হাত থেকে কখনও রেহাই পেতাম না। আয়। তাড়াতাড়ি।

সামনে রেললাইনের উপর ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে; আরও দূরে সামনে অনেক রক্তাভ বিন্দু। মেলখানা বিসর্পিত গতিতে চলে যাচ্ছে—সামনে স্টেশনে ঢুকতে চলেছে—পিছনে ধোঁয়ার একটা লম্বা রেশ শূন্যমণ্ডলে ভেসে রয়েছে। রেললাইনকে পিছনে রেখে তাঁরা সামনে চলতে লাগলেন। পলাশের পাতলা বন, খোয়াইবহুল ভূমিপৃষ্ঠ,—তারই মধ্য দিয়ে চলতে লাগলেন তাঁরা। সামনে তখনও অন্ধকার। বার দুই উমা পা-হড়কে পড়ে গেল। হাঁটুর কাছে খানিকটা ছড়েও গেল। তবু তারই মধ্যে তাঁরা চলতে লাগলেন। না চলে উপায় নেই। তাঁরা পলাতক। বাঘের ভয়ে হরিণ যেমন পালায় ঠিক তেমনি করেই তাঁরা পালাচ্ছেন।

কিছু দূরে এসে একটা রাস্তা—পাকা রাস্তা তাঁরা পেলেন। সেই পথ ধরে চলতে চলতে তাঁরা পেলেন আর একটা বড় রাস্তা। দুটো রাস্তার সংযোগস্থলে কাঠের খুঁটিতে লাগানো ছোট ছোট কাঠের ফলকে লেখা বিভিন্ন স্থানের নাম। ধানবাদ হাজারীবাগ—আরও অনেক নাম।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ভোর তখনও হয় নি কিন্তু তখনই অসংখ্য লরী চলেছে। জায়গাটার নাম গোবিন্দপুর।

ছোট একটি বাজার। দু'তিনটে পেট্রোল পাম্প। অল্প কয়েকটি দোকান।

সাধনা মেয়েকে বললেন—দাঁড়া। এইবার কোথায় যাব, ভেবে নিই।

পরক্ষণেই একখানা মোটরকার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ধানবাদের রাস্তায় মোড় ফিরল। এবং আরোহীদের যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি ওঁদের দিকে তাকালেন। কিছু দূর গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল। এবং চালক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওঁদের দেখতে চেষ্টা করলেন। সাধনা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন সেই মুহূর্তেই যে মুহূর্তে পাশ দিয়ে যাবার সময় চালক তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। গাড়িটা কিছুটা গিয়ে থামতেই তিনি মেয়ের হাত ধরে সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন। আর কোন উপায় নেই। কোন উপায় নেই। তবু চল উমা, তবু চল—পশুর মত ধরা দেব না। আয়। পিছনের দিকে তাকাস নে।

হয়তো বারণ না করলে উমা তাকাতো না পিছন ফিরে; বারণ করা মাত্র উমা সম্ভবতঃ নিজের অজ্ঞাতসারেই তাকালে এবং সভয়ে বলে উঠল—ওরা নেমেছে মা গাড়ি থেকে।

মুহূর্তে মাথার গোলমাল হয়ে গেল সাধনার। কি করবেন তিনি? হে ভগবান! তোমার এই রাজ্যে অকারণ অত্যাচার থেকে কি পরিত্রাণ নেই? নিস্তার নেই? তোমার রাজ্যে তোমার দয়া তোমার অনুগ্রহ সবই কি শক্তিমান বলদর্পীর উপর ঢেলে দিয়েছ তুমি?

এলোমেলো ভাবে নানান চিন্তা একের পর এক মাথার মধ্যে খেলে গেল। এক মুহূর্তে সহস্র চিন্তা। এত দ্রুত বোধ হয় বিদ্যুৎচমকও পরের পর খেলে যায় না। এর পরই মনে হল—কেন? কেন সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল? না নামলে কি হত? তারা তো তাঁকে শুধু অনুসরণ করে চোখে চোখেই রেখেছিল; অপরাধ তো পায় নি এ পর্যন্ত। সুতরাং কি করত —যা করেছে করে এসেছে এই মাস দুয়েক—তার বেশী? কিন্তু এবার? কিন্তু এবার যে তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে—বলবে অপরাধ যদি নেই তবে পালিয়েছিলে কেন? কেন? কেন? কেন? সহস্র লক্ষ কেন যেন কানের পাশে বেজে উঠল—চোখের দৃষ্টির সামনে সারিবন্ধ হয়ে ভেসে চলে যেতে লাগল। কেন? কেন? কেন? কেন? কোথায় পরিত্রাণ?

সামনে পথ। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড। বাঁদিকে অসমতল পাথুরে প্রান্তর—পলাশ গাছ এবং গুল্মে আচ্ছন্ন। কোন্ দিকে যাবেন? একেবারে সকল বুদ্ধি এবং সকল জ্ঞান যেন তাঁর বিলুপ্ত হয়ে গেল! তিনি ছুটলেন সামনের দিকে।

ওদিক থেকে একটু দূরে অবশ্য গর্জন করে একখানা লরী ছুটে আসছে—আরও একটু পিছনে দুখানা মোটর; লরীর হেডলাইট জ্বলছে এখনও; এখনও লোকজন বিশেষ জাগে নি; যারা জেগেছে তারাও বাইরে আসে নি। শুধু একজন দেশোয়ালী ব্যবসাদার তার দোকানের সামনে একখানা পাথরের উপর বসে সশব্দে সাড়ম্বরে ওয়াক ওয়াক শব্দ করে মুখ ধুচ্ছে। একটি মেয়ে গদির সামনেটা ঝাঁট দিচ্ছে। আরও খানিকটা ওপাশে জনচারেক মজুর রাস্তার পাশ ধরে ঝুড়ি গাঁইতি নিয়ে এই পথেই চলে আসছে। হাঁ—হাঁ করে উঠল। গেল—গেল! পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল ওই গাড়ির আরোহীরা—হাঁ—হাঁ—হাঁ! উমা চীৎকার করে কেঁদে উঠল—মা!

লরীতে চাপা পড়বেন সাধনা। উন্মাদিনীর মত ছুটছেন। ঠিক সেই বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের মত—এসে পড়েছে পাহাড়ের কিনারায়—সামনেটা সব শূন্যমণ্ডল—নীচে অনেক নীচে জমি; পিছনে বাঘের হুংকার শোনা যাচ্ছে; হরিণ আতংকে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে ঝাঁপ দিল। হয়তো ভাবল—বাঘের দাঁতের এবং নখের যন্ত্রণা থেকে নীচে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা অনেক কম। সেখানেও মৃত্যু আছে কিন্তু মৃতদেহটা সেখানে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে না—ওই ভয়ংকর দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ওই নিষ্ঠুর ধারালো নখে ছিঁড়ে। সে ভয়ংকরতম ভীষণতম যন্ত্রণার আতংক! সে আতংকের কাছে লরীর আঘাতে চাকার পেষণে পিষে মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়ার আতংকটাও কিছু নয়। তা ছাড়াও বোধ করি প্রত্যাশা থাকে—বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু তা হল না—লরীতে চাপা পড়ার আগেই রাস্তার উঠে-পড়া পাথরের টুকরোয় হুঁচোট খেয়ে তিনি উপুড় হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। ওপাশ ঘেঁষে লরীটা সশব্দে বেরিয়ে গেল। ঐদিক থেকে একখানা মোটরকার এসে একটু আগে ব্রেক কষে দাঁড়াল। উমা ছুটে এসে মায়ের পিঠের উপর হাত রেখে আর্তকণ্ঠে ডাকলে—মা—মা—মাগো! কিন্তু সাধনা তখন অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

দেশোয়ালীটি মুখ ধোয়া রেখে যথাসাধ্য দ্রুতপদে এসে কাছে দাঁড়াল।—কি হইয়েসে খোকী? এইসা—পাগলের মতুন ছুটে আসে? হায় রাম রাম!

—ওই ওরা—ওরা ধরতে আসছে। উমা পিছনের দিকে তাকালে। গাড়িটার আরোহীরা এগিয়ে আসছিল।

দেশোয়ালী লোকটি তাদের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললে—কি মশা—আপনাকে

তো হামি চিনছে। কাতরাসের দিকে থাকেন। হাঁ—আওরৎ লিয়ে আপনার বহুৎ নাম ডাক ভি আছে। কলকাত্তা থেকে খানকী নিয়ে বহুৎ ফুর্তি করেন। শেষে পথে ভি আওরৎ পাকড়াতে শুরু করিয়েসেন ? আঁ ?

থমকে দাঁড়ালো গাড়ির আরোহীরা। একজন বললে - কি বলছেন এসব ? আমরা পথের ধারে এই ভোরবেলা ওদের দেখে—

—দেখে বাস্ রুখলেন গাড়ি—আউর পাকড়ে গাড়িমে পুরে নিয়ে যাবার মতলব করলেন ! জানি আপনাকে মশা—এই আপনি বাবুকে হামি চিনহে—পহছানে। যান—চলিয়ে যান —আভি যান—।

সে একটা আঙুল বাড়িয়ে সোজা পথ নির্দেশ করে দিলে। আবার বললে—নেহি তো হামি আভি আদমী বুলাবো। জলদি যাইয়ে। জলদি !

তারা এবার সত্যসত্যই গাড়িতে গিয়ে উঠল এবং গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে—শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার বলে চিৎকার করে গাল দিয়ে গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে ততক্ষণে সাধনা উঠে বসেছেন। তাঁর কপাল এবং ঠোঁট খানিকটা কেটে গেছে। রাস্তার উঠে যাওয়া খোয়ার উপর পড়ে নানান স্থানে আঘাত লেগেছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠেছে, রক্ত পড়ছে। হাঁটুর চাকীর উপরের চামড়াটা যেন উখো দিয়ে মেজে দিয়েছে—দগদগে রক্তাভ হয়ে রয়েছে। কাপড়খানা ছিঁড়ে গেছে দশ-বারো জায়গায়।

দেশোয়ালীটি বললে—কি মায়ী, উঠতে পারবে ?

সাধনা হাতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে পারলেন না, পড়ে গেলেন,—তাঁকে ধরল উমা।—আমাকে ধর মা। ওঠ, ওঠ।

দেশোয়ালীটি ডাকলে—এ এতোরিয়া ইধরে আও। জলদি করো !—এ—।

* * * *

ওই-দেশী ওই দোকানদারটির বাড়িতেই তারা তাঁকে প্রায় তুলেই নিয়ে গিয়েছিল। সাধনার এর পর আর না গিয়ে তো উপায় ছিল না ; চলবার বা ছুটে পালাবার শক্তি তো তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাঁটুটা এমন জখম হয়েছে যে নাড়তেও কষ্ট হচ্ছিল। এবং মনের মধ্যে ওই গাড়ির আরোহীদের তাঁদের দিকে তাকাতে দেখে এবং গাড়ি থামিয়ে নামতে দেখে যে আশংকা আকস্মিকভাবে জেগে উঠেছিল তাদের পুলিস ভেবে—সেটাও এখন চলে গেছে। ওরা পুলিস নয় ; ওরা কলিয়ারীর বাবু। ওরা মোটরে চড়ে দেশ চষে বেড়ায়।—আর অনেক অনাচার করে বিলাস ও ভোগের প্রবৃত্তিতে ; প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ওরা হয়তো পথের ধারে সাধনাকে শুধু মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে দেখে খারাপ মতলবেই দাঁড়িয়েছিল। দেশোয়ালীটিকে উমা বলেছিল—'ওরা ধরতে আসছে।' উমাও কথাটা বলেছিল ওদের পুলিস ভেবে।

দেশোয়ালী ব্যবসাদার মহাদেব সাউ ওই লোকগুলির চরিত্র জানত—সেই হিসেবের ছকে ফেলে 'ধরতে আসছে'র অন্য অর্থ করেছিল। তাদের হয়তো এ অভিপ্রায় ছিলই না। হয়তো এই ভোরবেলা জনমানবহীন পথের পাশে ভদ্রকন্যা বাঙালীবেশিনী সাধনা ও উমাকে দেখে বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করতে চেয়েছিল—'কে তোমরা ? এখানে কেন এমন ভাবে ?' সাধনা যদি এই ভাবে পড়ে না যেতেন, যদি তিনি সুটকেস হাতে উমাকে নিয়ে মহাদেব সাউয়ের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেন তবে সেও সবিস্ময়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতো তাঁদের দিকে ; ভাবতো—এঁরা হয়তো ঘর থেকে পালাচ্ছে। এ অঞ্চলে বাঙালীর অভাব নেই—অনেক বাঙালী। এককালে অঞ্চলটাই বাঙালীর হাতে ছিল - তারাই ছিল প্রধান। এখন এটা বেহার ; বাঙালীপ্রাধান্য খর্ব হয়েও যা আছে তা কম নয়। কিন্তু ওই লোক কটির 'ধরতে আসার' অভিযোগ অখণ্ড

সত্য বলে ধরে নেওয়ায় সাধনাদের সম্পর্কে কোন সন্দেহই আর মনের মধ্যে জাগল না। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সাধনাকে আশ্রয় দিলে—ক্ষতস্থানগুলি ধুইয়ে দিয়ে টিঞ্চার আইডিন লাগাবার ব্যবস্থা করলে। ডাক্তার ডাকতে সে চেয়েছিল কিন্তু সাধনা ডাকতে দেন নি।

এরই মধ্যে মধ্যে প্রশ্নও কিছু কিছু করলে কিন্তু সন্দেহবশে নয়—যেমন ভাবে মানুষ মানুষের সংবাদ এমন ক্ষেত্রে জানতে চায় তেমনিভাবেই প্রশ্ন করলে। এবং প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরও কয়েকটা যুগিয়ে দিলে।

—বাংলাদেশ থেকে আসছ মায়ী? বাঙালিনু?

—হ্যাঁ বাবা।

জিভের ডগায় হিন্দী এসেছিল কিন্তু আত্মগোপনের যে একটি প্রেরণা এমন ক্ষেত্রে মানুষের মনে দৈব প্রকৃতির স্বভাববশতঃ আপনাআপনি জাগে সেই প্রেরণাতেই তিনি হিন্দী বলেন নি। হিন্দীতে পারঙ্গমতা যে তাঁর অর্থাৎ কানপুরের মেয়ে এলাহাবাদের বধূ সাধনার নাকের উপর তিলের মত একটা বিশেষ পরিচয় সেটা তাঁর খেয়াল হয়েছিল। তিনি বাংলাতেই কথার জবাব দিয়েছিলেন—হ্যাঁ বাবা।

—কুথাকে যাবে? এহি ভোরমে ই রাস্তাপর ক্যায়সে আ গয়ি মায়ী? উ বাবুলোক কেয়া হিঁয়া গাড়িসে উতর দিয়া? না কেয়া? আঁ?

একটু চুপ করে রইলেন সাধনা—ভেবে নিতে চাইলেন। মহাদেব সাউ তার নিজের পথে ভাবছিল—সে বললে—এ বাত কাহে তুমি বললে না মায়ী? তব তো উ লোককো পাকড়কে থানামে দিতম। হায় রাম রাম! হে ভগবান! তুম আভি চলো থানামে ডাইরী লিখা দেও। হম তো আপনা আঁখসে দেখা উ লোককে। পহছানাতাভি—। চলো—

—না। আতঙ্ককে যথাসাধ্য সংযত করে সাধনা বললেন—না বাবা। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। ওদের গাড়ি থেকে আমাদের নামিয়ে দেয় নি। আমরা ওদিক থেকে আসছিলাম এই বড় রাস্তায়। বাবা আমার স্বামী নিরুদ্দেশ। আমি এই একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। অনেকে বলে তিনি এই অঞ্চলে আছেন।—

আর কথা তিনি খুঁজে পেলেন না, অভিনয় করে কাঁদতেও পারলেন না, চুপ করে গেলেন।

—আ! সীয়ারাম সীয়ারাম! তুমার স্বামী তুমাদিগে ছোড়কে—। আঃ, হায় হায়! আওর কৌন আছে মায়ী সনসারে?

—কেউ না।

এবার তাঁর চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল আপনা থেকে। সংসারে বোধ হয় আমার কেউ নেই—এই ভাবনার চেয়ে বেদনার্ত ভাবনা আর নেই।

মহাদেব সাউয়ের মনেও তার ছোঁয়াচ লাগল—এই ভাগ্যতাড়িত সদ্য আহত মেয়েটির চোখের জল তাকে অভিভূত করে দিলে। সে আর কথা বাড়িয়ে মেয়েটির দুঃখের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে চাইলে না। এককথায় বললে—তুমি এখুন থোড়া বিশ্রাম করো মায়ী। দু'চার রোজমে ই সব ভালা হোবে। তখুন হামি খোঁজ করিয়ে দিব তুমার স্বামীর। ইস জাগা তো ছোটা জাগা নেহী মায়ী! বহুৎ বড়া জাগা। বহুৎ কয়লাকোঠী। হিঁয়াসে কাতরাস ঝরিয়া—উধর জিনাগড়া পাথরডি। ধানবাদমে কেতনা বাঙালী। পান—সাত—দশ হাজার। তবে মিলে যাবে পতা। জরুর মিলে যাবে। হামি মহাদেব সাউ—হামার ভি বহুৎ খোঁজ আছে—বহুত জাগামে কারবার আছে। ঝরিয়ামে কাতরাসমে হামার স্টোরের কারবার কাপড়ার দুকান আছে। ইখানে থাকি। সবসে পহেলে এহি কারবার হামারা, হামি হিঁয়া থাকি। লেকিন সব জাগাকে পতা হামি লিতে পারে। হাঁ মায়ী—মহাদেব সাউ সো পারে। হামি জরুর তুমারা পতিকে পতা লাগায়ে দিবে। মৎ কাঁদো মায়ী। কাঁদো না।

মহাদেব সাউ পুরানো কালের বিচিত্র মানুষ। ব্যবসায়ে সফল কৃতী মানুষ—অনেক টাকার মালিক। ধার্মিক বলে তার নিজের অহংকার আছে। বুদ্ধিমান বলেও অহংকার করে। পুজো-অর্চনা করে, ভগবানের নাম করে, দানধ্যানও করে আবার ওই মোটরের আরোহীরা তাকে যা বলে গাল দিয়ে গেছে সে তাও বটে। সে পাকা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। ওই কার্যটি অর্থাৎ যাকে ব্ল্যাকমার্কেটিং বলে সেটি আজ বেআইনী হয়েছে বলেই সে ও নামটায় আপত্তি করে অন্যথায় সে ও নামে নিজেকে নিন্দিত মনে করত না। তার পুরানো কালের মন—তার যুক্তি হল—আমি টাকা দিয়ে মাল যখন কিনলাম তখন সে বস্তু আমার, সে আমি যে দামে খুশী বিক্রি করবার হকদার, লোকসান করে বিক্রি করতে পারি—আমি ও মাল দান করতে পারি—ইচ্ছে করলে দরিয়ার পানিমে ডাল দিতে পারি, আগুন লাগিয়ে ছাই করলেই বা কার কি বলবার আছে? এবং আমি যখন কিনে লাভ করবার জন্যই বিক্রি করব তখন কম লাভে কেন করব? যত পারি দাম চড়িয়েই বিক্রি করব। আমি কিনবার পর দাম পড়ে গেলে যখন লোকসান আমাকে খেতে হয় তখন লাভ করলে তোমার বলবার একতিয়ার কি? একালের যুক্তিতর্ক সে বোঝে না, বুঝতে চায় না। এই গত কয়েক বছরে যুদ্ধের বাজারে দেশব্যাপী যে দুর্ভিক্ষ মড়ক বাংলাদেশে হয়েছে—আজও যার জের চলেছে—তার আঁচ এ অঞ্চলেও এসেছে। লেগেছে। সাউ এ সময় দশ টাকা দরের জিনিস পনের বিশ টাকায় বিক্রি করেছে। চাল ডাল আহার্য বস্তু সিমেণ্ট লোহা নিয়ে তার কারবার। তাতে উপার্জন করেছে অনেক টাকা। আবার তার গ্রামে—সে গ্রাম এখান থেকে চল্লিশ মাইল—দেওঘরের দিকে; সেখানে সে ভাণ্ডারা খুলেছে—তার গ্রামের কোন মানুষকে সে অভুক্ত থাকতে দেয় না। মাথা পিছু আধসের চাল আর এক আনা পয়সা বরাদ্দ করে দিয়েছে। যতদিন এ হাহাকার চলবে ততদিন সে দেবে।

মদ্যপান সে করে না কিন্তু নিত্য সন্ধ্যায় এক লোটা সিদ্ধি পান করে পরমানন্দ উপভোগ করে। মাছ মাংস খায় না। প্রচুর দুগ্ধ পান করে। ব্যভিচারে তার প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ব্যভিচারীর উপর তার দুরন্ত ক্রোধ। নিজের বিবাহ তিনটি। একজন থাকে দেশের বাড়িতে, দুজন থাকে এখানে। সন্তানসন্ততি চৌদ্দটি। তার মধ্যে আটটি মেয়ে। ছেলেরা জন চারেক উপযুক্ত; বিবাহ হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে। তাদের জন্য সাউ এখন থেকে নানান স্থানে—দেওঘর গিরিডি ঝরিয়া কাতরাসগড় হাজারিবাগ—ব্যবসায় শুধু ফাঁদে নি ক্ষেতখামার বাড়িঘরও করেছে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের উপর কড়া শাসন। বিচিত্র মানুষ মহাদেব সাউ। বার দুয়েক ব্ল্যাকমার্কেটিংয়ে হাজার টাকা হিসেবে জরিমানা দিয়েছে। অবশ্য হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে দিয়েছে। তাতেও তার ধারণা কোন পাপ সে করে নি। মুখে বলে—হিঁয়া মানুষের আইনে তার হোক জরবানা—অক্ষয় স্বর্গে সে যাবেই। কোন পাপ সে করে নি।

দোকানের পিছনে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রামের পর সাধনাকে সাউ তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। পথে উমাকে সে বলে দিলে—উমা, খুব সাবধান—হিন্দীতে কথা যেন বলিস নে। খবরদার। হিন্দীর সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে—বাঙালীর মেয়ে এমন ভাল হিন্দী বলে কি করে? হয়তো আজকের মধ্যেই তাঁদের পালানোর খবর ছড়িয়ে যাবে। এ যুগে তারে খবর চলে—রেডিয়োতে খবর চলে। সে খবরের সঙ্গে সঙ্গে কে জানে হয়তো বলবে—এত টাকা পুরস্কার। তা ছাড়া তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার বিপদ আছে। ধরিয়ে দেওয়ায় সরকারী অনুগ্রহ প্রত্যাশা আছে। যে মানুষ এখনই ভাল সেই মানুষই কিছুক্ষণ পরেই নূতন ঘটনায় আর এক

মানুষ। এই সাউজী—ওই খবরের পর তাঁদের সেই পলাতক আসামী জেনে কি করবে কোন্ মূর্তি ধরবে কে জানে।

খবরদার উমা – হিন্দী বলিস নে। কোন রকমে যেন এলাহাবাদের সংস্রবের কোন আঁচ তারা না পায়।

মূল দোকানের এক কম্পাউন্ডেই সাউর ভিতর-বাড়ি। দোকানঘরের পাশাপাশি খান-কয়েক বড় বড় টিনের ঘর। তার মালের গুদাম, তারপর প্রায় বিঘেখানেক জমি নিয়ে তার খামার, একপাশে গোয়াল অন্যপাশে শস্যের গোলা ; খামারের মধ্যে খড় জমা করা আছে ; একদিকে কাঠ গাদা করা আছে—বড় বড় গুঁড়ি চেরাই করা নানান সাইজের কাঠ—তক্তা এবং শাল প্রপের একটা পাহাড়। তারপর ওদিকে তার ভিতর-বাড়ি। অধিকাংশই খাপরার চাল—মাটির দেওয়াল কোঠা। একখানা দোতলা বাড়ি। উঠান একদিকটা বাঁধানো একদিকটা কাঁচা নিকানো।

সাউ সাধনাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভিতর এসে ডাকলে—কই তোরা গেলি কোথায় ?

তোরা অর্থাৎ তার দুই স্ত্রী। দুজনেই বেরিয়ে এল – কি ?—কই ?—

বড় স্ত্রীটির বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, স্থূলকায়া, ধপধপে রঙ, ছোটটি নেহাতই তরুণী—বছর বাইশ চব্বিশ বয়স—ডাগর দুটি চোখ—কাঁচা কাঁচা রঙ—মুখে একটি মিষ্টি ভাব—দুটি পাতলা ঠোঁটে যেন কৌতুকহাস্য মাখানো। সে সেই কৌতুকহাস্যস্মিত মুখেই বেরিয়ে এসে সাধনাকে দেখে ফিক্ করে হেসে ফেললে।

সাউ ধমকে উঠল—আরে এতেও তোর হাসি ? কি বলব তোর হাসিকে ? বেচারী জখম মানুষ, এত দুঃখ পেয়েছে, তাকে দেখে তোর হাসিটা কিসের ?

বড় বউ বললে—ছাড়ো ছাড়ো ওকে ধমকায় না এমন করে চব্বিশ ঘণ্টা। হাসি হল ওর বেমার।

ছোট বউটি তার রঙীন ছিটের ওড়নাটা মুখের উপর টেনে দিলে—তাতে তার ঠোঁটের হাসি ঢাকা পড়ল কিন্তু প্রবল হাসির আক্ষেপে যে দেহস্পন্দন তা ঢাকা পড়বার কথা নয়, পড়লও না। এ কথায় মেয়েটির বেশী হাসি পেয়েছে।

বড় বউটি বললে—রামপিয়ারী দে দে কিছু পেতেটেতে তো দে বহেন। জলদি কর।

বউটি কাজ করতে পেয়ে বেঁচে গেল বোধ হয়। সে লঘু চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং একখানি চমৎকার শতরঞ্জ এনে বিছিয়ে দিলে।

বড় বউ সাউকে বললে—তুমি যাও। আমরা দুই বহেনে খুব যত্ন করব। তোমার অতিথ সেবার ধরমের এতটুকু খুঁত কি কখনও করেছি আমরা ?—যাও।

সাউ বললে—দেখো মায়ী, হামার বাড়িতে আমরা কেউ মছলি উছলি খাই না ; ঘরে ঢুকতে ভি দিই না। সে দিকে তোমাদের অসুবিস্তা হবে। কিন্তু তার তো উপায় নেই।

সাধনা বললেন—না বাবা, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। মাছ না হল তো কি হল ?

—হাঁ। ওই বাত বাংগালী সমঝে না মায়ী। মছলি খাকে কি হোবে ? দুধ পিনা—ঘিউ খানা—ক্ষীর খানা। হামার ঘরে মায়ী পচাশ গাইয়া আছে। হিঁয়া ইখানে দশঠো আছে। হামার গাঁওয়ে আছে চালিশঠো। হিঁয়া দুধ হোয় তেরা সের চৌদ্দা সের। গাঁওমে হোয় বিশ-পঁচিশ সের। হামার মায়ী ছিঁয়া ক্ষেতে গঁহু হোয়, বাহারমে পেশাইকে বনবস্ত হ্যায়—হাঁতসে আটা তৈয়ার হোয়। আঁখ ভি হোয় মায়ী। ক্ষেতমে সবজি হোতা হ্যায়। ব্যাস ঘরকে আটা—ঘরকে ঘিউ—ঘরকে সবজি -ঘরকে গুড়। সব হামারা ঘরকে হ্যায়। আনন্দমে রহো। যা বলবে তাই করে দেবে ওরা।

বড় বউ বললে—যাও যাও বাবু বাহার যাও। আমরা সব করে দেবে।

—হাঁ। সব করে দেবে।

সাউ চলে গেল। ছোট বউ হেসে গড়িয়ে পড়ল—সব হামারা ঘরকা হ্যায়। সব ঘরকা হ্যায়। ওতে যে হাসির কি আছে তা সেই জানে।

সাধনা ভাবছিল—এর পর? উমা চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল।

হাসির শব্দে সাধনার ঘুম ভেঙে গেল। সবিস্ময়ে তিনি একবার তাকালেন হেসে ভেঙে পড়া রামপিয়ারীর দিকে, একবার তাকালেন উমার বিবর্ণ মুখের দিকে। আবার তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—কি হল? কিন্তু রামপিয়ারীরও হাসি থামল না।—উমাও কথা বলতে পারলে না। সে যেন বোবা হয়ে গেল।

হয়তো হাসির জন্য এমন উদ্বেগের কারণ সচরাচর ক্ষেত্রে থাকে না, উমা বোকার মত কিছু করে ফেলে থাকলে রামপিয়ারীর হাসি স্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ তাঁরও চোখে পড়ে গেল উমার সামনে জানালার আলোয় একখানা খোলা বইয়ের মধ্যে দেবনাগরী অক্ষর সারিবন্দী ফুটে রয়েছে। এতটা দূরে থেকে পড়া যায় না – তবে হরফের গড়ন দেখে ধরা যায় অক্ষরগুলি হিন্দী! উদ্বেগ সাধনার সেখানে। তিনি উঠে বসলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন—উমা!

উমা শুধু মুখ তুলে তাকালে। ভীতার্ত মুখ। ঠোঁট দুটি কাঁপছে কিন্তু কথা বলতে পারছে না। সাধনা কিছুটা অনুমান করতে পারলেন কিন্তু সবটা নয়। ভেবে পেলেন না কি প্রশ্ন করবেন। রামপিয়ারীই তাঁকে হাসির মধ্যে বললে—আপনার মেয়ে হিন্দী কিতাব পড়ছিল —আমার ভাল লাগল আর খুব চমক লেগে গেল – বাঙালী মেয়ে হিন্দী পড়ে? তা আমি শুধালাম—বহেন, তুমি হিন্দী জান? পড়তে পার? তো আপনার বেটী বললে—হাঁ। না—। সে খুব চমকে উঠে বললে! তারপর বললে—তসবীর দেখছি।—

বলেই সে আবার হি-হি হেসে ভেঙে পড়ল।

সাধনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা হিমানীপ্রবাহ বয়ে গেল।

রামপিয়ারী বললে – হিন্দী জানে না, বলে তসবীর দেখছে। তসবীর।—হি-হি-হি-হি-হি-হি!

সাধনা স্তব্ধ হয়ে রামপিয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে তখন সেই দৃষ্টি ফুটে উঠেছে যে দৃষ্টি ঘরে বন্ধ হওয়া বেড়ালের চোখে ফুটে ওঠে। সাধনার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছিল। সে দৃষ্টি দেখে রামপিয়ারীর হাসি থেমে গেল—ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল; দু'পা এগিয়ে এসে সে প্রশ্ন করলে—তুমি রাগ করলে?

—না। আমরা তোমাদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছি রাগ করব কি করে? কিন্তু—।

—কি? বল।

—আমরা দুঃখী। বড় কষ্টে রয়েছি। এর মধ্যে হাসিতামাশা ঠিক ভাল লাগে না।

অপ্রস্তুত হল রামপিয়ারী। বললে – না না, তামাশা আমি করি নি। তবে হাসিটা আমার রোগ। না হেসে থাকতে পারি না। একটু মজা লাগল তো! হিন্দী বই পড়ছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—হিন্দী পড়তে পার? জান হিন্দী? ও প্রথমে বললে—হাঁ। তারপরই চমকে উঠে বললে—না। তারপর নিজেই কৈফিয়ৎ দিলে—তসবীর দেখছি।

সাধনা উদাসীনতার ভানে কথা না বাড়িয়ে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রামপিয়ারী বললে—আচ্ছা, আমি যাই। দরকার হলে ডেকো।

সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সাধনা তাকে ডাকলেন—শোন।

—কি?

—তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে আমাদের ওপর?

একটু হেসে রামপিয়ারী বললে—একটু হচ্ছে।

—কি ?

—তোমরা বললে—কোন গাঁ থেকে আসছ। কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে তোমরা নও। তোমরা শহরের মেয়ে। এমন কথা—এমন পরিষ্কার ঝরঝরে ঠিক গাঁয়ের মেয়ের হয় না।

সাধনা একটা কৈফিয়ৎ মনে মনে তৈরি করেও বলতে পারলেন না। মুখে আটকে গেল। আত্মরক্ষার জন্যে মিথ্যে আপনি মনের মধ্যে জেগে ওঠে কিন্তু বলতে গিয়েও মুখে আটকায়। বিশেষ করে যাদের মিথ্যা-বলার অভ্যাস থাকে না তাদের। রামপিয়ারী কয়েকটা মুহূর্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলে—তারপর সে চলে গেল। সাধনা একবার মুখ তুললে—বলতে গেল—দাঁড়াও। কিন্তু তাও পারলে না—আবার মুখ নামালে। থাক। সত্য কথা ওকে বলেই বা কি হবে ? থাক। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, মনে মনে স্থির করে ফেললেন তাঁর কর্মপন্থা। কাল সকালেই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন। সরাসরি যাবেন তিনি থানায়; সেখানে গিয়ে আনুপূর্বিক সত্য কথা বলে আত্মসমর্পণ করবেন। কি করতে পারে ? জেল-খানায় পুরবে ! নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দেবে ? দিক। এই চোরের মত—এই বাঘের ভয়ে পালানো জানোয়ারের ছোটার চেয়ে তা অনেক ভাল। অনেক ভাল।

উমা এতক্ষণে বললে—মা।

সাধনা হেসে বললেন—কাছে আয়। ভয় কি ?

—আমি কাগজখানা—

—জানি রে জানি। ও হয়ে যায়। সত্য যা তা কিছুতেই লুকোনো যায় না রে। ওর জন্যে ভাবিস নে তুই। আয় সরে আয়।

মেয়েকে বুকের কাছে নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।—নে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো। যা হবার হবে।

গভীর রাত্রি তখন।

উমা ঘুমিয়ে গেছে। সাধনার ঘুম আসছে আবার ভেঙে যাচ্ছে। বুকের ভিতরের উদ্বেগকেও আচ্ছন্ন করে যে ঘুমটি আসছিল সেটুকু কোন একটা শব্দে বা কোন একটি দুঃস্বপ্নে ভেঙে যাচ্ছিল। সমস্ত শরীর যেন ব্যথায় টনটন করছে—বোধ হয় একটু জ্বরও হয়েছে—আঘাতের তাড়সে।

হঠাৎ সাধনা জেগে উঠলেন। মনে হল দরজায় টোকা পড়ছে। কান পেতে তিনি শুনলেন। হ্যাঁ টোকাই বটে। ঘুমের ঘোরে ভ্রম নয়। তিনি মৃদুস্বরেই প্রশ্ন করলেন—কে ? তিনি জানতেন—এ কে ? তবু প্রশ্ন করলেন।

উত্তর এল—সেও মৃদুস্বরে—আমি ছোটবহু রামপিয়ারী। দরজা খোল।

সাধনা আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিয়ে বললেন—কি ?

—চল, বলছি।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে—তোমরা এলাহাবাদ থেকে আসছ ?

—কে বললে ?

—তোমার নাম সাধনা দেবী—মেয়ের নাম উমা। তা উমা বলেই ডাকছিলে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি ?

হেসে রামপিয়ারী বললে—কিছু নয় তাতে। কিন্তু কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ওই যে দয়াবান কীর্তিমান শেঠ দেখছ—যে ভোরবেলা বাঙালীবাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে তোমাদের জন্যে সে বলছে তোমাদের পুলিসের হাতে দিয়ে সরকারের কাছে খাতির বাড়াবে। আজ রাত্রি দশটায় ধানবাদ গিয়েছিল, সেখানে খবরটা শুনে এসেছে। আমাকে এসে জিজ্ঞাসা

করলে—ওই মেয়েটি কেমন আছে? তারপর জিজ্ঞাসা করলে—ওর মেয়েকে তো উমা বলে ডাকছিল! ওর নাম কি তবে সাধনা? ওরা জরুর এলাহাবাদ থেকে আসছে। ওরা পুলিসের ফেরারী আসামী। ট্রেনে যেতে যেতে পথে নেমে পড়েছে। কাল ভোররাতে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেন থেমেছিল—সেই ফাঁকে নেমে পড়েছে। টিশনে টিশনে তার ছুটেছে। সঙ্গের পুলিসের লোক ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আসানসোলে হোঁশ হয়েছে। বললে—ওরা ভারী মামলার আসামী। সুভাষ বোসজীর দলের লোক।

সাধনা পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—বা রামপিয়ারীর প্রতি কথায় একটু একটু করে শক্ত হচ্ছিলেন উত্তরোত্তর।

রামপিয়ারীও যেন সেই রামপিয়ারী নয়। এ যেন আর এক রামপিয়ারী, যেন খোলস ছেড়ে অকস্মাৎ গম্ভীর আসল জনটি বেরিয়ে এসেছে সে সব কথাতেই হাসে না, কান্নার কথায় কাঁদে—রাগের কথায় রাগে; দুঃখে ক্ষোভে অভিশাপ দেয়। সে বললে—সিদ্ধি খেয়ে সন্ধ্যেবেলা থেকে ভাম হয়ে থাকে, সিদ্ধির নেশায় পাপ হয় না—বলে ওতে বুদ্ধি বাড়ে, মদের বোতল ছুঁলে হাত ধোয়। কখনও ব্যভিচার করে না কিন্তু চারটে বিয়ে করে, হয়তো আট-দশ বছর পরে আবারও একটা করবে; হাসপাতাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, দেবতার মন্দির বানায়, আর ব্ল্যাকমার্কেটিং করে। গান্ধীজীকে ভক্তি করে, নেহেরু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে কপালে হাত ঠেকায়, সুভাষবাবুকে বলে—উ তো দেওতা আছে—সাক্ষাৎ অর্জুনজী কি লছমনজী আছেন, ভারতকি আজাদীর লিয়ে জনম নিলেন; নেহি তো এই আংরেজের এই কড়াক্কর পাহারা সিপাই সান্ত্রী সবকে ঘুম পাড়িয়ে চলে যেতে পারে! অথচ বলে—যখুন আজাদী হবে তখনকার বাত দুসরা। লেকিন যব তক আজাদী না আয়েগী তব তক আংরেজ রাজা হ্যায় সরকার হ্যায়—তার দুশমনি করলে তো শুধু বিপদ নয় অধরম আছে। উ হমি কি করে করব রামপিয়ারী।

সাধনার কানে কথাগুলো যাচ্ছিল কিন্তু অর্থবোধ ছিল না। যা বুঝবার তা তিনি বুঝেছেন, তিনি শুধু ভাবছেন কি করবেন। সেও নিরর্থক ভাবনা। সামনে চলার পথ অকস্মাৎ ফুরিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে নিরর্থক ভাবনার মত ভাবনা। পথ নেই, যাবার জায়গা নেই, মনশ্চক্ষুর সামনে একটা দিগন্তহীন শূন্য মণ্ডল।

রামপিয়ারী বলে গেল—চোর হলে ধরিয়ে দেয়, ডাকু খুনে হলে ধরিয়ে দেয় কিন্তু তুমি মেয়েছেলে—তুমি সুভাষচন্দ্রজীর দলের জন্য কাজ করেছ। আমি এ কালের মেয়ে—এ সব বুঝি জানি—তার উপর আমার গুরুজী—তিনি এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন—তিনি বাঙালী, তিনি এককালে আজাদীর জন্যে জেল খেটেছেন—তাঁর কাছে সুভাষচন্দ্রজীর কত কথা শুনেছি। তোমাকে ও ধরিয়ে দেবে—

সাধনা বাধা দিয়ে বললেন—না, তার আগে আমি নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দেব, বলব—পালাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পালাব কোথায়—কোন্ পথে? তাই নিজেই আমি ফিরে এসেছি।

—না। রামপিয়ারী বললে—না। তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—তুমি এখান থেকে চলে যাও বরাকর নয় তো গোমো; সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে চলে যাও।

—কোথায় যাব বলতে পার?

—যেখানে হোক। তুমি ওদের জান না।

হেসে সাধনা বললেন—জানি। হয়তো তোমার থেকে বেশীই জানি। আমাকে ওরা ধরেছিল—পুলিসের হাজতেও রেখেছিল, জেরাও অনেক করেছে। তারপর বাড়িতে আটকেও

রেখেছিল। আমি জানি। তা ছাড়া আমাকে ওরা কোন চার্জেও হয়তো ফেলতে পারবে না। তার কারণ ওরা আমাকে ছেড়েই দিয়েছে একরকম। তুমি ভেবো না। শুধু— ।

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন সাধনা। বলে কি হবে? কি ফল? কিন্তু রামপিয়ারী বললে—বল কি বলছ?

—বলছি ওই মেয়েটার কথা। ভাবনা তো ওই মেয়েটার জন্যে। তা নইলে আমার ভাবনা কি? ওর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত যদি হতাম—তা হলে—

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল সাধনার। সে মুহূর্তের জন্য, তারপরই অসহায় হতাশার একটুকরো ম্লান হাসির মধ্যে তা মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল আপনা থেকেই।

তারপর বললেন—আমার ভাগ্য যত খারাপ আমার মেয়েদের ভাগ্য তার থেকেও অনেক খারাপ। বড় মেয়ে—সোনার প্রতিমা—জীবন্ত পুড়ে—।

—পুড়ে? আতঙ্কে শিউরে উঠল রামপিয়ারী।—কি করে পুড়ল?

—নিজে মাথায় কেরোসিন ঢেলে—কাপড়ে নিজে হাতে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরেছে।

—ওঃ! কাতর আর্তনাদ করে উঠল রামপিয়ারী।—হে পরমেশ্বর!

ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজল উপরতলায়। রাত্রি দুটো। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির শব্দের ধ্বনির রেশ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। উপরতলা থেকে মহাদেব সাউ-এর সিদ্ধির নেশার ঘুমের নাকডাকার শব্দ উঠছে; ডেকেই চলেছে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রামপিয়ারী বললে—কেন সে এমন করে পুড়ে মরল?

—সে অনেক কথা। আমার দুর্ভাগ্য—সে তো দু'কথায় শেষ হবার নয়!

আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। রামপিয়ারীর মনে করুণাকাতর অনেক প্রশ্ন কিন্তু সে প্রশ্ন করতে পারছে না। সাধনার জীবনের সব শক্তি উদ্যম শেষ হয়ে গেছে—ক্লান্তিতে অবসাদে হতাশার অন্ধকারের মধ্যে তিনি স্তব্ধ। এই রাত্রির মতই স্তব্ধ।

হঠাৎ রামপিয়ারী স্তব্ধ সাধনার একখানা হাত টেনে নিলে এবং আবেগের চাপে মুঠোর মধ্যে ধরে বললে—তোমার এ মেয়ের ভার আমাকে দিতে পারবে? আমি যদি নিই?

—কি করে নেবে তুমি? তোমার স্বামীর কথা যা বললে আজ তাতে ভার নিলেও কি আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব? তুমিই বল!

—স্বামীর উপর ভরসা করে আমি ভার নিতাম না—নিতে চাইতাম না। আমার সেই গুরু আছেন—আমি তাঁর ভরসা করে বলছি। তুমি তাঁকে জান না, দেখ নি—দেখলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে। আমি বলছি তুমি নিশ্চিন্ত হও।

হঠাৎ সে বললে—যাও না, এই রাত্রেই গাড়ি ডেকে দিচ্ছি, চলে যাও তাঁর আশ্রমে। যাবে? তোমাদের দুজনেরই ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন এবং করবেন এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সাধনা চুপ করে রইলেন। ভাবতে লাগলেন।

রামপিয়ারী বললে—তিনি আজ সন্ন্যাসী হয়েছেন কিন্তু এককালে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন; তোমার জন্যে তিনি তাঁর প্রাণপণ করবেন।

সাধনা বললেন—না। পালিয়ে আমি আর বেড়াব না। আমার জীবনের কথা তুমি জান না। অনেক দুঃখ অনেক উদ্বেগ অনেক কষ্ট আমি সহ্য করেছি। আজ মনে হচ্ছে—আর পারছি না, আর পারব না। তোমাদের মিথ্যে ইতিহাস যা বলেছি তা থেকে সত্য অনেক করুণ অনেক দুঃখের। আমার স্বামী সত্যই নিরুদ্দেশ। হয়তো তিনি আত্মহত্যাই করেছেন—বেঁচে নেই। সাধারণ মানুষ তিনি ছিলেন না। অসাধারণ মানুষ। আদর্শবাদী

—জেদী, হার তিনি মানেনই না কারুর কাছে—সমাজের কাছে না, চাকরি জীবিকা—কিন্তু তার জন্যেও না, যাদের চাকরি করতেন তাদের কাছেও না। চাকরি করতেন কৃশ্চান মিশনারীদের। আমার শ্বশুরও তাদের চাকরি করতেন। ইস্কুলে পড়াতেন। আমার স্বামী প্রথম জীবনে কৃশ্চান মিশনারীদের দেবতার মত ভাবতেন। তাদের চাকরিই শুধু করতেন না, বাড়িতে নিজের জীবনে কৃশ্চানধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সেই আদর্শে আমার বড় মেয়ে রমাকে তৈরি করেছিলেন। রমা আমার যত বুদ্ধিমতী, পড়ায় ভাল তত ছিল সে সুন্দরী—

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। চুপ করে গেলেন সাধনা।

রামপিয়ারীও স্তব্ধ হয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। যেন তার জীবনের সঙ্গে মিলছে খানিকটা। তার বাবা এই ধরনের মানুষ ছিল প্রথমটা।

সাধনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হেসে বললেন—সেই মেয়ে আমার কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জেলে পুড়ে মরল বিয়ের দিন। যে পাত্র বিয়ে করব বলে বিয়ের দিন অস্বীকার করে পাঠালে, তার বদলে পাত্র জুটেছিল—কিন্তু—

রামপিয়ারী বল.ল—টাকার জন্যে তো? অনেক টাকা চাইলে—। না বুড়ো আদমী!

সাধনা উত্তর দিতে পারলেন না। কথাটা মুখে আটকে গেল। রামপিয়ারী বললে—তাই হয় এ দেশে। আমার দেখ না; বাপ নার্স বিয়ে করে কৃশ্চান হল, আমার হাল হল দেখ! ওই ভাঙখোর, টাকার কুমীর দয়া দেখিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে। তারপর—যে রক্ষক সেই ভক্ষক। তা আমি মরতে পারি নি। মনে হয়েছিল কিন্তু সাহসে কুলোয় নি।

সাধনা ঘাড় নাড়লেন—না। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—পাত্র জুটেছিল—দেবতার মত ছেলে। আগের পাত্র থেকে অনেক ভাল। টাকাও চায় নি। কিন্তু—।

—কি কিন্তু? তবে সে এমন করে মরল কেন?

—না মরে তার উপায় ছিল না—পথ ছিল না। আগের পাত্রের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকে মেলামেশা করত। তার ফল—; আমরা বুঝতে পারি নি তাদের মেলামেশা এতটা এগিয়েছে—তা—।

থেমে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন—তার গর্ভে তখন—

শিউরে উঠল রামপিয়ারী, বলে উঠল—হে ভগবান! হে সীতারাম!

* * *

ঢং ঢং করে দোতলায় ক্লক-ঘড়িতে বাজল চারটে।

সাধনা তাঁর কথা শেষ করেন—চারটে বাজল। আমি এবার উঠতে চাই। আমাকে একজন লোক দাও যে আমাকে বরাবর স্টেশনে বা থানায় নিয়ে যাবে। আমি আর পারছি না—পারব না। সেখানে গিয়ে আমি বলব—আমি নেমে পড়েছিলাম—এখন ফিরে এসেছি ধরা দেবার জন্যে—আমাকে ধর, যা করবার হয় কর। আমি পারছি না। সত্যের থেকে পথ নেই, সাহসের চেয়ে বল নেই—তাড়াখাওয়া কুকুরের মত শেয়ালের মত কি হবে বেঁচে? বড় যন্ত্রণা বড় উদ্বেগ বড় লজ্জা এতে। জীবনটাতে ঘেন্না ধরে গেছে।

—না। তুমি চলে যাও আমার গুরুর আশ্রমে।

—না। আর লুকিয়ে আমি থাকব না। শুধু ভাবছি—

রামপিয়ারী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সাধনা আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত উমাকে দেখিয়ে বললেন—ওই মেয়েটার কথা ভাবছি।

—ওর ভার আমার। কিছু ভেবো না তুমি। ওকে আমি আমার গুরুর আশ্রমে পাঠিয়ে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

—তুমি আমাকে খানিকটা কাগজ আর কলম দেবে ?

রামপিয়ারী বললে -চিঠি লিখবে ?

—হ্যাঁ।

রামপিয়ারী তাকে কাগজ কলম দোয়াত এনে দিল। বললে - তুমি লেখ। ওই বিছানায় রেখো। আমি পাঠিয়ে দেব। আমি উপরে যাচ্ছি। ওর ওঠবার সময় হল। বলে সে লঘু পদক্ষেপে চলে গেল। চিঠি লিখে শেষ করে তিনি উমাকে ডাকলেন—উমা ওঠ ! নে মুখ হাত ধুয়ে নে। আমরা চলে যাব।

বলতে বলতেই উপরে সাড়া উঠল —এ রামপিয়ারী ! এ ! কাঁহা গয়ি ? এ !

মহাদেব সাউ-এর কণ্ঠস্বর। মহাদেব সাউ উঠে পড়েছে।

—উমা !

—মা !

—দেরি করিস নে। জলদি কর। চলে যেতে হবে। থাক মুখ হাত ধোওয়া —।

সাউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সাধনারা বের হবার আগেই সে এসে দাঁড়াল। এবং সবিস্ময়ে বললে—সুটকেস লিয়ে কুথা যাবেন ?

—যাব থানায়। কিংবা স্টেশনে। কাল আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম। আমি—কাল স্টেশনের আগে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—সেখানে নেমে পড়েছিলাম। আমি পলিটিক্যাল সাসপেক্ট। আমার সঙ্গে পুলিস ছিল। তার চোখে ধুলো দিতেই নেমে পড়েছিলাম। পথে আপনার সঙ্গে ওই অ্যাকসিডেণ্টের মধ্যে দেখা হয়েছিল। সারা রাত্রি কাল ভেবেছি। ঘুম হয় নি। ভেবে দেখলাম—এই ভাবে লুকিয়ে কুকুর-শেয়ালের মত পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে ফিরে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেওয়াই ভাল। তাই যাচ্ছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর মার্জনাও চাচ্ছি—আপনাকে কাল মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ভাবি নি আমার জন্যে আপনি বিপন্ন হতে পারেন।

মহাদেব সাউ তার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বললে—আপনে তো বহুৎ সাংঘাতিক মেয়েছেলিয়া ! বাপরে বাপ !

—তার জন্যে আমাকে আপনি মাপ করবেন।

রামপিয়ারী নেমে এল। এবং বিস্ময়ের ভান করে বললে -ক্যা ? ক্যা হুয়া ? ক্যা ব্যাপার ?

মহাদেব সাউ বললে -হাঁ। আপনে হমাকে বহুৎ বিপদে ফেলিয়েসেন। হম লোক ব্যাওসাদার আদমী—উ সব পলিটিক্সকে বহুৎ ডর করি। কভি কভি চাঁদাউঁদা দেতা কংগিরিসকে ফাণ্ডমে লেকিন ইয়ে সব পলিটিক্সমে থাকে না। ডর করে। বহুৎ ডর করে।

—উপায় তো নেই ; ঠিক যে এটা আমিই করেছি তাও করি নি। ঘটনাচক্রে হয়ে গেল। আপনি নিজেই এগিয়ে এলেন। কাল সেই মোটরের বাঙালী বাবু দুটিকে আমি পুলিসই মনে করেছিলাম। তাই এমন করে ছুটেছিলাম। আর পড়ে গেলাম রাস্তায় হোঁচোট খেয়ে। আপনি এগিয়ে এলেন।

—চলেন, হমি ভি আপনে সাথমে যাই। আপনি বিলকুল সচসচ বাত বলবেন কি হমার ইসমে কুছ গলতি নেহি কসুর নেহি। আঁ ?

—নিশ্চয় বলব। চলুন আপনি সঙ্গে। শুধু একটি প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

—বোলেন।

—আমার এই মেয়ে, আমার যে অপরাধ থাক এ কিছু করে নি ; এর বিরুদ্ধে কোন চার্জও নেই। এলাহাবাদে যখন ওরা আমাকে অ্যারেস্ট করেছিল তখন ওকে আমার সঙ্গে

নিতে দেয় নি। ওকে আমাকে বাড়িতে ফেলে যেতে হয়েছিল। বাড়িতে পুরনো দাই ছিল আর একজন হিতৈষী আত্মীয় ছিলেন—তাঁরা দেখেছিলেন রেখেছিলেন। এখানে ওকে কে দেখবে? আমায় ওরা চালান দেবে। ওকে আপনারা দয়া করে আশ্রয় দেবেন। পাঠিয়ে দেবেন এলাহাবাদ। ওই বলে দেবে ঠিকানা।

উমা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নির্বাক—মুখে বাক্য অবশ্য ছিল না কিন্তু দু'চোখ থেকে জলের ধারার আর বিরাম ছিল না। নিঃশব্দে সে কেঁদেই চলেছিল। শুধু এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ—মাকে হারানোর ভয়ই নয়, মনে মনে আত্মগ্লানির পীড়নেরও অন্ত ছিল না। সেই এর জন্যে দায়ী। সে যদি হিন্দী বইখানা না পড়ত তবে তো এ বিপদ ঘটত না। তার ঘুমন্ত অবস্থায় যা ঘটে গেছে তা সে জানে না; তার ধারণা—ওই তার হিন্দী বই পড়া থেকেই ধরা পড়ে গেছে সব। সেই জন্যই এরা পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছে।

সাধনা মেয়েকে কাছে টেনে বললেন—কাঁদিস নে। কাঁদলে তো হবে না মা। চোখের জল মোছ। শক্ত হ। ভয় কি? আমি চাইব তোকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু যদি না নিতে দেয় কি করব? এঁরা লোক দেবেন তুই চলে যাবি। এই এঁদের ছোট বউ রামপিয়ারী—এ বড় ভাল মেয়ে। নিজের দিদির মত মনে করবি।

উমা বললে—না।

উমার ধারণা রামপিয়ারীই এ সবের জন্য দায়ী। সেই তো তার হিন্দী বই পড়া ধরে ফেলেছিল।

সাধনা বললে - না নয়। যা বললাম তাই করবি। এই চিঠিখানা রাখ - দিদিকে দিবি। তারপর সাউকে বললে—চলুন। আর দেরি করে লাভ নেই। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। তাতে ভাল হবে আপনার; অন্ততঃ প্রমাণ হবে যে, জেনেশুনে আপনি আশ্রয় দেন নি। আমি অকপটে সব খুলে বলব। চলুন।

বেরিয়েও কিন্তু বাধা পড়ল। বাধা দিলে সাহুজীর মেজবউটি। সে উঠে পড়েছিল—
—এদের সংসারে এইটি বিচিত্র এরা প্রচুর অর্থসম্পদ সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি বিশেষ আচরণ ত্যাগ করে নি। ভোরবেলা অনুদয়ে ওঠা—ভোরবেলা স্নান পুজো—তার সঙ্গে গঙ্গামাটি গোবর ব্যবহার; নিজের হাতে রান্না ইত্যাদি। মেজবউ উঠেছিল—সংসারে রামপিয়ারীকে সে স্বামীর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল—আপত্তি করে নি—কিন্তু সংসারের কর্ত্রীর অধিকার সে ছাড়ে নি। এবং এইখানে সে তার বিচিত্র ধর্মবোধের বিচারকে এমন বড় করে অমোঘ করে তুলত যে সে লঙ্ঘন করবার সাধ্য মহাদেবের হত না এখানে মেজবউয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিল তার শাশুড়ী। এবং এখানেই স্বামী ও সতীনকে সে পেত তার তাঁবের মধ্যে। আর তার বিশ্বাসও ছিল দৃঢ়। সব শুনে মেজবউ বললে - উঁহু! এবং উঁহুর ভঙ্গীতেই ঘাড় নাড়তে লাগল—উঁহু! উঁহু!

সাহুজী বিস্ফারিত চোখে অসহিষ্ণুর মত প্রশ্ন করলে—কি?

মেজবউ জানকী ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহু।

—কি উঁহু?

—এ তো তোমার ধরিয়ে দেওয়া হবে। আশ্রয় দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া জরুর অধরম। পাপ! ভারী পাপ! উঁহু!

—তবে? চিৎকার করে উঠল সাহুজী!—তবে কি ওদের ঘরে রেখে পুলিসের কাছে ধরা পড়ব? এই বুড়ো বয়েসে গিরিপ্তার হব? জেহেল যাব?

রামপিয়ারী চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল, এ বিচারের ক্ষেত্রে সে চুপচাপই থাকে। বাদ-প্রতিবাদ

উচিত-অনুচিতের এই বিচিত্র নির্ধারণ শুধু দেখেই যায়। কখনও কখনও কৌতুক করে দু'একটা কথা বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আজও এই কথাটি শুনবামাত্র তার কৌতুকবোধ জেগে উঠল—সে বললে—আ—হাঃ—ই বাত মাৎ বলো জী! নিজেকে বুড়ো বলছ তুমি—। বলো না। মিছে কথা। এই তো সেদিন নওজোয়ান সেজে আমাকে সাদী করলে! সাদী করবার সময় নওজোয়ান আর এই বেলায় তুমি বুড়ো সাজছ!

বলেই সেই হাসি! হেসে ভেঙে পড়ল সে।

অন্য দিন এমন ক্ষেত্রে জানকীবাঈও হাসে। আজ কিন্তু সে হাসলে না। বললে—হেসো না রামপিয়ারী, এ হাসির বাত নয়। ধরম-অধরমের বাত! তুমি এদের আশ্রয় দিলে কেন? উঁহু। আশ্রয় দিয়ে শেষে ভয়ে তুমি যাবে ওর সঙ্গে পুলিসের কাছে—উঁহু!

—আরে এ মায়ী তো নিজুসে যাচ্ছে—

—আরে ধরমবীর সাধুজী—সে যাচ্ছে তুমি উকে আশ্রয় দিতে আর চাচ্ছ না পারছ না বলে! তুমি যাবে আপনাকে জান বাঁচাবার লিয়ে!

—আওর—, রামপিয়ারী বললে—সরকারী খাতাতে ইনকা নামও লেখা যাবে কি বহুৎ রাজভক্ত প্রজা ফলানা সাহু!

—রামপিয়ারী!

—ভাল—দিদিজী তুমি বলো আমি মিথ্যে বলেছি কি না!

জানকীবাঈ বললে—হাঁ। রামপিয়ারী ঠিক বলেছে—ই বাত সচ বাত!

সাহু বসে পড়ল। বললে—তব, বাতাও! ক্যা করনা হ্যায়—বাতাও। তোমার বিচার শুনি!

সাধনা এবার এগিয়ে এসে বললেন—বেশ তো আমরা নিজে থেকেই চলে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে নিরাপদেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই তো আপনাদের আর দায় রইল না। আশ্রিত তো রইলাম না। এরপর আমরা যাই করি যেখানে যাই তাতে তো কোন অধর্ম আপনাদের হবে না!

জানকীবাঈ তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—হাঁ। ই বাত ঠিক হ্যায়। এরপর আর আমাদের দায় কিসের?

মহাদেব সাহু বললে—উসকে বাদ? আমাকে যখন পুলিস ডাকবে—পুছবে—আঁখ পাকায়কে—

জানকীবাঈ বললে—তখন তুমি বলবে এসেছিল—চলে গিয়েছে। বাস—আমার কসুর কি? থানাতে তুমি নিজে থেকে যাবে—সে হয় না। ওতে নিশ্চয় অধরম—নিশ্চয় পাপ! উঁহু!

সাধনা বললেন—তা হলে আমরা আসি!

জানকী বললে—হ্যাঁ এস। তোমার পথ তোমার, আমার ঘর থেকে তোমার পথে তুমি যাও। কসুর কিছু হয়ে থাকলে মাফি মাংছি।

রামপিয়ারী করুণ নেত্রে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকল। সাহুজী বসেই রইল দাওয়ার উপর একতাল মাংসপিণ্ডের মত।

জানকী বললে—শিউপুজন—একখানা সাইকেল-রিকশা বোলায় দে। জলদি!

* * * *

গোবিন্দপুর থেকে ধানবাদের পথ। সাইকেল-রিকশাখানা চলেছিল চড়াই উতরাই ভেঙে। এ পথে মিলিটারী লরীর ভিড় খুব নেই। কয়লার লরী—প্রাইভেট মোটর—জীপের ভিড়। তার সঙ্গে সাইকেল-রিকশা। খানিকটা রাস্তা—মাইল দুই-আড়াই নির্জন, দু'পাশে শুধু শাল আর পলাশের বন।

সাধনা রিকশায় বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। মনের মধ্যে অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। সাউয়ের বাড়ি থেকে সংকল্পের যে দৃঢ়তা নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন সে দৃঢ়তাকে ছাপিয়ে কেবলই মনে প্রশ্ন জাগছিল—নিরর্থক প্রশ্ন—কেন—কেন তিনি কাল হঠাৎ এমন করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন? কেন? তা হলে তো এমন হত না! তাঁর তো প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদই ছিল না। তাঁকে তো তারা নিরপরাধ ধারণা করেই বর্ধমান যেতে অনুমতি দিয়েছিল। শুধু লোক সঙ্গে এসেছিল দেখতে যে, তিনি বর্ধমানেই যাচ্ছেন কি না। তাও তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। উঠল—ঐ লোকটি প্রত্যেক স্টেশনে তাঁকে দেখছিল বলে। ওঃ, কি দুর্ভাগ্য তাঁর—কি গ্রহের ফের! গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালে। তিনি নেমে পড়লেন। এবার? এবার পুলিসের চোখে তো নিশ্চিতরূপে অপরাধী দাঁড়িয়ে গেলেন। শুধু পুলিসের চোখে কেন? যে শুনবে সে ই বলবে। প্রথম প্রশ্নই করবে—অপরাধ যদি নেই তোমার তবে তুমি এমন করে ট্রেন থেকে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওখানে সেই জঙ্গলের মধ্যে শেষরাত্রের অন্ধকারে নেমে পড়লে কেন?

তিনি কি উত্তর দেবেন? সত্য উত্তর?—ভয়? হ্যাঁ, ভয়।

তারা প্রশ্ন করবে—অবশ্যই করতে পারে—কিসের ভয়?

—পুলিসের!

—কি করছিল পুলিস? বল, কিছু করেছিল?

কি বলবেন? নাই! উত্তর নাই। নিরুত্তর থাকতে হবে তাঁকে! নিরুত্তর!

প্রশ্ন করবে—এখন সত্য কথা বল। কি জান—বল?

—আমি জানি না। কিছুই জানি না!

—জান! না জানলে—কিছু না করলে পালালে কেন?

—ভয়ে! পুলিস—

—কিসের ভয়? পুলিস তোমাকে কি করেছে? কিসের ভয়?

নিরুত্তর। আবার নিরুত্তর। উত্তর নাই! উত্তর নাই!

—বল, কি জান বল!

—আমি জানি না!

—তুমি জান!

—না।

—হ্যাঁ, তুমি জান! বল! নইলে তুমি পালালে কেন? বল—কেন পালালে!

বুকের ভিতরটা সাধনার ধড়ফড় করে উঠল। মনে হল কে যেন তাঁর গলাটা টিপে ধরেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। রিকশার উপর বসেই তিনি মাথা নেড়ে নিজের সর্বাঙ্গটা নেড়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

উমা বললে—মা! মা!

সাধনা বললেন,—থামাও। রোখো। রিকশা! রোখো!—

রিকশাওলা বিস্মিত হয়ে বললে—রুখবো?

—হাঁ হাঁ, রোখো। নাম উমা, নাম! নাও—তোমার ভাড়া নাও। এই নাও।

—এখানে জঙ্গল মাঈজী! এখানে কোথায় নামবে?

—এখানেই নামব। এখানেই। ফিরে যাব। যাব না!

—তবে চল ফিরে নিয়ে যাই।

—না—আমরা হেঁটে যাব। এখানে বসব একটু।

রিকশাওলা বিস্মিত হয়ে তার ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

উমা ডাকলে মা! মা! কোথায় যাব আমরা!

—আয়। পালাব। জঙ্গলে-জঙ্গলে। আয়।

খানিকটা হেঁটে গিয়ে পেলেন তাঁরা রেললাইন। এই লাইন ধরেই তাঁরা কাল এসেছিলেন। ওই দূরে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালটা দেখা যাচ্ছে।

উমা আবার তাঁকে প্রশ্ন করলে—কোথায় যাচ্ছি মা? মা!

থমকে দাঁড়ালেন সাধনা। তাই তো—কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় আশ্রয় ওদের নাগালের বাইরে? কোথায়? হে ভগবান! এদিকে কালকে আছাড় খেয়ে পায়ের আহত স্থানগুলি টনটন করছে—পা টাটিয়ে উঠেছে। দেহ টাটাচ্ছে। তবু যেতে হবে। হ্যাঁ, যেতে হবে। চল উমা—চল—কোথায় জানি নে—তবে চল।

কিন্তু এ কি করলেন তিনি? আবার ভুল করলেন? হ্যাঁ, ভুল। সেই ভুলের জের না-টেনে আর উপায় নেই—চল।

—মা—চল ফিরে চল মা!

—না। অধীর উন্মত্তের মত সাধনা বললেন—না।

দু বৎসর পর; ১৯৪৫ সাল নভেম্বর মাস। অজয় মুক্তি পেয়ে বর্ধমানে এসে নামল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। শীর্ণ শরীর। মুখে ক্লান্তির রেখা; বয়স মাত্র কুড়ি—কিন্তু মনে হচ্ছে এ যেন চল্লিশ বছরের কোন ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ। এ পৃথিবীকে যেন সে চিনতে পারছে না। বর্ধমান স্টেশনে নেমে সে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলে—'বর্ধমান', 'বর্ধমান'। বর্ধমান।

তাদের নায়েব তাকে আনতে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে সচেতন করে দিলেন—হ্যাঁ, বর্ধমান। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পেঁছুব গিয়ে। মোটরে যেতে কতক্ষণ লাগবে? ঘণ্টা তিনেক। চল।

অজয় চারিদিক চেয়ে দেখে বললে—মা আসেন নি?

নায়েব বললেন—না। তিনি আজ পুজো-অর্চনার ব্যবস্থা করেছেন—সে সব ছেড়ে আসবেন না—আমাকে বলে দিয়েছিলেন। আর শরীরটাও তো তাঁর ভাল যাচ্ছে না আজকাল।

—মায়ের শরীর—? ভুরু কুঁচকে অজয় ভাবলে।—মায়ের শরীর খারাপ? মা তো—! মা কি আমাকে লিখেছিলেন? মনে পড়ছে না তো!

এই দীর্ঘদিন বিভিন্ন বন্দীশালায় বন্দী থেকে তার এই অবস্থা হয়েছে, অনেক কথা ভুল হয়ে যায়। মাঝখানে এটা বেশী হয়েছিল—ডাক্তার আশঙ্কা করেছিলেন হয়তো সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাবে।

অজয়ের মনে অনুশোচনা এবং গ্লানির অন্ত ছিল না। তার কেবলই মনে হয়েছে—কিছু না করে শুধু বন্ধুদের কাছে মুখে আস্ফালন করে এ কি করলে সে! বন্ধুরা অবিশ্বাস করে নি—কারণ সে চট্টগ্রামে জন্মেছে; অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চট্টগ্রাম! তারা তাকে নেতা করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমর্থক দল গড়ে তুলেছিল। তারপর যা ঘটল তার উপর আর কারুর কোন হাত রইল না। তার জন্য মামাদের প্রতিবেশী ভট্টাচার্যদের বাড়ির মাসীমা—সাধনা মাসীমা একান্তভাবে অকারণে কি দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন ভাবতে গেলে তার মাথার মধ্যে যন্ত্রণার আর অন্ত থাকে না।

ওঁদের কথা মনে হলেই কয়েকটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

কনে-চন্দনপরা বধূসাজে সজ্জিতা একটি অপরূপা মেয়ের ছবি। তারপরই সে মেয়ের

সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে সেই ছবি। তারপর মনে পড়ে দাড়িগোঁফওলা সেই ক্ষ্যাপার মত মানুষটির ছবি। ছোট একটি কিশোরী মেয়ে এসে আংটি ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তারপর মনে পড়ে সেই রাত্রের ছবি। সাধনা দেবী তাকে বাঁচাবার জন্য সেই গুণ্ডাদের সামনে এসে তাকে আগলে দাঁড়ালেন।

তারপর সে শুনেছে সাধনাকেও পুলিস অ্যারেস্ট করেছিল। অকারণ! অকারণ নয়—কারণ সে নিজে। শুধু তার জন্য। গ্লানির আর শেষ থাকে না ভাবতে গেলে। বন্দীজীবনে চিঠিপত্র যা পেয়েছে—যা সে নিজে লিখেছে তার মধ্যেও এদের কথা থাকে নি—থাকতে পায় নি। তবুও যেটুকু খবর সকল কড়াকড়ির ফাঁক দিয়ে আসে যায় তার মধ্যে এদের খবর সে বার বার চেয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু যা পেয়েছে তা যত সংক্ষিপ্ত তত একঘেয়ে—একরকম। ভাল আছে। তারা ভালই আছে।

এসব খবর আসা-যাওয়া করত জেলের ডাক্তারের কল্যাণে। একবার সে তাঁকে বলেছিল—আপনি ভুনিদাকে বলে দেবেন যেন মাকে লিখে মিসেস ভট্টাচার্যদের মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। খবর এসেছিল—সে হবে। নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন। কিন্তু গত পরশু সকালে মুক্তি যখন সে পায়—মুক্তি পেয়েছিল এলাহাবাদেই, তখন ভুনিদা, মামীমা গিয়েছিলেন তাকে আনতে। তাঁদের সে জিজ্ঞাসা করেছিল সাধনা দেবীর কথা। তাঁরা বলেছেন—সঠিক জানি না তারা এখন কোথায়।

সে বিস্মিত হয়েছিল। মামীমা ভুনিদা তাঁদের খবর জানেন না! এর উত্তরে সে যে কি প্রশ্ন করবে ভেবে পায় নি। অবাক হয়ে তাঁদের মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই থেকেছিল।

মামীমা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন—সাধনাকে তো কিছুদিন পরই পুলিস ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর তার এখানে পাঠশালাটা উঠে গেল, ব্যাংকের কাছে বাড়ি মর্টগেজ ছিল; সাধনা কাউকে কিছু না বলে ব্যাংককে বাড়িখানা বিক্রি করে দিয়ে এলাহাবাদ থেকে চলে গেল। যাবার সময়ও কাউকে কিছু বলে নি। হঠাৎ চলে গেল। তারপর আর কোন খবর পাই নি।

অজয়ের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল।—এ ক্ষেত্রে তাদের যা করণীয় ছিল তা তার মা করলেন না কেন? মা তো তাঁদের আশ্রয় দিতে পারতেন! ব্যাংকের টাকাটা শোধ করতেও তো পারতেন! অন্ততঃ আশ্রয় দেবার কথা যেন জেলের মধ্যেও ডাক্তারের মারফৎ পেঁাচেছিল তার কানে!

সে বলেছিল—আমার সব কথা স্পষ্ট মনে থাকে না। ভুল হয়ে যায়। কিন্তু মা যেন তাঁদের শীতলহাটিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন!

—হ্যাঁ। চেয়েছিল—মনু বার বার অনুরোধ করেছিল। প্রথমটা সে যাব বলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায় নি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন মামীমা। তারপর আবার বলেছিলেন—মনু কোন ত্রুটি করে নি। দোষ তোদের দিক থেকে কেউ দিতে পারবে না। কিছু কথা সাধনা আমাকে বলে নি। সে কথা এক জানেন এখানকার মুখুজ্জে খুড়ো।

—মুখুজ্জে খুড়ো? ও—হ্যাঁ! জিজ্ঞাসা করেন নি তাঁকে?

—আমি একদিন গিয়েছিলাম। তিনি তো বিচিত্র মানুষ। বললেন—দেখ মা, কিছু কথা আমি জানি কিন্তু সে কথা বলতে আমি পারব না। হারানদা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন—এক শিবেন কি তার বংশের সন্তান ছাড়া এ কথা যেন কাউকে না বলি। আমি সাধনা বউমাকে বলেছি। শীতলহাটী যায় নি ভালই করেছে। কোথায় গেল তা আমাকেও বলে নি। তবে ভাবছ কেন, এত বড় পৃথিবী মা -যতক্ষণ মনে সাহস আছে আর মাথার উপর ধর্ম শুভবুদ্ধি আছে ততক্ষণ সে পথও করে নেবে, আর ঠাঁইও

তার মিলবে।

অজয় বলেছিল—আমি একবার তাঁর কাছে যাব!

—তিনি তো নেই! ছ মাস হল মারা গেছেন।

গভীর বেদনা নিয়েই সে ট্রেনে রওনা হয়েছিল। বেদনা ওই অসহায়া ভাগ্যহতা ভদ্রমহিলার জন্য। নিজের মূর্খতার জন্য সে দুঃখভোগ করেছে—তার জন্য অনুশোচনা বড় নয়; মনে মনে সান্ত্বনা সে খুঁজে পেয়েছে যে, কাজ সে হাতে কলমে করে নি বটে কিন্তু মুখে সে নেতাজীকে সমর্থন করে যে দুঃখ-বরণ করেছে তাতেই সে তাঁর প্রতি তার আনুগত্য প্রমাণ করেছে। তার মিথ্যা সত্যের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। একমাত্র গ্লানি তার মায়ের মনোকষ্টের জন্য। অ্যারেস্টের পর মা যখন তার সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি বলেছিলেন - কখনও যেন ভেঙে পড়িস নে অজয়, ওদের বণ্ড সই করিস নে। ওদের কথায় ভুলিস নে। কোন কেসে সাক্ষী দিস নে ওদের শিক্ষামত। আমার জন্যে ভাবিস নে। আমি ঠিক থাকব।

তবু অজয় জানে যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন। তাঁর বড় সাধ ছিল তাকে উকিল করে চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়া। সেটা হল না। কারণ তার কর্মচক্র তাকে যে পথে এনে দাঁড় করিয়েছে সে পথের সামনের দিকে চাইলে সে দেখতে পায় সে পথ আদালতে যায় নি। সে পথের দুই ধারে সামনে ইংরেজের পুলিস পল্টন বেয়নেট বন্দুক উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। সে সংগ্রাম আসন্ন।

ইংরেজ হারতে হারতে জিতে গেল।

গোটা ইওরোপ পদানত করে যুদ্ধ আফ্রিকায় বিস্তৃত করেও হিটলার হেরে গেল। এদিকে জাপানও হারল। এই দু' বছরে ঘটে গেল অনেক—এখনও অনেক কিছু ঘটবে। সে বুঝতে পারছে। জেলখানার ভিতরে থেকেও সে অনুভব করেছে উপলব্ধি করেছে ঘটবে অনেক কিছু। বিস্ফোরণের পূর্বেই উত্তাপ সে অনুভব করছে। সিঙ্গাপুর মালয় বর্মা হারিয়েও আবার ইংরেজ দখল করেছে—করুক। কোহিমাতে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজ হটেছে—নেতাজী আজ নিরুদ্দেশ—ইংরেজ তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করছে করুক। এ মিথ্যা। যুদ্ধ নূতন করে আরম্ভ হবে ভারতবর্ষের বুকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ আজও শেষ হয় নি। সবে শেষপর্বের প্রারম্ভ। সে জানে আরম্ভ হলেই নিরুদ্দেশ নেতাজী—যাঁর মৃত্যু ঘোষণা করে ইংরেজ ইচ্ছাপূরণের আনন্দ অনুভব করছে, ভারতবর্ষের উদ্যম ভেঙে দিতে চাচ্ছে—সেই মহানায়ক সেই চিরযৌবনের সেনাপতি আকাশ থেকে নেমে আসবেন; তাঁর প্লেন নামবে—তাঁর রেডিও থেকে ঘোষণা হবে—আমি এসেছি—আমি এসেছি—তোমরা রক্ত ঢালছ—আমি তোমাদের স্বাধীনতার সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিল্লীতে প্রবেশাধিকার দিতে এসেছি।

ওদিকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর নব অভিযানের জন্য আবার প্রস্তুত হচ্ছেন। গান্ধীজীর অহিংসায় তাঁর আন্দোলনে তার বিশ্বাস চিরদিনই কম। সে চট্টগ্রামের ছেলে। ভুনিদা দুনিদা মামীমার সঙ্গে তার বিশ্বাসের মিল নেই। ওতে কিছু হবে না। অন্ততঃ স্বাধীনতা আসবে না তা সে জানে। তবুও এতেও কিছুটা হবে বই কি। এবং তাঁর অহিংস আন্দোলনও দেখতে দেখতে সহিংস হয়ে উঠবে। সে সত্য তো বিয়াল্লিশের করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে আন্দোলনেই প্রমাণিত হয়েছে। একুশ দিন উপবাসে গান্ধীজী তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—সে তাঁর নিজের প্রায়শ্চিত্ত; দেশ জাতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ অতি ক্ষীণ। তার জীবনের পথের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্র, সে দেখতে পাচ্ছে। তার মাকে হয়তো—।

নায়েব বললেন—এস—আর দাঁড়িয়ে থেকো না। সাড়ে দশটা বাজে। বাড়ি পেঁছুতে তিন ঘণ্টা। দেড়টা দুটো। মা না খেয়ে বসে থাকবেন। এস।

—চলুন।

স্টেশনের বাইরে তারা বেরিয়ে এল।

—এই যে! নায়েববাবু! শীতলহাটীর একজন কর্মচারী একখানা পুরনো মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

গাড়িটা মহেন্দ্রবাবু উকিলের। যুদ্ধের কালে এ দেশের ট্যাক্সি যা ছিল—অন্ততঃ মফঃস্বলে যা ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। দু'চারখানা কোনমতে আছে। তাদের দশাও প্রায় অন্তিমদশা। বৃদ্ধ উকিল মহেন্দ্রবাবু নিজে থেকেই গাড়িটা দিয়েছেন।

—ওঠ। আর দেরি কর না।

* * *

অজয়ের মনে হচ্ছিল—কত কাল পর, যেন একটা যুগ বা তারও বেশী পর সে ফিরে এসেছে। দীর্ঘকাল পর দেখছে এই মাঠঘাট—এই গ্রাম—খড়ে-ছাওয়া বাড়ি—এই পারি-পার্শ্বিক। কি আশ্চর্য মমতা মানুষের আপন মাটির জন্য। আপন ঘরের জন্য।

কার্তিক মাসের শেষ, দু'পাশের শস্যক্ষেত্রে ফসল হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মধ্যে মধ্যে দু'চারখানা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা কোন কালে পাকা ছিল—এখন ভেঙেচুরে খানাখন্দকে বন্ধুর এবং রাশি রাশি ধুলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ এরই মধ্যে ধুলোয় ভরে উঠেছে। কোনমতে গাড়িখানা কখনও দশ মাইল কখনও পাঁচ মাইল স্পীডে ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে। চারিপাশ দেখতে দেখতে মনটা প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। কখনও কোন গ্রামের কোন মন্দির বা পাকা বাড়ি দেখলেই সচেতন হয়ে উঠছে মন—শীতলহাটী কতদূর? না—এ তো শীতলহাটী নয়। শীতলহাটী এলেই অনেক দূর থেকে প্রথমেই দেখা যাবে তাদের ইস্কুল-বাড়ি। লম্বা এলু শেপের রানীগঞ্জ টাইলে ছাওয়া বারান্দাওয়ালা স্কুলবাড়ি। তার পর আমবাগান। আমবাগানের মাথার উপর দেখা যায় কালীমায়ের মন্দির আর তাদের দোতলার ছাদের উপরের চিলেকোঠা।

বাড়ির দরজায় মা দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্চয় এই দু'বছরে তাঁর শরীর অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। ক্লান্তির ছাপ পড়েছে তাঁর সেই সুন্দর মুখখানিতে। সে নামবামাত্র তাঁর চোখ দুটি বারেকের জন্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে—তারপর দুটি অশ্রুধারা নেমে আসবে দুই চোখ থেকে। ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকবে।

কি বলবেন? তার সারা অঙ্গে তাঁর সজল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বলবেন—এত রোগা হয়ে গেছিস রে! দেহে আর কিছু নেই! হাঁরে, মাথার সেই যন্ত্রণা কি কোন কমপ্লেন আর নেই তো?

গাড়িটা রাস্তার একটা বাঁকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল ইস্কুল-বাড়ি!

—ওই তো! ওই তো আমাদের ইস্কুল।

—হ্যাঁ। একটু হাসলেন নায়েব।

—ওটা কি? এত লোক ওখানে!

—ওটা ফটক করেছে—তুমি আসছ। অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেরা করেছে।

অজয় চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা উত্তেজনার শিহরণ বয়ে গেল আপাদমস্তক। গাড়িটা এসে দাঁড়াল ফটকে।

মাস্টার মশাই—হেডমাস্টার—তার শিক্ষক। তাঁর পিছনে ছেলেরা মালা নিয়ে এসে দাঁড়াল। মেয়েরা শাঁখ বাজল। বন্দে মাতরম্ জয় হিন্দ্ ধ্বনি উঠল। তাঁর চোখে জল এল। ওঃ, কতটুকু করে সে কত পেলে! ওঃ!

বাড়ির দরজায় এসে গাড়ি থামল। সে নামল। দরজার দুপাশে পূর্ণকুম্ভ—তার মুখে

আমের শাখা। চাকরবাকর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মা কই? মা? নায়েববাবু! মা?

—মা উপরে শুয়ে আছেন বাবা। তাঁর অসুখ! তা না হলে কি তিনি এলাহাবাদ যেতেন না?

—অসুখ? কি হয়েছে?

—অল্প অল্প জ্বর হয়। তবে খুবই দুর্বল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন তোমার জন্যে। ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করে নাও। তারপর চল উপরে চল।

—পরে—পরে এসে ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করব।

—না বাবা। তা হলে তাঁর আর খুঁতখুতুনির সীমা থাকবে না।

কোনমতে প্রণাম সেরে সে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উপরে উঠে গেল। মা—মা—মাগো!

—অজয়! অজয়! বাবা!

—মা! ঝড়ের মত গিয়ে ঘরে ঢুকল অজয়। - মা!

খাটের উপর প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছেন মনোরমা। তাঁর টি. বি. হয়েছে। অজয় তাঁর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল।

বিশীর্ণ মুখ—প্রায় কঙ্কালসার দেহ মনোরমার। চোখ দুটি শুধু শুভ্র,—আগুনের রঙ যদি সাদা হত তবে তার সঙ্গে তুলনা করা চলত। সাদা রঙের বাল্বের মধ্যে একশো পাওয়ারের ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে—কিন্তু তার সঙ্গেও এর মিল হয় না। ও চোখের দৃষ্টি থেকে যেন উত্তাপ—জ্বলন্ত শিখা বের হচ্ছে। যেন নিজে পোড়ার সঙ্গে সব কিছুকে পোড়াতে চাচ্ছে। অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনোরমার ঠোঁটে ফুটল হাসি এবং চোখে এল জল। জলের তলায় আগুন জ্বলতে লাগল।

অজয়ও কেঁদে ফেললে—আত্মসংবরণ করতে পারলে না।—মা—মাগো—বলে সে যেন ভেঙে গিয়ে মায়ের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল।

মনোরমা তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—কাঁদিস নে। ওঠ! ওঠ তুই—তোকে দেখি! ওঠ!

অজয় তবু উঠল না। উঠতে পারলে না। মনোরমা ধীর এবং গম্ভীর ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে বললেন—কাঁদিস নে অজয়। কাঁদবার সময় তো নয়। ওঠ!

একটু অপেক্ষা করে বললেন—শোন তোর কাছে আমি কথা চাই। আমার গা ছুঁয়ে তোকে প্রতিজ্ঞা করে বলতে হবে।

অজয় বুঝতে পারলে তার মা তার কাছে কি কথা চাচ্ছেন। তার মনে পড়ছে যখন তাকে নিয়ে তিনি চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসেন তখনকার কথা। যখন কলকাতা থেকে যুদ্ধের সময় গ্রামে চলে আসেন তখনকার কথা। তা ছাড়াও যে কতবার তিনি বলেছেন তাঁর সাধ-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাকে নিয়ে তিনি ফিরে যাবেন চট্টগ্রামে। ল পাস করিয়ে ফিরবেন। তাদের পৈতৃক আইনের বইঠাসা লাইব্রেরীঘরে তাকে বসাবেন। যে দিন তিনি তাকে কলকাতায় না পাঠিয়ে এলাহাবাদে পাঠান সে দিনও তিনি তাকে বলেছিলেন—তার কাছ থেকেও কথা নিয়েছিলেন যে সে রাজনীতি করবে না; ভুনি-দুনির সঙ্গে মিশে মামীমার প্রশ্রয়ে পাছে সে কংগ্রেসী হয়ে যায় তাই তিনি তাদের বাড়িতে রাখেন নি, হোস্টেলে দিয়েছিলেন। সেও রাজনীতি—সত্য করে যাকে রাজনীতি করা বলে তাও সে করে নি—তবু বিচিত্র ঘটনাচক্রে শুধু মুখের আস্ফালনের জন্য তার রাজনীতি করাই হয়ে গেল। মায়ের সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষা একরকম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মনের ক্ষোভে দুঃখে আশাভঙ্গের হতাশায় দরিদ্র না হয়েও এই দারিদ্র্যের ব্যাধি যক্ষ্মাকে টেনে এনেছেন। কিন্তু তার তো হাত নেই। এর পর অন্ততঃ এই যুদ্ধ জয়ের পর জয়দৃপ্ত ইংরেজ যে কি ভীষণ হয়ে উঠবে—কি নির্যাতন চালাবে সে তো

তার মা বুঝছেন না। আর সেই বা এই বন্দীদশার পর কি করে রাজনীতি ছেড়ে থাকবে?

মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তার মুখ চোখ থেকে মনের কথা পড়বার চেষ্টা করছিলেন—বললেন—অজয়! বল—কথা দে! আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।

অজয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমি তো সত্যিই কিছু করি নি মা। রাজনীতি করা যাকে বলে তা আমি করি নি। তোমাকে কথা আমি এলাহাবাদ যাবার আগেও দিয়েছিলাম—আর সে কথার ঠিক খেলাপও আমি করি নি। শুধু মুখের কথা—। মুখে আমি বলেছি ছেলেদের কাছে যে, চট্টগ্রামের আর্মারি রেড কেসের আসামী যারা তাদের সঙ্গে আমার বাবার জানাশোনা ছিল—যোগাযোগ ছিল, আমার বাবা ঠাকুরদা ওখানকার যাঁরা স্বদেশী করেছেন তাঁদের কেস ডিফেন্ড করেছেন। আর্মারি রেড কেসের গল্প করেছি। অপরাধের মধ্যে অপরাধ মিথ্যে কথা বলেছি। তার জের তো না টেনে উপায় নেই মা। আমি না টানতে চাইলেও তো ওরা না টানিয়ে ছাড়বে না। বিশেষ করে এত বড় যুদ্ধ জেতার পর!

একটু থেমে সে আবার বললে—এবার হয় আমাদের বুক পেতে দিতে হবে—ওরা বুকের ওপর চড়ে নাচবে বুট পরে নইলে লড়াই দিতে হবে। নেতাজীর এত বড় উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর তাও কি পারবে এ দেশের লোক!

এবার মনোরমার সেই চোখ দুটো যেন দপদপ করে জ্বলতে লাগল। মনোরমা বললেন—আমি তোকে আমার গা ছুঁয়ে সেই প্রতিজ্ঞাই করতে বলছি অজয়—লড়াই দিবি দিতে হবে। যারা আমাদের এত বড় সর্বনাশ করেছে তারা যত শক্তিমান হোক—দেশের লোক যাই করুক, লড়াই দিক চাই না-দিক—তুই লড়ে যাস। তুই যেন এদের ক্ষমা করিস নে। এদের সঙ্গে আপোস করিস নে। আমার অনেক সাধ ছিল—আমি তোর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম—তার সব ওরা ওই বুটের তলায় লাথি মেরে মেরে ভেঙেচুরে শেষ করে দিলে। আমার কালব্যাধি ধরেছে দুশ্চিন্তায়; খবর পেলাম ওদের অত্যাচারে তোর মাথার গোলমাল হয়েছে। হয়তো পাগল হয়ে যাবি। আমি খাই নি। দেবতার পায়ে আছড়ে পড়েছি। উপোস করে পুজো করেছি ব্রত করেছি। তুই ফিরে এসেছিস, একেবারে পাগলও হস নি। আমার আর এই ব্যাধির জন্যে দুঃখ নেই। আমি বাঁচব না আমি জানি—আমি অভিসম্পাত দিয়ে যাচ্ছি ওরা ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক। শুধু অভিশাপে কিছু হয় না—আপনি ফলে না অভিশাপ। আমার দেওয়া এই অভিশাপকে তুই সফল করবার জন্যে তপস্যা করিস, জীবন দিয়ে তপস্যা করিস।

অজয়ের চোখ ফেটে জল এল, কি আশ্চর্য তার মা! এই মাকে সে ভীরু ভেবেছে স্বার্থপর ভেবেছে! বন্দীশালায় ছোট ঘরখানির মধ্যে বসে যখনই মায়ের কথা ভেবেছে তখনই মনে হয়েছে—এ বন্দীজীবনের যে দুঃখ যে কষ্ট যে নির্যাতন সে তো সহ্য হল; যখন তাকে প্রথম এনেছিল তখন তার ভয় হয়েছিল—ভয় হত। নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদ—সারা দিন রাত্রি বসিয়ে রেখেছে একজনের পর একজন অফিসার এসেছে পালা করে—তার প্রতি জিজ্ঞাসার ছেদ পড়ে নি।

—বল না—কি জান বল! জান খোকা—, তুমি খোকাই বটে। এই অল্প বয়স—তোমাকে যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছ। শহীদ হবার লোভ দেখিয়েছে। বলেছে স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম লেখা থাকবে। স্বাধীনতার পর মনুমেণ্ট তৈরি হবে—তোমার নাম লেখা থাকবে। ইতিহাস লেখা হবে স্বাধীনতা যুদ্ধের—তাতে তোমার নাম থাকবে। হ্যাঁ, এর লোভ অনেক। দেশ স্বাধীন হবে। আমরাই আমাদের দেশের মালিক হব। ওই ইংরেজদের মতই আমরা তখন বুক ফুলিয়ে বেড়াব। বলেছে। জানি। বলেছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

জাপানী ফৌজ নিয়ে দেশে ঢুকবে মার্চ করে,—ব্যান্ড বাজবে ; দরবার হবে। বেঁচে থাকলে নেতাজী তোমাকে মেডেল দেবেন। বলে নি ? নিশ্চয় বলেছে। তুমি ভুল করেছ। হ্যাঁ, ভুলই। জিতলে ভুল হত না। যখন জেতা হল না বা হবে না তখন ভুল, নিশ্চয় ভুল। এখন তোমার পথ দুটো। একটা স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়ে যাওয়া। সেটা আমি তোমাকে বলব না, কখনও বলব না। হাজার হলেও আমি বাঙালী—আমি ইণ্ডিয়ান। আমি তোমাকে বলব একটা স্টেটমেণ্ট দিতে। হ্যাঁ, স্টেটমেণ্ট। সেটা পড়ে দেশের লোকের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যাবে। যেমন দিয়েছিল কবি নজরুল ইসলাম—যেমন দিয়েছিলেন গান্ধী।

অবাক হয়ে শুনেছিল অজয়। কিন্তু কি স্টেটমেণ্ট সে দেবে ? সে তো কোন কিছুই জানে না, কাউকেই জানে না। শুধু একটি নাম জানে—একজনকে চেনে, যাকে জানা ঠিক বলে—চেনা ঠিক বলে—তেমনি করে। সে নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। অজয় তাঁকে কখনও দেখে নি তবু তাঁকে চেনে—যে চোখে দেখেছে তার মতই চেনে, তার চেয়ে হয়তো বেশীই চেনে। অন্ধ মানুষ চোখে না দেখেও যেমন সূর্যকে চেনে তেমনি করে চেনে। চাঁদ তারা বা আর কিছু সে চেনে না—কিন্তু অন্ধ সূর্যকে চেনে জানে—উত্তাপ থেকে চেনে—জীবনের কলরব থেকে চেনে। সেই ভাবে না দেখেও সে চেনে সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর উত্তাপ সে হৃদয়ে মনে অনুভব করেছে—তাঁর কথা ভাবতে তার রোমাঞ্চ হয়েছে। কিন্তু আর কাউকে তো সে চেনে না। চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতির মত আর কিছু জনের নামই সে শুনেছে, আর তো কিছু জানে না সে। এই নেতাজীকে কুইসলিং বলে গাল দিয়েছে একদল ছেলে—তাদের সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে। মারামারি করেছে। এই পর্যন্ত। গান্ধীজী নেহেরুজী এঁদেরও সে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে ভালবাসে কিন্তু তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রোহী বলে শাস্তি দেওয়ায় তাঁদের প্রতি সে ভক্তি তার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সে ক্ষুব্ধচিত্তে মনে মনে তাঁদেরও বিরোধিতা করেছে।

অফিসারটি আবার তাকে বলেছিল—তাই কর, কেমন। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেব। লেখাপড়া শিখে বিখ্যাত লোক হয়ে আসবে।

অজয় বলেছিল—আমি তো কিছু জানি না।

—যা জান তাই লেখ। লেখার সরঞ্জাম এনে দাও। শুনছ।

এ হুকুমটা যে পুলিস অফিসার দাঁড়িয়েছিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম এসেছিল। এবং অজয় আনুপূর্বিক সত্য কথাগুলিই লিখেছিল। তার মধ্যে বার বার এই কথাই ছিল—আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ভক্তি করি, তাঁকে কখনও দেখি নাই, তাঁর দলের কোন লোককেও চিনি না। তাঁদের দলের সঙ্গে কোন যোগাযোগই কোন কালেই আমার নেই। শুধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ জয় করতে করতে এদেশে এসে ঢুকবেন এই কথা শুনি—তাতে আমার আনন্দ হয়। তাঁর নিন্দা কেউ করলে আমার রাগ হয়, আমার বাপ-পিতামহের নিন্দা করলে যেমন দুঃখ হয় যেমন রাগ হয় তার থেকেও বেশি রাগ হয়। নিজের গৌরববৃদ্ধির জন্য আমি কলেজের বন্ধুদের কাছে বলতাম আমি নেতাজীর দলের লোক। আমি চট্টগ্রামের ছেলে—আমার ছেলেবেলায় আর্মারি রেড হয়েছিল—দু'তিন দিনের জন্য চট্টগ্রাম স্বাধীন হয়েছিল—আমি সূর্য সেন অনন্ত সিং লোকনাথ বলদের নাম জানি—তাঁদের গল্প জানি—সে সব নাম সে সব গল্প আমি তাদের করতাম—তারা সেই কারণে বিশ্বাস করত আমি সত্যই নেতাজীর দলের লোক। এই ভাবেই প্রায় ঝগড়া হত বারা. নেতাজীর নিন্দা করত তাদের সঙ্গে। কংগ্রেসী কম্যুনিস্ট লীগ সব দলের ছেলেদের সঙ্গেই অমিল ছিল বিরোধ ছিল। কংগ্রেসীরা ঝগড়া করত না আর খারাপ কথা

বলে নিন্দাও করত না। কিন্তু অন্যেরা—

কাগজখানা টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে দিয়েছিল অফিসার। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। সে ভয় একটু পেয়েছিল তা দেখে এবং অবাকও হয়ে গিয়েছিল। অফিসার বলেছিল—What is this ? What shall we do with this ?—আবার একটু তাকিয়ে থেকে বাংলায় বলেছিল—কি লিখেছ এসব ?

অজয় বলেছিল—আর কি লিখব ?

—কি লিখবে ?

—হ্যাঁ। যা জানি তাই লিখেছি। আর তো কিছু জানি না !

—জান না ?

—না।

এবার উত্তর হল মুখের কথায় নয়, গালের উপর সজোর এক চড়ে। প্রস্তুত ছিল না অজয়, সে ঘুরে পড়ে গেল। কিন্তু তাতেই শেষ হল না। তার গালে পিঠে চড় এবং লাথি পড়তে লাগল। সে কিন্তু দু'চারটি আঘাতের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেল। দাঁতে-দাঁত টিপে সকল আর্তনাদ সকল ক্রুদ্ধ চীৎকারকে বুকের মধ্যে রুদ্ধ করে বসে রইল।

নির্যাতনের পর নির্যাতন চলেছে। এর মধ্যে কেবলমাত্র এলাহাবাদের সেই এস পি, খটরোগা মুখুজ্জে মশায়ের ছাত্র তাকে কিছুটা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে সে নির্দোষ। এরই মধ্যে একদিন গিয়েছিলেন তার মা। এই মা। সে অনেক আশঙ্কা করেছিল—মা নিজের কপালের উপর নিজের হাত দিয়ে আঘাত করবেন—বলবেন—এই কপাল আমার ! ছি ! ছি ! ছি ! তার পর তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে। তিনি বলবেন—যখন তুই কিছু করিস নি তখন বণ্ড লিখে দে। আমি তোকে খালাস করে বাড়ি নিয়ে যাব। পড়ে তোর আর কাজ নেই। কিন্তু তা তিনি বলেন নি। বলেছিলেন—দেখিস অজয় ভয়ে অত্যাচারে কি লোভে ওরা যা বলবে তাই লিখে যেন সই করে দিস নি। মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজী হস নি। আমার গর্ভকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাস ; তোর বাপ-ঠাকুরদার রক্তের মর্যাদা রক্ষা করিস। তাতে তোর যা হয় হোক।

বুকে সে জোর পেয়েছিল। মা তাকে আরও বলেছিলেন—তুই মিথ্যে করে বলেছিস তুই নেতাজীর দলের লোক—তাঁর অনুগামী। সব দুঃখ নির্যাতন সহ্য করে সেইটেই তুই সত্য প্রমাণ করে দে। আমি যা করবার তা করব।

ফিরে গিয়েই তিনি হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্ত করেছিলেন। তাতে পূর্ণ ফল কিছু হয় নি কিন্তু কিছুটা হয়েছিল।

এ মা—তার আশ্চর্য মা ! তাঁকে সে বার বার ভুল করেছে। আজও ভুল করেছে। আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মা তাকে বলছেন—আমার গায়ে হাত দিয়ে তুই শপথ কর অজয় প্রতিজ্ঞা কর—এই পাপ রাজত্ব—তার যত শক্তিই থাক—তাকে উচ্ছেদের তপস্যা করবি ! বল !

অবাক হয়ে গিয়েছে সে মায়ের কথা শুনে।—কি আশ্চর্য তার মা। তাঁর মুখের দিকেই সে তাকিয়ে রইল। অপলক চোখ দুটি কানায় কানায় জলে ভরে উঠছে। ভিতরটা এমন আবেগোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে যে তার একবিন্দুকে বাইরে আসতে দিলে মুহূর্তে সে উচ্ছ্বাস সমস্ত আবরণকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। কথা কইতে গেলেই বোধ হয় তাই ঘটবে। তাই সে কথা বললে না—শুধু পায়ে হাত দিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা তার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর মুখের উপর হাতখানি বুলিয়ে বললেন—তোর মাথার গোলমাল কি তুই বুঝতে পারিস ? কি হয় ?

অজয় বললে—কথা মনে থাকে না সব সময়। সব যেন ফাঁকা হয়ে যায়। চোখে যা দেখি তারও অর্থ থাকে না, কেউ কথা বললেও তার মানে ঠিক মনকে নাড়া দেয় না। এটা মধ্যে মধ্যে হয় এখন। আগে সব সময়ই হত। মাথায় একটা যন্ত্রণাও হয়। এটা হয়েছিল—এক সময় যখন খুব বেশী হয়েছিল তখন মধ্যে মধ্যে দেওয়ালে দরজায় লাথি মারতাম; আমার পায়ে বেড়ি দিয়েছিল। সেই সময় দেওয়ালে মাথা ঠুকেছিলাম। আর চীৎকার করেছিলাম।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মনোরমা। তারপর বললেন—ডাক্তার আজ আসবেন বর্ধমান থেকে। তোকে দেখবেন। কল দেওয়া আছে।

—কিন্তু তোমায় কে দেখছেন? তুমি যে নিজেকে শেষ করে বসে আছ মা।

হাসলেন মনোরমা। বললেন—আমার জন্যে ভাবিস নে। তুই এসেছিস হয়তো এইবার ভাল হয়ে যাব।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—ভাল হতে ভয় করছে অজয়।

—কেন মা?

—যুদ্ধ তো শেষ হয় নি বাবা!

—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জার্মানী জাপান সারেণ্ডার করেছে।

- এবার ভারতবর্ষে যুদ্ধ হবে। ওদের শেষ আমাদের শুরু। তুই দেখবি নেতাজী আবার সৈন্য সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের সীমান্তে দেখা দেবেন। এদিকে দেশের মধ্যে আগুন জ্বলবে। তোকে আমি আশীর্বাদ করে যুদ্ধে পাঠিয়েই চোখ বুজতে চাই। নইলে—

—মা। এসে দাঁড়ালো নায়েব। তিনি এতক্ষণ অজয়কে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তিনি একা নয় আরও অনেকে। তাদের মধ্যে হেডমাস্টার, গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ছিলেন—চাকরেরা ছিল। আর ছিল অনেকগুলি মেয়েছেলে। এতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেউই এই দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মা-ছেলের প্রথম সাক্ষাতের মধ্যে এসে দাঁড়াতে চায় নি পারে নি। এবার নায়েব এসে বললেন—মা!

মনোরমা মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন।

—আমি বলছি,—

—বলুন কি বলছেন!

—বলছি—অজয় স্নান করুক, কিছু খেয়েদেয়ে সুস্থ হোক। পরে আবার সব কথাবার্তা হবে। কথা তো অনেক! এখন সে-সব থাক।

একটু হাসলেন মনোরমা, ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, কথা অনেক। হ্যাঁ, সে-সবই ওকে বলতে হবে। বিষয়-সম্পত্তির মালিক তো ওই।

অজয় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সম্পত্তির কথা কেন মা? সে আমি শুনে কি করব?

মনোরমা হেসে বললেন—তবে কে করবে অজয়? আর তো আমার শক্তি নেই!

অজয় চুপ করে রইল—এ কথার উত্তর দিতে পারলে না। আবার তার বুকের ভিতর কান্নার আবেগ ঝড়ের মেঘের মত ঘনিয়ে উঠল। মনোরমা বললেন—শুধু তো তোর জন্যে ভেবেই আমার এই রোগ ধরে নি বাবা—আমার—। এবার একমুহূর্তে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন। দুই চোখ থেকে দরদরধারায় জল নেমে এল। বহুকষ্টে বললেন—ওরে—তারপরই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

অজয় তাঁর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললে—থাক মা। থাক। কি হয়েছে যার জন্যে তুমি এত কাঁদছ এত ব্যাকুল হচ্ছ?

আত্মসংবরণ করলেন অনেক কষ্টে মনোরমা। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন

—আমার আহারে রুচি গেছে—পৃথিবীর মানুষ বিষ হয়ে গেছে বাবা ; ভগবানকে দেবতাকে না ডেকে থাকতে পারি নে—অভ্যাসবশে আর শ্বশুরের হুকুমে—নইলে তাও ডাকতে ইচ্ছে করে না অজয়। আমাদের চট্টগ্রামের বাড়ি জমি আর কিছুই নেই। সব—সব—

—কিছুই নেই ? অবাক হয়ে গেল অজয়।

—কিছুই নেই।

—কি হল ?

—নীলেম।

—নীলেম !

—হ্যাঁ। আমাদের সেই মুহুরী যার উপর সব ভার ছিল সেই সেই সব নীলেম করিয়ে নিয়েছে। আমরা চলে আসবার এক বছর পর। কিসের জন্যে জানিস ? ট্যাক্স। মিউ-নিসিপ্যাল ট্যাক্স। খাজনা ! এই এর দায়ে। আমরা জেনেছি সদ্য মাস কয়েক আগে। নায়েববাবু গিয়েছিলেন। তাকে ধরতে পারেন নি। তবে দেখে এসেছেন যতদূর পাকাপোক্ত করতে পারা যায় তা সে করেছে। আমার সেই ঘর সেই বাড়ি—আমার—।

আবার তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল আবেগে।

অজয় বললে—তার জন্যে এত দুঃখ করছ কেন মা ! আইন আদালত আছে। তাতেও যদি উদ্ধার না হয়—তবে—আমি রয়েছি। আমি তোমাকে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াব।

হাসলেন মনোরমা। কোন কথা বললেন না।

নায়েব বললেন ওঠ বাবা। চান করে ফেল। একটু কিছু খাও। তারপর বলব কথা। বরং কাল বা পরশু চল বর্ধমান—মহেন্দ্রবাবু উকীল সব দেখেছেন কাগজপত্র—তার কাছে গিয়ে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

অজয় বললে—ও পরামর্শ পরে হবে। ও পালায় নি। আগে মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা। ডাক্তার কি বলেছে সেই কথা বলুন। কি চিকিৎসা হচ্ছে কাকে কাকে দেখানো হয়েছে সেই সব বলুন। আমাকে দেখবার জন্যে ডাক্তারকে কল দিয়ে রেখেছেন মা। কোন্ ডাক্তার ? তিনিই কি মাকে দেখছেন ?

নায়েব বললেন—আগে চান করে নাও, তারপর বলব। চল নীচে চল। তোমার থাকবার ব্যবস্থা নীচের তলায়। চল।

* * *

অজয়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে নীচের তলায়। এবং তাও উপরতলায় মায়ের ঘর যে প্রান্তে তার বিপরীত প্রান্তে। ব্যবস্থা খোদ মায়ের।

অজয়ের কারণ বুঝতে দেরি হল না। মা ছোঁয়াচের পথকে যতদূর সম্ভব বাঁকাচোরা এবং দীর্ঘ করবার চেষ্টা করেছেন। অজয় ঘরে ঢুকে দেখেশুনে বললে—এখানে থাকলে আমার চলবে না জ্যাঠামশায়। আমাকে উপরে যেতে হবে।

—কি করব ? মায়ের হুকুম—

—সে বুঝেছি। উপর থেকে বাতাস নীচের দিকে আসে না, সেটাকে আবার এ-মাথা ও-মাথা করে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। কিন্তু আমি সে বলে কয়ে বুঝিয়ে মায়ের মত করে নেব।

—পরে ক'রো বাবা। এখন দুটো দিন মেনে চল। উনি এমন অসহিষ্ণু আর এমন বদমেজাজী হয়েছেন সে বলবার কথা নয়। তুমি এসেছ—এইবার যদি একটু শান্ত হন সহিষ্ণু হন।

—এটা হল কতদিন ? আমাকে কিছু জানালেন না ?

—উনি দেন নি। আর সেটা তো অসঙ্গত বলেন নি উনি ! তা ছাড়া এ তো ধর ক-

মাসের মধ্যে! তুমি তেতাল্লিশ সালের নভেম্বরে এ্যারেস্টেড হলে। উনি গেলেন—তোমার সঙ্গে দেখা করে এলেন। ফিরে এলেন, কলকাতা ছুটলেন—উকীল-ব্যারিস্টারের পরামর্শ নিলেন। তাঁরা বললেন—এ তো বেআইনী আইন—সুতরাং আইনে এর পথ তো নেই! আপনি বরং যদি পারেন এখানকার মিনিস্টার-টিনিস্টারদের ধরে দেখুন। তা রাজী হলেন না। ফিরে এসে কাজ নিয়ে মাতলেন—বললেন প্রাইমারী গার্লস স্কুলটাকে এম-ই করব—না হলে অন্ততঃ ইউ-পি। এ সব সেই এলাহাবাদের সাধনা দেবী যিনি তোমাকে বাঁচাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়েছিলেন—যার জন্যে তাঁকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করেছিল—তাঁর জন্যেই; তাঁকে চাকরি দিয়ে এখানে আনবেন এইটেই একরকম আসল কথা। নইলে ওদিকে তখন চাটগাঁয়ের বাড়িভাড়াটাড়া একরকম বন্ধ হয়েছে। মানে মুহুরীবাবু তার অনেক আগেই তো নীলেম করিয়েছে; শুধু নীলেম? নীলেমের পর নীলেমদারকে দিয়ে বিক্রীকবালা করিয়েছে। একটা নয় দুটো তিনটে হস্তান্তর। ওখানে আমাদের যারা হিতৈষী তাদের বলেছে—এখানকার একটা মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে তিন চার লক্ষ টাকার ডিক্রি হয়েছে—তাদের ক্রোকের ভয়ে বেনামে হয়ে থাকছে। বাড়ি মিলিটারীরা ভাড়া নিলে—ভাড়ার টাকা সে রসিদ দিয়ে নিত; আমাদের পাঠাত নিজের নামে। ক্রমে ক্রমে সেটা অনিয়মিত হল। লিখলে লিখত —"আদায় না হইলে আমি কোথা হইতে পাঠাইব।" প্রথম তিন মাস অন্তর—তারপর চার মাস—তারপর ছ' মাস। এমনিই চলছিল। আমার একবার যাবার কথা হল। ওদিকে বোমা পড়া আরম্ভ হল। তখন সে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। এ সব অবিশ্যি ঘটেছে যখন তখন তুমি পড়ছ। এ সব তোমাকে জানান নি উনি। আর জানাবার মত সন্দেহও হয় নি।

অজয় বললে—ইরেগুলার টাকা আসার ব্যাপারটা আমি দেখে গিয়েছিলাম। জানি ওটা।

—তা জানবে বইকি। মাথা ঘামাতে না হোক—আমরা না বলি—বড় হয়েছিলে—

—শুনেছ—কানে গেছে বইকি!

– হ্যাঁ। তবে দুশ্চিন্তার কারণ আপনাদেরও হয় নি—আমার মনে হয় নি।

—সেই তো বলছি। হবেই বা কেন? এতদিনের বিশ্বাসী লোক! যাক গে;—মস্ত একটা ভুল বাবা, বলতে গেলে দায়ী আমি। কারণ বউমা—যতই বিষয়বুদ্ধি ধরুন—মেয়েছেলে—আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। কিন্তু ওই সময়েই গণ্ডগোল বাধল তোমাকে নিয়ে। ওদিকে আমাদের কারুর খেয়ালই রইল না। হয়তো ইংরেজ রাজত্বই চলে যাবে। এদিকে বউমা হয়ে গেলেন অন্য মানুষ; একদিকে পুজোআর্চা উপোস—অন্যদিকে মেয়ে-ইস্কুল। তারপর তোমার হাঙ্গামা হল বর্ধমানে আমাদের উকীলকে নিয়ে। সে আবার নেতাজীর বিপক্ষদলের লোক। সে তোমার মাকে বললে—অজয়কে দিয়ে বণ্ড লিখিয়ে দিন—আমি খালাস করে আনছি। উনি ক্ষেপে গেলেন। বুড়ো মহেন্দ্রবাবু উকিলকে নিয়ে তাকে খারিজ করার ব্যাপার। সে আবার এখানকার ইস্কুল ডাক্তারখানা বালিকা বিদ্যালয়ের একজন ট্রাস্টি। ঝগড়াঝাঁটি। আদালত-ঘর। ওদিকটায় আমাদের খেয়াল রইল না।

তারপর হঠাৎ আবার ঘটনা ঘটল। সাধনা দেবী এখানে চাকরি নিয়ে আসতে আসতে পথে ট্রেন থেকে নেমে নিরুদ্দেশ হলেন। তোমাকে ছেড়ে দেবে দেবে শুনছিলাম—সে বন্ধ হল। তারপর খবর পেলাম তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বউমাও মুষড়ে পড়লেন। এই সময় খবর এল চট্টগ্রামের বাড়ি জমি সব নীলেম হয়ে গেছে। আমি ছুটে গেলাম। যে দিন পৌঁছুলাম সেই দিনই রাত্রে সাইরেন। সে আমার কি অবস্থা! পাড়াগাঁয়ের মানুষ! যা হোক মুহুরীবাবুকে তো পেলামই না। কাগজপত্র বের করে বাড়ি এলাম। তার কিছুদিন

পর থেকে বউমার ঘুষঘুষে জ্বর—বুকে পিঠে বেদনা। ডাক্তার-বদ্যি দেখাবেন না। জোর করে শেষ দেখালাম, আমাদের ডাক্তারখানার ডাক্তারই দেখলেন। বললেন ব্রনকাইটিস। ওষুধ-পত্র চলল। দু'চারদিন ভাল থাকেন—আবার বেদনা বাড়ে। তখন বর্ধমানের ডাক্তার আনলাম। উনি আনতে দেবেন না। বলেন—কিছু হয় নি আমার। আমি শুনলাম না। তিনি বললেন—প্লুরুসি। তাঁর চিকিৎসাই চলছিল। এখন এই দশ-বারো দিন আগে বর্ধমান থেকে সেন সাহেবকে সুদ্ধ এনে দেখালাম—তাঁরা দুজনে পরামর্শ করে বললেন—ঠিক বলতে অবশ্যি পারছি না। বলা ঠিকও নয়। X-Ray করান। তবে যতদূর মনে হচ্ছে—।

চুপ করলেন নায়েব।

অজয় বললে—X-Ray হয় নি এখনও ?

—হয়েছে। বর্ধমানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে ও'রা বলছেন···কলকাতায় আর একবার X-Ray করান। তবে যতদূর দেখছি এতে তাতে তাই বটে। তারপরই তো আমি চলে গেলাম তোমাকে আনতে। এইবার তুমি এসেছ—যা করতে হয় করো। হয়তো এবার উনি বাঁচতে চাইবেন। শরীরের যত্ন নেবেন। এখানকার সেন সাহেব বলেছিলেন—দেখুন রোগী যদি বাঁচতে না চায়—সহযোগিতা না করে তবে যেমন যত বড় ডাক্তার হোক—যেমন চিকিৎসা হোক বাঁচানো যায় না।

অজয় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। এবং নায়েবজেঠা কথা বলে চলেছিলেন—শুনছিল। ওদের বাড়িখানি গ্রামের প্রান্তে। বর্ধমানের দিক থেকে আসতে হলে গ্রামের মুখেই পড়ে বাড়িখানা। তার সামনে ওই পশ্চিমদিকে বর্ধমানের দিকে মস্ত বড় প্রান্তর—লাল মাটির ডাঙা। এই মাটির কথা বর্ধমানে যখন সাহিত্য সম্মেলন হয় সেবার পল্লীপ্রাণ ভক্তকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন যে কবিতায় তাতে উল্লেখ আছে। বলেছিলেন—এই রাঙা মাটির ধুলো রাঙা ফাগের মত তোমাদের সর্বাঙ্গ রঙীন করে দেবে। উঁচু প্রান্তরকে ওরা বলে ডাঙা। এই ডাঙার উপরেই এখন ইস্কুল ডিসপেন্সারী বোর্ডিং হয়েছে। আর আছে একটা প্রকাণ্ড আমবাগান। এদিকে পূর্বদিকে বাড়ির পরেই তাদের ঘাটবাঁধানো পুকুর। তার পাড়ের উপরেও কলমের গাছের বাগান। তার ওপার থেকে গ্রাম আরম্ভ। প্রথমেই ব্রাহ্মণপাড়া—চাটুজ্জেদের বাড়ি প্রথম, তারপর ঘোষালদের বাড়ি, তারপর ভটচাজেরা কয়েক ঘর। কলমের বাগানের ছোট গাছগুলির মাথা ছাড়িয়ে ঘরগুলির চাল দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশই খড়ের চাল। ঘোষালদের ঘরে টিন।

নায়েব হঠাৎ কথায় ও প্রসঙ্গ বন্ধ করে তাকে ডাকলেন—অজয় !

অজয় ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়ে আছে। নায়েব আবার ডাকলেন—অজয় !

—এ্যাঁ ! চমক ভেঙে সে যেন উত্তরটা দিল।

—কি ভাবছ বল তো ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলতে পারব না। মাথার গোলমালটা সেরে গিয়েও ওইটুকু আছে। মধ্যে মধ্যে সব যেন হারিয়ে যায়। আপনি কি বলছিলেন ? ও—মায়ের অসুখের কথা ! হ্যাঁ, তা ডাক্তার আজ আসুন। দেখুন। আপনি কিন্তু ব্যবস্থা করুন কলকাতা যাবার। ওখানে তো—হ্যাঁ—আমাদের বাড়ি আছে। কাউকে পাঠান, পরিষ্কার করিয়ে রাখুক।

—হবে। আগে স্নান করে এস তুমি।

—পুকুরে ? না কুয়োর পাড়ে ? অনেক দিন পুকুরে স্নান করি নি।

—না। জলটা আর ভাল নেই। তুমি ঘরেই স্নান কর। এই দরজা—। বারান্দা ঘিরে স্নানের ঘর পায়খানা সব করানো হয়েছে। ও'র জন্যে ডাক্তার বললেন—ঘরের লাগাও পায়খানা স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে ভাল হয়, করানো হল—তখন উনি বললেন—তা হলে

নীচের ওই ঘরখানার সঙ্গেও এই ব্যবস্থা করুন। অজয় থাকবে এখন। তারপর আমার একটা ঘর হলে বাইরে লোকজন এসে থাকবেন।

—দাদাবাবু!

ঘরে এসে ঢুকল মনোরমার ঝি—কালী চাকরের মা।—আপনার চান হয় নি! মা যে খাবার তৈরি করিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। নীচেই পাঠাচ্ছিলেন। তা বললেন—না—এই বারান্দায় খানিকটা তফাতে দে—ও খাবে—আমি দেখব। নেন—ত্বরিত করে চান সারুন। নইলে এমন রেগে উঠবেন—! রাগটা বড্ড হয়েছে গো! তা থাকে না বেশীক্ষণ!

অজয় বললে—যাচ্ছি আমি। বলে সে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ল।

চমৎকার হয়েছে বাথরুম। মনে পড়ে যায় চট্টগ্রামের বাড়ির বাথরুমের কথা। সব পরিপাটী করে সাজানো। সাবান তেল তোয়ালে দাঁত মাজা মুখ ধোয়ার সরঞ্জাম। সব।

স্নান সেরে উপরে গিয়ে সে দেখলে মা বারান্দায় এসে বসেছেন। তাঁর থেকে বেশ একটু দূরেই তার খাবার দেওয়া হয়েছে। একটি ছোট টেবিলের উপর সুন্দর একটি ঢাকনা ঢাকা দেওয়া খাবার থালা। মা বললেন—ওঃ, মনে হয় নি যে আর তোকে আমি সামনে বসে খাওয়াব। চোখ থেকে তাঁর জল এল। আঁচলের খুঁটে মুছে বললেন—আজ বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে—সাধ হচ্ছে। সাধ হচ্ছে—এই পাষণ্ডের রাজত্ব—রাক্ষসের মত যারা দেশটার রক্ত চুষে খেয়ে এমন করে দিলে—তোকে ধরে নিয়ে গেল—তেমনি তো কত মায়ের বুক খালি করে দিলে—কত বউয়ের স্বামী কেড়ে নিলে—কত সংসার ছারেখারে গেল—তাদের ধ্বংসটা দেখে যাই। ধ্বংস ওরা হবে। হতেই হবে।

নিষ্ঠুর আক্রোশ রণ রণ করে বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

অজয় সামনের দিকে তাকিয়ে রইল—আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কানের কাছে কেউ কবিতা আবৃত্তি করছে—বীরের এ রক্তস্রোত—

মা ডাকলেন—অজয়! অজয়!

—মা।

—খা। তোর চোখের চাউনি এমন হচ্ছে কেন? এমনই হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ। তুই চান করতে গেলে নায়েব ভাসুর এসে বলছিলেন। না—এমন করে ভাবিস নে।

অজয় রেকাবির ঢাকনিটা খুললে—শ্বেতপাথরের রেকাবির উপর পাকা পেঁপে আম মিষ্টি সাজানো।

মা বললেন—আগে পেঁপে তারপর আম। তোর তো হুঁশ নেই এসব। নে খা। পেঁপে আম সব গাছের। কেমন? মিষ্টি? না একটু তিতকুটে?

—না মিষ্টি।

—খা।

অজয় খাচ্ছিল—মনোরমা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—একটা কথা—কথাটা এখন না বলাই উচিত। তবে না বললে পাপ হবে অজয়। ভগবান হয়তো সে ক্ষমা করবেন না। সাধনা বউদির খোঁজ করতে হবে। কি করে করি বল তো? বারো বছরের মেয়ে সঙ্গে—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! ওঃ!

মনোরমা আপত্তি করেছিলেন—অজয়, তুই চিকিৎসা চিকিৎসা করে বাড়াবাড়ি করিসনে। যা হবার এখানে থেকেই হবে। সারবার হয় সারবে, না সারবার হয় সারবে না। মানুষকে মরতে একদিন হয়।

অজয় সে-কথা শুনলে না। না, সে হয় না মা। সে হয় না। মরতে একদিন হবেই বলে আজই কেউ মরে না, রোগ হলে চিকিৎসা সবাই করায়।

মনোরমা তুলেছিলেন টাকার কথা।

—চট্টগ্রামের সম্পত্তি গেছে। সে ফেরাতে হবে। তার মামলা-মকদ্দমা আছে। আমার জীবনের দামের চেয়ে চট্টগ্রামের বাস্তুর দাম—চট্টগ্রামের বাসের দাম আমার কাছে অনেক বেশী। আমার নামে যে টাকা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তার আর কিছুই নেই। আমি সব খরচ করেছি এই ক'বছরে। দুর্ভিক্ষের সময় হিসেব করি নি—কেয়ার করি নি। ভেবেছিলাম চট্টগ্রামে এতবড় সম্পত্তি রয়েছে পাট রয়েছে—ভাবনা কিসের। তোর টাকাটা যেটা কোম্পানির কাগজে ছিল সেটাতে হাত দিতে পারি নি। নগদ যা ছিল ব্যাংক তাতেও হাত পড়েছে। এখানকার বাড়িঘর জায়গাজমি সব দেবোত্তর। ইস্কুল ডিসপেনসারী গার্লস ইস্কুলে খরচ হয়—মা কালীর সেবা আছে। শ্বশুরের বারণ আছে—এখানকার একমুঠো চালও কখনও নেবে না। এখানে শুধু দেবে—দিয়েই যাবে। তাঁর হয়তো সেকালের বিশ্বাস কিন্তু তাঁর ছেলে তোর বাপও তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। এখানে এসে আমিও তাই করেছি। আমার টাকা খরচ করেই সংসার চালিয়েছি—এখানকার উন্নতি করেছি। তোর নগদ টাকাও খরচ করেছি। যা আছে তোর নগদে কোম্পানির কাগজে তা খুব বেশী নয়। এর উপর চিকিৎসার নামে বেশী টাকা খরচ আমি করতে দেব না।

অজয় হেসেছিল। তারপর বলেছিল—তোমার কথা শুনলাম। মনে রাখব। চিকিৎসাতে বড়লোকগিরি করব না। কিন্তু যেটুকু দরকার সে করতেই হবে। এখানে তোমার বারণ শুনব না।

দিনকয়েকের মধ্যেই সে মাকে নিয়ে এসে গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে উঠল। হাওড়ায় নেমে অজয় বিস্ময়বোধ না করে পারলে না। তারা কলকাতায় এসেছিল জাপানী বোমার ভয়ের সময়। চট্টগ্রাম আগে আক্রান্ত হবে এই ভয়ে। কলকাতায় এসে দেখেছিল দলে দলে লোক কলকাতা থেকেও পালাচ্ছে। হাতীবাগানে বোমা পড়ার দু'তিন দিন আগে বোমা পড়েছিল খিদিরপুরে। পরদিন থেকে লোক পালানোর সে দৃশ্য তার মনে আছে। হাতীবাগানে বোমা পড়ার পর তারা কলকাতা ছেড়েছিল। কলকাতাকে দেখে গিয়েছিল প্রায় পরিত্যক্ত নগরী। সেই কলকাতা মানুষে মানুষে যেন চাপ বেঁধে গেছে। হাওড়া স্টেশন থেকে চাপবন্দী মানুষ—হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতা ঢুকবার মুখে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে তিন ভাগে ভাগ হয়ে অনর্গল ঢুকছে মানুষ মানুষ মানুষ। বেরিয়ে আসছে সমান জনস্রোত। মিলিটারী লরী জীপ ট্যাক্সি ঘোড়ারগাড়ি প্রাইভেট গাড়ি ট্রাম বাস—গোটা পথটা জুড়ে আসছে যাচ্ছে; মন্থর গতিতে যেতে হচ্ছে—উপায় নেই। তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে মানুষ বেপরোয়ার মত এপার ওপার করছে।

ট্যাক্সি গাড়ি পাওয়া দুষ্কর। তাদের নায়েব আগে এসে ব্যবস্থা করেছেন—ঘরদোর পরিষ্কার—জিনিসপত্র যেটা যেটা অভাব আছে সে-সব কেনাকাটা করে রেখেছেন; তিনি ট্যাক্সি এনগেজ করে রেখেছিলেন—তাই ট্রেন থেকে নেমেই গাড়ি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। হাওড়া ব্রিজে ঢুকে গাড়ি যেন আটকে গেল। সামনে ট্র্যাফিক জাম্ হয়ে গেছে। তাদের গাড়ির পাশের সারিতেই খানকয়েক লরীর উপর বিদেশী সৈনিকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে চলেছে। চীৎকার করছে। গালাগালি করছে শহরের ট্র্যাফিক কন্ট্রোলকে। ঠুঙি-পরানো আলোয় সব ভালো দেখাও যাচ্ছে না। কেউ চীৎকার করছে—হল কি রে বাবা?

কে যেন বললে—হবে কি মশায়! মিলিটারী কনভয় চলছে বোধ হয় স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে!

—কিংবা ট্রামে বাসে ধাক্কা খেয়ে দুটোই কাত হয়ে পড়েছে ঘটোৎকচের মতন।

বিদেশী সেপাইগুলো অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে। ওরই মধ্যে একটা লরীতে জনকতক তারস্বরে গান ধরে দিয়েছে।

হঠাৎ একটা কথা দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ থেকে যেন গাড়ির মুখে মুখে ভেসে এসে পেরিয়ে গেল ওপাশের ফুটপাথ পর্যন্ত। ধর্মতলায় প্রসেসন আটকেছে পুলিস। গুলি চালিয়েছে। সব ট্র্যাফিক জাম্।

মনোরমা ক্লান্তভাবে চোখ বন্ধ করে পিছনের সিটে মাথা রেখে যতটা সম্ভব আধশোয়া অবস্থায় একরকম নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি চোখ খুলে মাথা তুলে শঙ্কা ও উত্তেজনায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বললেন—গুলি চলছে ? কেন ?

উত্তেজিত হয়ে অজয়ও উঠেছিল।—প্রসেসনের উপর গুলি ?

আজাদ হিন্দ দিবস ছিল যে আজ! কাগজে তো রয়েছে ! তবে কি—?

তার ভাবনা—মনোরমার উৎকণ্ঠা উত্তেজনাকে চাপা দিয়ে অকস্মাৎ চলতে লাগল ট্র্যাফিক।

হর্নের আওয়াজে গাড়ি ট্রাম প্রভৃতি যানগুলোর যান্ত্রিক ও গতির গর্জনের আওয়াজে মানুষের কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেছে। মনোরমা তারই মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন—গুলি কিসের জন্য চলল অজয় ?

—হয়তো—

—কি হয়তো—

—হয়তো আবার লাগল মা। বোঝাপড়ার তো শেষ হয়নি। আজ—

—কি আজ ?

—আজ আজাদ হিন্দ দিবস ছিল। সেই উপলক্ষ্য করেই হয়তো শুরু। এবার বোধ হয় বোঝাপড়া শেষ না হয়ে এ পালা শেষ হবে না।

মনোরমা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে তিনি সামনে কিছু দেখছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আর ছবিগুলো চোখের সামনে ভাসছিল। অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিতে এলোমেলো দ্রুতগতিতে ধাবমান ছবি। অথবা একটা মুছে অন্য একটা আবির্ভাবের মত চঞ্চল এলোমেলো। অনেক লোক এলোমেলোভাবে ছুটছে—মারামারি করছে—ধোঁয়া ধুলো—কয়েকটা সাদা কাপড়-জামা পরা সম্ভবতঃ মানুষের দেহ পড়ে আছে রাস্তায়। এমনিধারা অস্পষ্ট অবছা এলোমেলো ছবি। হঠাৎ মনে হয় ওই পড়ে থাকা মানুষগুলোর সবগুলিই অজয়। হঠাৎ মনে হয়—তাঁদের গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি—তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুয়ে আছেন। বাইরে কে গোঙাচ্ছে। দরজা খুললেন—দেখলেন অজয় পড়ে গোঙাচ্ছে। বুকের কাছটায় জামাটা রক্তাক্ত। তিনি চঞ্চল অধীর হয়ে উঠলেন। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসা মানুষের মত মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—ওরে অজয়!

—মা! কি হল ? অজয়ও চিন্তিত হয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত যেন অত্যুত্তপ্ত ধারায় বেয়ে চলেছিল—সে অনুভব করছিল কান গরম হয়ে উঠেছে—হাত জ্বলছে, মাথার মধ্যে তারও এলোমেলো চিন্তা; তার চিন্তা পাক খাচ্ছে একটি ধারণাকে কেন্দ্র করে। "বিপ্লব শুরু হয়ে গেল!" বিয়াল্লিশ সালের পর এই প্রথম শোভাযাত্রার উপর গুলি। অনেকগুলি মানুষ—না না, তাদের মানুষ বললে অপরাধ হবে—তারা শহীদ—শহীদ, অনেকগুলি শহীদের দেহ রাজপথে পড়ে আছে। পিছনের কিছু মানুষ পালাচ্ছে—কিছু নিশ্চয় স্থির আছে—তারা গর্জাচ্ছে—হাঁক দিচ্ছে। যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে এতদিন ধরে এই সংগ্রামের জন্য তাদের ডাক দিচ্ছে। তাকে ডাকছে! সে দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধার নাম কিনেছে সত্যকারের কোন কাজ না করে, তাকে এবার তো যেতে হবে! উত্তেজনা—তার সঙ্গে বিচিত্রভাবে ভয়ও খানিকটা মিশে আছে।

হ্যাঁ—অস্বীকার তো করতে পারবে না। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মধ্যে তার আভাস সে অনুভব করছে।

এমনি অবস্থার মধ্যে মায়ের চাঞ্চল্যে সে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে—মা, কি হল? মা!

মনোরমা বললেন—কিছু না। কেমন যেন হাঁফ ধরছে।

—হাঁফ ধরছে?

—ধরেছিল হঠাৎ। এখন কমছে।

তাঁর গায়ে হাত দিয়ে অজয় বললে—আজ জ্বর একটু বেশী হয়েছে!

—না না। বেশ আছি আমি। ওটা গাড়ির মধ্যে গরমের জন্যে হচ্ছিল।

নায়েব বললেন – তা হতেও পারে। আজ এতটা পথ এসেছেন—সেই দুপুরে বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে; পাল্কিতে হলেও রোদ ছিল। তারপর ট্রেন। তারপর এই ট্র্যাফিক জাম! আজ জ্বর একটু হবে বেশী।

হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে গাড়িটা এই মুহূর্তেই স্ট্রান্ড রোডে উত্তর মুখে মোড় নিল। গাড়ির ভিড় অপেক্ষাকৃত কমেছে ব্রিজের তুলনায়। কিন্তু তবুও ভিড় কম নয়। ফুটপাথে লোকজন ব্যস্ত হয়ে চলেছে যেন। অন্ততঃ অজয়ের তাই মনে হল। যেখানে কয়েকজনের জটলা সেখানেই যেন এই কথা হচ্ছে। যেখানে কেউ দ্রুত চলেছে, অজয়ের মনে হল জরুরী খবর নিয়ে চলেছে।

বাড়ির দরজায় এসে নামল তারা। সেখানে নামতে নামতেই সে শুনলে—শহীদ রামেশ্বরের জয়! রামেশ্বর তরুণ ছাত্র, সে গুলি খেয়ে ধর্মতলায় ঢলে পড়েছে। অনেক কয়েকজন আহত হয়েছে। শোভাযাত্রী তরুণ ছাত্রদল তবু হটে নি, পালায় নি—তারা বসে পড়েছে সারা ধর্মতলাটা জুড়ে। পুলিস তাদের পথরোধ করে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেরা উঠবে না। শরৎবাবু মশায়ের কাছে লোক গেছে। শ্যামাপ্রসাদের কাছে লোক গেছে।

অজয়ের ইচ্ছে হল ছুটে সে চলে যায় এই মুহূর্তে। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে পারলে না। তার মা বললেন—তিনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন তার মনের কথা, বললেন, তোকে আমি এর পর আটকাবো না। কিন্তু এই অবস্থায় আমাকে ফেলে তুই এখুনি ছুটে যাসনে!

অজয় বললে—না মা। তা আমি ভাবি নি। তাই কি পারি?

মনোরমা বললেন—পারে। চট্টগ্রামে আমি দেখেছি। মাটির দেশের মধ্যে যিনি মায়ের চেয়েও বড় মা তাঁর কান্না তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস যারা শোনে তারা পারে। আমিও তোকে বলেছি সেই প্রথম দিন—আমার আর বেঁচেই বা কি ফল? এই ব্যাধি নিয়ে বেঁচে থাকা মানে এই ব্যাধিকে ছড়িয়ে দেওয়া। তবু বাঁচতে সাধ হয় ইচ্ছে হয়, এই পাপ রাজত্ব কবে অবসান হবে সেই দিনটি পর্যন্ত!

তাঁর ঘরে বিছানায় শুয়ে একটু সুস্থ হয়ে মনোরমা বললেন—ডাক্তারটাক্তার যাকে যাকে দেখাবি দেখিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে তুই আমাকে দেশে রেখে বরং চলে আসবি। আমি, দেবতা মানি ঈশ্বর মানি—আমাদের বাড়িতে মা আছেন—তাঁর মুখে হাসি দেখি আমি চোখের পলকপড়া দেখি আমি—ওই দিকে তাকিয়েই আমার দিন রাত্রি কেটে যাবে। আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তুই কলকাতায় থাকবি বা যেখানে ইচ্ছে যা ইচ্ছে করবি। আমি ভাবব না!

অজয় একটু হেসে বললে—সে যা হয় হবে মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম কর, ঘুমোও।

আমি চৈতন্য নই আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্র নই—তাঁরা সব ছেড়ে গেছেন—যেতে পেরেছেন। আমি ছোট—অনেক ছোট, আমি তা পারব না - ততখানি পারব না! মোক্ষদা মোক্ষদা!

মোক্ষদা ঝি এসেছে দেশ থেকে- তাদের সঙ্গেই এসেছে; সে-ই মায়ের সেবাযত্ন করে সে বিছানা করে দিয়ে গিয়ে কোন্ কোণে আশ্রয় নিয়েছে, তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

—কোথায় গেল সে! মোক্ষদা! বলে হাঁকতে হাঁকতেই বেরিয়ে গেল অজয়। মোক্ষদা নীচে রান্নাঘরে এখানে নিযুক্ত করা ঠাকুরের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। উড়িষ্যাবাসী কলিকাতাপ্রবাসী ঠাকুরটির কাছে সে এসেছে এখানকার সংবাদের জন্য। ঠাকুর তাকে সাড়ম্বরে কলকাতার হাঙ্গামার কথা বলছে। বলছে—এখানে তো এ সব লেগেই আছে। কামাই কবে? হাঁ, তবে এবার নাকি কঠিন ব্যাপার। এবার তো গান্ধীর ব্যাপার নয়, এবার নেতাজী সুভাষ বোসের ব্যাপার। লোকে এবার নেতাজী নেতাজী ক'রে ক্ষেপেছে। ঝাণ্ডা তুলেছে। ঝাণ্ডা এবার চরকা মার্কা নয় বাঘ-মার্কা। বিয়াল্লিশ সালেই তো খতম হয়ে যেতো। যে সব বোমা পড়েছিল—এই তো হাতীবাগানে—বাপরে বাপরে বাপরে—সে যখন পড়িল না তখন যেন বজ্রপাতের মতো আলো হইল—হাঁ, চক্ষুতে আলো লাগিল তো মনে হইল অন্ধা হই গেল। তা পরেতে—বাবা—দশ-বিশটা বজ্রপাত—কড় কড় কড় দন কান কালা হই গেল! হাঁ। তা তেমন বোমা আর কয় দিন পড়িলে কলিকাতা থাকিত না। তো শুনিল কি সুভাষঅ বসু জাপানী দিগে হুকুম দিল—খবরদার—কলিকাতা বোমা ফেলি নষ্ট করিবে না। আমি নিজে গিয়া দখল করিব।

অজয় শুনে হাসলে না। তার ভাল লাগল। এই পাচকবৃত্তিধারী উড়িষ্যাবাসী একান্ত-ভাবে উদরান্নের জন্য কলকাতায় এসেছে, এরা শান্ত মানুষ—অনেকে বলে ভীরু এরা—মিথ্যাও তা নয়, যারা পাচক যারা সামান্য গৃহভৃত্য তারা যে কোন প্রদেশের হোক ভীরুই হয়ে থাকে কম আর বেশী; এই পাচকটির মনেও আজ সুভাষচন্দ্রের বিপ্লববহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ এসে অন্তরকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলেছে। এই আগুন যদি জ্বলে, ভাল ক'রে জ্বলে, তখন এরাই জ্বলবে দাউ দাউ করে; খড়ের মত জ্বলবে—অল্পক্ষণ আয়ু হয়তো, কিন্তু সেই অল্প-ক্ষণই প্রাণপণে জ্বলে হয়তো ছাই হয়ে যাবে। অজয় ঘরে ঢুকে মোক্ষদাকে বললে—তুমি উপরে যাও মোক্ষদা। মা একলা রয়েছেন।

—যাই দাদাবাবু। এই ঠাকুরের কাছে কলকাতার খবর শোনছিলাম। বলে কি কলকাতার জন (জোয়ান) জন ছেলেরা এবার ক্ষেপেছে—সুভাষ বোস ফৌজ পল্টন কামানটামান নিয়ে ঠিক হয়ে আছে, কলকাতাতে যেমন সব মারামারি হাঙ্গামা আরম্ভ হবে অমনি আকাশ থেকে দুম দুম ক'রে বোমা ফেলাবে আর কামান থেকে দুম দুম ক'রে গোলা ছাড়বে—লালমুখো সায়েবরা পালাবে—যাবার সময় মেরে কেটে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।

—তা যাক, তার আগে আমি তোমাকে মাকে দেশে গিয়ে রেখে আসব। যাও এখন মায়ের কাছে গিয়ে বস।

এর পর সে নিজের ঘরে গিয়ে বসল।

মনে তার উত্তেজনা রণরণ করছে। যেদিন সে জেল থেকে বের হয়েছিল সেদিন ক্লান্তিতে হতাশায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মিত্রপক্ষের জয় তখন সম্পূর্ণ। সে ভেবেছিল—বিজয়ী ইংরেজের সাম্রাজ্য আরো হয়তো একশো বছরের জন্যে স্থায়ী হয়ে গেল। ভেবেছিল—সারা ভারতবর্ষ নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ। মিলিটারী বুটের তলায় তার চেতনা হারিয়ে না গেলেও মুহ্যমান। গান্ধীজীর অহিংসাকে সে বার বার অভিশাপ দিয়েছে। অহিংসার পঙ্গুতায় জাতিটার জীবনের এত বড় তপস্যা ব্যর্থ হয়ে গেল। এত বড় যুদ্ধটা গেল—এর মধ্যে বিয়াল্লিশ সালে কিছু বলিষ্ঠ দুঃসাহসী যুবক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে করেঙ্গে ইয়া

মরেঙ্গে ধ্বনি তুলে বিপ্লবের আগুনের মশাল জেবলে রাত্রির আকাশকে স্বল্প কয়েকদিনের জন্য প্রদীপ্ত করেছিল—সে আগুন নিভিয়ে দিল ইংরেজ। গান্ধীজী উপবাস ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। নেতার অভাবে জাতটা উঠে দাঁড়াতে পারল না। সেই সুযোগে ইংরেজ দিল গলায় পা। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এদেশে ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিকের অভাব হল না। সব শেষ হয়ে গেল জাপানীদের আত্মসমর্পণে, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ে। কিন্তু আশ্চর্য কথা—বেরিয়ে এসে অবধি প্রতিটি দিনই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে।

এসে প্রথম দিন মাকে সে বলেছিল হতাশার কথা। মনে মনে তার বিশ্বাসও ছিল—সব গেছে—কিছু নেই। কিন্তু তারপর প্রতিদিন সংবাদের পর সংবাদে তার বিস্ময় জেগেছে। মরে নি তো। জাত তো মরে নি!

জুন মাস থেকে নতুন ক'রে ইংরেজ মিটমাটের চেষ্টা করছে। লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হয়ে এসেছেন। তিনি বড়লাটের কর্মপরিষদ নতুন করে গঠনের প্রস্তাব করেছেন—তাতে ভাইসরয় আর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ছাড়া বাকী সমস্ত সদস্য হবেন ভারতীয়। প্রদেশে প্রদেশে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট আবার গঠিত হবে। যুদ্ধ জয়ে ভারতবর্ষ সাহায্য করবে—যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ভারতীয়দের হাতে।

সিমলাতে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সে সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইংরেজ এখনও চেষ্টা করছে। গান্ধীজী জিন্না সাহেবের কাছে গেছেন হিন্দু মুসলমান বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য। মুসলীম লীগ ভারত বিভাগের ধুয়ো তুলেছে। বিচিত্র রাজনীতি। ইতিহাসের বিস্ময়কর শক্তি ও গতি। ইংরেজের আশ্চর্য কুট নীতি। কিন্তু ইংরেজের এত আগ্রহ মিটমাটের জন্য কেন?

বুঝতে পারে নি কেউ!

হঠাৎ প্রকাশ পেল। প্রকাশ পেল—১৯৪৫, এই বৎসরের মে মাস থেকে আত্মসমর্পণকারী আজাদ হিন্দ ফৌজের পল্টনদের বন্দী হিসাবে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সংবাদ অনেকদিন গোপন ছিল। কিছুদিন আগে আগস্ট মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটা বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার সৈনিক আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে আজ ভারতে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বন্দী হয়েছে—তাদের ভারতবর্ষে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে আমরা জেনেছি যে কিছু লোকের ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু এমন কঠিন দণ্ড নির্মম ব্যবহার নিশ্চিতরূপে ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। বিশেষ করে এখন ভারতবর্ষে অনতিবিলম্বে একটি বিরাট পরিবর্তনের কথাবার্তা চলছে। তারাও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। তাদের সঙ্গে এই সন্ধিক্ষণে সাধারণ বিদ্রোহী সৈনিকের মত ব্যবহার শুধু ভুল নয়, অন্যায়, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাদের সাধারণ অপরাধীর মত দণ্ডিত করলে সে অন্যায় দণ্ডের আঘাতে ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষের হৃদয় রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। বিক্ষোভ উঠবে।

কিছুদিনের মধ্যেই এ-আই-সি-সি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—"স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব সৈনিক অস্ত্রধারণ করেছে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হোক।"

কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেছে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, কর্নেল ধীলন এবং সাইগল তিনজন কম্যাণ্ডার বন্দী হয়েছেন—তাঁদের বিচার হবে লালকেল্লায়।

এই সংবাদের প্রতিবাদেই কলকাতায় বিপ্লবের অগ্নিকণা শুষ্ক ক্ষুব্ধ জীবনের উপর পড়ে তাকে বহ্নিমান করে তুলেছে। আকাশের গায়ে তার ছটা লেগেছে। এ আগুন নিভবে না। নিভতে পারে না। দুর্যোগাচ্ছন্ন আকাশে জমাট মেঘ ছিঁড়তে শুরু করেছে। কতকাল—কতকাল ঢেকে রাখবে? রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন—'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব

কত আর ?’

দেরি নেই। দিগন্ত দেখা যাচ্ছে।

জীবন উল্লাসময় হয়ে উঠেছে। কত কাজ কত কাজ !

‘একজন আহত অচেতন মানুষ মাটিতে পড়ে ছিল—অকস্মাৎ সে যেন উঠে দাঁড়াল—শুধু দাঁড়াল নয়, জীবনের সকল শক্তিকে প্রয়োগ করে যুদ্ধোদ্যত হয়ে হুংকার ছাড়লে।’

নিজের ডায়রীতে অজয় সেদিন লাইনটি লিখে ডায়রী শুরু করলে।

১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী ভোরবেলা তখন ; সারাটা রাত্রি সে ঘুমোতে পারে নি। ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪৬ সাল—নেতাজীর জন্মদিনের বিরাট শোভাযাত্রা - লক্ষ মানুষের মিছিল—তাদের সমবেত কণ্ঠস্বরের মধ্যে বজ্রধ্বনির প্রতিধ্বনি জয় হিন্দ্—তাদের চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুচ্চমকের আভাস সে দেখেছে। খোলা মোটরে নেতাজীর বিরাট প্রতিকৃতির পাশে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ দাঁড়িয়েছিলেন বিশস্ত সৈনিকের মত।

অজয় সারাটা পথ মিছিলের সঙ্গে হেঁটেছিল। ফিরেছিল রাত্রি দুপুরে। ক্লান্তিতে সারা দেহটায় শক্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও এই ক্লান্তি তাকে ঘুমে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বাকী রাত্রিটা সে খানিকটা সময় শুয়েছে আবার উঠেছে—পায়চারি করেছে বারান্দায় ; মনের মধ্যে উত্তেজনার এলোমেলো কল্পনা বর্ষার মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে একের উপর আর একটা এসে পড়েছে। মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বন্দীবীর কবিতা। মনে হয়েছে আজকের এই কোলাহল কলরব কি দিল্লীতে ভাইসরয় প্যালেসে ঘুমন্ত লর্ড ওয়াভেলের নিদ্রাভঙ্গ করেছে ? “দিল্লী প্রাসাদ কুটে, হোথা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।” ঘুম ভেঙে কি লর্ড ওয়াভেল ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিজেকেই প্রশ্ন করেছে—“কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে নিবিড় নিশীথ টুটে ? কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে ?” তার মনই বলছে—নিশ্চয়ই পেঁচেছে। নিশ্চয় ! মাথার শিয়রে টেলিফোন বেজে উঠেছে—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিরিং !

—লর্ড ওয়াভেল।

—ইউর এক্সেলেন্সি - ট্রাংক কল, ক্যালকাটা থেকে হিজ এক্সেলেন্সি দি গভর্নর অব বেঙ্গল মিস্টার কেসী কথা বললেন। বলছেন খুব জরুরী ! কলকাতার অবস্থা জানাতে চান !

—দাও। এক্ষুনি দাও।

সংবাদ শুনতে শুনতে কখনও এই সমরনায়ক রাজপ্রতিনিধির লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। কখনও চিন্তায় কপালের উপর সারি সারি বলিরেখা জেগে উঠেছে।

হঠাৎ সে আত্মবিস্মৃতের মত চিৎকার করে উঠেছিল - জয় হিন্দ্ ! মনে হয়েছিল এ চিৎকার টেলিফোনের তার বেয়ে ওয়াভেল সাহেবের কানের পর্দায় আছড়ে পড়বে। চমকে উঠে প্রশ্ন করবে—ওটা কি ?

—অজয় ! ও ঘর থেকে ডেকেছিলেন মা।

অজয়ের পদচারণার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে অজয়ের মায়ের হৃৎপিণ্ড তাল রেখে চলে। অজয়ের কাজে মনোরমা বাধা দেন না কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব যেন খোলা চিঠির মত পড়ে যান। তাঁর কানের মধ্যে যেন একদিনের কতকগুলি কথাবার্তা টেপ রেকর্ডিংয়ের মত বেজে বেজে ওঠে।

ডাক্তারের কথা। অজয়কে বলেছিলেন—ঘরে তোমার নিজের মা—বাইরে তোমার দেশমাতা। বেছে একজনকে নিতে হবে বাপু। এখন দুই মায়ের যাকেই চাও তার জন্য চব্বিশ ঘন্টার সেবা চাই। তবে আমি বলি কি—ঘরের মাকেই দেখ। দেশমাতার সন্তানের অভাব নেই। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ ছেলের সেবার দরকার হবে। সেই

চিতোরের কথা—ম্যয় ভ্রখা হুঁ। বুঝেছ। লক্ষ লক্ষ ছেলের অভাবও হবে না। দেশ স্বাধীন হবেই। ঘরে বসে যা পার কর। এ মা-টির তোমার এ রোগের কারণ আর কিছু নয় তোমার জন্যে ভাবনা—তোমার জন্যে ভেবে কুল না পেয়ে আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। তা থেকেই এটা হয়েছে। টি. বি এখনও হয় নি। তবে কাছাকাছি বটে। ড্রাই প্লুরিসি। চিকিৎসা যতই করাও—সেবা যতই কর, উনি নিজে বাঁচতে না চাইলে বাঁচানো যাবে না। রোগীর কো-অপারেশন না পেলে ওষুধ বদ্যি পথ্যি কিছুতেই কিছু হবে না।

অজয় চুপ করে ছিল, কথা বলে নি।

ডাক্তার বলেছিলেন—কি, কথাটা মনঃপূত হল না? আজকালকার young man তো! শোন—আমিও জেল খেটেছি—দেশের সেবা করেছি, করিও। তুমি তো জান। আমি হলে বাপু মাকে নিয়েই এখন থাকতাম। দেখ, ভেবে দেখ।

ডাক্তার কেউ নন—ডাক্তার রায়—বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার চলে গেলে মনোরমা অজয়কে ডেকে বলেছিলেন—আমাকে তুই কাশীতে রেখে আয়। সেখানে ও'র প্রেসকৃপসন মত চিকিৎসাও হবে স্থান পরিবর্তনও হবে—আমিও বিশ্বনাথকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারব। তুইও এখানে তোর কাজ—

বলতে বলতে এইখানেই হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল—চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সব সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়ে।

অজয় আর থাকতে পারে নি, সে মায়ের অভিমান বুঝতে পেরেছিল, সে বলেছিল—না মা, তোমাকে সারিয়ে তোলার আগে আমার অন্য কোন কাজ নেই, থাকতে পারে না। এখানেই যতদিন না ইনজেকসন কোর্স শেষ হয়—চিকিৎসার ফল না বুঝতে পারি ততদিন এখানেই থাকতে হবে। শুধু ভয়—তুমি আমার জন্যে অকারণ না ভাবো—আমাকে অবিশ্বাস না কর।

—তোকে আমি অবিশ্বাস করি অজয়?

—তা হয়তো কর না। কিন্তু অকারণ ভাববে তো। আমি বাইরে বেরিয়ে ফিরতে দেরি হলে ভিতরে ভিতরে ছটফট করবে। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে পথের দিকে তাকিয়ে। আমি সেই কথা বলছি। মনকে তুমি শক্ত কর। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, তোমার অনুমতি না নিয়ে কোন কিছু করব না।

মা তার মাথাটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন —ভাবব না।

সে কথা অজয় রেখেই চলেছে—মনোরমার উন্নতিও হয়েছে খানিকটা—কিন্তু যেমন আশা করেন চিকিৎসকেরা ততটা হয়নি। মনোরমা অন্তরের উদ্বেগ কঠিন সংযমের আবরণে ঢেকে রেখেছেন কিন্তু উদ্বেগের সীমা নেই। কর্তব্য আর মমতা দুইয়েরই দ্বন্দ্বে তাঁর শান্তি নেই। অজয়ের মুখের প্রতিটি ভঙ্গির বিশ্লেষণ করে মনে মনে তার ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে তাঁর নিদ্রাকে তিনি গাঢ় হতে দেন না। অথবা মনের উগ্র উৎকণ্ঠার জন্য ঘুম সামান্য শব্দে ভেঙে যায়। কলকাতা এবং দেশের অবস্থা দিনে দিনে যেন কোন অনিবার্য ভয়ংকর দিনের সম্মুখীন হচ্ছে।

রেডিয়োতে খবর বলে দিনে কয়েকবার। ভোরবেলা খবরের কাগজওলা হেঁকে যায়। এমন কোন দিন নেই যেদিন খবরে বলে -শান্ত পৃথিবী প্রসন্ন পৃথিবী, কাল আর চাঞ্চল্যকর কোন কিছু ঘটে নি। কোন কোন দিন বিকেলবেলাতে হকার হাঁকে—সায়গল ধীলন শাহনওয়াজের বিচার হয়ে গেল বাবু। জোর খবর। জোর খবর!

সায়গল ধীলন শাহনওয়াজ তিনজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কের লালকেল্লায়

বিচার। ভুলাভাই দেশাই অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও দীর্ঘদিন পর আইনজ্ঞ হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

ভুলাভাই দেশাই বলেছেন—ওই তিন সেনানায়ককে বলেছেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের আমাদের মহান নেতা নেতাজী আর তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে যদি পারি তবে আমি আপনাদের বাঁচাব। সে মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বাঁচাবার চেষ্টা আমি করব না। আপনারাও আশা করি সেক্ষেত্রে সগৌরবে হাসিমুখে দণ্ড হিসাবে প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারবেন।

তিনজন সেনানায়ক হাসিমুখে জয় হিন্দ্ বলে সম্মতি দিয়েছিলেন। দিনের পর দিন এই বিচারের সংবাদ দেশের মানুষের বুকে বুকে উত্তেজনার উম্মাদনার তরঙ্গ তুলেছে। মনোরমাও অনুভব করেছেন—তার সঙ্গে মনে হয়েছে বিচিত্রভাবে সব যেন পালটাচ্ছে—বদলাচ্ছে। এই পালটানোর মধ্যে এই বদলানোর মধ্যে যেন ভয়ংকরের পদধ্বনি উঠছে। এরই মধ্যে সংবাদ এল তিনজন সেনানায়ক সসম্মানে মুক্তি পেয়েছেন।

কলকাতায় সেদিন কি উচ্ছ্বাস! কি উল্লাস! কি জয়ধ্বনি!

তারপর এল ২৩শে জানুয়ারী—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। কলকাতায় সারা ভারতবর্ষের উল্লাস উথলে উঠল। শাহনওয়াজ এলেন। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট মিছিল—সভা—জয়ধ্বনি। প্রতিটি মানুষ অনুভব করলে তার বুকের ভিতর সারা ভারতবর্ষ যে শক্তিতে সাহসে সংকল্পে অধীর আগ্রহে থরথর করে কাঁপছে তার প্রতিধ্বনি উঠছে। অজয়কে তিনি নিজেই ডেকে বলেছিলেন—তুই যাবি নে অজয়?

—তুমি বল তো যাব।

—আমি বলছি, তুই যা।

—তুমি ভাববে না তো?

—না।

—না মা, থাক। তুমি মুখে বলছ যা—কিন্তু আমি বের হবার পাঁচ মিনিট পর থেকেই তুমি ঘর আর বারান্দা করতে শুরু করবে।

—না—না—না। তুই যা অজয়। আমি বলছি—আমি বলছি—আমি বলছি। যা তুই।

সারাটা দুপুর তিনি ঘরে সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়েছেন—শঙ্খধ্বনি করেছেন—বাড়িটার বারান্দায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ডেকে আলোর সারির ব্যবস্থা করেছেন। অজয় দুপুরে খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরেছে অনেকটা রাত্রে—দশটার পর।

মনোরমা হেসে বলেছেন—জিজ্ঞাসা কর্—আজ আমি একটুও ভাবি নি।

অজয়ের মুখে ক্লান্তির ছাপ—কিন্তু থমথম করছিল। সে একটু হাসতে চেষ্টা করেছিল—পারে নি।

মনোরমা শঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন—শরীর ভাল আছে তো রে? চোখ ছলছল করছে যে।

অজয়ের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

—কি হল রে?

—হয় নি কিছু মা। কি বিরাট মানুষ—কি সাহস—কি বীরত্ব—সেই সব শুনে এলাম মা। তাই—।

মা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর খুঁজে পান নি।

অজয় বলেছিল—এই মানুষ নেই এ কি হতে পারে?

মনোরমা সেদিনের সব বাঙালীর মতই তারস্বরে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—হতে পারে না। তিনি নিশ্চয় আছেন। ঠিক দেখতে পাবি দেশে বিপ্লব শুরু হলেই তিনি এসে হাজির হবেন। জয় হিন্দ্ বলে সামনে দাঁড়াবেন।· কিন্তু তুই গরম জলে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেল, গাটাও মুছে ফেল। কিছু খা। তারপর শুয়ে পড় বাবা। বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। খুব ক্লান্ত তুই।

খেয়েদেয়ে শুয়েও অজয়ের ঘুম আসে নি।

সে বিছানাতে আড়ষ্ট হয়ে জেগে চোখ মেলে কল্পনার জাল বুনে চলছিল। এলোমেলো কল্পনা—চিন্তা। মধ্যে মধ্যে উঠে বসছিল। হঠাৎ সে বাইরে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আজকের আলো দেখে আর মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বরে জয়ধ্বনি শুনে ভাবলে দিল্লীতে লর্ড ওয়াভেল কি করছেন এখন?

ঘুম কি ভেঙেছে? টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে এ ধ্বনি কি তাঁর কানে প্রবেশ করছে?

উত্তেজনায় সে আত্মবিস্মৃতের মতই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মনোরমাও জেগে অন্ধকারের মধ্যে কান পেতে চোখ চেয়ে প্রতিটি শব্দধ্বনিকে ব্যাখ্যা করছিলেন নীরবে। এবার আর পারলেন না থাকতে। ডাকলেন—অজয়।

অজয় চমকে উঠল—মা।

—তুই ঘুমুস নি বাবা?

—না মা, ঘুম আসে নি।

—ঘুমো বাবা। শরীর খারাপ হবে।

—ঘুম আসছে না মা। মনে হচ্ছে স্বাধীনতা আসছে। সূর্যোদয়ের দিগন্তে সকাল হওয়ার সংগে সংগে দেখতে পাব।

সেদিন রাত্রে হয়তো, হয়তো নয় নিশ্চিতই যে এই মহানগরীর বহুজন অজয়ের মতই ঘুমোয় নি; শুধু মহানগরীতেই বা কেন, সারা দেশে। বাংলাদেশ ছাড়াও সকল প্রদেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে।

১৯১৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী।

লাল কেল্লায় সামরিক আদালতের বিচারে নেতাজীর সমরনায়কেরা মুক্তি পেয়েছেন। সে বিচারের মধ্যে এই কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অক্ষশক্তির করুণাদত্ত অন্নপুষ্ট কোন স্বার্থপর ভাড়াটে ফৌজ ছিল না। জাপানীদের ভারতবর্ষ দখল করতে তারা অস্ত্র ধারণ করে নি; ভারতবর্ষে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে উচ্ছেদ করে দেশের স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

—"তোমরা তোমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দাও—আমি আনব ভারতের স্বাধীনতা।"

নেতাজীর কণ্ঠস্বরেই যেন এই কথাটি চারি দিগন্তে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—মানুষ শুনেছিল। সে বৎসরে নেতাজীর জন্মদিবসে যে আশ্চর্য মানসোল্লাস মানুষ অনুভব করেছিল তার স্বাদ তার ক্রিয়া এ দেশের ইতিহাসে নূতন—বোধ করি কখনও আর আসে নি।

মহাজীবনের আবির্ভাব এ দেশে নূতন নয়। মহাজীবনের আবির্ভাবের ফল বা আস্বাদ পূর্ণ পরিমাণে বুঝতে পারে তাঁদের তিরোধান দিবসে পরম বেদনার মুহ্যমানতার মধ্যে। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব সেকালে এক দিনে এক প্রহরের মধ্যে দেশে প্রচারিত হয় নি; সে কাল ছিল অন্য কাল; সে বার্তা ধীরে ধীরে ছড়িয়েছিল দেশে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবে কলকাতা মুহ্যমান হয়েছিল সেই দিনই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব বেদনা তিরোভাবের পূর্ব থেকেই মানুষকে উৎকণ্ঠিত উদ্বেলিত করেছিল। তিরোভাবের পর একটা মুহ্যমানতা অসাড় করে দিয়েছিল দেশ এবং মানুষকে। ১৯৪১—১৩৪৮ সালের ২১শে শ্রাবণ।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর আবির্ভাব দিবস মুহ্যমানতার দিন নয়। সেদিন সে-আবির্ভাব দিবসে তিরোভাবের বেদনার আচ্ছন্নতা ছিল না—আকস্মিক নয় আবির্ভাবের প্রত্যাশার বিপুল উল্লাস এবং তার সঙ্গে আশ্বদয়নের মধ্যে মহাজীবনে জাগরণের আহ্বানের উত্তেজনা ছিল। সেদিনের সেই বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের সামরিক বাদ্য বেজেছিল—তার সংগীতের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল মানুষ!

—"তোমাদের বুকের রক্ত দাও—আমি আনব ভারতের স্বাধীনতা।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনেছিল তারা। কেউ বিশ্বাস করেনি বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর কথা। মিথ্যা, এ সাম্রাজ্যবাদীর মিথ্যা রটনা। মানুষ কানে শুনতে পাচ্ছিল অশ্বক্ষুরধ্বনি। যারা অতি আধুনিক তারা শুনেছিল মেকানাইজড আর্মির যন্ত্রযান ঘর্ঘর। ব্রহ্ম ও ভারত সীমান্তে আসছেন নেতাজী। রহস্যময় বিরাট পুরুষ—যিনি একাকী এ দেশের ইংরেজের সতর্ক প্রহরা অতিক্রম করে খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হয়ে আফগানিস্থান, রাশিয়া অতিক্রম করে জার্মানীতে পৌঁছেছিলেন—যিনি হাজার হাজার মাইল সমুদ্রের তলদেশের পথ অতিক্রম করে এসে ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে হাঁক দিলেন—বিরাট সামরিক বাহিনী সংগঠন করে কোহিমায় এসেছিলেন, তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হবেন এ অবিশ্বাস্য। মিথ্যা—মিথ্যা—ছলনা। আনন্দের সঙ্গে উল্লাস সহকারে মানুষের মনে হয়েছিল এ নেতাজীর নব আবির্ভাব দিবস।

যে কোন মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠবে। যে কোন মুহূর্তে। এবং সেদিনের উত্তেজনার মধ্যে মানুষ বিশ্বাস করেছিল আজই যে কোন মুহূর্তে।

অনেকে বার বার তাকিয়েছিল খোলা মোটরের উপর স্থাপিত তাঁর বিরাট প্রতিকৃতিটির দিকে। মানুষের বিশ্বাসে সেদিন অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল ওই প্রতিকৃতিই হয়তো সজীব মানুষ হয়ে উঠে হাত তুলে বজ্রনির্ঘোষে বলবেন—

"এসেছি আমি। Here I am! ঘোষণা করছি—আমরা স্বাধীন। তোমাদের বুকের রক্ত তোমরা ঢাল। ঢেলে দাও।"

মানুষের বুক সেদিন একটি পাত্রের মত হয়ে উঠেছিল—উষ্ণরক্তে পরিপূর্ণ করে মানুষ দুই হাতে ধরে প্রতীক্ষা করেছে সারা পথ। কিন্তু শোভাযাত্রা সভা শেষ হল—সে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল না। মানুষ ঘরে ফিরল কিন্তু হতাশ হল না।

একটা আশ্চর্য প্রত্যাশা এবং দুরন্ত উন্মাদনায় অধীর হয়ে তারা জেগে রইল। তরুণ এবং তরুণীর সংখ্যাই বেশী। বোধ হয় শত শত। অনেকে সেই শীতের রাত্রে জেগেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি—ছাদে উঠে পায়চারি করেছে। কান পেতে থেকেছে। রেডিয়ো খুলে কেবলই নব ঘুরিয়েছে। কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে। হতাশ হয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে ছাদে উঠেছে। বার বার কানকে তীক্ষ্ন করে শুনতে চেয়েছে—একটি মৃদু গুঞ্জন উঠছে না অন্তরীক্ষে, অনেক—অনেক উঁচুতে। গুরু গুরু গুরু গুরু! প্লেন! প্লেন আসছে না!

সাইরেন—যা আজ অনেক দিন বাজে নি তা বাজছে না ককিয়ে ককিয়ে?

তারপরই হয়তো শব্দ হবে বোমার। ধ্বক করে একঝলক আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।

তারপরই শব্দ হবে—কট-কট-কট-কট। মেসিন গান। দুম দুম! রাইফেল। বিপুল উচ্চনাদী শব্দে বোমা ফাটবে—দুম্।

তারা ছাদের উপর থেকে ছুটে নেমে যাবে। বাইরের দরজা খুলে পথে নামবে। যুদ্ধ—স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বক্ষরক্তভরা পাত্রখানি ঢেলে দিয়ে আসতে হবে। চল্—চল্।

নিরস্ত্র ? তাতে কিছু যাবে আসবে না। অস্ত্র আপনি আসবে।

—নমি! নমি—! অ নমি! রাত্রি তিনটের সময় প্রৌঢ়া হরিপ্রিয়া উঠে নমিতাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে ডাকছিল।—নমি—! কোথায় গেলি!

—কি বিপদ দেখ দেখি! মাঘ মাসের শীতের রাত্রি—এই রাত্রে কোথায় খুঁজব আমি! এই সারাটা দিন মিছিলের সঙ্গে ঘুরে এলি ; এসেও সোয়াস্তি নেই শান্তি নেই ? কি কপাল আমার!—বাঃ বাঃ বাঃ!

হরিপ্রিয়া বারান্দার দরজা দেখলে বন্ধ। বারান্দায় থাকবে বলেই মনে হয়েছিল তার। মিছিল থেকে ফিরে নমিতা চুপ করে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। অনেকবার বলার পর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ঘরে এসে শুয়েছিল। তারপর হরিপ্রিয়া ঘুমিয়ে গেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং শব্দে তিনটে বাজতেই তার ঘুম ভেঙে গেছে। এই সময় তার ঘুম ভাঙে একবার। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে ; ঘুম এই সময়ে নিত্যই ভাঙে এবং এরপর আর ভাল ঘুম হয় না। আলো না জ্বেলেই অভ্যাসের ইঙ্গিতে সে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ফিরে এসে শুতে গিয়ে মনে হল নমিতার সাড়া তো পাচ্ছে না! মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে গাঢ় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা শব্দ ওঠে। কই, তা তো উঠছে না! সে ডেকেছিল—নমি! সাড়া পায় নি। এগিয়ে গিয়ে নমিতার তক্তাপোশে তার বিছানায় হাত দিয়ে বুঝেছিল নমি বিছানায় শুয়ে নেই। তখন আলো জ্বেলেছে। কোথায় গেল নমিতা ?

নমিতা ব্রাহ্মণের মেয়ে। সে—তার জাতি নেই। নীচতম জাতি থেকেও বোধ করি নীচ। কারণ তাদের একটা জাত থাকে, তার নেই। তার মা ছিল দেহ-ব্যবসায়িনী। তারও জীবন শুরু হয়েছিল ওই ব্যবসায়ে। তারপর সে ঢুকেছিল রঙ্গমঞ্চে। অভিনয় করতে গিয়ে সে পেয়েছিল প্রতিষ্ঠা। প্রচুর প্রতিষ্ঠা, তার সঙ্গে অর্থও উপার্জন করেছিল। তারও থেকে বেশী পেয়েছিল ; একটি মানুষকে পেয়েছিল ; একজন খ্যাতিমান অভিনেতা নাট্যকার তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। সন্তান পেয়েছিল। কন্যা। এ থেকেও আরও বড় কিছু সে পেয়েছিল — পেয়েছিল অভিনয় করে-করে আশ্চর্য একটা মন।

এ মন ব্রাহ্মণের মন থেকে ছোট মন নয়। এ মন ধর্ম জেনেছিল অধর্ম জেনেছিল—ন্যায় বুঝেছিল অন্যায় বুঝেছিল ; শ্লীল চিনেছিল অশ্লীল চিনেছিল—নূতন কথা শিখেছিল—ভদ্র কথা ; অভদ্র কথা তাদের পুরানো কথা ভুলেছিল—তার সঙ্গে যা তার ছিল না তাও পেয়েছিল। জাতও একটা পেয়েছিল—সেটা আপনাআপনি যেন তাকে এসে আশ্রয় করেছিল। সে জাত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ শূদ্র জাত নয় — সংসারে এ সব ছাড়াও দুটো জাত আছে —ভদ্র জাত আর অভদ্র জাত ; তার মধ্যে ভদ্র জাতিধর্ম সে পেয়ে গিয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী অনেক আছে অনেক গেছে—এ সুযোগ মোটামুটি সবাই পেয়েছে—কিন্তু সবাই এ পায় নি— সে পেয়েছে। পেয়েছে হয়তো ওই মানুষটির গুণে আর তারও নিজের শক্তিতে কিছুটা বটে। সে রঙ্গমঞ্চে অনেক বড় বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছে। তার ভিতরে যে শিক্ষাটি ছিল সেটা সে পেয়েছে। হয়তো তার গুণেও বটে। বাংলাদেশের বড় বড় মানুষের সমাজের প্রশংসাই শুধু সে পায় নি, তাঁদের অনেকের সঙ্গে সে এই জাতের জোরে কথা বলেছে—তাঁদের নমস্কারও পেয়েছে। তাঁদের অনেকজনকেই সে প্রণাম করেছে কিন্তু সমানের মত নমস্কার করেও সে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে নি। জন্মগত জাতি বিদ্যালয়গত শিক্ষা না পেয়েও সে রঙ্গমঞ্চ এবং এই মানুষটির কাছ থেকে যা পেয়েছিল তাতে তার জীবন ভরে গিয়েছিল। সেই ভরা জীবন দুটো আঘাতে ভেঙে পড়ে খালি হয়ে গেল। প্রথমেই গেল তার মেয়েটি। মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিল তারা। সে এবং মেয়ের জন্মদাতা অভিনেতা ও নাট্যকার। ভবিষ্যৎ

স্থির করতে পারে নি কিন্তু লেখাপড়া শেখাচ্ছিল। অভিনেত্রী করতে ইচ্ছে তার ছিল না। তাঁর ছিল। মতান্তর তর্ক অনেক হয়েছিল—মীমাংসা হয় নি। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল —পড়ুক এখন তো। মেয়েকে তাদের জন্মগত যে শ্রেণী সেই শ্রেণীর শ্রেণীস্বভাব থেকে বাঁচাবার জন্য ওই অঞ্চলের বাস তুলে ভদ্র অঞ্চলে বাসা নিয়েছিল।

হঠাৎ মেয়ে মারা গেল।

হরিপ্রিয়া এক আঘাতে শুয়ে পড়ল। সন্তান তার শেষ বয়সের—অনেক কামনার ধন। অনেকটা বয়সে বত্রিশের পর মেয়ে তার কোলে এসেছিল। বারো বছর বয়সে 'নমিতা'—কন্যার নাম ছিল নমিতা—নমিতা মারা গেল। নমিতার জন্মদাতা বাইরে ভেঙে পড়েন নি কিন্তু ভিতরে ভিতরে বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। এক বৎসর পর তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন।

হরিপ্রিয়া কন্যার মৃত্যুর পর অভিনয় ছেড়েছিল। আবার সে তাঁর জন্য অভিনয়ে নেমেছিল। তাঁর শেষ নাটকখানিকে সফল এবং সার্থক করে তুলতে। তাও সে করেছিল। এক বৎসর যেতে না যেতে যুদ্ধ এল এদিকে। রেঙ্গুন পড়ে গেল। কলকাতায় নিষ্প্রদীপ হল আর সাইরেনের মহড়া চলতে লাগল। মানুষ দলে দলে পালাতে লাগল। পঙ্গু নাট্যকার অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন সাইরেনের অত্যাচারে। সাইরেন বাজলেই কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করতেন।

তাঁর জন্যই কলকাতা ছাড়ল হরিপ্রিয়া। তিনি এলেন কাশী। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ছোট দুটি পুত্র। হরিপ্রিয়াকেও ডেকে বলেছিলেন - তুমিও চল। শেষকালটায় দেখা হবে না?

হরিপ্রিয়া কাশী এসেছিল বাড়িতে তালাবন্ধ করে। নীচের তলায় ভাড়াটে ছিল, তারাও তখন কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। বাড়ি হরিপ্রিয়ার নিজের। কাশীতে এসে নাট্যকার মারা গেলেন বছরখানেকের মধ্যেই। তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা ফিরে গেল কলকাতায়—নাট্যকারের বড় দুই ছেলে সেখানে চাকরে। স্ত্রীর স্বামী গেলেন কিন্তু সন্তানেরা তাঁকে জড়িয়ে রইল। হরিপ্রিয়াকে জড়াবার আর কেউ রইল না কিছু রইল না। দৃষ্টি ফেরালে হরিপ্রিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে গঙ্গার দিকে।

মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসত; থাকত কিছুদিন বা কয়েকদিন—তারপর আবার ফিরে যেত। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় গেলে তাকে ডাকত রঙ্গমঞ্চের কর্তারা, কিন্তু সে তা যায় নি!

তারা বলত—আপনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন? এইটেই তো আপনার সাধনা!

হরিপ্রিয়া বলত—কে বললে ছেড়েছি? অভিনয় তো করছি। বড় রঙ্গমঞ্চে! বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে! ভক্তিমতী বিশ্বনাথ সাধিকার ভূমিকায় অভিনয় করছি। কিন্তু—

তারা প্রশ্ন করত না, চুপ করে থাকত।

হরিপ্রিয়া বলত—কিন্তু—। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলত—এ ভূমিকায় হয়তো ব্যর্থ—একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু উপায় তো নেই—শেষ পর্যন্ত করে তো যেতে হবে!

হরিপ্রিয়া জানত না নাটকে তার চরিত্রে আছে আশ্চর্য অভাবনীয় সংঘটন। তাই ঘটল। সব পরিবর্তন হয়ে গেল।

একটি চৌদ্দ বছরের অচেতন মেয়ের শিয়রে একদিন অদৃশ্য নাট্যকার তাকে টেনে এনে বসিয়ে দিল। মেয়েটার মা মারা গেছে দু'দিন আগে। বসন্তে মারা গেছে। মেয়েটা প্রবল জ্বরে অচেতনপ্রায়। ওদের বাড়ির বাসিন্দারা ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তাকে বিদায় করবার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দিয়েছে।

পাশাপাশি জানালা ছিল।

জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিল হরিপ্রিয়া। মেয়েটা জল-জল বলে কাতরাচ্ছিল। একসময় তার চোখে দৃষ্টি পড়তেই সে চিৎকার করে উঠেছিল—ও মা—এস—জল! ওখানে কি করছ? আমি যে মরে যাচ্ছি! ও মা!

চমকে উঠেছিল হরিপ্রিয়া।

কি বলছে মেয়েটা। তার নিজের মেয়ের অসুখ হলে একটুখানি সরে গেলে ঠিক এই বলে চিৎকার করত। তিরস্কার করত।

—ও মা! এস। জল! ওখানে কি করছ? আমি যে মরে যাচ্ছি! ও মা!

হরিপ্রিয়া ওদের জানত, পরিচয় হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ওর মা ওকে দিদি বলত। মেয়েটি বলত মাসীমা। আজ অকস্মাৎ সে তাকে 'মা' বলে ভ্রম করলে। এবং ঠিক সেই কথা-গুলিই বললে যা তার মেয়ে নমিতা বলত।

ওর নাম নমিতা নয়।

তার মেয়ে নমিতার কথাগুলি অবিকল বলেছিল এই মেয়েটি জ্বরের ঘোরে। হরিপ্রিয়ার ভাববার বা বিবেচনা করবার অবকাশ হয় নি সেদিন সে মুহূর্তে যে এ কথাগুলি ছোট মেয়েদের সাধারণ কথা, অসুখের সময় মা একটু দূরে চলে গেলেই সবাই এমনি করে এই কথাগুলিই বলে। ওই মুহূর্তটা পার হয়ে গেলে হয়তো হরিপ্রিয়া তাই ভাবত কিন্তু পার হয়ে যায় নি। প্রবীণা অভিনেত্রী জীবননাটকের এই বিশেষ মুহূর্তটিতে আগে আগে নকল নাটকে যে সব ভাল ভাল হৃদয়বতীর ভূমিকা করে এসেছে তারই নির্দেশে ছুটে নেমে গিয়েছিল নীচে—তারপর ও বাড়িতে। ও বাড়িতে গিয়ে নিজের শক্তি বিবেচনা না করেই চৌদ্দ বছরের মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল এবং নিজের বাড়িতে এনেছিল। নিজে বয়ে আনতে পারে নি, ও বাড়ির দাঈ তাকে সাহায্য করেছিল।

হরিপ্রিয়ার ছিল দোতলায় দুখানি ঘর একখানি দরদালানের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসা। বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই সে থাকত। এই মেয়েটির মা তার মেয়েটিকে নিয়ে থাকত গলির ওদিকের ঘরে। একখানি ঘরে মা ও মেয়ে। পরিচয় হয়েছিল। অন্তরঙ্গ পরিচয়। বেশ বছরখানেক ধরেই পরিচয়। তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন বাধা ছিল। হরিপ্রিয়াও এদিকে তাকাতো না। তারপর তিনি যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী চলে গেল ছেলেদের নিয়ে, একা হরিপ্রিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরচূড়া থেকে চোখ নামালেই দেখতে পেতো মা ও মেয়েকে।

মা করত কঠিন পরিশ্রম। জামাকাপড় সেলাই—কাপড়ে ফুল তোলা। উপার্জন ছিল সামান্য কিন্তু সম্বল সঞ্চয় ওদের ছিল। তাই থেকেই চলত আসলে—উপার্জনটুকু ফাউ।

মায়ের নাম আরাধনা দেবী—মেয়ের নাম শ্যামা।

শ্যামা পড়ত ইস্কুলে।

আরাধনা মারা গেল বসন্ত হয়ে। মেয়ের জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে হরিপ্রিয়াকে মা ভ্রম করে ডাকলে মা বলে। হরিপ্রিয়া ছুটে এসে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর বসন্ত হল শ্যামার।

শিয়রে মায়ের মত বসে হরিপ্রিয়া সেবা করে বাঁচালে তাকে।

হরিপ্রিয়ারও হল বসন্ত কিন্তু সে অল্পে অল্পেই গেল। জীবনের নাটকে আবার মোড় ফিরল হরিপ্রিয়ার। নতুন অঙ্ক আরম্ভ হল। হয়তো পঞ্চম অঙ্ক। নতুন করে ঘর বাঁধল হরিপ্রিয়া। মেয়েটিকে বাঁচিয়ে সে যেন যমের উপর শোধ নেওয়ার মত খুশী হল। নমিতাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এবার সে শ্যামাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। শ্যামাই তার নমিতা। নমিতাই দিলে সে নতুন নাম।

শুধু আক্ষেপ—মেয়েটি ছিল পরমা সুন্দরী। বসন্ত হয়ে তার দাগে মেয়েটির সেই

মুখখানিকে যেন ক্ষতবিক্ষত বিকৃত করে দিয়ে গেল। তার জন্য সে করেছিল অনেক। ডাবের জল দিয়ে মুখ ধোওয়ালো। দুধের সরে মসুরবাটা মেখে মাখালো। স্নো পাউডার অনেক কিছু করেছিল প্রথম প্রথম।

তারপর একদিন হঠাৎ মনে হল—থাক।

নমিত র এই রূপ না থাকাই ভাল। নমিতা কিশোরী। বছর কয়েকের মধ্যেই যুবতী হবে। তার নিজের জীবন মনে পড়ল। না। সেই ইতিহাসের ধারা যদি এসে প্রলুব্ধ করে—তোমার পথে তোমার মেয়েকে চালিত কর। প্রতিষ্ঠা তার হাতে তুলে দিয়ে যাও! না। তা হবে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে।

তার উপর নতুন নমিতা লেখাপড়ায় ভাল। খুব ভাল।

নমিতা পড়ুক। তারও নতুন জীবন হবে নমিতার কল্যাণে।

নমিতা ওখানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলে। কলেজেও ভরতি হল। অর্থ শ্যামার মায়েরও কিছু ছিল। সাত-আট শো। তার নিজের সঞ্চিত অর্থ বসে খেয়ে ফুরিয়ে এলেও মাসের বাড়িভাড়াটা আসত কলকাতা থেকে। আদর করে পাঠাতেন পুরনো আমলের থিয়েটারেরই একজন সহৃদয় ব্যক্তি। তিনিই হঠাৎ চিঠি লিখলেন—ভাড়াটে যারা আছে তারা নিজের ইচ্ছামত ঘর ভেঙেচুরে মেরামত করছে। মতলব ভাল নয়। তার আসা প্রয়োজন। একান্ত জরুরী।

হরিপ্রিয়া মেয়েকে রেখেই কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর গিয়ে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এল। কলকাতার বাড়ি হারাতে হবে না হলে।

কলেজে ভরতি করে দিয়েছে।

নমিতা—তার কাছে তার হারানো মেয়ে নমিতা। তার নাম শ্যামা। আসল নাম উমা। উমা তাকে সব বলেছে। তার মায়ের নামও আরাধনা নয়—সাধনা।

সে সব কথা শুনে শিউরে উঠেছে হরিপ্রিয়া। আবার আশ্চর্য আনন্দও অনুভব করেছে। তাই কাল যখন স্বেচ্ছাসেবিকা সেজে সে বললে—মা, হয়তো দেরি হবে—ভেবো না যেন।

ভাবনা! তোর জন্যে ভাবনা! মনে মনেই বলেছিল হরিপ্রিয়া।

সেও মনে মনে কামনা করেছিল নেতাজী যেন আজই ফিরে আসেন। সে নমিতার হাত ধরে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আসবে।

সে তো দেখেছে নেতাজীকে তার অভিনেত্রী জীবনে।

কিন্তু নমিতা গেল কোথায় এই শীতের রাত্রে।

—নমি—অ—নমি!

ছাদের দরজা খোলা। ছাদে? কি বিপদ! এ মেয়েকে নিয়ে সে কি করবে?

হরিপ্রিয়া ছাদে উঠে দেখলে হ্যাঁ—নমিতা—আলসেতে বুক দিয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আজকের দিনের একটি উত্তেজনা—একটি অসম্ভব কল্পনা সকলকেই আচ্ছন্ন করেছিল—তবে নমিতার আর হরিপ্রিয়ার মন এক নয়।

কালবৈশাখীর ঝড় সমুদ্রে বা মেঘনা পদ্মার বুকে একরকম—আবার খোলা প্রান্তরে একরকম—বসতির মধ্যে একরকম। ঝড় কিন্তু একই গতিবেগে বয়ে যায়।

হরিপ্রিয়ার মন বসতি আর নমিতার মন মেঘনার বুক।

হরিপ্রিয়া গিয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—এই শীতে—মাঘ মাসের রাত্রি—অসুখ করবে যে। ধন্য বাবা! গায়ের কাপড়সুদ্ধ নিসনি!

—জামা আছে।

—তবে আর কি! না—এ ভাল নয় নমি। এ ভাল নয়। আয়, নীচে নেমে আয়।

আকাশপানে চেয়ে থাকলে কিছু হবে না। তিনি যখন আসবার তখন ঠিক আসবেন। ওঁরা হলেন ভগবানের পাঠানো মানুষ। আয়—! হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে নেড়ে বললে—ও মা! মাথায় আর ধুলোয় এ কি হয়েছে!

—তবু তো ক্যাপ ছিল মাথায়! হাসলে নমিতা। অর্থাৎ ভলেণ্টিয়ার্স ক্যাপ।

নেমে এল নীচে নমিতা বা শ্যামা বা উমা হরিপ্রিয়ার সঙ্গে। একটা আয়নাওয়ালা আলমারির পাল্লার আয়নায় তার ছায়া পড়ল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্নের কালো বিন্দুতে ভরা মুখ।

সে ঢলঢল লাবণ্যবতী উমাকে চেনার উপায় নেই।

মাথার চুলগুলি ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে। মাথায় তার চুল হয়েছে একরাশ। হঠাৎ সে বললে—চুলগুলো কেটে ফেলব মা!

—চুল কাটবি? সে কি?

—হ্যাঁ। এখনকার চলনমত খাটো করে কাটবো। ভারী অসুবিধা হয়—এই সব সময়। ইয়া একটা চুলের ঢিপি। ক্যাপ থাকে না। খোঁপা ঢলঢল করে, খুলে যায়। বেণী করলে এটা ওটার সঙ্গে আটকে যায়—আর খপ ক'রে পিছন থেকে টেনে ধরলেই কাবু—

অবাক হয়ে শুনছিল হরিপ্রিয়া। কি সব অদ্ভুত কথা! খোঁপা ঢলঢল করে খুলে যায়—বেণীও এটা ওটার সঙ্গে আটকে যায়। কিন্তু বেণী ধরে পিছন থেকে টানতে গেল কে? এবং কেন? তবে হরিপ্রিয়া রাগে না। এই মেয়েটাকে নিয়ে সে এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। তার জীবনের প্রিয়তম জন নাট্যকার অভিনেতাটিকে পেয়ে জীবন যেমন ধন্য হয়েছিল—এক নতুন স্বাদ পেয়েছিল—এক নতুন জগতের দ্বার খুলে গিয়েছিল—উমা নমিতা হয়ে তার জীবনে আসার পর সে তেমনই নতুন স্বাদ পেয়েছে—নতুন জগতের দোর খুলেছে তার সামনে। তিনি তাকে নাটক বুঝিয়েছিলেন—ভাষা শিখিয়েছিলেন—চরিত্র বুঝিয়েছিলেন—তাকে প্রিয়তমার অধিকার দিয়েছিলেন—উমা নমিতা হয়ে এসে তাকে বোঝাচ্ছে নতুন কথা। ইতিহাস-দেশ—জীবনের নতুন মানে। এ কালকে উমা নইলে সে বুঝতে পারত না। শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে দেখেই যেত। উমা তাকে তার অর্থ বোঝাচ্ছে।

দেশ। স্বাধীনতা। মানুষের দাবি। জীবনের অধিকার!

সন্ধ্যার পর পড়াশুনা সেরে সে কথা বলে। অনর্গল বলে যায়। হরিপ্রিয়া শুনে যায়। কিন্তু এটা কি কথা হল। এযুগে তোর বেণী খপ করে ধরে কে টানতে যাচ্ছে! একটু হাসি পেল। হেসেই বললে—যত উদ্ভট কথা তোর নমি! নতুন ফ্যাসানে মেমসায়েবী ঢঙে চুল ছাঁটতে চাস তাই বল। তোর বেণী ধরে পেছন থেকে টানবে কে?

নমিতা বললে—বিপ্লব-যুদ্ধ যখন বাধবে মা তখন মেয়ে বলে শত্রুরা তো শিভালরি দেখাবে না, খাতির করবে না। তারা গলায় হাতে চুলে যেখানে নাগাল পাবে ধরবে। বেণী তো নাগাল বাড়িয়ে দেবে তাদের!

হরিপ্রিয়া অবাক্ হয়ে গেল।

নমিতা বললে—যখন পুলিসের ভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি মা বনে বনে—তখন মা চুলগুলো কচকচ করে একদিন কেটে ফেললে। তার আগের দিন একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে বেরুবার সময় মায়ের চুল আটকে গিছল। রাগ করে মা কাঁইচি বের করে চুলগুলো কেটে ফেললে। একবারে মানুষটা পালটে গেল। মা তখন সাহস পেলে—বললে—হয়েছে উমা। এইবার নির্ভাবনায় চল।

নমিতা—নমিতা নয়—শ্যামাও নয়—উমা। কিন্তু তাকে চিনবার কোন উপায় রাখে নি নিদারুণ ব্যাধির নিষ্ঠুর আক্রমণ। সারাটা মুখের উপর অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে আগের সকল

পরিচয় সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই নমিতার। হয়তো কোন দিন কখনও চুল আঁচড়াবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। হাতের চিরুনি হাতে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে; বারেকের জন্য মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে দেখে দাগগুলো মুছে যায় কিনা! তারপর একটি বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চুল আঁচড়ে ঠিক করে নেয়। হরিপ্রিয়া ডাকে—নমি, হল রে তোর? ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এদিকে দেরিও হয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে বসেই উঠে পড়বি দেরি হয়ে গেছে বলে!

—এই যাই। বলে নমিতা কোনরকমে চুল গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। চুল তার একরাশি। বয়সে সে কৈশোর অতিক্রম করে সবে যৌবনে প্রবেশ করছে, এরই মধ্যে চুল তার পিঠ ছাড়িয়ে কোমরে এসে পড়েছে। তার উপর চুলের গোছা খুব ঘন এবং মোটা।

হরিপ্রিয়া বলে—এ কি ছিরি করেছিস?

—ওই বেশ হয়েছে।

—মুখখানা ভাল করে মুছিসও নি? চকচক করছে।

—করুক। বলে সে আপন মনে খেয়ে যায়। হরিপ্রিয়ার কথাই সত্য হয়, আধখাওয়া করে উঠে পড়ে বই নিয়ে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে তাদের গলিটার নির্জন বাঁকে দাঁড়িয়ে ছোট রুমালখানা বের করে সজোরে মুখের উপর ঘষে নেয়। বার বার মনে মনে বলে—কি হয়েছে এতে? কি হয়েছে? কি হবে তার রূপ নিয়ে? কি হয় ওতে?

তারপর তার মন কল্পনার পাখা বিস্তার করে ভেসে পড়ে ভবিষ্যতের আকাশে। অসীম শূন্যতার মধ্যে তার মন দিকহারা পাখির মত সম্মুখে উড়ে চলে—আর যেন দেখতে পায় এক নূতন দিগন্ত। সে দিগন্ত সিংহদ্বারে তার কলেজ। কলেজের দীর্ঘ করিডোর পার হয়ে ওপারের সিংহদ্বার পার হয়ে নূতন রাজ্য নূতন জীবন। কিন্তু তার সামনেই যেন যুদ্ধের ট্রেঞ্চ কাটা। লালমুখ ইংরেজরা পাহারা দিচ্ছে। ওপারে যেতে দেবে না। এপারে তারা অর্থাৎ তরুণ-তরুণীরা দাঁড়িয়েছে কোমর বেঁধে। চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্প। ওই ট্রেঞ্চে প্রহরারত ইংরেজের শক্তিকে পরাভূত করে তাদের ওপারে যেতেই হবে। যেতেই হবে। হ্যাঁ, তারা যাবেই। তার দিন এসেছে। 'দিন আগত ঐ।' কিন্তু আর 'ভারত তবু কই' নয়। ভারত জেগেছে উঠেছে এসেছে চলেছে—সকল বাধাবিঘ্ন, সকল ভয়, সকল বিরোধী শক্তিকে জয় করে জগৎসভায় স্থানলাভ করবেই। তার আসন শূন্য পড়ে রয়েছে। কংগ্রেসের পতাকা এসেছে—নেতাজীর পতাকা এসেছে। কিন্তু অহিংসায় হবে না! নমিতার তরুণ মন গর্জন করে ওঠে! না—ওতে হবে না। নেতাজী তাঁর বেতার বক্তৃতায় মহাত্মাজীকে জাতির জনক বলে সম্বোধন করে অভিযানের পূর্বে তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। মহাত্মাজী বলেছিলেন —সুভাষচন্দ্র এবং আমার মাঝখানে একটি স্বর্ণসূত্রের মত নিষ্কলঙ্ক সম্পর্ক আছে। তাঁর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য সত্ত্বেও তা ছিন্ন হয় নি হবে না অথবা কলঙ্ক-চিহ্নেম্লান হবে না। তবুও নমিতা মনে মনে বলে—তোমরা দুজনেই বিরাট পুরুষ মহাপুরুষ। তোমাদের সম্পর্ক তোমাদের থাক। আমি প্রণাম করি মহাত্মাকে। কিন্তু না—ওই মত আমার নয়। ওই দল আমার নয়। কিন্তু ওরা—ওরা কারা? ওই লাল ঝাণ্ডা ঘাড়ে। গোটা যুদ্ধের কালটা যারা নেতাজীকে বললে কুইসলিং। বিশ্বাসঘাতক বললে। কাগজে ছবি ছাপলে—নেতাজী তোজোর হাতের দড়িবাঁধা ঘৃণ্যজন্তু বিশেষ। ওরা নয়। ওরা নয়। ওদের সঙ্গে তার মিলবে না! তার কেন? যারা এদেশের মানুষ—এদেশ সম্পর্কে যাদের মমতা আছে শ্রদ্ধা আছে তাদের কারুর সঙ্গে মিলবে না। মিলতে পারে না। তার মনে দগদগ করছে এলাহাবাদের স্মৃতি। অজয় নেতাজীর ভক্ত ছিল বলে তারাই তো এসেছিল সেদিন অজয়কে

মারবার জন্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমস্ত উদ্যমের বিরোধী মুসলীম লীগপন্থী ওই মুসলমান ব্যারিস্টারের ছেলেটি এসে হাত মিলিয়েছিল এদের সঙ্গে। মীরজাফর—রাজা রাজবল্লভ—রায়দুর্লভদের অশুচি মিলনে হয়েছিল পলাশী। এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। গঙ্গাধর অধিকারীর পাকিস্তান সমর্থন করা প্যাম্ফলেটখানা সে পড়েছে। এদের সে জানে—সে চেনে। মীরজাফরেরাও বলেছিল—বাংলার মসনদের জন্য নয়, বাংলার লোককে সিরাজের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পলাশী। এরাও বলে—মানুষের মুক্তির জন্য জনযুদ্ধ। তোজোর খেলার পুতুল সুভাষচন্দ্রের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ইংরেজকে সমর্থন! না—ওরা নয়। ওদের সে জানে! তার মায়ের দুর্ভোগ মনে পড়ে। ওঃ, সে কি দুর্ভোগ! সে কি মনের যন্ত্রণা! শেষে তার মায়ের এই মৃত্যু। তার মুখে অজস্র ক্ষতচিহ্ন; সব—সব—সবের জন্য যত দায় সেই ব্যারিস্টার পুত্রের—ততটাই কি তার থেকেও বেশী ওই ওদের! ওদের এ পবিত্র অভিযানের মধ্যে স্থান নেই।

এই কল্পনার দিগন্তলোকের দিকে তাকিয়ে সে হাঁটে ফুটপাথ ধরে। এসে পৌঁছয় কলেজে। কলেজেও এ কল্পনার ঘোর পুরো কাটে না। চলে। আজকাল কলেজেও এই আলোচনা। সারা দেশের জীবনটাই আজ উত্তাপে ফুটছে। এ আলোচনা ছাড়া কথা নেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশের চিন্তা ও মনের সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। এর সংগেই তার সারা ভবিষ্যৎ জীবন জড়ানো। ওদের সকলের তো তা নয়!

হরিপ্রিয়ার সংগে কলকাতায় যখন সে আসে তখন সে কলকাতায় নবাগতা। এবং তার জীবনের ঘটনাচক্রের ফলে মনে-প্রাণে নেতাজীর ভক্ত এবং অনুগামিনী হয়েও নেতাজীর রাজনৈতিক সংগঠনের সংগে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। প্রথম প্রথম যোগাযোগের জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তা তার ঠিক ছিল না। তার উপর সে অভিনেত্রী হরিপ্রিয়ার পালিতা কন্যা এই পরিচয়টাও তাকে সংকুচিত করত। প্রথম সে বেরিয়ে পড়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দাবির মিছিলে। কিন্তু কিছুটা দূর গিয়ে ফিরে এসেছিল। রাত্রে মিছিলের উপর গুলি চলার সংবাদ পেয়ে তার আর আপসোসের বাকী ছিল না। এবার নেতাজী জন্মদিনে সে সাহসের তার অভাব হয় নি—সে হরিপ্রিয়াকে বলেছিল—আজ থেকে ফিরতে আমার দেরি হবে মা।

হরিপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন? দেরি কেন হবে? কি আছে?

—আমি ভলেণ্টিয়ার হবার জন্য নাম লেখাতে যাব।

—ভলেণ্টিয়ার? কিসের? মেয়েতে—। বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল হরিপ্রিয়া। মেয়েতে ভলেণ্টিয়ার হবে কি? এ প্রশ্নটা আটকে গিয়েছিল মুখে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এ প্রশ্নটা তিরস্কারের সংগে মানুষ স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করত এবং সাজতোও। কিন্তু আজ আর সাজে না। মুখে আটকে যায়। প্রশ্নটা পালটে করেছিল হরিপ্রিয়া—কথার পুনরুক্তি করেছিল—কিসের ভলেণ্টিয়ার?

—নেতাজী জন্মদিনে খুব বড় উৎসব হচ্ছে। শাহনওয়াজ আসবেন। বিরাট মিছিল হচ্ছে। তাতে নারীবাহিনী থাকবে। ঝান্সিরানী ব্রিগেড। তাতেই মার্চ করবার জন্যে।

একটু চুপ ক'রে থেকে হরিপ্রিয়া বলেছিল—যাও। ভাল কাজে বারণ করব কেন? তা ছাড়া নেতাজীর কর্মের সঙ্গে ভগবান যেন তোমাকে জড়িয়ে দিয়েছেন। যাও।

হরিপ্রিয়া দীর্ঘকাল অভিনয় করে এবং ওই নাট্যকারটির সাহচর্যের মধ্যে থেকে এসব মোটামুটি ভালই বোঝে। শুধু কথায় বোঝে না হৃদয়ের আবেগ দিয়ে অনুভবও করে।

নমিতা উমা কলেজ থেকে সোজা উৎসব কমিটির আপিসে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল। তারপর প্যারেড করেছে—ওদের সঙ্গে মিশেছে, প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে। কাজ করার মধ্য

দিয়ে সে দলের অনেকটা কাছে গিয়ে পে'ীচেছে। নারীবাহিনীর সর্বময় অধিনেত্রী, নেতাজীর ভাইঝি বেলা দেবীর দৃষ্টি পর্যন্ত তার উপর আকৃষ্ট হয়েছে। সে নিজেও চেষ্টা করে তাঁর কাছে কাছে ফিরেছে। বেলা দেবীকেই সে বলেছিল, আমাকে পতাকা বইতে দেবেন ?

হেসে বেলা দেবী বলেছিলেন—পতাকা বইতে ? না—সেটা আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লকের মেম্বার কর্মী মেয়ে না হলে পাবে না। তবে তোমাকে ওদের পিছনেই দেব।

সে বলেছিল—আমাকে মেম্বর করে নিন না।

—সে পরে হবে। নেব তোমাকে।

সে আবেগবশে বলে বসল—আমাকে অনেক কাজ দিন—খুব শক্ত কাজ দিন, দিয়ে দেখুন ঠিক পারব আমি।

—পারবে বই কি! মানুষে না পারে কি? সব পারে। মরতে পারে, মারতে পারে। মাটির পৃথিবীকে স্বর্গ মানুষেই করতে পারে। এ বিশ্বের কোন কিছুই মানুষকে পরাজিত করতে পারে না। মৃত্যুও না। মৃত্যুকে মানুষ জয় করে।

—তাহলে কখন নেবেন আমাকে ?

—এ উৎসব চুকে যাক তারপর।

তার ইচ্ছা ছিল প্রশ্ন করে এই উৎসব দিনে—এই ২৩শে জানুয়ারীতেই কি নেতাজী এসে পেঁছুবেন দেশে ? অন্ততঃ রেডিয়োতে কিছু বলবেন ? খবরটা সে শুনছে, নানাজনে বলছে—সেও তা বিশ্বাস করে, সেও দু'একজনকে বলেছে, সেটা নেতাজীর ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারে নি। ঠিক সাহস হয় নি। একটি ছেলে একজন নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কথাটা কাল। নেতাটি এমন কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন যে ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। নেতা বললেন—যখন সময় হবে তখন আসবেন। রেডিয়োতে বলবেন। শুনতে পাবে। কাজ করতে এসেছ কাজ করে যাও। তিনি আসবেন বিশ্বাস করো। কখন আসবেন কিসে আসবেন জানবার আগ্রহ কেন ?

ছেলেটি চুপ করে গিয়েছিল—উত্তর দিতে পারে নি।

নেতা বলেছিলেন—তুমি খবর সংগ্রহ করতে এসেছ ? পুলিস না কম্যুনিস্ট তুমি ?

ছেলেটি কেঁদে ফেলেছিল। ক্ষমা তাকে করা হয়েছে কিন্তু সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, কেউ যেন তার অধিকারের বাইরের কোন প্রশ্ন না করে! সকলে যেন সর্বদা মনে রাখে যে আমাদের শৃঙ্খলার সঙ্গে সামরিক শৃঙ্খলার কোন প্রভেদ নেই।

সাবধান সকলেই হয়েছে। তারা উৎসাহের সঙ্গেই সৈনিকের মতই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তারই সঙ্গে প্রতিটি জনের গোপনতম অন্তরে একটি কথাই গুঞ্জরণ করে উঠছে। বিপ্লব আসছে। বিপ্লব আসছে। নূতন কল্পনার দিগন্তটিতে আছে শুধু বিপ্লব। ওতেই জীবন সার্থক হয়ে যাবে।

* * * *

পরের দিন সকালে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। অনেক বেলাতেই সে উঠেছিল। উঠেই নমিতা মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে কাপড়চোপড় পাল্টে নিয়ে বললে—আমি বেরুচ্ছি মা।

—এক্ষুনি বেরুবে? কাল সারাটা দিন হেঁটেছ খেটেছ। ফিরেছ রাত্রিদুপুরে। ঘুমিয়েছ ভোরে। আবার এখুনি বেরুবে? মানুষের দেহ তো! না—এবেলা বেরিয়ো না। ওবেলা।

হরিপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরের উপর আশ্চর্য দখল। এককালের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সে, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করবার কৌশল যা সে আয়ত্ত করেছিল সে তার নিজস্ব হয়ে গেছে।

কিন্তু উমা তাতে ভড়কাবার মেয়ে নয়। জীবনে সে মার তো কম খায় নি! হয়তো বা

সে এই বয়সে যে মার খেয়েছে তত বড় মার হরিপ্রিয়াও খায় নি। সে তার প্রিয়তম মানুষটিকে হারিয়েছে। কিন্তু উমার হিসেবের খাতার জমা খরচ শুধু মানুষ হারানোর জমা খরচ নয়—এই কয়েক বছর রাজরোষে আরও অনেক বেশী যন্ত্রণা ভোগ করেছে। সংসারে পলাতকের যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা আর বোধ হয় হয় না। পালিয়ে বেড়িয়ে শুধু চতুরই হয় না মানুষ, সাহসী হয়েও ওঠে। এই নূতন রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ তাকে এক আশ্চর্য স্বাদ দিয়েছে। মুক্তির স্বাদ! সে হরিপ্রিয়াকে বললে—বারণ তুমি করো না মা—বারণ আমি শুনব না। আমাকে যেতেই হবে।

—যেতেই হবে? স্থিরদৃষ্টিতে হরিপ্রিয়া তার মুখের দিকে চাইলে।

—যেতেই হবে। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। বিপ্লব যখন আসে তখন সে ডাক দিয়ে যায়। মানুষ বেরিয়ে পড়লেই সে সার্থক করে দিয়ে যায় মানুষের জীবন। আর মানুষ ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকলে সে চলে যায়—আবার কবে ফিরবে তার ঠিক থাকে না। আমি যাব।

উমা—নমিতা দ্রুতপায়ে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তাকে যেতেই হবে। আজ সে ফরওয়ার্ড ব্লকের মেম্বার হবেই হবে। কয়েকটা গলি ঘুরে সে এসে ট্রাম রাস্তায় দাঁড়াল—ট্রাম স্টপে। ট্রাম আসছিল একটু দূরে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল—সে তার ব্যাগ ফেলে এসেছে—পয়সাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই।

এলগিন রোডে যখন সে এসে পেঁছিল তখন বেলা একটা বেজে গেছে। সারাটা পথ সে হেঁটেই এসেছে। গতকালকের পথ হাঁটার ফলে সারা পা দুটো টাটিয়ে আছে. সেই টাটানো পায়ে এতদূর এসেছে সে বার বার থেমে থেমে। বার পাঁচেক বসেছে পথে। এক একবার মনে হয়েছে ফিরে যায়। বাড়ি ফিরে বরং পয়সাকড়ি নিয়ে ওবেলায় ফিরবে। কিন্তু ফেরে নি। কোন রকমে এসে পেঁচেছে। বাড়িতে মুখ হাতই ধোওয়া হয়েছিল—গতকালকের ধুলো বিশেষ করে চুলের ধুলো ধোওয়া হয় নি। একরাশি চুল ধুলোয় ধূসর হয়েই ছিল, শীতের গভীর রাত্রে মাথায় জল ঢালতে তার ইচ্ছে থাকলেও হরিপ্রিয়া তা দেয় নি। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে যতটুকু গিয়েছিল—গিয়েছিল। তার উপর রাত্রে বালিশের ঘেঁষে সে রুক্ষ ধূসর চুল বিশৃংখল হয়ে উঠেছিল—তাঁও ভাল করে আঁচড়ানো হয় নি। সেই অবস্থায় সকালে বেরিয়ে এতটা পথ হেঁটে আসবার পথে বিশেষ করে ময়দানে আরও প্রচুর ধুলো লেগেছে তার মাথায় মুখে সর্বাঙ্গে। পরনের কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে গেছে। সকালে এক কাপ চা খানচারেক বাসী লুচি একটু তরকারি খেয়েছে—তারপর আর তার পেটে কিছু পড়ে নি। এই অবস্থায় এলগিন রোডে পেঁছে সে ভিড় ঠেলে কোন রকমে নেতাজীর ভাইঝির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তাকে দেখে সবিস্ময়ে বললেন—এ কি—কি হয়েছে তোমার? এমন চেহারা কেন?

সে লজ্জায় বলতে পারলে না আসল কারণ। বলতে পারলে না—পয়সা ভুলে এসেছি বলে এতটা পথ হেঁটে এসেছি, সেই সকালে খেয়েছি, তারপর আর কিছু খাই নি। বললে—শরীরটা ভাল নেই। একটু যেন জ্বর হয়েছে।

—তবে আজ এলে কেন? কি দরকার ছিল?

—আপনি যে বলেছিলেন আজ আমাকে পার্টি মেম্বর করে নেবেন!

—সে তো পালিয়ে যেত না। যাও যাও, ওদিকে আপিসে গিয়ে মেম্বর হয়ে যাও। এখন অবশ্য সাধারণ মেম্বর হবে। যাও। এই - শোন—!

একজন কর্মীকে ডাকলেন। বললেন—যাও, একে নিয়ে যাও, বলগে একে অর্ডিনারী মেম্বর করে নেবে। বলবে—আমি পাঠিয়েছি, আমি জানি—আমি বলছি। যাও তুমি,

এর সঙ্গে যাও। ভিড় থাকলে বলবে একে আগে করে নেয় যেন। ওর জ্বর। বাড়ি চলে যাবে।

আপিসে তখন সত্যই অনেক ভিড়। ছেলেটি ভিড় ঠেলে গিয়ে আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে কানে কানে বললে কথাগুলি। তারপর ডাকলে—আসুন—এগিয়ে আসুন। একটু রাস্তা দিন তো ওঁকে। হ্যাঁ। ওঁর অসুখ—ওঁকে আগে ছেড়ে দিতে হবে। আসুন আসুন!

নমিতা অর্থাৎ উমা গিয়ে ভিতরে দাঁড়াল। কিন্তু গলা তার শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। চাঁদা! পয়সা তো নেই! কি করবে?—

একখানা ফর্ম এগিয়ে দিয়ে কর্মীটি বললে—ফর্মটা পূরণ করুন। প্লেজটা সই করুন।

হাতে ফর্মটা নিয়ে নমিতা শুষ্ককণ্ঠে কোন রকমে বললে—কলম একটা!

—কলম? কলম নেই বুঝি?

সুবিধে একটা যেন এসে গেল—নমিতা বললে আমার কলম পার্স সব হারিয়েছে রাস্তায়—। অপ্রতিভের মত হাসলে, তারপর বক্তব্যের জের টেনে বললে—চাঁদাটাও কাল এসে দিয়ে যাব আমাকে বেলা দেবী চেনেন।

কর্মীটি বললে—আমিও চিনি—দেখেছি। দিন না—কলম একটা কেউ দিন না!

—নিন। এই যে।

পিছন থেকে একজন কলমটা বাড়িয়ে দিল। নমিতা কলমটা নিতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকালে। এ কি? এ কে? এত চেনা? এ কে? অবাক হয়ে মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল—তার মুখের দিকে। কে? হঠাৎ সূক্ষ্ম কুয়াসার মত আবরণটা সরে গিয়ে অজয়ের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অজয় একটু বিব্রত বোধ করলে তার স্থির দৃষ্টির সম্মুখে। সে বললে—কি হ'ল - নিন কলম।

অজয় তাকে চিনতে পারে নি। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফর্মটা পূরণ করতে লাগল নমিতা। কি লিখবে? হরিপ্রিয়া মায়ের উপাধি কি?

থাক। ওটা তার নিজেরই থাক। লিখলে ভট্টাচার্য। বাপের নাম লিখলে এস ভট্টাচার্য। তারপর কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে কলমটা টেবিলের উপর ফেলে রেখেই সে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। পা টলছে—মাথার ভিতরটা কেমন করছে। বুকের ভিতরে কান্না অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্পে সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভের জলধারার মত উথলে উঠেছে। কোনক্রমে আর চেপে রাখতে পারছে না।

অজয় তাকে চিনতেও পারলে না!

মনে পড়ল তার আয়নার ভিতর ফুটে ওঠা মুখের ছবি!—ওঃ - কালো কালো দাগে ভরতি তার মুখ কুৎসিত কদর্য। চিনতে পারে নি অজয় সেই জন্য।—ওঃ—।

হঠাৎ সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। খেয়াল ছিল না, জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ক্লান্ত অতি ক্লান্ত যন্ত্রণাকাতর পায়ের পদপাতের তার ঠিক ছিল না; ঘর থেকে বের হতে গিয়ে হুঁচোট লেগে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে।

বাড়িতে মনোরমা দেবী উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিলেন।

সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রায় অজয় ফেরে নি। শীতের দিন সেই সকালে বেরিয়েছে— স্নান-খাওয়া হয় নি—তার উপর এই এক নিষ্ঠুর কঠোর কাল। কালের এমন বিচিত্র কঠোর রূপ কখনও তো তাঁর জীবনে আসে নি, গল্পেই বা কোথায় শুনেছেন? জীবনে ১৯২১ সাল দেখেছেন তবে ভাল মনে নেই; দাদা জেলে গিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন শঙ্কার পরিবর্তে ছিল উৎসাহ।

সত্য বলতে কি জীবনের কোন আশংকা ছিল না। এইটুকু মনে আছে যে বালিকা জীবনে সেদিন ভয়ের পরিবর্তে একটা আশ্চর্য গৌরব অনুভব করেছিলেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে ছিলেন তিনি, সেদিন রাত্রি এবং পরবর্তী কয়েকটা দিনের স্মৃতি তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তখন তাঁর স্বামী বেঁচে—ভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরসা তখন। সে উত্তেজনা সে উল্লাস—তার সঙ্গে আতংক। কিন্তু স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন আতংককে আড়াল দিয়ে। আলোকিত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকার এবং দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকার মত সে অবস্থা। তারপর ইংরেজের পুলিস মিলিটারী এল—আতংক তখন ঝাপটায় জানলা উড়িয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে কিছুটা কিছুটা এসেছিল ঝাঁটে ঝাঁটে। মনে পড়ছে—বাড়ি সার্চ হয়েছিল। রাত্রে পুলিসের হুইসিল শুনে মনোরমা চমকে জেগে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলাই ছিল। বাড়ির চারিদিকে পুলিস মিলিটারীর সারি। মনোরমা তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বামীকে জাগিয়েছিলেন।—ওগো! পুলিস বাড়ি ঘিরেছে!

স্বামী বলেছিলেন—ভয় কি? ভয় পেলে তো চলবে না। সম্ভবত সার্চ করবে বাড়ি। তা করুক না।

—যদি তোমাকে—

—না। আর যদিই ধরে নিয়ে যায় তাতেই বা ভয় কি?

স্বামীর ভরসায় ভয়কে সবলে দূরে ঠেলে দিয়ে বলতে পেরেছিলেন—সরে যা! দূর হ! কিন্তু এ কি কাল! কালের দেবতা যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। এত বড় বিরাট যুদ্ধটা গেল—দুর্ভিক্ষ মহামারী জাপানী বোমা—পুলিস মিলিটারীর শাসন দেশের যে লোকগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনে প্রহারে শোষণে কংকালসার মৃতপ্রায় করে ফেলেছিল—আশ্চর্য—পরম আশ্চর্য—সেই মানুষগুলো কি কঠিন পণ নিয়ে দুর্জয় সাহসে পাগলের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্রুদ্ধ চীৎকারে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে, তাদের পদক্ষেপে মাটি কাঁপছে—ধুলো উঠছে আকাশ দিগন্ত আচ্ছন্ন করে। এত বড় যুদ্ধটা জিতেও ইংরেজের অহংকারী ক্রোধী জাত তাদের বন্দুক পিস্তল হাতে নিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের মানুষের হাতে অস্ত্র নেই তারা নিরস্ত্র—যদি অস্ত্র থাকে তবে সে আর কটা? আর তারই বা কত শক্তি? তবু তারা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে—তারা ম'রে জিতবে। তাদের ঠিক প্রথম সারিতে না হোক, অন্তত দ্বিতীয় সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অজয়। গুলি যে কখন ছুটবে তার তো ঠিক নেই! প্রথমবার প্রথম সারি শেষ হলেই দ্বিতীয়বারের গুলির ঝাঁক ছুটলেই—। শিউরে উঠেছেন তিনি। হে ভগবান! হে ঈশ্বর!

এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার মধ্যে দূরাগত যে কোন একটা শব্দ শুনেই তাঁর মনে হয়েছে গুলি ছুটল। বিকেল তিনটের সময় তিনি একবার আতংকে চমকে উঠে ছুটে বাইরে এসেছিলেন। একটা শব্দ শুনেছিলেন—ফট্—ফট্—ফট্—ফট। বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। একখানা ছ্যাকরা গাড়ি যাচ্ছিল গ্রে স্ট্রীটের পাথরের ইটবাঁধানো ট্রামরাস্তার উপর দিয়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেও ভিতরে এসে আর বসতে পারেন নি। দাঁড়িয়েই ছিলেন বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। ঝি বারদুই ঘরে গিয়ে বসবার বা শোবার জন্য বলতে এসে বলতে সাহস পায় নি, ফিরে গেছে। মনোরমা মোটামুটি ভালই আছেন তবে ডাক্তারের নির্দেশ পূর্ণ বিশ্রামের। সেটার যেদিনই অভাব হয় সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে একটু উত্তাপ হয়। মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে। এবং একদিন হলেই তার জের চলে অন্তত আরও একদিন। ঝিয়ের কাছে খবর পেয়ে বৃদ্ধ নায়েব এসে অনুরোধ করেছিলেন।—মা ঘরে এসে বসুন। অজয়বাবু এলেই তো আপনার কাছে আসবেন।

মন মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মনোরমার। কিন্তু বৃদ্ধ নায়েবকে সম্ভ্রম করেন বলে কটু কথা বলতে পারেন নি। বলেছিলেন—নায়েববাবু আমার মরণই ভাল। কি হবে আমার বেঁচে বলতে পারেন? কেন যে আমাকে আপনারা নিয়ে এলেন জোর করে সে আপনারাই জানেন।

তারপর গতকাল অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারী থেকে আজকের বিকেল পর্যন্ত অজয়ের আচরণের ফিরিস্তি দিয়ে বলেছিলেন—বলুন দেখি আপনি এই কি সহ্য হয়, না হতে পারে?

নায়েব এ কথার জবাব দিতে পারেন নি। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—কোথায় গেছেন জানলে আমি নয় দেখে আসতাম।

মনোরমা বলেছিলেন—মেজর জেনারেল শা-নওয়াজ যেখানে সে ঠিক সেইখানে আছে। কিন্তু কোথায় আছেন তিনি কি করে বলব বলুন? আর তিনি ঠিক এক জায়গায় বসে থাকবার জন্যেও আসেন নি। কত জায়গায় কত বড় লোকের সঙ্গে তাঁর এনগেজমেণ্ট। সে ঠিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

নায়েব তাঁর যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনিও নিরুপায়ে একটু দূরে রেলিংয়ে ভর দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

শীতের অপরাহ্ণ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে সন্ধ্যা এসে যায়। এখনও আলো জ্বলে নি, তবে যে কোন মুহূর্তেই জ্বলে উঠবে। আবছা হয়ে এসেছে আলো। পথের ফুটপাতে ফুটপাতে মানুষের ভিড়। শুধু মাথার কালো রঙটাই চেনা যায়, মুখ চোখ ওপর থেকে ভাল দেখাও যায় না—যেটুকু দেখা যায় তাতে আলোর কমতির জন্য ঠিক চেনা যায় না। পশ্চিম দিকে একটু দূরে সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়, পূবে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড় অনেকটা দূরে—দেখা যাচ্ছে না। সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে একটা পেট্রোল পাম্প—তার গায়েই একখানা বাড়ির দেওয়ালে মস্ত একটা পোস্টার। মস্ত ছবিওয়ালা পোস্টার—আবছা আলো হলেও যে মানুষের ছবি সে মানুষটি অতি-অতিপরিচিত বলে চিনতে ভুল হয় না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামরিক পোশাক পরা ছবি। সেখানে একটা ভিড় জমেছে। কিছু উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা নেতাজীর নাম এবং মূর্তি আঁকা পোস্টারে যেন নামাবলী পরে বসে আছে; গোটা কলকাতার কুড়ি পঁচিশ লক্ষ লোক সে নাম জপও করছে। ট্রাস চলছে—ট্রামের গায়েও নেতাজীর ছবি—তাঁর নামাঙ্কিত পোস্টার। যাত্রীরাও আলোচনা করছে ওই নাম—ওই কথা। মনোরমা ওই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন—হঠাৎ তিনি বললেন—ওই না?

একখানা ট্যাক্সি দক্ষিণ দিক থেকে সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু ধরে এসে গ্রে স্ট্রীটে পূর্বমুখে মোড় ফিরে আসতে আসতে ব্রেক কষে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে একজন কেউ ভাড়া মিটিয়ে ওই ভিড়ের সামনে দাঁড়াল।

—ওই না? বলে উঠলেন মনোরমা।—হ্যাঁ—ওই তো!

আবছায়ার মধ্যেও অজয়ের পিছন ও বাঁ-পাশটা দেখে তিনি চিনতে পেরেছেন।—ওই তো অজয়!

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। এবার আর সন্দেহ রইল না যে সে অজয়! অজয় ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা কলরবে পরিণত হয়ে উঠল। মনোরমা উৎকণ্ঠিত হয়ে নায়েবকে বললেন—আপনি দেখুন। ঝগড়া মারামারি বাধল, আপনি যান! কি হল দেখুন।

নায়েব দ্রুতপদে নেমে গেলেন। মনোরমা অসহনীয় উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে প্রায় আত্মবিস্মৃতের মতই সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগলেন—অজয়! অজয়!

* * * *

কিছুক্ষণের মধ্যেই অজয় ফিরল। কোলাহলের মধ্যে একটা লোক—অল্পবয়সী ছেলে—ভিড় থেকে ঠেলে বেরিয়ে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে পালিয়ে গেল। অন্য লোকেরা তার পিছনে ছুটল। অজয়ও ছুটত কিন্তু তার আগেই নায়েব গিয়ে তার হাত ধরেছিলেন। তার হাত ধরাতেই অজয় পিছন ফিরে বাড়ির বারান্দায় মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফিরেছে। অনিচ্ছার মধ্যেই ফিরেছে।

মনোরমা বারান্দা থেকে ভিতরে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—মেরে ফেল, তুই আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেলে তোর যা ইচ্ছে করিস্! বুঝলি! এ আর আমি সইতে পারছি না।

অজয়ও উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—তুমি জান না মা—তুমি জান না তাই বকছ!

—কি জানি না? কি জানব? বলতে পারিস্? তুই শেষটায় রাস্তার উপর দাঙ্গাবাজি মারপিটে গিয়ে জুটেছিস্? ছি—ছি—ছি!

—জুটেছিলাম—ওই ছেলেটাকে দেখে সামলাতে পারি নি নিজেকে। ও শয়তান, দেশের শত্রু, আমাকে এলাহাবাদে যারা মেরেছিল ধরিয়ে দিয়েছিল তাদের একজন। আমাকে দেখেই ছুটে পালাল।

অবাক হয়ে গেলেন মনোরমা।—কি বলছিস তুই?

—চল ঘরে চল। বলে অজয় মায়ের হাত ধরলে। হাত ধরে সে চমকে উঠল··—এ কি—এত গরম কেন হাত?

—হাত পা জ্বালা করে আমার।

কপালে হাত দিল অজয়—মায়ের এ অজুহাত তার বিশ্বাস হল না। কপালেও উত্তাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অজয় বললে—এ তো জ্বর হয়েছে তোমার!

নায়েব বললেন—সেই বেলা তিনটে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে পথের দিকে চেয়ে রয়েছেন। আর ভাবছেন।

মনোরমা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন বলতে পারেন—আমার ভাবনার দোষ আছে?

অজয় হেসে বললে উনি পারেন না কিন্তু আমি পারি।

—তা পারবে না. তুমি না পার কি? আগে এটা জানতাম না, আজ চোখে দেখে জানলাম। তুমি পথের ভিড়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে মারপিট করবার জন্য। আজ সন্দেহ ঘুচে গেল আমার, তুমি সব পার।

মনোরমা আর দাঁড়ালেন না—ছেলের দিকে পিছন ফিরে হনহন করে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মুহূর্তপরে কাতরস্বরে বলে উঠলেন—হে ভগবান, আমার এ জীবন তুমি শেষ করে দাও। আর আমি সইতে পারছি নে।

অজয় ঘরে এসে ঢুকল।—মা!

মনোরমা কথা বললেন না।

—মা।

মনোরমা বললেন—আমায় তুমি আর বিরক্ত করো না অজয়—আজ থেকে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর গে। আমি কিছু বলতে চাই নে বলব না। শুধু আমাকে গ্রামে আমার শ্বশুরের ভিটেতে রেখে এস। আর এই চিকিৎসার উৎপীড়ন থেকে রেহাই দাও। আমি আর বাঁচতে চাই নে! এ সহ্য করতে আমি পারছি নে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অজয় নীরবে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তাও মনোরমার সহ্য হল না। তিনি ধড়মড় করে উঠে চীৎকার করে উঠলেন—অজয়! অজয়—

শোন !

অজয় ফিরে দাঁড়াল।

—শোন, এখানে আয় !

অজয় কাছে এসে দাঁড়াল কিন্তু কোন কথা বললে না।

মনোরমা বললেন—কোথায় যাচ্ছিলি ?

এবার অজয় বললে—কোথায় যাব ? ঘরেই যাচ্ছিলাম।

— মিথ্যে কথা, বাড়ি থেকে পালাবার মতলবে যাচ্ছিলি তুই !

হাসলে অজয়। মনোরমা ক্ষিপ্তের মত বললেন—তুই হাসিস নে। ওই হাসি তোর ভয়ংকর হাসি ! আমি বুঝি !

অজয় আরও একটু হেসে বললে—না হেসে কি করব ? তুমি একেবারে ছেলেমানুষ না হয় পাগল হয়ে গেছ ! তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমি ঘরেই যাচ্ছি। কোথাও পালাবার মতলব আমার নেই। ঘরের বিছানা লেপ ফেলে শীতে কোথায় যাব। তোমার শান্ত হওয়া দরকার নইলে জ্বরটা আরও বাড়বে।

অজয় চলে যাচ্ছিল। মনোরমা বললেন—সারাটা দিন এইভাবে কেন বাইরে থাকবি ? আর রাস্তায় তুই ভিড় দেখে নেমে গুণ্ডার মত লাফিয়ে গিয়ে মারপিট করতে গেলি ? কেন গেলি ?

—বললাম তো। ওই ছেলেটা এলাহাবাদে যারা আমাকে মারতে এসেছিল মামাদের বাড়ি ঘেরাও করে, যারা পুলিসে খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল ও তাদেরই একজন ! এদিকে খদ্দর পরে, দেখতে কংগ্রেসী আসলে কম্যুনিস্ট ছাত্রদের দলের ছেলে। ওর নাম রমেন।

—সে এখানে আসবে কি করে ?

—কি করে আসবে তা কি করে বলব আমি, তবে এসেছে। সকালবেলা যাবার সময় দেখেছিলাম ওই পাম্পের কাছে দেওয়ালে আঁটা পোস্টারে নেতাজীর ছবির উপর ওই পাম্পের উপর ঝরে পড়া তেলকালি নিয়ে কে বেশ করে মাখিয়ে দিয়েছে ! কাল রাত্রে যখন প্রসেসন থেকে ফিরি তখন রাত্রি অনেক। তখনও দেখেছি—কিছু ছিল না। সকালে দেখি তেল-কালি মাখানো। পাম্পে জিজ্ঞাসা করলাম—তারা বললে তারা জানে না। ফেরবার সময় দেখি লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। আলোচনা করছে—আর একজন খুব গালাগাল করছে যারা এ কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে। ওকে দেখেই আমি ঠিক চিনেছিলাম। এ সেই রমেন। এলাহাবাদের সেই পাণ্ডা। সেই ব্যারিস্টারের ছেলে লীগ পাণ্ডা মামুদের ডান হাত। মনে হল এ কাজ ঠিক ওই করেছে। করে-টরে এখন সাধু সেজে খুব বক্তৃতা করছে। আমি তাই গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলাম। সামলাতে পারলাম না। গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালাম। বললাম—রমেন ! তুমি এখানে ? আশ্চর্য সাহস আর আশ্চর্য বুদ্ধি ! বললে—কে আপনি ? আমি তো আপনাকে চিনি না।—চেনেন না ? এলাহাবাদে আমার কপালে মেরেছিলেন—দাগটা চিনতে পারছেননা ? লীগের পাণ্ডা স্টুডেণ্ট লীডার মামুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে ফরওয়ার্ড ব্লক বলে ধরিয়ে দিয়েছিলেন—চিনতে পারছেন না ? আমার নাম অজয়—মনে পড়ছে না ? আমার মামাতো দাদা কংগ্রেস ওয়ার্কার ভুনি-দুনির বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন গুণ্ডা দিয়ে—মনে পড়ছে না ? একটু থমকে গেল। তার উপর এই কদিনেই এখানে অনেকে আমাকে চিনেছে। তখন থতমত খেয়ে বললে—এসব আপনি কি বলছেন ? আমি নিজেই তো ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কার। আমি ধমক দিয়ে যেই বলেছি—মিথ্যে কথা ! চলুন ফরওয়ার্ড ব্লক আপিসে। আপনিই এই ছবির মুখে তেলকালি মাখিয়েছেন—চলুন।—অমনি ধাঁ করে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে ওই ভাবে ছুটল।

আমি ওকে ধরতাম। কিন্তু নায়েববাবু হাতটা ধরলেন। দেখলাম তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছ। ফিরতে হল আমাকে।

মনোরমা একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, মানুষ যখন অন্যায় করে বিপদে পড়ে তখন বেশীর ভাগ লোকই মিথ্যের আশ্রয় নেয় প্রাণে বাঁচবার জন্যে।

—হ্যাঁ, সেই মিথ্যেটা আমি ফাঁস করে দিয়েছি!

—কি লাভ? ওরা তো নিজের কাছেই নিজেরা চোর সেজেছে।

অজয় বললে—তোমার বাবা দাদা গান্ধীবাদী ছিলেন। ওই বাদের ওই সব কথা নীতি তোমার মনের মধ্যে বাসা গেড়ে আছে। আমি চট্টগ্রামের ছেলে—আমি ওসব বুঝি না। বিপ্লব আরম্ভ হলে দেখবে শুধু ইংরেজের সঙ্গে নয় ওদের সঙ্গেও আমাদের লড়তে হবে।

ঝি এসে দাঁড়াল। মনোরমা অজয়ের কথার উত্তর দিতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি?

—ওষুদ। সেই তখন থেকে তো ওষুদ খাও নি। মুখ দেখে বলতেও ভরসা পাই নি। খাও!

—দে।

ওষুধের গ্লাস জলের গ্লাস ছোট টেবিলটার উপর নামিয়ে দিয়ে অজয়কে বললে—তারপরে—আপুনি এবার মুখটুকু ধোন। কিছু খান! সারাদিনে কিছু খেয়েছেন—না খান নি?

—খেয়েছি রে খেয়েছি। দোকানে মাংস রুটি পেটভরে কিনে খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না। শুধু চা দে।

মনোরমা ওষুধ খেয়ে জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে বললেন—দোকানে খাওয়াটা ভাল নয়, তোর বাপ-ঠাকুরদা সকলে ঘেন্না করতেন। শ্বশুর তো বলতেন—রাম রাম রাম—তার থেকে উপোস করে থাকা ভাল, দোকানের বয়-বেয়ারাগুলো কাচের বাসন থুথু ফেলে গামছা দিয়ে মুছে তাতেই খাবার দেয়। ধোয় না।

অজয় বললে—ওটা একটা পুরোনো গল্প। তাঁর আমলের। তার উপর তিনি তো খুব গোঁড়া ছিলেন। ওসব সত্যি নয়।

—কিন্তু বাসন ওরা ভাল করে ধোয় না। ওই জলে চুবিয়ে তুলে নেয়। এঁটো লেগে থাকে। ও না খাওয়াই ভাল। তা আজ খেয়েছ খেয়েছ বেশ করেছ। সেও তো কখন খেয়েছ। এখন মুখ হাত ধোও। মুখ শুকিয়েছে; চুলে ধুলো। পরিষ্কার হয়ে খাও। আর দয়া করে—এই হতভাগীর উপর দয়া করে আজ বিশ্রাম নাও। ঘুমোও ভাল করে।

ঝিয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—জল গরম করেছিস?

—সে - দাদাবাবু ঘরে ঢুকেছেন আর চাপিয়েছি।

—দে বাথরুমে জল ঠিক করে দে। আর কড়াইশুঁটির কচুরির কথা বলেছিলাম করেছিস উয্যুগ?

—সব ঠিক করে রেখেছি মা সব তোয়ের। শুধু ভাজতে হবে।

—যা ভাজ গে যা।

অজয় বললে—এই দেখ। আজ পেটে জায়গা নেই আর আজই মটরশুঁটির কচুরি?

—জায়গা হবে। মনোরমা বললেন—মাথা মুখ হাত পা ধুলেই পেটে জায়গা হবে। চান করলেই খিদে পায় মানুষের। আমি নিজের হাতে ক্ষীরের পিঠে করে রেখেছি। গতকাল পিঠেপুলি খাস নি। যা।

—আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, জান?

মনোরমা বললেন—গোগ্রাসে দোকানের জিনিস খেতে বড় ভাল লাগে, না?

—দোকানে দুপুরে খেয়েছি। এখন যে আসবার পথে এক বাড়িতে খেয়ে আসতে হল!

—বাড়ির কথা, মা খাবার নিয়ে বসে থাকবে এ কথাটা তোদের কেন মনে থাকে না বল তো? বেশ—দু'চারটে যা পারিস খা। আবার কাল খাবি।

অজয় বেরিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললে· মা, তুমি তো সেকালে থিয়েটার দেখেছ, কলকাতার থিয়েটার?

—দেখেছি বই কি! তোর বাপ খুব ভালবাসতেন থিয়েটার দেখতে। যতবার চট্টগ্রামে কলকাতার থিয়েটার গেছে, আমাদের সব কদিনের জন্যে দুখানা টিকিট কেনা থাকত। কলকাতায় আসতেন যখন তখন প্রত্যেক শনি রবি। তুই দেখতে যাবি?

—না না। সে জন্যে নয়। থিয়েটারে একজন নামজাদা এ্যাক্ট্রেস ছিলেন হরিপ্রিয়া? দেখেছ তাঁর অভিনয়?

—হরিপ্রিয়া? ওরে বাপরে! খুব বড় এ্যাক্ট্রেস। দেখেছি বই কি! তারাসুন্দরীর পরই হরিপ্রিয়ার নাম। ওঃ, বড় বড় পার্ট খুব ভাল করতেন। অদ্ভুত!

—তাঁকে দেখলাম আজ। বিকেলে খাইয়েছেন আজ তিনি!

—তিনি? ভুরু কুঁচকে উঠল মনোরমা দেবীর। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

—এসে বলছি। ভারী ভাল লোক। চমৎকার মানুষ আর তেমনি অদ্ভুত জীবন মা!

অজয় বাথরুমে চলে গেল।

* * * *

স্মৃতিটুকু অজয়ের মনের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিস্ময়ের রঙে এবং আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ওই ভিড় আর ওই রমেনকে নিয়ে অবাঞ্ছিত ঘটনাটা না ঘটলে সে এসেই মাকে বলত—মা, হরিপ্রিয়া দেবী ফেমাস এ্যাক্ট্রেসকে দেখে এলাম আজ। আশ্চর্য মানুষ। অদ্ভুত মা। উমা বা নমিতাকে সে-ই পেঁছে দিয়ে এসেছে হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়িতে।

নমিতা বলাই ভাল। জীবনে রূপে কালের আঘাতে যে পরিবর্তন তার ঘটেছে তাতে উমা তার অন্তরালে ফুরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। এ অন্তরাল এমনই দুর্ভেদ্য যে সে অন্তরাল ভেদ করে উমার আর কখনও স্বরূপে স্বপরিচয়ে আসবার সম্ভাবনা নেই।

ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্তিতে চেতনালুপ্তির উপক্রম কয়েকবারই হয়েছিল নমিতার। তবুও সে প্রাণশক্তিতে মনের জোরে সংহত করে কোনক্রমে দাঁড়িয়েছিল। পায়ের উপর জোর ছিল না। দেহ কাঁপছিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছিল। ঠিক এই সময়টিতেই কলম নিতে গিয়ে অজয়কে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। অজয়বাবু! সেই অজয়বাবু! যার জন্যে —তাদের—। কিন্তু অজয় তাকে চিনতে পারলে না। হেঁট হয়ে সই করতে গিয়ে মনে পড়ল তার এখনকার চেহারার কথা। বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত মুখ। তারপর কি যেন হল, ঘরের চারটে দেওয়াল পাক খেলে· পায়ের তলার মেঝেটার একদিক যেন উপরদিকে উঠে সোজা দিকটাকে মাটির তলার দিকে উলটে দিলে। সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য—চেতনা লুপ্তির শেষক্ষণটিতে মনে হল কোন অতল গহ্বরে সে তলিয়ে যাচ্ছে —হারিয়ে যাচ্ছে।

অফিসের সকলেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল স্বাভাবিক ভাবেই।—এ কি! এ কি! কি হল? কি হল? প্রশ্ন উঠেছিল। নমিতা পড়েছিল অজয়ের পায়ের কাছে।

অজয় ঝুঁকে পড়েছিল। বলেছিল—ফিট হয়ে গেছে।

তারপর জল বাতাস। মেয়ে কর্মীর অভাব ছিল না। তারাই তাকে ধরে তুলে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। ডাক্তারের অভাব হয় নি। ডাক্তার এসে দেখে বলেছিলেন

—ফিটই বটে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল। ভারী উইক। জ্ঞান হলেই এক কাপ গরম দুধ খাওয়ান দেখি।

পেট পরীক্ষা করবার সময় বলেছিলেন—পেটটা একেবারে খালি। স্টমাকে কিছু নেই। ওই দুধ খাইয়ে দিন জ্ঞান হলে।

দুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছিল নমিতা। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সকাল থেকে তুমি কিছু খাও নি—না?

নমিতা বলেছিল—মিথ্যা কথা বলেছিল—খেয়েছিলাম; পথে আসবার সময় এসপ্ল্যানেডে সব বমি হয়ে উঠে গেল। কাল রাত্রে একটু জ্বর হয়েছিল কিনা!

—বমি হয়েছিল? তা হলে তুমি এলে কেন? ফিরে গেলেই তো পারতে।

এ কথার উত্তর দেয় না অমিতা, চুপ করে ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন—তা হলে এখন আর কিছু খেয়ো না। একটু শুয়ে থাক। অন্তত ঘণ্টাখানেক। তারপর বাড়ি যাবে। উইকনেসটা না কমা পর্যন্ত না। আর ট্রামে বা বাসে না।

নমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। দুধ খেয়ে পেট ভরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মের ম্লান চারাগাছ যেমন জলসিঞ্চন মাত্রেই একটা সজীবতায় প্রসন্ন হয়ে ওঠে তেমনি ভাবেই শক্তি ফিরে পেয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অজয় আটকা পড়েছিল। কাজও কিছু ছিল কিন্তু ওর কলমটা মেয়েটির কাছে থেকে গেছে। সই করে উঠে তার দিকে তাকিয়েই মেয়েটি পড়েছে। কলমটা সে নিজের ব্লাউজের তলায় রেখে কলারে আটকেছে তা সে দেখেছে। কলমটা তার বাবার কলম। সেকালের সোয়ান পেন। এর মধ্যে সে কলমটা নিতে পারে নি। অন্তত ওর জ্ঞান না হওয়া অবধি চাইতে কোথায় তার ভদ্রতায় বেধেছিল। তারপর একবার কাজে বাইরে গিয়ে ফিরে এসে দেখে মেয়েটি ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত অবস্থায় খুলে নিতেও পারে নি। অপেক্ষা করে ছিল।

নমিতার ঘুম যখন ভাঙল তখন তিনটে। বেশ সুস্থ হয়েছে কিন্তু আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু এক দুস্তর লজ্জা—তার পয়সা নেই। একটু ভেবে সে একটি মেয়েকে বলেছিল—আমাকে একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে দিতে বলুন। আমি বাড়ি যাই তা হলে।

সেই মেয়েটি আপিসে এসে সে কথা বলতেই অজয় বলেছিল—উনি সুস্থ হয়েছেন? উঠেছেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আমি একটু দেখা করব। আমার কলমটা ওঁর কাছে আছে।

কলমটার কথা বলতেই নমিতার লজ্জার আর সীমা ছিল না। তাড়াতাড়ি কলমটা তার হাতে দিয়ে বলেছিল—কি লজ্জা! আপনি বিশ্বাস করুন, তখন আমার কোন হুঁশ ছিল না।

অজয় বলেছিল—সে তো আপনি হুঁশ হারিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে গিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। মুখে বলতে হবে কেন? আর ওটা আমার বাবার কলম, নইলে থাকতই আপনার কাছে, পরে ফেরত দিতেন আপনি আপিসে, আমি পেতাম। কিন্তু ওটার প্রতি আমার ভারী মমতা।

ঠিক সেই সময়েই একজন ভলেণ্টিয়ার এসে খবর দিয়েছিল—ট্যাক্সি এসেছে।

আপিসের কর্তা এসে বলেছিলেন—তুমি একলা যাবে? সে তো ঠিক হবে না। কোথায় যাবে তুমি?

—নর্থ ক্যালকাটা। মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়িয়ে একটু যেতে হবে।

অজয় বলেছিল—তা হ'লে আমি যেতে পারি। আমি যাব গ্রে স্ট্রীট।

নমিতা আপত্তি করে নি কিন্তু সারাটা পথ চোখ বুজে এককোণে ঠেস দিয়ে প্রাণহীন পুতুলের মত পড়ে ছিল। বুকের ভিতর একটা আবেগ যেন বর্ষার বাদলা দিনের পুঞ্জ

পুঞ্জ মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল। তার ভয় হচ্ছিল চোখ খুললেই বুঝি ঝরঝর করে জল বেরিয়ে আসবে, কথা বলতে গেলেই বোধ হয় সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবে।

ওদের বাড়িতে এসে ডাকতেই হরিপ্রিয়া দেবী নিজে এসে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এবং অভিনয়ের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বলেছিলেন—

—তুমি নিষ্ঠুরা তুমি হৃদয়হীনা—তুমি পাষাণী—

অবাক হয়ে গিয়েছিল অজয়। ঠিক এমন বাগ্‌বিন্যাস এবং এমন সুর ও স্বরভঙ্গি সে কখনও শোনে নি জীবনে। তবে তিরস্কার বুঝতে তো বিলম্ব হয় নি। সে বলেছিল—কিছু বলবেন না ওঁকে। উনি অসুস্থ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

উমা বা নমিতা অপেক্ষা করেনি। সে হরিপ্রিয়া দেবীর পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়েছিল তার ফেলে যাওয়া পার্সের খোঁজে। ট্যাক্সিভাড়াটা দিয়ে দেবে। কোন রকমে অজয়কে বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সে বেঁচে যেত। অজয় যেন আর কোন রকমে তাকে চিনতে না পারে! যে পিছনটা তার অদৃষ্টের চক্রান্তে হারিয়ে গেছে সেটা হারিয়েই যাক। সেটা আবার কোন রকমে কোন ঘটনাচক্রে বেরিয়ে পড়ে তাকে চরম লজ্জা না দেয়!

—সেই সুন্দর উমা—তুমি এমন হয়ে গেছ? আঃ, কি চমৎকার দেখতেই না ছিলে! সেই রূপ! এ কথা যেন শুনতে না হয়।

অথবা,—"ওঃ, এ দুঃখ-দুর্দশা সব আমার জন্যে! যদি দয়া করে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ বলে···।"—এই কথা যেন অজয় না বলে।

অজয় লিখবে ভুনিদাকে, দুনিদাকে, জ্যাঠাইমাকে। তাঁরা ছুটে আসবেন। বলবেন—আমার মেয়ে নেই—তুই আমার মেয়ে।

ভুনিদা বলবে—তুই আমার বোন।

এসবের একটি শব্দও সে শুনতে চায় না।

তারপর হরিপ্রিয়া দেবীকে জেনে যদি—। কথাটা ভাবতেও সে পারে না। অজয়কে সে খানিকটা জানে। মনে পড়ে তার দিদির মৃত্যুর পর যখন তাদের বাড়ির সামনে মস্ত জটলা হয়েছিল—নানান জনে নানান কথা বলেছিল, মুখুজ্জে দাদু নিষ্ঠুরভাবে তার বাবাকে কটু কথা বলে আক্রমণ করেছিলেন তখন অজয় এগিয়ে এসে তাঁর কথার জবাব দিয়েছিল—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কোন অপরাধ করে নি দিদি অর্থাৎ রমা; যে অপরাধ কালের শিক্ষায় হয়ে গেছে বা করে ফেলেছে জীবন দিয়ে সে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। তার বাবা চীৎকার করে সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছিলেন—অপরাধ হয়েছে আমি স্বীকার করছি। অন্যায় আমার হাজারবার লক্ষবার হয়েছে। অজয় বলেছিল—না, হয় নি। কোন অপরাধ হয় নি। ভুল অপরাধ হয় তখনই যখন ভুল জেনেও সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মানুষ না করে। জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে যে বড় প্রায়শ্চিত্ত সংসারে নেই।

অজয় হয়তো তার অপরাধ এর মধ্যে দেখবে না।

না, দেখবে? বলবে—তোমার বসন্তের সময় রোগের প্রকোপে আত্মহারা হয়ে নয়তো ওকে মা বলে ভুল করেছিলে। কিন্তু তারপর? তারপর যখন জানলে তখনও তার পোষ্য হয়ে তার অন্নে তার দয়ার মধ্যে নিশ্চিন্ত কুণ্ঠাহীন হয়ে রয়েছ কেন?

হয়তো তাও বলবে না। কারণ তার ও তার মায়ের এই দুঃখ অজয়েরই জন্য বলে। কিন্তু মনে মনে? মনে মনে এ কথা অজয় ভাববেই। মনে পড়ছে অজয়ের মাকে। তার তো মনে পড়ছে কি কঠোর তাঁর আচার-বিচার। তার প্রভাব অজয়ের উপর রয়েছে। সে যাবে কোথায়?

সব থেকে বেশী অসহ্য হবে তার অজয় যদি জানতে পেরে চিনতে পেরে তাকে দয়া করতে

আসে। তারা তার জন্যে যে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে তার দাম দিতে চায়। মনোরমা পিসির কথা মনে পড়ছে। তাঁর চিঠির কথাগুলো তার মনে আছে। তিনি তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, সে যে দাম দেওয়ার চেষ্টা তার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে আছে বলেছিলেন—লিখেছিলেনও—"বউদিদি যে কষ্ট তুমি পেয়েছ পাচ্ছ তার জন্যে তো দায়ী অজয়। তোমার অপরাধ তো আমার অজয়কে ভালবেসে রক্ষা করতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়! এখন তোমার এই কষ্টে বিপদে যেটুকু পারি না করলে যে অপরাধের পাপের সীমা থাকবে না আমার। আমার অজয়ের তাতে অকল্যাণ হবে।"

নমিতা বা উমার সারা অন্তর চীৎকার ক'রে উঠেছিল। না—না—না। সে নেবে না, নিতে পারবে না সে!

কয়েকটা মিনিটের মধ্যে মনের মধ্যে ভাবনাগুলো অমাবস্যার জোয়ারের সমুদ্র-তরঙ্গের মত পর পর আছড়ে আছড়ে এসে পড়েছিল। মনোভূমি লবণাক্ত জলে ভিজে কটু হয়ে উঠেছিল। তারই মধ্যে ঝিনুক শাঁখের সম্পদের মত আর একটি চিন্তা এবং সংকল্পও জেগে উঠেছিল।

হরিপ্রিয়া দেবী তার মা। তাঁকে সে ছাড়বে না, ছাড়তে পারবে না। কোন অগৌরবের ভয়েও নয়। কোন সৌভাগ্যের বিনিময়ে—সে স্বর্গের বিনিময়েও নয়। নয়—নয়—নয়।

তার থেকে এখনই এই মুহূর্তে এর উপর যবনিকা টেনে দেবে সে। ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে অজয়কে বলবে—অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা তাহলে আপনি আসুন।

সে পার্স থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। নীচে নেমে আসতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হয়েছিল হরিপ্রিয়ার সঙ্গে, ওদিকে বাইরে ট্যাক্সির শব্দ হয়েছিল; সে চমকে উঠে বলেছিল—উনি চলে গেলেন?

হরিপ্রিয়া বলেছিলেন—তুমি নেমে এলে কেন?

—ট্যাক্সির ভাড়া আনতে গিয়েছিলাম।

—তুমি ওখানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। এখান থেকে হেঁটে গিয়ে—কিছু না খেয়ে কেমন মাথা ঘুরে—

—হেঁটে? না খেয়ে? তার মানে? টাকা ফুরিয়েছে তো নিয়ে যাও নি কেন? আমি এত পর? আমি তোমার কেউ নই? আজও তুমি আমাকে সত্যি করে মা ভাবতে পারলে না? হরিপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর অভিনয়ের বাচনভঙ্গিতেই কাঁপতে কাঁপতে উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছিল। এরপরই হয়তো কোন নাটকের কোন অংশ আবৃত্তি শুরু করবেন।

শঙ্কিত হয়ে অমিতা বলে উঠল—মা, তা নয়। টাকা ফুরোয় নি। শোন।

—কি শুনব? টাকা ফুরোয় নি কিন্তু তবু হেঁটে গিয়েছিলে। টাকা ছিল তবু উপবাস করেছ। বিচিত্র কাহিনী তোমার! এ সংসারে তো কেউ কখনও শোনে নি এমন বিচিত্র কথা! টাকা ছিল তবু ট্যাক্সিভাড়া দেবার জন্যে ছুটে উপরে উঠেছিলে টাকা আনবার জন্য। বিচিত্র বারতা! চমৎকার!

নমিতা এর ওষুধ জানে কিন্তু তা ব্যবহার করতে কেমন সংকোচ বোধ করে। ও'র সঙ্গে সমানে চেঁচাতে হয়। কিংবা কাঁদতে হয়। আজ দুটোর একটা করতেও তার মন চাইল না। সে এসে হাত ধরে বললে—দয়া করে আমার কথা শোন। দয়া কর!

—কি শুনব তোমার কথা?

—আমি তাড়াতাড়িতে পার্স ফেলে গিয়েছিলাম। তুমি বারণ করেছিলে যেতে, আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ফেলে গিয়েছিলাম। রাস্তায় দেখলাম পার্স নেই। ফিরে আসি নি তুমি যেতে দেবে না বলে। কি করব, হেঁটে চলে গেলাম।

বলতে বলতে আবার দরজার গোড়ায় মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল।

হরিপ্রিয়া বললেন—পরে শুনব, উপরে চল, ডাক্তার এসেছেন।

—ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার। ওই ছেলেটিকে হরেনবাবু ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। গাড়ি ফিরেছে—তিনি নিশ্চয় এসেছেন। যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। বাসিনীকে বল বিছানার পাশে চেয়ারখানা দিতে।

হরেনবাবু ডাক্তার প্রবীণ লোক, সেকালের নামকরা ডাক্তার, শুধু নামকরা ডাক্তারই ছিলেন না, এ্যামেচারে ভাল এ্যাক্টরও ছিলেন—আর ছিলেন রঙ্গমঞ্চ-রসিক। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তত ঘণ্টা দুয়েক কাটত থিয়েটারে। গ্রীন রুমে—আপিসে—আড্ডায়। যে বিখ্যাত নাট্যকার হরিপ্রিয়া দেবীর স্বামীপ্রতিম ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন—কত দিন কত সময় হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়িতে আসর জমিয়েছেন। হরিপ্রিয়া দেবীর অগাধ বিশ্বাস তাঁর উপর। হরেনবাবু তাঁর কাছে শুধু চিকিৎসক নন—ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হিতকামী। বাইরে থেকেই তিনি হাঁকছিলেন—কি হল ? নমির তো হার্টফার্ট উইক নয়, তবে এমনটা হল কেন ? কই ?—

—এই যে আসুন। বিচিত্র এ যুগ ডাক্তারবাবু—এ যুগই বিচিত্র ! বিদ্রোহের যুগ। কিছুকে কাউকে না মানার যুগ। সে হোক মাতা, হোক পিতা কিংবা সেই জন হোন না বিধাতা। মানব না। কিন্তু তার মাসুল আছে। দিতে হয়। পার্স ফেলে গিয়েছিল, কিন্তু বাড়ি ফিরলে পাছে যেতে না দিই তাই হেঁটে গেছেন—সেখান পর্যন্ত। বাড়ি থেকে না-খেয়ে পালিয়েছিল—পয়সা ছিল না—উপবাস গেছে—বলছে সেই জন্যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ! তবুও দেখুন। বলা তো যায় না। তা ছাড়া শুনলুম ওই ছেলেটি বললে—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার দেখেছে। তবে ডাক্তারটি কমবয়েসী—একালের ডাক্তার। ওদের উপর আমার একদম বিশ্বাস নেই।

হাসলেন হরেন ডাক্তার। বললেন—মিথ্যে বলেন নি। শতমারী ভবেদ্ বৈদ্য সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। কথাটা ফেলনা নয় মিথ্যেও নয়। আমার তো দশ হাজার পার হয়েছে। তার উপর আমার উপর আপনার বিশ্বাস ! চলুন।

বিচিত্র হরিপ্রিয়া দেবী। ডাক্তারের পিছনে অজয় দাঁড়িয়েছিল—তাকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারকে ডাকতে, সে ডেকে নিয়ে এল কিন্তু তাকে তিনি একটি কথাও বললেন না। থাকতেও না যেতেও না—লক্ষ্য করেও যেন লক্ষ্য করার প্রয়োজন মনে করলেন না। অজয় বিস্মিত হয়েছিল গোড়া থেকেই তাঁর কথার ভঙ্গি শুনে। এবার ডাক্তারের সঙ্গেও সেই ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে সে বিস্ময় বাড়ল। কিন্তু মনে মনে আহত না হয়েও পারলে না। আশ্চর্য ! একান্ত অপরিচিত সে, সে তার মেয়েকে এতটা পথ যত্ন ক'রে নিয়ে এল, ডাক্তার ডেকে আনলে তবু একটা কথা বললেন না ! খুব একটা বড়লোক ধনী লোক বলেও মনে হয় না ! তবে এমন মেজাজ কেন ?

সিঁড়ির ঘরটা বেশ প্রশস্ত। সিঁড়িটাও সেকেলে ফ্যাশনের অভিজাতধর্মী। ডাক্তার এবং হরিপ্রিয়া দেবী উঠে উপরের তলায় দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সে ভুরু কুঁচকে চলে যাবার জন্যে ফিরল। চলে যাবে সে। বেলা গড়িয়ে গেছে। মা উতলা হয়েছেন। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে একখানা ছবি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। আশ্চর্য ছবি। এ কি ছবি ? কার ছবি ?

বড় বড় থাম ও খিলেনওয়ালা ঘর—যেন কত চেনা মনে হচ্ছে ! সেই ঘরে দাঁড়িয়ে মুসলমানী পেশোয়াজ জামা ওড়না মুক্তোর মালা মাথায় মুকুট পরা রাণী বা বেগম—ও কে ? হঠাৎ সে চিনতে পারলে ঘরখানাকে। এ তো দেওয়ানী খাস ! দিল্লীর দেওয়ানী খাস !

তাহ'লে ? ওই মহিমময়ী মেয়েটি কে ? অথচ বাদশাহী আমলের পেণ্টিং নয়। ফটোগ্রাফ। সামনে কালোমুখ হাবসীর মত একজন মুসলমান রাজা বা সেনাপতি। একটু দূরে আর একখানা ফটোগ্রাফ। এখানেও সেই মহিমময়ী—কিন্তু বেশ হিন্দু রানীর। নতজানু এক বীর-বেশী যুবকের মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই আর একখানা—ওই আর একখানা। ওই আর একখানা। সামনে খোলা দরজার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় একখানা ঘরের দেওয়াল। সেই দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি—ওয়াটার কলারে এই মহিমময়ী মেয়েটির প্রতিকৃতি। গলায় মুক্তার কলার, গলা থেকে কোমর পর্যন্ত সোনার হার, হাতে ব্রেসলেট, তার মায়ের ছবিতে সে আমলের চুল-বাঁধার ঢং—পাতাকাটা চুলবাঁধা। মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি রুচি—তার সঙ্গে অসচরাচর এমন কিছু যাকে ব্যক্তিত্ব বা মহিমা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। একটু দূরে একটি ভদ্রলোকের ছবি। ওই সাইজের। চেয়ারে বসে আছেন—একটি টিপয় অথবা ছোট টেবিলের উপর থাক-বন্দী বই। আরও ক'খানা বড় ফটোগ্রাফ। গ্রুপ ফটো। তাতে বিচিত্র সমাবেশ। কিছু আধুনিক কালের ভদ্র ব্যক্তি। তার সঙ্গে নবাব বাদশা রাজা রানী বেগম। একালের লোকেরা ব'সে আছেন আর এই রাজারাজড়া বাদশা নবাব বেগম শাহজাদীরা দাঁড়িয়ে আছে বা তাঁদের পায়ের তলায় ব'সে আছে।

সাধারণ বোধে এ ছবিগুলিকে চেনা আদৌ শক্ত নয়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নাট্যলোকের পাতায় এ ছবি হামেশাই দেখা যায়। অজয়ও দেখেছে। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে সব ছবি এই বাড়িতে টাঙানো থাকবে কেন ? এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল। ওই মহিলাটির কথার ভঙ্গি যেন তাকে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছিল। তবু সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওই নমিতা মেয়েটি—কলেজে পড়ে—ফরওয়ার্ড ব্লকের ধ্বজাধারিণী—তার মা—ওই খাটো ক'রে চুলকাটা নিরাভরণা মহিলাটির সঙ্গে এ সবের কি ক'রে সম্পর্ক থাকবে ? তবে কি ওই ভদ্রলোক—ও'কে কেন্দ্র করেই এত ছবি ? তাও তো নয়। সব ছবিতেই ওই মহিমময়ী মেয়েটি রয়েছেন বিভিন্ন বেশে। কোথাও মুকুট প'রে রাজরাজেশ্বরী, কোথাও পেশোয়াজ প'রে বাদশাহী বেগম। কোথাও বিধবা কোথাও সধবা—এ-কালিনী, মোট কথা সব ছবির মধ্যে তিনি। তিনি কে ?

মনে একবারও হয় নি যে তিনি আর ইনি এক। অসম্ভব! অসম্ভব বলেই মনে হয় নি। সে অবাক হয়ে দেখছিল। যে ছবিখানা দেখছিল সেখানা ওই বড় ছবিখানা। যেখানায় ওই মহিমময়ী রূপবতী রুচিমতী মেয়েটি স্মিতহাস্যে তাকিয়ে আছে—দেখছে তার মুখের দিকে।

—দেখছ ?

হঠাৎ পিছন থেকে গাঢ় গম্ভীর নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হল—দেখছ ?

চমকে উঠে অজয় পিছন ফিরে দেখলে—নমিতার মা। অজয় একটু সংকুচিত হল—সংকোচের সঙ্গে হেসে প্রশ্ন করে বসল—উনি কে ?

একটু হেসে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে হরিপ্রিয়া বললেন, বললেন না কিছু—যেন অজয়ের কথারই আধখানার প্রতিধ্বনি করলেন—উনি ?

অজয় তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। বিচিত্র সে দৃষ্টি। তার ব্যাখ্যা সে জানে না। শুধু সে দৃষ্টি দেখে অভিভূত হয়ে গেল। কোন প্রশ্ন করতে পারলে না। হরিপ্রিয়া ছবিখানা দেখতে দেখতে বলে উঠলেন—বিচিত্র জীবন! একটি দিনের মত! সায়াহ্নের ক্লান্ত ম্লান রক্তসূর্য দেখে কে চিনিতে পারে বল মধ্যাহ্নের দীপ্ত শুভ্র মার্তণ্ড ভাস্করে ? তারপর একটু থেমে বললেন—ও আমি!

—আপনি !

—বিস্ময় লাগছে ? লাগবারই কথা। বললাম তো, সায়াহ্নের ক্লান্ত ম্লান রক্তসূর্য দেখে কে চিনতে পারে বল মধ্যাহ্নের দীপ্ত শুভ্র মার্তণ্ড ভাস্করে ?

চুপ করে রইল অজয়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবছিল—কে ? ইনি কে ?

হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর মত হেসে উঠলেন মহিলাটি। বললেন ও সত্যই আমি। আমার তরুণ বয়সের ছবি। তখন বয়স আমার তিরিশ। তুমি—? তোমার কত বয়স ? কুড়ি ?

—একুশ।

—তাই। এক কথা। তুমি দেখ নি। কিন্তু সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী হরিপ্রিয়া দেবীর নাম শুনেছ ?

অজয় অবাক হয়ে গেল। সত্যই কোন কথা সে বলতে পারলে না।

হরিপ্রিয়া বললেন—আজকের আমার মধ্যে ওকে খুঁজে পাবে না। পাওয়া যায় না। কিন্তু ও নাম শুনেছ কিনা বললে না তো ? তোমরা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, শুনেছি তোমরা থিয়েটার-টিয়েটার দেখ না। খোঁজও রাখ না। কিন্তু দেশবন্ধু আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। ওই দেখ ওই গ্রুপ ফটোতে মাঝখানে চেয়ারে বসে আছেন দেশবন্ধু। তাঁর পায়ের তলায় বসে আমি।

চুপ করলেন তিনি, সুখের অতীত কালকে স্মরণের মধ্যে আস্বাদনের তৃপ্তি একটি প্রসন্ন হাস্যের ক্ষীণ রেখায় তাঁর আসন্নবার্ধক্য শীর্ণ মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—তিনি ওই ছবি খানার দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

ভারী ভাল লাগল অজয়ের। মুগ্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়েই রইল। হরিপ্রিয়া দেবী হঠাৎ দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে আলোর সুইচটা টিপে আলো জ্বাললেন। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। অজয় সচেতন হয়ে উঠল। ওঃ, এ যে সন্ধ্যা হয়ে এল প্রায়। মা যে চিন্তায় অধীর হয়ে উঠবেন। সেও যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি করে কি বলে বিদায় নেবে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে এগিয়ে তাঁর কাছে এসে -মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—আজ আমি যাই।

চমকে উঠে পিছিয়ে গেলেন হরিপ্রিয়া দেবী।—এ কি করলে তুমি ! এ কি করলে ?

বুঝতে পারলে না অজয়। বিভ্রান্ত হয়ে বললে—আজ্ঞে ?

—কি নাম তোমার ?

—অজয় মুখোপাধ্যায়।

—ব্রাহ্মণ ! ওঃ ! এ কি করলে তুমি ? আমাকে প্রণাম করলে কেন ? এ কি করলে ! হে ভগবান !

—কেন ?

কপালে হাত দিয়ে হরিপ্রিয়া বললেন আমার অদৃষ্ট ! ওঃ ! ছি ছি ছি ! তারপর এগিয়ে এসে অজয়ের চিবুকে হাত দিয়ে বললেন—ওরে বাবা, তোদের প্রণাম আমার নেবার অধিকার নেই। আমি জাতিহীনা—আমি অশুচি—!

সে কি কণ্ঠস্বর তাঁর ! যেন হাহাকার ঝরে পড়ে ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল। অজয় বড় হয়েছে। এবং এ দেশের থিয়েটার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে একান্ত অজ্ঞ নয়। শুনে জেনেছে। পড়েছেও কিছু। সে এবার বুঝতে পারলে তাঁর বেদনার কারণ। লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। কারণ তো ঠিক নেই এ লজ্জার পিছনে। হরিপ্রিয়া কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন—তোমার প্রণাম আমি পরমহংসদেবের চরণে নিবেদন ক'রে দিলাম। তিনি বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে আমাদের পতিতজীবন থেকে উদ্ধারমন্ত্র

দিয়ে গেছেন। তিনি তোমার মঙ্গল করুন। অনেক বড় হও তুমি। অনেক বড়!

অজয় স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এবার আমি যাই।

—আর একটু বসতে হবে বাবা! আমার অসুস্থ মেয়েকে কত যত্ন ক'রে নিয়ে এসে পেঁছে দিলে, আমাকে মায়ের মত সম্মান দিলে, এখানে এসেও ডাক্তার ডেকে আনলে, শুধুমুখে তো তোমাকে যেতে দিতে পারব না! তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে আর একটু চা খেতে বলতে এসে তোমায় ওই ছবিগুলো দেখতে দেখে সব ভুলে গেলাম। অহংকার দম্ভ বড় বিচিত্র জিনিস বাবা। ওকে দূর করা বড় কঠিন। আজ হৃতগৌরব হৃতসর্বস্ব। গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—দেহপট সনে নট সকলি হারায়। তা দেহপট শ্মশানে শেষ হতেও হয় না—তার আগে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াবার বয়স আর রূপ গেলেই যায়; বাবা, এ বয়সে স্টেজে দাঁড়ালে দর্শকেরা চীৎকার করে উঠবে যাও যাও বলে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—এই দেখ আবার সেই বকে যাচ্ছি। সেই নিজের কথা। সেই অহংকার! চর্বিত-চর্বণ। বস তুমি—একটু মিষ্টি আর চা আনি আমি।

তারপরই সিঁড়ির দিকে মুখ তুলে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—নমিতা—নমিতা! তুমি নীচে এস। শুনছ?

কেউ কোন উত্তর দিল না। আবার তিনি ডাকলেন—নমিতা!

তারপর ডাকলেন—বাসিনী! বাসিনী!

এরপর উচ্চতর কণ্ঠে অসহিষ্ণুভাবে ডাকলেন—বা—সি নী! —শুনতে পাচ্ছ না? বধির হয়েছ?

—ওদিকে ছিলাম মা।

—নমিতা কোথায়? ডাক তাকে! নীচে আসতে বল! আর চায়ের জল বসিয়ে দাও।

নমিতার জন্যেই অপেক্ষা করে রইলেন।

উপর থেকেই বাসিনী বললে—দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছেন মা।

—ঘুমিয়ে পড়েছে?

—অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ডাকলাম—তা বললেন—উঠতে পারছি না আমি।

অজয় বললে—বিশ্রাম করুন উনি। ওখানে ডাক্তার বলেছিলেন—পরিশ্রম হয়েছে অত্যন্ত বেশী আর খাননি কিছু। উনি বললেন—বমি হয়ে সব উঠে গেছে, এখান থেকে যাবার পথে।

হরিপ্রিয়া বললেন—একটু মিথ্যা বলেছে বাবা। আমি ওকে যেতে বারণ করেছিলাম। কাল সারাটা দিন মিছিলে বেরিয়ে ফিরল অনেকটা রাত্রে। তারপরও রাত্রে ঘুমোয় নি। গভীর রাত্রে দেখি ঘরে নেই, ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নেতাজী আসবেন হয়তো অথবা কোন প্লেন এসে কাগজ ছড়িয়ে যাবে তিনি এসে নেমেছেন কোথাও এ দেশে। জোর করে এনে শোওয়ালাম। সকালে বারণ করলাম—আজ তুমি বেরুবে না। আমি বেরুতে দেব না। অসুখ করলে ভুগতে পারব না। ও সকালে উঠে লুকিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাড়াতাড়িতে পার্স ফেলে গেছে। পথে মনে হয়েছে। কিন্তু ফিরতে পারে নি—পাছে আমি আটকে দিই। পয়সার অভাবে এখান থেকে হেঁটে গেছে—খায় নি। লজ্জায় সে কথা বলতেও পারে নি। ওটা যে সব থেকে বড় লজ্জা বাবা। সংসারে অনেক আছের চেয়ে কিছু নেই-এর লজ্জাটাই বোধ হয় বড়।

অজয় বললে—না—না—না। এটা ও'র অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এটা আমরা কেউ বুঝতে পারি নি! এ কি কথা! আমরা এক পার্টি'র মেম্বর। এতে কি লজ্জা ছিল! আর এ যুগে তো না থাকাটা বড় লজ্জা নয়, থাকাটাই বড় লজ্জা।

—না বাবা। না থাকাটা চিরকালই লজ্জার কথা থাকবে। এখনকার লজ্জা একজনের বেশী একজনের কিছু নেই-এর লজ্জা। সে লজ্জা দূর করতে বড় লজ্জা কিছু না-থাকার লজ্জাটা দূর করতে হবে। সবারই আছে—এতে তা দূর হবে। তুমি বস বাবা। আমি খাবার চা নিয়ে আসি। চলতে শুরু করে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন- তার থেকে তুমি ওপরে এস না। ব্রাহ্মণের ছেলে—দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগী—আমার ঘর তোমার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হবে।

অজয় আর সংকোচ করে নি। ওপরে তাঁর পিছনে পিছনে উঠে গিয়েছিল। অমিতার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। খাটের উপর শুয়ে ছিল সে। ঘুমুচ্ছে। হরিপ্রিয়া দেবী নিজের ঘরে মেঝের উপর আসন পেতে তাকে বসিয়েছিলেন। ঘরে একখানা খাট ছাড়া আর কোন আসবাব বড় নেই। থাকবার মধ্যে একটা ছোট টেবিলের উপর টুকিটাকি কিছু জিনিস, আর দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একখানা বেঞ্চের উপর তিন-চারটে ট্রাংক একটা স্যুটকেস। এক-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা লোহার আলমারি। গোটা ঘরটা সুগন্ধি ধূপকাঠির গন্ধে ভরপুর হয়ে রয়েছে। হরিপ্রিয়া দেবী সামনের একটা দরজার পর্দা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকতেই অজয়ের নজরে পড়ল চমৎকার একটি চৌকির উপর বেশ বড় একখানি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অয়েলপেণ্টিং—তার সামনে নানান উপকরণ! বুঝতে পারলে ওটি ওঁর পুজোর ঘর। সেই ঘর থেকে একখানি শ্বেতপাথরের রেকাবিতে কয়েকটি নলেন গুড়ের সন্দেশ কমলালেবু আপেলের টুকরো কোরা নারকেলের শাঁস পরিপাটি করে সাজিয়ে এনে নামিয়ে দিলেন।

- খাও বাবা। আমি তোমাকে দেবতার প্রসাদ দিয়েছি। ফেলে রেখো না। তারপর ডাকলেন—বাসিনী! চা হয়েছে?

বাসিনী চায়ের কাপ এনে নামিয়ে দিল।

অজয়ের ক্ষিদে পেয়েছিল এবং এতক্ষণের এই বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে সকল সংকোচও তার চলে গিয়েছিল। সে তৃপ্তি এবং আশ্চর্য একটি আনন্দের সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছিল। হরিপ্রিয়া দেবী প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কথা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি বাবা! কোথায় থাক তুমি? মেসে?

—না, কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে গ্রে স্ট্রীটে। সেখানেও থাকি নে অবিশ্যি। বাড়ি আমাদের চাটগাঁয়ে—ঠাকুরদা বাবা ওখানে ওকালতি করে বাস করেছেন। আসল দেশ বর্ধমান জেলায়। গ্রামে। যুদ্ধের সময় চাটগাঁ ছেড়ে দেশে এসেছি। বাড়িটাড়ি নিয়ে এর মধ্যে গোলমাল হয়েছে চট্টগ্রামে। বাবা মারা গেছেন আমার বাল্যকালে। আছেন শুধু মা। আমাকে পুলিস তেতাল্লিশ সালে ধরেছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী বলে। ছাড়া পেয়েছি মাস কয়েক। এসে দেখি মায়ের অসুখ। ওঁকে কলকাতায় এনেছি চিকিৎসার জন্যে।

হরিপ্রিয়া ডাকলেন—বাসিনী!

—মা।

—নীচে গিয়ে ওই দোকানের ছোকরাটাকে আমার নাম করে বল একখানা ট্যাক্সি আনতে। বলেই অজয়কে বললেন—তোমরা যে ট্যাক্সিতে এসেছিলে, ডাক্তারবাবুকে নামিয়ে দিয়ে সেটা ওখান থেকেই চলে গেছে। আমি ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।

—সে কি?

—হ্যাঁ বাবা। ওটা নমিতার জন্যেই দরকার হয়েছিল। নমিতা আমাকে বলেছে। ওটা আমারই দেয়। ওতে সংকোচ করো না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সারাটা দিন চলে গেছে—তোমার মা রোগা দেহ নিয়ে নিশ্চয় ভাবছেন। তুমি ট্যাক্সিতে চলে যাও। আমি ভাড়াটা দিলে কিছু মনে করবে?

অজয় বললে—করব ! অত্যন্ত দুঃখ পাব।

—বেশ তবে দেব না।

* * *

বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে মাথাতে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে অজয় বেরিয়ে এল। অপরাহ্নের স্মৃতিটুকু অপরূপ উজ্জ্বলতায় এবং মাধুর্যে তার মনটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। কথাগুলি মাকে বলবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে মান-অভিমানের পালা শেষ হওয়ার পর তার মন এমন একটা কিছু চাইছিল যা দিয়ে মাকে বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত করে তুলতে পারে। শুধু তাঁকে উচ্ছ্বসিত করে তুলবার জন্যই নয়, তার আজকের এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার স্বাদ না দিয়েও তার আবেগ প্রশমিত হচ্ছিল না। চুল আঁচড়ে জামা বদলে সে মায়ের কাছে এসে বসেই বললে—অদ্ভুত, বুঝলে মা—অদ্ভুত মানুষ ! ওঃ কি কথা—যেমন বলবার ভঙ্গি তেমনি উচ্চারণ তেমনি কণ্ঠস্বর—

মনোরমা এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন—কার ? মেজর জেনারেল শা-নাওয়াজের ?

—ও, তিনি খুব দিলখোলা লোক, যেমন হাসিখুশী তেমনি অবিশ্যি গম্ভীর তেজস্বীও বটেন। চমৎকার লোক। অনেক গল্প করলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের। নেতাজীর সঙ্গে বিদায়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। জাপানীরা তখন ভেঙে পড়েছে—আজাদ হিন্দ্ কিন্তু ঠিক ছিল—প্রাণ দিয়ে লড়তে এবং লড়াই জিতবার তাদের সংকল্প—কিন্তু কি করবে—গোলাবারুদ আর্মস এ্যামুনিশন সব ফুরিয়েছে। কি দিয়ে লড়বে। একটা গল্প বললেন—পথে পিছু হটবার সময় তিনি সৈন্যদের সঙ্গে হেঁটে মার্চ করছেন—একজন জাপানী অফিসার তাঁর গাড়ি থামিয়ে তুলে নিতে চাইলেন সসম্মানে, কিন্তু নেতাজী বসলেন না। বললেন—আমাকে কি ভাবেন ? আমি বর্মার বা ম (BA MAW) নই। আমি আমার সৈন্যদের বন্ধুদের ছেড়ে নিরাপদ হতে চাই নে। শেষ বিদায়ের দিন—১৬ই আগস্ট—তিনি ব্যাংকক থেকে যাবেন সাইগন—সেখান থেকে টোকিয়ো। সেখানে গিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করবেন। সন্ধ্যের সময় তাঁর বাংলোতে ডাকলেন সকলকে, খাওয়ালেন। শা-নাওয়াজ বললেন—আমরা নেতাজী জিন্দাবাদ আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ বলে ধ্বনি দিচ্ছি—তাঁর সেই সুন্দর বড় বড় চোখদুটি থেকে মুক্তার ধারার মত জলের ধারা নেমে এল। আকাশের দিকে তিনি চেয়ে ছিলেন। গল্পটা বলতে বলতে শা-নাওয়াজ কাঁদলেন—আমরা যারা শুনলাম তারাও কাঁদলাম ! তবে নেতাজী বলে গেছেন তিনি আবার আসবেন—আসবার চেষ্টা করবেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। সে সূর্যোদয়ের আভাস তিনি চোখে দেখতে পেয়েছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে থাকতেন আর বলতেন—সেই সকালটি—সেই সকালের সূর্যোদয়টি কিন্তু পৃথিবীর সকল প্রভাতের মধ্যে উজ্জ্বলতম—brightest sunrise হবে। আমি জানি।

ঝি এসে মটরশুঁটির কচুরি রসে ভিজানো পিঠে এবং চা নামিয়ে দিয়ে গেল। মনোরমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল আবেগে—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—তিনি ছেলেকে খেতে বলবার মত শক্তিও খুঁজে পেলেন না। অজয়ও চুপ করে বসে রইল। তারও হাত বাড়াবার মত মুখে তুলে খাবার মত শক্তি মন দুই-ই অভিভূত হয়ে গেছে।

ঝিও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেও অভিভূত হয়ে গেছে বোধহয়। কিছুক্ষণ পর সেইই প্রথম বললে—দাদাবাবু, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কচুরিগুলোও—।

মনোরমাও এবার ভাষা ফিরে পেলেন।—খা বাবা। ঝিকে বললেন—যা আবার নতুন চা করে আন।

অজয় একখানা কচুরি তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বললে—বেশ করেছে তো! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—খিদে নেই যে! তুমি বুঝি বিশ্বাস করলে না?

—হ্যাঁ, কার বাড়ি বললি?—ভুলে গেছি। যাঁর কথা বললি তাঁর কথা যে সব কথা ভুলিয়ে দেয়। থিয়েটারের বড় এ্যাক্ট্রেস—

—হ্যাঁ, হরিপ্রিয়া দেবী। তারাসুন্দরীর পরই বড় এ্যাক্ট্রেস ছিলেন। ওঃ, কি সুন্দর চেহারাই ছিল তাঁর এককালে! একেবারে রানীর মত। এখন অবশ্য তাঁকে দেখে বোঝাই যায় না যে সেই মানুষ এই হয়েছে! কিন্তু কথা কইলেই ধরা যায়। ওঃ কি কথা—কি কণ্ঠ—কি উচ্চারণ—কি বলবার ভঙ্গি। আর কথা যা বলেন ঠিক যেন লেখকের মত, বক্তার মত। বললেন—ওই নিজের এখনকার চেহারার জন্যে বললেন—সায়াহ্নের ক্লান্ত ম্লান রক্ত সূর্য দেখে কে চিনতে পারে বল মধ্যাহ্নের দীপ্ত শুভ্র মার্তণ্ড ভাস্করে? জানো, কথাগুলো উনি নিজে তৈরী করে বললেন। অদ্ভুত! তারপর আমাকে আসন পেতে বসিয়ে রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদী কলা আপেল নারকেলকোরা নলেন গুড়ের সন্দেশ চা খাওয়ালেন। এখন একেবারে যেন তপস্বিনী হয়ে গেছেন।

উৎসাহবশে অজয় বলেই চলেছিল। মনোরমা বিচিত্র দৃষ্টিতে ছেলের দিকে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। শুধু চোখদুটি বিস্ফারিত এবং প্রখর হয়ে উঠছিল—যেন কেউ তাঁর মনের ভিতর থেকে চোখের প্রদীপদুটির শিখাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়ে চলছিল।

অজয় একসময় মায়ের চোখের সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, থমকে গেল, চমকে গেল। একটু থেমে প্রশ্নের সুরে বললে—মা?

মনোরমা দৃঢ়কণ্ঠে ধীর উচ্চারণে প্রশ্ন করলেন—সেখানে তোর কি দরকার ছিল? অভিনেত্রী হরিপ্রিয়ার বাড়ি কি জন্যে গিয়েছিলি?

প্রশ্ন—প্রশ্ন করার সুর—তাঁর কঠিন মুখ দেখে অজয়ের বিস্ময় এবং তার সঙ্গে ভয় দুইয়েরই সীমা রইল না। উত্তরে সে প্রশ্ন করলে—কেন মা? এ কথা বলছ কেন?

মনোরমা দৃঢ়স্বরেই বললেন—হরিপ্রিয়া যত বড় অভিনেত্রী হোন তিনি কি ছিলেন তুমি নিশ্চয় জান। বয়স তোমার যথেষ্ট হয়েছে!

চমকে উঠল অজয়। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। তাহ'লে তাঁর ওই মেয়েটি? —সেও—?

মা বললেন - অজয়!

অজয় নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—তিনি তো একজন মস্ত বড় শিল্পী মা। তাঁর সম্বন্ধে এসব—

বাধা দিয়ে মনোরমা বললেন—তোমাদের নতুন কালের শিক্ষা আমি জানি না বুঝি না। তিনি শিল্পী—তাঁর শিল্প অভিনয় দেখে কেঁদেছি হেসেছি—অনেক শিখেছি। দূর থেকে নমস্কার করেছি। কিন্তু তাঁর ঘরে—। চুপ করে গেলেন তিনি। সেই দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। অজয় সে দৃষ্টির সম্মুখে শুধু স্থির হয়ে বসেই রইল। কোন প্রতিবাদ করলে না—কিন্তু ঠিক যেন সমর্থনও খুঁজে পেলে না। নমিতাকে সে দেখেছে, ধ্বজাবাহিনীরূপে দেখেছে—আজ আপিসে দেখেছে। হরিপ্রিয়া দেবীকে দেখেছে। তাঁর পূর্বের ছবি দেখেছে। আজকের তাঁকে জীবন্ত স্বরূপে দেখেছে। তপস্বিনী বেশ। থান কাপড় পরা—মাথার চুল ছাঁটা—তাঁর ঘরের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের ছবিতে পূজার পরিচ্ছন্নতা পারিপাট্য দেখেছে, তাঁর নিষ্ঠা দেখেছে। কি করে, কি করে তাঁর সম্পর্কে মা যা ভাবছেন

তাই ভাববে ?

ছেলের মুখ দেখে মা বিস্মিত হলেন। ছেলের ভুরুদুটি যেন সংশয়ে অথবা প্রতিবাদে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে! কিন্তু তিনিও ক্ষান্ত হতে পারলেন না। বললেন—ও'র বাড়িতে যাবারই বা কি প্রয়োজন হল তোর ? আমি তো বুঝতে পারছি না।

অজয় বললে—ও'র একটিই মেয়ে—কলেজের ছাত্রী—সে আমাদের পার্টির মেম্বার হতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান হওয়ার পর তাকে পেঁাছে দেওয়ার জন্যে আমাকে ভার দিয়েছিলেন। আমরা কেউই জানতাম না ওর এই পরিচয়। মানে তার মায়ের নামের তো কথা আসে না, সুতরাং আসেও নি। আমি তাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে আসতেই ও'কে মানে হরিপ্রিয়া দেবীকে দেখলাম। পরিচয় পেলাম। উনি খেতে বললেন। অন্য বাড়ি হলে খেতাম না। হয়তো আরও অনেক আগেই চলে আসতাম। কিন্তু এমন অদ্ভুত আর ভাল লাগল তাঁর কথাবার্তা যে থেকেও গেলাম আর খেয়েও এলাম। না-খেলে উনি আঘাত পেতেন।

মনোরমা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন - এটা তোমার মনে হল না অজয় যে খেয়ে গেলে তোমার মা আঘাত পাবেন ?

অজয় নিষ্পলক দৃষ্টিতে মায়ের চোখে চোখ রেখে বললে—না। তা মনে হয় নি।

—হয় নি! কেন হল না অজয় ?

অজয় ধীর কণ্ঠে বললে—কারণ এতে দুঃখ পাওয়া উচিত নয় কারও। সে দুঃখ পাওয়া অন্যায়—আজকের বিচারে অধর্মও বটে।

—তোর বিচারে ?

—হ্যাঁ, আমার বিচারেও বটে।

স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত বসে রইলেন মনোরমা।

কিছুক্ষণ বসে থেকে অজয় বললে—তুমি শোও মা। আমার শরীরও ক্লান্ত—ঘুম পাচ্ছে।

মনোরমা কোন কথা বললেন না। অজয় উঠে চলে গেল।

কিছুদিন পর। ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে। ফাল্গুনের ৭ তারিখ। দেশের বাড়িতে অজয় সকালবেলাতেই রেডিয়ো খুলে প্রাতঃকালের খবর শুনছিল।

ওরা কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেছে। মনোরমা সেই ২৪শে জানুয়ারীর রাত্রে ছেলের সঙ্গে কয়েকটি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করার পরই স্তব্ধ হয়ে যেন নিজের ভিতরে ঢুকে বসেছিলেন। কয়েকটা বালিশ উঁচু করে পিঠের দিকে দিয়ে তাতেই ঠেস দিয়ে সামনের দেওয়ালের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসেই ছিলেন।

অজয় এতক্ষণ বিখ্যাত অভিনেত্রী হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়িতে ছিল, তাঁর মেয়ে—সে নাকি কলেজে পড়ে এবং সেও নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ভক্তিমতী—সেও নাকি বিপ্লবপন্থিনী, সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ট্যাক্সিতে তুলে হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়িতে পেঁাছে দিতে এসে তাদের বাড়ির আচার আচরণ রুচি কথাবার্তায় একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেছে।

তা হলে এরপর ?

সামনের দেওয়ালটার যেখানটায় তিনি তাকিয়ে ছিলেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, সেখানটায় কোন বিচিত্র অলৌকিক রহস্যে কোন বিশেষ আলোকিত মণ্ডল ফুটে উঠে তার মধ্যে ভবিষ্যৎ কালের ভবিতব্য দৃশ্যাবলী ফুটে ওঠে নি—বরং সমস্ত ভবিষ্যৎটাকেই ওই দেওয়ালটা যেন রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। কি হবে এর পরিণতি কিছু অনুমান করতে পারছিলেন না। তবে তাঁর সারা অন্তরটা একটা আশংকায় তার সঙ্গে অজয়ের উপর অভিমানে ক্ষোভে প্রচণ্ড হয়ে

উঠেছিল। সে প্রচণ্ডতাকেও রোধ করে যেন দাঁড়িয়েছিল সামনের ওই দেওয়ালটা। শক্ত অনড়!

বিক্ষুব্ধ শঙ্কিত অন্তরের নানা এলোমেলো চিন্তার ভিতর মধ্যে মধ্যে শুধু তিনি না—না না-এর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিলেন বিহ্বলের মত। অর্থাৎ না—না। এ হতে পারে না। এ হতে দেব না।

অজয় বললে—তিনি অন্যায়ভাবে মানুষকে ঘৃণা করেন না—না—তা তিনি করেন না। কখনও করেন না। কখনও না। মনে পড়ছে চট্টগ্রামে তাঁদের পাট ছিল ওকালতির পাট। শ্বশুর বলতেন—মক্কেল লক্ষ্মী। ওদের জাতবিচার নেই। অবস্থা-বিচারও থাকা উচিত নয় কিন্তু যে দেশ কাল তাতে অবস্থা বিচার না করে উপায় নেই। বড়লোক মক্কেলকে আদর যত্ন খাতির বেশী করতে হয়। তা করো। কিন্তু দেখো যেন কারুর অখাতির না হয়। হিন্দুর ঘর তাঁদের—শ্বশুর ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি মুসলমান মক্কেলের এঁটো কাপ নিজে হাতে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শুধু এইটুকু হলে বলতে হবে বামুন তিনি নামেই ছিলেন আসলে ছিলেন উকিল; তিনি বাড়িতে গরীব দুঃখী অমক্কেল অতিথি বন্ধু মুসলমানের সঙ্গেও এক ব্যবহার করেছেন। একবার একটা বেহারী চাকর এসেছিল, সে শ্বশুরের অতিথি এক মুসলমানের এঁটো বাসন ছুঁতে আপত্তি করেছিল—শ্বশুর তাকে কিছু বলেন নি কিন্তু নিজে হাতে তার বাসন ধুয়েছিলেন, খাবার জায়গা পরিষ্কার করেছিলেন। শ্বশুরের পর স্বামী। তিনি উদার, এ-যুগের মানুষ ছিলেন। বাড়িতে কতদিন এক ঘরে একসঙ্গে মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে খেয়েছেন। মনোরমাও খেয়েছেন। নবগ্রামে ফিরে এসে মনোরমা মা কালীর বাড়িতে দুজন চারজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অতিথির মতই সম্মানের সঙ্গে খাইয়েছেন। কোন দিন জাতবিচার করেন নি। নিজে হাতে পরিবেশন করেছেন। এখানেও কতদিন কত ব্রাত্য এসেছে খেয়েছে—তাদের কেউ কেউ খেয়েদেয়ে উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জনা না করেই চলে গেছে। সে স্থান মার্জনা করেছেন মনোরমা নিজে, কোনদিন বাড়ির চাকরদের বলেন নি।

তবে হ্যাঁ—তিনি এর প্রমাণ দিতে ব্রাত্যদের মদের আসরে গিয়ে বসতে পারবেন না। হরিপ্রিয়া দেবী শিল্পী—তিনি তাঁকে সম্মান করেন কিন্তু তাঁর জীবনের যে অংশটুকু দেহব্যবসায়ের বা বাধাবন্ধহীন বিচারহীন ব্যভিচারে কলুষিত তাকে শ্রদ্ধা তিনি করতে পারবেন না। ওই অংশটুকুর ছোঁয়াচকে তাঁর ভয় আছে। সেই ছোঁয়াচের ভয়েই তিনি অজয়কে কঠিন স্বরে তিরস্কার করেছেন। অজয় উদ্ধত হয় নি কিন্তু সমান কঠিন, না, কঠিন নয় সমান দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছে—ওই ধরনের মানুষকে ছোট অচ্ছুত ভাবার কাল চলে গেছে। ঠিক কি বলেছে কথাগুলি এরই মধ্যে মনোরমার ভুল হয়ে গেছে। এই ধরনের কথা যার অর্থ তিনি অতীত তিনি বিগত হয়েছেন তাঁর পুরনো অচল বিশ্বাসের জন্য মতের জন্য।

তা হবে!

পরক্ষণেই ঘাড় নেড়েছিলেন—না—না—তা নয়। ত নয়।

* * * *

এইভাবেই তিনি বিছানার উপর নিষ্পলক চোখে সামনের দেওয়ালের একটি স্থানের দিকে তাকিয়েই দীর্ঘক্ষণ বসেছিলেন। তাঁর ঝি কয়েকবারই এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে এক-আধবার কাজের অছিলায় একটু-আধটু শব্দ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে ফিরে গিয়েছিল। ডাকতে সাহস করে নি। একবার সে সাহস করে খাটের বিছানাটাই হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করে—চাদরখানা টেনে টেনে গদি-তোশকের তলায় গুঁজে তাঁকে নাড়া দিয়ে ডাকতে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তাতেও ফল হয় নি। মনোরমা দৃষ্টি ফেরান নি। শুধু বাঁ হাতখানা তুলে বাধা দিয়েই জানিয়েছিলেন—থাক। হাত তোলার অর্থ বুঝতে ঝি ভুল

করে নি—সে অনেকদিন এই মিষ্টভাষিণী অনুতপ্ত প্রকৃতির মনিবের কাছে আছে—তাঁর মিষ্ট প্রকৃতি এবং ভাষার সঙ্গে তার যেমন নিবিড় পরিচয় ঠিক তেমনি পরিচয়ে সে তাঁর আর একটি কঠিন দিকের কথাও জানে। সেটি হল তাঁর আঘাত পেয়ে বরফের মত জমে যাওয়ার মত হয়ে যাওয়া। তাঁকে তখন নাড়তে গেলে এমন তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে যে সে আগুনের স্পর্শে ফোস্কা হয়ে যাওয়ার থেকেও কঠিন। আগুনের স্পর্শে পুড়ে যাওয়ার জ্বালা আছে—আর এতে যেন সাড় হারিয়ে অসাড় হয়ে যায় মরা মানুষের দেহের মত।

সে চলে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল—দাদাবাবুকে ডেকে বলবে? নায়েববাবুকে খবরটা দেবে? ভরসা কিন্তু কোনটাতেই হল না। যিনিই আসুন তিনি আসবামাত্র তাঁকেও এইভাবেই ফিরে যেতে বলবেন—এবং তিনি যখন ফিরে যাবেন তখন মৃদুস্বরে বলবেন—বাসিনীকে ডেকে দেবেন। সে এসে সামনে দাঁড়াতে পারবে না। ঠিক এই সময়টিতেই ঢং ঢং শব্দে ক্লক ঘড়িটায় বারোটা বাজল। বাজা শেষ হতেই ঘর থেকে ডাক এল—বাসিনী! বাসিনী!

তারপরই দরজাটা খুলে গেল, ওপাশে তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালেন মনোরমা। মনোরমা বাসিনীকে তিরস্কার করলেন না, বললেন—ম্যানেজারবাবুকে ডাক তো। ঘুমিয়ে হয়তো গিয়ে থাকবেন, তবু ডাকতে হবে। হ্যাঁ—ডাকতে হবে!

বাসিনী একটা কিছু করবার হুকুম পেয়ে বাঁচল। সে নীচে নেমে গেল দ্রুতপদে। নায়েব শুয়েছিলেন, ঘুমোন নি। অনেকক্ষণ রাত্রি পর্যন্ত অজয়ের জন্য উৎকণ্ঠায় রাস্তা আর ঘর করে হিসেবনিকেশের কাজ হয় নি। নবগ্রাম থেকে পৌষ মাসের জমাখরচ এসেছে, কাগজপত্র এসেছে। পৌষ মাস সহজ মাস নয় বাংলাদেশে। ধানপান আদায়পত্র সব এই সময়। ধানপান অবশ্য এখন ক্ষেত থেকে খামারে উঠছে পালুইবন্দী হচ্ছে, ঝাড়াই-মাড়াই মাঘ মাসে কিন্তু আদায়পত্রের সময় এইটে। ১৫ই জানুয়ারী পৌষ মাস শেষ হয়েছে, ২১শে জানুয়ারী আজ—আজ সকালেই কাগজপত্র এসেছে। দিনে কিছুটা দেখেছিলেন—বাকীটা সন্ধ্যার পর দেখব বলে রেখেছিলেন, কিন্তু অজয়ের ফিরতে দেরি হওয়ার জন্য সে পড়েই ছিল। অজয় এসে পেঁছুবার পরই খেয়ে নিয়ে কাগজ দেখছিলেন। কাগজ রেখে সদ্য শুয়েছেন অমনি বাসিনী ডাকলে—ম্যানেজারবাবু।

বৃদ্ধ নায়েব এখন হালআমলে ম্যানেজার খেতাব পেয়েছেন—তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন এক মুহূর্তে—কে—? বাসিনী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি রে? এত রাত্রে?

—গিন্নীমা ডাকছেন—

—কেন? কি হল? বৃদ্ধ শীতের দিনে লেপখানা সরিয়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্ত হয়েই উঠে পড়লেন। মনের গভীরের ক্লান্তি অসন্তোষ সে চাপা থাকে না। নিজের কপালকে দোষ দিয়ে বললেন—কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছি, জানি নে বাবা! বাপরে বাপরে বাপরে! একটা দিনেই কি যত নিগ্রহ জমা হয়ে থাকে কপালের চক্রান্তে!—দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন—কি রে? কি হল?

—গিন্নীমা ডাকছেন, বললাম তো!

ক্রুদ্ধস্বরে নায়েব বললেন—সে আমি শুনেছি। কানে কালা এখনও হই নি। কিন্তু কেন? এত রাত্রে ডাকছেন—কি হল?

—দাদাবাবুর সঙ্গে কথান্তর ক'রে—

—সেও বসে বসে শুনেছি নীচে থেকে।

—হ্যাঁ—সেই—

—আরে সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—সেও কিছু শুনেছি। কানে এসেছে। তারপর এতক্ষণ পর আবার কি হল? বলি মায়ের শরীর ভাল আছে তো?

—তা আমি জানি না।

—জানিস নে? তুই ঘরে শুস। ঘরে ছিলি—

—হ্যাঁ ছিলাম। তবু জানি না মশায়। বড় ঘরের বড় কাণ্ড তার উপর মশায় এই ঠাকরুনটিকে ঠিক বুঝতে পারি না। যখন দুঃখু-দুঃখু ক'রে বসে থাকেন তখন মশাই ও'কে জিজ্ঞাসা করতে কিছু পারি না। মনে হয় মানুষটা সমুদ্দুরে ডুবে তলিয়ে গিয়েছে। সেই ছেলে রাগ ক'রে নিজের ঘর চলে গেল না খেয়ে, মা বিছানায় উঠে বসে লেপখানা কোল পর্যন্ত টেনে বালিশে ঠেস দিয়ে একদিষ্টে তাকিয়ে রইল তো রইলই। না রাম না রহিম, না নড়া না চড়া—মরা না জেবন্ত তা পর্যন্ত ভুল হয়ে যায় মশায়। শেষ ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম —হয় আপনাকে ডাকব নয় ছেলেকে ডাকব—তখন ঘরের দরজা খুলে ডেকে বললেন— নায়েববাবুকে ডাক। হয়তো শুয়ে থাকবেন, তা থাকুন—তুই ডাক তাঁকে।

—তা হলে অসুখ কিছু নয়, কি বলিস?

—তাই তো লাগে মশায়। কিন্তু মানুষটি তো একরকমের। ছিষ্টিছাড়া। হাজার যন্ত্রণা হলেও বলবে না। ডাকবে না। তবে অসুখ-টসুখ মনে হয় না মশায়।

—হুঁ। চল দেখি! তোর মত বে-আক্কিলে বোকাও দেখি নি। এই কথাটা ভেবে তো আগেই বলতে পারতিস—অসুখ নয়। চল্।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। নায়েব দেখলেন মনোরমা একলা নয় অজয়ও এসেছে এর মধ্যে।

অজয়ও নিজের ঘরে ঘুমোয় নি। সেও উত্তেজিত মস্তিষ্কে জেগেই ছিল। এই শীতের দিনেও রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে তার পাশেই একখানা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসেছিল। এই কথাই ভাবছিল।

সে কিছুতেই তার মায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছে না পারবে না। হরিপ্রিয়া দেবী এত বড় একজন অভিনেত্রী—বিখ্যাত শিল্পী, তাঁর কথায়বার্তায় আচারে আচরণে রুচিতে সেই শিল্পী-জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় দেখে এসেছে, তাঁর পূজার জায়গায় তিনি তাকে বসিয়েছিলেন —নিজের চোখে সে দেখেছে পূজার সজ্জার—পূজা-নিবেদন সাজিয়ে দেবার কি সুন্দর ভঙ্গি। নিষ্ঠা এবং রুচির সমন্বয়ে পূজা যেন সত্য হয়ে উঠে দেবতাকে মূর্ত ক'রে তুলেছে। তাঁর সম্বন্ধে অপবিত্রতার—তাঁর জীবনে অশুদ্ধতার অভিযোগ—এ কি করে সে স্বীকার করবে! সে তাঁকে প্রণাম করেছিল—তিনি শিউরে উঠে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—করলে কি বাবা —করলে কি? তাঁর কণ্ঠের স্বর যেন আর্তনাদ বলে মনে হয়েছিল।

তারপর তাঁর মেয়ে। ওই কি কোন দেহব্যবসায়িনীর মেয়ে? কাল নেতাজী জন্মদিবসে তার ধ্বজাধারিণী মূর্তি দেখেছে। আজ তাকে আপিসে যে মর্যাদাময়ী মূর্তিতে দেখেছে তা ভেবে তার প্রতি আর শ্রদ্ধার সীমা নেই! না খেয়ে এতটা পথ পয়সা ফেলে গিয়ে সে হেঁটে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে তবু বলে নি আমার খাওয়া হয় নি—আমি ক্ষুধার্ত! তবু বলে নি আমি টাকাপয়সার পার্স ফেলে এসেছি। বাড়ি এসে উপরে উঠে গিয়েই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে ট্যাক্সিওলাকে। বেচারী বিছানায় পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটির রূপ হয়তো ছিল, হয়তো নয়, সত্যই ছিল। তার নাক মুখ চোখ কপালের গড়ন থেকে বোঝা যায়। রঙও ফরসা ছিল, গৌরবর্ণই ছিল। কিন্তু বসন্তের দাগে মুখখানা শ্রী-সৌন্দর্য সব হারিয়ে বসে আছে। হয়তো মা বলতে পারেন—মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো শুধু এই জন্যে। রূপের

বাজারে ব্যবসা তো রূপ হারিয়ে জমবে না, তাই লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়ের সে অভাব পূরণ করছেন। তাই যদি হয় তবে তাতেই বা কি? এই বিদ্যার পুণ্যেই তো তার জন্মের কলুষ—তাদের ঘরের কলুষ—তার জীবনকে জড়িয়ে যত কলুষ সব ধুয়ে মুছে দেবে। মা হয়তো বলবে—ওরে তা ছাড়াও কলুষ আছে—সে আছে ওর শিরায় শিরায়—রক্তের ধারায়। সে বিদ্যার পুণ্যেও যায় না।

বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল তার চিত্ত। বার বার সে বাইরের শহরের কুয়াসাচ্ছন্ন আলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনেই বলছিল—যায়! যায়! যায়!

তাছাড়া এ মেয়ে অসাধারণ মেয়ে। তার হাসিতে তার কথায়, তার চাউনিতে সে একবিন্দু কলুষের সন্ধান পায় নি। মুগ্ধ হয়েছে—শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে। তার মধ্যে কলুষ থাকলে সে নেতাজীর মতাবলম্বিনী হ'ত না। নেতাজীর নিজের জীবনে এবং তাঁর দলের মধ্যে সব থেকে বড় সম্পদ—চরিত্র। কলুষের সেখানে স্থান নেই। নেই! নেই!

ঠিক এই সময়েই সে মায়ের গলার সাড়া শুনতে পেয়েছিল। তার ঘর এবং মায়ের ঘর পাশাপাশি। সে শুনতে পেয়েছিল মা ডাকছেন—বাসিনী! বাসিনী! বাসিনী!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল সে। কি হল? মা ডাকছেন এত রাত্রে? চেয়ার থেকে উঠে এসে নিজের ঘর থেকে দুই ঘরের মাঝের দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেয়েছিল তিনি বাসিনীকে ম্যানেজারকে ডাকতে বলছেন। ঘরে ঢুকে সে মায়ের কাছে যখন এসেছিল তখন বাসিনী নীচে নামছে, মনোরমা ঘরের ভিতরের দিকে ফিরছেন। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল মা?

মা উত্তর দেন নি—ফিরে এসে একখানা চেয়ারে বসেছিলেন।

—মা?

মা বলেছিলেন—তুমি শোও গে অজয়, রাত্রি বারোটা বেজে গেছে।

—কিন্তু কি হয়েছে? তুমি শোও নি?

—কিছু হয় নি।

—নায়েবকে ডাকতে বললে বাসিনীকে? এত রাত্রে?

—প্রয়োজন আছে আমার।

—সেটা কি? তাই তো জিজ্ঞাসা করছি! কি হল? শরীর—

—শরীর আমার ভাল আছে। আমি তাঁকে অন্য প্রয়োজনে ডেকেছি।

—অন্য প্রয়োজনে—

—হ্যাঁ। বৈষয়িক প্রয়োজন। যাও তুমি শোও গে! কাল দিনরাত্রি—আজ গোটা দিন—সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বিশ্রাম কর নি। যাও শোও গে!

অজয় কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তারপর বললে—না। না শুনে আমি যাব না!

—বেশ দাঁড়াও। উনি আসুন।

এরপর প্রায় মিনিট দুয়েক মাতা-পুত্র দুজনেই নির্বাক হয়ে দু'দিকে তাকিয়ে রইল। এর মধ্যেই সিঁড়ির মুখে গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে নায়েব এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

মনোরমা বললেন—আসুন।

ম্যানেজার ঘরে ঢুকে কোন প্রশ্ন না করেই দাঁড়ালেন। শংকার কারণ কিছু নেই, অন্তত গিন্নীমার শরীর সম্পর্কে—সে কথা তিনি ঘরের দরজা থেকেই বুঝেছেন। মনোরমা বললেন—আপনাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙালাম। কি করব? থামলেন তিনি—ম্যানেজার তবুও কিছু বললেন না। মনোরমা বললেন—ভেবেছিলাম সকালে উঠেই ডেকে বলব। কিন্তু

তাতে স্বস্তি পেলাম না। না ব'লে হয়তো সারারাত্রি ঘুমই আসবে না আমার। আপনি তো শুধু কর্মচারী নন। অভিভাবক বলতেও আপনি আর বর্ধমানের মহেন্দ্রবাবু উকিল।

আবার থামলেন। কথাটা যেন বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

ম্যানেজার এবার বললেন—বলুন।

মনোরমা বললেন—কালকেই আমি এখান থেকে নবগ্রামে যাব। তার ব্যবস্থা সকাল থেকে উঠেই করুন।

ম্যানেজার বললেন—হঠাৎ যাবেন—

—হ্যাঁ। তাই বটে। হঠাৎ যাওয়াই বটে। কিন্তু যেতেই হবে।

—কি দরকার—

—দরকার ঠিক আপনি বুঝবেন না—আমিও বোঝাতে পারব না। যেতেই হবে আমাকে।

—বেশ তো। কাল খেয়েদেয়ে চলুন। বিকেলে সন্ধ্যের দিকে বর্ধমানে পেঁছুব। মহেন্দ্রবাবুর ওখানে পরামর্শ সেরে—রাত্রিটা ওঁর বাড়িতে হোক বা আমাদের নিজের বাড়িতে হোক থেকে পরশু নবগ্রামে যেতে চান যাবেন—বা ওখানে খবর দিয়ে কর্মচারীদের ডাকিয়ে কথাবার্তা সেরে আবার বিকেলের দিকে রওনা হয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ ফিরব এখানে।

কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে মনোরমা বলে উঠলেন—আমি আর কলকাতা ফিরব না ম্যানেজারবাবু। তাহলে এই যাওয়ার ব্যাপারটা এত বড় করে দেখতাম না—ধরতাম না, তার ব্যবস্থা করতে হবে বলে এই রাত্রেই আপনাকে ডেকে তুলতাম না। কলকাতায় আমি আর ফিরব না। আমার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিয়ে যেতে হবে।

—আর ফিরবেন না ?

—না।

—সে কি ? চিকিৎসা চলছে—

—আমার জীবনের দামের চেয়েও আমার শ্বশুরবংশের মানমর্যাদা ধর্মের দাম অনেক বেশি। সেইটুকু মাথায় করে নিয়ে আমি চলে যাব এ আমি স্থির করে ফেলেছি। নবগ্রামেও আমি থাকব না। নবগ্রামে গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থা ক'রে দায়দায়িত্ব মিটিয়ে আমি অন্যত্র কোন তীর্থস্থানে চলে যাব। কাশী কিংবা হরিদ্বার যেখানে হোক।

অজয় কোন কথা না বলে নিঃশব্দ নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মনোরমা তার চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ম্যানেজার তাঁর নীরবতার সুযোগ পেয়ে বললেন—হঠাৎ এই ধরনের কিছু করা কি ঠিক হবে মা ? কি হয়েছে তা আমি জানি না।

মনোরমা যেন অকস্মাৎ জেগে-ওঠা মানুষের মত সচেতন হয়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—না—না—না—নায়েববাবু, কাল, কালই আমাকে যেতে হবে। কালই। হয়তো আপনাদের কষ্ট হবে। তা হোক। এই কষ্টটুকু আপনাদের আমার জন্যে করতেই হবে। আমার মিনতি।

—বেশ। তাই হবে।

ম্যানেজার চলে গেলেন।

মনোরমা বাথরুমে গিয়ে সেই শীতের দিনেও মুখ চোখ কানে জল দিয়ে ধুয়ে মাথায় তালুতেও জল দিয়ে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বাসিনীকে বললেন—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড় বাসিনী। কাল সকালেই উঠতে হবে।

* * * *

সকালে উঠেই মনোরমা ছেলের ঘরের দরজায় শব্দ করে ডাকলেন—অজয়! অজয়!

অজয়ও উঠেছিল। উঠেছিল কেন সমস্ত রাত্রি সে ঘুমোয় নি, শুধু মনের মধ্যে সংগ্রামই করেছে। সংগ্রামের একটা অবস্থা আছে—যে অবস্থায় কার্যকারণ এমন কি নিজের সচেতন অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে শুধু দুটো যুধ্যবান শক্তি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধই করে যায়; দুটো বিপরীতধর্মী রাসায়নিক বস্তুর মত; তারা ফুলে ফেঁপে রঙ বদলে স্বাদ বদলে, নিঃশেষিতশক্তি হয়ে দুটোয় মিশে আর একটা রসায়ন বা নতুন স্বাদে আর একটা শক্তিতে পরিণত হয়—ঠিক তেমনি সংগ্রাম চলেছে মনে। কিছুক্ষণের মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের বিচারের দ্বন্দ্ব সত্য-মিথ্যা বিচারের দ্বন্দ্ব সব লুপ্ত হয়ে মায়ের জেদ আর তার নিজের জেদে লড়াই চলেছে।

কখনও মনে হয়েছে—ভাল—তুমি দেশে গিয়ে বিষয়ের ব্যবস্থা ক'রে কাশী হরিদ্বার যাবে? কাল রওনা হবে? বেশ তার আগেই আজই এই রাত্রেই সে চলে যাচ্ছে। খানদুয়েক রাগ কয়েকটা কাপড়জামা একটা ব্যাগে পুরে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সে দুখানা রাগও পাট করেছিল। ছোট স্যুটকেসটাও খুলেছিল। নিজের মনিব্যাগটাও দেখেছিল। পঁয়ত্রিশ টাকা কয়েক আনা আছে। হাতে সোনার চেন তাগা আছে। জামায় সোনার বোতাম আছে। ঘড়িটা আছে। ঠিক আছে—এতেই হবে!

কিন্তু কিছুক্ষণ তার হাত আর নড়ে নি। ভাবছিল কোথায় যাবে? কি করবে? সামান্য মানুষের মত জীবন আরম্ভ করবে—তার পিতামহের মত? তারপর নিজেকে গড়ে তুলে একদিন ফিরবে!

না। মনে ঠিক ভালো লাগে নি। এই মহালগ্ন, ভারতবর্ষের মুক্তির মহালগ্ন—এই লগ্নে সে নিজেকে গড়বে কি ক'রে? তার জীবনের এই দীক্ষা—এ যে নিয়তি অদৃষ্ট বা বিধাতা নিজে সুকৌশলে ঘটনাচক্রের আবর্তের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছেন। এ দীক্ষা যে বিচিত্র পন্থায় জন্মজন্মান্তরের কর্মফলের মত তার জীবনে এসেছে। তাকে কি করে সে বিস্মৃত হবে?

তা ছাড়া এ যে তার পালিয়ে যাওয়া হবে।

তার চেয়ে কাল সকালে উঠেই সে মাকে বলবে যে, বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ঘরবাড়ির সঙ্গে সকল সংস্রব সব ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে। সে যাবে পার্টি অফিসে। সেখানে গিয়ে বলবে—সর্বক্ষণের জন্য সে নেতাজীর আদর্শকে রূপায়িত করতে নিজেকে উৎসর্গ করছে। একটু আশ্রয় অর্থাৎ পার্টি অফিসে সে থাকবার সুবিধাটুকু শুধু চায়। নিজের জীবিকার খরচ সে নিজেই উপার্জন করে নেবে। প্রাইভেট টিউশনি করবে অথবা যে কোন কাজ, দরকার হলে কুলিগিরি করেও তা সে উপার্জন করে নেবে। কাজ দেওয়া হোক তাকে। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে প্রচার ক'রে বেড়াবে নেতাজীর আদর্শ। সেই ভাল। একলা চল রে!

মনে মনে খুব খুশী হয়ে সে অতি মৃদুস্বরে গান গাইতে শুরু করেছিল—

তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে একলা চল রে।
একলা চল—একলা চল—একলা চল রে।

হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল একলা হয়তো যেতে হবে না তাকে। অন্তত একজনও সঙ্গী তার মিলবে। অন্ততঃ সে অন্ধকার রাত্রে ডাকতে ডাকতে বের হলে সব দরজা যখন বন্ধ হবে তখন একটি গৃহের দরজা খুলে যাবে এবং একজন ছায়ামূর্তির মত তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবে—আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। চল!

অন্ধকারে মুখ তার দেখা না গেলেও সে মুখ তার দেখা, সে কণ্ঠস্বর তার চেনা।

মুখে তার বসন্তের দাগ। নেতাজী জন্মজয়ন্তী দিনের শোভাযাত্রার সেই ধ্বজাধারিণী মেয়েটি! হ্যাঁ, তাকে সে নিশ্চয় সঙ্গে পাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে লজ্জিত হয়েছিল।

পরমুহূর্তেই সে লজ্জাকে দূর করে দিতে চেয়েছিল—কেন ? কিসের লজ্জা ?

আবার মনে হয়েছিল—মায়ের উপর সে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে। এ তার অপরাধ !

তারপর বিচিত্রভাবে মা আর ওই মেয়েটির দুটি মুখের প্রতি তার আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা। দুটি বিরুদ্ধধর্মী রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণের মত সে এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে তার নিজের সব যুক্তিতর্ক ন্যায়-অন্যায় সব হারিয়ে গিয়েছিল।

শুধু ক্ষোভে অভিমানে প্রেমে শ্রদ্ধায় সংঘর্ষ ; সে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিল। বার বার মনে মনে মাকে বলেছিল—মা হয়ে—আমার মা হয়ে তুমি—মানুষের উপর অবিচার তুচ্ছ কথা—আমার উপরেই এত বড় অবিচারটা করলে ?

এরই মধ্যে কখন কেটে গেছে শীতের দীর্ঘ রাত্রি। ভোরবেলা একটু ঘুম এসেছিল কিন্তু ও ঘরে তার মায়ের উঠে নড়াচড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলে দরজায় শব্দ ক'রে মা ডাকছেন—অজয় ! অজয় !

গম্ভীর অস্বাভাবিক রূপে ধীর সে কণ্ঠস্বর।

দরজা খুলে সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। নিজেকে সংযত ক'রে মায়ের মতই ধীর কণ্ঠে বললে—বল।

—এ ঘরে এস। কয়েকটা কথা বলব।

এ ঘরে এসে মা বলেছিলেন—আমি চলে যাচ্ছি—কাল তো শুনেছ। কারণ তোমাকে বলতে হবে না। কাল এক কথাতেই বুঝে নিয়েছি তোমার নতুন মতে আর আমার বাবা শ্বশুর স্বামীর কাছে শিক্ষায় যে মত গড়েছি তার সঙ্গে মিলবে না। তুমি নতুন—তুমি এ বংশের উত্তরাধিকারী মালিক—সুতরাং আজ হোক কাল হোক তোমার মতটাই বড় হবে। আমি তা মেনে নিতে পারব না। সেই জন্যে আমি কাশী বা হরিদ্বার বা কোন তীর্থস্থলে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটাব।

মা থামলেন। সম্ভবত ছেলে কি বলে শুনতে চাইলেন। অজয় কিন্তু কোন বাদপ্রতিবাদ করলে না। শুধু বললে—হ্যাঁ, সে তো কাল শুনেছি।

—তোমার কিছু বলবার আছে ?

—কি বলব ?

—ভাল। তুমি তো এখন এখানেই থাকছ। তোমার লোকজন কি দরকার হবে—টাকাকড়ি—

বাধা দিয়ে অজয় বললে—কিছু দরকার হবে না !

—কেন ?

বোধ করি রাসায়নিক ক্রিয়া শেষ হয়ে দ্বন্দ্বের শেষে নতুন রসায়নের মতই নতুন একটি মন বা মানসিকতায় অজয় উপনীত হয়েছে। সে বললে—আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাব।

—আমার সঙ্গেই ফিরে যাবে ?

—হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে অজয় নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে অনুভব করেছিল তার মনটা যেন হালকা স্বচ্ছন্দ সহজ হয়ে গেছে। অনন্ত তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। মনে হয়েছিল সে একটা বিরাট যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। তারপর বিছানায় সে আবার শুয়ে পড়েছিল। এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

* * * *

সেই অবধি অজয় এসেছে নবগ্রামে। এই ঘটনার পর অবশ্য তারা সেইদিনই ফেরে নি। দু'দিন পর ওখান থেকে দেওঘর গিয়ে দিন বিশেক কাটিয়ে এখানে ফিরে এসেছে।

মনোরমা ছেলের দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে দেখছেন।

একটা সংগ্রাম অনুভব করছেন। কিন্তু তিনিও হারবেন না।

অজয় শুধু মায়ের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে। আর কিছু না। ঘরে থাকে—খায় দায় ঘুমোয়। পড়ে। আর ব্যাটারি সেট রেডিয়ো খুলে গান শোনে খবর শোনে। বর্ধমান স্টেশনে নেমে এখানে কাগজ আসতে বিকেল চারটে বেজে যায়, রেডিয়োতে খবরটা সে সর্বাগ্রে শোনে।

আজ রেডিয়োটা খুলে সে বসে ছিল। খবর বলবার সময় হয়েছে।

বলছে খবর ঃ—অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো—এখন বাংলায় খবর পড়ছেন সুজন ঘোষ। আজ ইংরিজী ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সাল। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, কাল অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের অভীপ্সা পূরণের উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমুদয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আলাপ আলোচনা করে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ মিশন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

Announcement of special mission of Cabinet ministers to India.

চঞ্চল হয়ে উঠল অজয়!

আবার মিশন! আবার আপোস! আবার প্রতারণার ফাঁদে পা দেওয়া?

নেতাজী আপনি কোথায়? ফিরে আসুন! হে ভগবান!

স্তব্ধ হয়ে মাথা ধরে সে বসে রইল। ভারতবর্ষের বিপ্লবের সম্ভাবনা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হায় ভারতবর্ষ! কতক্ষণ পর তা তার খেয়াল নেই, হঠাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই তাকে বাইরে থেকে ডাকলেন—অজয়! অজয়! কণ্ঠস্বর তাঁর উচ্চ এবং উত্তেজিত।

ক্লান্তভাবেই সে মাথা তুলে তাকালে।

—অজয়!

—কি স্যার?

—একটা খবর দিতে এলাম। আমি এই কলকাতা থেকে পথে পথে আসছি। বাসায় যাই নি এখনও। জবর খবর! শুনে খুশী হবে। এবং এ সবই নেতাজীর কর্মের ফল।

অজয় উদ্‌গ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাস্টার মশাই বললেন—কাল সন্ধ্যেবেলা আমি গিয়েছিলাম চীফ মিনিস্টার সুরাবর্দির বাড়ি। উনি তো আমার দেশের লোক। ছেলেবেলা একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার ভাইপোর চাকরির জন্যে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম গত পরশু মানে এইটিন্থ ফেব্রুয়ারী বম্বেতে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীতে মিউটিনি হয়েছে!

ইংরেজের সামরিক নৌবিভাগে বিদ্রোহ!

দিগন্তে তো মেঘ কাটে নি। আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরই ডাক এল।

একখানা চিঠি তার নামে!

চিঠিটা খুললে অজয়।

"—এসেছে আদেশ,
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।"—রবীন্দ্রনাথ

সাইক্লোস্টাইল করা ছোট্ট একটুকরো কাগজ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোটেশন শুধু। কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু অনুভব করলে অজয়। আশ্চর্য—একটি নির্দেশ হয়ে উঠেছে। নীচে তারিখ রয়েছে। তারিখ ২৪।২।৪৬। ২৪।২ -? আজ তো ২০শে ফেব্রুয়ারী। তা হলে? মাথার মধ্যে অনেক অনুমান পরের পর খেলে গেল অজয়ের। সমস্ত অনুমানের মধ্যে একটি কথা অভিন্ন। ডাক এসেছে। যেতে হবে।

তাহ'লে কি নেতাজী ভারতবর্ষের কোন অজ্ঞাত স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? নইলে বোম্বেতে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীতে বিদ্রোহ হ'ল কি করে?

তার অনুমানকে আশ্রয় ক'রে নানান কল্পনা ক'রে একটি অসাধারণ সম্পূর্ণ চিত্র সে মনের মধ্যে এঁকে ফেললে। সেনা ব্যারাকে ব্যারাকে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করছে—পুলিসবাহিনীতে সংক্রামিত হচ্ছে। গ্রামে শহরে দলে দলে মানুষেরা বেরিয়ে পড়েছে। ধুলোয় ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাচ্ছে।

একটি অতি তরুণ বিপ্লবকামীর কল্পনা তার কামনার এবং আশার রঙে এক ছবি আঁকলে—আকাশে মেঘ—শূন্যমণ্ডলে ঝড়—পৃথিবীর বুক ঘেঁষে ধুলো আর ধোঁয়ার আস্তরণ কিন্তু তার একপ্রান্তে আকাশের কোণ থেকে অন্যপ্রান্তে পৃথিবীর বুক পর্যন্ত তীব্রতম দীপ্তিময় আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখা। সমস্ত অন্ধকারকে ঝলসে দিয়েছে। বিদ্যুৎরেখায় ওই কবিতার দুটি ছত্র যেন লেখা হয়ে রয়েছে।

কি করবে সে?

বাড়িতে মায়ের আঁচল ধ'রে বসে থাকবে? তার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে উঠল।—না। কিন্তু—। পরমুহূর্তেই একটা কিন্তু তার সব ছবিটাকে কালো করে দিল। যেন বিদ্যুৎ-দীপ্তি ঝলসে উঠে নিভে গেল – সমস্ত কিছু ছেয়ে গেল প্রগাঢ় অন্ধকারে। তার রুগ্ণ মা যেন সব রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে তাঁর ছায়া ফেলে সব ঢেকে দিয়েছেন।

অধীর অস্থির চিত্তে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের প্রায় প্রান্তেই তাদের বাড়ি। তারপর একটা লাল কাঁকরের ডাঙ্গা। কিছুটার উপর বড় বড় আমগাছের একটা বাগান। তার বাবার মাতামহ বংশের বহু যত্নে এবং পরিশ্রমে তৈরী হয়েছিল এককালে। তার ওপারের ডাঙ্গাটা বহুবিস্তৃত। সেখানে শুধু বট এবং অশত্থের গাছ। বাগানটা পার হয়ে সে গিয়ে পেঁছিুল সেই বট অশত্থগাছওয়ালা খোলা ডাঙ্গাটায়। আমবাগানে এবার প্রচুর আমের মুকুল এসেছে। কিন্তু মুকুলগুলি ফুটে তা থেকে মধু ঝরে পড়ছে মাটিতে। আমের পাতায় এবং মধুতে এমন চটচটে হয়ে উঠেছে যে তার উপর দিয়ে হাঁটা যায় না। পায়ে চটচটে হয়ে আটকে যায়। অন্যথায় ছায়ানিবিড় এই বাগানটিতে বসে নিশ্চিন্তে ভাবনার একটা সুযোগ পাওয়া যেত।

একটা বটগাছতলায় সে বসল। প্রশ্ন ওই একটি। কি করবে সে? এই রাত্রিতেই বেরিয়ে সে চলে যাবে, বর্ধমানে গিয়ে ট্রেন ধরে ভোর-ভোর কলকাতায় পেঁছিুবে? তারপর গিয়ে হাজির হবে আপিসে? না—ফিরে যাবে বাড়িতে। তার রুগ্ণ বিশীর্ণদেহ ক্লান্তদৃষ্টি পাণ্ডুর মুখ মায়ের হাতখানি ধরে বসে থাকবে চুপ ক'রে। মধ্যে মধ্যে বিপ্লব কোলাহলে মায়ের তন্দ্রা ভঙ্গ হবে—তিনি চমকে জেগে ডাকবেন—অজয়! সে ঝুঁকে পড়ে বলবে—এই যে মা আমি!

কি করবে সে?

সে উঠল গাছতলা থেকে। একান্তভাবে মনের অধীরতার জন্যই উঠল সে। কি করবে সে? হাঁটতে লাগল সে। কিছুদূর গিয়ে একটা তালগাছ—তাকে জড়িয়ে একটা অশত্থগাছ উঠেছে। আষ্টেপৃষ্ঠে শিকড়ের বেষ্টনী দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সেই গাছটায় হাত রেখে সে দাঁড়াল।

শীতের অপরাহ্ণ। শীত কেন—দুদিন হল মাঘ মাস চলে গেছে। ফাল্গুনের প্রথম এখন। তবুও অবশ্য শীত আছে এখনও। বেলাও ছোট। দুপাশের মাঠের ধান কাটা তোলা হয়ে গেছে। সদ্য ধান কাটা মাঠ যেন ঝকঝক করছে। এখনও ধুলো উড়ে এবং ধুলো পড়ে ধূসর হয়ে ওঠেনি। মাঠে লোক নেই। পথখানিও জনশূন্য। পথটা খুব সুগম নয়। বর্ষার সময় দারুণ কাদা হয়। মোটর টোটর কদাচিৎ আসে। এ পথে যাতায়াত করে শুধু গরুর গাড়ি আর পায়ে-হাঁটা মানুষ। না। দু'চারখানা বাইসিক্ল এখন সারাদিনে যাতায়াত করে। ওই একখানা বাইসিক্ল আসছে। কখনও কখনও সাইকেল-রিক্‌শাও আসে শীতকাল থেকে বর্ষার আগে পর্যন্ত শুকনোর সময়। বর্ধমান থেকে আসে। সন্ধ্যার আলো লালচে হয়ে উঠেছে। এখনও সূর্যাস্ত হয় নি। আলো পড়েছে সাইকেল-ওয়ালার মুখে। চিনতে পারলে অজয় তাকে, যে আসছে সে খবরের কাগজওয়ালা। তাদের গ্রামেই কাগজ দিতে আসছে।

কাগজওয়ালা তাকে দেখেই নামল।

—অজয়বাবু! তার প্রশ্নে এবং মুখে বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ। তার কিন্তু কাগজওয়ালার বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। আগ্রহই তার সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—বেরিয়েছে খবরটা ?

—খবর ? ও ক্যাবিনেট মিশন আসবার ? হ্যাঁ, বেরিয়েছে।

—না। বম্বের --

—বম্বের কি খবর ?

—রয়াল—। বলেই সে থেমে গেল। গভর্নমেণ্ট চেপে রেখেছে।

—কিন্তু আপনি কোথা যাবেন ?

—এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

—বেড়াতে ? এত দূর ? গ্রাম থেকে দু' ক্রোশ দূরে বেড়াতে ? হেসে উঠল কাগজওয়ালা। অজয়ের এবার খেয়াল হল সে তার চিন্তামগ্নতার মধ্যে সামনেই হেঁটেছে সামনেই হেঁটেছে। সম্মুখের দিকে। বর্ধমান স্টেশনের পথ ধরে সে দু' ক্রোশ পথ চলে এসেছে। এবং এই মুহূর্তে সচেতনতা ফিরে পেয়ে বুঝতে পারছে সে বেশ জোরেই হেঁটেছে। পায়ে প্রচুর ধুলো লেগেছে।

আবার সে চিন্তায় ডুবে গেল—তা হ'লে ?

ফিরে যাবে ? না—। না—সম্মুখের পথেই চলবে ?

তার অন্তরের অন্তর তার নির্দেশমত ঠিক তার নির্দিষ্ট পথে চালিয়ে এনেছে। আজ এই মহাকালের পার্শ্ব-পরিবর্তনের পরমলগ্নে কারুরই কি ঘরে বসে থাকবার বা পিছনমুখে চলবার উপায় আছে। দুর্নিবার নিয়তির মত কালের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে সব ছুটেছে সম্মুখের পথে মহাচুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মত। কালের আকর্ষণে মৃত্যুমুখে জীবনের মত। সম্মুখ পথে না চলে না ছুটে তার উপায় কোথা। তার সাধ্য কি সে মায়ের পাশে চুপ করে বসে থাকে মাটির বা পাথরের ঢেলার মত!

সে প্রশ্ন করে বসল—বর্ধমান কত দূর বলতে পারেন ?

—বর্ধমান ? বর্ধমান যাবেন নাকি ?

—যদিই যাই।

—সে আরও দু' ক্রোশ। ওই তো একটু পিছনে চার মাইলের পোস্ট। পোস্টটা এখন আর নেই, আগে ছিল ওই ঢিপিটার উপর। আচ্ছা তা হ'লে নমস্কার।

—নম— ।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান । বর্ধমান যাবেন । হেঁটে । ব্যাপার কি ?

—একটু বেড়িয়ে আসি ।

—বেড়িয়ে আসি ? অদ্ভুত ব্যাপার তো !

—একটু দরকার আছে । কিন্তু তা মনে ক'রে বের হইনি । তবে এতদূর যখন এসেই পড়েছি তখন বরং ঘুরেই আসি ।

সে চলতে লাগল ।

—দাঁড়ান । অজয়বাবু !

—কি ?

—এক কাজ করুন । শুনুন ।

দাঁড়াল অজয় ।—আমার বেলা যাচ্ছে । অন্ধকার হয়ে যাবে ।

—সেই জন্যেই বলছি । পথে মঙ্গলকোটের মুসলমানদের একটা প্রসেশন গেল বর্ধমানে দেখে এসেছি । ওদের লীগের মিটিং আছে । বর্ধমান যাচ্ছে । ওদের কথা তো জানেন । আজকাল ওদের জোস্ বেড়েছে । তড়পাচ্ছে । আপনি যাবেন । আমি বলি এই সন্ধ্যেতে যাবেন না । কাল যাবেন ।

—উ'হু । আমার কাজটা মনে হচ্ছে আজই সারতে হবে । আপনি বরং আমার বাড়িতে বলে দেবেন আমি বর্ধমানে যাচ্ছি—একটু বিশেষ কাজ আছে আমার । কাল না হয় পরশু ফিরব বা খবর দেব । দয়া ক'রে বলে দেবেন আমার মাকে । ভাবতে বারণ করবেন । কেমন ?

—দাঁড়ান । তা হ'লে আপনি বরং আমার সাইকেলটা নিয়ে যান । আমিই হেঁটে যাই । ফেরার সময় আপনাদের ওখান থেকে একটা সাইকেল নিয়ে আসব । বর্ধমানে কাল সকালে বদল ক'রে নেব । নিন ।

অজয় উৎসাহিত হয়ে উঠল । ভাগ্য বা দেবতা তার প্রতি যেন আশ্চর্য সদয় হয়ে উঠেছেন । দিন—। বলে সে তার সাইকেলখানা নেবার জন্য হাত বাড়ালে ।

খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে সাইকেলখানা সে তার হাতে এগিয়ে দিলে । মুহূর্তে সে চড়ে বসে সামনে একটু ঝুঁকে সজোরে প্যাডেল টিপে সামনের পথে অগ্রসর হ'ল ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে বর্ধমানের মুখে এসে উপায়ান্তরহীন হয়ে সাইকেল থেকে নামল । মঙ্গলকোটের মুসলমানদের মিছিল তার আগে গোটা রাস্তাটা জুড়ে ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে শ্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছে । তাদের সামনে মোহরমের বাজনার মত বাজনা বাজছে । বাজনার পরেই খানিকটা খালি জায়গা, সেখানে লাঠি ঘুরিয়ে চলছে জনকয়েক । তারপর ঘোড়ার উপর দুজন নেতা । সম্ভবতঃ মঙ্গলকোটের মিঞাবাড়ির মাতব্বরেরা হবে ।

—আল্লা হো আকবর !

—ইসলাম জিন্দাবাদ !

—মুসলীম লীগ জিন্দাবাদ !

—কায়দে আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ !

—সুরাবর্দি সাব জিন্দাবাদ !

—গান্ধী বরবাদ !

—কংগ্রেস বরবাদ !

এদের অতিক্রম ক'রে যেতে গেলে এরা এই মুহূর্তেই তাকে শুধু বাধাই দেবে না মারপিট করবে । নিরুপায়ে তার সারা অন্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল । সে সাইকেলখানা হাতে ধরে পিছনে

হাঁটতে লাগল। উপায় নেই। পাশে মাঠ নেই এখানে। দু'পাশে বসতি শুরু হয়েছে। মাঠ থাকলে মাঠে নেমে সে সাইকেলখানা কাঁধে তুলে কোনরকমে এদের মিছিলকে পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে সাইকেলে উঠে চলে যেত।

ক্ষণ বয়ে যাচ্ছে—কাল বয়ে যাচ্ছে—লগ্ন চলে যাচ্ছে, সেই মহালগ্নকে বাধা দিয়ে ভ্রান্ত মানুষের দল ধর্মান্ধের দল এ কি করছে! তার চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা হ'ল নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি জয়! একবার বল – ওতেই সব ভ্রান্তি তোমাদের কেটে যাবে।

বিশ্বাস না হয় প্রশ্ন করো তোমাদের মেজর জেনারেল শা-নওয়াজ সাহেবকে। কিন্তু না, তাতেও এদের অন্ধতা দূর হবে না। হবার নয়!

সে চট্টগ্রামের স্মৃতি ভোলে নি। তার মনে আছে। তাদের ইস্কুলে সহপাঠী মুসলমান ছেলেদের মধ্যে দেখেছে এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ! তারা বলে—কংগ্রেস, গান্ধী, নেহেরু, সুভাষ বোস যে স্বাধীনতা আনবে তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হবে। হিন্দুদের অধীন হতে হবে মুসলমানদের।

মনে পড়ল সেই অশত্থগাছের শিকড়-জড়ানো তালগাছটাকে।

হিন্দু-বিদ্বেষ ঠিক ওই গাছের শিকড়টার মত গোটা সম্প্রদায়ের জীবনটাকে বেষ্টন করে জড়িয়ে আছে।

তা হলে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা - সে কি আসতে দেবে না এরা এমনি করে? পরক্ষণেই সে নিজেকে নিজে উপহাস করলে। মূর্খ দুর্বল ভীরু সে—তাই এ কথা ভাবছে।

বিপ্লব আরম্ভ হোক। বিপ্লব আরম্ভ হোক। তার স্রোতে সব ভেসে যাবে। তার নিষ্ঠুর ধারালো কুঠারের মুখে ওই শিকড় কেটে টুকরো টুকরো করে ছাড়িয়ে ফেলবে। নেতাজী একবার সামনে এসে দাঁড়াবেন—বলবেন—হিন্দুর মুসলমানের সমান অধিকার 'আজাদ হিন্দোস্তান আজাদ ভারতবর্ষে'।

'হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। ভাই ভাই একঠাঁই—ভেদ নাই ভেদ নাই।'

কিছুদূর এসে একটা মাঠ পেয়ে সে সাইকেলটা ঘাড়ে করে মিছিলকে পাশ কাটিয়ে সামনে এসে চড়ে বসে আবার অগ্রসর হল। একটু এসেই সামনে রেলওয়ে লাইনের উপর ব্রিজ। সেই ব্রিজ অতিক্রম করে সে এসে উঠল স্টেশনে। সম্মুখের সব পথ খোলা এবার। এখনও দু'একখানা লোকাল পাওয়া যাবে। কিন্তু—। কিন্তু তার পথ রোধ করলো সাইকেলটা! সাইকেলটা কোথায় রাখবে? কাকে দেবে?

ঘুরল সে। শহরের মধ্যে এসে ঢুকল। ফরওয়ার্ড ব্লকের আপিসে দিয়ে যাবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য। আপিসের দরজা বন্ধ। তা হলে? ফেলে দিয়ে চলে যাবে সাইকেলখানা পথের ধারে? স্টেশনের পাশে? বাড়ি থেকে কাগজওয়ালা দাম পেয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিংবা পুরোনো সাইকেলের দোকানে বিক্রী করে দেবে? না—তা পারবে না। তার থেকে সে তাদের উকীলের বাড়িতে সাইকেলখানা রেখে চলে যাবে। টাকা তার কাছে গোটা পাঁচেক আছে। কলকাতায় গিয়ে টাকার ব্যবস্থা করবে। হাতে তাগা আছে। আঙুলে আংটি আছে। বিক্রী করলে টাকার তার অভাব হবে না। সেই ভাল।

মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ি শহরের ভেতরে। প্রবীণ উকীল। তখন শহরের ভিতরে ওই দিকটাই ভাল ছিল। অজয় চলল সেখানে। শহরের রাস্তাতেও দু'চারটে মুসলমান মিছিলের সঙ্গে দেখা হল। শহরের মধ্যে গলিপথ ঘুরেই চলতে হল। গলিতে এবং রাস্তার এখানে সেখানে জটলা চলছে। জটলা শহরের হিন্দুদের। সকলেই উত্তেজিত। কালকের ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণা এবং আজকের এই মুসলমানদের মিছিল এবং মিটিং নিয়েই আলোচনা চলছে। খোসবাগে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যখন সে এসে উপস্থিত হ'ল তখন

সেখানে উকীল ডাক্তার ব্যবসায়ীদের বেশ একটি জমাট মজলিস বসে গেছে। আলোচনা চলছে ওই মিশন এবং মিছিল ও মিটিংয়ের।

মহেন্দ্রবাবু এককালে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। এখন বয়স হওয়ার সঙ্গে রাজনীতি মোটামুটি ছেড়েই দিয়েছেন। তবে এখানকার সমাজের প্রকৃতপক্ষে তিনি নেতা না হলেও মাথা। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যও ঘটে গেছে। সেটা নানা কারণে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ মহাত্মা গান্ধীর মুসলীম তোষণনীতি। দেশবন্ধুর আমলে হিন্দু-মুসলীম প্যাক্টের তিনি অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন। তারপর তার ক্রমপরিণতি দেখে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন শিউরে উঠেছেন এবং ক্রমে ক্রমে সরে এসেছেন। হিন্দু মহাসভার সভ্য তিনি নন। কিন্তু ক্রমশঃ তাদের মতের সঙ্গেই তাঁর মতের ঐক্য বেশী হয়ে উঠেছে।

আজ মিছিল বের হয়েছে, বেলা প্রায় তিনটে থেকে তারা নানান দলে বিভক্ত হয়ে শহর পরিক্রমা করছে এখনও শেষ হয় নি। এর মধ্যে নানান স্থানে হিন্দুদের প্রতি কটূকাটব্য এবং দু'চার জায়গায় গালাগাল করেছে! কোন এক জায়গায় ক'টি স্কুলের ছাত্রী বাড়ি ফেরার পথে মিথিলের সামনে পড়েছিল। তাদের দেখে মিছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়ার ছলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মেয়ে ক'টি ভয় পেয়ে পাশে এক বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। পরে সেখানে লোকজন জমলে তারা চলে গেছে। ভয়ার্ত মেয়ে ক'টিকে লোক সঙ্গে দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা বাড়ি পেঁাছে দিয়েছে। প্রতিবাদের গোড়া সেখানে। কথাটা এখানে ওখানে আলোচিত হয়েছে এবং পরে পাড়ার মাতব্বরদের কাছে পেঁাচেছে। এখন মাতব্বরেরা সকলে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে এসে তাই নিয়ে আলোচনা করছেন।

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। ভেবে পাচ্ছেন না কি বলবেন।

একজন বলছিলেন—চলুন স্যার, একবার ডি-এমকে গিয়ে বলুন। তাঁরা যদি এর প্রতিকারে আমাদের সেফ্টি দিতে না পারেন তবে আমাদের বলুন আমাদের ইজ্জত আমরাই রক্ষা করব। আমাদের পারমিশন দিন। একবার মহারাজার ওখানে চলুন। মহারাজ বিজয়চাঁদ থাকতে বর্ধমানে—

মহেন্দ্রবাবু বললেন—গোপেশবাবু, সে দিন গেছে যখন লীগ মিনিস্ট্রি হয় নি। সুরাবর্দি চীফ মিনিস্টার হয় নি। ইংরেজের রাজ্য যায় যায় হয় নি। আর ডি-এমকে বলে কি হবে? কি করবে সে? যা করতে হয় নিজেদের করতে হবে।

—তাঁরা বলুন সে কথা।

—এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? আপনার ইজ্জৎ আপনি রক্ষা করবেন এ কথা তো সৃষ্টিকর্তা ভগবান আপনাকে বলে দিয়ে পাঠিয়েছেন। নিজেদের ইজ্জৎ নিজেদের ধর্ম এই রক্ষার জন্যে আর সৎভাবে পবিত্রভাবে জীবনধারণের জন্যে তোমাকে বল দিলাম বুদ্ধি দিলাম। তুমি রক্ষা করো। সেই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বুঝেছেন।

কে একজন বলে উঠল—গীতাতে তো তিনি বলেছেন—পাপের অধর্মের উচ্ছেদের জন্য তিনি আসেন—

মহেন্দ্রবাবুর সহ্য হ'ল না। তিনি দু'হাত নেড়ে বলে উঠলেন—তা হলে হোক—আরও অত্যাচার হোক, তারস্বরে কাঁদুন—আকাশ স্পর্শ করুক, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হোক—তিনি আসুন। আপনার বিছানা পেতে রাখুন—নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাবেন।

কণ্ঠস্বরে ক্রোধ তাঁর ফেটে পড়ছিল।—কংগ্রেস আপোস চায়। গান্ধীজী জিন্না সাহেবের প্রেম চান। হিন্দুদের নাস্তিক ছেলেরা একদল কম্যুনিস্ট—তারা মুসলীম লীগকে সমর্থন করছে। দেখেছেন এক গঙ্গাধর অধিকারীর ওকালতি পাকিস্তানের জন্যে?

—তা জানেন না বুঝি? ওই মেয়ে ক'টি যাদের বিপদ ঘটতে ঘটতে বেঁচেছে তাদের

একজনের দাদা কম্যুনিস্ট।

—চুপ করুন। চুপ করুন। থাক। থাক। তার সঙ্গে দেখা হলে শুনবেন—বলবে—তিলকে তাল করছেন আপনারা। থাক। এখন প্রতিকার যদি চান তবে নিজেদের করতে হবে।

অজয় মহেন্দ্রবাবুর সামনে যায় নি। তাঁর সঙ্গে ভাল পরিচয়ও নেই। সে মুহুরীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুহুরীকে পেয়েই বললে—দেখুন, আমার নাম অজয় মুখোপাধ্যায়—বাড়ি আমার নবগ্রাম।

সুন্দর সুশ্রী অজয়। মুহুরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি অজয়বাবু? আপনি এখানে? কাল আপনাদের কর্মচারী এসেছিল—কই সে তো কিছু বললে না?

অজয় বললে—আসবার ঠিক কথা ছিল না আমার। আজ বিকেলে একখানা জরুরী চিঠি পেয়েছি—কলকাতা যেতে হবে আমাকে। তাই সাইকেলে চলে এসেছি। সাইকেলখানা এখানে রেখে যাচ্ছি। আমাদের লোক যে আসবে তাকে বলবেন নিয়ে যেতে।

—বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না। উনি তো ব্যস্ত রয়েছেন খুব।

—হ্যাঁ। খুব। কাণ্ড যে ভয়ানক! কি যে হবে—

—আমি যাই। কেমন? নমস্কার।

—নমস্কার! কিন্তু বাবু শুনলে আমাকে বকবেন। বলবেন—গঙ্গাধরবাবুর নাতি—বিজয়বাবুর ছেলে—এমন মা। বড় মক্কেল আমার, সে এল—চলে গেল—আমাকে বললে না?

—আমি ফিরে আসবার সময় দেখা করব। বলবেন। নমস্কার!

বলেই সে প্রায় পালিয়ে যাবার মতই দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। খানিকটা দূর খুব দ্রুত এসে তবে দাঁড়াল। একখানা সাইকেলরিক্‌শা চাই। রিক্‌শাওয়ালা আজ কম। রিক্‌শাওয়ালাদের একটা বড় অংশই মুসলমান। তারা সব আজ ওই মিছিলে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করেছে। তবু মিলল একখানা রিক্‌শা। সে উঠে বসল—চলো স্টেশন!

স্টেশনে এসে ভাড়া মিটিয়ে সে ছুটে গেল টিকিটের জানলায়।

—একখানা হাওড়ার টিকিট!

—হাওড়ার? আরে মশাই, লাস্ট লোকাল তো ছেড়ে যাবে মিনিটখানেকের মধ্যে!

—দয়া করে জলদি দিন।

সে ভাড়াটা ঠেলে দিল। ঘটাং শব্দ ক'রে পাঞ্চ করে টিকিটখানা ঠেলে দিলেন টিকিটবাবু—সে টিকিটখানা নিয়ে দৌড়ুলো। ওভারব্রিজ পার হয়ে এসে সে চলন্ত গাড়িখানার ফুটবোর্ডে উঠে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল কামরায়।

একটা জানলার ধারে বসে এতক্ষণে সে স্থির হ'ল। আঃ! গাড়ি ছুটছে। তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল আজকের আসা সাইক্লোস্টাইলকরা পত্রখানির লাইন দুটি।

এসেছে আদেশ,
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।

কবিতাটি তার মুখস্থ আছে। সারা কবিতাটাই মনে পড়ল তার। টুকরো টুকরো জায়গাগুলি যেন আপনা থেকেই সরবে বেরিয়ে এল।

—মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে—

যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনই সে
পথ-কুক্কুরের মত সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার।—

ইংরেজের প্রতি দেবতা বিমুখ। আজ কেউ তার সহায় হবে না। এই যুদ্ধে যারা তার মিত্র ছিল তারাও না। দুনিয়া বদল গয়ি—নয়া জিন্দগী হ্যায় ইয়ে। আমি সেই জিন্দগী এনেছি পৃথিবীতে মৃত্যু মাথায় ক'রে ঘুরে—পুরানো কালের সঙ্গে পাঞ্জা ক'ষে। ক্ষণ এসেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় এসেছে। স্বাধীন হবে ভারত। স্বাধীন হবে ভারতবাসী। হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন সবাই। কারুর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। কোন সমস্যা নেই। উঠে এস বেরিয়ে এস। স্বাধীন ভারতবর্ষে সবার সমান অধিকার—এখানে অধিকার নেই স্বাধীনতাবিরোধীর, অধিকার নেই বিদেশীর কুত্তার।

সঙ্গে সঙ্গে কোটি কণ্ঠের কলরব আকাশ স্পর্শ করবে—জয় হিন্দ্ জয় হিন্দ্ জয় হিন্দ্!

নেতাজী ফিরবেন অবিলম্বে—যে কোন দিন—তাতে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের কোন সংশয় নেই। মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজী—মৃত্যু তাঁর হয় নি হতে পারে না—এই তাদের বিশ্বাস। দেশের এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিদিন। রাজনীতিতে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে তারা বুঝতে পারছে মহা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজের শুধু এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার কপট পাশাটি সম্বল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র আসন্ন। ফরোয়ার্ড ব্লকের আপিস আজ গমগম করছে। কংগ্রেস যাই করে থাক—যে বিরোধিতাই করে থাক ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে,কংগ্রেস মহাত্মাজী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যা করছেন তাতে তারা বাধা দেবে না। তবে এটাই আজ প্রায় নিশ্চিত তাদের কাছে যে আপোস হবে না। আপোস করতে গেলেও দেশ তা নেবে না। দেশ চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, অখণ্ড ভারতবর্ষ। সুতরাং এই আপোসের চেষ্টা সব ব্যর্থ হবে। এবং দেশে আগুন জ্বলবে। আগুন জ্বললেই একদা শুনতে পাবে আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো কলিং।—আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো কলিং—। আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো কলিং—ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সম্বোধন করছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

—'বন্ধুগণ! মেরে পেয়ারে ভেইয়ো!' সুতরাং তাদের কর্মব্যস্ততার আর শেষ নেই। এরই মধ্যে অধিকারীর লেখা কম্যুনিস্ট পার্টির পাকিস্তান সমর্থন নিয়ে তাদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চলতে হচ্ছে। সূর্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথ যেমন মাপা গতিতে অগ্রসর হয় তেমনি ভাবে এগুতে হবে। করুক কম্যুনিস্ট পার্টি যা করছে। তোমরা যেন উন্মত্ত হয়ে সংঘর্ষে এগিয়ে শক্তিক্ষয় করো না।

একটি তরুণ কর্মী বললে—মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? অন্যায় করলেও দাঁড়িয়ে দেখতে হবে? প্রতিবাদ করতে পাব না? শোধ নিতে পাব না?

—না—ডিসিপ্লিন ইজ ডিসিপ্লিন। এ ভাঙা যায় না। কাজ করে যাও।

অজয় একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সভার শেষে কর্মীরা একে একে চলে গিয়ে ভিড় কমলে সে গিয়ে দাঁড়াল।

—কি নাম তোমার? কোন্ ইউনিটে কাজ কর?

—আমার নাম অজয়। কাজ করবার কথা নর্থ ক্যালকাটায়। কিন্তু আমার মায়ের অসুখের জন্য বাড়ি যেতে হয়েছিল। কাল পার্টির সাইক্লোস্টাইল করা অর্ডার পেয়ে কালই চলে এসেছি।

—বেশ তো, তুমি নর্থ ক্যালকাটাতেই কাজ কর। খোদ বসু মশাই রয়েছেন। আলাপ আছে ওঁর সংগে? কি কর? পড়?

—এই তো ক'মাস মাত্র ছাড়া পেয়েছি।

—ও—তুমি এলাহাবাদের অজয়—

—হ্যাঁ।

—দাঁড়াও। তোমার খোঁজ করছিলেন প্রভাতবাবু। তুমি একবার গিয়ে ওঁর সংগে দেখা কর। প্রভাতবাবু—উনি কালচারাল ফ্রন্টের একরকম কর্তা। প্রভাতবাবু যদি না থাকেন তবে ওঁর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট অমিতা বলে একটি মেয়ে—

—তাকে আমি চিনি।

—ও। তা হলে তার সংগে দেখা কর।

অজয় চঞ্চল হয়ে উঠল মনে মনে। হরিপ্রিয়া দেবীকে মনে পড়ে গেল। মাকে মনে পড়ল সংগে সংগে। মায়ের সেই সুন্দর কোমল মুখ যেন পাথরের মাত শক্ত হয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অমিতার মুখ মনে পড়ল। বসন্তের দাগে বিক্ষত মুখ—কিন্তু তার অন্তরালে একখানি সুন্দর মুখ চাপা রয়েছে। আর যেন চেনা মনে হয়। কোথায় যেন দেখা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে প্রভাতবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু প্রভাতবাবুও নেই, অমিতাও নেই। ছোট্ট কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘর। একখানা টেবিল। দু'পাশের চেয়ারই খালি। জিনিসপত্র গোছানো, ছড়ানো নয়, কাজ করতে করতে উঠে যায় নি, মনে হচ্ছে বাইরে গেছে এখানকার কাজ সেরে। মনে পড়ল পার্টির বৈঠকের সময়েও অমিতাকে মেয়েদের মধ্যে দেখতে পায় নি। মনে মনে প্রশ্ন করেছিল—সে কই? নিজেই উত্তর গড়ে নিয়েছিল—হয়তো অন্য কাজে আছে।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অন্য একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজছেন?

—প্রভাতবাবুকে।

– প্রভাতদা সেই সকালেই বেরিয়ে গেছেন।

—অমিতা বলে একটি মেয়ে কর্মী এখানে কাজ করে।

—না। সে আজ ক'দিন হ'ল আসছে না। অথচ প্রভাতদার কাজকর্ম কিছু হচ্ছে না। উনি কাল বলছিলেন।

—সমীর! ওদিক থেকে ডাক এল।

ছেলেটি বললে—যাই। সে চলে গেল- যেতে যেতে বললে—প্রভাতদা ওর খোঁজেও গিয়ে থাকতে পারেন।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে নীচে নেমে এসে বললে—ও'রা কেউ নেই।

—ঠিক আছে, পরে দেখা কর।

— তা হলে আমি নর্থ ক্যালকাটায় কাজ করব?

—যদি কলকাতাতে থাক, তা হলে তাই করবে। তোমার মা সুস্থ হয়েছেন?

—ঠিক সুস্থ হন নি।

—তা হলে বাড়ি ফিরে যাবে? তোমার কথা আমি কিছুটা জানি বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমি চট্টগ্রামের ছেলে। অবশ্য অল্পকালই ছিলাম চট্টগ্রামে। তবে তোমার ঠাকুরদা, বাবা এঁদের দেখেছি—ও'দের কথা জানি। সেদিন তোমার কথা হচ্ছিল। এলাহাবাদের পার্টি সেক্রেটারী এসেছিলেন—তিনি তোমার নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন অজয়

মুখার্জী কি এখানে কাজ করছে ? তাইতে কথা উঠল। বললেন—আমি ঠিক তো ব্যক্তিগত-ভাবে জানি না। তখন আমি আন্ডারগ্রাউণ্ডে রয়েছি। তখন কোত্থেকে এই ছেলে এল। অবিশ্যি তোমার মামাতো ভাইদের চেনেন। তখন আমি তোমাকে ধরতে পারলাম তোমার বাবা ঠাকুরদাকে মনে করে। তোমার বাবার বিয়ের সময় আমি বারো-চোদ্দ বছরের ছিলাম—সে সময় নেমন্তন্ন খেয়েছি। আমার দাদা নাইন্টিন টোয়েন্টি-এইটে কেসে পড়েছিলেন—তোমার বাবা ডিফেন্ড করে বাঁচিয়েছিলেন। তবে পার্টির কন্ট্যাক্টে তুমি কখন এলে ঠিক জানি না। বললাম তাই। চট্টলের ছেলে বারো-তেরো বছর বয়সেই পলিটিক্সে হাতেখড়ি নেয়। সম্ভবতঃ ওখানেই এসেছিল। আর কে সাধনা দেবী। তাঁর কথা বললেন তিনি। তোমার জন্যে তাঁর নির্যাতন হয়ে গেছে। তাঁর খবরও জিজ্ঞাসা করছিলেন। বললেন, তিনি ওখানে থেকে তোমাদের গ্রামে আসছিলেন চাকরি নিয়ে। তোমার মা তাঁকে চাকরি দিয়ে আনছিলেন—তিনি ট্রেনে বেরিয়ে পথে কোনখানে নেমে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তার খবর কেউ জানে না। উনি মানে এলাহাবাদের সেক্রেটারী বলছিলেন, ঠিক যে কি ভাবে কি ঘটেছিল তাও ঠিক ধরতে পারেন নি। তা তুমি গঙ্গাধরবাবুর নাতি। মহাশয় লোক ছিলেন। ওঃ, দশাসই চেহারা—মোটা মোটা হাড়—শক্ত কঠিন দেহ। এই মস্ত একটা হুঁকোতে তামাক খেতেন। হাত দেড়েক লম্বা—এই মোটা রুপো দিয়ে বাঁধানো। খালি গায়ে খড়ম প'রে হাতার মধ্যে ঘুরতেন। গলার আওয়াজ ছিল ভরাট মোটা। একটা ব্যাঘ্রবৎ মনুষ্য।

অজয় শুনছিল, বাপ-পিতামহের প্রশংসা শুনতে শুনতে মুখে একটি স্মিত হাস্যও ফুটে উঠল। সে বললে আমি ওঁকে দেখি নি। তাঁর মৃত্যুর পরে আমার জন্ম।

হেসে তিনি বললেন—একদিন শুনব তোমার কথা। তুমি গিয়ে নর্থ ক্যালকাটার সেক্রেটারীর সঙ্গে —, দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি তো বললে মায়ের অসুখ এখনও সারে নি। কি অসুখ ?

—প্লুরিসি ! ড্রাই প্লুরিসি।

—কি মুশকিল ! তা' হলে—তুমি—। তোমরা কয় ভাই ? বাড়িতে আর কে আছে ?

—আমি এক ছেলে মায়ের। বাড়িতেও কেউ নেই মানে আপনার জন। তবে নায়েব কর্মচারীরা আছেন।

—তা হ'লে ?

অজয় চুপ করে রইল। এর উত্তর কি সে তো জানে না।

দেশ আগে না মা আগে ? কখনও দেশ বড় হয়ে ওঠে, আজ তাই উঠেছে, পার্টিও রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কোটেশন দিয়ে ডাক দিয়েছে। কিন্তু তবুও মায়ের কথা মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে।

—তুমিও ভেবে ঠিক করে নাও। বুঝেছ। মা যতদিন না সারেন ততদিন তুমি গ্রামেই থাকতে পার। বর্ধমানের পার্টির সঙ্গে কাজ করবে।

সেই কথাই ভাবতে ভাবতে অজয় ফিরছিল। হঠাৎ ট্রামখানা বিবেকানন্দ রোড পার হতেই তার মনটা চমকে উঠে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিডন স্ট্রীট পার হয়েই অমিতাদের বাড়ি। মনে প'ড়ে গেল। অমিতা আপিসে আজ কয়েকদিন যায় নি। প্রভাতবাবু সম্ভবতঃ তার খোঁজ করতে এসেছেন বললে ছেলেটি। খুব সম্ভব প্রভাতবাবু তা হলে কোন খবর পেয়েছেন—হয়তো অমিতার অসুখের খবর। তাই হবে। তা না হলে অমিতার মত অমিত-উৎসাহিনী তো ঘরে বসে থাকবার মেয়ে নয়। একবার খোঁজ ক'রে গেলে হয় না ? উচিত খোঁজ করা। কিন্তু তার মা !

মায়ের সেই কঠিন মুখ মনে পড়ছে !

এরই মধ্যে ট্রামখানা বিডন স্ট্রীট পার হয়ে রঙমহল থিয়েটারের সামনে এসে থামল। একটু আগেই গ্রে স্ট্রীট। সে নেমে পড়ল।

নেমেও কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল —বাড়ির দিকে নয়, হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়ির দিকে। অনেকটা যেতে হবে। বিডন স্ট্রীটের উত্তরে প্রায় সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর জংশনের কাছাকাছি।

বাড়িটায় সে একবার মাত্র এসেছিল। এবং এ অঞ্চলের রাস্তাগুলি এমনই সেই পুরনো আমলের তৈরী আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার মত যে বের করা খুব সহজ নয় তার পক্ষে। অনেক ঘুরেই সে সেই পানের দোকানটা আবিষ্কার করলে। হাঁ, সেই পানওয়ালাই বসে রয়েছে। তা হ'লে! এই বাড়িটাই বটে ! তবুও সে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে—এইটেই তো হরিপ্রিয়া দেবীর বাড়ি ?

—হাঁ। লেকিন উ মাইজী তো গুজর গয়ী !

—গুজর গয়ী ? মানে মারা গেছেন ?

—হাঁ। আজ পাঁচ রোজ হো গয়া। হার্ট ফেল কর্‌কে মারা গেলেন !

স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল অজয়।

পানওয়ালা বললে—খোবোরের কাগজে বেরিয়েসিলো।

—কি হয়েছিল ?

—কি হোবে ? কুছ না। উনার এক লেড়কী আছে না। চিচকের দাগ আসে মুমে। উ লেড়কী কালিজমে পঢ়ে। তো উ কালিজমে ঠিক ঠিক টাইমমে ফিরে না, উসব ঝাণ্ডা উণ্ডা লিয়ে ইনকিলাব জয় হিন্দ্ করকে ফিরে। এহি লিয়ে লেড়কীর সাথে ঝগড়া হোচ্ছিল। উ রোজ উ লেড়কী বহুত দেরমে ফিরলো তো মাইজী বকলো খুব। উ তো বকতো না থিয়েটার করতো। ওহি খুব রাগ করলো, আর বহুত জোর জোর এ্যাক্টিংকে মাফিক চিল্লালো। উসকে বাদ কলিজামে বহুত দর্দ হালো। একদম বিস্তারামে শুয়ে গেলো। হামাকে মাইজী খুব ভালবাসতো বাবুজী। হমি যখুন পরথম দুকান লাগাই তখুন মাইজী দিলো টাকা। পানশো টাকা। উ টাকা হমি দশ বিশ পচাশ করকে শোধ দিলম। যো কুছ হতো মাইজীর হমাকে বুলাইতেন। উ রোজ ভি বুলাইলেন। বাদ্দ বেটা জলদি ডগটরবাবুকে বোলা লে আয়। হমি আর বাঁচবে না। জলদি। হমি ছুটে গেলম—ডগটরবাবু—উনার ডগটরবাবু পুরানা আদমী—উনি যখুন আইলেন তখন মাইজী গুজর গিয়েসেন। বিশ পচাশ আদমী আইলো বাবু। আইলো - বাস ঘুমে চলে গেলো। লেকিন বাবু হমি আপনা আঁখসে দেখিয়েসি বড়া বড়া বাবু অফসর থিয়েটরকে মালিক জুড়ি মোটর লিয়ে আসতো। ঘণ্টের পর ঘণ্টে হিঁয়া আলাপ করতো বাবু। মাইজী স্টেজে ঢুকতো - হাজার আদমী গোল করছে— বস্ চুপ হয়ে যেতো।

হৃদয়াবেগে পানওয়ালা কথা বলেই চলেছিল। দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু ও জানে না— দেহপট সনে নট সকলই হারায়। সেদিন হরিপ্রিয়া দেবীও কথাটা বলেছিলেন নিজে। বলেছিলেন—দেহপট যেতেও তর সয় না। যৌবন। যৌবনের সঙ্গে নটীর সব যায়।

অজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—ও'র মেয়ে ? সে কেমন আছে ? তার সঙ্গে দেখা করব আমি।

পানওয়ালা বললে—আয় বাপ্ ! সো তো কোথা চলিয়ে গেলো। মাইজীর কিরিয়া শ্মশানমে শেষ কর্‌কে আইলো, উস বাদ, দুসরা রোজ গেইলো ডগটরবাবুকে হুঁয়া। বস্— আর ঘুমলো না। বিকালবেলা খুদ ডগটরবাবু আইলেন। উনিকো সাথ বাত করনে লিয়ে।

অবাক হইয়ে গেলেন। কি—উনকে হঁয়াসে তো চলিয়ে আসিয়েছে! লেকিন বাড়িমে তো ঘুমে নাই। তখুন শুনলাম কি উ লেড়কী মাইজীকে লেড়কী নেহি হ্যায়।

অজয় অবাক হয়ে গেল।

অমিতা হরিপ্রিয়া দেবীর কন্যা নয়?

ডাক্তার নগেন মিত্র কলকাতায় ডাক্তার হিসেবে খুব বড় না হলেও নামকরা ডাক্তার; কলকাতার বাসিন্দে হিসেবে পুরনো ঘরের মানুষ। কিন্তু থিয়েটার জগতের মানুষদের কাছে পরমাত্মীয় এবং সব থেকে বড় ডাক্তার। নগেনবাবু নিজে থিয়েটার-প্রিয় নয়—থিয়েটার পাগল মানুষ। অভিনয় অভিনেতা অভিনেত্রী এরাই তাঁর সব থেকে প্রিয়জন। সে সেই প্রথম যৌবন থেকে। প্রথম দিকে এর জন্যে অপবাদ রটেছিল; তার অল্প কিছুটা সত্য। একজন অভিনেত্রীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি তরুণ বয়সে থিয়েটারের গ্রীনরুমে, আপিসে প্রবেশাধিকার চেষ্টা ক'রে অর্জন করেছিলেন এবং চিকিৎসক হিসেবে তাঁর অকৃপণ সাহায্য দিয়ে সকলের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। ভালোবাসার পাত্রী অভিনেত্রীটি অকালে মারা গেল—ডাক্তার মিত্র তারপর আর কারুর প্রেমে পড়েন নি তবে থিয়েটার জগৎ ছেড়ে যান নি বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সকলের সঙ্গে। হরিপ্রিয়ার তিনি মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁর মতে হরিপ্রিয়া সারা পৃথিবীতে একজন বড় অভিনেত্রী। এবং হরিপ্রিয়ার প্রেমিক নাট্যকার অভিনেতাটি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। শুধু চিকিৎসা ক'রে নয়, সময়ে অসময়ে অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন। শুধু চিকিৎসা এবং অর্থসাহায্যই নয়, আরও অনেক কিছু করেছেন। যখন যেদিক থেকে দুর্যোগ এসেছে সেই দিকেই তিনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আইন আদালত থেকে বিরূপ বিপক্ষদের নিয়োজিত গুণ্ডাবাজি পর্যন্ত। নাট্যকারটি মারা যাবার পর হরিপ্রিয়ার বাড়িঘর সব তিনিই দেখেছেন। হরিপ্রিয়া উইল করে উইল তাঁর হাতেই দিয়ে গেছেন। থাকবার মধ্যে ছিল বাড়িখানা এবং কিছু আসবাব আর সামান্য কিছু গহনা। নগদ টাকা হাতে কি ছিল সে হরিপ্রিয়াই জানতেন।

ডাক্তার নগেন মিত্র বললেন··ঠিক বুঝতে আমি পারি নি। তা হ'লে –। তিনি থেমে গেলেন। তারপর বললেন—সত্য বলতে কি আমি একটু বিরূপ হয়েছিলাম মেয়েটির উপর।

কথা বলছিলেন তিনি অজয়কে। অজয় সেদিন পানের দোকানদারের কাছে হরিপ্রিয়ার মৃত্যু এবং অমিতার নিরুদ্দেশের কথা শুনে ডাক্তার মিত্রের বাড়ির দোর পর্যন্ত এসে ঘুরে গিয়েছিল। ঢুকতে পারে নি। সংকোচ হয়েছিল। সে কে, এবং কেন সে অমিতার খোঁজ করছে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কি বলবে? কিন্তু দু'দিন পর সে না গিয়ে পারে নি।

ডাক্তার মিত্র তাকে দেখেই চিনেছিলেন। বলেছিলেন—সে দিন তুমিই তো এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে! যে দিন অমিতার ফিট হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি অমিতারই খোঁজ নিতে এসেছি।

ডাক্তার মিত্র বললেন—সে কি? আমি মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম। মনে হচ্ছিল সে নিশ্চয় তোমাদের কারুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকবে। তা ছাড়া তো আর তার যাবার জায়গাও কোথাও নেই।

—আজ্ঞে না। আমি তো কিছুই জানি না। আমি সবে এসেছি দু'দিন হল। যে দিন আসি সেই দিন সন্ধ্যেবেলা ও'র বাড়িতে গিয়ে পানওয়ালার কাছে শুনলাম হরিপ্রিয়া দেবী মারা গেছেন আর অমিতা ও'র মেয়ে নয়—এবং সে আপনার বাড়ি এসে আর বাড়ি ফিরে যায় নি।

ডাক্তার মিত্র একটু চুপ ক'রে রইলেন—হ্যাঁ। মেয়েটির উপর আমি বিরূপ হয়েই ছিলাম। হরিপ্রিয়া দেবী নিজের কন্যার মৃত্যুর পর ভবেনবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন। ভবেনবাবুর

মৃত্যুর পর এই মেয়েটি তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। পাশের বাড়িতে থাকত ওরা। মা আর মেয়ে। মায়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়েছিল। ওদের আচার আচরণে ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট এবং মুগ্ধও হয়েছিলেন। বেশ শিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু একটা রহস্য যেন ছিল। কাশীতে যারা যায় তাদের অনেকেরই এটা থাকে। উনি তা জানতে চান নি। কাশীতে সেবার বসন্ত হয়েছিল ভীষণাকারে; সেই বসন্তে মা মারা গেল। মেয়েটার বসন্ত হল। জ্বরের ঘোরে প্রথমেই মেয়েটি প্রলাপের মধ্যে হরিপ্রিয়া দেবীকে 'মা' বলে ডেকে হাত বাড়িয়েছিল। হরিপ্রিয়া নিজে কন্যাশোকাতুরা, তিনি আর থাকতে পারেন নি—ওদের বাড়িতে এসে বুকে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তুলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন—যেন মনে মনে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিলেন কথাগুলি মনে প'ড়ে। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—মেয়েটির নাম ছিল শ্যামা। ওঁর নিজের মেয়ের নাম ছিল দুটো—তার বাপ ডাকতেন শুচি বলে—উনি ডাকতেন অমিতা বলে। এই মেয়েটিকে অনেক সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলে শ্যামা নাম পালটে অমিতা নাম দিয়েছিলেন। ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ এখানে ভাড়াটেরা বাড়ি নিয়ে নানা গোলমাল করায় তিনি কাশী থেকে চলে এলেন। বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। ওকে লেখা-পড়া শেখাবেন এবং ডাক্তার ক'রে তুলবেন এই ঠিক করেছিলেন। এর জন্য এই বয়সে একবার স্টেজে নামবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বয়স হয়েছিল—দেহ ভেঙেছিল—মন গিয়েছিল ধর্মের দিকে—বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এদিকে মেয়েটির একটা রাজনৈতিক দিক ছিল। যেটা কোনদিনই মেয়েটি বেশ খুলে ওঁকে বলে নি। সেটা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে। সে তুমি হয়তো আমার থেকে বেশী জানতে পার। কিন্তু এই নিয়ে হরিপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মতান্তর ঘটত। হরিপ্রিয়া দেবী ঠিক এটা পছন্দ করতেন না। বিশেষ ক'রে পড়া-শোনা খাওয়াদাওয়া বাড়িঘর সব ফেলে কলকাতাময় ঝাণ্ডা ঘাড়ে ঘোরা, কি বিপ্লব বিপ্লব করে ঘোরা তাঁর ভাল লাগত না। মেয়েটি কিন্তু ভয়ানক জেদী। সেও ছাড়ত না। একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল—তুমি জান। হরিপ্রিয়া দেবী যে দিন মারা যান সে দিনও এই ধরনের কাণ্ড ঘটেছিল একটা। আগের দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারারাত্রি বাড়িই ফেরে নি। পরের দিন বারোটা একটার সময় ফিরেছিল যার জন্যে হরিপ্রিয়া দেবী ওকে খুব তিরস্কার করেছিলেন। মেয়েটির মেজাজও সুস্থ ছিল না—উত্তর প্রত্যুত্তর হয়। মেয়েটি বলে—ভাল, আমি আপনাকে অশান্তি দুর্ভোগ থেকে রেহাই দিচ্ছি—চলে যাচ্ছি আমি। হরিপ্রিয়া দেবী বলেছিলেন—এক্ষুনি যাও। এক্ষুনি এই মুহূর্তে। তিনি নাটকের বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলতেন, অভ্যাস ছিল। মেয়েটি তার যা ছিল নিয়ে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি বক্তৃতাই করেছেন, তারপর সে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছে অমনি তিনি নিজের বুকে চাপড় মেরে চীৎকার করে-ছিলেন—ভেঙে যা—ভেঙে যা—ওরে প্রস্তরনির্মিত বক্ষস্বার, ভেঙে প'ড়ে মুক্তি দে—মুক্তি দে।

ওই ওতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। বুকে খচ ক'রে উঠে যন্ত্রণা উঠল, প'ড়ে গেলেন। ঝিটা চীৎকার করে উঠেছিল, মেয়েটিও ফিরেছিল; পানওয়ালাকে আমার কাছে পাঠায়। আমি যখন গেলাম তখন প্রায় শেষ অবস্থা। যন্ত্রণার মধ্যে বলেছিলেন—ক্ষমা ক্ষমা—ক্ষমা! আমাকে শুধু বলেছিলেন—গহনা। ওর।

মানে মেয়েটিকে দিতে চেয়েছিলেন। সৎকার হল—মেয়েটি মুখাগ্নি করেছিল। আমি বলেছিলাম—দেখ বাপু, মনে কোন আপত্তি থাকলে করো না। কিন্তু সে একটু হেসেছিল। বলেছিল—না।

রাত্রে বাড়ি এল। ঝিয়ের কাছে রেখে এলাম। বললাম—দেখ যদি ভয় লাগে—। সে

বললে—না।

পরের দিন আমার বাড়ি এল।

একটু থেমে ডাক্তার মিত্র বললেন—বোধ হয় শ্মশানে আমার সঙ্গে ক'জন পুরনো অভিনেত্রীর অভিনেতার কথা হচ্ছিল—সে সেটা শুনেছিল। উইলের কথা হচ্ছিল; তারা জিজ্ঞাসা করছিল—বাড়িটা কাকে দিয়ে গেছেন হরিপ্রিয়া। আমার কাছে উইল আছে এ কথাটা দু'চারজন জানত। আমি বলেছিলাম—বাড়ি দিয়ে গেছেন ওঁর গুরুর আশ্রমকে। ইদানীং মধ্যে মধ্যে বলতেন—গুরুর আশ্রমে দিয়েছি—এ তো আর ফেরাবার কথাও ভাবতে নেই; নইলে মেয়েটাকেই দিয়ে যেতাম। যেমন হয়, মৃত্যুর পর পাঁচজনে যেমন কথাবার্তা বলে, তেমনি আর কি! একজন বলেছিল—তা হ'লে মেয়েটা কোথায় যাবে? ওর মা'র নাম ক'রে থিয়েটারে-টিয়েটারে ঢুকিয়ে দিন না। এই সব কথা। মেয়েটি একটু দূরে বসে-ছিল। ভাবি নি যে কথাগুলো শুনছে ও। যাক শ্মশান থেকে ফিরে ওকে রেখে বাড়ি এলাম। পরের দিন সকালেই ও এল। বললে—ওঁর গহনাগুলো নিন। আমি বললাম—উনি তো ওগুলো তোমায় দিয়ে গেছেন। ও বললে—দুখানা সোনার মেডেল রয়েছে। ওগুলো? বললাম—ওগুলো গহনা ঠিক নয়, তবে ওগুলোও তোমার, কারণ সোনা টাকা উনি তোমাকেই দিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—বাড়ি তো গুরুর আশ্রমে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাকে কি বলেছিলেন উনি? ও বললে দু'একবার বলেছিলেন আগে, তারপর কাল আপনি বলেছিলেন আমি শুনেছি। তা হলে তো ওখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। আমি একটু বিরক্ত ছিলাম ওর উপর, কারণ হরিপ্রিয়া দেবীর মৃত্যুর কারণ একরকম আমার বিচারে ওই দাঁড়িয়েছিল। বললাম—হ্যাঁ, তাই হবে। তবে তাঁরা যদি দয়া করে থাকতে দেন সে আলাদা কথা। তুমি লিখে দেখতে পার। কেন, তোমার কি আর কোথাও কেউ আপনার লোক নেই? যার কাছে গিয়ে তুমি থাকতে পার! ও একটু হেসে বললে—না। তারপর উঠে চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—দেখ তোমার সম্বন্ধে আমি ভেবেছি, ভাবছি - ও—।

ডাক্তারবাবু বললেন—মেয়েটি বললে—আমি শুনেছি কাল শ্মশানে। কিন্তু ও তো—মানে থিয়েটারের চাকরি তো আমি করব না। আর আপনি ওসব নিয়ে আমার জন্যে ভাববেন না। বেশ শক্ত ভাবেই বললে। আমার মন আরও একটু বিরূপই হল। বললাম—বেশ। ও চলে গেল। বিকেলের দিকে মনটা আমার অনুতপ্ত হল। বয়স হয়েছে তো; মনে হ'ল ছোট একটি মেয়ে - কতই বা বয়স। তার ওপর এমন ভাবে বেশ বলাটা আমার উচিত হয় নি। এই কাল। এ কালে ও রাজনীতি নিয়ে মেতেছে—সেটা স্বাভাবিক। আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তা ছাড়া হরিপ্রিয়া দেবীর এই দুর্ঘটনার জন্যে ওকেই বা পুরো দায়ী কি করে করব? ওঁর যে ওই থিয়েটারি স্বভাব ওটাও তো একরকম ঘটনাটা ঘটিয়েছে। বুক চাপড়েছেন। ভেবে আমি ও বাড়িতে গেলাম। দেখলাম ঝিটি বসে আছে। মেয়েটি নেই। শুনলাম সেই আমার ওখানে গেছে আর ফেরে নি। পুলিসে খবর দেব কি দেব না ভেবে ঠিক করতে পারলাম না কিছু। খবর দিই নি। পলিটিক্স করে—কোন ভাবে যদি বিপদ ঘটে যায় তবে উলটো হবে; তার ভাল করতে গিয়ে মন্দ করে দেওয়া হবে। এক গহনাগুলো নিয়ে গেছে; তা সে তো হরিপ্রিয়া তাকে দিয়ে গেছেন আমাকেই বলে গেছেন। আমাকে সে সেসব দিতেও এসেছিল—আমিও তাকে বলেছি ওসব তোমার। ঝিকে বলে এসেছি সে যদি ফেরে, তবে সে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। কিছু বলতে বারণ করেছি। ভেবেছি ওঁর গুরুর আশ্রমে লিখে ওকে একটা ঘর ছেড়ে দিতে অনুরোধ করব; মনে হয় তাঁরা তা দেবেন। আর আমি বরং একটু সাহায্য করব, পড়াশুনো যেমন করে

তেমনি ক'রে যাক। কিন্তু কই, আজ তো তিন দিন হয়ে গেল—ফিরল না তো! ভেবেছিলাম একবার ফরোয়ার্ড ব্লক আপিসে যাব তাও হয়ে ওঠেনি। আমার নিজের দেহখানাও ভাল নেই।

অজয় কথাগুলি নির্বাক হয়ে শুনে গেল। শুধু তাই নয়, মেয়েটির ভাগ্যের বিচিত্র ইতিহাস শুনে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

কথা শেষ হতেই সে নমস্কার করে বললে—আমি যাই।

—যাবে! কিন্তু—

অপেক্ষা করে রইল অজয়।

—তোমাদের পার্টি অফিসে কেউ তার খবর জানে না?

—ঠিক জানি না। তবে আপিসে কোন খবর নেই। সেখানে কিছু বলে যায় নি। তারা বরং খুঁজছে।

—খবর পেলে আমাকে একটু জানিয়ো বাপু।

—জানাব।

ডাক্তার মিত্র চিরকালই কথা বেশী বলেন, এখন বুড়ো হয়ে বেশী বলেন; প্র্যাকটিস করেন না, নানান ধরনের পড়াশোনা নিয়েই থাকেন। তিনি অজয়কে আবার ডাকলেন—প্রশ্ন করলেন—কোথায় থাক তুমি? মানে বললাম তো আমাকে খবর দিয়ো। ভাবলাম না তো তোমার সুবিধে অসুবিধের কথা।

হেসে অজয় বললে—না, বেশী দূরে আমি থাকিনে—এই গ্রে স্ট্রীটে থাকি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়ছে বটে, সেই যখন ডাকতে এসেছিলে আমাকে অমিতার ফিট হওয়ার জন্যে তখন যেন বলেছিলে। তা বেশ। আমাকে একটা খবর দিয়ো।

—নিশ্চয় দেব।

অজয় বেরিয়ে এল। মনের মধ্যে শুধু একটি কথাই তার ঘুরছিল—আশ্চর্য মেয়ে। দুর্দান্ত মেয়ে। বিচিত্র ভাগ্য। হ্যাঁ, ভাগ্য বিচিত্র এবং বিরূপ না হ'লে মানুষকে তার সঙ্গে লড়াই করতে না হ'লে মানুষ এমন কঠিন শক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে না।

তার ভাগ্য চিরদিন সদয়। শুধু একবার মায়ের আওতা থেকে বেরিয়ে এলাহাবাদে দুর্দান্তপনার অভিনয় করতে গিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়েছিল। তাই সে আজ দেশ-সেবার অধিকার পেয়েছে। এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু—

অমিতা হরিপ্রিয়া দেবীর মেয়ে নয়? মায়ের নাম আরাধনা দেবী—ওর আসল নাম শ্যামা।

পথে ছোট বাচ্চাদের দল কাগজের ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল মিছিল খেলা খেলছে।

—নেতাজী কি জয়!

—নেতাজী কি জয়!

—নেতাজী কি জয়!

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

—স্বাধীন ভারত কি জয়!

অজয় দাঁড়িয়ে গেল। ভারী ভাল লাগল তার। ছোট ছোট বাচ্চারাও আজ নেতাজীর জয়ধ্বনি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কামনা জানাচ্ছে। চমৎকার অনুকরণ করেছে। তিন-চারজন পতাকা ধ'রে সামনে চলেছে, তার পিছনে ক'জন ছেলে টিনের তৈরী খেলনা ড্রাম বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। তার পিছনে একখানি টবের গাড়ির উপর নেতাজীর একখানি ছবি ফুল দিয়ে সাজিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। এ যেন একটা জোয়ার এসে গেছে।

একজন কনেস্টবল অন্য একটা গলির মুখ থেকে বেরিয়ে এই রাস্তায় ঢুকে কোথায় চলেছে।

বাচ্চারা একবার থমকে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল ; পরমুহূর্তে একটি ছেলে বুক ফুলিয়ে খুব জোরে চীৎকার করে উঠল—নেতাজী কি— । ছেলেগুলি সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—জয় !

কনেস্টবলটি হেসে ফেললে । মৃদুস্বরে বললে ফিন বলো !

—নেতাজী কি— । জয় !

— বহুত আচ্ছা ! বলে কনেস্টবলটি চলে গেল ।

অজয় উল্লসিত হয়ে উঠল ।

—বাবু ! পিছন থেকে কে ডাকলে ।

—কে ? পিছন ফিরলে অজয় ।

ডাক্তার মিত্তিরের বুড়ো চাকর তাকে ডাকছে ।

—কি ? আমাকে বলছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ । ডাক্তারবাবু বললে যে বাবুটি এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন দেখ তাকে যদি পাস । বল, আমি ডাকছি ।

আবার কেন ? তবুও অজয় ফিরল ।

ডাক্তার মিত্র বসে আছেন—সামনে কিছু কাগজপত্র । ডাক এসেছে । অজয় ঢুকতেই ডাক্তার মিত্র বললেন - যাক বাঁচা গেছে তোমাকে পাওয়া গেছে । নইলে গ্রে স্ট্রীট খুঁজে বেড়াতে হত । সেও তো সোজা নয় । নম্বরটা নিয়ে রাখি নি । অমিতার খবর পাওয়া গেছে ।

—পাওয়া গেছে !

— হ্যাঁ । কাশী থেকে । আশ্চর্য মেয়ে হে ! আশ্চর্য মেয়ে । ডাক্তার মিত্র একখানি চিঠি হাতে ধরেই ছিলেন । চিঠিখানা খুলে বললেন—হরিপ্রিয়ার গুরুর আশ্রম থেকে—এখানকার যিনি আশ্রমের গুরু তিনি লিখছেন । আমি তাঁকে হরিপ্রিয়ার মৃত্যু-সংবাদ এবং বাড়ি তাঁদের দিয়ে গেছেন সে সব খবর জানিয়েছিলাম । তিনি লিখছেন, আপনার পত্র পাইয়াছি । ইতিমধ্যে আজ সকালে একাকী কুমারী মেয়ে আমার নিকট আসিয়াছিল । কুমারী শ্যামা ভট্টাচার্য । আমরা জানিতাম হরিপ্রিয়া একটি অনাথ কন্যাকে নিজ কন্যার মত পালন করিতেন । এবং নিজ কন্যা অমিতা নামেই ডাকিতেন । মেয়েটি বলিল সে-ই সেই কন্যা এবং কিছু স্বর্ণালংকার কয়েকটি সোনার মেডেল (পশ্চাতে বিবরণ রহিল) আমাদের দিয়া বলিল, এগুলি হরিপ্রিয়া তাহাকে আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন । আপনার পত্রে আছে হরিপ্রিয়া মৃত্যুকালে স্বর্ণালংকারগুলি এই কন্যাকে দান করিয়াছেন । সুতরাং আমি বিস্মিত হইলাম এবং তাহাকে সেই কথা বলিলাম । মেয়েটি বলিল, গহনাগুলি শেষ সময়ে তিনি তাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সত্য বটে কিন্তু সে নিজে গহনাগুলি চায় না । হরিপ্রিয়া তাহার মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন - তাঁহার কাছে তাহার অনেক ঋণ, সে ঋণ সে আর বাড়াইতে চায় না । এবং তাঁহার জীবনের অর্জিত যাহা কিছু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সবই গুরুর আশ্রমে যাওয়া উচিত ! তিনি নাকি মধ্যে মধ্যে বলতেন আশ্রমে গিয়া শেষ জীবন যদি আশ্রমের বাসন মাজিয়া এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করিয়া কাটাইতে পারিতেন তবেই তাঁহার সাধনা পূর্ণ হইত । তাহা তিনি পারেন নাই । ইহার খানিকটা কারণ সে নিজে অর্থাৎ মেয়েটি নিজেকে মনে করে । কারণ হরিপ্রিয়া তাহাকে লইয়া মমতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন । সুতরাং এ গহনা হরিপ্রিয়া তাহাকে দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও সেটায় তাহার অধিকার নাই । এবং এ দান নিতান্ত কর্তব্যানুরোধে দান বলিয়াই সে মনে করে । আমরা তাহাকে অনেক বলিয়াও সম্মত করিতে পারি নাই । তাহাকে আমরা আপনার পত্রমত হরিপ্রিয়ার বাড়ির একখানি ঘর লইয়া থাকিয়া পড়াশুনা করিতে বলিয়াছিলাম, পড়াশুনায় সাহায্যও করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতেও

সে সম্মত হয় নাই। কারণ সে বলিল ধর্মে ঈশ্বরে তাহার ঠিক বিশ্বাস নাই। তাহার উপর সে নিজে রাজনৈতিক কর্মী। তাহাকে জীবনে সরকারী নির্যাতনে নির্যাতিত হইতে হইবে। আশ্রমের সঙ্গে কোন প্রকারে যুক্ত থাকিলে আশ্রমও বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং তাহা সে পারিবে না। সে শুধু একটি মেডেল এবং একটি আংটি বহু অনুরোধে হরিপ্রিয়ার স্মৃতি হিসাবে লইয়াছে। মেয়েটি অসাধারণ মেয়ে।

ভারতবর্ষের জীবনের গতি তখন যেন হিমালয়ের মাথা থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের মধ্যপথে এসে একটা শূন্যমণ্ডলে খসে নীচে পড়ার গতিবেগ নিয়ে এক অনিশ্চিত অতলে বা সমতলে পড়তে চলেছে। নেতা শ্রীবোস সেদিন বললেন, "পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চির সারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি"—এবার ঘর্ঘর শব্দ আকাশ স্পর্শ করেছে। রথ চলছে দুর্নিবার বেগে! 'যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' অজয়ের মনে পড়ে গেল আনন্দমঠের গান—ওর পরের লাইনটা সেটা কিন্তু বোসদা বললেন না। "হরে মুরারে" কথাটা হিন্দুর কথা। ফরওয়ার্ড ব্লক আশা রাখে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যে বিরোধ কংগ্রেসের সাধ্য হল না মেটাতে, সেটা তাদের পার্টি পারবে। নেতাজী এসে একবার দাঁড়ালেই মিলন হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কালে অত্যন্ত সংকর্ হতে হবে তাদের। তা ছাড়া "হরে মুরারে"র দিন আর নেই। বোসদা পলিটিক্‌স্‌ অনেক পড়াশুনা করেছেন—বিলেতফেরত লোক; তিনি বলেন—ধর্ম নয়—মানুষের সভ্যতা ধর্মের যুগ পার হচ্ছে। নো মোর অব ইট।

কংগ্রেস পারলে না—হেরে গেল। গান্ধীজীর ঐক্যের সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। জিন্না সায়েব লিয়াকৎ আলি খাঁ শক্ত মানুষ—গলা ধরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেও জিন্না সায়েব নিজের দাবিতে ঠিক আছেন। গান্ধীজী যদি মরণপণে অনশনও করেন তাতেও তাঁরা বিগলিত হবেন না।

রাজনীতিক্ষেত্রে ঘটনাচক্র দ্রুততম বেগে ঘুরছে।

ক্যাবিনেট মিশন এল—এবার ফিরে যাবে। কিন্তু কোন স্থানে এসে পেঁছুলো না, শুধু ঘুরপাকই খেলে। ২৩শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন এসে পেঁচৈছে। লর্ড পেথিক লরেন্স ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের সেক্রেটারী অব স্টেট—তাঁর সঙ্গে ক্রফ্‌ট, টার্নবুল প্রভৃতি চারজন—আর সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স—তার সঙ্গে চারজন করাচী হয়ে দিল্লী পেঁছে ইণ্টারভিয়ু কনফারেন্স এবেলা ওবেলা দিনের পর দিন করে গেলেন। কংগ্রেস মুসলীম হিন্দু মহাসভা শিখদল তপসীলী জাতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান নানান প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করলেন। সবই হয়তো মিটতো বা মিটে যেতো। কিন্তু কংগ্রেস আর মুসলীম লীগের মিলন অসম্ভব হয়ে উঠল। এদের দাবি আর ওদের দাবিতে পূর্ব পশ্চিমের তফাত! জিন্না বলেন—মিলন হয় না। মুসলীমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। হিন্দুর সঙ্গে তার মিল হয় না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত মুসলমান কংগ্রেসে অবশ্য আছেন এবং তাঁদেরও কিছু কিছু অনুগামী আছে কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানদের অধিকাংশই জিন্না সায়েবের অনুগামী দৃঢ় সমর্থক।

স্বাধীনতা—সে যে ধরনেরই হোক—ইংরেজ ভারতবর্ষকে দিতে রাজী হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি অখণ্ড ভারতবর্ষ—মুসলীম লীগের দাবি পাকিস্তান—শিখদের তরফ থেকে মাস্টার তারা সিংয়ের দাবি শিখিস্তান। এমন অনেক স্থানের দাবি। এমন কি শোনা যাচ্ছে কলকাতার একজন শিল্পী ও সাহিত্যিক মিশনের কাছে দাবি পাঠিয়েছে—আমাদের দাবি 'শিল্পী-সাহিত্যিকস্তান'। হয়তো রসিকতা বা ব্যঙ্গ—তবে ও থেকেই কত স্থান—কত

রাজপুতের কত স্বতন্ত্র হাঁড়ি এবং উনোনশালের দাবি তা ও থেকেই বোঝা যায়।

অজয়ের এটা বেশ ভাল রসিকতা বলে মনে হল। অনেক সন্ধান করে লোকটিকে দূর থেকে দেখে এল।

কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য বামপন্থী দলগুলি বিপ্লবের কল্পনা করছে। প্ল্যানও করছে। কম্যুনিস্ট পার্টির এখন অবস্থা ভাল নয়। যুদ্ধের সময় রাশিয়ার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে ইংরেজদের যুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সারা দেশে অবিশ্বাস এবং অনেকটা যেন অবজ্ঞা ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবু ওরা মিটিং করছে—স্লোগান দিচ্ছে—হিন্দু মুসলমান এক হো যাও। জিন্না গান্ধী মৈত্রী চাই। মিটিংয়ে বলছে পাকিস্তান মেনে নাও। প্রফেসর গঙ্গাধরের কল্পনার কথা বলছে। কিন্তু তবুও কিছু হল না। ক্যাবিনেট মিশন ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন করতে পারলে না জিন্না সায়েব যোগ দিতে রাজী হলেন না। ২৯শে জুন ক্যাবিনেট মিশন ফিরে গেল এখানে 'কেয়ারটেকার" গভর্নমেন্ট তৈরি করে দিয়ে গেল। তার মধ্যে সার আকবর হায়দারী ছাড়া সবাই ইংরেজ।

৭ই জুলাই গান্ধীজী বক্তৃতায় বললেন -"I said in one of my speeches at Delhi that I saw darkness all around me. I told the Working Committee that as I could not see light I could not advise them." কিন্তু কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর ইংরেজ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে নিষেধ করেছেন।

হায় গান্ধীজী! অজয়ের মনে হল, গান্ধীজী তাঁর জীবনের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তবু ভাল। ১০ই জুলাই বোম্বাইএ শিবাজী পার্কে দু'লক্ষ জনসমাবেশের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন -We have therefore prepared ourselves for both—for a struggle to wrest freedom and also to be ready to take the responsibility of running the Govt. of a free and independent India."

২৯শে জুলাই বম্বেতেই মুসলীম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের অভিপ্রায় বর্জন করে জিন্না সায়েব ডাইরেক্ট অ্যাকসনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বললেন— "Whereas tht Congress is bent upon setting up a Caste Hindu Raj in India······the council of All India Muslim League is convinced that the time has now come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan and assert their just rights and to vindicate their honour and to get rid of the present slavery under the British and contemplated future Caste Hindu domination."

* * *

এর মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষের ব্যক্তিজীবন সংসার-জীবন ঝড়ঝাপটানির মধ্যে গাছ আর পল্লবপত্রের মত আন্দোলিত হচ্ছিল। যারা রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছে তারা উল্লাসের সঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বন্ধনহীন টিনের চালের মত ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে। সম্মুখে যা পাবে কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাবে।

এই অবস্থায় অজয় চিঠি পেলে—বাড়ির নায়েব লিখেছেন—"এখানে মা এতদিন কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই। তবে দেহ তাঁহার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। ডাক্তারেরা আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। কারণ ইহার একমাত্র মনের দুঃখ এবং চিন্তা—ইহাতে তাঁহারা সকলেই একমত। এবং সে সব চিন্তা ক্ষোভ আপনাকে লইয়া একথা আপনি অবশ্যই বুঝিতেছেন। ডাক্তারেরা বলেন—রোগী যেখানে নিজে বাঁচিতে চাহেন না—সেখানে কোন ডাক্তার বৈদ্য কোন

ঔষধই খাটে না। আমি চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তিনি রাজী হন নাই উপরন্তু আমাকে শপথ করাইয়াছিলেন আপনাকে এসব কোন কথা না লিখিতে অথবা ডাক্তার বৈদ্যদের কোন কথা না বলিতে। আজ শপথ ভঙ্গ করিয়াই লিখিতেছি। আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া মাকে কলিকাতা লউন অথবা আপনি এখানে আসুন।"

কিন্তু অজয়কে সেই দিনই তাদের পার্টি থেকে বললেন—তোমাকে চট্টগ্রামে যেতে হবে। পারবে?

অজয় ভাববার অবকাশও পেলে না—ভাবলেও না। বললে—পারব।

—খুব গোপন চিঠি নিয়ে যেতে হবে। যাবে—যাচ্ছ যেন তোমাদের সম্পত্তি বাড়িঘরের খোঁজখবর করতে। কেমন?

—হ্যাঁ।

—সেখান থেকে এসেছ অনেক দিন—সব মনে আছে?

—আছে। আর খুব বেশী দিন আর এমন কি! আমি যখন আসি তখন ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেছি। সব মনে আছে আমার।

—গুড! তা হলে আজই চলে যাও! অবিশ্যি একা যাবে না। রতনবাবু যাবেন—তুমি সঙ্গে যাবে কিন্তু আলাদা।

এসেছে আদেশ
বন্দরে বন্ধন-কাল এবারের মত হল শেষ।
মা কাঁদিছে পিছে—
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে—
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে—

বাজুক তবু যেতে হবে। মানুষ যায় যুগ-যুগান্ত ধরে। মহা-বিপ্লব এইভাবেই ভয়হীন নাবিকেরা তাদের নৌকোর পালে বয়ে নিয়ে আসে। যেতে হবে বৈকি!

ট্রেনে চাপবার সময় ওই লাইন কটিই বার বার সে আবৃত্তি করছিল। মায়ের মুখ মধ্যে মধ্যে ভেসে উঠছিল। হঠাৎ একসময় মনে পড়ল সেই সঙ্গে আর একখানা মুখ। অমিতার মুখ!

অমিতা কোথায় গেল এসময়। কোথাও যাবার তো কথা নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী ডাক্তার মিত্রকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে শেষে লিখেছেন—মেয়েটি বলেছে সে রাজনৈতিক দলের কর্মী। তাকে হয়তো রাজরোষে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হবে। সংগ্রামের দিন আসছে। সে মিশনে থাকলে—মিশন তাকে আশ্রয় দিলে তার আঁচ মিশনকে লাগবে। সুতরাং তাদের আশ্রয় সে নিতে পারবে না।

ওরই মধ্যেই তো সে বলেছে—সে নিরুদ্দেশ হবে না—কোথাও নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আজকের এই আহ্বান থেকে দূরে থাকবে না।

আজ অকস্মাৎ তার মনে হল ওই মেয়েটির প্রতি তার একটা অদম্য আকর্ষণ আছে। আশ্চর্য মেয়ে। এ মেয়ে প্রেয়সী হলে উপরের নির্দেশে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকো খুলবার সময় দোরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছবে না, সেও সঙ্গে এসে কোমরে কাপড় বেঁধে নৌকোয় চড়ে বসে বলবে—তুমি ধরো হাল—বলে দাঁড়খানা টেনে তুলে নেবে। আশ্চর্য মেয়ে।

চট্টগ্রামের আর্মারি রেইড কেসের আন্দামানের আসামীরা প্রায় দল বেঁধে আন্দামানে

থাকতেই কম্যুনিস্ট হয়ে গেছেন। শুধু দু'চারজন ছাড়া—লোকনাথ বল বড়দের মধ্যে ব্যতিক্রম। তার ফলে এবং যুদ্ধের সময় কম্যুনিস্টদের উপর ইংরেজদের বিশ্বাস এবং সুগোপন পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চট্টগ্রামের তরুণেরা প্রায় সব কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট যদিবা দুটো চারটে থাকে তো তারা এখন দল বেঁধে ঠিক শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল না। এখন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষ এই যুদ্ধের নির্মম পেষণ সহ্য করেও আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে। ডাকলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রতন সিংহ আর অজয় চলেছে নির্দেশ নিয়ে।

ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হয়েছে। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট হয় নি লীগের প্রত্যাখ্যানের জন্য। কংগ্রেসকে একা দিলে কংগ্রেস যাবে। নেবে। না ডাকলে জওহরলাল বলেছেন—"We have therefore prepared ourselves for both—for a struggle to wrest freedom" —বাকিটা হবে না —ইংরেজ দেবে না।

লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকসনের ভয় দেখিয়েছে। ডাইরেক্ট অ্যাকসন—কি করতো তা কেউ জানে না- হয়তো জিন্না লিয়াকৎ আলিরা জানেন—তবে সে একটা আন্দোলন—কয়েকটা মিটিং কয়েকটা প্রসেসন ছাড়া কি হবে?

কংগ্রেস আবার একটা ওই ননভায়লেণ্ট কিছু করবে। এর মধ্যে সত্যকারের কাজ করতে হবে তাদের। বিপ্লবের আগুন এই শুকনো অরণ্যের মত ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে ধরিয়ে দিতে হবে। চট্টগ্রাম ফেণী প্রভৃতি জায়গায় মিলিটারীদের অনেক অস্ত্র আছে। মিলিটারী রয়েছে এখনও। যুদ্ধ শেষের পর চলে যেতে যেতেও এখনও রয়ে গেছে। তবুও ওই অস্ত্র সরিয়ে কাজ করতে হবে!

তার গাড়ির দরজার সামনে লুঙিপরা মাথায় টুপিপরা রতনবাবু এসে দাঁড়ালেন। রতনবাবু সাধারণ মুসলমান সেজে যাচ্ছেন থার্ড ক্লাসে। রতনবাবু দাড়ি গোঁফ গজিয়ে নিয়েছেন কিছু দিনের মধ্যে। রওনা হবার আগে ছেঁটেছুটে নিয়ে একেবারে খাঁটি মুসলমান সেজেছেন। এদেশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ওখানে যাচ্ছে—তার এক ভাইঝিকে নিয়ে একজন রাহমুদ্দিন পালিয়েছে—সে বলেছে তার বাড়ি চট্টগ্রাম শহরে—তারই খোঁজে। আর অজয় আপন পরিচয়েই চলেছে তাদের বাড়িঘর সম্পত্তি সবই সেখানকার কর্মচারীরা তাদের অনুপস্থিতিতে আত্মসাৎ করেছে তারই উদ্ধারের জন্য। দশজন বিশেষ ব্যক্তিকে বলবে। মামলা করার ব্যবস্থা করবে।

সে যাচ্ছে ইণ্টার ক্লাসে। রতনবাবু এসে তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন যেন। তারপর বললেন —আরে অজয়বাবু না?

অজয় বললে—কি মঞ্জুর শেখ সাহেব—তুমি কোথায়?

রতনবাবুর নাম মঞ্জুর শেখ—তার বাড়ি বর্ধমানের মঙ্গলকোট। বর্ধিষ্ণু চাষী গৃহস্থ।

—আমি চাটগাঁ যাচ্ছি বাবু! একটা কাণ্ড। শুনেন নি? আমাদের গেরামে এক শয়তান মৌলবী এসেছিল ইস্কুলে—

—শুনেছি। তা—

—হাঁ তার বাড়ি চাটগাঁ। যাব সেখানে। আপনি?—

—আমিও ওখানে যাচ্ছি। আমাদের বাড়িঘরের কথা তো জান!

—জানি না! শুনেছি বইকি। ওঃ, এমন বেইমান নিমকহারাম আদমী—অঃহহ!

কথা বলতে বলতে অজয় প্লাটফর্মে নেমেছিল—রতনবাবু তাকে কতকগুলো কথা চুপিচুপি বলে চলে গেলেন। সাবধান করে দিয়ে গেলেন, যেন রাজনীতি নিয়ে কোন কথা না বলে।

রাজনীতি এখন সর্বত্র। হাটে মাঠে ঘাটে ট্রামে বাসে ট্রেনে—কোথায় নয়! গান্ধী

জিন্না—জিন্না গান্ধী। জওহরলাল। এই সবের মধ্যে হঠাৎ সমস্যার সমাধানে একটি নাম উঠে পড়ে—সে নাম নেতাজী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র! তিনি এলেই সবের সমাধান হয়ে যাবে!

কেউ সে কথায় প্রতিবাদ করলে দল বেঁধে মানুষেরা হিংস্র ধারালো কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠে—তুমি কম্যুনিস্ট?

* * *

চট্টগ্রামে নেমে সে বাবার বন্ধু এবং উকীল অপরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠল। সমাদরের সঙ্গেই তাঁরা তাকে আহ্বান করলেন।—তুমি? এস। এস। এস। কিন্তু এ কেমন আসা। খবর দিলে না, এলে একলা, তোমার মাকে আনলে না। সঙ্গে তোমার নায়েব গোমস্তা কেউ নেই!

অজয় একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু সামলে নিতে দেরি হল না। বললে—হঠাৎ মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বাড়িঘরের জন্যে। তিন চার দিন পর পর স্বপ্ন দেখলাম, চট্টগ্রামের বাড়িতে এসেছি, ঘরগুলো খোলা হচ্ছে। উঠোন-টুটোন পরিষ্কার হচ্ছে, দোতলার বারান্দায় খেতে বসেছি—মা সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। একলা আমি খাচ্ছি না আমার সব ছেলেবেলার বন্ধুরা খেতে বসেছে। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ল চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম, মিলিটারীর ওরা বাড়িটাকে কোথাও ভেঙেছে কোথাও দেওয়াল দিয়েছে। উঠোনটায় এয়ার রেড শেল্টার করেছে। সব প্রায় তছনছ করে দিয়েছে। কিছুতেই আর থাকতে পারলাম না; চলে এলাম।

—এসেছ বেশ করেছ। আসতে হবে, চেষ্টা করতেও হবে। তোমাদের নায়েব এসেছিলেন। আমিই খবর দিয়েছিলাম। তোমার বাবার মুন্সী মামলা মকদ্দমায় ঝানু—আইন সে ভালই জানে—সব আটঘাট বেঁধেই সব করেছে। আদালতে খোঁজ করে নথিপত্র সব দেখেছি। এক একটা জোতকে বাকি খাজনার দায়ে দুবার তিনবার নিলেম করিয়ে হস্তান্তরের সে গোলকধাঁধা বানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া কঠিন। তবে বাড়িটা ফিরবে। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সের জন্যে নিলেম—সে টেঁকবে না। আর তোমার মা এলে আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা ব্রিচ অব ট্রাস্টের মামলা আগে করতে হবে। বলতে হবে এ সবের কোন খবরই তোমরা জান না। অস্বীকার করতে হবে। ভাল কথা—তোমার বয়স হল কত?

—বাইশ বছর।

—সাবালক হয়েছ—নাম জারিটারি করেছ?

—বোধ হয় না। আমি তো অ্যারেস্টেড হয়ে ছিলাম ডি-আই রুলে। এই তো ক'মাস ছাড়া পেয়েছি।

—এক কাজ কর, এইবারই তুমি এখানে নামজারির দরখাস্ত করে যাও। একটা এফিডেবিট করে যাও আর এখানকার কাগজে নোটিশ দিয়ে যাও যে এবার থেকে বিষয়ের সব কিছু তোমার সইয়ে হবে। তোমার মায়ের যে আমমোক্তারনামা মুন্সীকে দিয়ে গিয়েছিলেন অটোমেটিক্যালি অকেজো হয়ে যাবে। কিন্তু আর পলিটিক্স তুমি করো না। বাড়ি উদ্ধার কর, ওটা হবেই। ওকালতি পাস কর, এসে বাপ-পিতামহের পাটে বসো।

পরের দিন। সে তাদের বাড়ি দেখতে গেল।

অপরেশবাবুর ছেলে সমরেশ তার বাল্যবন্ধু।

সে বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছে। তাকে নিয়েই সে তাদের বাড়ির দিকে গেল। সমরেশ তাকে পথে বললে—কি রে তুই আবার নেতাজী কোত্থেকে করলি?

অজয় তার মুখের দিকে তাকালে।

সমরেশ ঠোঁট দুটো উলটে বললে—একটা ফ্যাসিস্ট—

—ও—তুই বুঝি ? বাকিটা না বলেই অজয় স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে।

সমরেশ বললে—হ্যাঁ, আমি কম্যুনিস্ট। তবে পার্টি মেম্বার নই। বিশ্বাস করি কম্যুনিজমে।

—থাক তা হলে সমরেশ। ও তর্কে কাজ নেই। আমি তোদের বাড়ি উঠেছি না জেনে। তবে উঠেছি যখন তখন তো উপায় নেই। আর বাড়িঘর এগুলোর জন্যে তোর বাবাই আমার সব থেকে বড় ভরসা। আমার—

বলতে বলতে সে থেমে গেল।

তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই কি তাদের বাড়ি ? সেই বাড়ি ? নীচের উঠোনটায় সারি সারি খিলেনকরা এয়ার শেল্টারগুলো কবরের মত যেন কবরখানা বানিয়ে ফেলেছে। এল শেপের বাড়ি—নীচে উপরে প্রশস্ত বারান্দা, জোড়া জোড়া থামের মাথায় তৈরী ছিল—থামে থামে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে জোড়া এবং ঘেরা ছিল। নীচের বারান্দার সামনেটা ব্যাফল ওয়াল দিয়ে বন্ধ করা। উপরের বারান্দার রেলিং ছাড়িয়ে পাঁচিল গেঁথে বারান্দাগুলোকে ঘর তৈরি করে কুশ্রী করে তুলেছে।

স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। এই উঠোনে তাদের ব্যাডমিণ্টন গ্রাউণ্ড ছিল। তারা ব্যাডমিণ্টন খেলত। একটা খুব ভাল আম আর পেয়ারার গাছ ছিল। ছেলেবেলা পেয়ারাগাছে ছিল তাদের বাসা। সে আর তার সঙ্গীরা। এই সমরেশ সুদ্ধ থাকত। অপরেশবাবু যেমন তার বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন সমরেশও ছিল তেমনি তার বন্ধু। আজ সমরেশ আর সে বিচিত্রভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে সন্দেহের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে।

হঠাৎ সমরেশ তার হাত চেপে ধরলে।

চমকে উঠে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে অজয় বললে—কি ?

—তুই কি জন্যে এসেছিস চাটগাঁয়ে ?

—কেন ? এই বাড়ির টানে— এই বাড়ি উদ্ধার—

—না।

—মানে ?

—মানে আমি জানি ! তুই পার্টির কাজে এসেছিস। কি কাজ বল !

—ছাড়। হাত ছাড়।

—না, তোকে বলতে হবে !

—সমরেশ ! বলে সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হনহন করে চলে এল। পথে সে থমকে দাঁড়াল। একটু ভেবে নিয়ে ওখানকার খ্যাতনামা কংগ্রেসী উকীলের বাড়ি গিয়ে উঠল।

তিনি প্রথম বয়সে গঙ্গাধরবাবুর জুনিয়র ছিলেন। কিন্তু অজয়ের বাপের সঙ্গে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনিও তাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সমরেশের বৃত্তান্ত না-বলে অজয়ের উপায় ছিল না। শুনে তিনি বললেন—হ্যাঁ। অপরেশের ছেলে ওদের একজন চাঁই বটে। কিন্তু—

একটু ভেবে নিয়ে বললেন—দেখ, অপরেশের ওখান থেকে চলে আসাটা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকবে। তা ছাড়া—। তুমি যদি বিষয়ের জন্যে এসে থাক তবে ফিরে যাও। আজই ফিরে যেতে বলব। এখন সময় নয়। দেশের অবস্থার কথা ভেবে বলছি। ১৬ই আগস্ট লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডিক্লেয়ার করেছে। বাংলাদেশে সুরাবর্দী সাহেব নিজে এটাকে সার্থক করবার ভার নিয়েছেন এ সময় চট্টগ্রাম অত্যন্ত বিপদের এলাকা। তুমি চলে যাও।

আজই চলে যাও কলকাতায়। আর যদি সমরেশ যা বলেছে তার জন্যেই এসে থাক তা হলে—।

তিনি থেমে অজয়ের মুখের দিকে তাকালেন। অজয়ও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন—শরৎ বোস মশায় কংগ্রেসের সঙ্গেই কাজ করবেন। করার মধ্যে বাধাও নেই। লক্ষ্য এক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। পথ হয়তো বিপ্লবের, আগুনই যদি জ্বলে একটু আধটু আলাদা হবে।

অজয় বললে—আমি থাকতেই এসেছি।

একটু হেসে তিনি বললেন—চল তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাই। কিংবা তুমি এখানেই থাক। আমি নিজে গিয়ে তোমার ওখানে কি আছে নিয়ে আসছি। অপরেশকে বলে আসছি। অপরেশ দুঃখিত হবে কিন্তু উপায় কি? কি বল?

কোথায় দিগন্ত। সব যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রত্যূষ আসছে আসছে করে যখন মানুষ উল্লসিত হয়েছিল তখনই ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার এসে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে যেন ঘোষণা করে দিলে—এ রাত্রি নয় এ চির অন্ধকার, রাত্রি হলে চির রাত্রি—এর অবসান নেই, এর অবসান নেই—হয় না।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে ভাবছিল উমা-নমিতা। হরিপ্রিয়া তার পালিকা মায়ের মৃত্যুর পর সে কাশী এসে হরিপ্রিয়ার দান অলংকার নগদ অর্থ যেগুলি হরিপ্রিয়া তাকে দিয়ে গিয়েছিল সেগুলি সে ফিরে দিতে চেয়েছিল ডাক্তার মিত্রকে। ডাক্তার মিত্র তা নেন নি। সে কিছুতেই নিজের মনকে বুঝাতে পারে নি। অন্যে যে যা বলুক, ডাক্তার মিত্র যতই বলুন হরিপ্রিয়া দেবীর হার্টের অবস্থা এমনই ছিল যে যে-কোন সময় যে কোন কারণে এমন কি বাহ্যিক কোন কারণ না থাকলেও মৃত্যু ঘটতে পারত। হয়তো ঘুমিয়ে থাকা অবস্থাতেও ঘটতে পারত। কিন্তু সে জানে মৃত্যুর কারণ সে।

কাশীতে সেই জ্বর-বিকারের মধ্যে তাকে মা বলে ভ্রম করে হরিপ্রিয়ার আশ্রয়ে এসে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—তারপর বসন্ত বের হল। সে মারাত্মক ধরনের বসন্ত। হরিপ্রিয়ার আবেগের বশে ভ্রম হয়েছিল—একরকম ভ্রম বইকি—ভেবেছিলেন তাঁর মরা মেয়েই যেন তাকে ডাকছে এই বসন্ত রোগাক্রান্ত মেয়েটির মধ্য থেকে। তাঁর মেয়ে শুচি-নমিতারও বসন্ত হয়েছিল—কিন্তু বসন্ত বের হয় নি ভিতরে গিয়েছিল। হরিপ্রিয়া তাকে শিয়রে বসে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। অতি গোপনে অন্তরে বিশ্বাস ছিল এই মেয়ের রোগাক্রান্ত দেহের মধ্যে তাঁর মৃত মেয়ের আত্মাই ফিরে এসেছে।

মধ্যে মধ্যে শংকরাচার্যের মহারাজ অমরুর মৃতদেহে আবির্ভাবের কথা বলতেন। সে ভ্রম তাঁর ভেঙেছিল পরে। উমার রাজনৈতিক দলে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়ার পর।

বলতেন থিয়েটারি ভঙ্গীতে—ভুল—ভুল। সব ভুল! এ জীবন ভুলে ভরা মোর! সে সব অনেক কথা। উমা বুঝত, তার ভুরু কুঁচকে উঠত! তবুও তাঁর আশ্রয় ছেড়ে যেতে পারে নি। সাহস হয় নি। আঁকড়ে ধরে পড়েছিল; আশ্রয়-চ্যুতির ভয়ে অতীত জীবনের কোন কথাও সে তাঁকে বলে নি।

কাশীতে যখন তার মা আরাধনা দেবীর নাম নিয়ে হরিপ্রিয়া দেবীর পাশের বাড়িতে বাসা নেয় তখন উমাকে বার বার বলেছিল—খুব সাবধান উমা, কদাচ মুখ ফুটে বলবিনে আসল নাম, কোথায় বাড়ি—এসব কথা। প্রকাশ হলে এবার আর আমার রক্ষা থাকবে না। আমি যখন ট্রেন থেকে নেমে পালিয়েছি তখন ওরা আর কোন কথা বিশ্বাস করবে না। কথাটা তার মনের মধ্যে এমন একটা ভয়ের সঞ্চার করেছিল যে কখনও সে সেসব কথা হরিপ্রিয়াকে বলতে

পারে নি। এখন সে অনেক বুঝেছে, বড় হয়েছে, রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে, শিখেছে অনেক ; সে জানে এখন পরিচয় প্রকাশে কোন ক্ষতি নেই, ভয় নেই, তবু বলতে পারে নি—বলে নি। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও কাউকে বলে নি। অজয়কে দেখে অবধি আবার আর একটা প্রতিবন্ধকতা যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উমা এলাহাবাদের ভটচাজবাড়ির মেয়ে এসে হরিপ্রিয়ার অন্ন লবণ এবং আশ্রয় গ্রহণ করেছে এ কথা বলতে যেন তার বেধেছে। তার থেকে হরিপ্রিয়ার মেয়ে সেই পরিচয় তার ভাল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। আরও মনে হয়েছে—পরিচয় দিলে যেন হরিপ্রিয়ার মানসম্ভ্রম অস্বীকার করে তাকে অপমান করা হবে। প্রকারান্তরে বলা হবে নিতান্ত অদৃষ্ট-ফেরে এই অশুচি আশ্রয়ে সে এসে পড়েছে বটে কিন্তু অশুচিতা ওর রক্তে নেই। তার থেকে এই পরিচয় ভাল।

তবে বিপদ ঘটেছিল অন্যত্র। হরিপ্রিয়া এবং তার মনের মধ্যে। সে পরিচয় চাপা দিয়ে তাকে ভুলতে পেরেছিল কিন্তু যে অন্যায় নির্যাতনে তারা এমন করে জন্তু-জানোয়ারের মত ছুটে বেড়াল তা ভুলতে পারে নি। একটা কঠিন আক্রোশ তার বুকে জমে আছে। এই দেশের এই যুগের বাতাস তাকে জমিয়ে জাগিয়ে রেখেছে, তাকে আরও শক্ত আরও আয়তনে বাড়িয়ে তুলেছে। তারই জন্য সে এমন উন্মত্ত আবেগে নেতাজীর দলের আগুন নিয়ে খেলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইংরেজ রাজত্বের ধ্বংস না হলে তার তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আর একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে তার। সে আক্রোশ এলাহাবাদের সেই মুসলমান ব্যারিস্টারের ছেলেটির উপর।

সে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে বিশ্রামের সময় নানান কল্পনা করত। কল্পনা করত—বিপ্লব বাধবে। নেতাজী আসবেন। তাঁর কণ্ঠস্বর রেডিয়োতে শুনে ভারতবর্ষ উথলে উঠবে। আগুন জ্বলবে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি "কদম কদম বাড়ায়ে যা" গাইতে গাইতে হাতে মশাল আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে মার্চ করে চলবে। নগরের পর নগর গ্রামের পর গ্রামে পতাকা উড়বে। দেশদ্রোহীদের বিচার হবে। দণ্ড হবে। কল্পনা করত—এলাহাবাদে গিয়ে তারা ঢুকছে—গোটা এলাহাবাদ তাদের সংবর্ধনা করছে। সে যাবে পতাকা বয়ে নিয়ে। গিয়েই সেখানে সে নেতাজীর সামনে দাঁড়াবে অভিবাদন করে। বলবে—আমার নালিশ আছে ! বিচার চাই আমি।

নেতাজী বলবেন—বল তোমার অভিযোগ।

সে বলবে—একটি বিপন্ন দরিদ্র সংসার। মা আর মেয়ে। এগারো বছরের মেয়ে, মায়ের বয়স ত্রিশ। সংসারের কর্তা সামাজিক অপমানে নিরুদ্দেশ। মা বাঙালীদের ছেলেদের নিয়ে পাঠশালা করে কোন রকমে দিনযাপন করেন।

বলে যাবে সে সমস্ত ইতিহাস। বলবে সে সেই লীগপন্থী ব্যারিস্টারের ছেলের কথা। বলবে সে কাশীর পেনশন-ভোগী সরকারী কর্মচারীর ছেলেটির কথা—যে তার দিদির আত্মহত্যার কারণ, তার বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ। অভিযোগ এই দুজনের বিরুদ্ধে। তার বিচার চাই।

বিচার হবে। দণ্ড হবে। কি দণ্ড ?

তাদের দুর্দশার কারণ লীগপন্থী ওই ব্যারিস্টার পুত্র ফৈজুল্লার উপর মৃত্যুদণ্ড চাইবে সে। আর অনুমতি চাইবে সে ফায়ারিং স্কোয়াডের মধ্যে বন্দুক ধরে দাঁড়াবার।

সাক্ষী মানবে সে অজয়কে ; তার থেকে তো বেশী কেউ জানে না। সাক্ষী মানবে সে রঘুনন্দন সিংকে, তিনি চোখে দেখেছিলেন—তার মা কি অবস্থায় বেরিয়ে এসে অজয়কে বুক দিয়ে আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। সাক্ষী মানবে সে নলিনী জেঠীমাকে দুনিদাকে ভুনিদাকে।

নলিনী জেঠীমা গান্ধীজীর শিষ্যা। তিনি হয়তো বলবেন—উমা পারিস তো ওকে

ক্ষমা কর মা। তুই ভারতবর্ষের মেয়ে।

সে বলবে—না।

নলিনী জেঠীমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলবেন—তা না করিস তুই নিজে বন্দুক ধরিস নে মা। অন্ততঃ এই কথাটুকু আমার রাখ।

সে বলবে—।

কি বলবে? না? না। ওই কথাটুকু রাখবে!

* * * *

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে সে এই সব কথাই মনে করছিল আর ভাবছিল কল্পনার কিছুই বুঝি জগতে কোনকালে সত্য হয় না!

নেতাজী এলেন না।

সেদিন হরিপ্রিয়া মার মৃত্যুর আগের দিন—যে দিন সে গোটা দিন রাত্রি পার্টির প্যাম্ফলেট সাইক্লোস্টাইল করা সেগুলি ভাঁজ করা ঠিকানা লেখার কাজ নিয়ে ছিল। সেই দিন তার কানে এসেছিল একটা কথা।

একজন বড় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, নেতাজী আসছেন—আসবেন, এইটের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। মারাত্মক ভুল হচ্ছে! তিনি না আসতে পারেন!

আর একজন প্রায় আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিলেন—চুপ করুন!

—চুপ আমি করলাম কিন্তু—

—থাক না কিন্তু এখন!

কথাটা থাকে নি। চুপ হয়নি এতে। তর্ক, শেষ পর্যন্ত উষ্ণ বাদানুবাদ হয়েছিল।

একজন বলেছেন—নেতাজীর আসন শূন্য হলে ভাববেন না আপনি বসবেন!

যিনি বলেছিলেন তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিলেন—শাট্ আপ!

—কিসের শাট্ আপ!

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যিনি কথাটা প্রথম বলেছিলেন তিনি আপিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে!

একটি দৃঢ় কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল—এ কথা যে মুখে আনবে বা উচ্চারণ করবে তার স্থান ফরওয়ার্ড ব্লকে নেই।

পাশের ঘরে উমা কাজ করছিল আরও দুজনেরই সঙ্গে। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল কয়েকবার। সকলের দৃষ্টির মধ্যেই একই ব্যাকুল প্রশ্ন।

—সে কি? নেতাজী?

চোখ ফেটে কান্না এসেছিল তার। সব যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছিল—হে ভগবান!

রাত্রি তিনটে পর্যন্ত কাজ করে তারা সকলেই ওই ঘরেই চেয়ারে বসে ঠেসের উপর ঘাড় রেখে হতাশ দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। এরই মধ্যে দু'দশ মিনিটের তন্দ্রা কারুর এসেছিল কারুর আসে নি। উমা বা অমিতার আসে নি।

পরদিন সকালে উঠে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে হতাশা ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। হরিপ্রিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতীক্ষা করছিলেন।

তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী—বড় শিল্পী। কিন্তু যে সমাজে তিনি আজীবন বাস করেছেন সে সমাজের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ; মন সন্দেহাকুল।

একটি যুবতী মেয়ে সারারাত পুরুষ-সাহচর্যে কোন্ কর্মের মধ্যে কাটিয়ে আসে?

তিনি তিরস্কার করেছিলেন।

কথাগুলি স্মরণ করতেও মনে দুঃখ পায় অমিতা। সে বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করে বলেছিল —এর পর আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। দয়া করে আপনি আমাকে মুক্তি দিন—রেহাই দিন। আমি চলে যাই—

— চলে যাবে ? স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন হরিপ্রিয়া।

—হ্যাঁ, চলে যেতে চাই। অনুমতি চাচ্ছি আপনার। আপনার ঋণ আমার শোধ হবার নয়। তাই অনুমতির অপেক্ষা করছি। নইলে চলে যেতাম! এবং অনুমতি না দিলেও চলে যাব!

—চলে যাবে ?

তাঁর থিয়েটিক্যেল হিস্টিরিয়া আত্মপ্রকাশ করেছিল। আবার বলেছিলেন—চ-লে-যা-বে ?

দৃঢ়স্বরে সে বলেছিল -যাব! আর আমার থাকা উচিত নয়। অধিকার নেই আমার।

তিনি বুকে চাপড় মেরে চিৎকার করতে শুরু করেছিলেন। এবং তারই মধ্যে একটা আর্তনাদ করে বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

তার দেওয়া গহনা কিছু টাকা তাকে ডাক্তার মিত্র দিয়ে বলেছিলেন - এ তোমার। তোমাকে দিয়ে গেছেন। একটি রুমালে বাঁধা তিনশো কয়েক টাকা ছিল—তার মধ্যে একটি কাগজের টুকরোয় লেখা ছিল—অমিতার মায়ের টাকা—অমিতার নিজস্ব!

দুটি মেডেল ও ওই তিনশো টাকা নিয়ে অমিতা কাশীতেই রয়ে গেছে সেই তখন থেকে। ফেরে নি, ফিরতে ইচ্ছে হয় নি।

ভারতবর্ষের আকাশে অন্ধকার আবার প্রগাঢ় হয়ে এল। এ অন্ধকার বুঝি কাটবার নয়! এ চিররাত্রি—অথবা চির অন্ধকার। এর শেষ নেই। নইলে নেতাজী—তিনি—! ক্ষণেকের জন্যে চিন্তা স্তব্ধ হয়। নেতাজী নেই? তাঁর দলের লোকও বলে ?

হিন্দু মুসলমান—বিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে ?

তার সব কল্পনা সব আকাঙ্ক্ষা—মিথ্যে হয়ে গেল ?

কাশীতেই একটি পরিবারে সে আশ্রয় করে নিয়েছে। বারো বছর বয়সে—দু বছর সে এখানে ছিল। কাশীর পথঘাট সে কিছুই ভোলে নি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল তাদেরও মনে ছিল। খুঁজে সে তাদের ওখানে গিয়ে তাদের পূর্বপরিচয় দিয়ে —নতুন পরিচয় করে নিয়েছিল। এরা বাঙালী নিতান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত। বৃদ্ধা বিধবা তার বিধবা কন্যা তার কুমারী কন্যার সংখ্যাই বেশী। কোন ক্ষেত্রে পুত্রও দু'একটি আছে। কোন ক্ষেত্রে দৌহিত্রীর বিবাহ হয়েছে—জামাইটিও থাকে সংসারে।

বাঙালী তীর্থযাত্রী এলে তাদের ঘর ভাড়া দেয়।

এমনি একটি বাড়িতে ছোট একটি কুঠরী ভাড়া করে সে আছে। পাড়ায় ঘুরে কাশীর বাঙালী বন্ধু ডাক্তার মিত্রের সাহায্যে একটি প্রাইভেট ট্যুশনি যোগাড় করে নিয়েছে। এবং ভাবছে···কি করবে ?

ফিরে যাবে এলাহাবাদ ? নলিনী জেঠীমা—ভুনিদা দুনিদা—মুখুজ্জে দাদুর কাছে গিয়ে বলবে—আমি উমা। আমি ফিরে এলাম ?

এতদিনকার ইতিহাস বলে বলবে—আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। নইলে মেয়েছেলে আমি কোথায় যাব ? হরিপ্রিয়া দেবীর কাছে থাকার কথা না বলে বলবে—এক দয়াবতী মহিলার আশ্রয়ে ছিলাম। না—হরিপ্রিয়া দেবীর আশ্রয়ে থাকার কথা স্বীকার করে বলবে— তোমরা বিশ্বাস কর আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করে বলছি—আমি পবিত্র—আমি পবিত্র—আমি পবিত্র। বিশ্বাস না হয় সাক্ষী মানছি আমি অজয়বাবুকে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর!

না—কলকাতায় ফিরে যাবে ?

অজয়বাবুকে বের করে বলবে—আমি উমা। সাধনা দেবীর মেয়ে। যে সাধনা দেবী আপনাকে ফৈজুল্লার ভাড়াটে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে পুলিসের হাতে এ্যারেস্টেড হয়েছিলেন। যাঁর মেয়ে রমা জীবনের লজ্জা মাথায় করে নিয়ে আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। যাঁকে আপনার মা গ্রামের ইস্কুলে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর ছোট মেয়ে উমা। মাকে যে চাকরিটা দিতে চেয়েছিলেন সেটা আমাকে দেবেন দয়া করে ?

ভেবে কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে নি।

কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না! মন বলছে, এই করে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে। এম এ পাস করতে পারে। ডাক্তার হতে পারে। পারে না ?

ভারতবর্ষের ভাগ্যের দিগন্তে যে অন্ধকারই নেমে আসুক মেয়েদের ভাগ্য পালটে তাদের জন্যে অনেক দোর খুলেছে এতে সন্দেহ নেই।

পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একদিন অজয়ের সঙ্গে দেখা করবে।

অনেক···অনেক কাল পর। সেই প্রবীণ প্রৌঢ় বয়সে। যখন সব রোমান্সের বিচিত্র রঙ-গুলি শুধু সাদা রঙের প্রলেপে শুধু সাদা হয়ে যাবে !

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সে উঠল তাড়াতাড়ি। তাকে ট্যুশনিতে যেতে হবে।

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে শহরে ঢুকবার পথে কয়েকটা হোটেল। আধুনিক কালের হোটেল হয়েছে। কয়েকটা পুরনো আছে। একটা হোটেলের সামনে একটা জনতা জমে গেছে। অনেক লোক। এমন জনতা জমায়েত হওয়া খুব একটা বিস্ময়ের কথা নয়। অতি সামান্য কারণেও জমে যায়। দোকানে জিনিসের দর নিয়ে হয়তো বচসা—তা থেকে হাত টানাটানি হয়ে গেলে হয়। কখনও বাঁদরেও কাণ্ড বাধিয়ে থাকে। কখনও বিচিত্র পাগলের পাগলামিতেও জমে। কখনও রাজনীতির তর্ক থেকেও হয়। কিন্তু সে থমকে গেল একটা কথা শুনে। একজন বলছে—টেলিফোন এসেছে, সেন মশায়দের ওখানে। আমি ছিলাম সেখানে। গোটা চিৎপুর কলুটোলা রক্তে ভেসে গেছে। চিৎপুরের সেনেরা এঁদের আত্মীয়, তাঁদের বাড়িরনাকি কেউ বেঁচে নেই। ১৬ই মানে কাল ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মিটিং ছিল ময়দানে ; সেখানে নানান জায়গা থেকে মিছিল এসেছিল। মিটিংএর শেষে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান স্লোগান দিয়েই সন্ধ্যেতেই এ্যাটাক করে ধর্মতলা। বন্দুকের দোকান লুট করে। তারপর গোটা কলকাতায় তাণ্ডব। কলুটোলা চিৎপুর বউবাজার শেষ। বিহার ইউ-পি থেকে এর জন্যে আগে থেকে গুণ্ডা ওরা আনিয়েছিল। তাদের মাথায় লাল শালুর একটা করে ফেটা বাঁধা ছিল। পুরুষ-দের খুন করেছে। মেয়েদের লুটে নিয়ে গেছে। ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে পেট্রোল ঢেলে। কলেজ স্ট্রীট বাজার জ্বলছে, কারুর সাধ্যি নেই পাস করে ওদিক দিয়ে। এমন ভাবে দু তিন দিন চললে গোটা কলকাতা ওরা খতম করে দেবে। পুলিস চুপ করে আছে। সুরাবর্দীর হুকুম। তার ডান হাত হয়েছে ডেপুটি কমিশনার দোহা।

আরম্ভ হয়ে গেছে তাহলে ? কলকাতার লীগের ডাইরেক্ট-অ্যাকশন এই ? এই গৃহযুদ্ধ ! এই রক্তগঙ্গা।

ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ইতিহাসের গতি ইংরেজ এসে বন্ধ করে আর একটা মুখে ফিরিয়েছিল সে মুখের গতি রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজ আবার সেই পুরনো গতির মুখটা খুলে দিলে !

বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিলে কুটিল ভেদনীতিতে ?

হল বইকি ব্যর্থ। নইলে "দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে"—কই, সে শঙ্খধ্বনি কই শোনা যাচ্ছে।

কই শোনা যাচ্ছে না তো সেই কণ্ঠস্বর—আমি এসেছি! স্তব্ধ হও তোমরা আমি এসেছি!

দূরে কোথায় অনেক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—ভারতমাতা কি জয়! জয় হিন্দ!

চঞ্চল হয়ে উঠল উমা!

এরই মধ্য থেকে আবার মোড় ঘুরবে না তো?

চট্টগ্রাম থেকে অজয় কোনক্রমে কলকাতায় এসে পৌঁছুল। রতনবাবু চট্টগ্রামেই থেকে গেলেন। তিনি এলেন না। কিন্তু অজয় থাকতে পারলে না। তার ভাবনা হল তার মায়ের জন্য। তার মা রয়েছেন নবগ্রামে, মঙ্গলকোটের কাছে। মঙ্গলকোটের আসল বানান মোংগলকোট বলেই অনেকে বলে থাকে। আবার অনেকে বলে—অজয়ের তীরবর্তী উজানিতে লহনা খুল্লনা উপাখ্যানের মঙ্গলচণ্ডীর আটন আছে, সেই সূত্রে ও গ্রাম মঙ্গলকোট। যেটাই সত্য হোক মোংগলকোটের মুসলমান প্রাধান্য এবং ওখানকার মুসলমানদের ধর্মান্ধতার কথা ও অঞ্চলে সবাই জানে। চেহারায় পোশাকে ভাষায় ওখানকার অধিবাসীরা শুধু এ অঞ্চলে তারা পরদেশী অর্থাৎ ভিন্নপ্রদেশী বলে নিজেদের জাহির করে না, এ দেশেরও পরদেশী কোন সুদূর তাতার উজবেগীস্থানের অধিবাসী বলে গৌরব অনুভব করে। কত ঘটনার কথা মনে পড়ল। অতীতকালের শোনা গল্প। তার নিজের জীবনের এই স্বল্প কয়েক বছরের গল্প। এই তো যে দিন সে বাড়ি থেকে সাইকেল চড়ে বর্ধমানে এসে সেখান থেকে কলকাতায় চলে আসে সেদিন পথে দেখা হয়েছিল তার মোংগলকোটের মুসলীমদের বিরাট মিছিলের সঙ্গে। তারা লীগের মিটিংয়ে যোগ দিতে আসছিল। সাইকেলে চড়ে সে পথে চলতে পায় নি। মাঠ ভেঙে সাইকেল ঘাড়ে করে কোন রকমে এগিয়ে এসে রাস্তায় উঠে সাইকেল চড়েছিল। তারপর বর্ধমানে উকীলবাবুর বাড়ির কথা মনে পড়ল। সেই হিন্দুদের জনতা। উকীল মহেন্দ্রবাবুর সেই কথাগুলি! সঙ্গে সংগে মনের মধ্যে একটা আতংক জেগে উঠল। যদি কলকাতার এই ১৬ই আগস্টের ঢেউ ওখানে গিয়ে লেগে থাকে? যদি লেগে থাকে বলে প্রশ্ন বা সংশয়ের বোধ হয় কোন অবকাশই নেই। তার মা! তার বাড়ি! তাদের বাড়ির দেবতা!

সে রতনবাবুকে বললে—রতনদা, আমাকে যেতেই হবে। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকতে পারি না—পারব না!

রতনবাবু বললেন—ধৈর্য ধরে কোন রকমে থাকতে পার না? দেখ, বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ, সেখানকার যা অবস্থা বলছ তাতে দাংগা ছড়াবার সম্ভাবনাই বেশী। যে ছড়াবার সম্ভাবনা দেখছ তেমনি অন্য দিকটা ভাব—তোমাদের ওখানে ওই মোংগলকোট মুসলমান-প্রধান হলেও গোটা অঞ্চলটা হিন্দুপ্রধান। বড় বড় অবস্থাপন্ন হিন্দু আছে। জমিদার উকীল জোতদার। তোমাদের অবস্থাও ভাল। গ্রামে একটা ইস্কুল রয়েছে। বোর্ডিং রয়েছে। তারা রুখবে না? তারা রুখতে পারবে না আর তুমি গিয়ে রুখবে? অথচ এখানে অনেক কাজ রয়েছে। অনেক কাজ করতে হবে। এ ঝগড়ার চেহারাটা যেমন বাইরে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, তেমনি ঝগড়া এটা কংগ্রেসে মুসলীম লীগে। এবং সেইটেই আসল ঝগড়া। কম্যুনিস্টরা এর মধ্যে চেষ্টা করছে দাঁড়াতে। তারা মোটামুটি পাকিস্তান স্বীকার করেছে—ন্যায্য বলেছে। এখন নেতাজীর আদর্শ নিয়ে যদি আমরা না দাঁড়াই তবে মারাত্মক অপরাধ হবে! নেতাজী এসে কি বলবেন? প্রশ্ন তোমাকেই যদি করেন—তুমি কি করেছিলে? কি বলবে?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অজয়। উত্তর তার ছিল না। রতনবাবু বললেন—প্যাম্ফলেটটার কথা ভাব। ডাক যখন দিয়েছিলাম তখন রবীন্দ্রনাথের যে বাণী তুলে ডাক দিয়েছিলাম সেটা

মনে কর।

"মা কাঁদিছে পিছে।
প্রেয়সী দাঁড়িয়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।"

মনে নেই ?

সেদিন সে মাথা হেঁট করে নির্বাক হয়ে ফিরে এসেছিল। কংগ্রেসী প্রবীণ উকীলটির বাড়িতেও তখন চরম উত্তেজনা—অনেক ভিড়। সে নীরবে এসে তার নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুয়ে পড়েছিল উপুড় হয়ে! ইংরেজের পুলিস যখন তাকে এলাহাবাদে অ্যারেস্ট করে তখন সে চঞ্চল হয় নি বিচলিত হয় নি। এতটুকু ভাঙে নি। কিন্তু আজ যেন সে ভেঙে পড়েছে। তার মা তার জন্য দুশ্চিন্তায় তার অভাবের বেদনায় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে যখন ফিরেছিল বাড়ি তখন তাঁর সে মূর্তি দেখে তার আর অনুশোচনার সীমা ছিল না। আবার সে চলে এসেছে দেশের ডাক শুনে—পার্টির নির্দেশ পেয়ে কর্তব্যে সে ত্রুটি করে নি। কিন্তু আজ যদি তার অনুপস্থিতিতে এই সংকট এই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে একটা চরম কিছু ঘটে যায়—মা যদি সেই বিপদের মধ্যে অবসাদে ভেঙে পড়েন, তার জন্যে চোখের জল ফেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন—তবে ? তবে সে কি করবে ? উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে সে কাঁদছিল। এমন সময় কেউ তার পিঠের উপর হাত দিয়েছিল। চমকে উঠেছিল সে !

—তুমি কাঁদছ ? তার পিতৃবন্ধু এ গৃহের গৃহস্বামী হরেন্দ্রবাবু উকীল।

সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। হরেনবাবু প্রশ্ন করেছিলেন --কি হয়েছে ? বলতে বাধা আছে ?

একটু ভেবে সে বলেছিল—আমি কি করব বুঝতে পারছি না !

—কি হয়েছে আমাকে বল !

সমস্ত শুনে তিনি বলেছিলেন—তুমি চলে যাও অজয়। তোমার যাওয়াই উচিত বলে আমি মনে করি। রতনকে ডেকে আমি বলছি। তুমি চলে যাও। যা অবস্থা তাতে হয়তো এমন হতে পারে যে গোটা দেশে এই মারাত্মক গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে ইংরেজ দাঁড়িয়ে দেখবে। এবং দুই পক্ষই যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ভয় পেয়ে নিজে থেকেই ইংরেজকে বলবে—তোমরা থাক ! তোমাদের নইলে আমাদের চলবে না। না হয় তো—মানে এ দেশের নেতারা যদি তা নাই বলে তবে দুপক্ষ গৃহযুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়লে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ জয় করে তাদের আসন আরও শক্ত করে তুলবে। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে হয়তো এমন হবে যে এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না। এই মন এই উদ্বেগ নিয়ে তুমি তো কাজ করতে পারবে না। তুমি চলে যাও। এখানে কাজ করছ সেখানে গিয়ে কাজ করবে। আমি রতনকে ডেকে বলছি।

রতনবাবু তাঁর কথায় সম্মতি দিয়েছিলেন। ভার দিয়েছিলেন কলকাতায় এসে সে সর্বাগ্রে পার্টি আপিসে গিয়ে বলবে আরও একজন নয় অন্তত কয়েকজন কর্মী পাঠাতে। নামও তিনি বলে দিয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম আর্মারী রেডের আন্দামান ফেরত খ্যাতিমান কর্মীদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে -তার ফলে এবং যুদ্ধের সময় কম্যুনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের ধ্বনি তুলে যুদ্ধে সহযোগিতা করে অবাধে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে বলে চট্টগ্রামের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের প্রভাব বেশী। এখন শক্ত দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী কর্মী চাই।

সেই কথাগুলি বলবার জন্যই সে এসে কলকাতায় শেয়ালদহে নামল। নৈহাটি স্টেশনে একবার মনে হয়েছিল এখানেই নেমে পড়ে ব্যান্ডেলে এসে ট্রেন ধরে সে সটান বর্ধমানে এসে

হাজির হয়।

সে এসে পেঁছুলো বিশে আগস্ট সকালবেলা।

স্টেশনে নেমে সে শিউরে উঠল। উঠবারই কথা। ১৮ই রাত্রি থেকে কলকাতায় সামরিক আইন জারি হয়েছে দাঙ্গার জন্য। ১৬ই সন্ধ্যা থেকে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিল সে তাণ্ডব অবাধে ১৭ই ১৮ই পর্যন্ত চলার পর বাংলার গভর্নর বারোজ রেডিয়োতে সামরিক বিধান ঘোষণা করে কলকাতার শাসন ও শৃঙ্খলার ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন। ১৮ই রাত্রি থেকে টানা কারফিউ চলেছে। ২০শে সকাল থেকে দিনের বেলা কারফিউ নেই কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে। স্টেশনে হেলমেট পরা ইংরেজ সৈন্যরা বন্দুক হাতে নানান জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে সার্কুলার রোড জনহীন। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ। গোটা রাস্তাটা পরিত্যক্ত যুদ্ধভূমির মত মনে হচ্ছে। ওপারের দোকানগুলো ভাঙা-চোরা। ভেঙে লুট করে নিয়েছে। ট্রাম বাস নেই।

তবু এরই মধ্যে তাকে পথ করে নিয়ে যেতে হবে। কোন্ দিকে যাবে সে? সার্কুলার রোড ধরে দক্ষিণে পার্টি আপিসে যেতে হলে পড়বে মৌলালী, পার্ক সার্কাস, উত্তরে নিজের বাড়ি গ্রে স্ট্রীটে যেত হলে পড়বে রাজাবাজার সামনে হ্যারিসন রোড। তাও মোড়টা থেকে খানিকটা দূর অবধি মির্জাপুরের মোড় অবধি মুসলমানদের প্রাধান্য।

তবে এরই মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের সংগঠন গড়ে উঠেছে। স্টেশনের যাত্রীদের সাহায্য করছে বাড়ি পেঁছুতে।

এমনি একটি সাহায্য সে পেলে। সেই সাহায্যেই সে হ্যারিসন রোড ধরে এসে পেঁছুল কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। খাঁ খাঁ করছে সমস্ত। উত্তর দিকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে গেল।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উত্তর মাথার দোকানগুলো এখনও ধোঁয়াচ্ছে। আগুনের শিখায় পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পশ্চিমে কলাবাগান। পেট্রোল ঢেলে দোকানে আগুন জেবলে পুড়িয়েছে।

লোক সর্বত্র রয়েছে। তারা তাকে সাবধান করে দিলে। শীতলাতলার আগে দুটো মার্কেটের মধ্যের রাস্তাটা যেখানে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে সেখানে সাবধান। পশ্চিম ফুটপাত ধরে যাবে না। গুপ্তঘাতক কোথায় রয়েছে—এসে ছোরা মেরে দিয়ে মিলিয়ে যাবে। মোটামুটি খবর সে ওই পথেই পেয়ে গেল। কলকাতায় সুরাবর্দি সাহেবের লড়াই ব্যর্থ হয়ে গেছে। ১৬ই রাত্রে মার খেয়ে ১৭ই সকাল থেকেই হিন্দুরা লড়াই দিয়েছে। সমান আক্রোশ। সমান আঘাত। নির্কিরিপাড়া ছাই হয়ে গেছে। শুধু এক জায়গায় হিন্দুরা ওদের সমান নিষ্ঠুর হতে পারে নি। সেটা মেয়েদের ব্যাপারে।

এরই মধ্যে সে গ্রে স্ট্রীটে এসে পেঁছুল।

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের নায়েব। তিনি তাকে দেখে বলে উঠলেন—অজয়বাবু!

—হ্যাঁ। বলে সে ধপ করে বসে পড়ল।

—কোথায় ছিলেন? এ কি চেহারা হয়েছে?

—চট্টগ্রামে ছিলাম। সেখান থেকে আসছি। মা—? মা কোথায়? মা কেমন আছেন? আমার মা?

—মা—? মা আর বাঁচবেন না! অজয়বাবু আপনিই তাঁকে মেরে ফেললেন!

—মা কোথায়? চীৎকার করে উঠল অজয়।

—মা দেশে। আহার নাই নিদ্রা নাই। সেখানে মঙ্গলকোটে জটলা হচ্ছে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মা কালীবাড়িতে বসে আছেন। আমাকে পাঠালেন—দেখে আসুন। খুঁজে নিয়ে আসুন। অন্ততঃ চরম দুঃসংবাদই যদি হয় তাও এনে আমাকে শুনিয়ে দিন। আসুন। ভিতরে আসুন।

শীর্ণ দেহ, রুক্ষ চুল, চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে প্রখর মনোরমা কালীবাড়ীতে মায়ের ঘরের সামনে ঢাকা বারান্দায় আসন নিয়েছিলেন।

১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছিল মনুমেন্টের তলায় মিটিং শেষ হওয়ার পর। মিটিং বাংলার মফঃস্বলের মুসলমানপ্রধান জায়গাগুলিতেও হয়েছিল। বাংলায় তখন মুসলীম লীগের শাসন, লীগের পৃষ্ঠদেশে পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ তাকে রক্ষা করছে প্রশ্রয় দিচ্ছে; সুতরাং সর্বত্রই লীগের এই মিটিংগুলিতে বক্তাদের আস্ফালনের সীমা ছিল না। বর্ধমান জেলায় বেশ কয়েকটি স্থানে মুসলমানদের পকেট আছে। মঙ্গলকোট একটি বড় পকেট এবং শক্তিশালী পকেট। আর একটি পকেট চক ইসলামপুর, সেটি নবগ্রামের কাছে; গুস্করার কাছাকাছি চানক রামচন্দ্রপুরের কাছাকাছি আরও একটা বড় পকেট। এখানে বর্ধিষ্ণু এবং এবং শিক্ষিত মুসলীম পরিবারের কাসেম সাহেবের নাম দেশে সুপরিচিত। কাসেম সাহেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নেতৃত্ব করেছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ—তখন সুরেন বাঁড়ুজ্জে—শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা; কাসেম সাহেব তাঁর সঙ্গে ঘুরতেন। বক্তৃতা করতেন। কিন্তু পরে মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের যাঁরা বীজ বপন করেন তাঁদের একজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের অনেক আগেই কাসেম সাহেব গত হয়েছেন কিন্তু তাঁর পুত্রস্থানীয় হাসেম সাহেব তাঁর স্থান সুযোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন—তিনি বাংলা লীগের একজন শক্তিশালী নেতা, অ্যাসেমব্লীর মেম্বার, লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী। সুরাবর্দী সাহেবের লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের তিনিও গোঁড়া সমর্থক। বর্ধমান মঙ্গলকোটে ১৬ই সন্ধ্যার আস্ফালন বিক্ষোভে অঞ্চলটি ত্রস্ত হয়েই উঠেছিল। এ অঞ্চলের মানুষদের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। ১৭ই বেলা দশটা হতে-না-হতে কলকাতার রক্তাক্ত দাঙ্গার ভয়ঙ্কর সংবাদ বর্ধমান স্টেশনে এসে বারোটা পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

সে সংবাদ অতিরঞ্জনে অতিরঞ্জনে ভীষণ এবং ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কলুটোলা মির্জাপুর চিৎপুরের খানিকটা অংশ, পার্ক সার্কাসের রাজপথ রক্তরঞ্জিত হয়ে গেছে। কতক-গুলি নামকরা বৈদ্যপরিবারে পুরুষ বলতে আর কেউ জীবিত নেই; মেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধাদেরও হত্যা করা হয়েছে; যুবতী কিশোরীদের লাঞ্ছনার সীমা নেই। তাদের সংবাদও কেউ জানে না তারা কোথায়। এবং হয়তো বা আজ রাত্রি শেষ হতে-না হতে গোটা কলকাতার পূর্ণ অধিকার দাঙ্গাকারীদের হাতে এসে যাবে। কলকাতার যে সব হিন্দুরা স্বীকার করবে পাকিস্তান-দাবি, তারাই থাকবে--অপর যারা তারা শেষ হয়ে যাবে। দেবস্থান থাকবে না। হিন্দু থাকবে না, হিন্দু মহাসভা থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না।

এ গুজব একক হিন্দুদের আতঙ্ক থেকে সৃষ্টি হয় নি—মুসলমানদের উত্তেজিত মাত্রা-হীন উৎসাহের কল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এবং যারা নেতা তারা জানে যে এইটেই ছিল তাদের পরিকল্পনা। ১৬ই তারিখের মনুমেন্টের তলায় মিটিংয়ে এখানকার কয়েকজন মুসলমান মাতব্বর উপস্থিত ছিল—তারা রাত্রের সেই অতর্কিত আক্রমণের স্বরূপও কিছুটা দেখে এসেছে। দু'একজনের গায়ে দু'চার ফোঁটা রক্তের ছিটেও লেগেছিল। তারা এসে প্রচার করেছিল নিজেদের মধ্যে যে, কলকাতার অভিযান সার্থক হতে আর একটা দিন। তার বেশী লাগবে না। সুতরাং এসব অঞ্চলে তাদের তৈয়ার হতে হবে। ভিতরে ভিতরে যে সাজ সাজ রবটি পড়েছিল তার ধ্বনি বাইরে খুব উচ্চরবে না হলেও গুঞ্জনধ্বনির মত চারিদিকের

বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিক্রিয়ায় ভীত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দুরা সতর্ক হয়েই ক্ষান্ত হয় নি, প্রতিরোধের জন্য তারাও চঞ্চল এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

নবগ্রামের খানিকটা দূরে—সিকি মাইলেরও বেশী দূরে চক ইসলামপুর। নবগ্রামের রায়চৌধুরীরা এককালে এই চক ইসলামপুরের কিছুটা জমিদারির মালিক ছিলেন। কিনেছিলেন ইসলামপুরের মিয়াদের কাছ থেকেই। কিন্তু ওখানকার সেখ এবং খাঁয়েরা খাজনা না দিয়ে, রায়চৌধুরীদের গোমস্তা পাইকদের অপমান করে তাঁদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে। মিয়ারাও জমিদারি বিক্রি করেও রায়চৌধুরীদের জমিদারিত্ব অস্বীকার করেছেন। ফলে একটা পুরনো বিরোধ ছিল। রায়চৌধুরীদের জমিদারি এবং সব সম্পত্তি তাঁদের দৌহিত্রবংশে উত্তরাধিকারসূত্রে আসার পর জামাই গঙ্গাচরণবাবু জমিদারি পত্তনি বিলি করে ঝঞ্ঝাটমুক্ত হয়েছিলেন এবং তার আয়ে কালী প্রতিষ্ঠা করে দেবোত্তরে অর্পণ করেছিলেন। সে সময় ইসলামপুরের জমিদারি ওই মিয়াদেরই আবার বন্দোবস্ত করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিদ্বেষ যায় নি। পত্তনিদার হিসাবে তাঁদের খাজনা দিতে হত কালীমাকে। সেটা তাঁদের যথেষ্ট মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। তাঁরা বার বার গঙ্গাচরণবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন যে ওই অংশটা তাঁদের বিক্রি করে দেওয়া হোক বা অন্য কোন স্থানের তাঁদের সম্পত্তির সঙ্গে বিনিময় করে নেওয়া হোক। তাঁরা তার জন্য কিছু বেশী মুনাফার সম্পত্তি বিনিময়ে দিতে রাজী আছেন। কিন্তু গঙ্গাচরণবাবু ছিলেন জেদী এবং সেকালের ধর্ম অনুযায়ী কিছুটা গোঁড়া। হয়তো বা ইতিহাসের অমোঘ প্রভাবও তাঁর উপর ছিল। তিনি ধরেছিলেন—তা হবে না। হার মানতে হয়েছিল মিয়াদেরই। কারণ স্বগ্রামের ভূস্বামিত্বের অধিকার এককালে বিক্রি করে মাথা হেঁট করে মর্মপীড়া ভোগ করেছেন তাঁরা। সেটা ঘোচাতে চেয়েছিলেন। পত্তনি নিয়েও কোন কালে আপোসে কালীমায়ের দেবোত্তরের চেক দাখিলা নিয়ে দেয় টাকা তাঁরা দেন নি। অষ্টম আইন অনুযায়ী নালিশের দিন আদালতে টাকা দাখিল করতেন। এবং যে মর্মপীড়াটা তাঁদের ঘুচবে ভেবেছিলেন সেটা তাদের ঘোচে নি। হয়তো ইতিহাসের জের বা তারই খেলা—নবগ্রামের লোকেরা তকরারের মুখে ইসলামপুরের শেখদের বলত—তোদের মিয়ারা তো আমাদের গাঁয়ের কালীমায়ের পত্তনিদার, বলতে গেলে তো প্রজা! এই সব ব্যাপার নিয়ে ইসলামপুরের শেখদের একটা বড় বিদ্বেষ ছিল নবগ্রামের কালীর উপর। সে বিষয়ে নবগ্রামের দেবোত্তরের সেবায়েত এবং ইসলামপুরের শেখ উভয় পক্ষেই সচেতন ছিল।

সেই কারণে ১৬ই তারিখের সন্ধ্যা থেকেই মনোরমা অধীর হয়ে উঠেছিলেন চিন্তায়। অজয়ের চিন্তা তখনকার মত চাপা পড়েছিল।

অজয় বাড়ি থেকে কিছু না বলে চলে গেছে; বর্ধমানে উকীল মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে মুহুরি মারফত চিঠি পাঠিয়েছে; সে আজ কয়েক মাস হয়ে গেল; সে গেছে ২০শে ফেব্রুয়ারী। ২০ শে ফেব্রুয়ারী আর ১৬ই আগস্ট। এর মধ্যে মনোরমা ছেলের চিঠি পেয়েছেন কিন্তু চিঠির উত্তর দেন নি। মুখে ছেলের নাম করেন নি। মাসিক ষাট টাকা হিসেবে পাঠাবার জন্য নায়েবকে বলে দিয়েছিলেন, মাসান্তে সেই খবরটাই একবার নিতেন, জিজ্ঞাসা করতেন—কলকাতায় তাকে টাকা পাঠিয়েছেন?

নায়েব বলত—হ্যাঁ, তা কি ভুল হয় মা!

মনোরমা বলতেন—না—তাই বলছি। আমার একবার জিজ্ঞাসা করা তো কর্তব্য।

নায়েব মধ্যে মধ্যে কলকাতায় গিয়েছে, মনোরমা বলে দিতেন প্রত্যেকবার—দেখবেন যেন আমার শরীর খারাপ কি কিছু এসব তাকে কদাচ বলবেন না। কদাচ না।

—কিন্তু আপনার শরীর তো দিন দিন আবার খারাপ হচ্ছে মা!

—হয় নি বলে তকরার আপনার সঙ্গে করব না। তবে আমার বারণ রইল। সংসারে ভগবান জ্যেষ্ঠ সন্তান যার নামে দিব্য আপনি মানেন সেই দিব্য রইল আপনাকে।

—মা! শিউরে বলে উঠেছিল নায়েব।

মনোরমা বলেছিলেন - আপনি এই পর্যন্ত বলতে পারেন যে কেমন আছি আমি—তার জন্য তার সত্যই যদি আগ্রহ থাকে তবে সে এসে দেখে যেতে পারে।

নায়েব চুপ করে ছিল সেবার। পরে প্রতিবারই এই কথা হয় নি বা ওঠে নি কিন্তু মনোরমা প্রতিবার সেই দিব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—আমার দেওয়া দিব্যের কথাটা যেন মনে থাকে আপনার।

নায়েব কলকাতায় এসেছে—অজয়ের সঙ্গে কথা তার খুব বেশী হয় নি, অজয় তখন প্রায়ই ব্যস্ত থেকেছে পার্টি অফিসে। দশটা এগারটা বাজতেই বেরিয়ে গিয়ে ফিরেছে রাত্রি দশটা এগারটা—কোন দিন তারও পরে।

জিজ্ঞাসাবাদ যা করেছে তা সংক্ষিপ্ত। মা কেমন আছেন—এ প্রশ্ন অবশ্য প্রথম প্রশ্ন এবং প্রতিবারের প্রশ্ন—সে তা করেছে, নায়েব ঠিক মনোরমার কথাই বলেছে, বলেছে—সে আপনি গিয়ে চোখে দেখে আসুন। এ তাঁরই কথা। তিনিই বলে দিয়েছেন বলতে।

অজয় কথাটা তার বয়স এবং তার রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত মনের পক্ষে যেভাবে গ্রহণ করা স্বাভাবিক তাই করেছে অর্থাৎ গুরুত্ব কিছু দেয় নি। ভেবেছে মা তাকে যেতেই বলছেন এবং ভালই আছেন! তবুও মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছে ডাক্তার কি বলছে?

—ডাক্তার তো দেখছে না আর!

—অ। কথাটায় সে আশ্বাস খুঁজে নিয়েছে অর্থাৎ আবিষ্কার করেছে। - ওষুধ খাচ্ছেন তো?

—না। তাও আর খান না।

এতে আরও আশ্বাস পেয়েছে সে। মনটা তার কোনোমতে মায়ের মর্মান্তিক ক্ষোভ এবং অভিমানের দিকটায় যেতে চায় নি। কারণ সে বার বার ভেবেছে—সে মহৎ কাজ করছে, সে আত্মত্যাগ করছে, দুঃখকে মাথায় করে জীবনকে পণ করে সে যা করতে চলেছে তাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে—মায়ের গর্ভকে লোকে ধন্য বলবে। তার মা তো কাঁদবার মা নন। মা যেমনই হোক মা যে মা এই কথাটা সে ভাবে নি! যখনই এমন ভাবনা মন ভেবেছে তখন সে মনে করেছে এলাহাবাদে যখন সে অ্যারেস্ট হয়—মা যখন তাকে দেখতে যান তখন তিনি প্রথমবার তার সঙ্গে দেখা করার পারমিশন পান নি; দ্বিতীয়বার দিল্লী পর্যন্ত গিয়ে তিনি ইন্টারভ্যু পেয়েছিলেন এবং দেখা করে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন—আমার জন্যে তুই ভাবিস নি।

এই গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে সেদিন—২৬ শে জানুয়ারীর পর একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন মা—তার কারণটা দেশের মুক্তিপণে বিপদে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে নয়—সে সেদিন সেই নমিতাকে নিয়ে তার মা অভিনেত্রী হরিমতী দেবীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য।

কথাটা মনে হয়ে তার ইচ্ছে হয়েছিল বাড়ি যেতে। হরিমতীর মৃত্যুর পর সে ডাক্তারবাবুটির কাছে যা শুনেছে, কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর যে চিঠি এসেছে তার কথা বলবার জন্যে যেতে তার গভীর আগ্রহ হয়েছিল। এর মধ্যে কোথায় যেন বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লাসের স্পর্শ ছিল।—মা, সেই যে যে-মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বলে পার্টি আপিস থেকে ট্যাক্সি করে অভিনেত্রী হরিমতী দেবীর বাড়ি পেঁছে দিয়েছিলাম, সে মেয়েটি হরিমতী দেবীর নিজের মেয়ে নয়। তার বিবরণ শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে মা। সে আশ্চর্য মেয়ে।

তারপর একে একে সব বিবরণ বলে বলবে—এ সব ঘটনার চেয়েও মা আশ্চর্য সেই মেয়েটি। জান হরিমতী দেবী তাকে টাকা গহনাগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে-সব সে কিছু নেয় নি। সব কাশীতে রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজীদের হাতে দিয়ে বলেছে—বসন্ত হয়েছিল—সে রোগের ঘোরে যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে মা ভুল করে মা বলে ডেকেছিলাম, তিনি আমাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে বাড়িতে রেখে নিজে সেবা করে চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তুলেছিলেন। তাঁর স্নেহেই আমার অধিকার ছিল—তাঁর টাকা পয়সা গহনা এতে ছিল না—নেই। তিনি তাঁর সব আশ্রমেই দিতে চেয়েছিলেন; মধ্যে মধ্যে বলতেন—মুক্তি এতে হবে না! নইলে এত আঘাত! না—। এ সব আমি নেব না! বল তো মা কি আশ্চর্য মেয়ে!

কথাটা বাড়ি গিয়ে বলতে ইচ্ছে থাকলেও পার্টির কাজের চাপে তার যাওয়া হয় নি। তার উপর নিরুদ্দেশ নমিতার সন্ধানের জন্য নিত্যই একটি কল্পনা করত। কাশী যাবার সংকল্প করত। কিন্তু পার্টির জন্যে যাওয়া হয় নি ঘটে নি। তা ছাড়াও নিজের মনের ভিতর থেকে একটি বাধা উঠত; যে মন যেতে চাইত সেই মনই কিনা সে বলতে পারবে না, তবে মনই বলত—কেন? তুমি তার সন্ধানে যেতে চাচ্ছ কেন? মনের মধ্যে "মা কাঁদিছে পিছে—প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে" লাইন দুটো যেন তাকে শাসন করত।

নায়েব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত আপসোস করত। গঙ্গাচরণবাবুর পৌত্র বিজয়চন্দ্রের ছেলে—সে শেষ একটি বাউণ্ডুলেতে পরিণত হল! গঙ্গাচরণের শেষ বয়সে সে তাদের বাড়ির চাকরিতে ঢুকেছে। সে বছরে দুবার তিনবার চট্টগ্রাম যেত. সে তাঁর কীর্তি দেখেছে তাঁর দাপট দেখেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখেছে। প্রকাণ্ড বড় একটা রুপোবাঁধানো হুঁকো নিয়ে শালপ্রাংশু মহাভুজের মত মানুষটি খড়ম পায়ে দিয়ে ঘুরতেন; প্র্যাকটিস তিনি তখন ছেড়েছেন একরকম। বিজয়চন্দ্রের তখন যথেষ্ট নামডাক হয়েছে। তবুও মধ্যে মধ্যে ছেলে আসত তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে। তিনি সেদিন নিজের ঘরে বড় তক্তাপোশের আসনে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে বড় বড় বই নিয়ে ওলটাতেন—দেখতেন—ছেলেকে দেখাতেন। এবং দুর্গমে পথ করে দেওয়ার মত পথ বাতলে দিতেন। চট্টগ্রামের আরও উকীলরা আসত কনসালটেশনের জন্য। এক একদিন বিশেষ মামলায় কোর্টে যেতেন। বহস করতেন—সে-বহস সে দেখেছে শুনেছে। কাছারী গমগম করত। গলা ছিল ভারী, তার উপর জোর দিয়ে বক্তৃতা করা ছিল তাঁর স্বভাব। জীবনে মামলায় হেরেছেন খুব কম। একটা পদ্ধতি ছিল তাঁর, মিথ্যে মামলা তিনি বুঝতে পারলে নিতেন না। ফিরে দিতেন। তবে কাগজপত্র দেখার পর তার বিপক্ষ পক্ষেও যেতেন না। বিজয়চন্দ্রকেও দেখেছে। শান্ত ধীর গলায় ল-পয়েণ্ট নিয়ে বহস করতেন। কাজ তাতেই হত। গঙ্গাচরণ ছিলেন খাঁড়া, বিজয়চন্দ্র ছিলেন তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। সেই বংশের একমাত্র ছেলে এই অজয়, চেহারায় সে আরও সুন্দর। মায়ের রূপ পেয়েছে। কথাবার্তাতেও মিষ্টভাষী, বুদ্ধি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। এই ছেলেকে নিয়ে মায়ের কত আশা। আজও মনোরমা আশা করেন, উকীল হয়ে অজয় চট্টগ্রামে যাবে; তার পৈতৃক বাড়ি সম্পত্তি উদ্ধার করবে। গঙ্গাচরণের পৌত্র বিজয়চন্দ্রের ছেলে অজয় বাপ ঠাকুর্দা দুজনের মিলিত খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সব—সব আকাশ-কুসুম হয়ে গেল!

বলবার কিছু নেই। বাপ-পিতামহের সম্পত্তি গেল—সে উদ্ধারের চেষ্টা না করে সে দেশ উদ্ধারের নেশায় মেতেছে!

একে তো অন্যায় অধর্ম অপকর্ম কেউ বলে না। সে নায়েব গোমস্তা মানুষ—তার প্রথম জীবনে সাহেব দেখে ভয় লাগত। সাহেবরা এদেশের রাজা হয়েছে বিধাতার ইচ্ছায় তাঁর নির্দেশে এই বিশ্বাস করত। আজ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে কেউ তা বিশ্বাস করে

না। আছে কিছু লোক। রায়বাহাদুর রায়সাহেবদের সব নয় কিন্তু কিছু কিছু আছে। যারা বিশ্বাস করে ইংরেজকে হারানো তাড়ানো অসম্ভব, এবং তাদের চেয়ে সুশাসক সুবিচারক এবং শক্তিমান সারা পৃথিবীতে আর নেই। এরা ছাড়া দু'দশ জন গেঁয়ো জমিদার ধনী মহাজন আছে তারাও তাই ভাবে। সে যদি এদের বাড়ি কাজ করত তবে সেও তাই ভাবত বিশ্বাস করত। কিন্তু এই বাড়িতে কাজ করার জন্য এ-ভাবনা সে ভাবে না, সে-বিশ্বাস তার ভেঙেছে। একত্রিশ সালে চট্টগ্রামে গিয়ে বিজয়চন্দ্রের আর্মারি রেড কেসে আসামীদের পক্ষে কাজ করা দেখে এসেছে। সুতরাং বলবে কি! বলবার কিছু নেই অজয়কে। বলবার কিছু থাকলে মনোরমার মত মা তিনি চুপ করে থাকতেন না। এ মেয়ে তো যে-সে মেয়ে নয়। যত শক্ত তত তাঁর সুক্ষ্ম ন্যায়-বিচার! 'ধর্মকে মাথায় করে চলা' একটা কথা আছে—শুনেই এসেছে বেশী দেখেছে খুব কম। ছেলের অন্যায় বা অধর্ম দেখলে এ-মা তাকে ক্ষমা করতেন না। তিনি একটি কথাও বলেন না এর বিরুদ্ধে। মুখে তিনি ছেলের কাজকে প্রশংসাই করেন—বলেন—তাকে কি বলব বলুন? সে তো অন্যায় কিছু করে নি! দেশের স্বাধীনতা এ তো সেই শ্রীকৃষ্ণের কংস বধ করে বন্দিনী দেবকীর বাসুদেবের শৃঙ্খল খুলে বুকের উপর চাপানো পাথর সরিয়ে তাঁদের মুক্ত করার মত কাজ। কংস রাজার মত শক্তিমান—তার সেই মল্লদের মত মল্ল—তার সেই দুর্দান্ত হাতীর কাছে ওই ষোল বছরের ছেলে এগিয়েছিল কোন্ সাহসে কোন্ তাগিদে। এও তাই। এরা সব তাঁর ছেলে। বলব কি? তবে—।

তবে বলেই থেমে যান আর বলেন না। কিন্তু নায়েব জানে কথাটা। তাঁর এক ছেলে—আর তাঁর মনের সেই আশা। মনের আশাভঙ্গের জন্য তত নয় যত তাঁর এক ছেলের মা হয়ে ছেলের উপেক্ষার জন্য অভিমান। এ অভিমান দুরন্ত অভিমান! এই অভিমানে তিনি রাত্রে কাঁদেন। ঝি বলে, প্রায় তাঁর মাথার বালিশ ভিজে-ভিজে থাকে। অন্য সময়ে তিনি যেন পাথর। নায়েব কলকাতা থেকে ফেরে—তিনিও ওই ছেলের মত একটা প্রশ্নই করেন—কেমন আছে সে?

ব্যস্! তার পর আর কিছু না, সে কি করে—সে কি বললে এসব নিয়ে একটি প্রশ্নও না। আপনার নিয়মিত কাজে রত হয়ে যান। কাজ অনেক, তার মধ্যে বারো আনা ওই মা কালীর পুজো সেবা ভোগ এবং অতিথি খাওয়ানো। পুজো শেষ হলে নিজে ঐ দালানে বসেই নিজের পুজো সেরে একটু জল খান—তারপর ভোগ, অতিথিসেবার পর নিজে প্রসাদ খান। একটু বিশ্রাম করে সারা বাড়ি ঘোরেন। বিকেলে কারুর কাজ থাকলে কাজের কথা হয়। নায়েব ইস্কুলের হেডমাস্টার ডাক্তারখানার ডাক্তার আসেন, কাজের কথা বলে চলে যান। তার পর সন্ধ্যা থেকে আবার দেবতা নিয়ে পড়েন। রাত্রি আটটার পর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বসেন; সাড়ে দশটায় ওঠেন—তখন আবার একবার নায়েবকে যেতে হয়। গ্রামের অভাবী লোকদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা আছে—সেই সাহায্য যায় সন্ধ্যার পর; সাহায্য পাঠানো হল এই সংবাদ তাঁকে দিয়ে আসতে হয়। সেই সময় মনোরমা নিজে এই অভাবীদের তালিকায় একটি দুটি নতুন নাম যোগ করে দিয়ে বলেন—এদের একটা খোঁজ নিয়ে দেখুন। অবস্থা যদি খারাপ হয়—।

নায়েব হেসে বলে—নেব। তবে নেওয়ার মধ্যে সত্য যাই হোক শতকরা পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে দেওয়ার ব্যবস্থা তাকে করতেই হয়।

মনোরমা তাঁর কারণ দেখান—শ্বশুরমশাই এখানকার সম্পত্তি তো সবই এইভাবে ব্যয়ের ব্যবস্থাই করে গেছেন। আমরা এখানে এসে এখন থাচ্ছি রয়েছি সেইটেই বলতে গেলে অন্যায় হচ্ছে। বলুন আপনিই বলুন। তা ছাড়া যে মা এখন মালিক তিনি তো সকলের মা।

একা তো আমাদের নয় !

নায়েব বলে—ঠিক আছে—তাই হবে।

এ নিয়েও ইসলামপুরের মুসলমানদের অভিযোগ আছে। তারা ঠিক এর অংশ পায় না। তারা কেউ প্রার্থী হয়ে এলে মনোরমা তাদের ঠিক ফেরান না—অল্প কিছু দিয়ে থাকেন কিন্তু এই গ্রামের হিন্দুদের যেমন ও যত দেন তত দেন না। বলেন—ওদের দরগা থেকে গরীবদের দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা হিন্দুদের নেই। তা ছাড়া গ্রাম হিসেবে ওদের ভিন্ন গ্রাম। এত দূরে আমি যেতে পারব না। আমার কতটুকু সাধ্য !

মধ্যে একবার তারা কালীপূজার সময় বাজনায় আপত্তি করেছিল। কালীপূজার কাল রাত্রে, বাজনাবাদ্যের সমারোহও সেই সময়, তখন উপাসনার সময় নয়, গ্রামও এক গ্রাম নয়, মধ্যে সিকি মাইলেরও বেশী ব্যবধান, তবুও আপত্তি করেছিল রাত্রে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে। কিন্তু সে আপত্তি টেঁকে নি।

তাই ১৬ই আগস্টের সন্ধ্যায় স্থানীয় মিটিংয়ে উত্তেজনা-পূর্ণ বক্তৃতার সংবাদ পাওয়ামাত্র মনোরমা চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। রাত্রেই নায়েবকে ডেকে বলেছিলেন—এখন কি করবেন ?

—দেখি !

—এখনও দেখবেন ? এখনও বুঝতে পারছেন না ? বক্তৃতার কথা শুনেছেন ?

—শুনেছি। তবে—

—তবে এখনও এর মধ্যে আছে নাকি ?

ঠিক সেই সময়েই ইসলামপুরে সমবেত মুসলমানদের দেওয়া একটা ধ্বনি ভেসে এসেছিল। এটা সেই মিটিংয়ের পর থেকেই উঠছে মধ্যে মধ্যে। মনোরমা বলেছিলেন। —শুনছেন !

—হ্যাঁ। তা তো সন্ধ্যে থেকেই শুনছি।

—তবে –

—তবে দেশে তো এখনও একটা রাজত্ব রয়েছে।

—রাজত্ব আছে ? যদি থাকে তবে সেটা তো ওদের। ইংরেজ তো ওদের সব ছেড়ে দিয়েছে।

চুপ করে ছিল নায়েব। এই সময়েই চাকর এসে খবর দিয়েছিল—হেডমাস্টার স্কুলের সেক্রেটারী গ্রামের ক'জন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে—বলছেন খুব জরুরী। আর ইসলামপুরের বাগ্দীরা মেয়েছেলে গরু বাছুর নিয়ে এসেছে এখানে ; বলছে ও গাঁয়ে আর তারা থাকতে সাহস করছে না। এখানে এসেছে—নাটমন্দিরে কি কোথাও রাত্রে শুয়ে থাকবার জায়গা চাচ্ছে।

সংবাদ সকলেরই এক। হেডমাস্টার সেক্রেটারী গ্রামের ভদ্রলোকেরা শঙ্কিত হয়ে এসেছেন। যা গতিক তাতে হয়তো একটা বিশ্রী ভয়ংকর ব্যাপার ঘটবে। গ্রামে এবং আশেপাশে নানান রকম গুজব ছড়াচ্ছে।

তার একটা হচ্ছে—ইংরেজরা সুরাবর্দীকে বাংলাদেশ একরকম ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে কংগ্রেসকে হিন্দুদের দমন করে তুমি ইংরেজদের অধীনে রাজত্ব কর। জমিদারি যেমন পত্তনি দেয় তেমনি ব্যবস্থা। সুরাবর্দী নবাব হবে আর ইংরেজদের গভর্নর হবে।

আর একটা হচ্ছে—ইসলামপুরের মুসলমানরা বলেছে নবগ্রাম ভেঙে চাষের জমি করবে। তার সঙ্গে আরও অনেক কথা।

ইসলামপুরের বাগ্দীদের মাতব্বর নেপাল বাগ্দী বললে—তা মা রাজত্ব নাকি ওদেরই

হবে কি হয়েছে তাই বলছে বটে। বলছে খুব গরম গরম কথা। এখানকার খানবাহাদুর নাকি এখানকার সম্বময় কত্তা হবে। মসজিদে খুব জমায়েত বটে, আমরা শুনছি। ওখানে মা অনেক পুরুষ আছে ; মধ্যে মাঝে আমাদের পরে অত্যেচার এক আধজনা করেছে ; কিন্তু মিয়া সাহেবরা আমাদিকে রক্ষে করেছেন, যে অত্যেচার করেছে তাকে শাসন করেছেন। আমরা ওদের অনেককালের পাইক। তা এবার আর কেউ রক্ষে করবে বলে মনে লাগছে না। শুনছি সে ভীষণ কথা মা। হয় জাত নয় জান দিতে হবে। জান না-হয় মরদরা আমরা দিলাম কিন্তু মেয়েছেলে আছে তাদের জাত ধরম কে রাখবে বলেন! জলা পরামাণিক আমাদিগে সন্ধ্যেবেলা এসে বলে গেল—নেপাল সরে পড়। পহরখানেক রাত পার হলেই চলে যা। নইলে এবারে কাণ্ড খারাপ। আমরা কোথা যাব মা, আপনার কাছে এলাম। একটুকুন আশ্রয় দিতে হবে!

মনোরমা বললেন—আশ্রয় দেব। কিন্তু রক্ষা করতে পারব কি না তা তো জানি না। তেমন কাণ্ডই যদি ঘটে তবে ওরা তো এসে আমাদের বাড়িই আগে আক্রমণ করবে। আমার বাড়ির বন্দুক-টন্দুক সব বাজেয়াপ্ত হয়েছে তোমরা তো জান। আশ্রয় দেওয়া তো সহজ নয় সোজা নয়। আশ্রয় দেওয়া মানে তাকে রক্ষা করার ভারও নিতে হবে।

নেপাল হাত জোড় করে বললে—মা, যদি অভয় দ্যান তো বলি।

—বল।

—মা, আমাদের সব চেয়ে বড় ভয় আগুনকে মা। ওখানে আমরা লোক হিসেবেও অল্প —আমরা বারো ঘর বাগদী আর ওরা ষাট ঘরের ওপর। তা ছাড়া ঘর খড়ের আর তালপাতার। ওরা হামলা করলে আগেই ঘরে আগুন দেবে তারপর বার করবে। আপনার এখানে পাকা ছাদের তলায় মেয়েছেলে ক'টাকে যদি আশ্চয় দেন তবে আমরা আপনার লোকেদের সঙ্গে হাত মেলাব—ওদের সঙ্গে লড়ব। বারো ঘরে আমরা বাগদী জোয়ান আছি সতের জনা। লাঠি সবাই ধরতে জানি। ওই ইসলামপুরের মিয়েরাই আমাদিগে রক্ষে করে নাই এতদিন। আমাদের লাঠি আর কব্জার জোরও আছে তার সঙ্গে!

মনোরমা বললেন—নায়েববাবু, এদের মেয়েছেলেদের ওই পাশের একতলার ঘরে থাকতে দিন। ভাঙা কাঠ-কাটরা যা আছে সব বের করিয়ে দিন। যাও তোমরা সাফসোফ করে নিয়ে ওখানে থাক। খাওয়াদাওয়া সব ভার আমার রইল।

প্রণাম করে নেপাল বললে—আপনার ছেলে রাজা হোন মা। মেয়েরা সব ঘরে থাকুক, আমরা এই বাইরে বারান্দায় নাটমন্দিরে লাঠি মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকব।

হেডমাস্টার বললেন—ভালই হল। আমরা একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার কথা বলতে এসেছিলাম, তার পত্তন হয়ে গেল।

সেক্রেটারী এবং গ্রামের ভদ্রলোকেরা বললেন—আমাদের গ্রামের বাউড়ীরা সবাই দুর্বল নিরীহ—ওদের মধ্যে খাঁদা শিবেকে নিয়ে জন ছয়েক আর হাড়িদের কুড়ি জন সব নিজে থেকে বলে গেল ওরা গ্রাম পাহারা দেবে রাত্রে। বোর্ডিংয়ের ছেলেরা আসতে চায় কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। তা হলে পরে ইস্কুলে গোলমাল হবে। ইসলামপুরের ছেলেরাও পড়ে এখানে, তা ছাড়া এই তো দেশের হাল!

মনোরমা বললেন—হ্যাঁ। তা ঠিক হবে না। এই তো কম হল না। এরা সতের জন —বাউড়ীরা ছ'জন—হাড়িরা কুড়ি জন। এ ছাড়া গ্রামের জোয়ান ছেলে আছে যারা ইস্কুলে পড়ে না। আর তেমন হলে আপনি ইস্কুলের বোর্ডিংয়ের ছেলেদেরই বা আটকাবেন কি করে! তবে এখন ওদের না টানাই ভাল।

রাত্রিটা উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটল।

রাত্রি এগারটা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ইসলামপুরের উত্তেজিত শেখেদের সমস্বরে উচ্চারিত ধ্বনি মধ্যে মধ্যে শোনা গেল। তারপর স্তব্ধ হল। রাত্রি বারোটা নাগাদ জলা পরামাণিক অর্থাৎ নাপিত এসে উপস্থিত হল।

জলা পরামাণিক ইসলামপুরে একলাই বাস করে। ওকে ইসলামপুরের মিয়ারাই নিয়ে গিয়ে বাড়ি জমি দিয়ে রেখেছে। ওখানে ও ক্ষৌরকর্ম করে এবং আরও একটি কাজ তার আছে। ইসলামপুরের মিয়াবাড়ির প্রাচীন ব্যবস্থা অনুযায়ী মিয়াবাড়িতে বা গ্রামে কারুর কাছে কোন কাজে বা অসময়ে পথক্লান্ত কোন হিন্দু পথিক বা অতিথি এলে গ্রামের মাইনে করা ওই হিন্দু পরামাণিকই তার পরিচর্যা করত। সেই জল দিত জলখাবার দিত, আহারের আয়োজন করে দিত। ওই পরামাণিকের বাড়ির সঙ্গেই একখানি বেশ ভাল সাজানো কুঠরি আছে, বারান্দায় রান্নার জায়গা আছে—সেখানে রান্নাবান্না করে নিতেন তিনি নিজের হাতে। বড় সম্মানিত অতিথি এলে নবগ্রাম থেকে পাচকের কাজ যারা করে তাদের কাউকে নিয়ে গিয়ে রান্না করিয়ে নিতেন। কেবল মিয়া ও শেখ বাড়ি থেকে আসত পান। লোকে বলত ইসলামপুরে আশ্রয় পেলে জীবন জাত ধর্ম এ নিয়ে নবাব বাদশার হাতেও বিপন্ন হবার আশঙ্কা নেই। জলা এখন সেই পরামাণিকের কাজ করে।

জলা রাত্রি বারোটা পর্যন্ত একটা গাছে চড়ে সব লক্ষ্য করেছে তারপর এসেছে। সে বললে—এতক্ষণে ওরা জানতে পেরেছে বাগ্দীরা পালিয়েছে। জানতে পেরে ওরা ক্ষেপে উঠেছে। নানান কথা বলছে। সে সব কথা ভয়ংকর কথা। তারপরই সে বললে—এক গ্লাস জল খাব আমি।

জল খেয়ে বললে—ওদের খুব রাগ এই বাড়ির ওপর। আজ রাতেই হয়তো কিছু করে বসত। কিন্তু খানবাহাদুরের বারণ আছে যে তিনি ফিরে না এলে কিংবা তিনি খবর না পাঠালে কেউ যেন কিছু না করে! রাত্রে বোধ হয় কিছু করবে না। কিন্তু শেষরাত্রে আবার ইসলামপুরে ধ্বনি উঠল। এবং দেখতে দেখতে আকাশে আগুনের রক্তরাঙা ছটা বেজে উঠল। আগুন লেগেছে ইসলামপুরে।

ইসলামপুরে আগুন?

ছাদে উঠে নেপাল বাগ্দী দেখে বললে—আমাদের পাড়ায়! আমাদের পাড়া পুড়িয়ে দিলে!

পরদিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখ বেলা সাড়ে দশটা হতে না হতে গোটা অঞ্চলটা যেন আতঙ্কে পরস্পরের প্রতি আক্রোশে থমথম করতে লাগল। মনোরমা ঠাকুরবাড়িতে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন—বল দাও মা। যেন আমি মরার আগে তোমার কিছু না হয়।

গোলমাল লাগল দুপুরে। লাগল নবগ্রামে ইস্কুলে।

১৯৪৬ সালের ১৭ই আগস্ট—বেলা একটা তখন। কলকাতার সংবাদ তখন লোক মুখে-মুখে স্ফীতকায় হয়ে এসে পেঁৗছে গেছে।

কলকাতায় 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানে'র লড়াই গতরাত্রি থেকে শুরু হয়ে গেছে। এবং ধর্মতলা, মৌলালী, কলুটোলা, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে পাকিস্তান প্রায় কায়েম হয়ে গেছে। কলাবাগান অঞ্চলে কলেজ স্ট্রীটের দোকানে আগুন জ্বলছে। গোটা কলকাতায় হিন্দুরা থরথর করে কাঁপছে। তারা পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল বলে; ইংরেজ সরকার বসে দেখছে; এই ধরনেরগুজবে অঞ্চল তখন ছেয়ে গেছে। বাতাসে উত্তেজনা আতঙ্ক ভেসে বেড়াচ্ছে। নবগ্রামে মনোরমা গতরাত্রি থেকেই চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। সকাল থেকে হিন্দুদের মাতব্বরেরা আসছে। তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে। পাশে ইসলামপুর; কিছুটা দূরে মঙ্গলকোট। ইসলামপুরের আক্রোশ আছে নবগ্রামের উপর। কি হবে?

পরামর্শের জন্য সকলেই আসছে এই বাড়িতে। এ বাড়িতে সামনে দাঁড়াবার মত পুরুষ কেউ নেই বটে কিন্তু এ বাড়ির চারিপাশের পাঁচিল শক্ত—পাকা ইঁটের গাঁথনি। বাড়িও পাকা দোতলা। মাথার উপর খড়ের চাল নেই—আগুন সহজে ধরবে না। তা ছাড়া এ বাড়িতে অর্থের সামর্থ্য আছে। আরও আছে—এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত দেবী বিগ্রহে আছেন। তাঁকে রক্ষার দায়িত্বও গ্রামের হিন্দুদের। মনোরমা দেবী এখানে আসবার আগে থেকেই এ বাড়ির সব সম্পত্তি সম্পদ গ্রামের কল্যাণের জন্য খরচ হয়ে থাকে। মনোরমা দেবী যখন থেকে এসেছেন গ্রামে তখন থেকে এ বাড়ির সঙ্গে গ্রামের লোকের সম্পর্ক শুধু অনুগ্রহকারী এবং অনুগৃহীতের নয়—একটি মমতাময় প্রাণের সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে।

সকালবেলা থেকেই মাতব্বরেরা আলোচনা করে একমত হয়ে গ্রামে ছেলেছোকরা জোয়ানদের বলে দিয়েছেন যেন তারা গ্রাম থেকে বাইরে কেউ না যায়। যেন কেউ কোন মুসলমানের সঙ্গে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে কোন ঝগড়া তো দূরের কথা তকরারের সৃষ্টি না করে। ইস্কুলের হেডমাস্টারকে বলে দিয়েছেন তিনি যেন ছেলেদের সতর্ক করে দেন এবং তাদের সামলে রাখেন।

গোলমাল বাধল এই ইস্কুল থেকেই। এটা কেউ কল্পনা করে নি। কল্পনার অতীতই বটে। তবে তার একটা আয়োজন গোড়া থেকেই ছিল, সেটা মাস্টারেরা কেউ লক্ষ্য করেন নি। অনুমান করতেও পারেন নি। এদিন ইস্কুলে হিন্দু ছাত্র কম এসেছিল। গ্রামান্তরের ছেলেরা বড় কেউ আসে নি। গ্রামের হিন্দু ছেলে এবং বোর্ডিংয়ের হিন্দু ছেলেরা ছিল কিন্তু ইসলামপুর এবং আশপাশ গ্রামের মুসলমান ছেলেরা সকলে এসেছিল। মৌলবী এনায়েৎ হোসেন তাদের সকলকে নিয়ে প্রায় মিছিল করে ইস্কুলে এসেছিলেন। আসে নি কেবল মঙ্গলকোটের মিয়া বাড়ির তিনটি ছেলে।

মৌলবী এনায়েৎ হোসেন কুমিল্লার লোক। জবরদস্ত লীগপন্থী। আরবী পারসীতে নাকি বেশ শিক্ষিত লোক। এদিকে ম্যাট্রিক পাস। উর্দু বলেন ভাল। বক্তৃতা করেন। তাঁর আগে পর্যন্ত ইস্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এনায়েৎ হোসেন সাহেব এখানে আসবার পর তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেদের ইস্কুলে দেবার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ইসলামপুরে একটি মক্তব আছে। সাধারণত ইসলামপুরের চাষী গৃহস্থেরা ছেলেদের ওই মক্তবে পড়ানো শেষ করে চাষবাস বা কোন বৃত্তিতে লাগিয়ে দিত। ইসলামপুরে মিয়া পরিবার এবং দু'চার ঘর চাকুরে মুসলমান পরিবার ছাড়া বাকী সবই প্রায় চাষী এবং চাষী মজুর। ভাড়ায় গাড়ি বয়ে থাকে, ভাগে চাষ করে থাকে, দু'একজন দর্জির কাজ করে, কিছুদিন থেকে একটা বিড়ি বাঁধার কারবারও গড়ে উঠেছে। পাঁচ সাত জন পাইকার আছে। তারা গরু ছাগল কেনাবেচা করে; কয়েকজন ঘরে ঘরে ঘুরে ধান কিনে বিক্রী করে আসে। তিন-চার জন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। কিছু ছোট চাকুরে হয়েছে আজকাল। আদালতে পিওন। কয়েকজন স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে টাউটের কাজ করে। এরাই মৌলবী সাহেবের খুবই অনুগত এবং তাঁর ভক্ত।

মৌলবী সাহেব মুসলমানদের জন্য করেছেনও অনেক। ইসলামপুরের মসজিদ মঙ্গল-কোটের মিয়া সাহেবদের সম্পত্তি। সেখানে মৌলবী সাহেবের এই ধরনের জটলা তাঁরা পছন্দ করেন না বলে এনায়েৎ হোসেন ইসলামপুরে এক দলিজা তৈরী করেছেন ধান চাল চাঁদা তুলে। আগে মক্তব বসত এখানকার বর্ধিষ্ণু সেখদের বাড়ির একখানা ঘরে; এখন মক্তব বসে ওই দলিজায়। মৌলবীর চেষ্টায় সরকার থেকে মক্তবের বাড়ির জন্য টাকা মঞ্জুর হয়েছে। বাড়ি তৈরীর কাজও শুরু হয়ে গেছে। মৌলবী এনায়েৎ হোসেন নবগ্রাম ইস্কুলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য কয়েকটি ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দাবি করে তাও আদায় করেছেন। মুসলমান ছাত্রদের দুপুরে নামাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র বারান্দাও তৈরী করিয়ে নিয়েছেন তাঁর পারসী আরবী

ক্লাসের ঘরের সামনে। সেখানে তিনি নিজে নামাজ পড়েন, তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছেলেও নামাজ পড়ে থাকে। সকল মুসলমান ছেলেই তাঁর খুব অনুগত কেবলমঙ্গলকোটের মিয়াদের আত্মীয়-বাড়ির তিন-চারটি ছেলে ছাড়া। তার কারণ মঙ্গলকোটের মিয়া সাহেবরা এনায়েৎ হোসেনের সব কার্যকলাপ পছন্দ করেন না। তাঁরা নিজেরা—নিজেদের বংশের একটা রীতিনীতি ধারাধরন আছে—তার ব্যতিক্রম করে তাঁরা চলেন না। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের সম্প্রদায়গত যে সব সমস্যা অভিযোগ আছে তা নিশ্চয়ই আছে তাঁদের মধ্যে কিন্তু তাঁরা মানিয়ে চলারই পক্ষপাতী। তাঁরাও লীগপন্থী, কিন্তু উগ্রতা তাঁদের নেই। এনায়েৎ হোসেন বলেন এবং তাঁর ধারণা যে, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁরা ঈর্ষান্বিত এবং শঙ্কিত বলেই তাঁরা এবং তাঁদের ছেলেরা তাঁর অনুগত হন নি। অধার্মিক মুসলমান এবং বড়লোক বলে এনায়েৎ হোসেন তাঁদের ব্যঙ্গ করেন। কটু কথাও বলেন।

ইসলামপুরের শেখ-খাঁ থেকে সকলেই এতে খুশী হয়। মঙ্গলকোটের মিয়ারাই এখানে প্রধান। আজ বলে নয় অনেককাল থেকে। তাঁদের অবস্থা কালক্রমে খারাপ হয়ে এসেছে; অনেক ব্যবসায়ী অনেক চাষী পরিবার এখন তাঁদের থেকে বর্ধিষ্ণু; কিন্তু বিচিত্র কথা যে, এঁদের সম্মান প্রাধান্য আজও ক্ষুণ্ন হয় নি। সামাজিক এবং ইসলাম সম্প্রদায়ের সব ক্ষেত্রেই তাঁদের আসন পুরোভাগে। বর্তমানকালে রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত লীগের কর্তা-ব্যক্তিরাও এঁদের বাইরে খাতির করতে বাধ্য হন। মঙ্গলকোট এবং চক ইসলামপুরের আধুনিক সংগতিপন্ন এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ইসলামপুরের শেখেরা মঙ্গলকোটের কর্মীরা এঁদের উপেক্ষা করেই চলতে চেষ্টা করে।

১৬ই তারিখের সংবাদ অতিরঞ্জিত হয়ে এখানে এসে পৌছুলে মিয়ারা ১৭ই নিজেদের ছেলেদের ইস্কুলে এই কারণেই আসতে দেন নি। এটাও একটা সংকেত যেটা ঠিক ধরতে পারেন নি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মুসলমান ছেলেরা এসে বেশ চুপচাপই ক্লাসে পড়াশুনা করছিল। একটার সময় মনোরমা দেবীর কালীবাড়িতে ভোগের পর কাঁসর ঘণ্টা বাজতেই হঠাৎ গোলমাল বেধে উঠল।

দেখা গেল মুসলমান ছেলেরা ঠিক সেই সময়েই বারান্দায় নামাজের জন্য সমবেত হয়েছে। মৌলবী সাহেব নামাজ পড়তে বসেছেন। ছেলেরা রুদ্রমূর্তি হয়ে চীৎকার করতে করতে বের হয়ে পড়ল—বন্ধ করো, বন্ধ করো—কাঁসর ঘণ্টার বাজনা বন্ধ করো। তারা প্রায় ছুটেই চলে গেল মন্দিরের দরজা পর্যন্ত; এবং সেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল বন্ধ করো। বন্ধ করো।

—কিসের গোলমাল ?

মনোরমা ভোগ দেওয়া শেষ হতে বাড়ির ভিতরের দিকে চলেছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের গোলমাল ?

বাইরে বসেছিল ক'জন বাড়ির লোক—চাকরবাকর আর ইসলামপুরের বাগ্দী মাতব্বর নেপাল, যে কাল রাত্রে বাগ্দীদের নিয়ে ইসলামপুর থেকে পালিয়ে এসেছে সে। তারা দরজা রুখে দাঁড়াল; একজন ছুটে খবর দিতেই এসেছিল, সে মনোরমাকে দেখে বললে—মা, সর্বনাশ হয়েছে !

—কি ?—মুহূর্তে দুর্বলশরীর মনোরমা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছেন। মুখ তাঁর থমথমে হয়ে উঠেছে। তাঁর পা হাত কাঁপছে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি ? মুহূর্ত অপেক্ষা করে তীক্ষ্ন স্বরে চীৎকার করে উঠলেন—কি হয়েছে ? কি ? এই ?

—মুসলমান ছেলেরা—

—কি ? কি ?

—তারা ছুটে এসেছে দল বেঁধে। চীৎকার করছে। বলছে কাঁসার ঘণ্টা বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করো। বন্ধ করো।

—কেন ?

—তা জানি না মা।

—কোথায় তারা ?

—দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠাকুরবাড়ি ঢুকে পড়ত কিন্তু নেপাল বাগ্দী, রাম, ধীরেন এরা দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

মনোরমা ঘুরলেন। হনহন করে চললেন সদর দরজার দিকে।

—মা! মা! মা!—নায়েব ছুটে এসে পড়েছিলেন খবর পেয়ে। তিনি মনোরমাকে সদর দরজার দিকে হনহন করে যেতে দেখে শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—মা—মা—মা!

মনোরমা শুনলেন না। তাঁর ধৈর্য বিচার বিবেচনা সংযম সব ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছে এই অন্যায় অত্যাচারের বিক্ষোভ এবং ক্রোধ। হনহন করে চলেছেন তিনি—জিজ্ঞাসা করবেন ওদের ওরা কি চায় ? কেন তিনি বন্ধ করবেন কাঁসর ঘণ্টা ? কেন ?

—মা। চীৎকার করে নায়েব এবার এসে তাঁর পথ আগলে সামনে দাঁড়াল।

—ছাড়ুন পথ ছাড়ুন।

—না। আপনি ভিতরে যান। আমি যাচ্ছি।

—না—না। আমি যাব, আমি জিজ্ঞাসা করব ওদের।

—আপনার পায়ে ধরছি আমি। আপনি যান। আমি যাচ্ছি। দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন। আপনি ফিরুন। মা!

এবার থমকে দাঁড়াতে হল মনোরমাকে। তিনি ফিরলেন কিন্তু বাড়ির ভিতর গেলেন না। ফিরে গিয়ে উঠলেন মায়ের মন্দিরে। কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছিল—তারা তখন থেমে গেছে। হতভম্ব হয়ে কাঁসর ঘণ্টা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিত, ঠাকুরবাড়ির পাচক এরা সব নিরীহ ব্রাহ্মণ, এদের মুখ শুকিয়ে গেছে, তারাও দাঁড়িয়ে আছে মাটির পুতুলের মত।

ওদিকে বাইরে তখন কোলাহল আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

* * * *

বাইরে তখন জনতা হয়ে উঠেছে মস্ত বড়। ইস্কুলের হিন্দু ছেলেরা ছুটে এসেছে। হেড-মাস্টার ছুটে এসেছেন। তিনি মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। একদিকে মুসলমান ছেলেরা, অন্য-দিকে হিন্দু ছেলেরা। মৌলবীও এসেছেন। বচসা চলছে ছেলেতে ছেলেতে। হেডমাস্টার থামাতে চেষ্টা করছেন।

নায়েব বাইরে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

—কি হয়েছে ? কি চাই ? এত ভিড় কেন ?

একটি মুসলমান ছেলে বলে উঠল—আমাদের নামাজের সময়। ইস্কুলে নামাজ পড়ছিলাম। আপনাদের বাড়ি থেকে কাঁসর ঘণ্টা বাজানো হল। কেন ? ও বাজানো চলবে না। বন্ধ করতে হবে।

নায়েব বিষয়ী লোক। তিনি ফৌজদারী বোঝেন, ফৌজদারী বিষয় নিয়ে ফৌজদারী। কিন্তু এই রাজনৈতিক দাঙ্গাকে তিনি ভয় করেন। তিনি জানেন যে, এর পিছনে সরকারের মুখখানা উঁকি মারছে আশকারা দিচ্ছে। কিন্তু আজ তিনিও যেন ধৈর্য হারাতে বসেছেন। ক্ষোভে ক্রোধে তাঁর অন্তর জ্বলে গেল। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন—এটা কি মগের মুলুক, না তোমরা একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা করবার জন্যে মতলব করে এখানে আজ এমন করে এসেছ ? মতলবটা কি ? কি চাও কি তোমরা ?

ছেলেরা চুপ করে গেল। মৌলবী এনায়েৎ হোসেন দু'পা এগিয়ে এসে বললেন—আমরা চাই যে, দুপুরে নামাজের সময় আপনাদের এখানে এমন কাঁসর ঘণ্টা বাজবে না।

—এ আপনি কি বলছেন মৌলবী সাহেব? হেডমাস্টার এগিয়ে এলেন।

—হক কথা, আমাদের দাবির কথা বলছি মাস্টার সাহেব।

—না বলছেন না।

—মানে? সারা বাংলা মুলুকে নামাজের সময় বাজনা থামাতে হয়। না থামালে আমরা থামাতে জানি।

—সে মসজিদের সামনে। ইস্কুল আপনাদের মসজিদ নয়।

—যেখানে আমরা নামাজ পড়ি সেইখানেই আমাদের মসজেদ।

—না!

একটা গর্জন উঠল সমবেত কণ্ঠে। চারিপাশে তখন হিন্দু জনতা স্ফীত হতে হতে বিপুল জনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। এবং ক্রমান্বয়েই লোক ছুটে এসে জমছে। তারা সমস্বরে ক্রুদ্ধ গর্জনে প্রতিবাদ করে উঠল—না!

মৌলবী এনায়েৎ হোসেন বললেন—এর জবাব আমরা দিব। দিতে জানি। চলো সব মুসলমান ছেলে—চলো।

বলেই তিনি পিছন ফিরে ইসলামপুরের দিকে মার্চ করে চলতে লাগলেন। ছেলেরাও তাঁর অনুসরণ করলে। তিনি ধ্বনি দিতে লাগলেন—ছেলেরা প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

পিছনে এদিকে সমবেত জনতার মধ্যেও উত্তেজনার সীমা ছিল না। হেডমাস্টার নিজে মাঝখানে বাধার মত দাঁড়িয়ে না থাকলে একটা কিছু তখনই ঘটে যেত। তাদের বহুজন হাতে ঢেলা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

নায়েব এবার সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন—এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করো না তোমরা। এখান থেকে সরে যাও। তবে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। মনে হচ্ছে এতেই শেষ হবে না। একটা গণ্ডগোল ওরা বাধাবেই।

কেউ একজন অতি উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে ধ্বনি দিয়ে উঠল—বন্দে মাতরম্।

জনতাও প্রতিধ্বনি তুললে—ব—ন্দে মা—ত—রম্।

তারপর বাঁধ ভেঙে গেল। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির কল্লোল গর্জন নবগ্রামের আকাশ স্পর্শ করে ঊর্ধ্বদিকে ছুটল—এদিকে ছুটল দিগন্ত অতিক্রম করে।

নায়েব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই ধ্বনি চক ইসলামপুর পর্যন্ত পেঁছুলেই সেখান থেকেও ধ্বনি উঠবে—আল্লা হো আকবর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!

তারপর হয়তো একসময়ে তাদেরও দেখা যাবে তাদের গ্রামের প্রান্তে। ক্রমে একসময় তারা ছুটে আসবে এরা ছুটে যাবে এবং একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষে তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে।

তিনি দু'হাত তুলে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন—থামো থামো। শুনছ, থামো—তোমরা থামো।

তার সঙ্গে হেডমাস্টার মশায়ও চীৎকার করে বললেন—থামো। থামো।

হয়তো থামতো। কিন্তু মন্দিরপ্রাঙ্গণের ভিতরে একটা অকল্পিত কাণ্ড ঘটে গেল। ঝনোঝনো শব্দে কাঁসরটা বেজে উঠে জনতার এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে যেন বাদ্যযন্ত্রের মত বাজতে লাগল।

—কে? কে?—কে?

নায়েব ভিতরে গিয়ে দেখলেন মনোরমা নিজে কাঁসরটা নিয়ে প্রায় পাগলের মত বাজিয়ে চলেছেন। মনোরমা মন্দিরে বারান্দায় দেবীপ্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন।

তাঁর দুর্বল দেহ—বিক্ষুব্ধ অন্তর ; অজয় ঘর থেকে চলে যাওয়া অবধি ক্ষোভের একটি অন্তর্দাহে নিরন্তর তিনি যেন ভিতরে ভিতরে পুড়েই চলেছিলেন, অবলম্বন আশ্রয় করেছিলেন এই দেবতার্চনাকে, আজ তাতে আঘাত পড়তেই তিনি যেন জ্বলে উঠেছেন। তাঁর সব জ্ঞান যেন হারিয়ে গেছে। বাইরের জনতা অকস্মাৎ এই ধ্বনি দিয়ে উঠতেই বারেকের জন্য চমকে উঠেছিলেন—তারপর একটা উন্মত্ত উল্লাস তাঁকে পেয়ে বসল—তিনি হঠাৎ একসময় উঠে গিয়ে বারান্দার কোণে নামিয়ে রাখা কাঁসরটাকে তুলে নিয়ে সেটা ঝনোঝনো শব্দে বাজাতে আরম্ভ করেছেন।

নায়েব কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে ডাকলেন—মা—মা—মা !

মনোরমা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টি অসুস্থ অস্বাভাবিক।

—মা থামুন। মা ! মা !

তবু মনোরমার ভ্রূক্ষেপ নেই। নায়েব বুঝতে পারলেন মনোরমা শুধু কাঁসর বাজাচ্ছেন না, সঙ্গে সঙ্গে টলছেন।

—মা ! প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন নায়েব।

মনোরমার হাত থেকে এবার কাঁসরটা ঝনঝন শব্দ করে খসে পড়ে গেল। এবং পরমুহূর্তেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে মন্দিরের বারান্দার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। পড়ে যাওয়া কাঁসরটার কানায় লেগে তাঁর কপালের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল—সাদা মার্বেলের মেঝে লাল হয়ে গেল।

নায়েব চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মন্দিরপ্রাঙ্গণও জনতায় ভরে গেছে। তারা স্তব্ধ বিস্ময়ে মনোরমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তাদের মনে হচ্ছিল যে, দেবতাই বুঝি মনোরমার দেহ বা আত্মাকে আশ্রয় করে বহ্নিশিখার মত জ্বলছেন। আর কিছুক্ষণ হলে এই উত্তেজিত ধারণাবশে তাদেরও একটা উন্মত্ততায় পেয়ে বসত। কিন্তু মনোরমাকে পড়ে যেতে দেখে চমক ভাঙল তাদের।

নায়েব বললেন—জল—জল। জল আর পাখা। একজন কেউ শিগ্‌গির গিয়ে ডাক্তারকে খবর দাও। দেখ তো দেখ তো ডাক্তার বাইরে আছেন কিনা? ডাক্তারের তো নিশ্চয় এই সমবেত জনতার মধ্যে থাকবার কথা। দেখ তো ! আর মাস্টারমশাই কই ? মাস্টারমশাই—আপনি লোকজনদের একটু দেখুন। একটু ভুলে যেন সর্বনাশ না হয়ে যায়।

ডাক্তার এবং হেডমাস্টার দুজনেই এসে ভিড় ঠেলে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এলেন। ডাক্তার মনোরমার হাতখানি তুলে নিলেন—নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

হেডমাস্টার ঝুঁকে পড়ে নায়েবের কানের কাছে মুখ এনে বললেন—মঙ্গলকোটের বড়মিয়া সাহেব লোক পাঠিয়েছেন।

—মঙ্গলকোটের বড়মিয়া সাহেব—আফতাপউদ্দিন সাহেব ?

—হ্যাঁ। বাইসিকিলে করে একজন লোক—ওঁদেরই একজন হিন্দু কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন চিঠি দিয়ে। খুব দুঃখ করে লিখেছেন—এই কাণ্ডটা ঘটবে এটা তিনি আগে ঠিক খবর পান নি। পেলে তিনি নিজে এসে দাঁড়াতেন—ঘটতে দিতেন না। তিনি লিখেছেন—আমরা যেন ধৈর্য ধরে থাকি। সহজে কিছু ঘটতে না দিই। তিনি নিজে ওখানে খুব চেষ্টা করছেন যাতে কোন কিছু না ঘটে। বলেছেন ক'দিনের জন্য ইস্কুলটা বন্ধ করে দিতে।

নায়েব বললেন—বলে দিন আমরা ধৈর্য ধরেই আছি। তাঁকে আমরা সেলাম জানাচ্ছি। আর কি বলব ?

তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন ?

—বড় দুর্বল। উত্তেজনায় হয়ে গেছে এটা। সাংঘাতিক কিছু হতেও পারত কিন্তু তা হয় নি। এখন বিশ্রাম চাই।—এই যে চোখ মেলছেন।—

১৮ই আগস্ট মনোরমা নায়েবকে ডেকে বললেন—আমি একবার বর্ধমান যাব। আপনি ব্যবস্থা করুন। আজই। দুপুরের আগে পেঁছুতে চাই। নাহলে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস সাহেব এঁদের সঙ্গে দেখা করার অসুবিধে হতে পারে। আর সন্ধ্যের আগে ফিরে আসাও সম্ভবপর হবে না।

নায়েব বিব্রত হয়ে বললেন—এই অবস্থার মধ্যে ওই সব মুসলমান গ্রামের পাশ দিয়ে যাবেন আপনি—যাবেন মা—

—না গেলে কে যাবে ? সন্তান থাকতেও আমার নেই। আমাকে যেতেই হবে। কাল সারারাত্রি আমি ঘুমুই নি।

—সেই জন্যে আরও বলছি। শরীরের অবস্থা ভাল নয়। তার উপর এই উত্তেজনার মধ্যে—

দৃঢ়কণ্ঠে মনোরমা বললেন—না। আমাকে যেতেই হবে। আমি জেনে আসব তাঁদের কাছে, আমাদের রক্ষার ভার আমাদেরই নিতে হবে, না তাঁরা কিছু করবেন ?

—করলে তো করতেন মা। থানায় তো খবর পাঠিয়েছি কাল একটার পরই। কই একজন কনেস্টবলও তো পাঠালে না থানা থেকে। ভার চিরকালই নিজেকে নিতে হয় মা। ভার কি কেউ পরে নেয় ?

—সেই কথাটা জেনে আসব। আর মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করব। শ্বশুরের দেবোত্তরের দলিল নিয়ে পরামর্শ আছে আমার। অজয় দেবকার্যে বিশ্বাস করে না—সে যা নিয়ে আছে তাই নিয়ে থাক, আমার ঠাকুরকে রক্ষা করবে যারা তাদের হাতেই এ ভার আমি দিয়ে যেতে চাই। তার জন্যে যা করার দরকার তা আমাকে করতেই হবে। আপনি বাধা দেবেন বলে বলছিলাম না। কিন্তু এ কাজ আমাকে করতেই হবে। আমি কাল শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি শ্বশুরকে। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। আপনি না বলবেন না। আমি যাবই। যেতেই হবে আমাকে।

নায়েব বললেন—দেখি মা! ব্যবস্থা তো গরুর গাড়িতে হয় না। সে কিছুতে হতে পারে না। পথে যাবেন—সঙ্গে না-হয় চার-পাঁচ জন পাইকই নিলেন। তার বেশী লোক জোটানো যায় কিন্তু নিয়ে তো পথে বের হওয়া যায় না। পালকি হতে পারে। তাতে বেহারা থাকবে দশ-বারো জন। পাইকও থাকতে পারবে। দেখি তার ব্যবস্থা যদি করতে পারি। পালকিটাও ঠিক নেই।

—সে না পারেন আমি পথে হেঁটে বেরিয়ে পড়ব।

মনোরমার মুখ চোখ দেখে নায়েব মনে মনে শিউরে উঠলেন। ঝি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে এতক্ষণে কথা বললে, বললে—যদি যাবেনই মা তবে কিছু মুখে দিন। কাল থেকে তো একরকম নিরম্বু উপোস করে আছেন।

মনোরমা তিক্তকণ্ঠে বললেন—মরণের পর তো পুনর্জন্ম পর্যন্ত নিরম্বু উপবাসই আমার অদৃষ্টের ফল। বৎসরান্তে শ্রাদ্ধ করে ছেলে তো পিণ্ডি দেবে না। অভ্যেসটা করে রাখা ভাল। মেলা বকিসনে।

পালকি করেই যাওয়ার ব্যবস্থা হল। সঙ্গে নায়েব পাইক বেহারা নিয়ে বারো চোদ্দ জন লোক। এবং মুসলমান গ্রাম দূরে রেখে, সোজা পথ ছেড়ে ঘুর-পথে হিন্দু গ্রাম হয়ে বর্ধমানে

এসে পৌঁছুলেন মনোরমা। উঠলেন মহেন্দ্রবাবুর বাসায়। বর্ধমান শহরও থমথম করছে। মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে তখন অনেক লোকের ভিড়। হিন্দু প্রধানেরা সকলে এসে ওই আলোচনাতেই ব্যস্ত। বর্ধমানেও যে কোন সময়ে হাঙ্গামা লাগতে পারে এই আশঙ্কায় উত্তেজিত এবং সশঙ্ক আলোচনার শেষ নেই। বর্ধমান শহরে হিন্দুসংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেছেন একটা।

এরই মধ্যে মনোরমা দেবী এসেছেন সংবাদ নিয়ে নায়েব গিয়ে দাঁড়াতেই মহেন্দ্রবাবু শুধু ব্যস্ত হয়েই উঠলেন না, কিছু বিরক্ত হয়েও উঠলেন। বললেন—সে কি—এই অবস্থায়! আপনারও কি কোন আক্কেল নেই মশাই? আমরা তো সব খবর পেয়েছি নবগ্রামের। আমরাই আজ লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলাম। এই অবস্থায় -

বলতে বলতে তিনি উঠে বাইরে এলেন।

মনোরমার পালকি মহেন্দ্রবাবুর অন্দরের দরজায় নেমেছিল কিন্তু মনোরমা তখনও নামেন নি। নায়েব এসে বললেন—মা, উকীলবাবু এসেছেন।

মহেন্দ্রবাবু তিরস্কার করেই বললেন—এ অবস্থায় আপনি কেন এলেন মা? না—না না। এ আপনার উচিত হয় নি।

মনোরমা উত্তর দিলেন না।

নায়েব ডাকলেন—মা! মা!

পালকির ভিতর একটা বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় মনোরমা ক্লান্ত হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছেন। নায়েব এবার পালকির ভিতর উঁকি মেরে দেখে চমকে উঠে বললেন—মা মা! মা! তারপর সঙ্গে সঙ্গেই গায়ে হাত দিয়েই বললেন—এ কি!

—কি?

—মা! মা! এ কি এ যে অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

—সে কি?

—হ্যাঁ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বলেই মনোরমার হাতখানি তুলে নাড়ি ধরলেন।—সর্বনাশ! এ যে নাড়ি অত্যন্ত ক্ষীণ—মধ্যে মধ্যে—

মহেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—জল জল। ওরে জল নিয়ে আয়। শিগ্‌গির। ওহে রজনী, শিগ্‌গির হরেন ডাক্তারকে ডাক। শিগ্‌গির। কি বিপদ বল দেখি! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী! এই অবস্থায় উনি চলে এসেছেন! ছি—ছি—ছি!

দুর্বলতায় উত্তেজনায় মনোরমা অজ্ঞান হয়েই গিয়েছিলেন। ডাক্তার বললেন—অত্যন্ত দুর্বল, এখন পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। নিজের শরীরকে উনি উপবাসে অর্ধাহারে প্রায় শেষ করে এনেছেন।

মনোরমা শুনলেন। কোন কথা বললেন না বা বলতে পারলেন না।

ডাক্তার বললেন—আমি বলি এখানেই উনি এখন থাকুন। গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। তা হলে—।

মনোরমা বললেন—তা হলেই কি আমার জীবন সার্থক হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন—তা তো আমরা বলতে পারব না। তবে ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি, তা হলে আপনি বাঁচবেন। আমরা যেটা দেখি সেটা বাঁচা আর মরা।

—কিন্তু আপনি তো শুধু ডাক্তারই নন আপনি মানুষও বটেন।

ডাক্তার হাসলেন। বললেন—এর উত্তর আমি দিতে পারব না মা।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—নবগ্রামের ভার আমরা নিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—নিশ্চিন্ত থাকব?

—হ্যাঁ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

—দিচ্ছেন ?

—দিচ্ছি।

—বেশ, তা হলে আমি আপনাদের নির্দেশ মেনেই চলব। ডাক্তারবাবু এখানে থাকতে বলছেন—থাকব। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রতিশ্রুতি আমাকে দিন আপনি !

—বলুন।

—শ্বশুরের দেবোত্তরের দলিল দেখুন—দেখে এই দেবোত্তর যাতে জনসাধারণের হাতে যায়, যাতে আমার ছেলে অজয় এতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তার কোন অধিকার না থাকে তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

মহেন্দ্রবাবু নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

মনোরমা বললেন—বলুন !

মহেন্দ্রবাবু বললেন—তার আগে তার সঙ্গে একবার আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

—কিসের জন্যে ? সে মা দেবতা সবই পরিত্যাগ করে তো চলে গেছে।

—গিয়েছে আরও বড় কিছুর জন্যে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে। আপনার সন্তান তো কুসন্তান নয়।

মনোরমা চুপ করে রইলেন এবার। কয়েক মুহূর্ত পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন। কয়েক মুহূর্ত পর বোজা চোখের দুটি কোণ থেকে দুটি শীর্ণ জলের ধারা গড়িয়ে নেমে এল।

—আপনি একটু ধৈর্য ধরে নিজেকে শক্ত করুন। অজয় আপনার একমাত্র সন্তান। আর সে কুসন্তান নয়, সুসন্তানই বটে। তার জন্যে আপনার মনের বেদনা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সে বেদনাকে জয় করতে হবে আপনাকে !

এবার মনোরমার অন্তর বিদীর্ণ করে কথা বেরিয়ে এল। তিনি যেন ভেঙে গেলেন। বললেন—সে গেছে আজ চার মাসের উপর। আমাকে চিঠি দিয়েছে—আমি তার উত্তর দিই নি। তাতেও সে আমার অন্তরটা বুঝলে না বাবা ! তাতেও সে একবার এল না আমাকে দেখতে !

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—মরবার আগে তাকে হয়তো দেখতেও পাব না। তার হাতের আগুন আমার মুখেও পড়বে না।

এবার দরদরধারায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—আপনি ধৈর্য ধরুন। সে যেখানে থাক আমি তাকে আনিয়ে দিচ্ছি।

—বেশ। আপনি তা হলে একবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন আমার হয়ে। বলুন তাঁদের আমার কথা নবগ্রামের কথা—তাঁরা কি বলেন আমাকে এসে বলুন। যদি জাত ধর্ম দেবতা নাই থাকে তবে তা অন্যের হাতে যেতে দেব কেন ? দেবতাকে বিসর্জন দেব—তারপর বিষ খেয়ে মরে জাত ধর্ম রক্ষা করব। আর পারি তো নিজেরা নিজেদের শক্তিতে পায়ে দাঁড়িয়ে সব রক্ষা করে বাঁচব।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—তার জন্যেও ব্যস্ত হবেন না আপনি। দু'দিনের মধ্যে অবস্থা ফিরে গেছে। কলকাতায় হিন্দুরা উঠে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আজ সকালে এম-এল-এ খানবাহাদুর কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। লীগপন্থী লোক, তবুও ভাল লোক। দেখলাম মুখ চোখ বসে গিয়েছে। যেন কতদিন রোগভোগ করেছেন। শুনলাম মুসলমানরা তাঁর কাছে গিয়েছিল নির্দেশের জন্য। তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন। বলেছেন—পড়শীর

ঘরে আগুন দিতে যাবার আগে ভেবে রেখো সে আগুন তোমার ঘরেও লাগবে। এটা অধর্ম এ অন্যায়। ইসলাম ই কথা বলে না। যারা বলে এমন কথা এমন কাজ করে তারা অধার্মিক। তারা মুসলমান নয় ই আমি হাজারবার বলব। লাখবার বলব। তিনি আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন, বলেছেন—বর্ধমানে ই অঞ্চলে যাতে এ আগুন না ছড়ায় তার জন্যে দু'পক্ষ মিলে কমিটি তৈরী করবার জন্য। সেই কথাই আমরা আলোচনা করছিলাম এমন সময় আপনার পালকি এল। আমি উঠে এলাম।

মনোরমা শুনে বললেন—মংগলকোটের খাঁসাহেবও আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনিও এমনি কথাই বলেছেন। ও'রা ভাল লোক। কিন্তু এমন ভাল লোক ক'জন। তাঁদের কথা শোনে তবে তো!

—না শোনে নিজের রক্ষার ভার নিজেরাই নেব আমরা।

—আপনাদের মত লোক সে কথা বললে আমি মেয়েছেলে আমি আর ভাবব না। তবে অজয়কে একবার আমার কাছে এনে দিন। একবার সে আমাকে দেখা দিয়ে যাক। আমি আর ভাবব না।

মহেন্দ্রবাবু ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন। বর্ধমানে মহেন্দ্রবাবু এক-কালের প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী এবং মাননীয় ব্যক্তি। তা ছাড়া উকীল হিসাবে সব থেকে বড় উকীলদের একজন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী সংগে সংগেই প্রায় এসে উপস্থিত হল। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মনোরমার কাছে। বললেন—এ'কে তুমি চোখে দেখ—এ'র কি অবস্থা!

কথার অর্থ প্রথম সে বুঝতে পারে নি। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—কেন?

মহেন্দ্রবাবু বললেন—ইনি মনোরমা দেবী। নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। নবগ্রামে এ'দের কীর্তিকলাপের কথা বর্ধমানে কারুর অজানা নয়।

সেক্রেটারী বললে—নিশ্চয় জানি। তা ছাড়া উনি অজয়ের মা। অজয় আমাদের পার্টি'র ওয়ার্কার।

—সেই অজয়। অজয় আজ চার মাস চলে গেছে কলকাতায়। ও'র এই শরীরের অবস্থা। এ অবস্থা শুধু অজয়ের জন্যে। তুমি কোন রকমে অজয়কে একবার নিয়ে এস। কাজ সে করতে চায়, দেশের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছে—বারণ তো উনি করেন না—কিন্তু সে তো কাজ এখানে থেকেই মানে বর্ধমানে থেকেই করতে পারে!

মনোরমা বসে ছিলেন। মুখ নীচু করেই বসে ছিলেন। তিনি এবার মুখ তুলে বললেন—সে কিছুদিন আগে আমাকে পত্র লিখেছিল সে চট্টগ্রামে যাচ্ছে, তারপর আর কোন খবর আমি পাই নি। তার খবরের জন্যে আমার মায়ের প্রাণ বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে বাবা। বড় উদ্বিগ্ন! আমাদের নায়েবকে আমি কলকাতা পাঠাচ্ছি—আপনি যদি সংগে যান—নইলে আপনাদের পার্টি আপিস কি কোন খবর ও'কে দেবে?

—আমাকে সংগে যেতে বলছেন?

—যদি দয়া করে যান।

—আমি সংগে লোক দিচ্ছি। সে নিয়ে যাবে ও'কে—আমি বরং তার হাতে পত্র লিখে দিচ্ছি। এই সময়ে আমি তো বর্ধমান ছেড়ে যেতে পারব না।

—আপনি গেলেই ভাল হত।

—আমি যে লোক দেব সে পার্টি'তে সকলের প্রিয়। কলকাতার আপিসেই সে কাজ করত। অজয়কেও সে জানে। কিন্তু আজ তো যাওয়া হবে না। এখনই তো পাঁচটা

বাজে। এর পর ট্রেন ধরে কলকাতা পেঁছুতে রাত্রি হবে। রাত্রিতে কলকাতা পৌঁছুনো তো নিরাপদ হবে না। কাল।

- বেশ। কালই যাবেন নায়েববাবু।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী চলে গেল। মনোরমা বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

নায়েব আসতেই বললেন—আর দেরি করলে বাড়ি পেঁছুতে রাত্রি হয়ে যাবে নায়েববাবু। এখুনি উঠবার ব্যবস্থা করুন।

—সে কি? এই অবস্থায় আপনি—

—হ্যাঁ। এই অবস্থাতেই আমি যাব। আমার দেবতা আছেন সেখানে। আমি মৃত্যু-ভয়ে এখানে থাকতে তো পারব না। কিছুতেই না। বেহারারা কোথায়?

বলতে বলতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এবং চলতে আরম্ভ করলেন। নীচে এসে মহেন্দ্র-বাবুর আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—বাবা! আমি নবগ্রামে ফিরছি। এখানে থেকে আমার চিন্তার অবধি থাকবে না। আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আপনি ভাববেন না। আমার কিছু হবে না। আমি এখন খুব সুস্থ হয়েছি। আমি ফিরে যাচ্ছি।

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গভীর বেদনায় ঘাড় নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পাশের বন্ধুটির দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছেন। হয়তো এ দুর্যোগ পার হতে হতে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবেন ভদ্রমহিলা।

পালকির বেহারারা বাড়ি ফিরে যাবে সন্ধ্যের আগে এবং আবার পরদিন ফিরবে এই কথা হয়েছিল। তারা বাড়ি যাবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল। পাইকের ডাকে আবার তারা এসে পালকির কাছে দাঁড়াল; মনোরমা পালকিতে উঠবেন, এমন সময় এসে দাঁড়াল নমিতা। মনোরমার কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললে—আপনি অজয়বাবুর মা। আমি আপনাকে চিনি। আপনি চেনেন না। ফরওয়ার্ড ব্লকের আমিও ওয়ার্কার। আমিই আপনার নায়েবের সঙ্গে যাব। আপনি যা বলেছেন তাই হবে। তাকে নিয়ে এসে আপনার কাছে আমি পেঁছে দিয়ে যাব। আপনি ভাববেন না।

মনোরমা মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মুখে বসন্তের দাগ। ক্ষতচিহ্নিত মুখখানি যেন কোথায় দেখেছেন।

এ যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। পাথরে মাটিতে জলধারার অভিষিক্ত জমাট একটা পাহাড় যেন বহুকাল পূর্বের সঞ্চিত বিষ বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। পলাশীর পর থেকে পরাধীনতার দুর্বহ প্লাবনে যে বিষ ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল তার উপরে পড়েছিল পলির স্তূপ—ভেসে আসা পাথর যা জমাট বেঁধে ছিল সূর্যালোকের তপস্যায় তা বন্যার জল শুকিয়ে আসবার উপক্রম হতে শুধু মাটি শুকোল না, বিস্ফোরক শুকনো হল এবং স্বভাবধর্মে বিস্ফোরণ ঘটালে।

পরাধীনতার এই দেড়শো বছরের অধিক কালের মধ্যে কত চেষ্টাই না হয়েছে এই বিস্ফোরককে জলঢালা বারুদের মত একটা অকর্মণ্য জড়পিণ্ডে পরিণত করতে, কিন্তু দেখা গেল তা সব মিথ্যা হয়ে গেছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে প্রয়াস তো কম হয় নি। এবং সে প্রয়াস যে নিতান্ত মাটি দিয়ে গড়া মূর্তির মত জল লাগলেই গলে যাবার মত বস্তুও তো নয়। আন্দোলন হয়েছিল, এবং সে আন্দোলন নেতারা সচেতনভাবে গড়ে তুলেছিলেন তাও সত্য কিন্তু

সেইটে তো পূর্ণ সত্য নয়। অন্তরে অন্তরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় বেদনাও তার মধ্যে ছিল। লর্ড কার্জন যে অস্ত্র দিয়ে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ভাগ করেছিল সেই অস্ত্রের মুখে জাতীয়তার একটি অখণ্ড মূর্তিও খোদাই হয়ে গিয়েছিল। তার মহিমার আকর্ষণে হিন্দু মুসলমান সবাই আকৃষ্ট হয়েছিল।

১৯২১ সাল থেকে আর এক প্রবলতর আবেগ সঞ্চারিত হয়ে তাকে যেন পর্বতের অটল অক্ষয় মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু তাতেও সে বিস্ফোরকের বিস্ফোরণী শক্তি নিঃশেষিত হয় নি। তাকে উত্তপ্ত করে তুললে মানুষেরই কুটিল স্বার্থবুদ্ধি। ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত দু'দিক থেকেই। এবং তাতে ইন্ধন যোগালে ইংরেজ।

ভারতবর্ষ জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেও মুসলমান হিন্দুর কাছে উঁচু হতে পারে নি, অস্পৃশ্য থেকে গেছে—এ কথা মুসলমানের মন থেকে মোছে নি। মুসলমান মন্দির ভেঙে দেবমূর্তি ভেঙে জোর করে জাতিচ্যুত করে যে মর্মান্তিক আঘাত করেছে তাও হিন্দু ভুলতে পারে নি। মুসলমান ভুলতে পারে নি তারাই ছিল ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারী শাসকের জাতি; হিন্দু ভুলতে পারে নি মুসলমান বাইরে থেকে এসে তার দেশ দখল করেছিল—যুদ্ধের ন্যায়নীতি মানে নি। ভুলতে পারে না এ দেশে তারাই সংখ্যাধিক্য মানতে পারে না এ দেশ একা তাদের দেশ নয়। পরাধীনতার পেষণ যখন প্রবল ছিল তখন এই বোধ স্তিমিত হয়ে ছিল; তখন ওই চাপের তলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে দুই পক্ষই সমানে হয়তো হাতে হাত মিলিয়ে সে চাপকে তুলে দূরে ফেলতে সমান শক্তি প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু চাপ কিছুটা হালকা হতেই নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পেয়েই দুই পক্ষই সচেতন হয়ে উঠেছে—মনে পড়েছে পুরাতন কথা। তবুও একথা সত্য যে হিন্দুদের তরফ থেকে গান্ধীজী নেতাজী তার সঙ্গে নেহেরু এঁরা সে মনকে উগ্র হতে দেন নি। বার বার হিন্দুকে সাবধান করেছেন, তাদের স্বার্থত্যাগে প্রবুদ্ধ করেছেন। কিন্তু মুসলমানকে উগ্র এবং এত প্রবুদ্ধ করে তুলেছে মুসলীম লীগের নেতারা। জিন্না সাহেব তার পুরোহিত। তার উত্তরসাধক আমীর এবং ওমরাহদের বংশধরেরা। জিন্না সাহেবের চৌদ্দ দফা শর্ত মুসলমানদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। যুগে যুগে এমনি নেতার ভুল জাতিকে বিভ্রান্ত করে। কংগ্রেসের ভুল প্রকাণ্ড। বাংলার মুসলমানেরা তো জিন্না সাহেবের লীগপন্থী ছিল না। জনাব ফজলল হকের অনুগামী ছিল তারা। হক সাহেব ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দরিদ্র চাষী মুসলমানের কল্যাণকামী। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করতে। লীগপন্থী খাজা নাজিমুদ্দিন সুরাবর্দীর সঙ্গে মিলতে চান নি। কিন্তু কংগ্রেস সেদিন মিলতে চায় নি। যদি মিলত তবে আর যাই হোক ফজলল হক সাহেব লীগের সঙ্গে মিলে লীগকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতেন না। জিন্না সাহেব বিদেশে যাবার আয়োজন করেছিলেন চলে যেতেন।

ভারতের এই দুর্ভাগ্যের অন্তরালে একটি অপরূপা নারীর মুখ উঁকি মারে। সে নারীর নাম রতনবাঈ। পার্শী ধনকুবের জাহাঙ্গীর পাটিটের কন্যা। জিন্না সাহেবের সঙ্গে তার প্রেম হয়। বাপকে লুকিয়ে জিন্না সাহেবকে বিবাহ করেন। ধনকুবের পার্শী জাহাঙ্গীর জিন্না সাহেবকে বয়কট করে তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। বিলেতে চলে যান জিন্না সাহেব। তিক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি এ দেশের মুসলিম বিদ্বেষে। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রশ্ন নিশ্চয় জেগেছিল জিন্না সাহেবের মনে। কেন? কি তাঁর অপরাধ? জাহাঙ্গীর পাটিট তো তাঁর কন্যাকে অসূর্যম্পশ্যা করে তৈরী করেন নি; তাঁকে স্বাধীনা করে জীবনে তো স্বামী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছিলেন। তবে? রতনবাঈ যদি কোন ইউরোপীয়কে ভালবেসে বিবাহ করত তবে তিনি কি করতেন? তিনি তো রতনবাঈকে

অপহরণ করেন নি। তবে? কেন এই বিদ্বেষ—কেন এই ঘৃণা? তিনি মুসলমান বলে?

বিলেত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল জাহাঙ্গীর সাহেবের সুদীর্ঘ হস্ত। সেখানেও বিব্রত করে তুলেছিল তাঁকে ভারতীয় সমাজের বয়কট। প্রিভি কাউন্সিলে এখানকার আপীল যাতে জিন্নাকে ॥ দেওয়া হয় তার জন্যে জাহাঙ্গীর সাহেব সহযোগিতা চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেনও। জিন্না অনুভব করেছিলেন—এই যন্ত্রণার মধ্যে অনুভব করেছিলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমানের যে ঐতিহাসিক স্থিতি তার চারদিকে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে আত্মীয় বলে অস্বীকৃতির বিদ্বেষের পুঞ্জ। মুসলমান ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রেখেছে তার দায়িত্ব নিয়েই তিনি 'নদারুণ ক্ষোভে চেয়েছিলেন মুসলমানের অধিকার হিসাবে পাকিস্তান। তিনি নিজে শিক্ষায়-দীক্ষায় ছিলেন পাকা সাহেব। ইসলামী অনুশাসন তিনি মেনে চলতেন না। রতনবাঈ পর্বের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে ছিলেন কংগ্রেসের উৎসাহী সভ্য। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ক্ষোভ সব বিপর্যস্ত করে দিল। তিনি সেই ক্ষোভে অতীত ইতিহাসকে করলেন পুনর্জীবিত। সাহায্য করেছিল ইংরেজ।—ভুল। এ তাঁর ভুল। সেই ভুল আর সেই ক্ষোভে কলকাতায় ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। ভুল কংগ্রেসের ফজলল হকের সঙ্গে যোগ না দেওয়া। ভুল ফজলল হকের লীগের সঙ্গে যোগ দেওয়া। ফজলল হক আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিহীন, দূরে নিক্ষিপ্ত। কংগ্রেসের ভুলে আজ বাংলার মুসলমান লীগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে লীগের সুপরিকল্পিত রচনা। ক'দিন আগে জিন্না বলেছেন—ডাইরেক্ট অ্যাকসন ডে কি তা কলকাতায় গিয়ে প্রত্যক্ষ কর। সুরাবর্দী তাঁর সুদক্ষ যোগ্যতম সিপাহসালার। তাঁর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন তাঁর পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করবেন সুরাবর্দী। তিনি জানতেন কারও সাধ্য হবে না একে রোধ করতে।

রোধ করতে পারতেন একজন।

নেতাজী! নেতাজী যদি এসে উপস্থিত হতেন, তাঁর উপস্থিতিমাত্র থেমে যেত এই আত্মঘাত। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পুরোভাগে তিনি—তাঁর পাশে শাহনওয়াজ হবিবুল্লা—এই তো ছিল হিন্দু মুসলমানের অতীত ইতিহাসকে অতিক্রম করে ইতিহাসের নূতন অধ্যায় উন্মোচনের ভূমিকা—ভিত্তি।—মুখে মুখে বলে যাচ্ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা এবং লিখে যাচ্ছিল একটি ছেলে। তার আশেপাশে ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বুলেটিনের মত ছাপা হয়ে বিলি হবে।

বক্তা বললেন—আর বলতে গেলে বড় হয়ে যাবে। এবার প্যারা করে আরম্ভ কর—বোল্ড টাইপে হবে—তিনি আসবেন। তাঁর আবির্ভাব স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু তার আগে ভারতের হিন্দু মুসলমান তোমরা স্থির হও—প্রতিনিবৃত্ত হও এ আত্মঘাতী সংঘর্ষ থেকে—

একজন বলে উঠলেন—আমার কিন্তু বক্তব্য আছে দাদা—

বক্তা তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন—বল।

—এ আমার ভাল লাগল না।

—কেন?

—কারণ এইভাবে ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির এই কি সময়? জিন্না সাহেবকে নিয়ে যে সব কথা লিখছেন তাতে তো মুসলমানেরা আরও বিরূপ হবে।

—কিন্তু ইতিহাস খুলে কারণকে তুলে না ধরলে অ্যাপীল দাঁড়াবে কিসের উপর?

—রতনবাঈ—

—হ্যাঁ। রতনবাঈ জিন্না সাহেবের সমস্ত জীবন এবং কর্মের মধ্যে গাইডিং ফ্যাক্টর। এবং সে দিক দিয়ে জিন্না সাহেবকে দায়ী একবারে করিনে তা নয় কিন্তু তার চেয়ে বেশী

দায়ী করি রতনবাঈয়ের বাপকে। সে যখন মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং রতনবাঈ যখন জিন্না সাহেবকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করেছে তখন জিন্না সাহেবের দায়িত্ব সব থেকে কম। একমাত্র বলতে পার জিন্না জাহাঙ্গীরের বন্ধু ছিলেন—রতনবাঈয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু তার জন্যে তার মুসলমান ধর্মের দায়িত্বের চেয়ে ইউরোপের শিক্ষার দায়িত্ব বড়। পদ্মিনীর ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজীর অপরাধ অপরাধ। কিন্তু তা তো আমি বলি নি বলছি না এক্ষেত্রে।

—না। মানতে পারছি না এ কথা। এ কথায় ঐক্য আসবে না, অনৈক্য বিরোধ বাড়বে।

বসে পড়লেন বক্তা। বললেন—তবে ছিঁড়ে ফেলো। নতুন করে তোমরা লেখো। বলেই চলে গেলেন তিনি বেরিয়ে। শুধু বলে গেলেন—পথ দুটি। এক হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে ইতিহাস বুঝে সেই ইতিহাসের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নয়তো বিরাট শক্তিধরকে আসতে হবে। যিনি এসে ইতিহাসের চক্রান্ত থেকে ধর্মের অন্ধকূপ থেকে টেনে তুলবেন সকলকে। মুহূর্তে ভুলিয়ে দেবেন সব। আর—

একটু থেমে বললেন—আর এক হতে পারে ডিক্টেটরশিপের মধ্যে। একটা পুরুষ অন্তত পঁচিশ বছর ধরে শাসন করে বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেবেন। কিন্তু তাও হবে কি না জানি না। হ্যাঁ, রাশিয়ায় তা হয়েছে। কিন্তু ও তো আমরা চাইনে।

—আচ্ছা আমি চললাম। চলে গেলেন তিনি।

একপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল উমা বা শ্যামা বা নমিতা।

সে বর্ধমান থেকে মনোরমার নায়েবকে সঙ্গে করে কলকাতায় এসে পেঁচেছে। গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে নায়েবকে রেখে নর্থ ক্যালকাটা ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারীর সঙ্গে এখানে এসে এই সভার মধ্যে পড়েছিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল। শুনতে তার ভারী ভাল লাগছিল। উনি চলে যেতেই সে এগিয়ে এল মিসেস মিত্রের কাছে।

মিসেস মিত্র তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন—নমিতা? তুমি ছিলে কোথায় এতদিন? কলকাতায় তো ছিলে না!

—না, কাশীতে ছিলাম।

—শুনেছি আবছা আবছা। তোমার মা মারা গেছেন—তাঁর বাড়িঘর সব রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে গেছেন—তুমি কাশী চলে গেছ। হরিমতী দেবী তোমার মা হতেন?

—হ্যাঁ, মা হতেন বইকি। তবে তাঁর সন্তান আমি নই।

—তাও শুনেছি—সবই অবশ্য আবছা আবছা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উমা বললে—সে অনেক কথা। কথা শেষ করেও সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—কোথায় রয়েছ এখন?

—ছিলাম তো কাশীতে। উনি মারা যাবার সময় ওঁর গয়নাগুলো আমাকে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু সেও আমি নিই নি। কাশী গিয়ে মিশনের সন্ন্যাসীদের সেগুলো দিয়ে ভাবছিলাম কোথায় যাব কি করব। মিশনের সন্ন্যাসীরা একটা আশ্রয় দেখে দিয়েছিলেন—দুটো ছোট মেয়ে পড়াবার কাজও জুটিয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ ডাইরেক্ট অ্যাকশনের খবর পেলাম। মন চঞ্চল হয়ে উঠল—ভাবলাম এর মধ্যে দিয়ে যদি রেভুল্যুশন শুরু হয়ে যায়! এই হানাহানি শুনে নেতাজী যদি এসে পড়েন! একদিন স্টেশনে এসেছিলাম। হঠাৎ—

থেমে গেল উমা।

মিসেস মিত্র ধরিয়ে দিলেন—স্টেশনে এসে হঠাৎ টিকিট কেটে চেপে বসলে?

উমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে সে এসেছিল—এসেছিল ঠিক ওই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই। কথাটা সত্য। কিন্তু তার পরও কিছু আছে। ডাউন পাঞ্জাব মেল এসে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়েই। হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল সাহেবী পোশাক পরা একটি তরুণ যুবাকে। চোখে তার গগল্‌স ছিল। তবু তার চিনতে কষ্ট হয় নি। এ সেই এলাহাবাদের ব্যারিস্টারের ছেলে ফৈজুল্লা। চমকে উঠেছিল সে। দরজার কাছটায় এসে রিজারভেশন স্লিপ দেখে বুঝতে পেরেছিল ফৈজুল্লা যাচ্ছে কলকাতা। কলকাতায় যে আগুন জ্বলেছে তাতে খোঁচা দিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল।

সে মুহূর্ত চিন্তা না করে ছুটে গিয়ে হাওড়ার একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে গাড়িতে চেপে বসেছিল। কেন চাপছে—কি করবে সে ওর সঙ্গে গিয়ে, সে সব কথা মনে ওঠেই নি। বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত আসতে মনে জুটেছিল অনেক চিন্তা। পথেই ট্রেনে অনেক গুজব শুনেছিল কলকাতা সম্পর্কে। ধীরে ধীরে মনও হয়ে পড়ছিল দুর্বল। একবার টাকার কথা মনে হয়েছিল। সঙ্গের টাকা গুনে দেখেছিল—আট টাকা ক' আনা। তারপর মনে হয়েছিল কলকাতায় আশ্রয়ের কথা। কোথায় থাকবে সে? কি করে হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতায় ঢুকবে সে?

বর্ধমানে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গিয়েছিল বর্ধমানের ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারীর সঙ্গে। তিনি চিনতেন উমাকে। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি?

সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বলেছিল—একটু সাহায্য করবেন আমাকে?

—কি? কি হয়েছে?

—আমার হাতে টাকা নেই। পাঁচ টাকা দশ টাকা যা হয় দিতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে হাতের সম্বল একগাছি করে চুড়ি—তাই একগাছা খুলে দিয়েছিল।

বর্ধমানের সেক্রেটারী বলেছিলেন—প্রথম তো টাকা আমার সঙ্গে নেই। দ্বিতীয় কথা—তুমি কি কলকাতায় যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে যাচ্ছ?

—একলা। সঙ্গে কে থাকবে বলুন!

—তা হলে নামো এখানে। তোমার একলা যাওয়া হবে না।

—কেন?

—হবে না। আমি বলছি—হবে না। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

—কিচ্ছু নেই।

—কিচ্ছু নেই? মানে?

—মানে—একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—হঠাৎ চেপে বসেছি ট্রেনে ঝোঁকের বশে।

—কি অন্যায় বল তো! চল আমার সঙ্গে চল। কলকাতা পৌঁছুনো এখন সহজ নয়। আমি ব্যবস্থা করব।

নেমেছিল উমা। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। উদ্দেশ্য ছিল যদি কোন রকমে একটা পিস্তল বা বোমা একটা যোগাড় করতে পারে। কিন্তু তাও সে পায় নি। বর্ধমানের ওঁকে একথা বলতে পারে নি।

বর্ধমানের সেক্রেটারী ব্যবস্থা করেছিলেন মনোরমার নায়েবের সঙ্গে। নায়েব প্রবীণ লোক বিচক্ষণ লোক; অর্থ তাঁর সঙ্গে আছে—নিরাপদে উমাকে নিয়ে গ্রে স্ট্রীটে পৌঁছুবেন ঠিক। উমাও তাঁকে আপিস থেকে অজয়ের খবরটা এনে দিতে পারবে।

মিসেস মিত্র বললেন—হাওড়া থেকে এসে পৌঁছুলে কি করে ?

—এসেছি অজয়বাবুদের নায়েবের সঙ্গে। অজয়বাবুর মা প্রায় আধপাগলা হয়ে গেছেন ছেলের জন্যে। ওঁদের ওখানে কয়েকখানা মুসলমানের গ্রাম আছে—সেখানে প্রবল টেনশন। দু'দিন নাকি হাঙ্গামা লাগতে লাগতে লাগে নি। অজয়বাবু কোথায় জানেন ? দেখলাম না তো ! ওঁদের বাড়িতেও চাকরের কাছে শুনলাম তিনি নেই এখানে।

—অজয়কে চট্টগ্রাম পাঠানো হয়েছে। ওদের তো ওখানেই আগে বাস ছিল।

—চট্টগ্রাম ? শিউরে উঠল উমা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এ খবর পেলে তিনি বোধ হয় বাঁচবেন না। হার্ট-ফেল করবেন।

হঠাৎ একজন খুব ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

বললে—গভর্নর নিজে কলকাতার ল-অর্ডার হাতে নিয়েছে। মিলিটারী কল করেছে। কার্ফু জারি হচ্ছে। শোভেনদা টেলিফোন করেছেন যারা ওখানে থাকবে তারা ছাড়া বাদ-বাকীকে নিজের নিজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। আটচল্লিশ ঘণ্টা কার্ফু বোধ হয়।

ঘরের সমস্ত লোক চমকে উঠল।

মিসেস মিত্র বললেন—তুমি থেকে যাও এখানে।

—না। আমি যাই। নায়েবকে খবরটা দিতেই হবে আমাকে !

—তা হলে নর্থ ক্যালকাটার ব্যাচের সঙ্গে চলে যাও।

—আমাকে একটা—

—কি ?

—আর্মস। আর্মস দিতে পারেন ?

—আর্মস ? কি করবে ?

চুপ করে রইল উমা।

নর্থ ক্যালকাটার সেক্রেটারী ডাকলে—নমিতা ! এস।

—যাও। দরকার বুঝলে যোগাড় করে দেব। এখন কি করবে ? চলে যাও।

নমিতা একটা ক্ষোভোত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলে এল। মন তার ক্ষোভে আক্রোশে অধীর হয়ে উঠেছে। ভাবনায় আসছেও না যে অস্ত্র পেলেই বা সে তার ওই শত্রুর সন্ধান পাবে কি করে এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরে।

গাড়িতে চুপ করেই সে সারা পথটা এল। ময়দান হয়ে গঙ্গার ধার ঘেঁষে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে গাড়ি এসে পৌঁছুল উত্তর কলকাতায়।

সর্বাগ্রে তাকেই নামিয়ে দিলে গে স্ট্রীটে।

পথের উপর নেমেই তার চোখে পড়ল বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে অজয়।

অজয় বললে—আপনার জন্যে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিলাম।

উমা বললে—আপনি ফিরলেন কখন ?

—স্টেশনে নেমেছি দশটায়। কোনক্রমে ঘুরে ঘুরে এখানে এসে পৌঁছুতে একটা পার হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে নায়েববাবুকে দেখলাম—উনি বললেন আপনি সঙ্গে এসেছেন এবং আমার খোঁজে আপিসে গেছেন একটা জীপে করে। আমি বেরুতে চেয়েছিলাম উনি দেন নি। বলেছিলেন যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন। তা ছাড়া গুজব শুনছিলাম মিলিটারী বেরুবে। একটা ট্যাক্সি নেই।

উমা বললে—গিয়েই বা কি করতেন ?

—কেন, পার্টি যা বলত তাই করতাম। তা ছাড়া এমন উৎকণ্ঠা হচ্ছিল আপনার জন্যে !

প্রতিমুহূর্তে কত চিন্তা যে হচ্ছিল—কোথায় এই এনার্কি'র দিনে হয়তো বিপদে পড়বেন আপনি—

শুনে হাসল উমা। বললে—বিপদে পড়াটাই আমার ভাগ্যলিপি। বিপদ আমাকে ছাড়ে না। আমিও ছাড়ি না! কিন্তু আজ পড়ি নি। ফিরে এসেছি নিরাপদে। বোধ হয় আপনার কল্যাণে।

অজয়দের নায়েব কোথাও বাইরে গিয়েছিল কাছেপিঠেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে ঘরে ঢুকল এবং নিজেই দরজা-জানালাগুলো সশব্দে বন্ধ ক'রে দিতে দিতে চাকরটাকে ডাক হাঁকতে লাগল—রামধনি—রামধনি রে! এ—রামধনিয়া!

ভিতর থেকে রামধনি সাড়া দিয়ে বললে—চা বানাচ্ছি নায়েববাবু।

—হাঁরে, সেই মেয়েটি ফিরেছে? সেই যে—

—হাঁ হাঁ—নমিতা দিদি—হাঁ উনি ফিরলেন—বাবুকে সাথ উপরমে বাত করছেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নায়েব বললে—যাক একটা দুশ্চিন্তা গেল। এখন ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে রাখ—খবরদার খুলবি না। আজকে বিকেল থেকে কার্ফু'। লাটসাহেব গোরা সেপাই ডেকে শহরে ছেড়ে দিয়েছে। পথে বেরুবার হুকুম নাই। দেখলেই গুলি করে মেরে দেবে। জানালা খুলে রাখলে বিপদ—সেই দিকে গুলি ছুঁড়বে। বাড়িতে জিনিসপত্র সব হিসেব ক'রে খরচ করবি—বাজারহাট দোকানপাট সব বন্ধ!

বলতে বলতে উপরে উঠে এল নায়েব। প্রথমেই নমিতাকে বললে—যাক আপনি ফিরেছেন মা—আমি বেঁচেছি। কি যে দুর্ভাবনা আমার হচ্ছিল! কেবল মনে হচ্ছিল আপনাকে একলা ছেড়ে দিলাম আর আমি বুড়ো মিন্সে ঘরে রইলাম! ভাবতে ভাবতেই আসছি। পোস্টাপিসে টেলিগ্রাম করতে গিয়েছিলাম—মনে করলাম খবরটা মাকে পাঠিয়ে দিই বর্ধমানের উকীলবাবু মারফত। তা টেলিগ্রাম করব কি—সব বন্ধ। তার উপর পথে শুনে এলাম কার্ফু'। আর যা দেখে এলাম—ওরে বাপরে—একটা বাড়িতে কান্নাকাটি উঠেছে—তাদের ছেলে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে—কলাবাগান থেকে একজন গুণ্ডা বেরিয়ে এসে পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মা তার বুক চাপড়ে কাঁদছে। তারপর শুনলাম কাল রাত্রেও নাকি সুরাবর্দ্দীর গাড়ি এদিক দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। বাগবাজার গিয়েছিল নিকিরিপাড়ার অবস্থা দেখতে—তা সেখানে দাঁড়াতে পারে নি। শুনলাম শোভাবাজার গিয়েছিল হাবু গুণ্ডাকে উদ্ধার করতে। তাও সেখানে তার আগেই আজ বেলা দেড়টা পর্যন্ত সব সাফ ক'রে দিয়েছে। হাবু গুণ্ডার লাস নাকি টাঙিয়ে দিয়েছে! ওদিকে চিৎপুর কলুটোলা বউবাজার অঞ্চলে হিন্দু শেষ। বাড়িঘর রক্তে ভাসছে। লাস পড়ে আছে। সব পুরুষের আর বুড়ী আধবুড়ী মেয়েদের। যুবতী মেয়েদের সব নিয়ে চলে গেছে। লোকে বলছে লাটসাহেবের গোরা সেপাই ছেড়ে দেওয়া—এ একটা কেবল ছুতো। এই ছুতোতে মুসলমানদের হিন্দু মেরে নিশ্বংশ করতে সুবিধে হবে।

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে যেন কোন একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে করে বললে—ওঃ, সেখানে যে কি হচ্ছে কি হবে আমি ভাবতে পারছি না! হয়তো—। বলে কথা আর সে বলতে পারলে না। দুই হাতে মাথা ধরে উপু হয়ে বসে পড়ল। এবং নিরাশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—সব গেল! এ যে হবে তা তো জানা কথা! কলিশেষে একচ্ছত্র একাকার হবারই যে কথা!

অজয় এবং নমিতা ঘরের মধ্যে বসে এই কথাই বলছিল। তখন আর এই কথা ছাড়া কোন্ কথাই বা ছিল বা থাকতে পারে। নমিতা তাকে বলছিল পার্টিতে আজ যা হয়েছে সেই সব কথা। খুব উত্তেজিত ভাবেই সে বলছিল—ও'রা ভাবছেন একেই মোড় ফিরিয়ে

ইংরেজের বিপক্ষে দাঁড় করাবেন। কিন্তু তা হবে না। হতে পারে সেই একজনের দ্বারা। কিন্তু তিনি কোথায় ?

এরই মধ্যে নায়েব এসে পড়েছিল। কথা বন্ধ ক'রে ওরা নায়েবের কথাই শুনছিল। হঠাৎ নবগ্রামের কথা তুলে হায় হায় ক'রে বসে পড়তে অজয় আর থাকতে পারলে না। তার মনে হচ্ছিল ওই প্রতিটি হায় হায় আক্ষেপ তার পিঠে যেন চাবুকের মত নিষ্ঠুর আঘাতে পড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে। সে এসে নায়েবের হাত ধ'রে বললে—উঠুন। এমন করে ভেঙে পড়বেন না। দেখুন আপনি কোন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আজই কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি !

নীচে থেকে রামধনি চা নিয়ে এল। টেবিলের উপর খানিকটা হালুয়া আর চা নামিয়ে দিয়ে বললে—দুকান-উকান তো বিলকুল বন্ধ। ঘরমে ঘিউ ছিল—চিনি সুজি ছিল—হালুয়া বানাইলম। ওহি খান !

নায়েব মুখ তুলে রামধনির দিকে তাকিয়ে বললে-- রামধনি !

—হাঁ।

—তুই পারিস ?

—কি—বলেন ?

—দেখ আজই যদি আমরা বর্ধমান চলে যেতে চাই তবে হাওড়া পেঁছুবার একটা ব্যবস্থা করতে পারিস ?

—আজই যাবেন ?

—হ্যাঁ।

একটু ভেবে রামধনি বললে—উ কি ক'রে হোবে ! আপনে খুদ খবর আনলেন কি পল্টন নিকলাচ্ছে, রাস্তাপর কোইকে দেখবে তো গোলি চালাবে ! এই হালমে কি ক'রে যাবেন। ট্যাক্সিউক্সি তো কোই বাহার হোবে না।

—তোর তো সব জান পহছান আছে। দল আছে। কাল রাতেও তো সব বেরিয়েছিলি, শোভাবাজারে গিয়েছিলি, গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলি। আমি তো সব শুনলাম আশেপাশের বাড়ির লোকেদের কাছে।

—হাঁ। উ তো হমি না বলছে না। হামার ভাই কাম করছিল শোভাবাজারমে। পহেলা রোজ রাতকো উসকা জান লিলে উলোক। উসকা বদলা হম লিবে না ? হাবু গুণ্ডার দল লিলে জান। কাল তামাম দিন হাবু কাঁহা কাঁহা লুকাইয়ে থাকলো। না মিললো। কাল রাতমে খবর মিলা কি একঠো গাড়ি আসবে সনঝাকে আর হাবুকে লিয়ে যাবে ! আর খবর ভি মিলা কি গঙ্গাজীসে জাহাজমে সোওয়ারী হোকে পাঠান আসবে—ঘাটপর উতারকে ইধারকো খতম কর দেগা। ওহি লিয়ে গেলম। বহুত আদমী,—হাঁ। আজ রাতকো মতলব থা— তো পল্টন নিকালনেকা খবরসে তো থোড়া গড়বর হোতা হ্যায় ! কেয়া হোগা আভিতক ঠিক নেহি হুয়া। লেকেন—

—আরে সে তো আমি তোকে বললাম ! তুই তো ঘরে—কি ক'রে জানলি গড়বড় হ'ল—কেউ বের হবে না—

হেসে রামধনি বললে—হমিকে খবর আওর আগেসে মিলেছে বাবু। আজ তো ইয়ে ঠিক হইয়েছে কি পল্টন নিকালনেকা বাদ কেয়া হাল হোগা উ দেখ লেনা। ফিন কালসে যেইসা হাল হোগা ওইসা কাম চলেগা।

—তা হ'লে পারবি না—

—কেঁউ নেহি পারেগা বাবু—পারে—জরুর পারে, লেকেন গাড়ি লেকে যানা অলগ

বাত। আওর আপ লোগকো লেকে যানা ভি অলগ বাত। হম লোগ যাতা—হাতমে হাতিয়ার লেতা—পাকিটমে বোমা রাখতা—মারনেকো লিয়ে যাতা, মরনেকো লিয়ে ভি তৈয়ার হোকে যাতা।

—তোমার কাছে বোমা আছে? জিজ্ঞেস করলে নমিতা। তার চোখদুটো দীপ্ত হয়ে উঠল।

—হাঁ। বোমা না লিয়ে কাম চলবে কি ক'রে? নিচুতালামে তিনঠো বোমা হামি আনিয়ে রাখিয়েছি। শালালোগ ঘরমে চড়াও হো যায়েগা তো কেয়া করেগা? মরেগা তো পহেলে মারেগা। হাঁ।

নায়েব বললে—বোমা রেখেছিস নিচের তলায়? সর্বনাশ! পুলিসে ধরলে যে—

—আরে বাবু ডর মৎ করিয়ে। পুলিস আব কাঁহা হ্যায়? পুলিস লোগ ভি অলগ হইয়ে গিয়েছে। হিন্দু পুলিস হিন্দুকো খবর দেতা—বাঁচাতা। মুসলমান পুলিস মুসলমানকো খবর দেতা—উ লোগকো বাঁচাতা। উ লোক কাম করতা তো এহি দাঙ্গা কভি হোনে সক্তা হ্যায়!

নমিতা বললে—তুমি আমাকে গোটা চারেক বোমা এনে দিতে পার?

—হাঁ, দেগা। কেঁউ নেহি দেগা। আপ চলিয়েগা হামরা সাথ—হামার লীডারকে পাশ লে যায়েগা—আপ বাতাইয়েগা আপকা কাম। মিল যায়েগা।

নিচে রাস্তায় কোথাও একটা কোলাহল উঠল।

—কেয়া হুয়া?—রামধনি দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে পড়ল। সংগে সংগে অজয় এবং নমিতা।

দূরে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু জংসনের মোড় বরাবর একটা জটলা রাস্তার এদিক ওদিক চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনজন চারজন ক'রে এক একটা দলে। হাতে এক একটা চোঙা। কিছু ঘোষণা করতে আসছে।

"আজ সন্ধ্যের পর থেকে গভর্নর বারোজ সাহেব কলকাতার শৃংখলা রক্ষার ভার নিজের হাতে নিচ্ছে। ইংরেজ এবং মুসলীম লীগের ষড়যন্ত্র হিন্দুর কাছে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ধ্যের পর থেকে কার্ফু জারী হবে। মিলিটারি বেরুবে। আপনারা সকলে আপন আপন বাড়ির ভেতরে থাকবেন। বাইরে বেরুবেন না। কিন্তু তৈরী থাকবেন। মিলিটারির হাতে আমরা কতটা নিরাপদ জানি না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ওয়াচ টাওয়ার ক'রে লক্ষ্য রাখছি। বিপদ দেখলে জানাব। কেউ দরজায় ধাক্কা দিলে খুলবেন না। অন্তত ভাল ক'রে না বুঝে এবং জেনে খুলবেন না।"

রামধনি নিচে নেমে চলে গেল।

দলের লোকেরা এই দিকেই আসছিল। রামধনিকে দেখে তারা দাঁড়াল। রামধনি তাদের কি বললে। বলার সংগে সংগেই দুটি তরুণ তার সংগে বাড়ির ভিতর ঢুকল। এবং উঠে এল উপরে অজয়ের কাছে।

একজন বললে—রামধনি বলছিল বর্ধমানে ফিরবার জন্য আজই হাওড়া যেতে চান? না, এমন কাজও করবেন না। কখনও না। এই সন্ধ্যেতেই রেডিয়োতে শুনতে পাবেন কার্ফুর কথা! আর বোমা চাচ্ছেন? কেন? রামধনির কাছে আছে। আমাদের সংগে কাজে বেরুলে পাবেন। এমনি নিয়ে কি করবেন?

অন্য ছেলেটি বললে—তা ছাড়া আমি আপনাকে অন্তত চিনি। বললে সে নমিতাকে।—আপনি ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কার। আপনারা তো মুসলমানদের বেপাড়ায় মুসলমানদের রক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছেন। কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক যেই বলুক এ কথা আমরা তা মানব না।

গান্ধী জিন্নার তোষামোদ ক'রে মুসলীম লীগকে মাথায় চড়িয়েছেন।

নমিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—আমি আপনাদের সংগেই লড়াইয়ে নামব। মানে আপনাদের সংগে একসংগে। তবে আমার লড়াই একজনের সংগে—সব মুসলমানের সংগে নয়। তবে তার সংগে যারা থাকবে তারাও হবে আমাদের শত্রু!

—তা হ'লে দেব—পাবেন। পরে কথা বলব—আজ চললাম। তবে অজয়বাবু, আপনার যে মতই হোক না আপনি কিছু কন্ট্রিবিউট করবেন আমাদের ফাণ্ডে। আমরা আজ দু'দিন লড়াই না দিলে পাড়ার কিছু থাকত না!

চলে গেল তারা।

নমিতা বা উমা নিজেই নিজের কাছে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। চুপ ক'রে বসে ভাবছিল—এ সে কি বললে? কি করলে?

অজয় যদি জিজ্ঞাসা করে? সে চিন্তার মধ্যে ডুবেছিল উত্তরের সন্ধানে। ঘরের ভিতরটা আধো অন্ধকারে ছায়াচ্ছন্নের মত দেখাচ্ছে। অজয়ও তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল -নমিতা এ কথাটা কেন বললে?

নমিতার পরিচয়-রহস্যের কথা তার কাছে অবিদিত নয়। কিন্তু আজ বিকেলে তার সংগ দেখা হওয়ার পর থেকে সে সব কথা তুলবার অবসর হয় নি। তার থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল দেশের কথা পার্টির কথা। এবং কেমন যেন একটা সংকোচও বোধ হচ্ছিল পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে।

এবার এই কথার পর সেই বিস্ময়জনক কৌতূহল প্রবল হয়ে সংকোচের আড়ালকে ছাপিয়ে মাথা তুললে। সেও সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এসে সামনের চেয়ারে বসল। ডাকলে –

—নমিতা দেবী!

নমিতা মুখ তুলে তাকালে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না।

শুষ্ক কণ্ঠে নমিতা বললে—বলুন।

অজয় বললে—তার আগে বলি, ফেব্রুয়ারী মাসে মাকে নিয়ে আমি দেশে চলে গিয়েছিলাম। তারপর এখানে চলে এলাম মাকে না বলে—কাউকে কিছু না ব'লে। তখন সব নেগোশিয়েসন ভেঙে পড়েছে, পার্টির প্যাম্ফলেট পেয়েছি।

হেসে নমিতা বললে—বন্দরের কাল হ'ল শেষ—

এসেছে আদেশ—

—হ্যাঁ।

—ওটা আমিই লিখেছিলাম পার্টির হুকুমে।

—ও। তারপর এখানে আমি এলাম, এসে পার্টি আপিসে বললাম আমি হোলটাইমার হয়ে কাজ করব। কিন্তু আপনাকে দেখতে পেলাম না। কেউ কোন খবর দিতে পারলে না। বললে ক'দিন আসে নি। আমি আপিস থেকে ফেরার পথে আপনাদের মানে হরিমতী দেবীর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বাড়ি বন্ধ। শুনলাম হরিমতী দেবী মারা গেছেন হঠাৎ এবং আপনার খবর পাড়ার কেউ জানে না। পানওয়ালাটা বললে—ও মেয়ে তো মাঈজীর নিজের মেয়ে ছিল না। মানুষ-করা মেয়ে। খবর পেতে পারি ওই ডাক্তার বোসের কাছে। আমার আশ্চর্য লাগল। আমি ডাক্তার বোসের বাড়ি গেলাম। সেখানে শুনলাম—সে আবার এর

থেকেও আশ্চর্য। কাশীতে হরিমতী দেবীর পাশের বাড়িতে আপনি এবং আপনার মা থাকতেন।

—হ্যাঁ, সে অনেক কথা। অনেক !

—ডাক্তার বোস বললেন—সে আশ্চর্য মেয়ে—খুব বড় রক্ত আর বড় সহবৎ না হলে এমন হয় না।

—উনি গয়না টাকা না নেওয়ার কথা বলেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। সে সব আপনি কাশী গিয়ে হরিমতী দেবীর গুরুদেবের হাতে ফেরত দিয়েছেন।

—না দিয়ে পারি অজয়বাবু ? আমিই তো একরকম হরিমতী মাকে মেরে ফেলেছি। ওই—ওই প্যাম্ফলেটটা লিখে সাইক্লোস্টাইল করিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। ফিরলাম পরদিন বারোটার পর। হরিমতী মাকে তো জানতেন। হিস্টিরিক মত ছিলেন। আমাকে শাসন করতেন আমার চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। মানে সন্দেহটা তাঁর বেশী পড়ল আমার কারুর সঙ্গে প্রেমে পড়ার উপর। আমি সইতে পারলাম না। ওইটে মানে ওই অপবাদটা আমার গায়ে বড় বেশী লাগে। ভয়ানক লাগে। আগুনের ছেঁকার মত লাগে—

অজয় বললে—সকলেরই লাগে, বিশেষ করে আমাদের সমাজে। এবং আমাদের সমাজের মানুষের মন অত্যন্ত সহজেই সন্দেহ ক'রে বসে—

নমিতা বললে—তার উপর—। চুপ ক'রে গেল নমিতা। দিদির কথাটা জিভের ডগায় এসে পড়েছে। দিদির আগুনে পুড়ে মরার কথাটা বুকের ভিতর পাক খাচ্ছে। সে থেমে গিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

অজয় প্রতীক্ষা ক'রে রইল। তারপর বললে—আপনি চলে যেতে চেয়েছিলেন আমি শুনেছি—তাতেই তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—

—হ্যাঁ। আমি একটা অত্যন্ত অন্যায় কথা বলেছিলাম। সামলাতে পারি নি নিজেকে। যেটা বলেছিলাম সেটা আজ উচ্চারণ ক'রে লজ্জা পাই। মানে—তিনি নিজের জীবনে যা ছিলেন সেটাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনিও আত্মহারা হয়ে গেলেন রাগে ক্ষোভে। চীৎকার ক'রে উঠলেন—বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা, এখুনি বেরিয়ে যা তুই ! আমিও ছুটে নেমে এসে পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তিনিও নেমে এসেছিলেন ছুটে। নীচে এসেই বুক গেল বুক গেল বলে বসে পড়লেন। হার্টটা ওঁর ড্যামেজড ছিল। ডাঃ বোস অনেকবার আমাকে বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন—দেখ ওঁর হার্টটা ড্যামেজড, তার উপর হিস্টিরিক স্বভাব। ওঁর সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর বেশী ক'র না। সেই যেদিন আপনি আমাকে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি পোঁছে দেন সেই দিন। কিন্তু আমি সামলাতে পারলাম না। উনি মারা গেলেন ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই। এরপর বলুন তো, ওঁর টাকা গয়না এ আমি কি ক'রে কোন্ অধিকারে নিই। কিন্তু ডাক্তার বোস সেগুলো কিছুতেই নিলেন না। তিনি বললেন—উনি বলে গেছেন আমাকে। তোমার পড়া আছে—ভবিষ্যৎ জীবন আছে।

হঠাৎ পর পর পাঁচ-সাতটা তীক্ষ্ণ উচ্চ বিস্ফোরণের শব্দে তারা চমকে উঠল। এতক্ষণে খেয়াল হ'ল যে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়ে খানিকটা রাত্রি হয়ে গেছে। আবার পর পর কয়েকটা শব্দ। এবং তার সঙ্গে খুব ভারী মোটরগাড়ির আওয়াজ। খুব দ্রুতবেগে চলে আসছে এগিয়ে।

পাড়ারই কোথাও কোন ছাদ থেকে অর্থাৎ উঁচু জায়গা থেকে মেগাফোন লাগিয়ে কেউ বললে—পাড়ার লোক সাবধান ! লরী ক'রে মিলিটারি বেরিয়েছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ? দু'দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। জানালা বন্ধ করুন। আলো জেলেও রাখবেন না।

প্রচণ্ড গর্জনে লরী এগিয়ে কাছে এসে পড়েছে।

রাইফেলের গুলি চলছে—ফট্ ফট্—ফট্ ফট্—।

বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ, আল্লা হো আকবর, নারায়ে তকদীর বুলি ঠিক বন্ধ হয় নি। কিন্তু উন্মত্ত ক্রুদ্ধ কোলাহল আজ স্তব্ধ।

ওরা দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে। কিন্তু কেউ কাউকে ঠিক দেখছে না।

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভে গেল।

চমকে উঠল দুজনে। দুজনেই প্রশ্ন করলে—কে?

নায়েব বললে—আমি। আলো নেভাতে বলছে যে!

—ও! হ্যাঁ মনে ছিল না।

নায়েবের গলা কাঁপছে। বললে—রামধনিটা ছাদের উপর চলে গেল। কিছুতেই শুনলে না। বেটা বোমা হাতে ক'রে গিয়েছে। যদি মেরে বসে?

মিলিটারি লরীর গর্জন আবার উঠল। লরীটা বোধ হয় থেমেছিল। আবার স্টার্ট নিলে। এগিয়ে চলে যাচ্ছে।

আবার মেগাফোন দিয়ে কেউ বললে—গ্রে স্ট্রীট সেণ্টাল এ্যাভেনু্য জংসনে কয়েকজন টমিকে নামিয়ে দিয়েছে। ওরা ঘুরছে। সাবধান!

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠল রাইফেলের—ফট্ ফট্—ফট্ ফট্! একটা গুলি বোধ হয় তাদের বাড়ির কার্নিস টার্নিসে লেগেছে। খানিক চ্যাংড়া যেন খ'সে পড়ল।

অজয় বললে—আমি ছাদে যাচ্ছি!

—ছাদে? চলুন আমিও যাই।

চাপা গলায় নায়েব বললে—না না না!

ছাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠছে। ছুটে নেমে আসছে কেউ। কে আর—রামধনি। অজয় প্রশ্ন করলে—কে? রামধনি?

—হাঁ! আরে বাপরে! আলসার উপর ঝুঁক কর্ দেখ রহা থা। শালা গোলি মার দিয়া! উ গোলি কার্নিস পর লাগা! নেহি তো মার দেতা মুঝে। শালা!

আবার শব্দ উঠল—ফট্ ফট্!

অন্ধকারে ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—চারটি প্রাণী!

কয়েক মুহূর্ত পরেই মেগাফোনে আওয়াজ উঠল—

...লেনের বাইলেন—ছোট গলিটার পথে একটি কেউ—বোধ হয় আধবয়সী একটি মেয়ে—বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে এপারের গলিতে ছুটে ঢুকছিল—তার পায়ে গুলি লেগেছে। গ্রে স্ট্রীটের কেউ যদি পারেন তবে তাকে তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে নিন!

অজয় বললে—রামধনি!

—হাঁ বাবু—ই তো হামাদের বাড়িকে পিছে হোগা!

—আমার সঙ্গে যাবি?

—হাঁ। চলিয়ে!

—চলুন, আমিও যাব।

—থোড়া সবুর করেন দিদি! দুশমন লোগকো যানে দিজিয়ে!

নায়েব কেঁদে উঠল।—না না!

—থামুন! ধমক দিয়ে উঠল অজয়।

আবার শব্দ উঠল—ফট্ ফট্—ফট্ ফট্! এবার শব্দ দূরে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের

মোড় বরাবর। নমিতা বললে—চলুন এবার।

রামধনি আগে, তার পিছনে ওরা দুজন।

বাড়ির পিছনে সংকীর্ণ একটা গলি। এঁকাবেঁকা। অল্প দূরে একটা বাঁকের মাথায় একটা গ্যাস পোস্ট। তার আলোতে দেখা গেল ওই বাঁকেই একটা কেউ পড়ে কাতরাচ্ছে। তারা এগিয়ে গেল। আধবয়সী ঝি শ্রেণীর একটি মেয়েই বটে। রক্তে তার পরনের কাপড়ের নীচের দিকটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। পায়ের ডিমে গুলিটা লেগে বেরিয়ে গেছে। ক্ষত গভীর নয়—ইঞ্চিখানেক একটা জায়গার মাংস কেটে ঝুলেছে।

অজয় বললে—রামধনি, তোর কাছে বোমা আছে তো?

—হাঁ।

—তা হলে আমি আর উনি একে ধ'রে তুলে নিয়ে যাই—তুই পিছনটায় একটু দেখতে দেখতে আয়।

মেগাফোনে শব্দ উঠল—যাঁরা তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে যদি ফার্স্ট-এড দেবার কিছু না থাকে তবে ছাদে উঠে হেঁকে বলুন। আমরা লোক পাঠাব। যাঁরা আমাদের ওয়াচ পোস্ট জানেন তাঁরা যদি পারেন তবে এখানেই পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

রামধনি বললে—উ পাতা হমি জানে। হমি গিয়ে লিয়ে আসছি উদের। আপলোগ ঘরমে ঘুষে যান।

অজয় এবং নমিতা ঘরে ঢুকল মেয়েটিকে নিয়ে। মেয়েটি বললে—একটুকু জল খাব।

নীচের তলায় উঠোনের আলো জ্বলছিল। নমিতা বললে—আমি আনছি।

অজয় আলো পেয়ে এবার তার ক্ষতটা ভাল ক'রে দেখলে। মেয়েটি কেঁদে উঠে বললে—আমি আর বাঁচব না গো! ওঃ মা গো!

নমিতা জল নিয়ে ফিরে এসে তার হাতে দিয়ে বললে—খাও!

মেয়েটি তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

—খাও!

মেয়েটি ঢক ঢক ক'রে খানিকটা জল খেয়ে আবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—নমিতা!

নমিতা চকিত বিস্ময়ে তার দিকে তাকালে, আলোয় তার মুখ ভাল ক'রে দেখে সেও সবিস্ময়ে বললে—শান্ত!

—হ্যাঁ মা! দেখ ললাটের লেখন। বলে আবার কেঁদে উঠল।

নমিতা অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—হরিমতী মায়ের বাড়িতে কাজ করত!

—চব্বিশ বছর কাজ করেছি। হরিমতী মায়ের খাতির দেখেছি চলতি দেখেছি। তার পরে ছেলে মরল—তা দেখেছি। কাশীতে সন্ন্যাসিনী হ'তে গেল—সঙ্গে থেকেছি। তোমরা মা বেটীতে এসে পাশের বাড়ির ভাড়াটে হ'লে দেখেছি। হরিমতী মা তোমাকে দেখে কি যে হ'ত কি বলব! বলত—শান্ত, ওই মেয়েটিকে যদি আমাকে দেয় তবে আবার সংসার বাঁধি। তখন কি রূপ তোমার! আহা হা। নাম ছিল উমা। তা সাক্ষাৎ উমাই বটে—

—শান্ত, চুপ কর। কথা বলো না বেশী!

—কি আর বেশী বললাম মা। সে কত কথা! হরিমতী মা তো বক্তৃতায় কথা বলত। সে সেই বক্তৃতা ক'রে হাত পা নেড়ে বলত—উমা—উমা—নয়ননন্দিনী উমা—গিরিরাজসুতা—আমি তার মেনকা জননী- আমার মুখস্থ হয়ে আছে আজও। বলতে বলতেই আবার কাতরে উঠল।

অজয় অবাক হয়ে শুনছিল। নমিতা হরিমতীর কন্যা নয় তা সে শুনেছিল কিন্তু তার

নাম যে উমা ছিল তা শোনে নি।

উমা তখন আশ্চর্য সুন্দরী ছিল।

অজয় অবাক হয়ে শুনছিল। এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল উমার বসন্তক্ষত চিহ্নিত মুখের দিকে।

উমা এখন সুন্দরী নয়। ওই ক্ষতচিহ্নগুলি রূপকে বিকৃত করেছে তবে তার সুগৌরব বর্ণের আভাস এখনও পাওয়া যায়। চোখদুটির মাধুর্য আজও অম্লান সদ্যফোটা ফুলের মতই অক্ষুন্ন রয়েছে। এবং জীবনে যৌবনের নববসন্তের সাড়ায় একটি অপরূপ শোভা তার সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করেছে।

সে নমিতা নয়; তার পূর্বের নাম ছিল শ্যামা। হরিমতী বলতেন—শ্যামা নয়। বর্ণে গৌরী—ও উমা। ওকে পেলে আমি মেনকার মতই আবার সুখী হয়ে সংসারে ফিরি। নিষ্করুণ বসন্তরোগের মধ্য দিয়ে ভগবান তার প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

সে দৃষ্টি দেখে একটু হাসলে শ্যামা।

অজয় বললে—ডাক্তারবাবুর কাছে শুনেছিলাম আপনি হরিমতী দেবীর নিজের মেয়ে নন। পালিতা কন্যা। বসন্ত হয়ে মা মারা গেলে আপনার বসন্ত হয়—তখন তিনি নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। ভাল করেন। ভাল হলে নিজের মেয়ের নামে ডাকতেন। নমিতা ছিল তাঁর নিজের মেয়ের নাম। আপনার নাম ছিল শ্যামা?

—হ্যাঁ। কিন্তু শ্যামাও আমার আসল নাম নয়।

—তবে?

—উমাই আমার নাম।

—উমা?

দৃষ্টি একটু বিস্ফারিত হল অজয়ের। মানুষের স্মৃতির ঘরে একটা বিস্মৃতির যবনিকা অহরহ স্মৃতিকে আবৃত করে রাখে। বাইরে থেকে সামান্য মাত্র পরিচয়ের আভাসের সাড়া জাগলে ভিতর থেকে সুপ্ত স্মৃতির গাঢ় নিদ্রা হালকা হয়ে যেন তন্দ্রার মধ্যে সে সাড়ায় পালটা সাড়া দিতে চায়। উমা নামটা তেমনি একটা সাড়ার মত সাড়া জাগালে—বিস্মৃতির যবনিকাটা যেন দুলে উঠল। উমা! বড় চেনা নাম! কিন্তু সে কে তা ঠিক মনে পড়ছে না। সে মনে করতে চেষ্টা করলে। সেই চেষ্টায় গভীর চিন্তায় সে মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে গুলির শব্দ দূরে চলে গেছে। ঠিক আর শোনা যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে কিছু দূরে অকস্মাৎ কোলাহল উঠছে—আল্লা হো আকবর! নারায়ে তকদীর! সে কোলাহলে খুব আস্ফালন ও উগ্রতা নেই বরং কিছুটা আতঙ্কের আভাস আছে। সংগে সংগে পালটা ধ্বনি উঠছে—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্! এ ধ্বনিতে গাম্ভীর্য আছে বিক্রম আছে।

মনে হচ্ছে এ ধ্বনি যারা দিচ্ছে তারাই বিজয়ী পক্ষ। এই কয়েক দিনের মধ্যেই সুরাবর্দী সাহেবের সব আয়োজন, অতর্কিত আক্রমণের আঘাত ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দুরা কলকাতায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এ এক বিচিত্র সত্য। এ সত্য নির্ভয় বিক্রমে অমিতবীর্যে মূর্তি ধরে এসে না দাঁড়ালে সুরাবর্দী সাহেব কলকাতার কর্তৃত্বভার লাটসাহেবের হাতে সমর্পণ করতেন না। লাটসাহেবও নিতেন না। দাঁড়িয়ে দেখতেন। ইংরেজও আতঙ্কিত হয়েছে। এ কি হল? এ তারা ভাবে নি। ভেবেছিল হিন্দুরাই তাদের কাছে এসে নতজানু হয়ে বলবে—১৭৫৭ সালে তোমরাই রক্ষা করেছিলে আমাদের মুসলমানের অত্যাচারের হাত থেকে। আমাদের ভুল হয়েছিল—আমরা তোমাদেরই তাড়িয়ে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। বুঝতে পারছি তোমরা চলে গেলে আমাদের ধর্ম ইজ্জত প্রতিষ্ঠা সমাজ এ সবের কিছু থাকবে না। আমরা স্বাধীনতা

চাই না! চাই না! তোমরা থাক—আমাদের রক্ষা কর। আশ্চর্য! পর্যবেক্ষণে ভুল হয়ে গেছে। বিপরীত হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বিপরীত! বিচিত্র জাত! সাতশো বছর ধ'রে মুসলমানের আক্রমণাত্মক ধর্ম রণনীতি দিয়ে এদের ধ্বংস করা যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সে বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। ইসলাম যেখানে যেখানে গেছে অভিযান নিয়ে সেখানে সেখানে পুরাতন ধর্মের সংস্কৃতির কিছু চিহ্ন পাথরে খোদাই হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই। প্রায় গোটা আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সর্বত্র ইসলাম এসে সব কিছু শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু এই বিচিত্র দেশটিতে সাতশো বছর লড়াই করেও তার জীবনকে অস্তিত্বে বিলুপ্ত করতে পারে নি। সাতশো বছরের পর ইংরেজ এসে বিচিত্র পন্থায় এদের গ্রাস করবার চেষ্টা করেছে। পাদরীরা এসেছে —অর্ধনগ্ন মানুষকে সুসভ্য পোশাক দিয়েছে, ইংরিজী ভাষা দিয়েছে, জাতিভেদহীন সমাজের সুখস্বপ্ন দেখিয়েছে—তারপর বিজ্ঞানবাদ এনেছে। নানান উপকরণের মধ্য দিয়ে আত্ম-বিস্মৃতির জন্য অপরিমেয় মদ্য পান করিয়েছে—তবুও এরা বেঁচে আছে ; শুধু বেঁচে আছে নয়, তারা যেটাকে দিয়েছিল আত্মবিস্মৃতির জন্য তাই তাদের অতীত সংস্কৃতি গৌরব মহিমা সব কিছুকে নতুন করে স্মৃতির মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে ; শক্তিহীনতার পরিবর্তে প্রবল শক্তিতে এদের জাগ্রত করেছে।

যে ভেদ সৃষ্টি করে মুসলমান পক্ষকে সমর্থন করে হিন্দুকে পদানত করতে চেয়েছিল তারা সেই ভেদবুদ্ধি আজ তার অর্থাৎ ইংরেজের শক্তিকেও সংক্রামিত করেছে। গোটা বাংলা সেক্রেটেরিয়েট আজ দু'ভাগে বিভক্ত। মুসলমান—অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দু। পুলিস-বাহিনীও তাই!

সেক্রেটেরিয়েটের ইংরেজ ধুরন্ধর আই-সি-এস, পুলিস কমিশনার প্রমাদ গনে গভর্নর বারোজকে বললে—অবিলম্বে কলকাতার শান্তিশৃঙ্খলার ভার নিজের হাতে নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারলে অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজকে গোটা কলকাতায় এবং বোধ হয় সারা বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটে যাবে। তাতে হিন্দু থাকবে না মুসলমান থাকবে এ প্রশ্ন তুলবার আগের প্রশ্ন,আমরা থাকব কি না? মনে হয় থাকব না। সুতরাং সুরাবর্দীর হাত থেকে কলকাতার শাসনভার গভর্নরকে নিতে হবে। দেশী পুলিসে হবে না। তারা ইতিমধ্যেই দু'পক্ষে দাঁড়িয়েছে—আমাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। সুতরাং ফোর্ট থেকে ইয়োরোপীয়ান সোলজারস ডেকে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমাদের ফুল সাপোর্ট পেয়েও মিঃ সুরাবর্দী হ্যাজ ফেলড। হিন্দুরা কলকাতায় জিতে গেছে।

সত্যই তিন দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত হিন্দুরা জিতে গিয়েছে।

দূরাগত ধ্বনির মধ্যে ব্যঞ্জনার পার্থক্য সেই সত্যই ঘোষণা করছে। এমন কি সন্ধ্যে থেকে এই সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর গুলিচালনার মধ্যে যে ত্রাস ও বিভীষিকা সৃষ্টির কথা তাকেও সহ্য ক'রে উপেক্ষা ক'রে হিন্দুরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আঘাত প্রতিরোধের উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছে।

অদৃশ্য ঘাঁটি থেকে যে নির্দেশ আসছে তাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

—যাঁরা সাহস করেন, যাঁদের হাতে আমাদের দেওয়া জিনিস আছে বা যাঁরা নিজেরা যোগাড় করেছেন তাঁরা বেরিয়ে পড়ুন। সার্কুলার রোডের ওমাথায় নিকাশিপাড়ায় অ্যাকশন হচ্ছে। মিলিটারী ভ্যান দূরে গেছে। এর পর থেকে আপনারা আকাশের দিকে তাকাবেন। দেখতে পাবেন আলোর সিগন্যাল। মনে রাখবেন লাল যতক্ষণ জ্বলবে ততক্ষণ আপনারা নিরাপদে কাজ চালিয়ে যাবেন। যখন নীল জ্বলবে তখন বুঝবেন ডেঞ্জার। মিলিটারী আসছে। সরে পড়বেন। যতক্ষণ মিলিটারী থাকবে ততক্ষণ আলো জ্বলবে না। বেরিয়ে

পড়ুন। সাবধান—মেয়েদের গায়ে হাত দেবেন না আর শিশুদের ক্ষতি করবেন না। ধর্ম-বিরুদ্ধ ওটা। কুইক—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। বড় মোড়গুলো এড়িয়ে যাবেন। ওসব জায়গায় দু'একটা টমি থাকতে পারে। গলি গলি, গলি গলি টু নিকাশিপাড়া!

*　　　*　　　*　　　*

অজয় এবং উমা সমস্ত মন একাগ্র ক'রে এই ঘোষণাই শুনছিল। কয়েক মিনিটের জন্য ভুলে গিয়েছিল কি কথা তারা বলছিল। হঠাৎ ঠাকুরটা এসে বললে—বাবু হামি যাচ্ছে!

—কোথায়?

—নিকাইশি পাড়া। হুঁয়া শুরু হইয়েছে কাম!

অজয় এর জবাব দিতে পারলে না। যাও বলতেও পারলে না, যেয়ো না বলতেও পারলে না।

ঠাকুর বললে—দরওয়াজা বন্ধ কর দিজিয়ে।

—দরওয়াজা!

উমা বললে—চল আমি বন্ধ করছি।

অজয় বললে—আমি যাচ্ছি।

নীচে নায়েব একটা চেয়ারে মাটির মূর্তি'র মত বসে ছিল, সে বললে—আমাকে বলে চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম আমি জানি না—বাবুকে বলগে। তারপর সে ঠাকুরকে বললে—যাচ্ছিস তো, তারপর?

হেসে উঠল ঠাকুর।

—মরিস তো হামি বেরিয়ে যাবে।

ঠাকুর চলে গেল। অজয় দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন।

—ঘুম আসে এতে! আমি ভাবছি সেখানকার কথা। কি যে হচ্ছে সেখানে!

অজয় বললে—দেখি কাল যদি কোন রকমে বেরুতে পারি। কার্ফু এক আধ ঘণ্টার জন্যেও সকালবেলার দিকে তুলে নেবে বোধ হয়। লোকের বাজারহাট তো আছে!

বলে উপরে এল সে। উমা বাড়ির ভিতরের দিকের বারান্দায় রেলিংয়ের কাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অজয় তার পাশে দাঁড়াল।

এতক্ষণে আবার চাপাপড়া আলোচনাটা যেন মাথা ঠেলে উঠল মনের মধ্যে। উমা! নমিতা নয় শ্যামা নয়—উমা!

হঠাৎ সে বলে উঠল—আচ্ছা, উমা নাম বলছিলেন—তা উমা কি? মানে -

একটু নীরব থেকে উমা বললে—উমা ভট্টাচার্য।

—উমা ভট্টাচার্য?

উমা বললে—হরিমতী মা'র ঝিটা বোধ হয় কাতরাচ্ছে।

বলে সে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি ওর কাছে ওই ঘরেই শোব।

উমার মনে একটু অভিমান অথবা ক্ষোভ ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠেছিল।

উমা বলাতেও অজয়ের মনে পড়ল না। উমা ভট্টাচার্য বলাতেও মনে পড়ল না এলাহাবাদের কথা। মনে পড়ল না কয়েক মাস ধ'রে সে তাকে নিত্য দেখছে প্রায়। তা না পড়ুক। তখনও পর্যন্ত অজয়ই একদিক থেকে তাদের উপকার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনে পড়ল না সেই রাত্রির কথা! যে রাত্রে দলবদ্ধ গুণ্ডাদের নিয়ে সেই মুসলমান ব্যারিস্টারের ছেলে সইফুদ্দীন এসে হামলা করেছিল ভুনিদাদের বাড়িতে—যেদিন বাড়িতে

কেউ ছিল না—অজয় আত্মগোপন করেছিল ভন্নার্তের মত, সেদিন যে উমা ভট্টাচার্যের মা সাধনা ভট্টাচার্য ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন—তার বা তাদের কথা উমা ভট্টাচার্য নামটা বলা সত্ত্বেও তার মনে পড়ল না !

সে এসে শুয়ে পড়ল খাটের বিছানায়। এ ঘরটাতেই থাকতেন মনোরমা তাঁর অসুখের সময়। সেই সময় থেকেই পাশে একটা একজনের মত চৌকি পাতা আছে যেটার উপর মনোরমার নিজের ঝি শুয়ে থাকত। সেইটের উপরে শুয়ে ছিল হরিমতীর ঝি। সে ঘুমুচ্ছিল। তাকে ফার্স্ট-এড দিয়ে অ্যাসপিরিন খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতটা খুব বেশী নয় ভাগ্যক্রমে—বুলেট চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। প্রথম কিছুক্ষণ সে কাতরেছিল, তারপর নিরাপদ আশ্রয় এবং পরিচিতমুখ নমিতাকে পাওয়ার আশ্বাসে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যে মধ্যে ঘুমের ঘোরের মধ্যেই একটু-আধটু উঁ-আঁ করছে। উমা এসে তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে বিছানাটায় শুয়ে পড়ল।

অজয় তখনও দাঁড়িয়ে ভাবছিল—উমা ভট্টাচার্য। নামটা যেন স্মৃতির ঘরের ভিতর থেকে সামনের বিস্মৃতির পর্দাটার ওপারে সন্তর্পণ পদক্ষেপে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। বেরিয়ে আসছে না।

ওদিকে ক্রমান্বয়ে কোলাহল বেড়ে চলেছে। কোলাহল যেন আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। যে সব বাণী ধ্বনি দিয়ে মানুষ নিজের শক্তিকে স্ফীত করে অথবা ভয়কে দূরে সরাতে চেষ্টা করে সে সব বাণীর ধ্বনি বিরল হয়ে এসেছে কোলাহলের মধ্যে—উঠছে এবার আর্ত চীৎকার। কান্নার সুর রয়েছে তাতে। মধ্যে মধ্যে বোমা ফাটছে।

দূর থেকে মোটরের শব্দ আসছে।

ঘোষণা হল।—ডেঞ্জার। মিলিটারী লরী আসছে। যে যার চলে যাও। ঘরের আলো নেভাও।

অজয় তাকিয়ে দেখল ছাদের উপর দিকে। আকাশের গায়ে একটা লম্বা বাঁশের উপর যে লাল আলোটা জ্বলছিল সেটা জ্বলছে না। নীল আলো জ্বলছে। লরীর শব্দ অত্যন্ত দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। নীল আলোটা নিভে গেল। আকাশের গায়ে আর কোন চিহ্ন নেই। বাঁশটাও কাত হয়ে শুয়ে গেল। গুলির শব্দ উঠছে। রাইফেলের শব্দ ! সার্কুলার রোডের দিকেই বটে। স্তব্ধ রাত্রে শব্দ ছুটে চলেছে দিকদিগন্তরে।

গ্রে স্ট্রীটের উপর দিয়ে কতকগুলো পদধ্বনি ছুটে চলে গেল। অজয় ঘরে এসে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। এই ব্যস্ততার মধ্যে অজয়ের স্মৃতির সামনে বিস্মৃতির যবনিকাটা ক্রমে নিথর স্তব্ধ হয়ে গেল। মন অন্য কল্পনায় ছুটেছে। উমা নামটাও চাপা অথবা ঢাকা পড়েছে। নিষ্ঠুর কঠিন গুলির শব্দ শুধু মন ভাবনা আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে।

এই তো যুদ্ধ ! যুদ্ধ তো তারা করতে পারে !

একটু অবকাশ—এই কার্ফুর মধ্যে একটু অবকাশ পেলেই সে বেরিয়ে পড়বে। সটান হাওড়া। যদি ট্রেন না পায় ? ট্রেন কি ছাড়ছে ? ছাড়ুক না ছাড়ুক হাওড়ায় বসে থাকবে। ট্রেন পেলেই বর্ধমান চলে যাবে। এইভাবে সংগঠন করবে !

এরই মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হয়ে যাক বিপ্লব। হোক মুসলমানদের বাদ দিয়েই হোক। অথবা ইংরেজ এবং মুসলমানের মিলিত শক্তির সঙ্গেই বোঝাপড়া হয়ে যাক। এই তো আরম্ভ। এর প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দেখা দেবে। নিশ্চয় জ্বলবে আগুন। বেহার ইউ-পি বোম্বাই—সারা ভারতবর্ষে !

হায় গান্ধীজী ! অহিংসায় কি স্বাধীনতা আসে ? আনতে পারলে না তুমি। মহম্মদ

আলী জিন্নার মন বিগলিত হল না। ও হবার নয়।

কতটুকু হয়েছে কলকাতায় ? সে তো জানে ইউ-পিকে—তার মামার বাড়ি সেখানে—সে ছিল এক বছর, পড়েছে। তারপর এক বছরের বেশী প্রায় দেড় বছর ইউ-পির জেলে আটক ছিল। সে জানে! সেখানকার রাজপুত, গোয়ালা, ভূমিহারদের বিক্রম ক্ষোভ ক্রোধ কি পরিমাণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সে পরিচয় তার জানা। তার সংগী ছিল এলাহাবাদ হোস্টেলে ক'টি রাজপুত ছেলে। তারা নেতাজীর গল্প শুনত গভীর আগ্রহে। মনে পড়ছে সঈফুদ্দীনের দলের সংগে মারামারির কথা। গংগা যমুনা সংগমের ঘাটে রাত্রিকালে তারা অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছিল কয়েকজন স্টুডেণ্টস ফেডারেশন দলের ছেলেকে নিয়ে। দলে তারা বেশীই ছিল। তবু তারা লড়াই দিয়ে সঈফুদ্দীনকে আঘাত ক'রে বেরিয়ে এসেছিল। এবং সংগে সংগেই বলেছিল—চল আর এলাহাবাদে নয়। আমাদের সংগে চল গাঁয়ে। কিন্তু সে যায় নি। হোস্টেলেও যায় নি, এসে লুকিয়েছিল মামাদের খালি বাড়িতে।

মনে পড়ছে বাবু রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহকে। তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে হাঁক মেরেছিলেন। ভাড়াকরা গুণ্ডা ক'জন থমকে গিয়েছিল। তখন তাকে সাধনা মামীমা জড়িয়ে ধরেছেন বুকে।

কোথায় যে গেলেন সাধনা মামীমা!

অকস্মাৎ পর্দাটা খুলে গেল।

উমা। সাধনা মামীমার মেয়ে উমা। উমা ভট্টাচার্য। রমা তার দিদি পুড়ে মরেছিল। উমা—বারো-তেরো বছরের মেয়ে উমা—তার দিদির মৃত্যুর দু'দিন পর এসে তার মায়ের রমাকে দেওয়া আংটি এবং টাকাগুলি নিঃশব্দে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। উমা ভট্টাচার্য।

সে আর এ! কিশোরী উমা—নম্র ধীর শান্ত গৌরাংগী অপরূপা। বড় সুন্দর ছিল। এ যুবতী। দীপ্ত প্রখর অসাধারণ সাহসিনী! মনে পড়ছে ২৩শে জানুয়ারীর শোভাযাত্রায় তার ধ্বজাবাহিনী রূপ। গৌরাংগী এও বটে। রূপ এরও আছে। বসন্তের ক্ষতচিহ্নে পৃথক। আর এক জায়গায় মিল রয়েছে। এক জায়গায় নয় দু জায়গায়। চোখে। হ্যাঁ চোখদুটি তারই মত। সেই চোখ বললেও ভুল হবে না। শুধু দৃষ্টি পালটেছে। তবু সেই চোখ। আর মিল আছে চুলে। চুল উমারও ছিল পর্যাপ্ত প্রচুর। তখনই তার কোমরে পড়ত একরাশি কালো চুল। মনে পড়ছে অশৌচের মধ্যে তার তৈলহীন রুখু চুলের রাশি ফেঁপে ফুলে যেন তাকে দু'পাশ থেকে ঘিরে ধরে থাকত। নমিতার চুলও ছিল প্রচুর। নমিতা বলেই সে জানত তাকে তখন। সেও তৈলহীন রুখু। তবে বেণী বাঁধা ছিল। মোটা বেণী—কোমর ছেড়ে নীচে নামত। তারপর চুল সে কেটেছিল খাটো ক'রে। আবার সে চুল বড় হয়েছে। আজও তার চুল রুখু রয়েছে।

এ—সেই। তবে এ সেই উমা!

আর একটা মিল আছে। মর্যাদাবোধে। হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ মিল। অতি স্পষ্ট মিল। মনে পড়ছে নিঃশব্দে নীরবে তার সামনে এসে আংটি টাকা নামিয়ে দিয়েছিল।

মামীমা তাকে ডেকে বলেছিলেন—ওরে অজয়—বাবা, উমা এই টাকাটা আর আংটিটা ফিরে দিতে এসেছে। বলছে—দিদির বিয়ের যৌতুক, কি ক'রে নেব? দিদি তো নেই!

সে বলেছিল—কিন্তু মা যে ও'দের দিয়েছেন। মেয়ের বিয়ের প্রয়োজন না থাকলেও অন্য প্রয়োজন তো আছে। ফিরে নেবার জন্যে তো কেউ দেয় না মামীমা!

উমা কাছেই বসে ছিল, সে বলেছিল—সংসারে যা দান করে তাই ফিরে নেয় না। নইলে যৌতুক আজ এর মেয়েকে দিলে কাল দিতে হয় ওর ছেলেকে বা মেয়েকে। তাহলে যৌতুক বলে আপনারা দেন নি বলুন। কিন্তু দান আপনারা করলেই বা আমরা নেব কেন বলুন। বলে সে উঠে চলে গিয়েছিল। সেই শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে চলে যাওয়া আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে।

তার সঙ্গে মিল রয়েছে ওর সেই পার্টি আপিসে না খেয়ে হেঁটে গিয়ে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার। জ্ঞান হবার পরও বলে নি যে সে সারাদিন খায় নি—গত রাত্রে ঘুমোয় নি। ট্যাক্সি করে বাড়ি এসে ভাড়া আনতে উপরে গিয়েছিল ছুটে। কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন হরিমতী দেবী।

আরও মিল রয়েছে। অবিকল সেই একভাবে হরিমতী দেবীর মৃত্যুর সময় দিয়ে যাওয়া গয়নাগুলি হরিমতীর গুরুর আশ্রমে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে নমিতা। নমিতা নয় উমা!

কোন ভুল নেই আর।

অজয় উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে নেমে। তারপর আলোটা জেবলে দরজায় গিয়ে ডাকলে—উমা দেবী! উমা দেবী!

উমারও ঘুম আসে নি। সে ভাবছিল হঠকারিতার মধ্যে সে কেন জড়িয়ে পড়ল এই ধনীর সন্তানটির সঙ্গে! অন্যায় হয়েছে তার। অন্যায় করেছে সে। কাশী থেকে প্রায় একবস্ত্রে সামান্য সম্বল যা ছিল তাই দিয়ে টিকিট কিনে ট্রেনে চেপেছিল। একবারও ভাবে নি এই চরম সংকট মুহূর্তে সেই পরমবাঞ্ছিত দেবতাত্মা মানুষটি আসবেন না। দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি এসে দাঁড়াবেন।

তখন যাত্রা করবে তারা দিল্লীর মুখে।

পথে এলাহাবাদে সে চাইবে তাঁর কাছে বিচার।

নানান চিন্তা। তরুণ মস্তিষ্কের কল্পনা আকাশ-কুসুমের মত বিচিত্র এবং বর্ণাঢ্য। তার সঙ্গে আত্মগ্লানি। এখন সে কি করে এদের কাছ থেকে বেরিয়ে কোথায় একটি নিরাপদ আশ্রয় পাবে?

আশ্রয় আছে। পেতে পারে। পার্টি আপিসে গিয়ে বেলাদিকে বললে একটা আশ্রয় তার মিলবে—সে বিশ্বাস তার আছে। এতদিন বলা তার উচিত ছিল। আশ্রয়টা নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেই ভাল করত সে।

হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতের সঙ্গে ডাক শুনতে পেলে—উমা দেবী! উমা দেবী!

সে চুপ ক'রে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

ঘুমিয়েছেন? উমা দেবী!

হঠাৎ আবার লরীর শব্দ উঠল। লরী আসছে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গুলির শব্দ। গুলি করতে করতেই আসছে তারা লরীর উপর।

দুম্—দুম্—দুম্!

সমস্ত কিছু শব্দকে ঢেকে দিয়ে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ উঠল।

লরীটা থেমে গেল।

কেউ বোমা ফেলেছে লরীটাকে লক্ষ্য ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে যেন কতকগুলো রাইফেল গর্জে উঠল। একঝাঁক গুলি ছুটল। বুলেটগুলোর কয়েকটা তাদের বাড়ির দেওয়ালে জানালায় সশব্দে এসে আঘাত করলে। একটা জানালার শার্সি'র কাচ ঝনঝন ক'রে ভেঙে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্নধার কিছু এসে তীব্রবেগে অজয়ের হাঁটুর উপরে জানুতে যেন বিঁধে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠল অজয়। কিন্তু তার মধ্যেও ছুটে গিয়ে সে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

—কি হল? অজয়বাবু! এবার সাড়া দিয়ে উঠল উমা। এবং দরজা খুলে দরজায় দাঁড়াল। ঘর অন্ধকার।

ও ঘরে হরিমতীর ঝির ঘুম ভেঙেছে। সে ভয়ে বু-বু করে উঠল।

অজয় চাপা গলায় বললে—চুপ কর! চুপ কর!

উমাও বললে—চুপ কর ! শুনছ ! চুপ কর !

লরীর শব্দ এগিয়ে আসছে। লরীটা ধীরে ধীরে চলছে। তার সংগে কতকগুলো ভারী বুটের শব্দ গ্রে স্ট্রীটের ফুটপাথ ধ'রে চলছে। মধ্যে মধ্যে দোরে দোরে লাথি পড়ছে। —হে ! হে !

কিন্তু সব স্তব্ধ। নিথর রাত্রি শুধু চমকে উঠছে। ওদিকে খানিকটা দূরে পশ্চিমদিকে বিকট শব্দ ক'রে একটা বোমা ফাটল। লরীর গর্জন বেড়ে গেল মুহূর্তে। পদশব্দগুলি দ্রুততর হয়ে ছুটল পশ্চিমদিকে।

উমা ডাকলে -অজয়বাবু !

অজয় উত্তর দিলে—আমার মনে পড়েছে উমা দেবী। আপনি শিবেন মামার মেয়ে উমা !

উমা সে কথার জবাব দিলে না। বললে—কি হল আপনার ? কাতরে উঠলেন কেন ?

—বলতে পারছি নে। হয় বুলেট না হয় ভাঙা কাচ এসে বিঁধেছে হাঁটুর উপরে !

—কোথায় আপনি ? সাড়া দিন !

—ঘরের মাঝখানেই আছি বোধ হয়। আলোটা নিভিয়ে আসতে আসতে কোথায় এসেছি—

—দাঁড়ান বাড়ির ভিতর দিকের আলোটা জবালি।

আলো জেবলে সে এসে অজয়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ধারালো লম্বা সুচলো ছুরির মত একটা ফালি বিঁধে রয়েছে ডান পায়ের হাঁটুর উপরে। রক্ত ঝরছে দরদরধারে। মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে রক্ত। উমা দেখে বললে—দাঁড়ান। এটা আমি টেনে বের ক'রে নিই।

—আমি নিজেই টেনে বের করছি। তাতে কম লাগবে।

হেসে উমা বললে—ওটা কোন যুক্তি হল ?

—যুক্তি না থাক বাস্তব সত্য ওটা। বলে সে নিজেই টেনে বের করলে কাচটাকে। প্রায় তিন আঙুল লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া কাচের ফালি একটা। এবং টেনে তুলে সে নিজের চোখের সামনে ধরলে। রক্ত বেশী ঝরতে আরম্ভ হল। উমা বললে—তাই তো। রক্ত যে বেশী পড়ছে।

—পড়বে। মুখটা খুলে গেছে তো।

—কিন্তু বন্ধ করা দরকার যে।

—টিপে ধরতে হবে মুখটা। বরফ হলে ভাল হত। কিন্তু বরফ এখন পাওয়া যাবে কোথায় ?

—কিন্তু তার আগে তো টিঞ্চার আইডিন কি ডেটোল-টেটোল দেওয়া উচিত।

—সে সব পাবেন কোথায় ?

—ওই ফার্স্ট-এড সেণ্টারে। যাদের লোক এসে ঝিটার পায়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে।

—তাদের পাত্তা পাচ্ছি কি ক'রে ? এবং যাবেই বা কে ?

—ছাদে উঠে জিজ্ঞাসা করব হেঁকে ?

—এখন নয়। এখনও লরীর সাড়া পাচ্ছি। তার উপর কে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে ! ঠাকুর থাকলে হত। কিন্তু সে তো যুদ্ধক্ষেত্রে। একেবারে ফ্রণ্টে ! এখন টিপেই ধরুন। এটা আমার নিজেকে দিয়ে ঠিক হবে না।

তাই ধরল টিপে উমা।

নায়েব এতক্ষণে উঠে এল নীচে থেকে। ভয়ে সে প্রায় হতচেতন হয়ে বসে ছিল। এবার খোঁজ নিতে এসে দেখে আতঙ্কে একটা আর্তনাদ ক'রে উঠল।

অজয় বললে—ভয় নেই। কাচ বিঁধে গেছে। নীচের চৌবাচ্চা থেকে জল আনতে পারেন

—ঠাণ্ডা জল ?

—না। উমা বললে—তাতে কি আছে, তেল কি কী কে বলবে !

এই সময়টিতেই নীচে যেন একটা ভারী জিনিস কিছু পড়ল উঠানে।

— কি ? প্রায় তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

ও ঘরে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল ঝিটা। সে উঠে বসে এ ঘরে অজয়ের রক্তাক্ত পা-খানার দিকে তাকিয়ে ছিল। কোন শব্দ বা কথা তার মুখ থেকে বের হয় নি। তার নিজের পায়েও আঘাত লেগেছে। সে ভাবছিল—কি সর্বনাশ এল দেশে ! কি রক্তারক্তি ! তার নিজের পায়ের আঘাত রাইফেলের গুলির আঘাতে হলেও তার ভাগ্যক্রমে শুধু খানিকটা ডিমের মাংস খাবলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাও সামান্য। প্রথমটা একটা চিড়িক মেরে ওঠার মত যন্ত্রণা হয়েছিল। সেটা খুব তীব্র। তারপর জ্বালা করেছে। পড়েও সে গিয়েছিল। তারই মধ্যে পড়েই ছিল। ভয়ে আর ওঠে নি ! অজয়ের পায়ের রক্ত দেখে তার আঘাতের পরিমাণ নিজের মতই ভেবে চুপ ক'রে ছিল। এবার নীচে ওই শব্দটা শুনে তার বুকে আতঙ্কের বোমা যেন বিস্ফোরণ ক'রে ফেটে গেল। গোরারা লাফিয়ে পড়ল নাকি ? না—ঘর ভেঙে পড়ল ? হে মা কালী !

এবার নীচে যেটা শব্দ ক'রে পড়েছিল সেটা সশব্দ হয়ে উঠল—রঘুপতি রাঘব রাজারাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। রঘুপতি রাঘব—

গান গাইছে ঠাকুর !

—ঠাকুর ! নায়েব হেঁকে উঠল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেঁকে উঠল।

—নায়েববাবু !

—হ্যাঁ। তোমার মত বজ্জাত লোক তো আমি দেখি নি জীবনে !

—কি করলাম হামি ? বলতে বলতে সে উপরে উঠে এসে দাঁড়াল। তার কাপড়ে রক্তের দাগ। মুখে সারা উর্ধ্বাঙ্গে কালির ছোপ।

সে মূর্তি দেখে শিউরে উঠল নায়েব। এবং বোবা হয়ে গেল !

—এ কি রে ?

—বস্তি পুড়ল কিনা ! কালির দাগ লাগল।

—রক্ত ?

—উ লাগল ! লেকিন আপনার কি হইল খোকাবাবু ? গোলী—?—

—না—গুলিতে ভেঙে কাচের টুকরো এসে বিঁধেছে।

—আচ্ছা !

— তুমি ওই ফার্স্ট-এড যেখানে আছে ওদের কারুকে ডেকে আনতে পার ?

—হাঁ—সো পারে ! লেকিন কি হোবে উসব লিয়ে ?

—কি হবে ? বেকুব কোথাকার ! নায়েব ধমক দিয়ে উঠল।

—হাঁ ! আভি বন্ধ হইয়ে যাবে খুন। আপসে বন্ধ হইয়ে যাবে।

—না—তুমি যাও। অন্তত টিঞ্চার আইডিন আর খানিকটা তুলো তুমি নিয়ে এস।

—আরে বাপ রে ! মুখ বিকৃত ক'রে ঠাকুর বললে—উসমে বহুত কষ্টো হবে। আগুনের মত জ্বলবে !

—না না, যাও তুমি !

অজয় বললে—দরকার নেই। ওকে দেখে আশ্বাস লাভ করুন। সে হাসলে।—দেখুন রক্তও বন্ধ হয়ে এসেছে, ছাড়ুন একবার।

কিন্তু বন্ধ হয় নি। আবার রক্ত পড়তে লাগল। উমা বললে—না—তুমি যাও ঠাকুর।

অন্তত আইডিন খানিকটা নিয়ে এস।

—চল আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। নায়েব বললে।

—নেহি নায়েবজী। দুশমনের সামনে গিরবেন তো আপনি জরুর খতম হো যাইবেন। ছুটতে ভি পারবেন না। হামি যাচ্ছে।

সে চলে গেল সহজ পদক্ষেপে।

—এই সব মানুষ কত ভাল সৈনিক হয় বলুন তো! কি সাহস! কি ধীরতা!

চুপ ক'রে ক্ষতস্থান টিপে ধ'রে উমা বসে রইল।

অজয় হঠাৎ বললে—আমার ভুলের কিন্তু মার্জনা নেই। আপনাকে দেখে চিনতে পারা আমার উচিত ছিল। হ্যাঁ, উচিত ছিল! ভুল নয়, অপরাধ!

উমা বললে—না, অনুচিত বলব না। অপরাধও হয় নি। বসন্তরোগ আমার মুখের চেহারা এমন পালটে দিয়েছিল যে আমিই প্রথম প্রথম নিজেকে চিনতে পারতাম না। আজও আমার আগের চেহারা কেমন ছিল নিজেরই ঠিক মনে পড়ে না। ওই শান্ত কাশীতে আমাকে দেখেছিল। রোগের আগেও দেখেছিল—তার পরও দেখেছে। ও কতবার বলেছে—আঃ, সেই রূপ সেই মেয়ে চেনাই যায় না! কি, শান্ত?

শান্ত এতক্ষণে কথা কইলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—আঃ, সে রূপ—সে কি রূপ—কি মিষ্টি চেহারা! যেন মাখন দিয়ে গড়া। সে রূপের আছে শুধু চোখ আর চুল। তাও চুল কেটে যা করলে তুমি! হরিমতী মায়ের সে কি রাগ!

হাসলে উমা। বললে—তা ছাড়া কি ক'রে ভাবতে পারেন অ্যাকট্রেস হরিমতী মায়ের মেয়ে নমিতা সেই উমা হ'তে পারে? হয়তো বসন্ত না হলেও ভাবতে পারতেন না।

—তা বটে! সে কথা ঠিক! আজকের কথাই ভাবুন না। কিছুতেই মনে দুটোয় একটা হচ্ছিল না। সে উমা নাম শুনেও, হরিমতী দেবীর পালিতা কন্যা জেনেও! কি ক'রে ভাবব। ভাবা যেন যায় না। কিন্তু কি ক'রে আপনারা এভাবে—। মানে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমানের পথে মোগলসরাই 'গয়া পর্যন্ত আপনাদের খোঁজ ছিল—ট্রেনে ছিলেন। তারপর ধানবাদে এসে দেখা গেল নেই আপনারা। এবং পুলিস কোন খোঁজ করতে পারে নি!

—ধানবাদের আগেই সিগন্যাল পড়ে নি বলে গাড়িটা থেমেছিল। মা আমাকে নিয়ে সেইখানেই নেমে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ঘুরছিল—মা তাতে প্রায় একরকম পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—নাম এখানে। যা হবার হবে। এর থেকে বাঘের পেটে যাওয়া ভাল—সাপের কামড়ে মরা ভাল! তারপর—।

সে বলতে লাগল সেই বিচিত্র কথা। অবাক হয়ে শুনছিল অজয়। এরই মধ্যে ফিরে এল ঠাকুর সঙ্গে একটি ছেলেকে নিয়ে।

ছেলেটি বললে—দেখি!

ছেলেটি নিপুণ ভাবে দেখে ডেটোল দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে। বললে—বেশী কিছু নয়, শুধু চলাফেরাটা করবেন না। করলে আবার রক্ত পড়বে। পায়ের ক্ষত তো!

—আপনি ডাক্তার?

—না, মেডিকেল স্টুডেণ্ট।

—আপনাদের কাজ কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল হচ্ছে। অদ্ভুত।

—ওঃ, আপনাদের ঠাকুরটি যা না—তার তুলনা নেই! অথচ আমরা ওদের ঘেন্না করি অবজ্ঞা করি! পলিটিক্যাল পার্টি নেই, আদি অকৃত্রিম এই দেশের লোক। হিন্দুর দেশের

হিন্দু। গান্ধীজীর রঘুপতি রাজারাম গান করছে। এই তো এক্ষুনি গিয়েছিল ডাকতে ওই গান গাইতে গাইতে। আমি আসতে আসতে বললাম—এ যে গান্ধীজীর গান! ও বললে, হ্যাঁ, মহাত্মাজীর গান। বহুত আচ্ছা গান। বললাম—তবে এই সব করছ যে? বললে—কাহে? কি হরজা? কি দোষ হ'ল এতে? ই তো লড়াই হ্যায়। লড়াই চুকে যাবে তো বাস আর করবে না! রামজী লড়াই করে নি? কি উত্তর দেবেন দিন!—হাসতে লাগল সে।

অজয় চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। ছেলেটি বললে—আমি যাই তা হ'লে!

—একটা কথা। অজয় জিজ্ঞাসা করলে—কাল কার্ফু কিছুটা রিল্যাক্স করবে কিনা জানেন?

—কাল—না! আজ রাত্রেও তো কম কাণ্ড হ'ল না! কিন্তু কেন?

— আমি দেশে চলে যাবে।

— অসহ্য হয়ে উঠেছে?

—না। সেখানে আমার বাড়িতে দেববিগ্রহ আছে। পাশে কয়েকখানা মুসলমান গ্রাম আছে। খুব টেনসন সেখানে। মা আমার একলা আছেন। নায়েবকে পর্যন্ত আমার সন্ধানে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি সেখানে যেতে চাই।

—ক'জন?

—আমি ইনি আর নায়েববাবু।

—উনি? মানে উনি তো—ও'কে জানি আমি। আমি ডাক্তার মিত্রের সম্পর্কে ভাইপো। ও'কে দেখেছি। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রসেসনে ফ্ল্যাগ ধরতে দেখেছি। কাকার কাছে বিবরণও শুনেছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য আপনি ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কার তাও জানি!

অজয় বললে—উনি আমার মামার বাড়ির সম্পর্কে খুব আপনার লোক। আমার আত্মীয়া বলতে গেলে—। সে চুপ করলে, একটু পর আবার বললে—সে লঙ হিস্ট্রি। ও'কে তো এর মধ্যে ছেড়ে যেতে পারব না! আজ দু'বছরের উপর ও'দের মানে ও'কে আর ও'র মাকে খুঁজেছি। ও'রা নিরুদ্দেশ ছিলেন। ও'দের যত বিপদ আমার জন্যে। মা'র কাছে ও'কে পে'ছি দিয়ে তবে আমি খালাস।

মনোরমা নিঃশেষিত-কাষ্ঠ হোমকুণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গার-স্তূপের মতই জীবন-শেষের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

২২শে আগস্ট। তখন কলকাতায় সর্বনাশা আত্মঘাতের দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের শিখা নিভেছে, কিন্তু ধোঁয়া উঠছে। যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সমগ্র দেশের এক মুসলীম লীগ নেতারা ছাড়া অপর সকলেই আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে বলেছেন—"সম্বরণ কর ঐ আত্মঘাতের সর্বনাশা প্রবৃত্তি এবং হিংসাকে সম্বরণ কর।"

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে সীমান্ত গান্ধীও বলেছেন। যাঁরা বিশিষ্ট অথচ সহজ মানুষ এমন ধার্মিক মুসলমানেরাও বলেছেন। তাঁরা মুসলীম লীগের বাইরের লোক।

তবুও এরই মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় পীস কমিটি গঠিত হয়েছে কলকাতায়। তার মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছেন।

এরই মধ্যে লরীতে ক'রে শান্তি মিছিল বেরিয়েছে। তাতে শিল্পী সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছেন। এ মিছিল বের হয়েছিল প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক সংঘ এবং এমনি আরও কয়েকটি প্রগতিশীল সংঘের উদ্যোগে। এই সংঘগুলির অধিকাংশই কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত সংঘ। কম্যুনিস্ট পার্টির বিগত যুদ্ধের সময়ের জনযুদ্ধের ভূমিকার জন্য অধিকাংশ লোকই তার উপর বিমুখ এবং বিরক্ত। তবুও এক্ষেত্রে এই শান্তি মিছিলের

উদ্যোগে অধিকাংশ লোকই যোগ দিয়েছেন।

কলকাতার পথঘাট বলতে গেলে জনশূন্য পরিত্যক্ত। নিতান্ত দায়ে পড়ে না হলে হিন্দু মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রম করে না। মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ ক'রে বলতে গেলে হেরেছে। তারা হিন্দু অঞ্চলে আসতে ভরসাই পায় না। আসে না।

পার্ক সার্কাস বেনেপুকুর মধ্য-কলকাতা কলাবাগান গার্ডেনরীচ খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ভীতার্থ হয়ে বাস করছে।

তবুও গুপ্তহত্যার শেষ হয় নি। গুপ্তহত্যা চলছেই। মিলিটারী শাসনে ছেড়ে দেওয়া সৈন্যদের গুলিতে মানুষ কম মরে নি। মরেছে অনেক।

মুসলমান পাড়া অঞ্চলের দরিদ্র বস্তিবাসীরা দলে দলে এসে হিন্দু পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। হিন্দু পাড়ার কাছাকাছি ছোটখাটো মুসলমান বস্তির বাসিন্দারা চলে গেছে বড় বড় মুসলমান পাড়ায়। মুসলমান পাড়ায় হিন্দু শিখ ট্যাক্সিওলারা যায় না, সেখানে ঘোড়ার গাড়ি এবং মুসলমান ট্যাক্সিওলা ভরসা। হিন্দু পাড়ায় ঘোড়ার গাড়ি নেই—যে কিছু কিছু গাড়ি ছিল তার কোচম্যান সহিসরা পালিয়েছে বা হয়তো মরেছে। গাড়িগুলো ভেঙে পড়ে আছে, ঘোড়াগুলো অনাহারে পেটের জ্বালায় ছুটকে বেড়াচ্ছে।

পথেঘাটে স্তূপীকৃত জঞ্জাল জমেছে। স্তুপ বললে ঠিক বলা হয় না, সে জঞ্জালের পাহাড়। জমাদার ঝাড়ুদারেরা কাজে বের হয় নি হতে পারে নি। কোথাও কোথাও পড়ে আছে গলিত শব। হাইড্রেনের মধ্যে কোন একটা বন্ধ গলিতে কিংবা খালের ধারে পড়ে আছে। খালের জল পচে উঠেছে পচা শবের বিষ থেকে। সমস্ত কিছুর দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দোকানদানি কমই খুলেছে, কিছু কিছু খুলেছে মাত্র। মানুষ—সে ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক—কোনক্রমে নুন ভাত, আর যার ভাগ্য ভাল সে হয়তো কয়েকটা আলুসিদ্ধ অথবা ছোলা মসুর ভেঙে বেঁটে সেঁকে নিয়ে তাই দিয়ে পেট ভরাচ্ছে। কলকাতার এই আত্মঘাতী মারণযজ্ঞের সংবাদে সারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলি মুখরিত।

তবুও বাইশে অগাস্ট এরই মধ্যে অজয়, নায়েব এবং উমা রওনা হল বর্ধমান। বাইরে থেকে কলকাতায় লোক খুব কম আসছে। যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশী। ভীত মানুষেরা পালাচ্ছে। বেশীর ভাগই মেয়েছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে সকলে। কলকাতার আগুন কলকাতাতেই আবদ্ধ নেই—সারা দেশে ছড়িয়েছে। অনেক জায়গাতেই আগুন জ্বলেছে—তার মধ্যে শহরাঞ্চল বেশী। দু'চার ক্ষেত্রে নবগ্রামের মত অঞ্চলে যেখানে মুসলমান এবং হিন্দুরা প্রায় সমসংখ্যায় বাস করে সেখানে জ্বলেছে। পূর্ববঙ্গে ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়েছে। তবু সে সব স্থান কলকাতা থেকে নিরাপদ তাই পাঠিয়ে দিচ্ছে মেয়েছেলেদের।

হিন্দু ফিরছে হিন্দুর গ্রামে কঠিন আঘাতে মর্মাহত এবং নিষ্করুণ হয়ে। মুসলমানও তাই। এরই মধ্যে গতকাল ২১শে বর্ধমান থেকে লোক এসেছিল। মনোরমা নায়েবকে পাঠিয়ে কোন সংবাদ না পেয়ে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছেন। তাই লোক এসেছিল। লোকটি বর্ধমান শহরের একজন বাউণ্ডুলে—অনেকে বলে গুণ্ডাও বটে। সে দুপুরে এসে পৌঁছে খবর নিয়ে ফিরে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে এপারে এসে গ্রে স্ট্রীটে এসে উঠেছিল—আবার ফিরেও গেছে ওই পথে।

খবর দিয়ে গেছে মঙ্গলকোটের বড়মিঞা এবং নবগ্রামের মাঠাকরুন কথাবার্তা বলে দুজনে দু'তরফকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছেন। অনেকটা করেও এনেছেন। বিপদ এখনও ইসলামপুর নিয়ে। ইসলামপুরের মুসলমানেরা একদিকে হিন্দুবিদ্বেষী অন্যদিকে

মঙ্গলকোটের মিঞাদেরও বিরোধী। তারা মানতে চায় না। ইসলামপুরের যে দুর্ধর্ষ বাগ্দীগুলি দীর্ঘকাল ধরে ওই মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি আবার বিচিত্র সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে এসেছে তারা এই বিপদে ঘরবাড়ি ছেড়ে নবগ্রামে পালিয়ে এসে রয়েছে—তাদের বাড়ি-ঘর পুড়ে গেছে ; তারাও একদিন রাত্রে ডাকাতের মত গিয়ে মুসলমানদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসে প্রায় অর্ধেক গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে—তারাও মনোরমার আশ্রয়ে এসে থেকেও তাঁর কথা ঠিক মানতে চাচ্ছে না। শুধু তারাই বা কেন, ওই দুটি লোক—মঙ্গলকোটের বড়মিঞা এবং নবগ্রামের মনোরমা ছাড়া দু'পক্ষের বাকী সকলেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে প্রীতি হারিয়েছে, অবিশ্বাস এবং আক্রোশের দৃষ্টিতে দেখছে।

অবস্থাটা বৈশাখের অর্ধসমাপ্ত কালবৈশাখীর সন্ধ্যার মত। একটা ঝড় কিছু বৃষ্টি হয়ে গিয়েও একটা গুমোটে যেন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। দূরদূরান্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ক্ষীণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঝড় জল যা হবার হয়ে গেলেই যেন ভাল হয়—কিন্তু তাতেও দুরন্ত ভয়, হয়তো এমন বিপর্যয় হয়ে যাবে যে তারপর আর মানুষের উঠে দাঁড়াবার অবস্থা থাকবে না।

অবস্থাটা কলকাতারই মত। তবে কম আর বেশী।

শুনে নায়েব অজয় দুজনেই আশ্বস্ত হয়েছে। উত্তর কলকাতায় বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকদের গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলি আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তখন কাজ করছিল। লরী প্রাইভেট কার জীপ প্রভৃতি নিয়ে একটা বিভাগই হয়েছিল যারা মুসলমানপ্রধান অঞ্চল থেকে বিপন্ন হিন্দু পরিবারদের নিয়ে আসছিল হিন্দু অঞ্চলে। এখানকার মুসলমানদের জন্য সুরাবর্দী সাহেব ব্যবস্থা করেছিলেন—মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান থেকেও ঠিক একই ভাবে লরী কার জীপ এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছিল—তবুও ক্ষেত্রবিশেষে এরাও তাদের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে পেঁছে দিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ পুলিসও দেখা দিতে শুরু করেছে। লরীতে একজন দুজন পুলিসকেও দেখা যায়। এই এদের কাছে গিয়েই অজয় ওদের হাওড়া যাবার ব্যবস্থা ক'রে এল। ওরাই পেঁছে দেবে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে বিখ্যাত বোসেদের বাড়িতে এদের আপিস ছিল। গান্ধীভক্ত অধ্যাপক নির্মল বোস স্বেচ্ছায় এসে এদের ভার নিয়েছিলেন। তিনি হেসে বললেন—পাবেন—গাড়ি ঠিক সময়ে যাবে। আপনারা তৈরী থাকবেন।

গাড়ি ড্রাইভ ক'রে নিয়ে এসেছিল বোসেদেরই মেজ-ভাই মাধব। পাকা গাড়ি-চালিয়ে, মেকানিক। একসময় ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করেছিল শখ ক'রে। দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। কয়েকজন রিটায়ার্ড পুলিস কর্মচারীও এঁদের সঙ্গে ছিলেন। মাধব বোসের সঙ্গে তাঁদেরই একজন থাকবেন গাড়িতে। হাওড়ার পথে বিশেষ কোন বিপদ নেই—গ্রে স্ট্রীট থেকে সেনট্রাল অ্যাভেন্যু ধ'রে বিবেকানন্দ রোড জংশনে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড—তারপর হাওড়া ব্রীজ পার হয়েই হাওড়া।

বর্ধমানে নামল দশটার সময়। ওখানে লোক ছিল গাড়িও ছিল। পীস কমিটির প্ল্যাকার্ড লাগানো একখানা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন মহেন্দ্রবাবু। সেই গাড়িতে মঙ্গলকোটের কিছুটা পাশ দিয়ে ইসলামপুরের কোল ঘেঁষে সড়কটায় ধুলো উড়িয়ে এসে গাড়িটা পেঁছুল ঠিক সাড়ে এগারটায়।

নবগ্রামের মোড়েই কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির ছাদের উপর উঠে আলসের উপর বুক রেখে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মনোরমা। পথের উপর ধুলো দেখে তিনি নীচে নেমে এলেন।

গাড়িটা দাঁড়াল। অজয় নামল। মাকে সে দেখতে পাচ্ছে মন্দিরের অঙ্গন পার হয়ে আসছেন। তার মাথাটা যেন হেঁট হয়ে গেছে। সে যেন মুখ তুলতে পারছে না। ভুলতে পারছে না মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে একদিন আবার চলে গিয়েছিল তাঁকে একটি কথা না বলে। দীর্ঘদিনের মধ্যে চিঠিও লিখেছে মাত্র দু'তিনখানা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মা একটি চিঠিরও জবাব দেন নি।

নতমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অজয়। সে শুনতে পেলে মায়ের কণ্ঠস্বর—আসতে পারলি? এলি?

এগিয়ে গিয়ে অজয় কিছু বলবার আগেই উমা তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—ও'র পায়ে একটা কাচের স্প্লিনটার ঢুকেছিল।

—স্প্লিনটার ঢুকেছিল?

—হ্যাঁ। পরশু রাত্রে মিলিটারী লরী ঘুরছিল—তা থেকেই তারা গুলি ছুঁড়ছিল। একটা গুলি এসে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির জানালায় লাগে—শার্সির কাচের টুকরো এসে বিঁধে গিয়েছিল পায়ের ডিমে।

অজয় এসে এবার প্রণাম করলে মাকে।

—মুখ তোল। মুখ নামিয়ে কেন?

অজয় এবার মুখ তুলে একটু হাসলে। সে হাসি শুষ্ক হাসি।

মনোরমা বললেন—তোকে অনেক তিরস্কার করব বলে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম তুই এলে, তোর এই সব তুই নে বলে মায়ের হাতের খাঁড়াখানা নিজের বুকে বা গলায় বসিয়ে দেব—

—মা! কাতর স্বরে অজয় বললে—ক্ষমা কর মা!

মনোরমা বললেন—কিন্তু তা পারছি নে। কই পারছি? তুই তো কোন মন্দ কাজের জন্যে কিংবা কোন ঝোঁকের বশে এমন ক'রে চলে যাস নি! তুই গিয়েছিলি দেশের জন্যে। আমি চট্টগ্রামে বউ হয়ে গিয়েছিলাম। এসেছিলাম এলাহাবাদ থেকে - আমার দাদা সেখানে গান্ধীজীর ভক্ত ছিলেন। চট্টগ্রামে শ্বশুরকে দেখেছি স্বামীকে দেখেছি। শ্বশুর বলতেন—আমার দুটো থাকলে একজনকে দিতাম দেশের জন্যে মরতে। তিনি আজীবন যারা দেশের জন্যে কাজ করেছে তাদের কাজ ক'রে গেছেন। স্বামী বলতেন—বাবা আমাকে মানুষ করেছেন মা-বাপ দুই হয়ে। তাঁকে দুঃখ দিতে পারি না তাই তাঁর পথে যতটুকু পারছি তাই করছি। নইলে মনোরমা আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলতাম। তিনিও আজীবন কাজ ক'রে গেছেন দেশসেবকদের কাজ ক'রে। চট্টগ্রাম আর্মারি রেড কেসে তিনি ওদের উকীল ছিলেন। তুই তাঁর ছেলে। ওরে আমারও দুটো থাকলে আমি এমন ক'রে ভাঙতাম না!

টপটপ ক'রে চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়ল তাঁর। অজয়ের চোখেও জল এসেছিল—গড়িয়ে বেরিয়ে এল।

উমা বললে—বাড়ির ভিতর চলুন পিসীমা।

এবার চকিত হয়ে তার দিকে তাকালেন মনোরমা। সম্ভবতঃ পিসীমা ডাক শুনে। তিনি তাকে যেন আবছা চিনেছিলেন। দেখেছিলেন তো একবার বর্ধমান স্টেশনে। তিনি বললেন—তুমি তো সেই মেয়েটি মা—বর্ধমান স্টেশনে দেখেছিলাম—

অজয় এবার বললে—ও উমা মা।

—উমা?

—সাধনা মাসীমার মেয়ে উমা। যারা—

—উমা? প্রচণ্ড বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা প্রশ্ন

করলেন—উমা ?

বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—হ্যাঁ পিসীমা, আমি উমা। বসন্ত হয়ে—.

—বউদি কোথায় ? সাধনা বউদি ?

—তিনি নেই পিসীমা। তিনি বসন্ত হয়ে মারা গেলেন—আমার—

কথার মাঝখানেই মনোরমা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—বউদি নেই ?

—নাঃ। কাশীতে তাঁরই প্রথম বসন্ত হল। তিনি মারা গেলেন। তারপর আমার হল।

—কাশীতে ?

—হ্যাঁ। ধানবাদের আগে হঠাৎ ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শেষরাত্রে। পুলিসটা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মা আমাকে নিয়ে একটা জঙ্গলে নেমে পড়েছিল—তারপর—

হায় হায় ক'রে উঠলেন মনোরমা।—কোন রকমে আমাকে একটা খবর দিলে—। আঃ, ছি-ছি-ছি !

অজয় এবার বললে—ঘরে চল মা।

উমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরে দেখে মনোরমা যেন মিলিয়ে নিয়ে বললেন —হ্যাঁ, এইবার চিনতে পারছি। বেশ পারছি। আঃ, কি সুন্দর শ্রী—কি রূপ! আমি যখন তোর অ্যারেস্টের খবর পেয়ে গেলাম তখন উমাই আমার কাজ ক'রে দিত। আমি ভেবেছিলাম সাধনা বউদি বুক দিয়ে যে ভাবে তোকে বাঁচিয়েছেন অজয় তাতে তোর মায়ের কাজ করেছেন। আমার সংকল্প ছিল তাই হবে। আমি উমাকে নিয়ে উমার মা হব। আর তার বদলে তোকে দেব বউদিকে। তিনি ছেলে পাবেন। তাই তাঁকে আমি এখানে আনতে চেয়েছিলাম। তাঁকে তো জানতাম—ও কথা বলে তাঁকে আনতে চাইলে তিনি কখনওই আসবেন না। তাই চাকরির ছুতো ক'রে ও'কে এখানে আনতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে সঙ্গে উমাকে আমি গড়ে নেব আমার মনের মত ক'রে।

অজয় উমা দুজনেই মুখ নত করলে।

—আয় বাড়ির ভিতরে আয়।

যেতে যেতেও বললেন—কি ভুলই করলেন অধীর হয়ে বউদি! ছি-ছি-ছি! ধানবাদের আগে নেমে পড়লেন এতটা পথ এসে!

—সে অনেক কথা মা। পরশু শুনলাম সব ও'র মুখে। তাও অকস্মাৎ।

বাড়ির ভিতর ঢুকে মনোরমা বললেন—মাকে প্রণাম কর।

উমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কালী প্রতিমাটির দিকে।

—ঠাকুরমশাই চরণোদক দিন। নাও হাত পাতো।

সে পর্ব শেষ ক'রে মনোরমা মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন—কি খেলা মা তোর! যখন দুঃখ দিস তখন তার অবধি রাখিস নে। আবার যখন মুখ তুলে চাস সদয়া হোস তখন এমন করে দিস যে তা আর দু'হাতে ভরে না আঁচলে ভরে না—উপচে পড়ে যায়, ভুবন ভরে যায়। মা, আজ আমার ঘর ভ'রে দিলি মা! ছেলেকে এনে দিলি। সঙ্গে সঙ্গে যাকে একদিন সংকল্প করেছিলাম পুত্রবধূ করব তাকেও বিচিত্রভাবে এনে পৌঁছে দিলি!

তারপর তিনি বাড়ির ভিতরের দিকে চললেন। পিছনে উমা আর অজয়। অজয় বললে —সে কাহিনী বিচিত্র কাহিনী মা। ও'র কাছে পরশু শুনেছি আর আশ্চর্য হয়েছি। সে যে কি দুঃখ—কি কষ্ট! সে চোরের মত পালিয়ে বেড়ানো! অদ্ভুত! আরও একটা মজার কথা জানো মা—ও'কে আমি রিলিজড হয়ে কলকাতায় এসে অবধি দেখছি—আলাপও হয়েছে অথচ চিনতে পারি নি মুখে বসন্তের দাগের জন্যে—অবিশ্যি নামটা গোপন করেছিলেন।

একসঙ্গে পার্টিতে কাজ করেছি। উনি কিন্তু চিনতে পেরেছিলেন আমাকে। চেনা দেন নি।

মনোরমা সবিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

অজয় হেসে বললে—ওঁর ভয় হয়েছিল আমরা যদি—

মনোরমা বললেন—উপেক্ষা করি!

অজয় বললে—এমন আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আমি দেখি নি। তুমি তো জানো, সেই যে নেতাজীর জন্মদিনের পরদিন—আমি পার্টি আপিসে গিয়ে ফিরতে রাত করেছিলাম। বলেছিলাম একটি মেয়ে টাকা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল—ট্রামে উঠে পয়সা নেই দেখে নেমে পড়ে হেঁটে গিয়েছিল—সারাদিন না খেয়ে ছিল—তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল—আমি তাকে ট্যাক্সি ক'রে—

—হ্যাঁ। মনোরমা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাকালেন, বললেন—অ্যাকট্রেস হরিমতীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলি—তার মেয়ে—

—হ্যাঁ, মা। সেই তো এই উমা।

—তার মানে?

এবার মায়ের মুখ দেখে থমকে গেল অজয়। মনোরমার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। সে থমকে গেল।

উমা এবার বললে—আমার মায়ের মৃত্যুর পর হরিমতী মা আমাকে জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তখন তিনি কাশীতে থাকতেন। একটি মেয়ে ছিল—সে মরে গিয়ে প্রায় পাগলের মত হয়ে গিছলেন—সব ছেড়েছুড়ে কাশীবাস করছিলেন। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। উনি আমাকে তুলে এনে অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছিলেন। আমার উমা নাম পালটে, মেয়ের নাম ছিল নমিতা, সেই নামে ডাকতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি নমিতাই ছিলাম। আর সত্যিই তিনি আমার মা ছিলেন।

চলতে চলতে সকলে বাড়ির ভিতর সিঁড়ির মুখে দরদালানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। থমকে দাঁড়িয়েছিলেন মনোরমাই। ওই 'তার মানে' প্রশ্নটি করেই তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যেন স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। নির্বাক, কি বলবেন তা খুঁজে পেলেন না। হয়তো কি করবেন তাও ভেবে পাচ্ছিলেন না।

অজয় বললে—চল মা।

মনোরমা বলে উঠলেন—আঃ, ছি-ছি-ছি! তুমি আমাকে চিঠি লিখলে না কেন ভাল হয়ে উঠে?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উমা।

মনোরমা আবার বললেন—এলাহাবাদে বউদিকে চিঠি দিলে না কেন? মুখুজ্জে খুড়ো তোমাদের দেখতেন, তাঁকে চিঠি লিখলে না কেন?

উমা বললে—তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ওই ভয়ংকর অসুখে নিজে হাতে সেবা করেছিলেন, একদণ্ড ওঠেন নি শিয়র থেকে। তারপর আমাকে তাঁর মরা মেয়ের নামে ডেকে মা হতে চেয়েছিলেন। এলাহাবাদে জেঠিমাকে কি এখানে আপনাকে চিঠি লিখলে আশ্রয় হয়তো পেতাম অন্নও মিলত, কিন্তু সে অনুগ্রহের অন্ন তো! হরিমতী মায়ের অন্ন অনুগ্রহের ছিল না। মায়ের অন্নের মতই লেগেছিল—

—কিন্তু হরিমতী কি তা জান?

উমা বললে—কি তা বিচার আমি করি নি করবও না কোন দিন। তিনি আমার মা।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন মনোরমা।

অজয় শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—মা!

নায়েব সঙ্গেই ছিল। নীরব শ্রোতার মত সব শুনেই যাচ্ছিল, সে এবার বললে—ও সব কথা পরে হবে মা। ধীরেসুস্থে হবে। এখন কি ওই সবের সময় ?

মনোরমা সংবিৎ ফিরে পেলেন যেন। বললেন—হ্যাঁ, তাই হবে। এস। ওপরে এস। বলে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে।

হঠাৎ বললেন—কিছু মনে করো না মা। আমরা তো ঠিক একালের মানুষ নই। কথাটা কেমন মনে লেগে গেল।

উমা চুপ ক'রেই তাঁকে অনুসরণ করলে।

মনোরমা উপরে উঠে ঝিকে ডাকলেন, বললেন—ওপাশের একেবারে কোণের ঘর যেটা সেই ঘরে উমার জায়গা ক'রে দে। বুঝলি ?

অজয় চমকে উঠে বললে—ঘরটা যে একেবারে—

—তা হোক অজয়বাবু, ওই ঘরেই আমি বেশ ভাল থাকব। চল গো মেয়ে চল—আমাকে দেখিয়ে দেবে চল। আমার স্যুটকেসটা পাঠিয়ে দেবেন শিগ্‌গির। চান করব।

সব যেন কেমন ভেঙে গেল। মনোরমা ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। সেই যে ঘরে ঢুকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইলেন তাই-ই হয়ে রইলেন। অজয়ও কেমন হয়ে গেল। সে না যেতে পারলে মায়ের কাছে, না যেতে পারলে উমার কাছে। উমা স্নান ক'রে খাবার সময় খেতে এসে একটা ঘরে একলা বসে খেয়ে উঠে চলে গেল, গিয়ে সেই একপাশের ঘরটায় ঢুকে খোলা জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝিটা বললে—শুয়ে একটুকুন গড়ান দিদিমণি !

উমা বললে—আচ্ছা ওই যে রাস্তাটা চলে গেছে ওইটেই বর্ধমানের রাস্তা, নয় ?

—হ্যাঁ। ওটা গাড়ির পথ—ওই পথ দিয়েই তো মটরে চড়ে এয়েচেন গো !

—এখান থেকে কতটা রাস্তা হবে ?

—তা অনেকটা হবে বইকি !

—কই, একজনও লোক চলছে না তো ?

—চলবে কি গো ? ওই তো ছামনে এসলামপুর। ওখানকার শেখেরা কি হুজ্জুত করলে ক'দিন কি বলব ? রাতে ঘুম নাই দিনে স্বস্তি নাই। ওরা হাঁকে উদিক থেকে এরা হাঁকে এদিক থেকে। ওরা গাঁয়ের বাগ্দীদের ঘর পুড়িয়ে দিলে। বাগ্দীরা রাতে গিয়ে ওদের পাড়ায় আগুন দিয়ে এল। ভাগ্যে মঙ্গলকোটের বড়মেয়া ছিলেন আর আমাদের মা—সেই রক্ষে মা ! তা কলকাতায় নাকি ভীষণ কাণ্ড দিদিমণি—

—হ্যাঁ।

—বলে রাস্তায় বেরুলেই—

—তা হলে লোকে বর্ধমান যাচ্ছে কি করে ?

—পাঁচজনা মিলে যাচ্ছে মা। দল বেঁধে। আর ঘুরপথে রাস্তা আছে—ঘুরে ঘুরে যেতে হয়।

—হুঁ।

—কলকাতায় কত লোক মরেছে দিদিমণি ? এখানে তো বলছে কেটে গাদি ক'রে দিয়েছে। লরীতে ক'রে গঙ্গায় ফেলেছে।

উমা সে কথার উত্তর দিলে না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বললে—চল তো একবার তোমাদের মায়ের কাছে চল তো !

—তিনি এখন—

—আমার খুব দরকার। দেখা করতেই হবে। বলে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল। মনোরমার ঘরের দরজায় এসে বললে—পিসীমা আছেন ?

—কে ?

—আমি উমা।

—উমা ? কিছু বলছ ?

—হ্যাঁ। আমি কি ঘরে ঢুকব ?

—ও। আমি যাচ্ছি। তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন দরজায়।—কি ?

—আমাকে যে বর্ধমান পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

—বর্ধমান ? কেন ?

—কাজ আছে অনেক। আমার তো এখানে ব'সে থাকলে চলবে না। পার্টির এখন অনেক কাজ।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মনোরমা।

উমা বললে—আমি অজয়বাবুকে পেঁছে দিতে এসেছিলাম। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম।

—কিন্তু আমি তোমাকে এই অরাজকতার মধ্যে ছেড়ে দিতে তো পারব না !

—আমাকে যেতেই হবে।

—না। কঠিন দৃঢ় কণ্ঠে ওই একটি কথা বলেই তিনি ঢুকে গেলেন।

উমা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দুরন্ত ক্রোধে ঘৃণায় তার অন্তর টগবগ ক'রে ফুটছে। হঠাৎ সে বলে উঠল—কেন আমাকে এখানে আটকে রাখবেন ? আমি অস্পৃশ্য—

স্পর্ধা তো কম নয় মেয়েটার ! মনোরমা বাধা দিয়ে বললেন—তার ব্যবস্থা আছে। প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে করব আমি।

—না না না। কোন প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। বলেই সে হনহন করে এসে আবার সেই কোণের ঘরখানায় ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। এবং সেই জানালাটার গরাদে ধ'রে দাঁড়াল।

সামনে বর্ধমান যাবার রাস্তাটা নির্জন, যেন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আকাশে ঘন হয়ে মেঘ জমেছে। কালো একটা ছায়া নামছে, দিগন্ত ঘিরে একটা বৃত্তের মত যেন কেন্দ্রের দিকে ঘন হয়ে আসছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এই গ্রামই ছিল তার পিতামহের গ্রাম। তার পিতামহ পাদরীদের চাকরি নিয়েছিলেন এবং একটি মনোমত মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন বলে এই গ্রাম থেকে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। দূর এলাহাবাদে গিয়ে তবে তিনি এই সমাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

চারিদিকে গুমোট ঘন হয়ে উঠছে, তার মনে হল, এ গ্রামেরই বাতাস এমন ভারী যে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি ক'রে এখান থেকে সে মুক্তি পাবে ? কোন্ পথে ?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠে কড় কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। তার মনে পড়ে গেল তার স্যুটকেসে দুটো বোমা আছে। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল সে। ওঃ, স্যুটকেসটা যে এনেছে—আনবার সময় ফেটে গেলে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটত !

তাড়াতাড়ি স্যুটকেস খুলে সে দেখলে ঠিক আছে। বোমা দুটিকে কাপড়চোপড়ের মধ্যে বেশ নিরাপদ করেই পুরেছিল সে। এ দুটো সে চেয়ে এনেছে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির ঠাকুরের কাছ থেকে।

এই তো ! এই তো তার ওই জনহীন পরিত্যক্ত পথটা ধ'রে বর্ধমান যাবার পাথেয়—তার

সাহস, তার সঙ্গী! এই তো!

ওদিকে বৃষ্টি নামল। ক্ষীণ ধারাপাত প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। অবিশ্রান্ত ঝমঝম করে বৃষ্টি। তার আর শেষ নেই।

রাত্রি নেমে এল। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে অন্ধকার পুরু চামড়ার মত। সে ঠিক করলে এই দুর্যোগের মধ্যেই সে বেরিয়ে যাবে। এ দুর্যোগে হিন্দু মুসলমান তারাও বিরোধ মুলতুবী রেখে আজ ঘরে আশ্রয় নেবে। এ দুর্যোগে বের হতে পারে একমাত্র সে-ই যার বুকে তার মত নিষ্ঠুর ক্ষোভের আগুন জ্বলছে—উত্তাপ জমাট হয়ে আছে।

তার ঘরেই এসে ঠাকুর খাবার দিয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে এসেছিল অজয়। সে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলতে পারে নি। তার লজ্জা সে বুঝতে পেরেছে। বলেওছে—আমি আপনার অন্তর বুঝতে পারছি অজয়বাবু। কিন্তু কি করবেন? আপনি যান—আমি অস্বস্তি বোধ করছি। যান।

অজয় চলে গিয়েছিল; উমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে আবার দাঁড়িয়েছিল সেই জানালাটা ধ'রে।

রাত্রি নিস্তব্ধ নয়। ব্যাঙের ডাকে চারিদিক উতরোল হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে জলস্রোত ভাঙার শব্দ। মানুষের সাড়া নেই। আকাশে মেঘ কাটছিল। চাঁদের আলোর আভাস ফুটছে। তারই মধ্যে সেই অসমসাহসিনী প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্ষুব্ধা, নিদারুণ অভিমানে মর্মাহতা মেয়েটি স্যুটকেস খুলে তার টাকাগুলি খুঁটে বেঁধে খান-দুই কাপড় এবং সেই বোমা দুটো বের ক'রে নিয়ে কোমরে বাঁধলে। হাতে নিলে টর্চটা। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল এবং নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীচে নামল।

—কে?

চমকে উঠল উমা। অজয়ের কণ্ঠস্বর।

—আপনি? উমা দেবী?

—হ্যাঁ।

—চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—চলুন আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি। আমি জানতাম। এরপর আপনি থাকবেন না থাকতে পারেন না—এ আমি জানতাম। আমি জেগেই রয়েছি সেই জন্যে।

উমা চুপ ক'রে রইল।

—আসুন।

—বলুন আমাকে পেঁছে দিয়ে আপনি বাড়ি ফিরবেন?

অজয় বললে—ফিরব।

নীচে নেমে তারা দাঁড়াল। দরজায় তালা বন্ধ। দরজার গোড়ার শুয়ে রয়েছে প্রহ্লাদ বাগদী—এ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

অজয় তাকে ডাকলে। সে উঠে সবিস্ময়ে বললে—দাদাবাবু!

—দরজা খোল।

—দরজা খুলব!

—হ্যাঁ। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—শুধু তাই নয়, আমাদের বর্ধমানে পেঁছে দিতে হবে।

—মা—

—মাকে যা বলবার ফিরে এসে আমি বলব প্রহ্লাদ। তুই আমাদের সঙ্গে চল। আমার

মানটা তুই বাঁচা।

খানিকটা ভেবে প্রহ্লাদ বললে—চলুন। কিন্তু হেঁটে—

—হ্যাঁ, হেঁটেই। দুটো জন্তুকে এ দুর্যোগে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? চল। দাঁড়া—ও'র স্যুটকেসটা নিয়ে আসি। ফেলে এসেছেন উনি।

সারাটা পথ তারা প্রায় মুখ বুজে হেঁটে এল বর্ধমান পর্যন্ত। শেষ পথটুকু হাঁটবার শক্তি আর উমার ছিল না। শুধু মনের তাড়নায় এসে পে'ছিুতে পারল। বর্ধমানে ঢুকে জমির জলে উমা বোমা দুটোকে ফেলে দিলে। রাত্রি অল্পই বাকী ছিল; ওয়েটিং রুমে এসে কাপড় বদলে বসল উমা। অজয়ের জামাকাপড় ছাড়ার উপায় ছিল না। জল এবং কাদায় দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে তারা। খানিকটা চা খেয়ে একটু সুস্থ হল তারা।

উমা বললে—আমাকে একখানা কাশীর টিকিট এনে দিন। সে দুখানা দশটাকার নোট দিলে।

অজয় বললে--কাশী?

—হ্যাঁ। বাংলা দেশে থাকব না। আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল অজয়। টিকিট ক'রে আনলে ইণ্টার ক্লাসের। টিকিট হাতে দিয়ে বললে—একখানা চিঠি দেবেন—নিরাপদে পে'ীচেছেন!

—দেব। কিন্তু আমার ঠিকানা দেব না।

—বেশ।

আবার দুজনে চুপ ক'রে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। অজয় উঠে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরে এসে বললে—মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার আসছে। এরপর ট্রেন অনেক বেলায়। এইটেই ভাল।

—চলুন।

ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে অজয় বললে—একটা অনুরোধ করব!

—কি?

—এই টাকা ক'টা রাখুন। দরকার হবে। আপনার গহনা বিক্রির কথা আমি জানি।

সাগ্রহে হাত পেতে উমা বললে—দাও!

অজয় একতাড়া নোট তার হাতে দিয়ে বললে—এরপর বলবার মুখ আমার নেই। তবু কোন দুঃসময়ে আমাকে জানাতে যদি বলি—না বলো না। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম—বাসি। সেই এলাহাবাদে মা কথাটা বলেছিলেন মামীমাকে। আমি সেই বয়সেই তোমাকে—তখন তুমি ফ্রক পরো। শখ ক'রে কাপড় পরো—। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে চুপ করলে।

উমা বললে—জানি। তারপরও তুমি নমিতাকে ভালবেসেছিলে। তাও অজানা ছিল না। আমিও এবার—। হেসে বললে—থাক। হয়তো আমাদের বংশে কোন অভিসম্পাত আছে। দিদি—

—না না উমা—তোমার দিদির মত তুমি যেন ক'রে বসো না কিছু!

—না, তা করব না। কিন্তু তুমি কথা দাও মাকে ফেলে আর যাবে না!

—যেতে গেলে মাতৃহত্যার পাপ নিতে হবে। নইলে আজই—

—না। ফিরে যাও। কোন প্রতিশ্রুতি আমার কাছে তোমার রইল না। কিন্তু আমার ভালবাসা রইল একান্তভাবে আমারই নিজস্ব হয়ে।

ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

অজয় বললে—আর দেখা হবে না?

—হবে। অন্তত স্বাধীনতা যে দিন পাব সে দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবই। কথা রইল।

কাশীর ট্রেন চেপে উমা মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন লাইন আবৃত্তি করতে করতেই সারাটা পথ অতিক্রম করেছিল। দাঙ্গা হত্যাকাণ্ড রক্তপাত নারীর লাঞ্ছনার বিভীষিকার মধ্যেও সেদিন সারা ভারতবর্ষেই মানুষের মন ভরসা হারিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে নি। লড়েছে তারা। এই বিভীষিকাময় ভয়ংকর কালটির মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য তারা সেদিন বদ্ধপরিকর। তাই তারা সেদিন গীতা মহাভারতের শ্লোক ভোলে নি—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভোলে নি। মুসলমানদের মধ্যে যারা আত্মস্থ তারা কোরানের ভ্রাতৃত্বের বয়েৎ ভোলে নি—যারা উন্মত্ত প্রমত্ত, রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা প্রতারিত তারাও গোঁড়া মৌলভী এবং প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের কথা ভোলে নি।

প্রবীণ গীতা-বিশ্বাসী হিন্দু মনে মনে আবৃত্তি করছিলেন—"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।"

উমার মনে গুঞ্জন করছিল—"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার, খুলিতে বিলম্ব কত আর ?" আবার কিছুক্ষণ পর গুঞ্জন করে উঠেছিল—"বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ? স্বর্গ কি হবে না কেনা ? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ ? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

দিন আসবার রাত্রি প্রভাত হবার কোন লক্ষণ সেদিন কোন দিকে প্রকাশ পায় নি। সকল দিগন্ত গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতার দাঙ্গায় মিলিটারির আবির্ভাবে একটা সাময়িক ছেদ পড়ল মাত্র। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। প্রথম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষটা শেষ হল বটে তখনকার মত কিন্তু কঠিন আক্রোশে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এবং তারপর থেকে আরম্ভ হল অপ্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। অভিযানটা আরম্ভ হয়েছিল মুসলমানদের তরফ থেকে—তারাই করেছিল প্রথম আঘাত কিন্তু যখন সংঘর্ষটা প্রথম থামল তখন দেখা গেল প্রতিঘাতে মুসলমানেরাই হটে গেছে অনেক পিছনে। রাজশক্তি তখন মুসলীম লীগের হস্তগত তবু তারা হটে গেছে। এ ক্ষোভ অবশ্যই তাদের পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল। ট্রেঞ্চ গেড়ে বসার মত দুই সম্প্রদায় পাড়ায় পাড়ায় মুখোমুখি বসে শুধু অতর্কিত হত্যাকাণ্ডের পথে এ যুদ্ধ চালাচ্ছিল।

চলে গেল অগাস্ট—চলে গেল সেপ্টেম্বর। অক্টোবর মাসে পুজো হয়ে গেল কলকাতায় দারুণ উত্তেজনা এবং সতর্কতার মধ্যে। হঠাৎ ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন, কলকাতার মাথায় ওঠা ঝ'ড়ো কালো পুঞ্জীভূত মেঘখানা নিজের কলেবরকে ফুলিয়ে বিস্তৃত করেছিল পূর্বমুখে। একটা বিশাল বিপুল পুঞ্জমেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে জমল গিয়ে নোয়াখালির মাথায়। সাত-সাতটা দিন সেখানে চলল প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রবল নিষ্ঠুর আক্রমণ সংখ্যালঘুদের উপর। সাত দিনের মধ্যে বাইরের জগৎ একটি ক্ষুদ্র সংবাদ জানতে পারলে না। জানতে দিলে না লীগ গভর্নমেণ্ট। সাত দিন পর আট দিনের দিন বাংলার সংবাদপত্র এই ভয়াবহ মর্মান্তিক খবর কাগজে প্রকাশিত করে দিলে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের সে প্রহার সে নির্যাতন সে লাঞ্ছনার কথা প্রকাশিত যখন হল তখন ক্ষোভে সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষ মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহের নোয়াখালি ; দক্ষিণে সমুদ্র ; গোটা বর্ষার জল নদী খাল বিলে জমে থৈ থৈ করছে। সমুদ্রের মুখে থস ধরে আছে। তারই মধ্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরে দলবদ্ধ হিংস্র আক্রোশক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অস্ত্রহাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুদের উপর। হত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড নিয়ে নির্মম পাশবিক অত্যাচারের আর অন্ত ছিল না। গোটা দেশটা এই সংবাদে যেন আত্মহারা হয়ে উঠল।

উমা কাশীতে ওই স্বামীজীদের কাছে এসে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং আশ্রয় পেয়েও ছিল। আশ্রয় নিয়ে সে মনস্থির করতে চেয়েছিল—সে কি করবে?

কলকাতায় হত্যাকাণ্ড অগ্নিলীলা দেখে এবং মানুষের প্রতি মানুষের আক্রোশ দেখে সে যেন মনে মনে ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল অজয়ের সঙ্গে নবগ্রাম। মনে করেছিল হয়তো বা এইখানেই তার জীবনের নোঙরা-ছেঁড়া নৌকা আবার একটা বন্ধনে বাঁধা পড়ে বন্দরের আশ্রয় পাবে। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে তার সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন মনো পিসিমা। সে অশুদ্ধ? সে অস্পৃশ্য? শুধু তাই নয় তার পালিকা জননী হরিমতীকে তিনি যে কথা বলেছেন তার আর মার্জনা নেই।

হরিমতী মা বলতেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চৈতন্যলীলা দেখতে এসে অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তুমি কি তাঁর চেয়েও পুণ্যবতী পবিত্র মনোরমা পিসী? হরিমতী মা তাকে পালন করে তো অভিনেত্রী করতে চান নি—তাকে দিয়ে জীবনের অন্নের কথা ভাবেন নি। তিনি পড়তে দিয়েছিলেন—নেতাজীর আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিতেও দিয়েছিলেন। ছি মনো পিসী ছি!

যাক তার জন্যে তার আপসোস নেই, দুঃখ নেই। ভগবানে ঠিক তার বিশ্বাস নেই। যেমন এ যুগের সব ছেলেমেয়েদের মন তেমনি মন তার। বিশ্বাসও নেই আবার অবিশ্বাসটাই যে ধ্রুব স্থির তাও নয়। তবে তার যা হল, যে ভাবে তাকে আবার সে আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে এই পৃথিবীর বুকে একেবারে আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতে হল তাতে ভগবানই এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন—এ ছাড়া অন্য কথা কিছু মনে করবার মত খুঁজে পেলে না।

একটা দ্বিধার মধ্যেই পড়েছিল সে।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেই পারত। কিন্তু এই নিদারুণ মুহূর্তটিতেও নেতাজী, যাঁর নামে আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে (অবশ্য বিচিত্র ভাবে বিচিত্র পন্থায় হয়েছে), তিনি এলেন না—আকাশ-তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠের একটি বাণীও উচ্চারিত হল না বলে হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই কারণেই সে কলকাতা যায় নি। আরও একটা কারণ আছে। কলকাতায় থাকলেই অজয়ের সঙ্গে তার দেখা হবে।

তা সে হতে দিতে চায় না! না!

মনো পিসী, তোমার সন্তান নিয়ে তুমি সুখী হও। ছেলে বউ নাতি নাতনী নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার জমিদারবাড়িতে সোনার সংসার পাতো।

মনটাকে মাসখানেকে অনেকটা গুছিয়ে নিয়ে এসেছিল। নেতাজী আজ না এসেছেন—আসতে তাঁকে হবে, আসবেন তিনি নিশ্চয়, কেননা ইংরেজকে এবার যেতে হবে—তার না গিয়ে উপায় নেই একথা বলছেও সকলে এবং সে যেন মনে মনে সেটা অনুভব করছে। হয়তো ঠিক লগ্নটিতে আসবেন। যখন হিন্দু মুসলমানের হানাহানিতে ক্লান্তি আসবে—যখন সামনাসামনি ইংরেজ আর ভারতবর্ষের কথা হবে তখন সেই কথা ভেঙে পড়বামাত্র আসবে সেই লগ্ন—আরম্ভ হবে অভ্যুত্থান এবং তখনই আসবেন তিনি।

এই সময়টা সে নিজেকে গড়বে। পড়বে সে। স্বামীজীকে সে সব কথাই খুলে বলেছে। স্বামীজী এই মেয়েটির সেই গয়নাগুলি ফিরে দেওয়ার সময় থেকেই তার মর্যাদাবোধে অত্যন্ত মুগ্ধ। এবার তার সমস্ত বিবরণ শুনে একটু চুপ করে থেকে বলেছেন—তুমি তো মা অসাধারণ মেয়ে গো!

চুপ করে ছিল উমা। মুখ নত করে ছিল সবিনয়ে।

স্বামীজী বলেছিলেন—পথ কি তোমার করে দিতে হয়? পথ এসে আপনি বুক পেতে দিয়ে বলবে—হাঁটো। আমি যে কত কাল অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্যে!

হেসেছিলেন। উমা কেঁদে ফেলেছিল।

—কাঁদছ কেন মা?

চোখ মুছে উমা বলেছিল—আমার ইচ্ছে আমি পড়াশুনো করে নিজেকে তৈরী করে নি!

—বেশ তো, পড়ো। আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তিনি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একটি ধনী বাঙালী ভক্তঘরের মহিলার আশ্রয়ে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বলেকয়ে বাঙালী ঘরে তোমার দু একটা টিউশনিও জুটিয়ে দেব।

এরই মধ্যে এল ১৮ই নভেম্বর। ১৭ই নভেম্বর কলকাতায় যে কাগজ প্রকাশিত হয়েছে তা কাশীতে এসে পৌঁছুল ১৮ই তারিখে।

"নোয়াখালিতে হিন্দুর উপর বর্বর নৃশংস অত্যাচার। অবাধ হত্যাকাণ্ড—হিন্দুদের বাড়িঘর লুণ্ঠিত; বহ্নিমুখে ভস্মরাশিতে পরিণত; হিন্দু নারী ধর্ষিত—লুণ্ঠিত। সরকার পঙ্গু। নোয়াখালির পুলিস সুপারের দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগদান। নোয়াখালির হিন্দু সম্প্রদায় বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন।"

গোটা কাশী প্রথমটা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেল। তারপর ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উমা আবার চিত্তের স্থিরতা হারাল। একটা পুরনো ক্ষতে খোঁচা লাগল। এলাহাবাদের ব্যারিস্টার-পুত্র ফৈজুল্লাকে মনে পড়ে গেল তার। তার এবং তাদের সংসারের জীবনের সমস্ত বিপর্যয়ের মূলে দুজন মানুষ। একজন সেই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মেকী প্রগতিবাদী ছেলেটি যে তার দিদির জীবনটাকে আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দিলে—আর এই ফৈজুল্লা। দিদির সর্বনাশ যে করেছিল সে বলতে গেলে হারিয়ে গেছে। কাশীতে এসে তার মা শঙ্কিত ছিলেন পাছে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—কাশীবাসী সরকারী কর্মচারী পিতাটি ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে এখানকার বাসা তুলে দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি যৌতুক হিসেবে বাড়ি পেয়েছেন—সেখানে সংসার পেতেছেন পুত্রবধূকে নিয়ে। পুত্রটি তখনও বিদেশে। সম্ভবতঃ আমেরিকায়। ১৯৪২ সালে বিলেত যাব বলেও যায় নি, মত পরিবর্তন করে আমেরিকায় গেছে। তার সম্পর্কে তার আক্রোশ ক্ষোভটা তত প্রত্যক্ষ নয় যত প্রত্যক্ষ ফৈজুল্লার উপর। সেদিন রাত্রে সে তাকে দেখেছিল একদল ভাড়াটে মারমুখী লোকের সামনে। রাস্তার আলো মুখে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। অজয় দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালে তার সে কি আক্রোশ! তারপর যেদিন মুখুজ্জে দাদু তাকে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পুলিস সাহেবের আপিসে যান সেদিনও তাকে একবার সে দেখেছিল। ফৈজুল্লা পুলিস সাহেবের আপিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এই দু দিনের দেখা। তবু তার মনের ক্ষোভের জন্য হোক, আক্রোশের জন্য হোক আজও সে এমনি উত্তেজনার মুহূর্তে চোখ বুজলেই ওই ফৈজুল্লার মুখ তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এবং সে নানান কল্পনা করে; তার সবই ওই ফৈজুল্লার উপর আক্রোশ মেটানোর কল্পনা। যখন সে শুনেছিল কোহিমা সীমান্তে নেতাজী এসেছেন তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন এবং তারপর কলকাতায় তাঁর জন্মদিনে জেনারেল শাহনাওয়াজকে পুরোভাগে রেখে শোভাযাত্রার ধ্বজাবাহিনীর হয়ে সে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল সেদিন—তারপরও কতদিন সে কল্পনা করেছে ভারতের মুক্তি-ফৌজ চলেছে কলকাতা থেকে দিল্লী, শহরের পর শহর জয় করতে হচ্ছে না—তারা আপনি উচ্ছ্বসিত নদীর মত উথলে এসে সমুদ্রের জোয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার পর আসানসোল—তারপর পাটনা—তারপর কাশী—তার মধ্যেও অগণিত গ্রাম নগর নেতাজীকে অভিবাদন করে মুক্তিপতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর বাহিনী এসে পৌঁছুল এলাহাবাদ, সে এলাহাবাদে নেতাজীর কাছে গিয়ে স্যালুট দিয়ে বলবে—জনগণমন অধিনায়ক নেতাজী আমি

বিচার চাই। বিচার করবেন তিনি।

কিন্তু কলকাতায় দাঙ্গা বেধে উঠল তবু নেতাজী এলেন না—তার মন যেন ভেঙে পড়ল। ও কল্পনা যেন আপনাআপনি মিলিয়ে গেল। তার মনে নতুন কল্পনা জেগেছিল সেদিন। সেদিন মনে জেগেছিল দুরন্ত হিংসা। এই হিংস্র রক্তপাতের মধ্যে সেও অস্ত্র হাতে নিয়ে তার ওই শত্রু ফৈজুল্লাকে খুঁজবে। তার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনায় সে স্থিরনিশ্চয় ভেবেছিল যে এই হিংসা-জর্জর রক্তারক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই উৎসাহী ফৈজুল্লা এসেছে কলকাতায় এবং সুরাবর্দীর পাশে দাঁড়িয়েছে। সে তাকে সেখানে নিশ্চয় পাবে। সেই কল্পনাও তার ছিল কলকাতায় এই দাঙ্গার মুহূর্তে নেতাজী নিশ্চয় আসবেন এই ব্যগ্র প্রত্যাশার মধ্যে। তাই সে কলকাতায় এসেছিল উদ্‌ভ্রান্তের মত। যদি ফৈজুল্লাকে না পায় তবে নেতাজী এলেই তার প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। রক্তপাত দেখে সে শিউরেও উঠেছিল। কাশীতে এসে স্বামীজীর আশ্রয়ে থেকে মনকে শান্তও করে আনছিল। হঠাৎ আবার এই নোয়াখালির বর্বরতায় পৈশাচিক কাণ্ডে মনে ক্ষোভ জেগে উঠল। এ ক্ষোভের সকল ক্রোধ হিংসা পড়ল গিয়ে সেই ফৈজুল্লার উপর। অধীর অস্থির হয়ে উঠল সে।

কি করবে সে স্থির করতে পারছিল না। তবু অস্ত্র সংগ্রহের একটা নিরন্তর সন্ধান তার ছিল। কাশী এককালের বিপ্লব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। তার উপর এই নোয়াখালির সংবাদে এখানেও উত্তেজনার শেষ নাই। এ অঞ্চলের মুসলমানেরা সন্ত্রস্ত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যেও তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যে সব মুসলমান লীগের দলের নয়—যারা নিরপেক্ষ—এমন কি যারা কংগ্রেসী তাদেরই বিপদ বেশী। কংগ্রেস ঝাণ্ডা উড়িয়ে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে।—এ সর্বনাশ এ আত্মঘাত ডেকে এনো না—সাবধান! তোমরা সাবধান! কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসীদের একদল হিন্দু হিন্দুর উপর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। মুখে শান্তির কথা বললেও তাদের অন্তর টগবগ করে ফুটছে ফুটন্ত ধাতুর মত। কখন আগ্নেয়গিরির মত সে গলন্ত ধাতু উদ্গিরণ করবে কেউ জানে না। তারাও অস্ত্র সংগ্রহ করছে।

একটা অস্ত্র পেলে সে এলাহাবাদে চলে যাবে এবং চীৎকার করে ডাকবে হিন্দুদের। বলবে—ওই ফৈজুল্লা! ওই মুসলীম লীগের মূল!

অস্ত্র সে একটা পেলে। সাত দিনের চেষ্টার পর সেটা সে সংগ্রহ করলে ওই আশ্রমেরই অনুগত একটি অতিসাধারণ হিন্দুস্থানীর সাহায্যে। আশ্রমের নিরপেক্ষতার জন্য সেও বিক্ষুব্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে উমার কাছে দুঃখ করে বলত - দেখিয়ে উমা দিদি, ই লোগ ক্যায়সা হিন্দু সন্ন্যাসী ইয়ে তো মেরে সমঝমে নেহি আতা হ্যায়। এই দুঃসময়ে এরা বসে আছে। বসে বসে খাচ্ছে দাচ্ছে জপ করছে আর বলছে—না—খবরদার—মুসলমান বলে মানুষ মেরো না। মহাপাপ!

সে-ই তাকে সন্ধান দিয়েছিল—একদল লোক কিন্তু তৈরী হচ্ছে। তারা হিন্দু ধরম আর দেওতা ছাড়া কাউকে মানে না। গান্ধীকে না, নেহেরুকে না, কোইকে না।

তারই সাহায্যে সে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। পিস্তল পায় নি। পেয়েছিল একটা ছোরা আর বোমা। কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা বোমাগুলো নবগ্রাম থেকে আসবার পথে মাঠের জলে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সেদিন মন ছিল একরকম। তা ছাড়া ট্রেনের নিরাপত্তার জন্যেও বটে। সেদিন ২৫শে অক্টোবর। স্থির করলে সে কালই রওনা হবে এলাহাবাদ। জীবনে আত্মীয়হীন স্বজনহীন এই তিক্তচিত্ত মেয়েটির নিজের মন ও নিজের বুঝবার শক্তি ছিল না। যখন যে আবেগ এসেছে আসছে সেই আবেগেই সে চলেছে এবং চলছে কিছু সময়ের জন্য। নোঙরহীন নৌকোর মত।

* * *

২৬শে অক্টোবর সেদিন।

সকালে উঠে সে অভিভূত হয়ে গেল। গতকাল ২৫শে অক্টোবর গোটা বিহারে আগুন জ্বলে উঠেছে। নোয়াখালি দিবস ঘোষণা করেছিল হিন্দুরা। প্রতিবাদ জানাবে নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের বর্বর অত্যাচারের। কিন্তু সে প্রতিবাদ প্রতিবাদেই ক্ষান্ত থাকে নি, নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে নাকি মুসলমানদের ধ্বংস করেছে। কেউ বলছে এক লাখ। কেউ বলছে আরও বেশী। কেউ বলছে বিহারে নাকি একটি মুসলমানও জীবিত নেই। এবং বালক বলে রেহাই দেয় নি—শিশু বলে ছেড়ে দেয় নি। নারী বলে বাদ দেয় নি। বৃদ্ধকেও না। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে চলেছে। এবং এখনও চলছে সে হত্যাকাণ্ড অবাধে।

কাশীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়ে গেল। পুলিস পিকেট বসল। উমা শিউরে উঠল প্রথমটায় – তারপর স্তম্ভিতের মত বসে রইল।

খবরের পর খবর—গুজবের পর গুজব।

বিকেলে আশ্রমে এল সে স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী একখানা কাগজ নিয়ে বসেছিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে জল গড়াচ্ছিল।

কাগজটা সে দেখলে। Morning News—পাটনার কাগজ। তাতে সংবাদ—লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে হিন্দুরা। Several thousands of Muslims butchered—burnt alive—

হে ভগবান!

শিউরে উঠল উমা। একটা বেলা আশ্রমে হতভম্বের মত বসে থেকে সে উঠল। স্বামীজী বললেন—কোথায় যাচ্ছ?

—যাই ওখানে।

অর্থাৎ যে বাড়ির আশ্রয় সে পেয়েছে সেই বাড়িতে।

—না। কাশীতেও আরম্ভ হচ্ছে শুনছি। একলা যেয়ো না। অপেক্ষা কর। সঠিক খবর পাই তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

—আমি তো হিন্দু।

—নিশ্চয়। তবুও মানুষ যখন উন্মাদ হয় তখন কোন্ মুহূর্তে কি ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। বসো।

বিকেলবেলা স্বামীজীই তাকে নিয়ে একটা টাঙা করে যাচ্ছিলেন পৌঁছে দিতে। হঠাৎ পথের মাঝখানে টাঙাওলাকে আটকে দিল লোকে। তিনটে মৃতদেহ পড়ে আছে। রক্তে পথটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তিনজনই মুসলমান। সামনে মুসলমানদের একটা ছোট বস্তি।

যারা আটকেছিল গাড়ি তারা হিন্দু; হিন্দু এলাকার সীমান্তে আটকেছে। বললে—মৎ যাইয়ে। গলির ভিতর ওরা 'ছিপাকে' রয়েছে। গেলেই হয় বম্ মারবে নয়তো ছুটে দলকে দল বেরিয়ে এসে স্বামীজীর জান নেবে—লেড়কীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

টাঙাওলাকে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবে?

টাঙাওলা বললে ঠিকানা। তারা বললে—ঘুরে যাও—হিন্দু এলাকা ধরে ধরে।

স্বামীজী বললেন—না, ফেরো। উমা তুমি বরং—। উমা! উমা!

উমার কোন সাড়া ছিল না। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীজী টাঙাওলাকে বললেন—জলদি ফেরো। পথে দাওয়াখানা ডাগডরখানা দেখলে থামিয়ো।

দশাশ্বমেধঘাট রোডের মোড়ে মাড়োয়ারী হাসপাতালের সামনে একটা ডাক্তারখানা,

এখানকার পরম সদাশয় ডাক্তার সান্যালের ডাক্তারখানা এটি। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরম প্রীতির সম্পর্ক।

কোলে করে উমাকে টাঙা থেকে নামিয়ে ডাক্তারখানার ভিতর এসে স্বামীজী বললেন—ডাক্তারবাবু!

—কি ব্যাপার? স্ট্যাবিং?

—না। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে পথের উপর তিনটে লাস দেখে।

—শুইয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখার ঘেরা জায়গাটার পর্দা তুলে ধরলেন। স্বামীজী শুইয়ে দিলেন তাকে। ডাক্তারবাবু উঠে এসে তার নাড়ি ধরে দেখে বললেন—আমার ব্যাগটা আনুন তো ভাই। বললেন তাঁর সামনের চেয়ারে বসেছিলেন যে একটি ভদ্রলোক তাঁকে।

তিনি ব্যাগটা আনতেই ডাক্তারবাবু স্মেলিং সল্টের শিশিটা বের করে খুলে উমার নাকের কাছে ধরলেন।

মিনিট খানেকের মধ্যেই উমা মাথা সরালে। ডাক্তার শিশিটা সরিয়ে ধরলেন। এবার উমা চোখ মেললে। চোখ মেলে তাকিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখে সে খুঁজলে স্বামীজীকে। স্বামীজী টাঙাওলাকে ভাড়া দিতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উমা বিহ্বলের মত তাকাচ্ছিল—ডাক্তারের মুখ থেকে তার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল ভদ্রলোকটির মুখের উপর।

ডাক্তারবাবু বললেন—স্বামীজী আছেন। টাঙাওলাকে ভাড়া দিতে গেছেন। ভয় নেই তোমার।

উমা রুদ্ধকণ্ঠে চাপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—ভুনিদা!

ভুনি। এলাহাবাদের ভুনি। সে এলাহাবাদ থেকে বেহারে যাবার পথে নেমেছে কাশীতে। তার সহকর্মীদের কয়েকজনকে নিয়ে যাবে পাটনা। ডাক্তারবাবুও তাদের দলের একজন অন্তরঙ্গ।

ভুনি বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত—তারপর বললে—কে? উমা? উমা!

চোদ্দ মাস পর। ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী।

অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এর মধ্যে। ঐতিহাসিক ঘটনা। এমন বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা বহু শতাব্দীর পর ঘটে থাকে। ইয়োরোপের দুটো যুদ্ধ যা ক্রমে ছড়িয়ে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, যার জয়-পরাজয় মীমাংসিত হয়ে গেছে জার্মানী জাপান ইতালীর পরাজয়ে সেও ইতিহাসে এত বড় ঘটনা নয়। সে ঘটনা ভবিষ্যতের এই সব ঘটনার সূত্রপাত বা ভূমিকা মাত্র।

প্রথম ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

ইংরেজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী হিংস্র কলহের ফলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যে দাঙ্গা, না, দাঙ্গা নয় সংগ্রাম, ইতিহাসের চাপাপড়া আক্রোশের হিংসার ফলে যে হানাহানি হয়েছিল সেদিন সেটা দাঙ্গা বললেও দাঙ্গা নয়, সেটা যুদ্ধ—সংগ্রাম। সে যুদ্ধ কলকাতা থেকে নোয়াখালি, নোয়াখালি থেকে বিহার, বিহার থেকে সারা ভারতবর্ষে এখানে ওখানে আগুন জ্বলার মত জ্বলে উঠেছিল। সে আগুন শেষ জ্বলেছে পাঞ্জাবে। দিল্লীতে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

এরই মধ্যে স্বাধীন হল ভারতবর্ষ। কিন্তু আগুন এখনও নিভল না।

মহাভারতে রাজা পরীক্ষিতের সর্পাঘাতে মৃত্যুর প্রতিশোধে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ

করেছিলেন—বিরাট যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বলেছিল দাউদাউ করে—তাতে সাপেরা পুড়েছিল। কিন্তু তাতে সাপ শেষ হয় নি। তারাও মানুষের প্রতি আক্রোশ পোষণ করে লুকিয়ে ছিল বিবর মধ্যে।

ভারতবর্ষে পাকিস্তানে দুই এলাকাতেই জ্বলছে এখনও তেমনি নরমেধ যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড। এ অগ্নিকুণ্ড যে বা যারাই জ্বেলে থাক মানুষ মরছে।

এ আগুন নেভাবার জন্যে যে মানুষটি আস্তিকের মত ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনিও কাল এ অগ্নিতে পুড়ে গেলেন।

দিল্লীর ভাঙি কলোনীতে প্রার্থনা ও সভামণ্ডপের মধ্যে তাঁকে কাল ৩০শে জানুয়ারী একজন হিন্দুই গুলি করে মেরেছে। পর পর তিনটি গুলি। গান্ধীজী হাত জোড় করে হা রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

'আলো নিভে গেল—Light is out'—জওহরলাল নেহেরুর এই ভগ্নকণ্ঠের বাণী ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে হাহাকার করে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দিলে।

৩১শে জানুয়ারী দিল্লীর পূর্বপ্রান্তে যমুনার কুলে রাজঘাটে তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হচ্ছিল। চিতায় আগুন দেওয়া হয়েছে—চিতা জ্বলছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী কাঁদছে। কেউ নীরবে কেউ সরবে।

এই জনতার মধ্যে থেকে সরে একটু দূরে বসে যে মেয়েটি প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিল সে উমা।

আজ এক বৎসরের উপর সে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে নতুন একটি পথ পেয়েছিল। গান্ধীজী নোয়াখালিতে নিজে বাস করে সেখানে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সেতু রচনার যেমন চেষ্টা করেছিলেন তেমনি চেষ্টা বিহারেও হয়েছিল। একদল কর্মী সেখানে কাজ করে যাচ্ছিল তাঁরই নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী। সেখানে উমা কাজে লেগেছিল ভুনিদা'র সঙ্গে।

নোয়াখালির দাঙ্গার সংবাদে হিন্দুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের নানান স্থানে আগুন জ্বলে উঠেছিল। তার মধ্যে বিহারে হিন্দুর উন্মত্ততা এবং আক্রোশে দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কাশীতেও আগুন জ্বলতে চেয়েছিল, সে আগুনে অনেক আহুতিই পড়েছে। কিন্তু বিহারের মত আগুন অন্যত্র জ্বলে নি। সেই সংবাদ পেয়ে ভুনি আসছিল বিহার, পথে নেমেছিল কাশীতে। সেখানেই ডাক্তার সান্যালের ডাক্তারখানায় অজ্ঞান উমাকে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন উমারই অভিভাবক এবং আশ্রয়দাতা স্বামীজী।

উমা রাস্তার উপর তিন-তিনটে মানুষের রক্তে ভেসে যাওয়া মৃতদেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। স্বামীজী তাকে নিয়ে এসেছিলেন সব থেকে কাছের জানা ডাক্তারখানায়, ডাক্তার সান্যালের চেম্বারে।

জ্ঞান হয়ে উমা ভুনিকে দেখে চিনতে পেরে তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—ভুনিদা!

ভুনি তার বসন্তের দাগে চিহ্নিত মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরেই চিনতে পেরে বলেছিল—উমা!

ভুনির সঙ্গেই উমা এসেছিল বিহারে।

তার সব কথা শুনে ভুনি বলেছিল—কি বলব বল? আপসোস হচ্ছে এই যে যখন তোমরা মেল থেকে পথে নেমে পড়ে পলাতক হয়ে ঘুরে ঘুরে কাশী এলে, তখনও যদি একটা খবর পাঠাতে!

—মা বলতেন ভুনিদা। মধ্যে মধ্যে বলতেন। কিন্তু হঠাৎ নেমে পড়ে যে ভুলটা হয়ে গেল তাঁর, তারপর তাঁর ভয় বেড়েছিল যে এরপর আর পুলিস বিশ্বাস করবে না, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না আমরা নির্দোষ। কিছুই জানি না আমরা।

—হ্যাঁ, তা হয়তো ঠিক। সন্দেহ ওদের খুবই বেড়েছিল। আমাদের বাড়ি কয়েকবার সার্চ করেছে। আমরা জেলে—মাকে কতবার থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেসা করেছে তার ঠিক নেই। বার পাঁচেক তো বটেই। তারপর তারা কিন্তু সবটাই ঠিক আবিষ্কার করেছিল। কলকাতা চট্টগ্রাম এলাহাবাদ তিন জায়গার আই. বি. মিলে অজয়ের আসল সত্য বের করেছিল —তোমাদের সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে যাকগে—এখন তুমি আর এমন করে ঘুরো না নিরাশ্রয়ের মত আত্মীয়স্বজনহীনের মত। তুমি চলে যাও এলাহাবাদ। মা'র কাছে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ কর। পড়াশুনা কর। কালই চলে যাও। তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি রওনা হব।

উমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—না ভুনিদা, এলাহাবাদ আমি যাব না।

—কেন ?

—আমি পথ খুঁজছিলাম ভুনিদা, ভগবান মাঝপথে তোমার সঙ্গ ধরিয়ে দিয়ে বোধ হয় বলে দিলেন এই তোমার পথ। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

বিহারে এসে বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে সে শিউরে উঠেছিল। কলকাতায় হত্যাকাণ্ড সে দেখেছে। মুসলমানেরা প্রথম কয়েক দিন যে ভয়াবহ বীভৎসতার সৃষ্টি করেছিল তা চোখে দেখেছে এবং প্রতি মুহূর্তে তার আঁচ অনুভব করেছে। তার মনে সব থেকে ক্ষোভ এবং ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের নারীর উপর অত্যাচার দেখে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের আগুনে পোড়া কালো বীভৎস চেহারাটা তার মনে ভেসে ওঠে কলকাতার দাঙ্গার কথায়। আর মনে পড়ে কয়েকটি প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার কান্না। তাদের কন্যা বধূকে তারা হারিয়েছে। অত্যাচারের কথা বলে তারা বুক চাপড়ে কেঁদেছে, হাত জোড় করে বলেছে—হে ভগবান, তাদের জীবনটা যেন যায়, তারা যেন জীবনে না বেঁচে থাকে।

তারপর হিন্দু কলকাতায় ক্ষিপ্ত হয়ে জেগেছে, বাধা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, আক্রমণও করেছে। কিন্তু নারীর উপর অত্যাচারের কথা শোনে নি। হয় নি বলেই তার বিশ্বাস।

তারপর শুনেছিল নোয়াখালির কথা। নোয়াখালির বর্বরতার আর তুলনা হয় না। দূর থেকে শুনেছে, কাগজে পড়েছে, মনে মনে আগুনের মত জ্বলেছে, নিরুপায় হয়ে কেঁদেছে। সেখানেও সব থেকে বড় নৃশংসতা পাশবিকতার আক্রমণ হয়েছে মেয়েদের উপর।

তারই প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আগুন লেগেছে। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে আর মানুষ থাকে নি—তার চেহারা হয়েছে হিংস্র জন্তুর মত। যেখানে যে প্রবল সে-ই হয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মত ভয়ংকর ভীষণ।

—ভগবানও মধ্যে মধ্যে জন্তুর মত হিংস্র হয়ে ওঠেন এ কল্পনা মানুষেরই উমা। হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন—মুখটা হয়েছিল সিংহের মত, হাতের মুঠো হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণ-নখওয়ালা থাবার মত। এ সত্য মানুষেরই সত্য। ভগবান সত্য না মিথ্যে সে প্রশ্ন না-তুলেও এটা সত্য তার প্রমাণ দেখ।

বিহারে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাতে সব রক্ত এক জায়গায় ঢাললে রক্তের নদী হতে পারত। উন্মত্ত আক্রোশে ক্ষোভে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মুসলমানকে হত্যা করেছে। বালক বৃদ্ধ যুবা নারী বাছে নি। হত্যা করেছে। হত্যা করে বড় বড় কুয়োর মধ্যে মৃতদেহগুলো ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছে।

মুসলীম লীগের কাগজে নিহত মুসলমানের সংখ্যা লিখেছে লক্ষ। অনুসন্ধান চলছে।

এ কাজ তারাই অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবকরাই করছে। দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই এখানে ছুটে এসেছিলেন হিন্দু মুসলমান কংগ্রেস লীগ দুপক্ষেরই নেতারা যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আব্দুর রব নিস্তার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লিয়াকৎ আলি খাঁ। সর্দার প্যাটেল এবং লিয়াকৎ আলি খাঁ দিল্লী ফিরে গেছেন; পণ্ডিত নেহেরু এবং রব নিস্তার সাহেব এখানে রয়েছেন। পণ্ডিত নেহেরু এই হত্যাকাণ্ডে বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন—দাঙ্গা অবিলম্বে না থামলে তিনি বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোর উপর বোমা ফেলে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবেন। এবং মুসলমানদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার জন্য মুসলমান আর্মড পুলিস নিযুক্ত করেছেন।

সে মর্মান্তিক দৃশ্য।

মধ্যে মধ্যে এক একটা মুসলমান গ্রাম জনহীন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে—খাঁ-খাঁ করছে। পথে রক্ত এবং মাটিতে জমাট বেঁধে কালো ডেলা পাকিয়ে পড়ে আছে। দু'চারটে কুকুর শুঁকে মাটি চেটে রক্তের স্বাদ নিতে চেষ্টা করছে। কদাচিৎ কোন একটা বড় পাকা বাড়িতে অথবা গ্রামপ্রান্তের জঙ্গলে কিছু লোক লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

কঠিনতম ক্ষোভে উন্মত্ত আত্মহারা মানুষের জান্তব ক্রোধের ভয়ংকর প্রকাশ দেখে উমা কেমন হয়ে গিয়েছিল। সর্বাগ্রে বন্ধ হয়েছে তার খাওয়া এবং ঘুম। খেতে গেলেই কেমন গন্ধ লাগে। ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখে। তবু এর মধ্যে সে একটা সান্ত্বনা পেয়েছে—এখানে মানুষ নারীহত্যার পাপও করেছে, কিন্তু নারীর যেটা চরমতম লাঞ্ছনা সেটা করে নি। তার প্রমাণ পায় নি, কেউ বলে নি।

ভুনি বলেছিল—তুই এখানে থাকতে পারবিনে উমা। তুই এলাহাবাদে চলে যা। এ সহ্য করতে গিয়ে তুই শেষ পর্যন্ত মরবি—নয় পাগল হয়ে যাবি।

উমা বলেছিল—না, ভুনিদা। সহ্য আমাকে করতেই হবে। এ ছাড়া আমার আর পথ নেই। আমার ভাগ্যবিধাতা এর জন্যে আমাকে অনেক হাতুড়ি পেটা করেছেন—এই পথেই আমাকে চলতে হবে। তুমি ভেবো না—কয়েক দিনেই সহ্য হয়ে যাবে; এই নার্ভাসনেসটা কেটে যাবে।

—কেন রে? এই পথেই তোকে চলতে হবে কেন? জীবনের সব পথেই তো আজ সিংহদ্বার খুলে যাচ্ছে মানুষের সামনে। স্বাধীনতা আসছে। দেশ স্বাধীন হবে—জীবনে কত সুযোগ পাবি। যে পথে যেতে চাইবি সেই পথই দেখবি তোর সামনে খোলা।

উমা হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। বিষণ্ণ বিমর্ষ হয়ে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে।

—কি রে? ভুনি জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল? হঠাৎ এমন হয়ে গেলি? মনু পিসিমার কথা মনে পড়ে গেছে বুঝি? হেসে ভুনি বললে—দেখবি স্বাধীনতার পর পিসীমাও পালটাবেন।

—না ভুনিদা, ওকথা ভাবি নি। ওঁদের মনেও পড়ে নি। আমি ভাবছিলাম আর এক-জনের কথা।

—কার?

—নেতাজীর।

স্তব্ধ হয়ে গেল ভুনি।

উমা বললে—জানি না ভুনিদা, তোমরা আজীবন কংগ্রেসে থেকে কাজ করে আসছ; গান্ধীজীই তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর কথাই তাঁর পন্থাই তোমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ পন্থা—সব থেকে বড় কথা। নেতাজী কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করে পৃথক হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক করেছিলেন।

অহিংসার পথকে ছেড়ে দিয়ে দুঃসাহসের পথে দেশ ছেড়ে জার্মানী গিয়ে তাদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করেন নি ; সেখান থেকে এসে জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন। তিনি আজ এলে দেশের সব কিছুর মোড় ফিরে যাবে। হয়তো ইংরেজের সঙ্গে এই আপোসের কথাই আপনা আপনি ভণ্ডুল হয়ে গিয়ে শুরু হয়ে যাবে বিপ্লব। তোমরা তা চাও কিনা জানি না। কোনটা ভাল তাও আমি জানি না, বলতে পারব না। তবে তুমি বললে স্বাধীনতা আসছে, দেশ স্বাধীন হবে, শুনে আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে—সে স্বাধীন ভারতবর্ষে সবাই থাকবেন, থাকবেন না নেতাজী সুভাষচন্দ্র! ভাবতে কষ্ট লাগছে ভুনিদা। কান্না পাচ্ছে আমার।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল ভুনি। বোধ হয় মনে মনে খতিয়ে দেখছিল। তারপর বলেছিল—যার সম্বন্ধে যা বলবে তুমি বল উমা, শুধু একটি—একটি কেন দুটি মানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণা তুমি রেখো না। প্রথম মহাত্মাজী সম্পর্কে। নেতাজী এলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনিই তাঁকে সর্বপ্রথম বরণ করে নেবেন। এবং দেশ যদি মহাত্মাজীকে বলে তুমি সরে দাঁড়াও, ওখানে বসুন বা দাঁড়াবেন নেতাজী—তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করবেন। আর নেতাজী বলবেন—না। Father of the nation বাপুজী—তাঁর কোলের কাছে আমার স্থান। তবে মতভেদ হলে মহাত্মাজী সরে দাঁড়াবেনই। তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন—বল তো তোমাদের বেলা দেবীর স্বামী হরিদাস মিত্রকে তিনিই কি প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচান নি ? আর একজনের কথা —তিনি জওহরলাল—আমার বিশ্বাস—। বলতে বলতে থেমে গেল ভুনি। তারপর বললে—থাক, বলব না। তোমার মনে হতে পারে বেশী বলছি। নেতাজী না-আসার কারণ অন্ততঃ তিনি নন এটা তো মানবে।

উমা চুপ করে ছিল।

ভুনি বলেছিল—তা ছাড়া একটা কথা উমা, সেটা ইতিহাসের অমোঘ যোগ। পঞ্জিকায় আমাদের যোগের কথা লেখে। তার কোনটা ফলে কোনটা ফলে না। যেটা ফলে সেটাও কাকতালীয় হতে পারে। ইতিহাসের যোগ কিন্তু তা নয়। ও যোগে যা ঘটবার তা ঘটেই। নেতাজী যা করেছেন তাতে তাঁর স্থান ভারতবর্ষে অক্ষয়যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তিনি যেদিন আসবেন সেইদিনই তা ফলবে। তাকে ব্যর্থ করতে কেউ পারবে না।

আলোচনাটা চাপা পড়েছিল—একজন স্বেচ্ছাসেবক সাইকেলে চেপে ডাক নিয়ে এসেছিল। সাইকেল থেকে নেমেই বলেছিল—মহাত্মাজী নে এক আপীল ইসু কিয়িন হ্যায়। এ হাঙ্গামা বন্ধ না হলে তিনি আমরণ অনশন করবেন।

ভুনি হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলে।

···Though Bihar calls me, I must not interrupt my progıamme for Noakhali.

ভুনি বললে—মহাত্মাজী এখন বিহারে আসবেন না। কাগজখানা রেখে দিয়ে সে চুপ করে বসল। সে যেন হতাশ হয়েছে।

উমা কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়ে গেল।

Bihari Hindus are in honour bound to regard the minority Muslims as their brethren requiring protection equal with the vast majority of Hindus······I cannot rest till I have done some measure of penance.

চমকে উঠল উমা। আবার অনশন করবেন নাকি ? পড়ে গেল সে। হ্যাঁ, তাই করবেন। The low diet will become a fast unto death if the erring Biharis have not turned over a new leaf.

উমা শঙ্কিত কণ্ঠে ডেকেছিল - ভুনিদা !

—কি ?

—মহাত্মাজী বলেছেন বিহারে এর প্রতিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি হিন্দুরা না করে তবে তিনি আমরণ অনশন করবেন ।

হাত বাড়ালে ভুনি । উমা কাগজখানা তার হাতে দিলে ।

হাসলে ভুনি । বললে—না পড়েও তা জানি ।

তারপর সব চুপচাপ । অনেকক্ষণ নীরবতার পর উমা বলেছিল—মহাত্মাজীর সঙ্গে তোমার খুব জানাশুনো আছে, না ভুনিদা ?

—হ্যাঁ । ভালবাসেন আমাদের । আমাদের চেয়েও মাকে স্নেহ করেন বেশী । বলেন —নলিনী তো মাতাজী হ্যায় । মা বলেন—না, আপ সব কোইকে বাপুজী - ময় আপকে বেটী হোনে চাহতি—মা নেহি ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—এমনিতে বেশ মানুষ—অগাধ স্নেহ, কিন্তু কঠিন হলে পাথর । সেই যে বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন'—তাই । সংকল্প করলে তাঁকে কেউ বিচলিত করতে পারে না । তাই ভাবছি । ভাবছি উমা ভারতের স্বাধীনতা দোরে এসে দাঁড়িয়েছে, সে পর্যন্ত ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো !

উমা বললে—আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাবে ভুনিদা ?

—যাওয়া তো কঠিন নয় । তাঁর তো অবারিত দ্বার । তবে কাছে যাবার জন্যে পরিচয় অর্জন কর । কাজ কর । কাজ করবে বলে এসেছ । কাজ করে যাও । এ কাজ আজ নেতাজী থাকলেও এইভাবেই করতেন । অন্য পথ তো নেই । মুসলমান মারছে হিন্দুকে, হিন্দু তার প্রতিহিংসা নিচ্ছে মুসলমানের উপর । দুই সম্প্রদায়কেই তো শাসন করে গুলিগোলা ছুঁড়ে শেষ করে দিতে কেউ পারবে না । ইতিহাসের প্রায়শ্চিত্ত উমা । প্রায় সাতশো বছরের ইতিহাসের হিসেবনিকেশ ।

চুপ করে রইল উমা । সারা দিন ভেবেছিল । তার পরদিন থেকে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল কাজের মধ্যে ।

দিন পনের পর । ভোরবেলা তাকে ডেকেছিল ভুনিদা ।—উমা, উমা !

তখনও ভোরবেলা । রাত্রে শুতে অনেক দেরি হয়েছিল । ঘুম বলতে গেলে ভোরবেলা তাকে চেপে ধরেছিল । সে বিছানায় শুয়েই প্রথম উত্তর দিয়েছিল—কি ? তারপরই ধড়মড় করে উঠে বসেছিল । চেতনা চমকে উঠেছিল—আবার কোথাও কিছু হল নাকি ? ভুনিদা উত্তর দেবার আগেই সে আবার বলেছিল—কি হয়েছে ভুনিদা ?

—মা এসেছেন রে । ওঠ ।

মা ? ভুনিদার মা ! জেঠীমা ? মুহূর্তে তার দেহের মনের অবসন্নতা কোথায় চলে গিয়েছিল । সে ঘর খুলে বাইরে এসেছে । নলিনী দেবী হাসিমুখে দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন । তারপর বসন্তের দাগে ভরা তার মুখ দু হাতে ধরে দেখে বলেছিলেন —ওঃ সেই সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা এমনি করে দিয়েছে ! চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে এসেছিল ।

সেও কেঁদেছিল ।

চোখ মুছে নলিনী দেবী বলেছিলেন—তুই তৈরী হয়ে নে । দু ঘণ্টা পরই ট্রেন আছে ।

উমা বলেছিল—আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন জেঠীমা ? কেন ? আমি এখানে কাজ নিয়ে বড় ভাল আছি ।

নলিনী দেবী বলেছিলেন—না, এলাহাবাদ নয়, নবগ্রাম যেতে হবে।

—নবগ্রাম ? কেন জেঠীমা ?

—শিবেন ঠাকুরপো সেখানে মৃত্যুশয্যায়।

—বাবা ? আমার বাবা ?

—হ্যাঁ। মনো চিঠি লিখেছে।

কিছু বুঝতে পারে নি উমা। বলতে গেলে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। সে নলিনী জেঠীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—বাবা বেঁচে আছেন ? নবগ্রামে ? তিনি শেষ শয্যায় ?

—হ্যাঁ। মনোর এই চিঠি। দেখ, পড়ে দেখ।

উমা পড়লে চিঠিখানা।

শ্রীচরণেষু—বউদি, আমার প্রণাম নিয়ো। আমি কেমন আছি সে জানো। জীবনটা যায় না বলিয়াই আছি। এই কয়েক বৎসর যে অজয়কে লইয়া কি শাস্তিভোগ করিতেছি সে ভগবান জানেন আর আমার অন্তরাত্মাই জানেন। তোমরা বিশেষ করিয়া তুমি বা ভুনি বা দুনি আমার অবস্থা বুঝিবে না, বুঝিতে পারিবে না। কারণ তোমাদের দীক্ষা তোমাদের অন্তর আর এক রকম। তোমরা দেশ চাহিয়াছ—ঘর চাহ নাই। আমি ঘর চাহিয়াছিলাম। অপরাধ কিছু করি নাই। ঘর আমার ভাগ্যে ভগবান আমাকে দিয়াও ছিলেন কিন্তু অজয়কে বোধ হয় ঘর দেন নাই। সে তোমাদের দৃষ্টান্তে তোমাদের সংস্পর্শে আসিয়া দেশ চাহিল এবং ভগবান আমাকে যে ঘর দিয়াছিলেন সে ঘর ভাঙিয়া দিল। এই কারণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। তোমাকেও ভুলিয়াছি। তোমাকেও আজ এক বৎসরের উপর পত্র দিই নাই। তোমরা পত্র দিয়াছ—নায়েব তাহার উত্তর দিয়াছে। আমি সংসারে নিজের সন্তানকেই যখন আপন করিয়া পাইলাম না তখন অন্য জনকে লইয়া লাভ কি ? আমি আমার দেবতাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছি। কিছুদিন এই দাঙ্গার মধ্যে যে কি অবস্থায় কাটিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। এখন কিছুদিন অজয় আসিয়া ঘরে রহিয়াছে। কিন্তু সে তাহার দেহটাই আছে—আসল মানুষটা নাই। আমি বুঝি, বুঝিতে পারি—কিন্তু কি করিব। কিছুদিন আগে কলিকাতার দাঙ্গার ঠিক পরেই সে চার পাঁচ মাস দেশ দেশ করিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন বাড়ি ফিরিল তখন তাহার সঙ্গে শিবেন দাদার (ভটচাজ) মেয়ে নিরুদ্দেশ উমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে ঠিক চিনিতে পারি নাই। পারিবারও উপায় নাই। সারা মুখে সর্বাঙ্গে বসন্তের দাগ। শুনিলাম সাধনা বউদি ট্রেন হইতে পথে মেয়েকে লইয়া নামিয়া পড়িয়া বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া কাশী গিয়া লুকাইয়া ছিলেন। সেখানে তাঁহার বসন্ত-রোগে মৃত্যু হয়। তাহার পর উমার বসন্ত হয়। সে সময় তাহাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকিত কলিকাতার বিখ্যাত অ্যাকট্রেস হরিপ্রিয়া দাসী। সে মেয়েটিকে সেবাযত্ন করিয়া বাঁচাইয়া তোলে। হরিপ্রিয়া যৌবনে যাহা ছিল তাহা সকলে জানে। তবে পরে সে নাম করিয়া একজনকে ভজিয়াই ছিল। একটি কন্যা হইয়াছিল—সে মারা যাওয়ায় কাশীবাস করিতেছিল। এবার এই মেয়েটিকে পাইয়া কন্যার মত মানুষ করিতেছিল, কলেজে তাহাকে পড়াইতেছিল বলিয়াও শুনিলাম। অজয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ পার্টি আপিসে। আমি তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলায় সে মেয়ে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অজয়—আমার গর্ভের সন্তান—সে-ই তাহাকে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিয়াছে। সে নাকি কাশী গিয়াছে। অজয় এখানে আছে নামমাত্র। আমার উপর কোন মমতা তাহার নাই।

এসব ঘটনা জানাইবার জন্য এ পত্র নয়। এ পত্র অন্য কারণে। হঠাৎ আজ দিন পনের হইল এখানে একজন সন্ন্যাসী আসেন। প্রথম আমার ঠাকুরবাড়িতে ওঠেন। কয়েক দিন

থাকিয়া ভটচাজদের ভিটা কোথায় খোঁজ করিতে থাকেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দশ দিন পূর্বে একদিন সকালে উঠিয়া তিনি ওই ভটচাজদের ভিটার উপর যে একটি আমগাছ আছে তাহার তলায় আসন করেন। বলেন, এখানেই একটি কুঁড়ে বাঁধিয়া তিনি থাকিবেন। জীবনের স্বল্প কয়টা দিন বাকী আছে—এখানেই কাটাইবেন। সেখানেই থাকিতেছিলেন। আমি একটা কুঁড়ে করিয়াও দিয়াছিলাম। কিন্তু তিন দিন পূর্বে সেদিন সকালে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়। খবর পাইয়া আমি তাঁহাকে আমাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর একটা ঘরে তুলিয়া আনিতে বলি এবং ডাক্তার কম্পাউন্ডারকে চিকিৎসার ভার দিই। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন নিউমোনিয়া হইয়াছে। এবং ডাবল নিউমোনিয়া। ব্যাপারটা কঠিন। যাই হোক, পরদিন সকালে শুনিলাম জ্ঞান হইয়াছে, মনে হইতেছে কিছুটা ভাল। কিন্তু জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন—তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে আমি সকলের সঙ্গেই দেখা করি ; সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও দেখা করিতে হয়। তবুও প্রথম আমি নিজে না গিয়া নায়েবকে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে আমার কথা মনোরমা দেবীর সঙ্গে। আমি যাহা বলিব তাহা অন্য কাহাকেও বলিবার নয়। এবং আমার প্রয়োজন—বিশেষ প্রয়োজন। অগত্যা আমি গেলাম। লোকটি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন—ঠোঁট কাঁপিতেছিল। আমি বর্তমানে রুক্ষ-প্রকৃতির হইয়াছি। বলিলাম—বলুন কি বলিবেন ? আমার মায়ের পূজার সময় হইতেছে। তিনি বলিলেন—এলাহাবাদের শিবেন ভট্টাচার্যকে মনে আছে ? চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তাঁহার কথা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ? সঙ্গে সঙ্গে কেমন সন্দেহ হইল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দাড়ি গোঁফ চুলে মুখ ভরতি—তাহাও সবই প্রায় পাকিয়া আসিয়াছে—শুধু নাক এবং চোখ দুইটা চেনা চেনা মনে হইল। লোকটি বলিলেন—আমিই শিবেন। অনেকক্ষণ ভাল করিয়া দেখিলাম। তিনি বলিলেন—আমি কোন স্বার্থের কথা বলিতেছি না। আমার প্রার্থনা কিছু আছে—সেটা সামান্য। বলিয়া তিনি গোড়া হইতে রমার আগুনে পুড়িয়া মরা পর্যন্ত সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন—সেদিন শ্মশান হইতে সকলের অগোচরেই আমি চলিয়া গিয়াছিলাম গঙ্গার কিনারা ধরিয়া উপরের দিকে। প্রথম ইচ্ছা ছিল মরিব। কিন্তু মরিতে পারি নাই। চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে অনেক কথা। কল্কেফুলের বীজ ভাঙিয়া খাইয়াছিলাম। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় একটি দেহাতী লোক তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। এবং দেহাতী চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইয়াছিল। বিষের পরিমাণ সম্ভবতঃ কম হইয়াছিল। তাহার পর সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আসিয়াছিলাম কাশী। রমার সর্বনাশের কারণ যে ছেলেটি তাহার উপর শোধ লইব বলিয়া। সেখানে তাহারা ছিল না। শুনিলাম কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। আসিলাম কলিকাতায়। কলিকাতাতেও তাহাকে পাই নাই, শুনিলাম সে আমেরিকা গিয়াছে শ্বশুরের টাকায়। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে একটা কাজ জুটিয়া গেল—যুদ্ধে এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ। কাজ তাহার আসামে। কাজে পয়সা ছিল। তখন আর একটা সংকল্প জাগিল। রমা মরিয়াছে—উমা আছে—তাহার বিবাহ আছে। টাকার জন্য রমার বিবাহ হয় নাই। রমা পুড়িয়া বাঁচিয়াছে। এবার উমার বিবাহের টাকা যোগাড় করিয়া উমাকে বাঁচাইব—বাপের কাজ করিব। আড়াই বৎসরের মধ্যেই আট হাজার টাকা আমি জমাইয়াছিলাম। সেই টাকা লইয়া তিন বৎসর পর পঁয়তাল্লিশ সালে আমি এলাহাবাদ ফিরিয়াছিলাম। গোপনেই ফিরিয়াছিলাম। সেখানে জানিলাম সাধনা উমাকে লইয়া তোমার এখানে আসিবার পথে ট্রেন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এবার তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলাম। ছয় মাস ঘুরিয়া যাহা জানিলাম তাহা আমার অদৃষ্টেরই

উপযুক্ত। হাজারিবাগ অঞ্চলে জঙ্গলের পথে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। এবার সন্ন্যাসী হইলাম। হিমালয়ে মাস কয়েক ছিলাম। তাহার পর অনেক তীর্থই ঘুরিয়াছি। ঈশ্বরে বিশ্বাস কোন দিন ছিল না। সে বিশ্বাস সন্ন্যাসী হইয়াও হয় নাই। ইহার মধ্যে শরীর ভাঙিল। প্রথম নিউমোনিয়া হইয়াছিল। তাহার পর সারিয়া উঠিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রায় ভুগিতেছি। এবার বাংলাদেশে তীর্থভ্রমণে আসিয়াছিলাম। হঠাৎ বর্ধমানে আসিয়া মনে হইল নবগ্রামে আমার পিতার ভিটা। আমার বাবা সে ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন। নিজের মা—যিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই তিনি তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া একবার ভিটায় প্রণাম করিয়া আসিব। আমি জানিতাম নবগ্রাম তোমার শ্বশুরের শ্বশুরবাড়ি। এখন তোমরা এখানেই আছ। আসিয়া তোমার ঠাকুরবাড়িতেই উঠিয়াছিলাম। তোমাকে চিনিয়া একটু ব্যাকুলতাও হইয়াছিল পরিচয় দিবার জন্য। তোমার ছেলে অজয়কেও চিনিয়াছিলাম। রমার মৃত্যুর দিন সে মুখুজ্জে খুড়োর সঙ্গে তকরার করিয়াছিল আমার জন্য—সে আমি ভুলি নাই। তোমার ঠাকুরবাড়িতে থাকিয়াই খোঁজ করিয়া নিজেদের ভিটে দেখিলাম প্রণাম করিলাম। বাড়ির ধারের অশথ গাছটার তলায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল এখানেই কুঁড়ে বাঁধিয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইয়া থাকিব। একটা আশ্রম বানাইব। গরীব দুঃখী ছোটজাতের ছেলেদের লইয়া একটা পাঠশালা করিব। চিরটা জীবন মিশনারি-দের চাকরিতে এই কাজই করিয়াছি—এই কাজই করিব। দেবতা মানি নাই—ধর্ম বিশ্বাস করিতে পারি না কিন্তু মানুষকে এই গরীবদের ভালবাসি। বড়লোকের উপর আমার রাগ—তাহারা অমানুষ—এই গরীবদের মানুষ করিয়া তুলিব। সেই সংকল্প করিয়াই ওই জমিটুকু সেদিন তোমার নিকট চাহিয়াছিলাম কুঁড়ে বাঁধিবার জন্য। তুমি দিয়াছিলে। দুই তিন দিন রাত্রে বিনা আচ্ছাদনেই গাছতলায় কাটাইয়াছিলাম। যে কুঁড়েটা করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে যেন হাঁফ ধরিত। মনে ভরসা ছিল এলাহাবাদে জন্ম, সেখানকার শীতে মানুষ, বাংলাদেশের এইটুকু শীতে কি হইবে? কম্বল চাপা দিয়া কাটাইয়াছি। ইহারই মধ্যে সেদিন সারাদিনই শরীরটা জবর-জবর ভাবে কাটিয়াছিল—রাত্রে শুইয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিতেছি ডাক্তারখানায় শুইয়া আছি। শুনিলাম তোমার অনুগ্রহে এ ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি আবার নিউমোনিয়া হইয়াছে। ডাবল নিউমোনিয়া। মনে মনে বুঝিতেছি যে আমি বাঁচিব না। সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। আমার কাছে উমার বিবাহের জন্য জমানো আট হাজার টাকার মধ্যে এখনও ছয় হাজার টাকা আছে। টাকাটা আমি তোমার হাতে দিতে চাই। যদি বাঁচি তুমি আমাকে দিয়ো। ওখানে গরীব ছেলেদের জন্য একটা পাঠশালা করিয়া তোমাকেই ভার দিয়া যাইব। আর যদি মরি তবে তুমিই ওখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়ো। দুঃখের ভাগ্য লইয়া আসিয়াছিলাম—দুঃখেই জীবন গেল। দেশ স্বাধীন হইবে—জীবনে কোন দিন বিশ্বাসও করিতে পারি নাই যে দেশ স্বাধীন হইবে। কিন্তু তাহাও দেখা ভাগ্যে ঘটিবে না। আমি বেশ বুঝিতেছি আমি মরিব। আমার নামে এই পাঠশালাটা করিয়া দিয়ো। ওইটুকু পুজাই আমি করিয়া গেলাম।

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলেও অনেকক্ষণ কথা বলিতে পারি নাই। তাহার পর আমি বলিয়াছিলাম—শিবেনদা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আমার অনেক ঋণ সাধনা বউদির নিকট। তিনি আমার অজয়কে সেদিন না বাঁচাইলে অজয়কে হয়তো খুন করিয়া ফেলিত। অজয়ের জন্য তিনি পুলিসের হাতে নির্যাতন ভোগ করিলেন। শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। কিন্তু আপনার অনুমান ভুল। সাধনা বউদি জঙ্গলে মরেন নাই। তিনি উমাকে লইয়া কোনমতে

কাশী পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে তিনি অবশ্য বসন্তরোগে মারা গিয়াছেন কিন্তু উমা বাঁচিয়া আছে। এই কিছুদিন আগেও সে এখানে আসিয়াছিল অজয়ের সঙ্গে। এবং উমার সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলাম। শুনিয়া অবধি তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। আমি নায়েবকে কাশী পাঠাইয়াছি—রামকৃষ্ণ আশ্রমে খোঁজ করিয়া তাহাকে লইয়া আসিবে। অন্যদিকে শিবেনদা ব্যস্ত হইয়াছেন তোমার জন্য। তিনি তোমার হাতে উমাকে দিয়া যাইবেন। সেই কারণে তোমাকে পত্র লিখিতেছি—তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তাঁহাকে আমি বাড়িতে আনিয়া নিজের ভাইয়ের মতই চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু তিনি সত্যই বুঝিয়াছেন—ডাক্তারও বলিতেছেন যে রোগ কঠিন। পেনিসিলিনের খোঁজও করিতেছি। তুমি চলিয়া আসিবে। আমার প্রণাম জানিবে। ইতি

প্রণতা মনোরমা দেবী।

*

উমা এসে পৌঁচেছিল বাপের শেষ অবস্থায়। শিবেন ভটচাজ আট দশ ঘণ্টা মাত্র বেঁচে-ছিলেন উমা এসে পৌঁছুবার পর। তাও প্রায় অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থা। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্য। এমনি বারদুয়েক সজ্ঞান অবস্থার মধ্যে ক'টি কথা বলেছিলেন বাপ মেয়েকে। ক'টি কথা বলেছিলেন নলিনীকে।

উমাকে দেখে বেশ কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় পুরনো উমাকে খুঁজেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—সেই উমা? বলে কেঁদে ফেলেছিলেন।

তারপর বলেছিলেন—বেশ হয়েছে রূপ গেছে। রমার রূপ রমার সর্বনাশ করেছিল।

তারপর বলেছিলেন—বিয়ে না হয় কি হয়েছে? ভাল করে পড়িস।

নলিনীকে বলেছিলেন—ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ওর ভার তোমার ওপর।

মনোরমা এবার বলেছিলেন—আমার ছেলের জন্যে ওকে আমি চাচ্ছি শিবেনদা—দেবে?

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন শিবেন ভটচাজ।

তারপরই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর উমা কিন্তু ফিরে এসেছিল এলাহাবাদে। মনোরমা চেয়েছিলেন শিবেনদার শ্রাদ্ধ ওখানেই হয়। বলেছিলেনও। বলেছিলেন—শিবেনদা পৈত্রিক ভিটেতে ফিরে এসেছিলেন এখানেই শেষ ক'দিন কাটাবেন বলে। এখানেই মানুষের সেবা করবার সংকল্প করেছিলেন। দেহও এখানে রাখলেন। শ্রাদ্ধ এখানেই কর।

উমা বলেছিল—আমার ইচ্ছে এলাহাবাদেই করি। তাঁর অস্থি প্রয়াগসঙ্গমে বিসর্জন দিয়ে শ্রাদ্ধ ওখানেই করব। আপনি বললে না বলা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কিন্তু বাবা সেখান থেকে বড় দীনহীনের মত চলে এসেছিলেন। শ্রাদ্ধ সেখানেই করব। মুখুজ্জে দাদুকে বলব—তিনি পুরোহিতের কাজ করে দেবেন।

এরপর আর না বলতে পারেন নি মনোরমা।

অজয় নীরব ছিল। কোন কথাই সে বলে নি। আসবার সময় হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করেছিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বল।

—মা তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবেন এই আশঙ্কা করছ তুমি?

—করিনে বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু সেইটেই বড় কারণ নয়। কারণ তিনি তা বললেও আমি করব না।

—কিন্তু তিনি বোধ হয় তা আর বলবেন না।

—কি করে জানলে ?

—পরে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে থেকে যা বুঝেছি তা থেকেই বলছি। নোয়াখালির লাঞ্ছিত মেয়েদের সম্পর্কে যখন পণ্ডিতেরা মত দিলেন যে সংসারের স্বর্ণ লক্ষ্মীবিগ্রহ চোরে চুরি করে নিয়ে গিয়ে যদি পঙ্ককুণ্ডে ফেললে যেমন তাকে উদ্ধার করে গঙ্গাজলে স্নান করিয়েই আবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তেমনি ভাবেই এই সব কুললক্ষ্মীদের স্নানে শুদ্ধ করে গৃহে প্রতিষ্ঠা কর। মা প্রথমটা একটু ভেবে খুশী হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—এঁরা যে বিধান দিলেন এর থেকে বড় বিধান আর হয় না। একদিন তোমার কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—উমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার কথাটা আমি অন্যায়ই বলেছিলাম। সে তো পবিত্র। তা ছাড়া মায়ের স্নেহ—সে আমার স্নেহের চেয়ে কোন অচ্ছুৎ মায়ের স্নেহ তো কম পবিত্র নয়। এই কিছু দিন আগে একটি ডোম মেয়ে এসেছিল একটি ছেলের হাত ধরে। সুন্দর দেখতে ছেলেটি। মেয়েটি ওই ছেলেটির জন্যে কাপড়জামা চাইতে এসেছিল। বলেছিল—মা, ছেলেটি বামুনের ছেলে – আমার ঘাড়ে পড়েছে। আমাদের ছেলেদের টেনা পরিয়ে রাখি কিন্তু ওকে তো পারি না। তাই তোমার কাছে এসেছি। মা জিজ্ঞাসা করলেন—বামুনের ছেলে তোর কাছে কেন ? সে বললে —কি করব মা, ওর মা মড়কের বছর মারা গেল—তখন ছেলেটা বছর দুয়ের। আমার সঙ্গে ভাব ছিল মায়ের। মরবার সময় আমাকেই দিয়েছিল, বলেছিল—আমার বাবাকে দিয়ে আসিস। বাবা যদি না নেয় তবে তুই যা খাস তাই খাইয়ে ওকে বাঁচাস ডোমবউ। দেখিস, যেন না খেয়ে পথে না মরে। ওর মায়ের বাবার কাছে নিয়ে গেলাম, তা ওর বাবা বললে—বানের জলে ভাসিয়ে দিগে। অজয়ে এখনও বান চলছে। কি করব মা—আমার কাছেই রেখেছি। মা একটু ভেবে বলেছিলেন—তুইই ওর মা। তুইই ওকে মানুষ করিস। তবে একটা পৈতে পারিস তো দিস। কাপড়জামা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—মা বদলাচ্ছেন। এমন তো ছিলেন না। আমি চলে যাওয়াতেই এমন হয়ে গিয়েছিলেন।

উমা বলেছিল—ভাল লাগল শুনে। তুমি ওঁকে ছেড়ে যেয়ো না। ওঁর কাছেই থেকো। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে—হবে। দেশে ঘরে গ্রামে অনেক কাজ – তাই কর। সেও তো ছোট নয় তুচ্ছ নয় !

—তুমি ? তুমি আসবে ? কাজ করবে এখানে আমার সঙ্গে ?

একটু—অতি অল্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উমা ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না। আমি আমার কাজ পেয়েছি। বাবার শ্রাদ্ধ করে বিহারেই আমি ফিরে যাব।

—পার্টির কথা জান ? পার্টি তো ঠিক যোগ দিচ্ছে না মহাত্মাজীর দলের সঙ্গে।

—না দিক। আমি নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় যোগ দিয়েছিলাম পার্টিতে। যে কাজ মহাত্মাজী করেছেন সে কাজ মন্দ এ কথা নেতাজী এসেও বলবেন না। যদি বলেন—শাস্তি দিলে নেব। কিন্তু এ কাজ দলের কাজ নয় দেশের কাজ।

অজয় চুপ করে গিয়েছিল। কথা বলে নি।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

শ্রাদ্ধ সেরে উমা ফিরে এসেছিল বিহারে—সেই কাজে। পাটনা থেকে অনেকটা দূরে একখানা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। মাসাওরি গ্রাম। কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে। তার কাজ ছিল মেয়েদের মধ্যে। তার সঙ্গে ছিল আরও তিনটি বিহারী মেয়ে। অনসূইয়া গঙ্গা এবং একটি মুসলমান মেয়ে—নাম জুবেদা।

এরই মধ্যে এলেন মহাত্মাজী। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাস। ৫ই জানুয়ারী।

নামলেন ফতুয়া স্টেশনে। ভুনিদার সঙ্গে সে গিয়েছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে। তাঁকে দেখতে। এই সে তাঁকে প্রথম দেখবে। বুক তার আবেগে ভরে উঠেছিল। ভারতবর্ষের আত্মাপুরুষকে আজ সে দেখবে। গতরাত্রে সারারাত্রি ভেবে সে এই নামটি আবিষ্কার করেছিল। মহাত্মাজী ভারতের আত্মাপুরুষ। নেতাজী—সে আত্মার ক্ষাত্রবীর্য। একজন বহ্নি, অপরজন দীপ্ত শিখা। একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে ভাবা যায় না।

স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। বিহার কংগ্রেসের সভাপতি জনাব আব্দুল বারি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভুনিদা কংগ্রেসী মহলে সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠিত কর্মী। তার সঙ্গে সে আগেই গিয়ে দাঁড়াল।

ট্রেন এল। গাড়ি থেকে নেমেই মহিমময় শান্তিদূত প্রসন্ন হাস্যে বিকশিত হয়ে উঠে বারি সাহেবকে বললেন—ক্যা আভিতক জিন্দে হ্যায় ?

বারি সাহেব হেসে বললেন—খোদার দয়া।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এগিয়ে গেলেন। ওদিকে গাড়ি থেকে নামছেন গান্ধীজীর সঙ্গের লোকেরা। গৌরবর্ণ সুপুরুষ মাথাজোড়া টাক নিয়ে নামলেন একজন।

ভুনিদা বললেন—অধ্যাপক নির্মল বোস। নোয়াখালি থেকে গান্ধীজীর সেক্রেটারীর কাজ করছেন উনি—কথা আধখানা হয়েই অসমাপ্ত রয়ে গেল। ও কে নামছে !

অজয় ? হ্যাঁ অজয়ই তো। কাঁধে ঝোলা। চুলগুলো রুখু হয়ে উড়ছে। মুখে কষ্টের ছাপ পড়েছে। অজয় !

উমার বুকখানা স্পন্দিত হয়ে উঠল। কিন্তু দেখা হল না। ও'রা ওখান থেকেই সদলে চলে গেলেন পাটনা।

পরের ট্রেনেই তারা পাটনা গেল। ভুনিদাই বললেন - চল পাটনা যাই।

পাটনায় গঙ্গার ধারে সৈয়দ মামুদ সাহেবের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে গান্ধীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ভিড়ের অন্ত ছিল না। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসী মন্ত্রী মুসলীম লীগ নেতা আবদুল আজিজ প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা চলছে। তার মধ্যে সময় কোথায়।

দেখা হল অজয়ের সঙ্গে।

অজয়কে ভুনিদা প্রশ্ন করল - তুই ?

অজয় বললে—থাকতে পারি নি ভুনিদা। উমাকে নিয়ে মামীমা চলে এলেন—মা বললেন—অজয়, তোকে আর ঘরে আটকে রাখব না রে। তুই যা। তুই তোর দেশের কাজের পথেই চলে যা। দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন যেন নবগ্রামে ফিরে আসিস। আমি ভেবেচিন্তে নোয়াখালিই চলে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম শরৎবাবুর সঙ্গে ; গিয়ে কিন্তু ফিরতে ইচ্ছে হল না, ওখানেই থেকে গেলাম। প্রফেসার বোস স্নেহ করেন। মহাত্মাজীর অনুমতি উনিই যোগাড় করে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নোয়াখালির পর এক দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বর্ধমানে এসে ট্রেন উঠেছি।

সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনাসভার পর গান্ধীজীকে প্রণাম করে তারা মাসাওরী ফিরেছিল। ভুনিদাকে দেখে গান্ধীজী বলেছিলেন —ক্যা তুম হিঁয়া আয়া ?

ভুনিদা প্রণাম করে হেসে বলেছিলেন—হাঁ, আমি মাসাওরীতে রয়েছি।

—খুব ভাল। মা কেমন আছে—নলিনী মায়ী ?

—ভাল। এটি আমার বহিন। আমার সঙ্গে কাজ করছে।

—হাঁ ? আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা।

উমা প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়েছিলেন। জীবন তার কৃতার্থ হয়ে গেল বলে মনে হয়েছিল।

বিহার সফরের মধ্যে গান্ধীজী মাসাওরীতে তিন দিন ছিলেন। সে তাঁর সেবা করে আশীর্বাদ পেয়ে যেন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন বলেছিলেন—জীবনে রাস্তা অনেক আছে। কিন্তু সে রাস্তায় মানুষের জীবন পূর্ণ হয় নি। এই রাস্তা—এ নতুন নয় কিন্তু এ কখনও পুরনোও হয় নি। এই রাস্তায় দুনিয়া পোঁছোয় নয়া জমানায় নয়া জিন্দিগীতে। নয়া জমানা সেই পুরনো কল্পনার জমানা যে জমানায় হিংসা নেই, হানাহানি নেই, অন্যায় নেই। চিরকালের নব দিগন্তের এই একমাত্র পথ। মানুষ যখন এই পথ ধরে চলে তখন নব দিগন্তের সিংহদ্বার খোলে। কিন্তু দুঃখের আপসোসের বাত কি জান, চলতে চলতে মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। দরজাও বন্ধ হয়। মানুষ আবার উলটো মুখে ফেরে। নব দিগন্তের এ পথ থেকে মুখ ফিরিয়ো না কখনও।

উমার মনে পড়েছিল মহাকবির কবিতা—

নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?

নাই নাই—দেরি নাই। এই কথাই সেদিন মনে হয়েছিল। সেদিন অজয় বলেছিল—সেই ভাল উমা সেই ভাল। ওই সিংহদ্বারের ওপাশে পার হয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

উমা বলেছিল—সেই ভাল।

* * * *

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী, গোডসে গান্ধীজীকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করলে।

নেহেরু চীৎকার করে উঠলেন—আলো নিভে গেল !

সারা ভারতবর্ষ হায় হায় করে উঠল। কান্নার রোল আকাশ পূর্ণ করে বিশ্বজগৎ অতিক্রম করে ব্রহ্মাণ্ডের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল।

উমার মনে হল সিংহদ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

রাজঘাটে চন্দনকাঠের চিতার উপর গান্ধীজীর মরদেহ ভস্মীভূত হচ্ছে। উমা কাঁদছে।

অজয় তার পাশে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। তারও চোখ থেকে জল পড়ছে। তারা এই সময়টাতে দিল্লীতেই ছিল। শেষের দিকে উমা প্রার্থনাসভায় যারা গান গাইত তাদের দলের একজন হয়েছিল। অজয়ও ছিল অন্যতম কর্মী হিসেবে। ভুনিদা গান্ধীজীর খুব কাছে থাকতে পেয়েছিলেন।

সব শেষ হয়ে গেল।

নব দিগন্তের সিংহদ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝি ! হে ভগবান !

না—বন্ধ হতে দেবো না ! উমা চীৎকার করে উঠল—না—না—না !

অজয় বললে—কি, উমা ?

উমা বললে—আমার হঠাৎ মনে হল অজয়—আমি যেন চোখে দেখলাম নব দিগন্তের —গান্ধীজী যে নিউ হরাইজন নব দিগন্তের কথা বলেছিলেন তার সিংহদ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওঃ—!

অজয় বললে—না। বন্ধ হতে পাবে না। দেব না বন্ধ হতে। মানুষ দেবে না।

হঠাৎ উমা বললে—এবার আমরা কি করব অজয় ?

অজয় বললে—এই কাজই করে যাব উমা। চল—নবগ্রাম ফিরে গিয়ে আমাদের সর্বস্ব দিয়ে এই কাজই করি।

প্রার্থনার স্তোত্র উঠেছে। চিতাগ্নি নিভে আসছে।

রবীন্দ্রনাথ
ও
বাংলার পল্লী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

অশেষ প্রীতিভাজনেষু

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৮

লেখকের নিবেদন

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মহাকবির স্থাপিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতামালার তৃতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণ পেয়ে একই সঙ্গে সম্মানিত ও বিব্রত বোধ করলাম। আমি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, সাহিত্য পাঠ করে থাকি। কিন্তু তা আলোচনার, বিশেষ করে সে আলোচনাকে বক্তৃতার আকারে প্রকাশ করার আমার সাধ্য ও অধিকার কতখানি!

তবু নিমন্ত্রণ সসম্মানে গ্রহণ করেছিলাম। নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আমি বলতে গেলে, দেখিনি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। তাঁর নামে নামাঙ্কিত বক্তৃতার নিমন্ত্রণ তাই অবশ্য-কর্তব্যের মতই মনে হয়েছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে পিতার নামে এই বক্তৃতামালার পত্তন করেছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম যৌবনে একবার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তারপর তিনি রাষ্ট্রসংঘের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে সে দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে অবসর নিয়ে বিশ্বভারতীতে এসে বসবাস করছেন। তাঁর কৃত্যকে সম্মানিত করাও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সর্বোপরি মহাকবিকে তাঁর সাধনপীঠে প্রণাম জানাবার আবেগটিও অনুপস্থিত ছিল না। আর তা ছাড়া আমি তো সারাজীবনই বাংলার গ্রামের কথাই বলে এলাম!

সেই অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার দ্বিতীয় বর্ষে আমি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দিই। দ্বিতীয় বর্ষের বক্তৃতা এখনও প্রদত্ত হয়নি।

শেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বর্ষে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই সব রচনা। সবগুলিকে একসঙ্গে সংকলিত করে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হল।

এর জন্য শিশু সাহিত্য সংসদ যে যত্ন নিয়েছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

টালা পার্ক, কলিকাতা ২

শ্রাবণ, ১৩৭৮

প্রথম বক্তৃতা

প্রারম্ভিক নিবেদন

বিশ্বভারতীর এই অতি পবিত্র মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই মৃত্তিকাকে, এই প্রতিষ্ঠানকে এবং এই তীর্থতুল্য স্থানের যিনি তীর্থ-দেবতাস্বরূপ, সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এখানকার মৃত্তিকা একজন বাঙালী হিসাবে ও একজন লেখক হিসাবে আমার কাছে তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমির ধূলো আমার ললাট ও চিত্ত রঞ্জিত করুক, আমাকে নম্র করুক।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। যাঁরা জ্যেষ্ঠ ও অগ্রজ তাঁরা আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন; যাঁরা অনুজ ও কনিষ্ঠ তাঁরা আমার সস্নেহ সমাদর গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলকে এই তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা, নমস্কার, স্নেহ ও সমাদর জ্ঞাপন করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই বক্তৃতামালা দেবার জন্য আমাকে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা আমাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। এই কর্মের জন্য আমা অপেক্ষা বহু যোগ্য ব্যক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের যে কোন একজন বহু গভীর চিন্তার ও জ্ঞানের বার্তা আপনাদের দিতে পারতেন, যাতে আপনারা লাভবান হতেন। আমি একজন কথাকার মাত্র। আমাদের চারিপাশে যে প্রভুত জ্ঞানের সম্ভার থরে থরে নানা গ্রন্থরাজির মধ্যে গ্রথিত ও সঞ্চিত তা থেকে আমি জীবনে সামান্যই সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার যেটুকু জ্ঞান বা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই আমি অর্জন করেছি আমার সম্মুখে প্রবাহিত প্রত্যক্ষ জীবনের শোভাযাত্রা থেকে। সে শোভা-যাত্রায় রাজা ছিল না, ধনী ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষ, এদেশের এখানকার এই অঞ্চলের মানুষ। এখানকার মানুষের দীনদরিদ্র, ক্ষীণকায়, রৌদ্রদগ্ধ, তাম্রবর্ণ দেহের মধ্যে যে বিচিত্র প্রাণলীলাকে তাদেরই জীবনের শরিক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, মনে হয়েছে সেই বিচিত্র প্রাণশালা তার গূঢ় প্রকাশের ওপার থেকে যেন আরও কোন বাণী আকারে-ইংগিতে বার বার অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করছে। এইটুকুই আমার সম্বল। সে সম্বলটুকু আমি লাভ করেছি আমার চারিপাশের জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে। তাই আমার বক্তব্যের মধ্যে যদি পরোক্ষ ও পঠিত জ্ঞানের স্বল্পতা লক্ষ্য করেন তবে মার্জনা করবেন। অবশ্য আমি এও জানি আমার কাছে সে ধরনের জ্ঞান ও উপলব্ধির কথা শুনবার জন্য আপনারা খুব ব্যগ্র ও উৎসুক নন।

এই বক্তৃতামালা যাঁর মহৎ নামে নামাঙ্কিত, সেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এই খ্যাতিমান ও মহৎ মানুষটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি, তবে আমার প্রথম যৌবনে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে একবার দেখেছিলাম। সে দেখার স্মৃতি আজও মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। কংগ্রেস অধিবেশনের সুসজ্জিত উজ্জ্বল মঞ্চে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য ভাষণ দিতে উঠে তিনি শ্রোতার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে চলে গেলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী সহর্ষ

অভিনন্দনে দীর্ঘক্ষণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এর অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর সম্পর্কে আমার নাই। কিন্তু দেশসেবক, দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, আদর্শ-বাদী নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে, নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে জানি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাল্যাবধি তাঁর অকৃত্রিম অনুরক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার কথা সর্বজনবিদিত। ১৯০২ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে, যখন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম নববিধান সমাজে দর্শন করেন। সেই প্রথম দর্শনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। সেদিন তিনি 'উর্ধ্বলোকবাসী এক নির্মল ও স্বর্গীয় অস্তিত্বকে' নবীন কবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; এবং সেই প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁকে অভিভূত করেছিল। পরবর্তীকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মহাকবির কাব্য, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন, এবং নিজেকে তারই সঙ্গে যুক্ত করে গিয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে নামাঙ্কিত এই বক্তৃতামালা তার অন্যতম প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বিশ্বভারতীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রেমকে এরই মাধ্যমে তিনি একটি স্থায়ী মূর্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর সেই আন্তরিক অভিপ্রায় ও প্রয়াসকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

এর পর কিছু ব্যক্তিগত কথা সসঙ্কোচে উল্লেখ করব। আমার বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্যই সেগুলি উল্লেখের প্রয়োজন।

দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যে সব মানুষের বিশ্বভারতীর সঙ্গে, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও যোগসূত্র আছে, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তার থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। তার কারণ, আমার জন্মস্থান শান্তিনিকেতন থেকে বিশ মাইলের মধ্যে, এই জেলাতেই। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতন আমার জন্মস্থানের সমতুল্য। বাল্যকাল থেকেই নানান ভাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয়। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে এখানকার আনন্দে, উৎসবে, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছি, এখানে এসে প্রথম যৌবনে ঋষিতুল্য পুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথকে, মহাত্মা গান্ধীকে দূর থেকে সবিস্ময়ে দর্শন করে গিয়েছি। শান্তিনিকেতন আমাদের অঞ্চলের অংশ বলে তরুণ বয়সে অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। এখানকার নিভৃত, শান্ত অথচ নিত্যউৎসবময় পরিবেশে এমন কিছু ছিল যা শুধু এখানেই ছিল, আর কোথাও যার আস্বাদ মিলত না। মানুষের মন মায়ের কোলে, পিতৃগৃহে জন্মে আপনার ঘর খুঁজবার জন্য পথে বেরিয়ে কেবল খুঁজেই মরে, কিন্তু আপনার সেই ঘর যা নাকি তার মনের ঘর আর খুঁজেই পায় না। আমার সারাজীবন মাঝে-মাঝেই মনে হয়েছে, এখানকার পাখী-ডাকা নিভৃত গাছের ছায়ায়, আমার অতিপরিচিত কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর যেন আমার সেই মনের ঘরখানি লুকিয়ে আছে। একটু খুঁজলেই যেন তার দেখা মিলবে। মোট কথা, বীরভূমের মানুষ হিসাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান আছে, যা যাবার নয়, যাকে তাড়াতে চাইলেও যাবে না।

আজ সর্বাগ্রে মনে পড়ছে লেখক হিসাবে যেদিন মহাকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি সেদিনের কথা। আজ যতদূর মনে পড়ে সে ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। আমার দুখানি বই, 'রাইকমল' আর 'ছলনাময়ী' মহাকবিকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বই দুখানি পড়ে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে পত্র লিখেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এক চৈত্র মধ্যাহ্নে গেলাম কবিকে প্রণাম করতে। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন—এ কি ? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে ?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে ?

নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার দেখেছি আপনাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই প্রথম সাক্ষাতের বৎসর কয়েক আগে ১৯৩৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন স্বর্গীয় কালীমোহন বাবুর উদ্যোগে কবি সমাজ-সেবক কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্প-ক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসংকোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি।

তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সূত্রপাত হল এইভাবে।

কথায় কথায় বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি।

আবার বললেন—দেখবে, দু চোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই, দুখীরাম রুই—এদের কথা।

—ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারীতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। লেখক হিসাবে পরিচিত হতে এসে গ্রাম-সেবক ও সমাজ-কর্মীর পরিচয়টিকে এড়াতে পারি নি। দুই মিলে এক হয়ে গিয়েছে। তাই যখন এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাকে 'নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা' দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন তখন থেকে এই সব কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে। তা ছাড়া আমি নিজে পল্লীর মানুষ, সারাজীবন বাংলা দেশকে এই পল্লীর কথাই শুনিয়ে আসছি। আমার বলবার কথা যদি কিছু থাকে তো সে পল্লীর কথা। এই সব বিবেচনা করেই আমি আমার বক্তৃতার বিষয় স্থির করেছি—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লীগ্রাম।

সর্বাগ্রে আমার নির্ধারিত বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। আমার বক্তব্যের সীমা এবং সংজ্ঞা সম্পর্কেই আমার প্রথম বক্তৃতা অর্থাৎ এটুকু আমার মূল বক্তব্যের ভূমিকা।

ভূমিকা

কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত মানবসভ্যতায় মানুষের চিন্তা যেমন বহির্লোকে পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে দূরান্ততম জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি মনোলোকে তার চিন্তা জীবন জগতের কল্পনা, বাসনা সুন্দর-অসুন্দর মেধ্য-অমেধ্য সব কিছুকে স্পর্শ করে বোধ হয় আরও বেশীদূর প্রসারিত। এই দুয়ের সংঘর্ষ ও সংযোগ থেকে পাওয়া যে অভিজ্ঞতা, তার উপরই পৃথিবীর সব শিল্পের সৃষ্টি। ধাতুগত রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত হয়ে শিল্পীকে যে বিশেষ চরিত্র দান করে, সেই চরিত্রের প্রবণতা অনুযায়ী শিল্পী নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাকেই বিশেষ বিশেষ কালের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আধারে পরিবেশন করেন। শিল্পসৃষ্টির জন্য আসল প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, যার উপাদান হল মৌল জীবনবোধ। এই মৌল জীবনবোধ থেকে যিনি বিচ্ছিন্ন, এ বোধ যাঁর আয়ত্ত নয়, তিনি শিল্পের ছাপ দিয়ে নিজের কালে নিজের সৃষ্টির বিনিময়ে অজস্র বাহবা ও শিরোপা পেতে পারেন, কিন্তু তা পরবর্তী কালের কুঞ্চিত-ভ্রূ বিচারের ধোপে টিকবে না।

শিল্পীর রুচি ও প্রবণতার পার্থক্যহেতু শিল্পের রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। একই উপাদান নিয়ে দুই শিল্পী কাজ করেছেন এবং শিল্পকর্ম দুইই সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে, অথচ দেখা যাবে দুটি মূর্তি হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। দুই বিপরীত মূর্তিতেই তারা শিল্প-বিচারে সমান সম্মান আদায় করবে, সমাদরের পার্থক্য ঘটলেও। সেক্ষেত্রেও সমাদরের কম বেশী ঘটতে পারে, তবে দুইকেই সমাদর করবার জন্য রসিক গ্রাহকের কোন দিন অভাব ঘটে না, ঘটবেও না। আমার কালের আমার সমসাময়িক দুই স্বর্গত বন্ধুর নাম এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। একজন বিভূতিভূষণ, অন্যজন মানিক। তাঁরা দুজনেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের অলঙ্কার। দুজনেই জীবনের বহু মৌল বিষয় নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। অথচ দুজনের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। যদি একের দৃষ্টি ও সৃষ্টি অন্যের বিপরীত প্রান্তে বলি তা হলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। অথচ দুজনেরই পাঠকের কাছে সম্মান ও সমাদরের অভাব ঘটে নি।

আবার শিল্পীর এই রুচি ও প্রবণতাই তার সীমা ও গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয়। এই রুচি ও প্রবণতা যেমন শিল্পীকে তার নিজস্ব দৃষ্টি, তার থেকে সঞ্জাত দর্শন, যা জীবনবোধের নির্যাস এবং সৃষ্টির উত্তাপ যোগায় তেমনি সে আপনার নিজস্ব বিশেষত্ব দিয়ে শিল্পীকে খণ্ডিতও করে। এর ফলশ্রুতি সাহিত্যের পাতায় পাতায়। তবে তার ফল সাহিত্যের পক্ষে অশুভ হয় নি। তাতে অভিনব বৈচিত্র্যের বিবিধ উপকরণে সাহিত্যের ভাণ্ডার উজ্জ্বলই হয়েছে। বৈচিত্র্যই নূতন মহার্ঘতার বোধ সংযুক্ত করেছে।

এরই ফলে, শিল্পের যে পরিধি পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে উর্ধ্বলোকে জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে সেই বিশাল রাজ্যে কোন শিল্পী শুধু ধুলোর মুঠো নিয়ে খেলা করেছেন, কেউ বা সেই ধুলোর উপরে বসে ধুলোর মুঠোর সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে মূর্তি গড়েছেন, কেউ বা ঘাসে মাঠে শিশুর মত ছুটে বেড়িয়েছেন, কেউ বা দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের শোভাযাত্রা দেখেছেন, কেউ বা সেই শোভাযাত্রায় যাত্রীদলের একজন হয়েছেন, কেউ বা অন্ধকার অরণ্যভূমির অন্ধকার গায়ে কম্বলের মত জড়িয়ে নিয়ে অরণ্যভূমির শরিক হয়ে সেখানকার ভয়াল জীবনকে দেখেছেন, কেউ বা মাটিতে ধুলোয় দাঁড়িয়ে আকাশের উদাসীন মেঘকে উদাসীনের মতই দেখেছেন, কেউ বা আকাশলোকের অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে

তাকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। এঁরা সবাই শিল্পী, সার্থক শিল্পী। এক-একজনের সৃষ্টিতে এক-এক আস্বাদ। নিজের নিজের সৃষ্টিলোকে তাঁরা সকলেই মহামান্য সম্রাট।

কিন্তু যে যাই দেখে থাকুন আর পরিবেশন করে থাকুন, একটি কৃত্য প্রত্যেকেই সম্পন্ন করেছেন সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই রাজ্যের প্রতিটি মহিমান্বিত সম্রাটের অঙ্গে অঙ্গে পৃথিবীর ধুলার রাজলাঞ্ছন। এই রাজলাঞ্ছনের মহিমায় যিনি মহিমান্বিত নন, তিনি আমাদের, আমরা যারা ধুলোর উপর মাটি দিয়ে ঘর বাঁধি, যাদের চোখের জল মর্ত্যলোকের ধূলিই শোষণ করে, জীবনান্তে যাদের এই প্রাণময় রসময় দেহ আবার ধুলাতেই বিলীন হয়, সেই আমাদের রাজা নন। রাজা কেন, তাঁর বশ্যতা কেন, তাঁর সঙ্গে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্কই স্বীকার করি না।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে শিল্পের রাজ্যে এমন জন কেউ আছেন কি, থাকেন কি? উত্তরে অসংকোচে বলব, আছেন এবং তাঁদের সংখ্যা স্বল্প নয়। কেউ কেউ শিল্পী মন নিয়ে জন্মেও জন্মসূত্রেই এমন চারিত্রিক প্রবণতা নিয়ে এসেছেন যে পৃথিবীর ধুলোর ছোঁয়া তাঁদের অঙ্গে কেন, পায়েও লাগল না। মন তাঁদের আকাশের তারার সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে বাঁধা রইল। মনকে বাঁধতে বাঁধতে সারা দেহটাই যেন তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেই এই দেহে আকাশের মত, তারার মত হয়ে গেলেন। মর্ত্যলোকের দৈনন্দিন মানবজীবনের সুখ-দুঃখের সব আস্বাদ তাঁদের হারিয়ে গেল। সেই হারাবার তপস্যাই যেন তাঁদের সৃষ্টিতপস্যা। তাই শিল্পের আনন্দলোক থেকে তাঁরা স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নিয়ে অন্য আনন্দলোকে বসবাস করতে যান। তাঁদের গানে তাই মর্ত্যলোকের দুঃখ-বেদনার উষ্ণ স্পর্শ নাই, ক্লেশজয়ের মহিমার স্বাদ নাই। তাঁদের সংগীত মানব-সুখ-দুঃখ-বিরহিত আর এক আনন্দের শীতলতায় শীতল। তাঁরা আমাদের প্রণম্য। তাঁরা সাধক, তাঁরা পরম সত্যসন্ধানী। তবু বলি, তাঁরা শিল্পের রাজ্যের কেউ নন। তাঁদের প্রেম মিথ্যা হবে বলে 'ভুবনেশ্বর পথের ধুলায় নেমে আসন পাতেন না।

আর এক দল আছেন যাঁরা একদা এই ধুলায় মহিমান্বিত হবার জন্য এসে, কবে, নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো, ধুলো থেকে গা বাঁচিয়ে সরে এসে নির্জন, নিরাপদ, কোলাহলহীন গৃহশয্যা আশ্রয় করেছেন। সেইখানে বসেই তাঁর নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন শিল্পী-জীবন কেটে গেল। তাঁর গৃহকোণের শয্যাতল যত মহার্ঘই হোক, তিনি যে একদা ধুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরে ঢুকেছিলেন, তার ফলে শিল্পের রাজ্য থেকে যে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হলেন এবং শিল্পের প্রাণদেবতা তাঁর বন্ধ দ্বারে বার বার করাঘাত করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন সেকথা তিনি বুঝলেন না।

আরও একদল আছেন যাঁরা সারাজীবনে এই ধুলোর রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পেলেন না। তাঁরা যেখানে চলাফেরা করলেন সেখানে যে ধুলোর নামগন্ধও নেই এ বোধটাই সারাজীবনে তাঁরা পেলেন না।

এই ধুলার রাজ্যের অধীশ্বর যাঁরা তাঁদেরও ইতর-বিশেষ আছে। এ রাজ্যে ধুলার রাজারা অধিকাংশই ধূলিতলবাসী। ধুলার হাঁটতে হাঁটতে, চলতে চলতে, খেলতে খেলতে, দেখতে দেখতে অধিকাংশ জনই ভুলে যান তাঁর রাজ্যে ধুলা ছাড়া আরও কিছু আছে। ধুলার নিজস্ব মোহনতা, লোভনতাও তো কম নয়, অনেক! তার আস্বাদ যে বড় তীব্র, আর তাতে বৈচিত্র্যই বা কত! আবার কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে মর্ত্যলোকের ধুলার উপর পা রেখেও তিনি একবারও ভোলেন না যে তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁর গন্তব্য ওই আকাশলোক, অসংখ্য জ্যোতিষ্কে গ্রথিত আকাশলোক। তাঁদের মনে এবং সৃষ্টিতে মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা ও আকাশের নীলিমা এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। তাঁদের

সৃষ্টির টানায় মাটির ছোঁয়া, আর পোড়েনে আকাশের নীলের স্পর্শ। আকাশ আর মৃত্তিকার যুগল সম্মিলনে তাঁরা যে অতি-মহার্ঘ অতি-বিচিত্র অঙ্গদখানি রচনা করেন মানব-বিধাতা তা উত্তরীয়ের মত অঙ্গে ধারণ করে বোধ হয় কৃতার্থ হন এই ভেবে যে, যা দিয়ে তিনি তাদের মর্ত্যলোকে পাঠিয়েছিলেন তারই খানিকটা তারা ফিরিয়ে দিলে।

আমাদের মহাকবি এই পথের পথিক, এই ধারার শিল্পী। তিনি সাধক, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি দার্শনিক। কিন্তু এ সবই তাঁর খণ্ডিত পরিচয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি মহাকবি। এই ধূলি-ধূসর মর্ত্যজীবনে সকল ধূলি-মালিন্যের মধ্যে অবস্থান করে চিরদিন তিনি আকাশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর রচনায় মাটি আর আকাশ মাখামাখি হয়ে আছে। তার মধ্যে আকাশের ছোঁয়া কতখানি আর কতখানি যে মাটির স্পর্শ তা নিরূপণ করা কঠিন। অধিকাংশ শিল্পী যেখানে শিল্পে মর্ত্যলোকের পর্ণকুটিরে অবস্থান করেন, সেখানে মহাকবির আবাসগৃহ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আকাশলোকের একান্ত আস্বাদ গ্রহণ করবার সময় তিনি যে মর্ত্যলোকের মানুষ, মৃত্তিকা-সম্পর্ক-বিরহিত জন নহেন, এ সচেতনতা সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকত তাঁর মধ্যে। নিজের পা দুখানি যে এই মর্ত্যলোকের মৃত্তিকায় আরও লক্ষজন সমকালীন যাত্রীর সঙ্গেই ধূলার উপরেই স্থাপিত একথা বিস্মৃত হবার মত শিল্প-চারিত্র তাঁর নয়। কারণ মর্ত্যলোকের ধূলার মোহন মাধুরীই তাঁকে আকাশলোকের পথ চিনিয়েছিল। বহির্লোকে অনন্ত রূপরসময়ী, নিত্যউৎসবময়ী পৃথিবীর চিরনবীন অনন্ত সৌন্দর্য এবং অন্তর্লোকে মানবজীবনের অনিবার্য যাবতীয় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকুতি-তপস্যা যুক্ত বেণীর প্রবাহের মত তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল সেই আশ্চর্য আকাশলোকে, যা পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দ-রসোপলব্ধিতে ভাস্বর। মর্ত্যদেহে মর্ত্যবস্তুনির্ভর এই সৌন্দর্য ও আনন্দ-আস্বাদের মধ্যে যে অমৃত আস্বাদ রয়েছে তাতে যদি স্বর্গ থাকে, দেবতা থাকে, তবে স্বর্গের দেবতারাও তার জন্য ঈর্ষিত হবে।

এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লৌকিক ও জীবদেহসঞ্জাত হয়েও ভিন্ন শ্রেণীর। এর জাত আলাদা। জীবদেহে সঞ্জাত অন্যান্য বৃত্তির মত এর পরিপূর্তির জন্য বিশ্বসংসারের কোন কিছুর উপর এর কোন দাবী নাই। এ বৃত্তি দেহ দিয়ে কিছু পেয়ে নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে না। বিশ্ব-সংসারের দিকে চোখ মেললেই এর পরিতৃপ্তি। কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দরসোপলব্ধি যুগিয়েছে এই মাটির পৃথিবীই, অন্য কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয়, মাটির পৃথিবীর বাইরের কিছু নয়। এ সৃষ্টির এক প্রান্তে মাটির পৃথিবী, অন্য প্রান্তে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা। দুয়ের সম্মিলনে এর সৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটিই বোধ হয় এই। দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত, প্রত্যক্ষ সৃষ্টির সৌন্দর্য-চেতনা এবং সেই চেতনার ফলশ্রুতিস্বরূপ এই সৃষ্টির ভঙ্গুর মৃৎপাত্রে তজ্জনিত আনন্দের অমৃতরসপান।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিমাণে যত বিপুল, প্রকারে তত বিচিত্র। কাজেই কোন একটি বক্তব্যকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর বলে উপস্থাপিত করতে চাইলে তা বিনা বিচারে সকলের পক্ষে গ্রহণ করতে অসুবিধা ঘটাই স্বাভাবিক। বিশালায়তন রবীন্দ্র-সাহিত্যে কত বিচিত্র, কত বিভিন্ন সুর! ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্ম, স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বমানবিকতা প্রভৃতি একজন স্পর্শকাতরচিত্ত, ধীমান, প্রবল কল্পনাশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল পরিপক্ব মনুষ্যসত্তার পক্ষে যা যা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব, সর্ব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেদোজ্জ্বলা বোধ দিয়ে চিন্তা করেছেন এবং নিজের প্রায়-অলৌকিক ও অতি চারু শিল্পশক্তির দ্বারা তাকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই বহুবিচিত্র ও বহুবিভিন্নের মধ্যে একটি সুরকে প্রধান বলে চিহ্নিত করতে চাইলে তা সর্বজনসম্মতভাবে গৃহীত হতে আপত্তি হতে পারে।

রবীন্দ্র-মানস বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর জবাব মিলতে পারে। মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের রুচি-প্রবৃত্তি ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে আসল মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাকে চিনতে পারলে এর উত্তর পাওয়া সহজ হতে পারে। শিল্পকর্ম অবশ্যই শিল্পীর চিত্তের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহন করে, কিন্তু সেই যে শতকরা একশো ভাগ তার অন্তরের আসল মূর্তি এ কথা কে জোর করে বলবে? সোনা থেকেই অলংকার তৈরী হয়; কিন্তু সোনা যখন অলংকারের মূর্তি নেয় তখন সোনা ছাড়াও তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু সামান্য পরিমাণে মেশাতে হয়। অলংকার তৈরির প্রয়োজনেই সে মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। তাই যেমন সোনা আর অলংকার শতকরা একশো ভাগ এক নয় তেমনি শিল্পের অভিজ্ঞতা আর শিল্পীর যে চিত্ত সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, দুইকে পুরোপুরি এক এবং অভিন্ন বলে ধরা ঠিক হবে না।

'ছিন্নপত্রাবলী'র মধ্যে কবি আপনার এই নিভৃত মনের অকপট পরিচয় অসংকোচে ব্যক্ত করেছেন। এরই সমর্থনে 'ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রগুচ্ছের মধ্য থেকে কিছু অংশ এখন উদ্ধৃত করে শোনাচ্ছি:

> আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি।...চারিদিকে কেবল মাঠ ধূ-ধূ করছে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচিলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।...সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল—নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হল যেন ঐখেনে সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মত কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্‌গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে—যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ঔদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করেছে, কারও ঘরের কথা নয়। ...আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল।
>
> [ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১০]

'ছিন্নপত্রাবলী'র মধ্যে এই ধরনের প্রকৃতি-সৌন্দর্য-আবিষ্ট চিন্তা ও ভাবের পরিমাণ বোধ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই ধরনের চিন্তা ও ভাব 'ছিন্নপত্রাবলী'তে বহু বিবিধ চিন্তা ও ভাবের

অরণ্যমধ্যে সীতার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত স্বর্ণালঙ্কারের মত যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। আমি উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি নি, তবে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তার আয়তন সংক্ষেপ করি নি। তার প্রথম কারণ ভাব ও চিন্তা এখানে গঙ্গার ধারার মত শিল্পবোধের দুই তটরেখা প্লাবিত করে অনিবার্য বেগে প্রবাহিত; এবং দ্বিতীয় কারণ এই প্রবল প্রবাহের তরঙ্গধ্বনি থেকে তার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু একটি প্রগাঢ় ও সম্পূর্ণতা নিয়ে আমার শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

কবির অন্তরের যে ভাব-মূর্তি উপরে প্রকাশ পেয়েছে তাই বোধ হয় তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত মূর্তি, এই বোধ হয় তাঁর মূল চিত্তধর্ম। তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী জীবনের প্রতি মুহূর্তের অচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা তিনি মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু গভীর, বহু বিচিত্র উপলব্ধি ও বোধের অতি মহার্ঘ সম্ভার সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু মনে হয়, তার সব কিছু এই মূল চিত্তধর্মের সঙ্গে মিশে তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে; এই মূল চিত্তধর্মের চারিপাশে তাকে ঘিরে সেই উপলব্ধি ও ভাবের অলঙ্কারে সাজিয়েছে। এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর কোলে বসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত-মাধুরী পান ও সেই আনন্দ-আস্বাদের গানই তাঁর সারাজীবনব্যাপী কাব্য-সাধনার মূল কথা।

তাই এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবী থেকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সংসারের দিকে তাকিয়ে তাঁর কবি-দৃষ্টি কখনও ক্লান্ত হয় নি। বালক বয়সে চিত্তের উন্মেষের সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত শ্যামা ধরিত্রী সমান নবীনা ছিল, তার রূপমাধুরী সমান অম্লান ছিল। এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন কবি কেন, কোন মানুষেরই ভাগ্যে ঘটে না। এই জরা-মরণশীল মানবদেহ জন্মসূত্রেই যে আনন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মায় তা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়িত হয়; সংসারের জৈবদেহাশ্রয়ী প্রবৃত্তিগুলির পৌনঃপুনিক কর্ষণে সেই অকারণ আনন্দের উৎসের উপরে স্থূল থেকে স্থূলতর আবরণ পড়ে, মানুষের নিজের অজ্ঞাতে সে উৎসমূল থেকে ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার সঙ্গে জীবদেহও কালের অমোঘ নিয়মে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়। প্রাচীন, অস্বচ্ছ মন ও জীর্ণ দেহ আর আনন্দকে নবীন ও অম্লান করে ধরে রাখতে পারে না। তবে কেউ কেউ এই অমোঘ জীব-পরিণামের বিপরীতমুখী তপস্যায় ও চর্চায় নিজের জীর্ণ দেহেও নবীন প্রাণচেতনাকে ধারণ করে রাখতে পারেন। এই দুর্লভ শক্তি ও সাধনা মহাকবির ছিল। এবং তিনি এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রকৃতির রূপমাধুরী দর্শন-চর্চার মধ্যেই তিনি এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তবে মহাকবির এই মাধুরী দর্শনের এক আশ্চর্য বিশেষত্ব ছিল। যে বৃহৎ, নিঃশব্দ হাস্যময়ী পৃথিবী তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিশেষ চিত্তধর্ম এবং অভ্যাস যোগে সাধনার দ্বারা লব্ধ এক ধরনের বুঝাপড়া ছিল, যার ফলে দৈনন্দিন প্রাণযাত্রার কর্ম থেকে একবার বাইরে দৃষ্টি ফেরালেই তিনি বোধ হয় অনুভব করতেন, চিরনবীনা পৃথিবী অতি নিঃশব্দে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করে আছে অনন্ত সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টি বিনিময়মাত্রে তিনি সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর খোলা দরজা দিয়ে একেবারে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন। যে বিশেষকে দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন সে বিশেষ,—সে সূর্যাস্তই হোক, সন্ধ্যা-সমাগমই হোক, তারাময় রাত্রিই হোক, নির্মলনীল আকাশই হোক বা পদ্মার ফেনশীর্ষ তরঙ্গই হোক—সে বিশ্বব্যাপী সুধারসসিক্ত অপার সৌন্দর্যের হাতছানির ইঙ্গিতমাত্র। সেই বিশেষ এক মুহূর্তে তাঁকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যের জগতে উত্তরিত করত। এবং সেই বিশেষ যখন কাব্যের অভিজ্ঞতার আধারে আবার কাব্যের ভিতরে মূর্তি নিত, সে তখন বিশাল সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশের মত দেখা দিত।

শুধু তাই নয়। জন্মসূত্রে যে ভগবদ্-বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন এবং যা তিনি তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও জীবনাচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং নিজের অন্তরস্থ যে বোধকে উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে নূতন করে লাভ করেছিলেন সেই বোধকেই প্রত্যক্ষভাবে তিনি সমস্ত সংসারব্যাপী স্পষ্ট অস্তিত্বরূপে উপলব্ধি করেছেন এই সৌন্দর্য আস্বাদের পথে। যিনি সংসারের সমস্ত অস্তিত্বের প্রাণের প্রাণ, যিনি বিশ্বসংসারের সমস্ত বিশেষ অস্তিত্বের মধ্যে সৌন্দর্যের অপার ভাণ্ডাররূপে মানব-অনুভবের মধ্যে প্রকাশিত, তিনিই সমস্ত অস্তিত্বের অন্তরালে প্রাণরূপে, জীবদেহে চেতনারূপে, মানবদেহে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। কবির চিত্তে তিনিই অপার সৌন্দর্যানুভূতির মূর্তিতে প্রকাশিত। তাঁর অভ্রান্ত বিশ্বের সৌন্দর্যানুভূতির সাধনার পথেই তিনি একান্ত নম্রচিত্তে সেই সর্বব্যাপী অস্তিত্বকে বার বার আস্বাদ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন মানবচৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলের মূল্যে তার পদপ্রান্ত স্পর্শ করতে হয়। সেই সর্বব্যাপীকে, সুন্দর ও ভীষণকে জীবনের উপাস্য বলে জেনেছেন।

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশের পরম ক্ষণে প্রিয়জনমুখে।...
... ... তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে; তারপর দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

[এবার ফিরাও মোরে]

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবচৈতন্যের সৌন্দর্যকে মহাকবি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। মানবচৈতন্যের এ সৌন্দর্যের প্রকাশ বীর্যবত্তার পথে, শ্রেয়কে লাভের জন্য দুঃখবরণের পথে। দুঃখের মূল্যেই তাকে স্পর্শ করা যায়।

বিশ্বসংসারের অনন্ত সৌন্দর্য, মানবচৈতন্যের চিরন্তন ভাস্বর মহিমা এবং সমস্ত জড় ও চৈতন্যের অন্তরালে সর্বব্যাপী এক অস্তিত্বের প্রতি নিঃশেষ আস্থা—এই তিনে মিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুঙ্গশীর্ষ রচনা করেছে। সেখানে, সেই সৃষ্টি-অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি বা মানব-মহিমা বা সেই সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও কবির ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কিছু নাই, কেউ নাই।

কিন্তু আরও এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। যে রবীন্দ্রনাথ আরও পাঁচজন মানুষের মত সমাজবদ্ধ হয়ে, মানুষের মধ্যে থেকে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করেছেন। যিনি বিশুদ্ধ মানুষ ও বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের তপস্বী ছাড়াও যাঁর আরও এক লৌকিক পরিচয় আছে। যে লৌকিক পরিচয়ে তিনি আপনার সমসাময়িক পরিপার্শ্বের সঙ্গে নানান বন্ধনে আবদ্ধ এবং

নানান সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। যিনি প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে ডুবেছেন ও ভেসেছেন, যিনি সমসাময়িক ঘটনার আবর্তে পড়েছেন ও অংশ নিয়েছেন, যিনি সমসাময়িক কালে আশপাশের মানুষের সঙ্গে নানান সম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন! এ মানুষ অনেক পরিমাণে লৌকিক মানুষ।

এখানে সুমহৎ কবি-কল্পনা থেকে ভিন্ন স্তরে তিনি বিচরণ করেন। এখানে লৌকিক বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ক্রিয়াশীল। এখানে তাঁর সামনে লৌকিক সংসার আপনার বিশেষ বিশেষ দাবী বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে উপস্থিত।

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

> কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে—···ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অমিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রম' ব্যবহার, সেখানে টুল-বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। [ছিন্নপত্রাবলী ঃ পত্রসংখ্যা ১২]

এর সঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে' নামক অতিখ্যাত কবিতার আর একটি একান্ত পরিচিত অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

> ······ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
> তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
> নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
> সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
> নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
> দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
> মরে সে নীরবে।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এ বোধ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে যে, এ আর এক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতি, মানব-মাহাত্ম্যের ও সর্বব্যাপী এক অজ্ঞেয় অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির মিশ্রণে গঠিত মরমী কবির দৃষ্টি এখানে অনুপস্থিত। এ জীবন, এ দৃষ্টি, এ অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগ্রাহ্য; এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের কম-বেশী পরিচয়

সকলেরই আছে। আমাদের সমসাময়িক কালের স্বর্গত কবি-বন্ধু সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বিখ্যাত কবিতাটি আছে তার থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করি।

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধবধব করে—
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
... ...
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সবজির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলু কুলু রবে ছুটেছে গ্রামের মেয়ে।

[রবীন্দ্রনাথ : রাজহংস : সজনীকান্ত দাস]

মরমী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর গৌরব হিমালয়ের হিমশৃঙ্গের তুল্য, তাঁকে আমার বিষয় থেকে সরিয়ে রাখলাম। যিনি আমার জীবন-ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে গ্রামের নদীটির মত বহমান তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। তাও আমি তাঁর মাত্র একটি অংশ বেছে নিয়েছি। যে রবীন্দ্রনাথ পল্লী বাংলার মানুষ ছিলেন, পল্লী বাংলার মানুষের কথা, সমাজের কথা, প্রকৃতির কথা ভেবেছেন, বর্তমান বক্তৃতামালায় তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী এই বিষয়েই আমি তিনটি বক্তৃতা করব। বক্তৃতার বিষয়গুলি হল—রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাসী, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি।

আমার আজকের বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। শেষ করার পূর্বে এ কথা বলি যে আমি যে দুই রবীন্দ্রনাথের দুই মূর্তি এখানে আলোচনার মধ্যে উপস্থাপন করেছি তাঁরা একই ব্যক্তি, আদৌ ভিন্ন নহেন। একই মূর্তির দুই প্রকাশ মাত্র।

আপনি, যিনি শেষরাত্রে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে এসে শান্তিনিকেতনের মৃত্তিকায় আপনার গৃহাঙ্গনের পাশে বড় ছায়াচ্ছন্ন গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে গাছটির উর্ধ্বলোকে প্রসারিত শাখা-বাহুর অবকাশে শান্ত ও নম্র চিত্তে পূর্বাচলশায়ী শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃসীম নির্জনতা ও অপরিমেয় নিস্তব্ধতার পটভূমিতে, তিনিই তো আবার দুঘণ্টা পরে কলকাতা-প্রত্যাগত বন্ধুকে কলকণ্ঠে প্রভাতী চায়ের টেবিলে অভ্যর্থনা জানান! তাতে তো আপনার শেষরাত্রির সেই নির্জন ও গোপন নম্র সাক্ষাৎকার মিথ্যা হয়ে যায় না.!

এখানকার মাটিতে এসে দাঁড়ালে, এখানকার আকাশে-বাতাসে-মৃত্তিকায় সেই আশ্চর্য সুমহৎ সাধনাকেও যেমন আপনার অজ্ঞাতেই আমি স্পর্শ করি তেমনি এই অঞ্চলের মানুষ বলে, এ কথা কখনও ভুলতে পারি না যে মহাকবি আমাদেরই মৃত্তিকায় এপাশে জয়দেব ওপাশে চণ্ডীদাসকে রেখে তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। এবং তাঁর বৃহৎ সাধনার মধ্যে পল্লীর মানুষের সুখদুঃখও একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। সেই কারণেই আমার এই বিষয় নির্বাচন। এই মাটির মানুষ হয়ে আমি সে কথা ভুলি কি করে?

দ্বিতীয় বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ

এক

আমি আমার মূল বক্তব্যে এসে পে'ীছেছি।

আমার আলোচনায় একান্ত পরিচিত ভূমিতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ স্বস্তিবোধ করছি। কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত আমাদের এই বৃহৎ প্রাচীন দেশের মৃত্তিকার ও তার জনারণ্যের মানসভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন চিন্তা-মননের আকাশলোক থেকে অপেক্ষাকৃত বাস্তবভূমিতে ধরিত্রীবক্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। নাগরিক সভ্যতার বাইরে প্রসারিত দেশের অগণিত পল্লীর মধ্যে যে জীবন, মহাকবি তাকে কেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য, আমার বিচার তাঁর এই সম্পর্কিত সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচার নয়। বাংলার পল্লী-জীবন সম্পর্কে, সেখানকার মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা ভেবেছিলেন, তাকে যেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচনার বিষয়।

আমার পূর্বদিনের আলোচনার শেষাংশে আমি উল্লেখ করেছিলাম—মহাকবির যেকোনো রচনা বা অভিজ্ঞতা, তা যত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বিধৃত হোক বা যত সামান্যই হোক, বা কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট ঘটনা-কেন্দ্রিক হলেও, তা প্রায় সব সময়েই মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে এক স্থির ধ্রুববোধের স্পর্শ বহন করে, এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অচ্ছিন্ন তপস্যায় অর্জিত সেই বৃহৎ ও স্থির উপলব্ধির আলোকের সম্মুখে স্থাপন করে দেখতে হবে।

নিজের মানসিক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

…আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

> মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
> চেয়ে তোর স্নিগ্ধ-শ্যাম মাতৃমুখ-পানে
> ভালবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।

আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

[আত্মপরিচয়]

'গোরা'র শেষ অংশে গোরা উচ্চারণ করেছে :

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।…আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমার বার বার মনে হয়েছে, গোরার উচ্চারিত এই কথাগুলি শুধুমাত্র 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরার কথাই নয়, এগুলি কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথেরও অন্তরের

কথা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে, বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা ও অগণিত মানুষ সমন্বিত যে ভারতবর্ষ, তার সম্পর্কে তিনি এই মনোভাবই পোষণ করতেন। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা তাঁর কাছেও মাতৃক্রোড়, এবং ভারতবর্ষের বিশাল জনতার প্রতিটি মানুষ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য।

এই আলোচনায় এইটি আমার কাছে মূল সূত্রের মত। তবে এখানে কয়েকটি কথা সবিনয়ে উল্লেখ করি। আমি মহাকবির রচনা থেকে এই অংশটুকু আবিষ্কার করে নিয়ে তাকেই তত্ত্বের আকারে উপস্থাপিত করে মহাকবির এই সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও ভাবনাকে এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি নি। এই বক্তৃতার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-রচনাবলী নাড়াচাড়া করতে করতে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচনার সামগ্রী হিসাবে সংগৃহীত হল, তারই মধ্য থেকে এই ধরনের একটি মনোভাব আমার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবং তাঁর রচনা থেকে পূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যটুকু পেয়ে মনে হল যেন এই মনোভাবই এখানে বাণী হয়ে ধরা দিয়েছে।

দুই

একান্ত পরিণত বয়সে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ঐকতান'-এর মধ্যে উচ্চারণ করেছিলেন :

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে ;
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

উদ্ধৃত চরণগুলির মধ্যে মহাকবির উক্তিতে যে আকুতি, নম্রতা ও প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ আছে তা যেমন আন্তরিক তেমনি তীব্র ও অকপট। পরিণত বয়সের এই আক্ষেপ, আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম জীবনেও সমান তীব্র ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের অতি বৃহৎ জীবনযাত্রা থেকে ভবিতব্যবশে লৌকিকভাবে তিনি দূরেই ছিলেন। কিন্তু মনে দূরে ছিলেন না। এবং তা ছিলেন না বলেই কাছে আসার, মাতৃক্রোড়ে আপামর সাধারণ স্বদেশবাসী ভাইদের পাশে বসার ইচ্ছা তীব্রতর মূর্তিতে আজীবন তাঁর হৃদয়ে লালিত ছিল। এর ফল অশুভ হয় নি। তাঁর অন্তরের এই সুতীব্র পিপাসা তাই সদাজাগ্রত থাকত, এবং মানসিক ভাবে তাঁকে দীনতম স্বদেশবাসীর সঙ্গে যুক্ত করে রাখত। এ কথা সত্য যে, তাদের জানার তীব্র পিপাসা তাঁর জীবনে কোন দিন ম্লান হয় নি। আবার এও সমান সত্য যে দূরে থেকে

দেখার জন্য দেখায় তীব্র স্পষ্টতা আসে নি। আবার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও সহজ হলে এক ধরনের অবহেলা-জনিত অস্বচ্ছতার জন্ম হয়, যার ফলে একান্ত কাছের মানুষের বিশিষ্টতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন আসে না। দূর থেকে তিনি যতটুকু দেখেছেন, তার সঙ্গে সেই দেখার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তাঁর মন ও ধ্যান সদা-সতর্ক ও সদা-সচেতন ছিল। এবং তাঁর কবি-মন তাকে পরিপূর্ণ মূর্তিতে লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আপনার কল্পনার মধ্যে প্রায় অহরহই তাকে ধ্যান করেছে। এবং তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি তাকে এক বিশিষ্ট পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাই তাঁর রচিত মানবমূর্তিতে অস্পষ্টতার ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু এই ত্রুটিই আবার তাতে অবশ্যম্ভাবী এক পরিপূর্ণতাও যুক্ত করেছে। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক ভিন্নতর হলে হয়তো মানবমূর্তির স্পষ্টতর রূপ পেতাম, কিন্তু তাতে চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে হারাবার আশঙ্কা ছিল।

তাঁর কবিচিত্ত ও শিল্পীসত্তা এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই অন্তরে অন্তরে আপনার দুর্লঙ্ঘ্য খামতি পূরণের জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকত। সেই কারণেই দূরস্থ বিপুল দেশবাসীর জীবনকে অতি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং সে দেখায় ক্লান্তি ছিল না। তার প্রমাণ তাঁর বিপুল রচনার মধ্যে অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। দূরে বাস করেও, দূরস্থ মঙ্গলাভিলাষী, উৎকণ্ঠ আত্মীয়ের মত তিনি তাদের সব দোষ ও সব গুণের সংবাদ জানতেন, গুণগুলির সম্পর্কে তাঁর তৃপ্তির ও গর্বের শেষ ছিল না, আবার দোষগুলিও পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে লক্ষ্য করে মমতাময় শুভ বচনের দ্বারা, কখনও কখনও ক্ষুব্ধ তীব্রতার সঙ্গে তিরস্কার করে বিদূরিত করতে চেয়েছেন। দূরের, একান্ত দূরের স্বদেশবাসীকে যে তিনি তাদের কাছের, একান্ত ঘনিষ্ঠ, অস্বচ্ছদৃষ্টি আত্মীয়ের চেয়ে বেশী চিনতেন নীচের উদ্ধৃতিটি থেকে তা অনায়াসে বুঝা যাবে ঃ

> বিনয় কহিল,······আমরা শেয়ালদা ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। সোদপুর স্টেশনে যখন গাড়ী থামল দেখি, একটি সাহেবী-কাপড়-পরা বাঙালি নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটি শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনোমতে ঢেকে খোলা স্টেশনের এক ধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল—তার স্বামী জিনিসপত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁকডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সমস্ত বাংলা দেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই! যখন দেখলুম, স্বামীটা নির্লজ্জভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজছে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করছে না এবং স্টেশনশুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি—তাদের লক্ষ্মী বলে, দেবী বলে জানি এ সমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি—বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্তব্যবোধের ঔদার্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবল ভাবে না দেখি—ঘরের মধ্যে দুর্বলতা সংকীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই—তা হলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

অতি পরিচিত, অতি তুচ্ছ, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি স্পষ্ট ও সহজ একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পী এখানে প্রচলিত দেশাচার ও অভ্যাসের মূর্তিটি তুলে ধরে তার মধ্যে যে অন্ধ অবহেলা, অসৌজন্য ও হৃদয়হীনতার প্রকাশ আছে তাকেই ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশে নারীর সম্মান সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উৎকৃষ্ট বাক্য আছে; একদিন হয়তো তার সত্যমূর্তিও সমাজের মধ্যে ছিল সামাজিক আচার, ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে, কিন্তু আজ তার বিপরীত মূর্তিই প্রকাশিত। এখানে লক্ষণীয় যে শিল্পী এখানে বিনয়ের মুখ দিয়ে কোন তিরস্কার বা ধিক্কার উচ্চারণ করেন নি, কেবল হৃদয়ের গভীর ক্ষোভ ও বেদনাই প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশের মানুষের মূর্তি আঁকতে গিয়ে সেই মূর্তিটিকে হৃদয়ের যে পটভূমিতে স্থাপন করে তাকে রচনা করতেন সেই পটভূমি যে যে ভাবে ও রসে রঞ্জিত ও সরস ছিল তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বদেশ সেখানে এই সাবিত্রী নারায়ণী ধরিত্রীর অংশ, তিনি জননীস্বরূপা, স্বদেশের মৃত্তিকা মাতৃক্রোড়, স্বদেশবাসী আপামর সাধারণ মানুষ তাদের সব দোষ-গুণ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য। তাই মানুষের মূর্তি রচনার সময় স্বাভাবিকভাবে চিত্ত ও বুদ্ধি সহযোগে গঠিত মূর্তি নির্মাণশালার ভাবে ও রসে মাখামাখি হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একজন মহৎ শিল্পীর উল্লেখ করি। টলস্টয়। সমগ্র জীবন ধরে নিজের অন্তর্জীবনে জীবনকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য অন্তর্জীবনে তাঁর সংগ্রামের আর শেষ ছিল না। নিজের চিত্তভূমিতে সেই ক্ষমাহীন সংগ্রামের পটভূমিকায় যে যে মানবমূর্তি তিনি গড়েছিলেন তারাও সেই সংগ্রামের সুমহৎ লাঞ্ছন বহন করছে। এইখানে আমাদের মহাকবির সঙ্গে তাঁর শিল্পচারিত্রের কিছু সাযুজ্য আছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে এখানে শিল্প-সাধনাই একমাত্র সাধ্য বিষয় নয়। শিল্প-সাধনার সঙ্গে জীবন-সাধনা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। সামগ্রিক জীবন-লাভের প্রাত্যহিক তপস্যা এই ভাব ও রসের পটভূমিটি গঠন করে দিয়েছিল। এখানে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে কল্যাণও যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত যুগল সন্তানের মত হাত-ধরাধরি করে উপস্থিত।

সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে থাকে শুধুমাত্র আনন্দ। সেখানে মানব-জীবন-রহস্যের তীব্র আস্বাদ থেকে যে আনন্দের জন্ম হয় তা বৃহৎ অর্থে মানবিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। সেই যথেষ্ট। কখনও কখনও আকস্মিকভাবে সেই আনন্দ ভোগের সঙ্গে এই মানবিক কল্যাণ-স্পর্শেরও আভাস যুক্ত হয়, যা পাঠকের চিত্তে আনন্দ-সরসতার সঙ্গে একটি সকরুণ বিনম্রতার ও তৃপ্তির আস্বাদ যুক্ত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুই প্রায় অনিবার্য যোগে যুক্ত। এর কারণ তাঁর সদাসতর্ক প্রাত্যহিক জীবন-সাধনা তাঁর শিল্প-সাধনায় এক গভীরতর ভিন্ন অর্থ যুক্ত করে তাঁর শিল্পকে এক বৃহত্তর ও মহত্তর অর্থে গৌরবান্বিত করেছে।

তিন

তাঁর জীবনে ন' দশটি বৎসর পল্লীর পরিবেশ ও পল্লীর মানুষ যেন একান্ত নিবিড় ভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। সময়টা মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল। এই কালের রচনার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম দিকের অধিকাংশ গল্প, যার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী।

তাঁর জীবনের এই নয় দশ বৎসর কাল প্রধানত কেটেছিল পাললমৃত্তিকাগঠিত, নদীমাতৃক বাংলা দেশের গভীর অন্তঃপুরে, একেবারে নদীর বুকের উপর। তাঁর এ সময়কার সৃষ্টির

প্রকৃতি দেখে মনে হয় বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড়, অন্তরঙ্গ, দীর্ঘস্থায়ী পরিচয় ঘটেছিল এই সময়। এ সময়ের রচনা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব করলে অবশ্যই জানা যাবে যে এই বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হলেও অবশ্যই ছেদহীন নয়। এই কালের মধ্যে তিনি অবশ্যই বহুবার রাজধানীতে ও নগরজীবনে ফিরে এসেছেন, আবার ফিরে গিয়েছেন পদ্মার উপরে। তবু বলব, এই কালে তিনি সেখান থেকে সরে এলেও সদাসর্বদা বাংলাদেশের অন্তঃপুরের নিবিড় আস্বাদে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাই মনে হয়, যেন তিনি এই কালে দেশজননীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মত ক্রমাগত নিজের সমস্ত সত্তা পরিপূর্ণ করে সেই জননীর প্রাণরস থেকে প্রাণরস পান করেই নিজের শিল্প-জীবন ও শিল্প-চেতনাকে পুষ্ট ও পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

এই সময়ে চার পাঁচ মাস মাত্র ব্যবধানে লিখিত দুখানি চিঠি তাঁর এ কালের প্রত্যক্ষ মনোভাব ও অভিজ্ঞতা হিসাবে দাখিল করছি :

এক ॥

> এ দেশে (ইংল্যান্ড) এসে সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মত আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।
>
> [ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৭]

দুই ॥

> ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত ? আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশী ভালবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।……
>
> [ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১৩]

যে শিল্পী গল্পগুচ্ছের এই পল্লীপ্রাণ গল্পগুলি রচনা করেছেন তাঁর মনোভাব এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত। মানস-মৃত্তিকা আপনার সমস্ত উর্বরতা ও সরসতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি ক্ষুদ্র বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গল্পের মঞ্জরী হয়ে এই মৃত্তিকা থেকে উদ্গত হয়েছে। জমিদারী কাছারীতে দেনা-পাওনার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমলাদের সঙ্গে নিকট-দূরত্ব থেকে অথবা বোটের উপর থেকে রচনা, চিন্তা বা শুধু দেখার মধ্য দিয়ে সুদূর বৃহৎ চলমান জীবনের ভগ্নাংশ টুকরো টুকরো চোখে, কানে এবং সেই সঙ্গে অব্যর্থভাবে তৃষিত মনে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই থেকে পরম যত্নে কল্পনার সযত্ন লালনে তাকে শিল্পী পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

এ কাজ যখন তাঁর মনোলোকে ও তার ফলশ্রুতি হিসাবে গল্পের আকারে মূর্তিলাভ করছিল তখন বাংলাদেশের সাহিত্যের আসর সুদূর রাজপুতানার রাজকীয় গল্পে জমজমাট। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে, তখন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল যৎসামান্য বর্ধিত কলেবরে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ মাত্র। কিন্তু 'রাজসিংহে'র যে আধুনিক মূর্তি তা তার হল ১৮৯৩ অর্থাৎ বাংলা ১২৯৯ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হবার সময়। প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে ৪৩৪ পৃষ্ঠা কলেবরে রসের ও কল্পনার পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে সে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে জনচিত্ত জয় করে নিলে। রস ও রুচির এই সংস্কারের কালে বাংলাদেশের সামান্য মানুষদের প্রাত্যহিক পরিচয়ের স্পর্শে লুপ্ত-রহস্য আকর্ষণহীন, নিরাভরণ, দরিদ্র জীবনের উপকরণ নিয়ে গল্প রচনা করা কোন ক্রমেই সহজ ছিল না।

এ কথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রচার করা নয়, উদ্দেশ্য হল তাঁর এই অভিজ্ঞতার নিবিড়তা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কিছু বলা। যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্বদেশকে মাতৃক্রোড় ও স্বদেশবাসীকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে তার একান্ত সন্নিকটে ও সান্নিধ্যে আসবার তৃষ্ণায় উন্মুখ, সেই হৃদয় ও মস্তিষ্ক যখন সেই পরম বাঞ্ছিত নিবিড় সান্নিধ্যলাভ করবার বৃহৎ সৌভাগ্য লাভ করল, তখন সেই ভাব ও কল্পনা অনিবার্য বন্যাবেগের মত সাহিত্যের অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানে কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশই ছিল না; সে ভাব ও কল্পনা পরিপূর্ণ রসমূর্তি গ্রহণ করে পাঠককে পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি না—একথাও বোধ হয় একবারও গল্পকারের চিত্তকে আন্দোলিত করে নি। এ তো শুধু শিল্পের চর্চা ও প্রকাশ নয়, এ এক মানবজন্মের সামগ্রিক আকূতি ও তৃষ্ণা-পরিপূর্তির পরিপূর্ণ ও শিল্পময় প্রকাশ।

চার

এই কারণেই তিনি বহু খ্যাতিমান, সার্থক শিল্পীর মত মানুষকে শুধু মাত্র একক মানুষ হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, দেখতে পারেন নি। স্বদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ স্বদেশের মৃত্তিকায়, স্বদেশের যুগ যুগ বাহিত আচার সংস্কার রুচি দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে যে মূর্তি নিয়েছে, তারাই তাদের সবটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর গল্পে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই তাঁর গল্পে আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন মানুষ তাদের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিছক নির্ভেজাল জৈব প্রবৃত্তির পথে প্রকাশিত মূর্তি নিয়ে আসে নি; তারা ফুটে উঠেছে সমাজের ও পরিবারের পটভূমিকায়, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া করে মানিয়ে চলতে হয়। তাই কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমের বিবিধ রূপান্তরে, ক্রোধ লোভ

এরাও অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্তিতে প্রকাশিত। তাই সেখানে প্রবৃত্তির তাড়না বার বার শাসিত বা শান্ত মূর্তি নিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

নিজের অতি প্রাচীন স্বদেশের প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি ও তার যুগযুগবাহিত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রীতি ও অকপট আসক্তি ছিল বলেই তাঁর গল্পে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে বার বার নির্মল সত্যবোধের জয়ঘোষণা দেখেছি। সে সত্যবোধ যেমন ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ, তেমনি বৃহৎ মানব-সংস্কৃতিরও সার্বজনীন শ্রেয়বোধ। অবশ্য সংস্কারের ও মার্জনার অভাবে আবার মলিন হয়ে এসেছে, আধেয়ের উপরও মলিনতার আস্তরণ পড়েছে। কিন্তু জীবনের চরম মুহূর্তে যখন শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের সংকট-মুহূর্ত এসে আবির্ভূত হয়েছে তখন তারা প্রেয়ের ও সকল লৌকিক লাভ ও লোভের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজেদের জীবনের ধাতুগত অভীপ্সার তাড়নায় নির্ভুলভাবে শ্রেয়ের ও সত্যের পাদস্পর্শ করে মহতী বিনষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি পাঁচটি গল্পের উল্লেখ করব। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দান প্রতিদান', 'দিদি' ও 'সমস্যা-পূরণ'। এ গল্পগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অতি পুরাতন ও যথেষ্ট নিবিড়। গল্পাংশের সঙ্গে আশা করি সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। আমি গল্পাংশ বিবৃত না করেই প্রতিটি গল্প থেকেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

এক ॥

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীরে বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি। এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

[গল্পগুচ্ছ ঃ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা]

দুই ॥

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে ?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

... ...

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল ; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য

লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

[গল্পগুচ্ছ : খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন]

তিন ॥

শশীভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিতে লাগিল, "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল—তুমি ধনী, দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

[গল্পগুচ্ছ : দান প্রতিদান]

চার ॥

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চির-পরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

[গল্পগুচ্ছ : দিদি]

পাঁচ ॥

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু!"

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত

অধ্যবসায় ! আজ এত কাণ্ড করিয়া যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।”

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, “লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমারই ভাই হয়, আমার পুত্র।”

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “যবনীর গর্ভে ?”

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “হাঁ বাপু।”

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, “সে সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলুন।”

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, “না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিত কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

[গল্পগুচ্ছ ঃ সমস্যাপূরণ]

যে সংসারে আদালতে দুখানা উইল দাখিল হলে একপক্ষে বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও অন্যপক্ষে নিজ পুত্রের দাবীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিজের একমাত্র পুত্রের মিথ্যা দাবীকে অস্বীকার করে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পক্ষের উইলকে সত্য বলে স্বীকার করতে বাধে না কাশীবাসী বৃদ্ধ রামকানাইয়ের ; যে সংসারে প্রভুর পুত্র নিজের ত্রুটিতে নদীর জলে হারিয়ে গেলে নিজের একমাত্র পুত্রকে সুশিক্ষিত করে প্রভুর হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হওয়াকে অশিক্ষিত মূর্খ রাইচরণ বিধিনির্দিষ্ট দায়মুক্তি বলে মনে করে ; যে সংসারে গোপনে ভাইয়ের সম্পত্তি আইনের কুটিল পথে স্বনামে গ্রহণ করে ভাইয়ের জীবনের শেষ মুহূর্তে রাধামুকুন্দের পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিতে বাধে না ; যে সংসারে মৃত্যু ধ্রুব জেনেও স্বামীর বিরোধিতা করে পুত্রতুল্য মাতৃহীন কনিষ্ঠ সহোদরের দাবীকে শশীকলা সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে ; যে সংসারে সম্মানিত, বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার কৃষ্ণগোপাল নিজের সমস্ত সম্মান; সম্ভ্রম ও চরিত্রখ্যাতির বিনিময়ে যবনীর গর্ভজাত সন্তান অছিমদ্দিনকে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করতে কাশী থেকে ফিরে আসেন, সে সংসার বড় ভীষণ নির্মলতা ও কঠোর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ভিত্তি মানুষের শ্রেয়বোধের উপর। বাস্তব লৌকিক জীবনে সে সংসার মূর্খের সংসার, বাস্তববাদীর চক্ষে সে এক অবাস্তব সংসার। কিন্তু এই বৃহৎ মানব-সভ্যতার ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে তারই ধারাবাহিক চর্চা আছে। সে চর্চা সচরাচর অন্তঃসলিলা হয়ে বহমান থাকে। তাই বলে সে অবাস্তব নয় ; লৌকিক ও বাস্তব জীবনের মতই সে সমান সত্য। মহাকবি এই গল্পগুলির মধ্যে ভারতের জীবনধারার সেই ভীষণ নির্মল ও কঠোর সুন্দর মূর্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করে আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন তাই নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতর কৃতিত্ব অন্যত্র। তিনি এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অতি সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করেছেন যার অর্থ হল এই শ্রেয়বোধ একান্ত সহজভাবে, এক স্বাভাবিক অবস্থিতির মত তাঁর স্বদেশের জীবনে অভ্রান্ত ভাবে অবস্থান করছে। অতি সামান্য ও সাধারণের মধ্যে সেই ধ্রুব ও শ্রেয়ের অভ্রান্ত প্রকাশ। তাঁর স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর জীবনে যে ধারাবাহিক সাধনা নানান প্রতিকুলতা সত্ত্বেও শেষ হয়ে যায় নি, কেবলমাত্র তার উপরে মলিনতার আস্তরণ পড়েছে মাত্র, তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রেমের অন্ত ছিল না। তাঁর সেই পরিমাপহীন শ্রদ্ধা ও প্রেম এগুলিকে আবিষ্কার করে শ্রদ্ধা ও প্রেমের অর্ঘের মতই তাঁর স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন

করেছে। তাঁর স্বদেশবাসী নিজের অপরিচিত বা বিস্মৃত মূর্তিকেই এই রচনাগুলির দর্পণের মধ্যে আবার দেখতে পেয়েছেন।

পাঁচ

একথা অবশ্যই নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তাঁর স্বদেশের একটি ভাবমূর্তিকে তিনি অন্তরে অন্তরে সর্বদা দেববিগ্রহের মত বহন করতেন। কিন্তু সে বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি হয়ে তাঁর জীবন-ধ্যানে কোন বিচ্ছিন্ন কিছু হয়ে বিরাজ করেনি। তিনি অহরহ দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় দ্বিবিধ অস্তিত্বের মধ্যেই খণ্ডিত বিশেষ আধারে সেই সম্পূর্ণকে দেখেছেন। তাঁর স্বদেশবাসী জনগণ তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই ভাবমূর্তির অংশ ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অতি বৃহৎ সাধনার মধ্য দিয়ে স্বদেশের সমস্ত মালিন্য ও গ্লানিকে একান্ত মমতা ও বিবেচনার সঙ্গে দূর করতে চেয়েছেন তা তাঁর বহুবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্পেষিত, দুর্বল, শিক্ষাহীন, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর দারিদ্র্য, চারিত্রিক দুর্বলতা, শিক্ষাহীনতা কুসংস্কার তিনি যেমন দূর করতে চেয়েছেন তেমনি এই সব মিলিয়ে তাদের যে সমগ্র জীবন তার প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। তাদের সাধুতা, সততা ও নম্রতা শিক্ষাভিমানী বিত্তবানরা আঘাত করলে বা ব্যঙ্গ করলে তিনি সে আঘাত ও ব্যঙ্গকে কখনও ক্ষমা করেন নি। মা যেমন নিজের অজস্র ত্রুটিযুক্ত সন্তানকে সর্বদা দুই হাত দিয়ে আগলে ফেরেন তিনি তেমনি ভাবেই আপনার বহু-দোষে-দুষ্ট স্বদেশবাসীকে মমতার বাহুপ্রসারে আগলে রেখেছিলেন। নীচের সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ দেবে ঃ

এক ॥

চতুর ব্যারিষ্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নীকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মাসতুতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল—বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল। আমার স্বাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।

দিদি বলিলেন, "বটে ? লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভাল বলে জানতুম।"

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে ; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই ; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত সহর খুঁজিলে মিলে না।

[গল্পগুচ্ছ ঃ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা]

দুই ॥

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ না থাকার এই ফল।

... ...

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে ভালো

করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

[গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]

তিন ॥

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার এই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারী ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

[গল্পগুচ্ছ : অনধিকার প্রবেশ]

দেশের কেন্দ্রস্থলের কলরব ও উচ্ছ্বাস থেকে অনেক দূরে দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় ও নির্জনতায় নির্বাসিত বাংলার পল্লীজীবনে সত্যের ও জীবনমহিমার সহজ মাহাত্ম্য সহজে দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়; রবীন্দ্রনাথ তাদের থেকে লৌকিক দূরত্বে অবস্থিত থেকেও অভ্রান্তভাবে তাকে দেখতে পেয়েছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন। যে প্রতিভাবলে তিনি একে দেখতে পেয়েছেন, তার মূল উপাদান হল এই দূরান্তবর্তী অকিঞ্চন স্বদেশবাসীর সম্পর্কে প্রেম ও শ্রদ্ধা। এই কারণেই শিক্ষাভিমানী, বুদ্ধির অহংকারে অহংকৃত যে সব মানুষ স্বদেশের এই সনাতন জীবনধারার সঙ্গে বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই জীবনধারার মাহাত্ম্যকে, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভাবে, অনুভব ও উপলব্ধি করবার শক্তি হারিয়েছেন তাঁদের অতি তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা তিরস্কৃত করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। এই সব শিক্ষাভিমানী, অর্থবান 'আধুনিক' মানুষের চেয়ে কাশীবাসী সাধারণ বৃদ্ধ, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার, অতি সাধারণ পল্লীবধূ, পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী গৃহস্থ, অতি দরিদ্র গৃহভৃত্য, কঠোর চরিত্রের আচারপরায়না বিধবা প্রভৃতির মত একান্ত সাধারণ অথচ জীবনের ধ্রুব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলি তাঁর কাছে অনেক অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে; অপর পক্ষে ওই সব শিক্ষাভিমানী, স্বদেশের সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন ওই 'আধুনিক' মানুষগুলিকে তিনি অনাত্মীয় জ্ঞান করেছেন ওই সহানুভূতিহীন ও শ্রদ্ধাহীনতার জন্যই।

ছয়

স্বদেশের যে সব মানুষ গ্রামের মধ্যে বাস করেন তাঁদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কী পরিমাণ উৎপাত ও উপদ্রব হয়, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন একাধিক কঠিন হস্তের দ্বারা কী পরিমাণ লাঞ্ছিত, প্রাত্যহিক প্রাণধারণ ও দিনযাপনের গ্লানি কী পরিমাণ পুঞ্জীভূত তা তাঁর অগোচর ছিল না। তাঁদের এই যন্ত্রণা অসহায়-অক্ষমের যন্ত্রণা বলে তাঁর বুকে আরও বেশী করে বাজত। উৎপীড়নের বিবিধ হস্তের মধ্যে শাসক রাজার শ্বেত হস্ত ছিল, তাঁদেরই আশ্রয়-পুষ্ট জমিদার, জমিদারের আমলা ও মহাজনের হাতও ছিল। অত্যাচার হত, সে অত্যাচারের প্রতিকার ছিল না। তাঁর অন্তর বার বার এই বেদনায় মথিত হয়েছে, বার বার এই অত্যাচারকে ধিক্কার দিয়েছেন। সে অন্যায় প্রতিকারের অবুঝ কল্পনা মধ্যে মধ্যে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি' পর্যন্ত প্রসারিত। দীন-দরিদ্র স্বদেশবাসীর সম্পর্কেও তাঁর এতখানি সম্ভ্রমবোধ ছিল বলেই তাঁর সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি ও ভয়হীন হৃদয় এই অবুঝ কল্পনাকে হাস্যকর জ্ঞান করে নাই। এ সম্পর্কে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

এক ॥

গোরা যখন দেখিল ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পারিল না, সে কহিল, "খবরদার! মারিস নে!" পাহারাওয়ালার দল তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল।

[গোরা : ২৮ পরিচ্ছেদ]

দুই ॥

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

[গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র]

তিন ॥

পুলিশ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমাপরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্ করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিশের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিশের বড় কর্তা তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

[গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র]

বলা বাহুল্য এই তীব্র ক্ষোভের আকস্মিক ও অবুঝ প্রকাশের ফলাফল গোরা বা শশীভূষণ কারও পক্ষেই আরামের হয় নাই। তাদের দুজনকেই কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। এই আঘাতের ফলাফল কি হবে তা তারা উভয়েই জানত। কিন্তু অসহায় অক্ষম মানুষকে রক্ষা করবার কর্তব্যবোধ তাদের স্থির থাকতে দেয় নি। তাদের

আত্মমর্যাদাবোধই তাদের এ কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। যে তীব্র জ্বালা ও ক্ষোভ তাদের প্রজ্বলিত করেছিল সে ক্ষোভ ও জ্বালা তো তাদের স্রষ্টারই হৃদয়ের! এই বোধ থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার যবনীর গর্ভজাত অছিমদ্দিনকে আপনার পুত্র বলে স্বীকার না করে পারেন নি। এই বোধ থেকেই 'বিচারক' গল্পের স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন দত্ত এক পতিতা রমণীকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছিলেন।

সাত

আমাদের তরুণ বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন সদ্য প্রবেশ করেছি তখন মধ্যে মাঝে শুনেছি মহাকবি দেশের দীনদরিদ্র মানুষদের দেখেন নি এবং তাদের সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে বর্তমান সুপ্রচুর গবেষণার ফলে এ সত্য এখন প্রমাণিত যে এই ধরনের অভিযোগ অমূলক, আমি সেই সম্পর্কেই সামান্য কয়েকটি কথা বলব।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ মানুষদের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে ভূমিনির্ভর। সেই ভূমি-নির্ভরতা আবার সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দড়ি আর চাকায় বাঁধা। ঊনবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণ, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ, এই দেড়শো বছরের বাংলার পল্লী-মানুষের জীবন এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্রে রেখেই বিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা দেশের এই সমসাময়িক কালের সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে এই সৃষ্টির একটা বৃহৎ অংশ বাংলার পল্লীকে অবলম্বন করে। অবশ্য ধীরে ধীরে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার পরিমাণ কমে আসছে। কারণ জাতীয় জীবনে এক দিকে শিল্পোন্নয়নের ফলে পল্লীজীবনে দ্রুত নাগরিকতার স্পর্শ লাগছে, অন্য দিকে পাঠকসমাজের, এমনকি পল্লীর পাঠকসমাজেরও রুচি নগরজীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। আজ যে সমস্ত সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সামনে প্রতিদিন নানা মূর্তিতে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাও রূপে মূলত নাগরিক। কিন্তু পল্লীজীবনের সমস্যাও যে কম নয় তা গত তিন চার বৎসরের ইতিহাস ভাল করেই প্রমাণ করেছে আবার। পল্লীর জীবন যে আসলে ভূমিনির্ভর সেই কথাটাই আবার ব্যাপকভাবে ও তীব্রভাবে প্রমাণিত হয়েছে গত কয়েক বৎসরের আন্দোলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ যদিও পল্লীজীবনের কথা নিয়ে রচিত ও পল্লীজীবনের দুঃখকষ্টের যথেষ্ট পরিচয় তাতে আছে, এই ভূমিনির্ভর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত জীবনের প্রকাশ রবীন্দ্র-পরবর্তী-সাহিত্যে কতটুকু ঘটেছে? উত্তরে বলতে হবে, সামান্যই। শরৎচন্দ্র এই জীবনকে কোথাও কোথাও স্পর্শ করেছেন, তারপর আর এক আধ জন মাত্র তাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার পর এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ কাল কেটে গিয়েছে। তবু এই ভূমি-কেন্দ্রিক রচনার পরিমাণ যৎসামান্যের বেশী নয়। বাংলা দেশের ভূমি-ব্যবস্থাকে না জানলে গ্রামের মানুষের সে জীবনকে জানা সম্ভব নয়। ভূমি-নির্ভর, এমন কি ভূমি-সর্বস্বও বলতে বাধা নেই, সেই ভূমি-সর্বস্ব জীবনের পরিচয় আজ থেকে আশী বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জানতেন। তাই পল্লীজীবনের আসল সমস্যা ও দুঃখকে তিনি চিনতেন ও জানতেন। ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এই অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেছিল।

মাত্র একটি গল্পে তিনি তাঁর এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অকল্পনীয় দারিদ্র্যে, অপরিসীম নিঃস্বতায়, অন্তহীন আশাহীনতায় যে জীবনযাপন সে জীবনে যে অন্তহীন ছেদহীন কলহ ও তিক্ততা কখনও উচ্চরোলে, কখনও নিঃশব্দে বাসা বেঁধে

থাকে সেই কলহের বর্ণনা দিয়ে গল্পের আরম্ভ। তাদের গৃহাঙ্গনের পরিবেশও তেমনি দুঃসহ।

> বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলো অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।
>
> [গল্পগুচ্ছ ঃ শাস্তি]

এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের সেই বর্ষার একদিনের পরিশ্রম ও উপার্জনের কথা শুনুন ঃ

> দুখিরাম ও ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলি ধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্যই দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছে,—উচিত মতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।
>
> [গল্পগুচ্ছ ঃ শাস্তি]

এই যাদের পারিবারিক সঙ্গতি ও উপার্জনের চিত্র তাদের উপার্জনের পটভূমির পশ্চাতে পাওনাদার ভবিতব্যের মতো অপেক্ষা করে থাকে ঃ

> চক্রবর্তীদের বাড়ীর রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ী ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।
>
> [গল্পগুচ্ছ ঃ শাস্তি]

এই যেখানে একজনের সামগ্রিক জীবনের মূর্তি সেখানে ভয়ঙ্কর যে সদাসর্বদা আততায়ীর মত গোপনে অপেক্ষা করে থাকবে এবং সুযোগ পাবা মাত্র ভয়াল হাসি হেসে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সুযোগ মাত্রেই সে ভয়াল অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করলে ঃ

> ক্ষুধিত দুখিরাম আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"
>
> বড়ো বউ বারুদের বস্তায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"
>
> সারা দিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত

ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষে দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

[গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রথযাত্রাই আমাদের গত দেড় শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির একটা বৃহদংশ রচনা করেছে, সেই রথযাত্রায় বাংলা দেশে জমিদারীর নাটমণ্ড আলোকোজ্জ্বল ও উৎসবমুখর হয়েছে, সংস্কৃতির মেলা জমজমাট হয়েছে, সেই রথযাত্রার কল্যাণে ও প্রসাদে উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই বাজারে হাসিমুখে কেনাকাটা করেছে এসবই সত্য; কিন্তু তার চেয়ে আরও সত্য এই যে, যে অগণিত নির্বাক দরিদ্রের উপর বংশানুক্রমিকভাবে এই রথের দড়ি টানার ভার পড়েছিল, তাদের কতজনের শ্রমের স্বেদজলে ও ক্লেশের অশ্রুজলে সেই রথের গতিপথ কত পিচ্ছিল হয়েছে, এবং সেই জগদ্দল যন্ত্রের চাকায় যে কতজনের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার হিসাব এই বৃহৎকালব্যাপী সংস্কৃতির পৃষ্ঠায় কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে যৎসামান্য দুর্লভ স্থানে তার কথা ধরা আছে তার মধ্যে উপরের কাহিনীটি একটি। প্রায়-অন্তেবাসী একটি দরিদ্র পরিবারের এই কাহিনীতে সেই অস্থি-পঞ্জর নিঃশেষে চূর্ণ হবার নিঃশব্দ ইতিহাস পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত বেদনার সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।

সেই সঙ্গে তিনি জানতেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কালের পর্বান্তরে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে যাবে। দীন-দরিদ্র, সামান্য লোক আর সামান্য থাকবে না। অন্ততঃ অসামান্যের পটভূমিকায় সামান্য হয়ে সে বিরাজ করবে না। সকলের সঙ্গে সাধারণ একজন হয়ে সে বিরাজ করবার অধিকার পাবে। আজ ইতিহাসের রথচক্র আবর্তনের সঙ্গে কাল পরিবর্তিত হতে চলেছে। তার প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে। নূতন ভূমি-বণ্টন-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মধ্যে তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ উদ্যত। কালে আরও অনেক পরিবর্তন ও অধিকার আসবে সামান্য লোকদের জন্য। এই পটভূমিতে আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে, ১৩০২ সালে রচিত 'সামান্য লোক' নামক কবিতাটি ভবিষ্যৎবাণীর মতই শোনাবে :

সন্ধ্যাবেলা লাঠি হাতে বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোন মতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষি দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁধে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,
চারি দিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখ দুঃখ যত, তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু, তার চাষ-বাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এই পংক্তি কয়টির মধ্যে তিনি সেই অনাগত দিনকেই প্রত্যুদ্‌গমন করে যেন হাত বাড়িয়েছেন বলে মনে হয়। সামান্য লোকের অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট তিনি অসামান্য মানুষ হয়েও, তাদেরই মত মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই সামান্য লোকের সেই দুঃখ-কষ্টের দিনটি যেদিন মিলিয়ে বদলে গিয়ে ভিন্নতর দিনের মূর্তি নেবে সেই দিনের ঐকান্তিক প্রত্যাশাই প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের এক মেঘমুক্ত প্রসন্ন প্রভাতকে প্রত্যুদ্‌গমনের ও অভ্যর্থনার শ্রেয় বাণীই তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম বাণী।

তৃতীয় বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ

এক

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী !

বাংলা দেশের হৃদয় হতে মহাকবি যাঁকে একদা অপরূপ রূপে আবির্ভূত হতে দেখেছিলেন, বলা অবশ্যই বাহুল্য যে, সে মূর্তি দেশজননীর কোন মৃন্ময়ী মূর্তি নয় ; সে জননীর এক চিন্ময়ী মূর্তি। এ মূর্তিকে মহাকবি কোথায় দেখেছিলেন ? আদৌ দেখেছিলেন কি ? না, এ তাঁর ভাবগাঢ় কল্পনার মূর্তি ?

আমাদের এই প্রাচীন দেশে, আজ এসব একান্ত অবিশ্বাস্য কল্পকথা হলেও, বিগত দিনে কালে কালে মহাপুরুষ সাধকরা পরমেশ্বরীকে বাঞ্ছিত মূর্তিতে দর্শন করে মানবজন্ম ধন্য করেছেন। মহাকবিও আধুনিক কালে সেই মহৎ সাধনধারায় একজন অতি যোগ্য উত্তর-পুরুষ। সেই কারণে বিশ্বাস করি, এ দর্শন শুধুমাত্র ভাবগাঢ় কবিকল্পনা নয় ; সত্য দর্শন। তিনিও বাঞ্ছিত মূর্তিতে পরমা জননীকে দর্শন করেছেন।

তবে এই দর্শনের রীতি-প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি বাংলা দেশের আধারে সেই চিন্ময়ী জননীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাঁর দিব্য-দর্শনের এই যে আধার বাংলা দেশ, এ বাংলা দেশের স্বরূপটি নির্ণয় করতে পারলেই সেই সত্যকে আমরা জানতে পারব। এ কি শুধুমাত্র দেশের মৃত্তিকা ? নিশ্চয়ই নয়। তা হলে দেশের সমাজ ? বা দেশের অগণিত মানুষ ? বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে তিনের কোনটিই নয়। এই তিন একসঙ্গে মিলে তাঁর সমগ্র মূর্তি। দেশের মৃত্তিকাময়ী মূর্তি সেই জননীর সুবিস্তীর্ণ মাতৃক্রোড় ; দেশের সমাজ জননীর চেতন বুদ্ধি ও করুণার আধার ; দেশের অগণিত মানুষের চৈতন্যের মধ্যে জননীর সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। স্বদেশের মৃত্তিকা ও তার পরিমণ্ডল, স্বদেশের সমাজ এবং স্বদেশের স্বজন—এই তিনে মিলে এক অখণ্ড মূর্তিতে প্রকাশিত দেশজননীকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিচিত্র কথা এখানে উল্লেখ করি। মহাকবি পরমেশ্বরকে স্মরণ মাত্রেই পুরুষের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা, কখনও বা প্রভু কি বন্ধু বলে। কিন্তু দেশের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে কখনও মা ছাড়া অন্য মূর্তিতে কল্পনা করেন নি, করতে পারেন নি। আমার অন্তত এই ধারণা।

দেশের সমাজকে আমি পূর্বেই মহাকবির দৃষ্টিতে দেশের ভাবমূর্তির অবিভাজ্য অংশ এবং উপমার আশ্রয় নিয়ে দেশজননীর চেতনা বলে উল্লেখ করেছি। সে চেতনার আধারে জননীর প্রজ্ঞা ও করুণার অমৃত বিধৃত। আজ আমি মহাকবির পল্লীসমাজ সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার কথা বলব।

দুই

বাংলা দেশের ও বঙ্গসংস্কৃতির পরম সৌভাগ্য যে মহাকবি এমন মুহূর্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মেছিলেন যখন "বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়

তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।" কাজেই তিনি শিশুকাল থেকেই জন্মসূত্রে অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট আদর্শের মধ্যে দেশের স্পর্শলাভ করেছিলেন। সেই স্বাদেশিকতার বোধ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার একটি বিশিষ্ট অংশ ও অঙ্গ হিসাবে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে একটি পরিণত মূর্তি লাভ করেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন যে তাঁর স্বাদেশিকতার চিন্তা সমসাময়িক অন্য সকলের চিন্তা থেকে বিশেষভাবে পৃথক; সেই কারণেই সে চিন্তা যত বিশিষ্ট তত একক। এই চিন্তার যে বীজ তিনি বাল্যকালে জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন তাকে তাঁর জীবনের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে একযোগে বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, বিগত কালের শাস্ত্র, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি ও রুচি যতখানি এগিয়ে যেতে দিয়েছে ততখানি নিজেকে যুক্ত করেছেন, আবার নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ও চারিত্রিক প্রবণতা ও বিবেচনা অনুযায়ী তার থেকে সরে এসে নিজের মানসিক সিদ্ধান্তের স্থিরভূমিতে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো এ কথা এইভাবে বললেই আরও সঠিক হবে যে তিনি যেখানে থাকবার সেইখানেই ছিলেন বরাবর; তৎকালীন ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন; আবার সেই অনিবার্য আকর্ষণেই তিনি এবং রাজনীতি দুইই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে করতে পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মহাকবির স্বাদেশিকতার মূর্তি পলিটিক্যাল স্বাদেশিকতা থেকে পৃথক। এ বিষয়ে তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' থেকে উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন:

> বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্যই আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।
>
> ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি অবস্থা-নির্বিচারে গবর্ণমেন্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়ত বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।
>
> ... ...
>
> আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।

মহাকবির কাছে তাঁর পরিণত জীবনারম্ভের প্রথম কাল থেকেই স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট মূর্তি ছিল। এবং সে মানসমূর্তি সে সময়কার পোলিটিক্যাল বা ভিন্নতর স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চিন্তা থেকে পৃথক।

সকলেই স্বাদেশিকতা চর্চায় যে দেশকে কল্পনা করতেন সে কল্পনা অনেকখানিই, তখনকার দিনে সব চিন্তা যেখান থেকে আমাদের দেশে এসে আমাদের অল্পবিস্তর প্রভাবিত করত, সেই য়ুরোপ থেকে ধার করা। সেদিন অধিকাংশের কাজে দেশ ছিল ইংরেজী স্টেটেরই নামান্তর। যার সঙ্গে 'নেশনের' অনেকখানি আত্মিক সাদৃশ্য ও মিল আছে। মহাকবির কাছে দেশের সংজ্ঞা ছিল ভিন্ন। দেশের মূর্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করতেন সমাজের মধ্যে। দেশের সমাজই তাঁর কাছে দেশের জাগ্রত মূর্তি।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সমাজের মূর্তির মধ্যে দেশের যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মূর্তিকে তিনি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও চিন্তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। এই থেকে স্থির অনুমান করা ও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে এ সম্পর্ক তার বহু পূর্ব থেকেই তিনি বিশেষ চিন্তা করেছেন; এবং বহু চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ফলে এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁাছেছিলেন। এখন যাকে দেশের জাগ্রত আধার বলে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার চরিত্র কেমন ছিল সেইটিই এখন আলোচ্য বিষয়।

স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে 'নেশনের' চেয়ে 'সমাজ' বড় কি ছোট, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না; এবং ভাল-মন্দের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত নেই। তিনি এই কথাই স্পষ্ট-ভাবে বলতে চেয়েছেন যে য়ুরোপের চরিত্র অনুযায়ী 'নেশন'কে অবলম্বন করেই তাদের বিকাশ, স্টেটই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা জাগ্রত পদার্থ; স্টেটের শুভাশুভের উপরেই জাতির সমস্ত মানুষের ভালমন্দ নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের চরিত্র অনুযায়ী তার সমস্ত শুভাশুভ রাজার উপর নির্ভরশীল ছিল না; ছিল সমাজের উপর।

এখন স্বভাবতই সমাজ বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটি জানা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন:

> আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমনভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।
>
> [স্বদেশী সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

এই সমাজ যেন এক প্রাচীন অতিকায় কূর্মের মত। তার বয়সের পরিমাণ নাই। তার বিশালকায় প্রাচীন দেহের চারিপাশে এক সুকঠিন অদৃশ্য আবরণ, যাতে কাল থেকে কালান্তরে যত আঘাত বাইরে থেকে এসেছে, সব প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে; সেই আবরণের অভ্যন্তরে তার চলমান প্রাণক্রিয়াকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে পারে নি।

ভারতবর্ষে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত প্রাণধারা এই সমাজের মধ্য দিয়েই তার

অবশ্যম্ভাবী মূর্তিটি গ্রহণ করে নিজেকে সক্রিয় ও সচল রেখে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করেছে। তাই ভারতবর্ষের আরাধ্য ও সাধ্য বিষয় 'নেশনের' কল্পনা নয়, সমাজের বহমানতা।

এই সমাজ আমাদের কোন্ কল্যাণ করেছে তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> কিন্তু এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।
>
> [ভারতবর্ষীয় সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ]

ভারতবর্ষে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের আধার এই সমাজ। মহাকবি ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন এই চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন সেই সময় সমাজের এই মূর্তি ছিল। আজ, সেই কালের পর সত্তর বৎসর অতিক্রম করতে চলেছে। দুটো মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটন করেছে। সত্তর বৎসর পূর্বেও সমাজের যে মূর্তি ছিল তা আজ শুধু ভগ্ন দেবদেউলের মত ভেঙেই পড়েছে নয়, তার বোধ হয় কোন চিহ্নও আর নাই। ভূমিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ ; একান্নবর্তী পরিবার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ; নব শিল্পোন্নয়ন ও বিবিধ নব নব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক চিন্তার ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। সে সব পরিবর্তন দিনে দিনে ধীরে ধীরে ঘটে যাচ্ছে বলে, আমরা ঠিক অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারি না; কিন্তু তা বিপ্লবাত্মক। এসব সত্ত্বেও বলব, বাইরের কাঠামোতে এই পরিবর্তন সর্বত্র প্রকট হলেও, কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত সেই ভাবগুলির অনেক ভাবই এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নাই, য়ুরোপের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও আমি অনভিজ্ঞ ; তবু মনে হয় সাধারণভাবে আমাদের দেশে আত্মীয়ের জন্য আত্মীয় আজও বহু ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে তা বোধ হয় পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই অপরিজ্ঞাত। আজও এই কঠিন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও, আমাদের দেশের অগণিত মানুষ, যাঁরা নূতন কালের সমাজ-জীবন এবং নাগরিক-জীবনের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসে পড়েছেন ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে, প্রাচীন কালের অনেক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে নূতন চিন্তা ও নূতন অভ্যাসকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সমস্ত লোকলোচনের আড়ালে, 'বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করাকেই শ্রেয়' বলে মনে করেই সেই ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে

চলেছেন। একে তাঁরা কোন গৌরবের মহৎ কর্ম জ্ঞান করেন না, অন্যকেও তা মনে করাবার চেষ্টা করেন না। এঁদের এই দৈনন্দিন গৌরবময় স্বেচ্ছাবৃত আত্মত্যাগের কাহিনী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় না অথবা তাঁদের প্রশংসায় সভাগৃহ করতালি ধ্বনিতে মুখর হয় না। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ আজও এই মহৎ আত্মত্যাগ ও দৈনন্দিন স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্র-সাধনকে জীবনের অতি সাধারণ সহজ কৃত্যের অতিরিক্ত কিছু বলে জ্ঞান করেন না; যাঁরা আচরণ করেন তাঁরাও না, যাঁরা তা চোখে দেখেন তাঁরাও না। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বহুকালাবধি ধারাবাহিক চর্চার ফলে এই ত্যাগের প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ধাতুগত সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এ সম্পর্কে চেতনাহীনতার জন্যই আমাদের মুখের প্রসন্ন আচ্ছাদনের অন্তরালে যে বিষণ্ণতা, ক্ষীণ হাসির অন্তরালে যে ক্লেশ ও দুঃখ আত্ম-গোপন করে থাকে তাকে আমরা দেখতে ও চিনতে ভুল করি; সে যে সুমহৎ যোদ্ধার সুবৃহৎ এক মহৎ জয়ের কথা এবং এক অভেদ্য কবচকুণ্ডলের কথা ঘোষণা করেছে তা আমরা বুঝতে পারি না।

চার

যদি ইতিহাসের ও কালের উজান বেয়ে একবার সেই উদ্ভবভূমি, ভাবগঙ্গোত্রীর সন্ধান করি তা হলে একে চেনা কষ্টকর হবে না। মহাকবির ভাষাতেই বলি:

> রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন। সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না···আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইবে। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহা হিন্দুত্ব।
>
> [ভারতবর্ষীয় সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

এই পরিকল্পনা ঈশ্বর, ব্যক্তি-মানুষ, গৃহস্থ ও সমগ্রভাবে দেশের প্রাণযাত্রাকে একসঙ্গে একটি পবিত্র, ভাবগম্ভীর সংগীতের মত এক সুরে গেঁথে মানুষের জীবনে একটি মহৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করে তার প্রাত্যহিক জীবনকে একান্ত সূক্ষ্মভাবে অথচ একান্ত সহজে একটি মহৎ আদর্শের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে চিরকালের মত যুক্ত ও চলমান করে দিয়েছে। কালের গতির সঙ্গে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হয় নি বলেই তা পরবর্তীকালে সমাজের সম্পূর্ণ প্রাণধারাকে ধারণ করতে পারে নি। সংস্কারের অভাবে তার খাত মজে এসেছে। যদিও কোনক্রমে কালে কালে কালোপযোগী প্রয়োজনীয়

সংস্কার সাধন সম্ভব হত তা হলে আজও সমাজ নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে দেশের বৃহৎ জনমানসের সমগ্র জীবনধারাকে সেই পুরাতন ধ্রুব সংগীতের মতই ধারণ করতে পারত এবং যা তার পক্ষে বিষম ও বিরোধী তাকে অক্লেশে প্রতিহত করতে পারত।

কিন্তু তা হয় নি, হয় না বলেই হয় নি। ইতিহাসের নিয়ম হয়তো তা নয়। এবং হয় নি বলে আক্ষেপ করেও লাভ নেই। কিন্তু যা হয়েছিল, তাও টি'কে ছিল এবং টি'কে আছে বহুকাল ধরে। বহু বহু শতাব্দীর সেই বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও চেষ্টা করলে কিছু কিছু দেখা যাবে। বিচ্ছিন্ন এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মানবজীবন তখন একটি আদর্শমুখী ছিল একথা উল্লেখ করলাম; তার বাইরের শৃঙ্খলার কথাও মহাকবির উক্তি উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি। এবার তার মানসমূর্তির সামান্য বর্ণনা মহাকবির রচনা থেকেই দিই :

> মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না।
>
> [স্বদেশী সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ]

এর সামগ্রিক ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ভাষায় ও ভঙ্গিতে বললে বলতে হয়, চতুর্বর্গ লাভ হত; লাভ হত অর্থ ও পরমার্থ; ইহজীবন এবং পরজীবন দুইই পরিপূর্ণ হত; লাভ হত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আজকের ভাষায় বললে বলতে হয়—ব্যক্তি-চরিত্রের সামগ্রিক বিকাশ হত আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথে এবং সমাজে একটি সুস্থ সমষ্টি-শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ হত। মানব-জীবনে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেয়তর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যে ব্যবস্থা বহু শতাব্দীর প্রাচীনতা নিয়েও জরাগ্রস্ত হয় না, যার মধ্যে যাবতীয় বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করে নিজের জীবনধারাকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করার শক্তি, যার মধ্যে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথে তার সামগ্রিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা, তার চেয়ে বাঞ্ছিত ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

পাঁচ

কিন্তু বহুকালের মহা-প্রাচীন হয়েও যে জীর্ণ হয় নি, ইংরেজ-শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রাচীনতার মধ্যে জীর্ণতার স্পর্শ ধরা পড়ল। মহাকবির পরিপূর্ণ ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে তার মাহাত্ম্যই শুধু ধরা পড়ে নি, তার জীর্ণতাও দৃষ্টিগোচর হল। সেই জীর্ণতার সুযোগে নবীন কালের নগরসভ্যতার পত্তন হল দেশে। নগর পল্লীর রস শোষণ করতে লাগল। ভারতবর্ষের সনাতন পল্লীসমাজের মধ্যে এতকাল ধরে যে-মন, যে-চরিত্র ছিল, পল্লীসমাজ মানুষকে চরিত্রের যে গড়ন দিত, তার ফলে আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত মানবচিত্ত একান্ত সহজে, না জেনেও, না বুঝেও শ্রেয়কে জীবনের কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠা দিতে পারত," গৃহস্থ হয়ে সংসারের যাবতীয় কর্মকে কর্মযজ্ঞের মত অনুষ্ঠান করতে পারত।

কিন্তু কালক্রমে মানবচিত্তের মধ্যে সে প্রবাহের খাতে তামসিক আলস্যের ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বালি জমে তাকে মজা খাতে পরিণত করেছিল। একেই তিনি বার বার আপনার চারিপাশে প্রত্যক্ষ করেছেন। মনের মধ্যে সনাতন সমাজ-মূর্তির জাগরূক ধ্যানের সঙ্গে বাইরের প্রকাশকে মিলিয়ে পান নি। সমাজের মানবচিত্ত তখন উৎসাহহীন ও অবসন্ন; কর্মযজ্ঞের সে ধারণা তখন মানবচিত্ত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে; মানুষ তখন অশিক্ষায়, শিক্ষা-হীনতায় আত্মমগ্ন; মহৎ ধ্রুব ঐকতান সংগীতের তার থেকে স্খলিত হয়ে জৈব দুর্বুদ্ধির তাড়নায় তাড়িত; প্রাচীন কালের ধ্যান-ধারণা সব ছেঁড়া মালার পাথরের মত ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গিয়েছে। তারই ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট বাংলা দেশের নূতন জমিদার সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর কেন্দ্রস্থল, স্বগ্রামে বসবাস ত্যাগ করলেন; তাঁরা অধিকাংশ জনই তাঁদের ভূসম্পত্তির মুনাফা স্বগ্রামে বাস করে খরচ করেন নি; ক্ষেত্র বিশেষে কিছু অংশ খরচ করলেও, তার অধিকাংশটাই নবীন কালের নূতন শহর কলকাতায় বাস করে সেখানেই খরচ করেছেন। পল্লীসমাজের মানুষের দেওয়া অর্থ, পূর্বকালের মত, পল্লীতে ব্যয়িত হয় নি; ব্যয়িত হল কলকাতায়। অথচ পূর্বকালে এর বিপরীত ঘটত:

> পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রাসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজ-রাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্ব চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।
>
> [স্বদেশী সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

সমাজের যে মূর্তির মধ্যে তাঁর স্বদেশের কল্যাণ নিহিত ছিল, কিন্তু যে মূর্তি তখন বিগতশ্রী, বিগতমহিমা বিগতরূপ, সেই মূর্তিরই নব রূপায়ণ তিনি বার বার কামনা করেছেন। যে কোন পোলিটিক্যাল সিদ্ধির চেয়ে এই প্রাচীনকে সংস্কার করে নবরূপে তাকেই প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে যে শ্রেয়লাভের সম্ভাবনা, সেই কথাই বার বার উচ্চারণ করেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্যের মূল কারণ এইখানে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে তার সঙ্গে সাময়িক ভাবে যুক্ত হয়েও তিনি স্পষ্টভাবে এই পৃথক ও ভিন্ন বার্তা বার সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সময়েই ১৯০১ সালের মধ্যে স্বদেশের মানুষের স্বার্থ ও পরমার্থ লাভের মূল উপায় হিসাবে তিনি তাঁর এই চিন্তা স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।

এসব আজ ইতিহাসের কথা। তবু সংকোচের সঙ্গেই বলি, মহাকবির স্বাদেশিকতার এই চিন্তা পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ জাতি স্পষ্টভাবে দেখতেও পায় নি, বুঝতেও পারে নি, গ্রহণও করে নি। সেদিনের পরশাসনের অধীনতাজনিত যে জ্বালা তাতে জাতির বুঝবার অবকাশ বা মন কোনটাই ছিল না। চিন্তার ও ভাবনার যে নির্মল, অনাবিল আকাশে

মহাকবির এই ধ্যান-ধারণা তাঁর কাছে একান্ত স্বচ্ছ ও ধ্রুব বলে ধরা পড়েছিল, পরাধীনতার যন্ত্রণার জাতির মেঘাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে এ লেখার প্রতিবিম্ব পড়তে পারে নি।

সেদিন পরশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মানুষের ব্যক্তি-জীবনের ও মানব-সমাজের ধ্রুব ও স্থায়ী কল্যাণের পটভূমিকায় সমস্ত সমস্যাটিকে আবিষ্কার, বিচার ও তার জন্য প্রয়োজনমত প্রবৃত্তির প্রয়োজনে যে স্থৈর্য, যে শান্তচিত্ততা, যে শ্রদ্ধা ও যে কর্মনিষ্ঠা প্রয়োজন তার একান্ত অভাব ছিল সেদিন। তাই বা কেন? সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

ছয়

ভগ্ন দেবমূর্তির মত সমাজের তৎকালিক মূর্তিকে তিনি পদ্মাবক্ষে বাসের কালে প্রতিদিন দেখেছেন এবং তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করেছেন। সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রতিকার হবে না তাও তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে সাধনা—সাহিত্য-সরস্বতীর সাধনা—যা চিন্তা, মনন ও সেই চিন্তা ও মননকে রূপদানেই যার পরিপূর্তি—তার সঙ্গে এই প্রতিকারের কাজে কর্মের যোগ না করলেও চলত। কিন্তু মানব-চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভ যাঁর সাধনা, চিন্তা থেকে প্রয়োজনের সময় কর্মে না নেমে তাঁর পরিত্রাণ কোথায়?

মহাকবির স্বদেশ-চিন্তার মূলে রয়েছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম। স্বদেশকে তিনি জাতির আত্মা বলে মনে করতেন এবং স্বদেশের সেবা করবার জন্য উপযুক্ত হবার প্রয়োজন আছে সে কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন।

এই মানসিকতার পটভূমিতে তাঁর পল্লীবাসের মধ্যে প্রতিদিন আশপাশের মানুষের জীবনে যে আত্মিক ও লৌকিক দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তাঁর ধ্যানের স্বদেশের দেবমূর্তির অঙ্গে আঘাত লেগেছে বলে অনুভব করেছেন। তাই সেই দেব-অঙ্গ থেকে আঘাত ও আবর্জনার কলঙ্কস্পর্শ দূর করা তিনি অবশ্য প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন। শুধু দেশের বা সমাজের কল্যাণসাধন নয়, গ্লানিমোচন নয়, নিজের আত্মিক সাধনার সম্পূর্ণতাও নির্ভর করেছে এই কর্মের উপর।

সেই কারণেই শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্যই শ্রীনিকেতনের পত্তন। শ্রীনিকেতন ভিন্ন শান্তিনিকেতন সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করি:

> আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লী সংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।
>
> কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে, লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষার জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সংসদের সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

[পল্লীপ্রকৃতি : শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে অভিভাষণ]

এই প্রচেষ্টার মূল স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে তিনি বললেন :

……রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরু-ভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে, আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।

[পল্লীপ্রকৃতি : তথৈব]

স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তাঁর মূলগত ধারণার সঙ্গে তাঁর সমকালীন রাজনীতি-মুখী স্বাদেশিকতা ও আন্দোলনের মূলগত পার্থক্য ছিল বলেই সমকালীন রাজনীতির আদর্শ সম্পর্কে সহানুভূতি থাকলেও তার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। এবং এই পার্থক্যের কথাও তিনি অসংকোচে তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেছেন :

> সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব—আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হাতে পারে, একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

[কালান্তর : স্বরাজসাধন]

'অন্তরে বাহিরে এই আত্মকর্তৃত্বের চর্চার' যে অভাব তা তাঁর কল্পনালব্ধ কোন চিন্তা নয়; অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ। ভারতবর্ষের সমাজের মূল অন্তরমূর্তি ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি প্রাথমিকভাবে জন্মসূত্রে লব্ধ বোধ এবং পরবর্তী কল্পনা, চিন্তা ও ধ্যান থেকে আবিষ্কার করেছিলেন, যার মূলে ছিল স্বদেশ প্রেম—দেশের মানুষ ও মৃত্তিকার সম্মিলনে গঠিত

সমাজের প্রতি প্রেম। এই মূর্তি ও তার অভিপ্রায়কে তিনি ভগ্ন দেবমূর্তির মধ্যেই দেবতার অস্তিত্বের মত নিজের পল্লীবাসের সময় দেশের গভীর অভ্যন্তরে তার পল্লীসমাজের মর্মলোকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত বলে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তার বিকৃতিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই দেশের অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও আনন্দের অভাবের অন্তরালে এই সমস্ত অভাবের মূল কারণ যে 'অন্তরে বাহিরে আত্মকর্তৃত্বের অভাব' তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর স্বাদেশিকতার মূল ধ্যানকে অটুট প্রত্যয়ে পরিণত করেছিল। এই প্রত্যয়ের জন্যই নিজের সমকালীন রাজনীতি ও আন্দোলন থেকে নিজেকে পৃথক রাখা সম্পূর্ণ অসংকোচেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সাত

মহাকবি ধনীর সন্তান ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে, ঠাকুর-পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁদের বৃহৎ জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বও তাঁকে বেশ কিছু কাল বহন করতে হয়েছিল। আমাদের যখন প্রথম যৌবন, যখন দেশ স্বাধীন হয় নি, যখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের জোয়ার বইছে অথচ মহাকবি তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও তার থেকে দূরে আছেন, সেই কালে মহাকবির সমাজের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত জীবনের সঙ্গে নিম্নতলবাসী সাধারণ মানুষের জীবনের যোগাযোগ নাই—এমনি ধরনের একটা কথা, একটা ধারণা শিক্ষিত সমাজে অর্ধবিশ্বাসের মত প্রচলিত ছিল; এবং সে কথা নিম্নকণ্ঠে কোথাও কোথাও উচ্চারিতও হত। বলা বাহুল্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের মৃদু সুর অনুপস্থিত থাকত না।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও স্বাদেশিকতা সংক্রান্ত রচনাগুলি, যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত, সেগুলির সঙ্গে যথাযথ পরিচয় হলে এ সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হবে, এবং পাঠক একান্ত শ্রদ্ধা ও লজ্জিত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারবেন যে ধনীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও যে কোন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে দেশের সাধারণ মানুষ ও চাষী সম্পর্কে মহাকবির পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেকগুণ ভারী ও তীব্রতর ভাবে স্পষ্ট। পল্লীর মানুষ ও চাষী পরিবারের আর্থিক অবস্থা, তাদের অভ্যাস, তাদের চরিত্র ও চরিত্রের গড়ন সব তিনি বিশিষ্ট ও স্পষ্টভাবে জানতেন। তিনি চাষীর সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন, চাষী যখন চাষ করে তখনি সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে সে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায় একথা তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। আমাদের দেশের চাষীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, চিত্ত ভীরু এবং সংস্কারগ্রস্ত এ তাঁরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তিনি দেখেছেন চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এমনি যে তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। অথচ একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন; সে সক্রিয়তা চাষের লাইন-বাঁধা কাজে থাকে না। বাংলা দেশের অন্তত দুটি জেলার চাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তিনি নিজেই দাবী করেছেন। এই অঞ্চলের চাষীদের অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি দেখেছেন এক জেলা এক ফসলের দেশ যেখানে ধান ফলাতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপরে তারা তাদের ভিটের জমিতে অবসরকালে সবজি উৎপন্ন করতে পারত। এ নিয়ে তিনি তাদের যথেষ্ট উৎসাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু ফল পান নি। যারা ধান-চাষের জন্যে প্রাণপণ করতে পারে তারা সবজি-চাষের জন্য নড়ে বসতে চায় না; ধানের লাইন থেকে তাদের মনকে সবজির লাইনে টেনে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম একথা তিনি ব্যথিত বিস্ময়ের

সঙ্গে ব্যস্ত করেছেন। আর এক জেলার চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ-সব শস্য হয় না সহজে, সে জমি তাদের এমনি পড়ে থাকে, তার জন্য খাজনা বহন করে চলে তবু নিজের অভ্যাস ছেড়ে তাতে কিছু ফলাবার চেষ্টা করবে না। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফেরে।

এসব মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর রায়ত সম্পর্কে আরও কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমি তাঁর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করব। প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' প্রকাশিত হবার পর, আজ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর আগে শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মশায়কে তিনি লিখেছিলেন :

> আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি ; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না।···
>
> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথা'র পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি ; রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয় ? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব ? অন্য এক জমিদারকে ? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গছিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব ? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে ?···
>
> জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, একথা সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড

হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পস্বল্প হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়নায় খরিদ-বিক্রি বেড়েই চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকী থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্বসমাসে তা আর টেকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোন খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

... ...

মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা নিজেকে কোনোমতে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজ জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়।...

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যত দিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে তত দিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এই কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে।...আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে ?...

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা

আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে।······দেখতেদেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপুরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতি-স্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

[কালান্তর : রায়তের কথা]

অতি-দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। কিন্তু আমি মনে করি, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সমগ্র জীবনের প্রায় সবটাই আজকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আজ থেকে চল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর আগে, ভূমি-নির্ভর ছিল। এই ভূমি-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল ১৭৯৯ সালে ইংরেজ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় জমিদার, রায়ত, তার মাঝখানে নানান ধরনের জমিদারী স্বত্ব ও উপস্বত্বভোগী নানা শ্রেণীর জমিদার; তার সঙ্গে নানান শ্রেণীর মহাজন; সব সমেত মিলে এক অতি জটিল ব্যবস্থা। যিনি এই জটিল ও বিচিত্র ব্যবস্থার সংগে বংশানুক্রমিকভাবে সাত পাকে বাঁধা না পড়ে এর হাজার ঘাটে জল না খেয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ব্যবস্থার হালহদ্দ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব বলেই মনে করি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত কেতাবী বিদ্যার আন্তরিক অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বুঝলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এই সহস্র গ্রন্থিতে গাঁথা, জটিল ব্যবস্থায় কোন্ গ্রন্থিতে কতখানি ব্যথা, কতখানি সুখ, কতখানি ছলনা, কতখানি ধূর্ততা, কতখানি শুভবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি আবদ্ধ মানুষটিকে পীড়ণ করেছে তা সঠিক উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যিনি এই ব্যবস্থার মধ্যস্থলের জীব, জমিদার মহাজন বা রায়ত যাই হোন, তাঁর পক্ষেও একে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা তো আরও অসম্ভব। কারণ নিজের অবস্থা ও দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার ফলে নিজের স্বার্থই তাঁকে বার বার ছলনা করে যা বুঝাবে তা সম্পূর্ণ সত্যের থেকে অনেক দূরের পদার্থ। কাজেই এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও যিনি এর সম্পর্কে স্বার্থহীন সানুকম্প উদার দৃষ্টি অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তিনিই এ সম্পর্কে সঠিক কথা শোনাতে পারেন। বলাই বাহুল্য, সেই দৃষ্টিই দেশের সাধারণ মানুষ যে রায়তের মূর্তিতে, প্রজার মূর্তিতে এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ছিল তাদের সঠিক অবস্থাকে উন্মোচিত করে দেখাতে পারে।

মহাকবি আপনার সাধনার গুণে এবং অভিজ্ঞতার আনুকূল্যে সেই দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে জমিদারের কর্ম সাময়িকভাবে করলেও, তিনি, তাঁর কথামতই, আসলে ছিলেন আসমানদার। তাই কর্মে জমিদারী করলেও মর্মে জমিদারী বৃত্তি ও প্রবৃত্তি প্রবেশাধিকার পায় নি। কর্মের সুযোগে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এ বিষয়ে; আর মর্মের চরিত্রগুণে রায়তরূপী দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের অসহায় বেদনা ও দুঃখের সর্বপ্রকারের মূর্তিকে অনুভব করে অসীম মমতার সঙ্গে হৃদয়ে অক্ষয় বেদনার মত ধারণ করে রেখেছিলেন। উপলব্ধির সঙ্গে বেদনার মণিকাঞ্চন যোগে তাঁকে তাই রায়তের স্বার্থ সম্পর্কে ভিন্ন কথা উচ্চারণ করিয়েছিল। আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন জমি যে চাষ করে তারই হওয়া উচিত। বুদ্ধিগতভাবে একমত হয়েও রায়তের প্রতি সহানুভূতি ও মমতাবশতই পুরোপুরি এ কথা মানতে তাঁর দ্বিধা এসেছে। বুদ্ধিতে দুর্বল, অর্থশক্তিতে সম্বলহীন রায়তের নিঃসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাঁর যে যুক্তি যে জমি চাষ করে তারই—এই প্রাথমিক প্রতিপাদ্যকে মেনে নিয়েছে সেই যুক্তিকেই তাঁর প্রবলতর মমতা করুণ মুখে প্রশ্ন করেছে—জমির উপর প্রজার ষোল আনা অধিকার মানেই প্রজার জমি হস্তান্তর করার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া; যা তিনি নির্ভুলভাবে জানতেন প্রজার পক্ষে তৎকালে আত্মহত্যার অধিকার পাওয়াই হবে। তাই একে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। তবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তার আবশ্যিক আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

আজ কালধর্মে জমিদার, মহাজন ও রায়তের মধ্যে জমিদার-ভূত কালের প্রাণীতে পরিণত। বাকি শুধু মহাজন ও রায়ত। আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটেছে; জমিদারী বিলুপ্তির পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শ্রাদ্ধবাসরের অন্তে আমাদের সম্মুখের চলমান কালের নাটক মুখর ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহাজনের যে আধুনিক মূর্তি জোতদার, সেই জোতদার ও রায়ত আজ সেই নাটকের মুখ্য দুই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জমিদারী ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে যা যা উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলি আজ সব স্তরে স্তরে ইতিহাসের পূর্বলিখিত পৃষ্ঠার মত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। রায়ত আজ সম্পূর্ণভাবে স্ব-কর্ষিত মৃত্তিকার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

আট

একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এই জটিল সমস্যাকে রায়তের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন এবং সমস্যাটিকে তার পূর্ণ মূর্তিতেই চিনতেন। যে ধাতুগত সাধনা ও হৃদ্‌গত মমতা জমিদার রবীন্দ্রনাথকে রায়তের চোখ দিয়ে সমস্যাটিকে দেখতে শিখিয়েছিল সেই তাঁকে ওইখানেই থামতে দেয় নি, আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই কুম্ভীপাক থেকে মুক্তির পথসন্ধানে। 'রায়তের কথা'র শেষ অংশে তাই তিনি উচ্চারণ করলেন:

> কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে—জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে।

স্বদেশের যে মূর্তিকে সমাজের মধ্যে তিনি প্রকট দেখেছেন তার বাঁচবার পথও তিনি চিন্তা, পড়াশুনো ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এই তিনের মধ্য দিয়ে অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তার বাঁচবার যে শক্তি তা নিহিত আছে সমাজের জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে,

বিচ্ছিন্ন কোন অংশে বা বিশেষ কোন কর্মের মধ্যে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলেই তা সম্ভব। আর পল্লীর সামগ্রিক প্রাণসঞ্চার সামগ্রিক আত্মউদ্‌বোধনের মধ্যে, উদ্‌বুদ্ধ আত্মশক্তির মধ্যেই নির্ভুলভাবে নিহিত। সে আত্ম-উদ্‌বোধনের অর্থ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই অংশের একসঙ্গে উদ্‌বোধন।

এরই জন্য শ্রীনিকেতনে হাতে-কলমে কাজের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা হয়েছে। আবার এই চিন্তা ও কর্মের রূপ কেমন হবে বা হতে পারে তার ভাবনা তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রাণকে জড়ত্ব থেকে উদ্‌বোধনের জন্য যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করার প্রয়োজন হতে পারে তাও বলেছেন তিনি। সেই বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এতো বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে হয়। আমিই বলি, আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

[তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

জীবনের বহিরঙ্গ সর্ববিধ অভাবে জর্জর, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অন্তরে ভীরু, অসহায়, দুর্বল দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় তাদের পূর্ণ উদ্‌বোধনের দ্বারা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নকে মহাকবি আজীবন মন্ত্রজপের মত নিরন্তর চিন্তা করেছেন। সেইখানেই তার শেষ হয় নি। তাদের বাইরের ও ভিতরের অভাব ও দৈন্য দূর করবার কামনায় যতটুকু পারেন কাজে হাত লাগিয়েছেন। নিজের সীমিত সঙ্গতি ও কর্মের সংকীর্ণ পরিধির কথা জেনেও কাজে হাত না দিয়ে পারেন নি। সম্পূর্ণই জানতেন যে আলো জ্বলবে কি না কে জানে, আর জ্বললেও তার শিখায় অতি যৎসামান্য অন্ধকার বিদূরিত হবে। তবে মনে অশেষ এই আশা ছিল যে, কোথাও কোনও এক কোণের অন্ধকারও তো দূর হবে!

তাই সেই আলো জ্বালার কাজে কলম রেখে হাত লাগিয়েছেন। জ্বালা আলোর কম্পিত শিখাটিকে প্রতিকূলতার ঝোড়ো বাতাস থেকে আড়াল করে বাঁচাতে চেয়েছেন।

কিন্তু কেন?

সারা জীবন মনে পড়েছে পীড়িত দেখা-অদেখা কোটি মানুষের মুখ, অভাবে শীর্ণ, ভীরুতায় সকরুণ, অজস্র পীড়নে অসহায় ও ভয়ার্ত। সেই বেদনা সারা জীবন তাঁকে ব্যথিত করে রেখেছে। বোধ হয় সুগভীর স্নেহে, আকুল মমতায় তাদের সকলের সব ব্যথা নিজের বুকে কেড়ে নেবার সুতীব্র কামনা জেগেছে। তাই কাজে হাত দিয়েও মনে হয়েছে এ কতটুকু! তাদের সবারই মুখ মনে পড়ে হতাশার মর্মযাতনা ভোগ করেছেন। বুঝেছেন প্রয়োজন অনেক অনেক বেশী।

স্বদেশের সব পীড়িত মানুষের সব দুঃখ এক নিমেষে নিঃশেষে মুছে নিতে পারলে যাঁর পরিতৃপ্তি হ'ত, কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখকে অশেষ বলে দেখতে পেয়ে যাঁকে সারাজীবন অপরিতৃপ্ত থাকতে হয়েছে, সেই স্বদেশ ও সমাজ-প্রেমিক মহাকবি দেশের মানুষ ও মৃত্তিকায় যুগল সম্মিলনে রচিত স্বদেশের সমাজের সম্মুখে একান্ত নম্র ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যই যেন সকরুণ কাতরতার সঙ্গে জোড় হাতে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন :

> অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
> তবু জানি নে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
> আমার জনম গেল মিছে কাজে,
> আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
> তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

তাঁর সুবৃহৎ, সুবিশাল ও সুদূরপ্রসারী স্বদেশ-চিন্তার মধ্যে তাঁর মনটিকে বুঝতে যদি কারও ভুল হয়, তাঁর এই সকরুণ, নম্র, কাতর আক্ষেপের তীব্রতার মধ্যে তাঁর মনটিকে চিনতে নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি ঘটবে না।

চতুর্থ বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি

এক

আমাদের প্রতিদিনের প্রাণযাত্রায় এই বৃহৎ পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমরা সচরাচর স্পর্শ করি, সেই কারণেই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সেই সামান্য ক্ষুদ্র অংশ থেকেই সংগৃহীত হয়ে আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। একান্ত জীবযাত্রার প্রয়োজনে যে জীবন শুধুমাত্র আপনার বাঁচবার রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, তার প্রয়োজন সীমিত থাকে কলকোলাহলময় মানুষের কর্মব্যস্ত সংসারের একটি সামান্য অংশে। সে পৃথিবী মানুষের কলকাকলিতে মুখর, কর্মের প্রেরণায় ও তাড়নায় চঞ্চল, উত্তপ্ত ও উন্মত্ত; তার সঞ্চয়ের পরিমাপ হয় অর্থমূল্যে। সে জীবন অতি বিচিত্র, অতি দুর্বার, অতি বেগবান।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রাণযাত্রার সীমানার ঠিক ওপারেই, কখনও বা তারই মধ্যে, আর এক প্রাণলীলার জগৎ সুদূর আকাশের নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত। তা আমাদের প্রতি দিনের কাজে বড় একটা লাগে না। তাই তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে থাকি। শুধু তাই নয়, মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা থেকে দূরান্ত জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত বিস্তৃত এই জগৎ যেন আমাদের তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেও দিতে চায় না। তার মধ্যে নিত্যকালের প্রাণলীলা বিধৃত, সে অনন্তব্যাপ্ত, অথচ সে একান্ত নিঃশব্দ, নির্বাক ও মূক। সে যেন আমাদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও অহরহ নিজের অস্তিত্বকে গোপন করবার জন্যই পাষাণ মূর্তির মত নিজেকে নিশ্চল রেখে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। তার দিকে চকিত অনভ্যস্ত দৃষ্টি পড়লে মনে হয়, সে পাষাণ পদার্থ মাত্র।

কিন্তু সেই অনন্ত-প্রসারিত নিত্যকালের প্রাণলীলা আমাদের জীবযাত্রার মতই চঞ্চল ও স্পন্দমান। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আমাদের চারিপাশের বাস্তব পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে তার বাইরের অজানিত, নির্বাক পৃথিবী একযোগে যুক্ত হলে তবেই পৃথিবীর মানব-চেতনায় ব্রহ্মাণ্ডের মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়। মানব-চেতনার সম্মুখে এই সৃষ্টি পৃথিবী থেকে অনন্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে সবুজ ফুল-তোলা, জ্যোতি বিন্দুর বুটি-বসানো, নীলাম্বের রঙে রঙীন, অনন্ত নৈঃশব্দের এক যবনিকার মত, যার প্রান্তে প্রান্তে এই মর্ত্যজীবনের মুখরতা আর চাঞ্চল্য জরির পাড়ের মত বসানো। মানুষের মুখরতা আর চাঞ্চল্যের পাড়টি সেই অনন্ত নৈঃশব্দের যবনিকার থেকে পৃথক করে দেখলে কোনটিই সৃষ্টির সম্পূর্ণ মূর্তি হবে না। দুইকে এক করে একসঙ্গে দেখলে তবেই দুইয়ের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি হতে পারে।

অথচ মানব-চেতনায় এই দুইকে পৃথক করে দেখারই রেওয়াজ। যাঁরা এই অস্তিত্বের আস্বাদ আমাদের কাছে চিরকালের সামগ্রী করে বহন করে নিয়ে আসেন, সেই শিল্পীদের মধ্যেও কেউ বা এই পাড়ের কথা বলেছেন, কদাচিৎ কেউ এই পাড়হীন কাপড়খানির কথা, এই দুই ভিন্নের আস্বাদ ভিন্ন ভাবেই আমাদের দিয়েছেন; কেউ এটা দিয়েছেন, কেউ বা অন্যটা দিয়েছেন। কেউ বা এই মুখরতা ও চঞ্চলতার কবি, কেউ বা এই নৈঃশব্দের কাব্য রচনা করেছেন। কেউ বা কবি মানব-হৃদয়ের, কেউ বা কবি প্রকৃতি-চরিত্রের।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানব-হৃদয়ের এক কবি কথাশিল্পীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

বাসরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফেলা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠবো, আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে ?'

'সদর। ঘাটে না চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পাড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস, পাঁচী ?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু ?'

'পারবি ক্যান ?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দু দিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

[প্রাগৈতিহাসিক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

এ কাব্য একান্তভাবে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ মানব-হৃদয়ের। একটি মানব-দম্পতির একান্ত দেহের আধারে রচিত এক তীব্র তীক্ষ্ন কাব্য-কাহিনী। পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের শিল্পী ও কবির সংখ্যাই সমধিক। তার কারণও একান্ত স্পষ্ট। চারিপাশের ছড়ানো মানব-জীবন থেকেই তাঁরা শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার বাইরে তাকাবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনোটাই হয় নি তাঁদের।

আর এক শ্রেণীর স্রষ্টা আছেন যাঁরা ধাতুগতভাবে মানব-জীবনের প্রাণচঞ্চলতা, মুখরতা কোলাহল ও জনারণ্যের মধ্যে অবস্থান করেও এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে বা আত্মিক সম্পর্ক-শূন্য হয়ে এই প্রাণচঞ্চলতা, কোলাহল ও মুখরতার বাইরে যে নিঃশব্দ নির্বাক পৃথিবী তারই সঙ্গী, তারই অধিবাসী। এ যেন হয়েছেন তাঁরা বিচিত্রভাবে—জন্মসূত্রে। তাঁরা আপনার মনের ও প্রাণের স্থায়ী আবাসস্থল আবিষ্কার করেন ওই বিপুল-বিস্তার মৌন নির্বাকের মধ্যে। এ এক ধরনের মানব-প্রবৃত্তির উজানে বয়ে যাওয়া যেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এমন দুজন শিল্পীর রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি আপনাদের আস্বাদনের জন্য পরিবেশন করছি :

এক ॥

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।…

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁঝ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।…কেহ কোন দিন সে দিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া, মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোন দিন জানিবে না, ওড়্‌কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

[পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দুই ॥

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা ;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়ীটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে ;
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

[রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ]

এই দুই ক্ষেত্রে কোলাহল-মুখর মানবজীবনের বাইরে পরিকীর্ণ যে নিঃশব্দ পৃথিবী, মাটি জল গাছপালা থেকে আকাশ ও জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত যে নিঃশব্দ অস্তিত্ব তার কাব্যই শুধু এঁরা রচনা করেন নি, এঁদের রচনার চারিত্র্য বিচার করলে দেখা যাবে যে এঁরা এরই মধ্যে প্রাণের স্থায়ী ও অনন্ত আরাম আস্বাদ করেছেন। যে মানব-গৃহে এঁরা জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন সেই মানব-গৃহে মানবী-জননীর স্নেহে-সমাদরে তাঁদের স্থূল দেহটি লালিত হয়েছে, কিন্তু মন ও প্রাণটির পুনর্জন্ম হয়েছে এই অনন্ত রূপময়ী, মূক, অবজ্ঞাত ও অন্য-অজ্ঞাত প্রকৃতির সূতিকাগৃহে এবং তারই স্নেহে তাঁদের মন ও প্রাণ লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা প্রাণের এ জন্মের আরাম ও জন্মজন্মান্তরের ভুলে-যাওয়া চিরস্থায়ী আবাসকে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু তাতে অন্য দিকটি বাদ পড়ে গিয়েছে। কোলাহলময় মানবলোককে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। কেবল মানবলোক থেকে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে, মানবচিত্তের ও মানব-চরিত্রের সব ফেলে দিয়ে শুধু সেই সব বৃত্তি বা আবেগ বা অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে গিয়েছেন যা তাঁদের শ্রেয় আত্মিক আবাস অলংকরণ ও রঞ্জনের প্রয়োজনে প্রয়োজন। বাকীগুলিকে বর্জন করে গিয়েছেন।

দুই

কিন্তু আমাদের মহাকবির দৃষ্টি ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি এই কোলাহলমুখর মানবজীবনের মাঝখানেই জন্মেছিলেন, এইখানেই, এই ভূমিতেই আপনার জীবনব্যাপী সাধনার স্থির আসন পেতেছিলেন এবং এই ভূমিতে অবস্থান করেই সমগ্রের সাধনা করেছিলেন। কোলাহলমুখরতার মধ্যে অবস্থান করেও তাঁর দৃষ্টি এই মানব-লোকের দ্বারা মাত্র সীমাবদ্ধ হয় নি, তা স্থির ও ধ্রুবভাবেই চিরকাল যুক্ত ছিল কলরব-মুখরিত জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে দূরতম জ্যোতিষ্কলোকের মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত। তাই তাঁর পৃথিবী অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং সেই অনন্ত প্রসারিত সংসারকে নিত্যউৎসবময় রূপে নিরীক্ষণ করতেন তাঁর বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর অগণিত গানে জ্যোতিষ্কলোকের অজস্র, একান্ত সহজ উপমা এই অভিজ্ঞতার স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই নিত্যউৎসবময় সংসারে, 'সুন্দর ভুবনের মাঝখানে, মানবের মাঝে' তিনি বসে এই অনন্তপ্রসারিত নিত্যউৎসবের আনন্দধারা পান করছেন।

তাঁর এই আনন্দ আস্বাদ, আমার যত দূর মনে হয়েছে, মোটামুটি দুই ধরণের মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এক প্রত্যক্ষ রূপকে আস্বাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতা, অন্যাটি রূপকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যমাধুরীলব্ধ ধ্যানের তন্ময়তা থেকে আনন্দ-আস্বাদের অভিজ্ঞতা। চরিত্রে প্রথমটি প্রধানত লৌকিক, দ্বিতীয়টি চরিত্রে মূলত আত্মিক। লৌকিক রূপময়তায় আত্মিক স্পর্শ লেগেছে কোথাও, আবার কোথাও আনন্দময়তা রূপকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠে আত্মাকে ধ্যানমগ্ন করেছে। আনন্দাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ। এই রূপপ্রধান ও আনন্দপ্রধান স্বরূপের দুটি নমুনা আপনাদের আস্বাদের জন্য পরিবেশন করছি ঃ

এক ॥

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।

[সুখ ঃ চিত্রা]

দুই ॥

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।

হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তুই দিতেছে নিঃশব্দে করতালি।

[১৪নং কবিতা ; জন্মদিন]

প্রথমটিতে পরিপূর্ণ রূপময়তা আনন্দের স্পর্শ বহন করে প্রকাশিত আর দ্বিতীয়টিতে আনন্দময়তা শরতের সোনালি আলোয় স্নাত হলদে ফুলের মতই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

বর্তমান আলোচনায় আমার আলোচনার বিষয় পল্লীপ্রকৃতি ; সেই কারণে আমি আমার বক্তব্য পল্লীপ্রকৃতির রূপময় প্রকাশের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

তিন

পূর্বে বলেছি, মহাকবি কোলাহলমুখর, কর্মচঞ্চল মানবজীবনের মাঝখানে জীবনের ধ্রুব আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই অতি-বাস্তব ও চঞ্চল-মুখর জীবনের বহির্দেশে নিত্যকাল অনন্ত-প্রসারিত নিঃশব্দ, নির্বাক জীবনের সঙ্গে চিরকাল আপনার কাব্য-চেতনার মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ ছিলেন। সেই কারণে প্রকৃতি-অভিমুখী ও প্রকৃতি-প্রেমিক অন্যান্য শিল্পীদের মত মানব-অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রকৃতির মূর্তি ও প্রেম প্রকাশিত হয় নি। তাঁর প্রকৃতির ধ্যানের মাঝখানে সব সময় মানুষের ধ্রুব আসন পাতা থাকত। প্রকৃতির মূর্তি তাঁর শিল্পে তাই সর্বদা মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধনে যুক্ত। এই বোধকে ও প্রবণতাকে তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রায় প্রারম্ভেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তরুণ কালের রচনা কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতাটিতে তিনি আপনার কবিচিত্তের প্রবণতা আবিষ্কার করে উচ্চারণ করেছিলেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

[প্রাণ : কড়ি ও কোমল]

পরিপূর্ণ মানব-অস্তিত্বের যে ধ্যান ও বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তাতে নিজের কবিশক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি বিগ্রহহীন শূন্য সিংহাসনের মত ; আর প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানব অস্তিত্ব সিংহাসন-মহিমাহীন বিগ্রহের মত। তাই সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য, শোভা ও মহিমামণ্ডিত প্রকৃতির সিংহাসনে তিনি মানব-বিগ্রহকে স্থাপন করেছিলেন। দুইয়ে একত্রিত ও যুক্ত হলে তবেই মানব-অস্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। মহাকবির শিল্প-চেতনায় এ কোন পূর্ব পরিকল্পনা নয়। এ বোধটি প্রথম থেকেই তাঁর কাব্য-চেতনায় নিহিত ছিল ; প্রথমে অস্ফুট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তা পরিস্ফুট হয়ে দিনে দিনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী শিল্প-সাধনার মধ্যে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'পূরবী' পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে এর প্রকাশ লক্ষণীয় :

এক ॥

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেল চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।

স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ-বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
... ...
ভাবিতেছে মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
[যোগিয়া : কড়ি ও কোমল ১২৯৩]

দুই ॥

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।
সেই মতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি —
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।
[১৪ সংখ্যক কবিতা : বলাকা ১৩২১]

তিন ॥

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখাশুনা হল হারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর ;
[পূর্ণতা : পূরবী ১৩৩১]

কবি-জীবনের প্রথম কাল থেকে একান্ত পরিণত কবি-কর্মের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাকবির কবি-কৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে, যে সব কবিতায় তিনি পল্লীজীবনের লৌকিক চিত্র এঁকেছেন সে অভিজ্ঞতা, বলা বাহুল্য, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্নতর আনন্দ-আস্বাদের উচ্চ ভূমিতে উত্তরিত হয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কল্পনার একটি বিশেষ গড়নের আভাস পাওয়া যায়। অজস্র ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য-সম্ভারের যে রাশি রাশি সম্পদ প্রকৃতি আমাদের অগোচরে একান্ত নিঃশব্দে আমাদের চতুর্দিকে থরে থরে নিত্যকাল ধরে অম্লান উপহারের সামগ্রী হিসাবে সজ্জিত করে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে, তারই মধ্যের কোন সামগ্রী কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। কবি সেই উপকরণ দিয়ে আপনার কল্পনার দোলমঞ্চ রচনা আরম্ভ করলেন একান্ত চারু রুচিতে। অপরূপ দোলমঞ্চ রচিত হয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হল, কিন্তু পরিপূর্ণ হল না ; সেই মুহূর্তে সেই সজ্জিত মঞ্চের নেপথ্য থেকে হাত ধরাধরি করে এসে ঢুকল মানুষ আর মানবী, এসে তারা দুজনে বসল সেই মঞ্চের মাঝখানে ; অমনি কবির কল্পনায়, পাঠকের হৃদয়ে গান বেজে উঠল ; রসাপ্লুতচিত্ত পাঠক পরিতৃপ্ত হয়ে বলে উঠল, এইবার পরিপূর্ণ হয়েছে। মানুষে প্রকৃতিতে, প্রেমে সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে পরম স্রষ্টার অমূর্ত পরিকল্পনাটিকে মর্ত্যলোকে পূর্ণ প্রকাশিত করে তুলল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এইটি অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। সৌভাগ্যক্রমে—সৌভাগ্যক্রমেই বলব, কারণ একে সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি—মহাকবি জীবন সম্পর্কে এই সমগ্র দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাধারণত অধিকাংশ শিল্পীর জীবন ও দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের মতই, খণ্ডিত হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অভিজ্ঞতা মানব-লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে অধিকাংশ শিল্পী মানব-জীবনের কবি ও কথাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার কেউ কেউ বা প্রবণতাগুণে প্রকৃতির রাজ্যেই নিজের আবাস সংগ্রহ করে নেন। যাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই নিজের আবাস খুঁজে পান তাঁরা মানব-লোকের দিকে বড় একটা মুখ ফেরান না ; ফেরালেও সেখানকার ধূলোমাটির রঙে রঞ্জিত না করে কাউকে তাঁরা তাঁদের ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার দেন না। মোট কথা, দুই ক্ষেত্রেই সেখানে জগৎ খণ্ডিত। মহাকবির কাছে জগৎ খণ্ডিত ছিল না ; তিনি সমগ্রকেই একেবারে লাভ করেছিলেন কবিসত্তার আবির্ভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতের সময়েই যে জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটেছিল সে জগৎ মানবলোক ও প্রকৃতিলোক দুই মিলিয়ে সমগ্র জগৎ। আর সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে যার স্থিতি সে মানুষ। তাই তাঁর কবিদৃষ্টি যেমন সামগ্রিক তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রতিমা গঠনের সময় দেবমূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চারিপাশে চালচিত্র করা হত, মহাকবির বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কেও তাই বলা যায় ; তাঁর ভাবজগতের কেন্দ্রস্থলে মানুষের বিগ্রহ, আর তার চারিপাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যময়, মহিমান্বিত সজ্জা।

চার

যে প্রকৃতিকে মহাকবি মানবজীবনের মত সর্বত্রই দেখেছেন, তাকে স্বদেশে দেখেছেন, বিদেশে দেখেছেন ; তাকে নগরে দেখেছেন, পল্লীগ্রামে দেখেছেন। নগরে প্রধানত যেমন

মানবলোককেই পেয়েছেন তেমনি পল্লীতে প্রধানত প্রকৃতিকেই পেয়েছেন। এক জায়গায় প্রধানত মানুষের সান্নিধ্য, অন্যত্র প্রধান সান্নিধ্য প্রকৃতির। পল্লী অঞ্চলে তাই মানুষও প্রকৃতির অংশ। পল্লী অঞ্চলে নির্জনবাসের কালে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি :

হেথায় তাহারে পাই কাছে—
যত কাছে ধরাতল যত কাছে ফুলফল—
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশিরনির্মলা উষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি ;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি। [পল্লীগ্রাম : চৈতালি]

এ এমন এক সংসার, যা নির্মল, সুন্দর, প্রশান্ত, নম্র, সহজ এবং বহু সমস্যার অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমস্যাহীন। এ যেন এমন এক সংসার, যেখানে ঈশ্বর স্বর্গে অধিষ্ঠিত আর মর্তলোকে সবই নিয়মমত চলছে। পল্লীগ্রামের সব সমস্যাই মহাকবি জানতেন, সেখানকার দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তা সত্ত্বেও নিত্যকালের প্রকৃতির পটে মানব জীবনের যে নির্মল, নম্র, সহজ, প্রশান্ত নিত্যমূর্তির প্রকাশ তা পল্লীর পরিবেশে স্পষ্টতর মূর্তিতে প্রকাশিত। সৃষ্টির সর্বত্রই এ রূপের অব্যাহত প্রকাশ ঘটছে, কিন্তু সর্বত্র তাকে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে ধরা যায় না। যেখানে মানুষের প্রাণধারা অপেক্ষাকৃত কম মুখর, বেশী নির্জন, যেখানে মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ও দৃশ্যের মিলিত অস্তিত্বকেও চিনতে পারা যায়, সেই পল্লীর মধ্যেই একে আবিষ্কার করা সহজ। দৈনন্দিন মানব-জীবন, যা সেই বিশেষ দিনটির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সকল লাভ-ক্ষতি, মুখরতা-স্বার্থ, কোলাহল-কলরব নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরদিনের জন্য মানুষের হৃদয়ে কোন সঞ্চয় রেখে যায় না, সেই দৈনন্দিন মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের এই নিত্যমূর্তির সংযোগ না ঘটলে মানব-জীবন রসের যোগানে সরস ও পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ব হয় না। সেই পরিপূর্ণতার সহজ উপকরণ তিনি পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত ভাণ্ডারের মত দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছেন।

আমি যদিও মানব-জীবন ও প্রকৃতি এই দুইকে আমাদের সাধারণ ও সচরাচরের অভ্যাসবশত পৃথকভাবে বার বার উল্লেখ করেছি, মানব-অস্তিত্বের সমগ্রতার দৃষ্টিতে এ দুই কখনও বিচ্ছিন্ন নয় ; এ সর্বদা এক ও অবিভাজ্য। মহাকবির মানব-জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিও

সর্বদা সেই সমগ্রতাবোধের দ্বারা চিহ্নিত এবং তাঁর চেতনা সর্বদা এই সমগ্রতাবোধে সজাগ ছিল। দুইকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টি তাঁর ছিল না। তবে জীবনের, চিন্তার ও শিল্পের প্রয়োজনবোধে সেই সমগ্রের বৃহৎ পরিধির এক এক স্থানে এক এক সময় চেতনার আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই মাত্র। একের কথার সঙ্গে অন্যের কথা স্বতই এসে পড়েছে, একের আলোকিত মূর্তির পশ্চাতে অন্যের অস্তিত্ব সর্বদাই আভাসিত হয়েছে। মানুষ পল্লীর পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত; শুধু তাই নয়, সেখানে সে বৃহৎ প্রকৃতির অংশমাত্র। শিল্পকর্ম নয়, মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ নীচে নিবেদন করছিঃ

> শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মত ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তারপর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড় বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।
>
> [ছিন্নপত্রাবলীঃ ১৪ সংখ্যক পত্র]

এ ছাড়া মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল পর্যন্ত রচিত গল্পগুচ্ছের কম বেশী পঞ্চাশটি গল্প এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন বহন করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পৃথিবীর গল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সবিনয়ে এ কথা বলতে পারি যে মানুষে প্রকৃতিতে মাখামাখির এমন রসময় স্বাদু অভিজ্ঞতা সাহিত্যের বৃহৎ ও উজ্জ্বল ইতিহাসে কমই আছে। নদীমাতৃক, শ্যামল, কোমল বাংলা দেশের নিভৃত অন্তঃপুর—সেখানে এক দিকে দূর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা প্রান্তর, অন্য দিকে বিপুল-বিস্তার শুভ্র বালুকারাশি, মাঝখানে কলস্বরা খরস্রোতা পদ্মা ও তার বিভিন্ন জলধারার প্রবাহ; মাথার উপরে অনন্ত-বিস্তার আকাশ; নদীর দুই দিকে কোথাও দূরে ও কোথাও নিকটে আম-কাঠাল-বট-অশথ-শিরীষের প্রাচীন বনশোভার ভিতরে ও আড়ালে কোটোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রাণভোমরের মত ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরের সমাবেশে বাংলার পল্লীগ্রাম। এই বৃহৎ, নিঃশব্দ, প্রশান্ত প্রকৃতির পটভূমি, যার দিকে সারা আকাশ সকলের অগোচরে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে, সেই শব্দহীন বৃহতের কোলে ছোট ছোট পুতুলের মত মানুষের সহজ ও জটিল জীবনের ছোট ছোট হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের লীলা।—যা বড়ই ছোট, যার উচ্চরোল এই বৃহৎ নৈঃশব্দকে সামান্যই বিঘ্নিত করে, যার সুখ-দুঃখ এই অনন্ত-বিস্তৃত উদাসীনতাকে সামান্যই স্পর্শ করে। জীবনের এমন সমগ্র মূর্তি শিল্প-অভিজ্ঞতার মধ্যে কদাচিৎ আস্বাদ করা যায়। এই ভীষণ নীরব, বিপুল-বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিতে কোলাহলময় মানব-জীবন যেমন অনুপাতে একান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, এবং একান্ত তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও যেমন তার বৈচিত্র্যের শেষ নাই, বিশাল পদ্মার দুই নিভৃত পল্লীর মানুষের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীবনের দুঃখ-সুখের বৈচিত্র্যের তেমনি অবধি নাই। আবার এই ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে আবেগ ও প্রবৃত্তি পদ্মা-মেঘনার চেয়েও দুর্বার, প্রবল এবং দুস্তর। প্রকৃতির বিশাল ও নিভৃত পটভূমিতে মানব-আবেগের এই গল্পগুলি রচনার পর দীর্ঘকাল পার হয়ে গিয়েছে; তারপর থেকে পদ্মার অনেক জলধারা বয়ে গিয়েছে, দেশের ইতিহাসে এবং মানুষের মনে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু আকাশ ও মৃত্তিকার শুক্তির আবরণের মধ্যে বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের যে লুকানো মুক্তা মহাকবি

শুক্তিপেটিকার আবরণের মধ্য থেকে আমাদের জন্য উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন তা এখনও অম্লান লাবণ্যে ঝলমল করছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে জলের মধ্যে কতটা মাটি মেশানো আর মাটিতে জলের অংশ কতখানি তা নির্ণয় করা যেমন দুরূহ, তেমনি এই গল্পগুলিতে কতটা মানুষের মৌল আবেগ আর কতটা প্রকৃতির নিঃশব্দ ক্রিয়া আছে তার সীমারেখা টানাও তেমনি কঠিন। নীচের আশ্চর্য অংশটিতে এক অন্ধ বধূর অভিজ্ঞতা তার অপরূপ সাক্ষ্য বহন করছে :

> অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশির-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল ; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্বগান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না ; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশির-স্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লীসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন ; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ী হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

[দৃষ্টিদান : গল্পগুচ্ছ]

এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চরম সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনের বাইরে যে বৃহৎ নিঃশব্দ সংসার, যাকে প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছি, সে তার সকল সম্ভার উদ্যত করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্কই আমাদের এত ব্যাপৃত করে রাখে, আমাদের ক্ষুদ্র, বস্তুনির্ভর ও নিকট-নির্ভর মন তাতেই এত নিমগ্ন থাকে যে আমরা সেই গণ্ডীর ওপারে তাকাই না। অথচ সে নিঃশব্দে দিয়েই যাচ্ছে, তার সব দেবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। অথচ আমাদের তা খেয়ালে থাকে না। তাই দৈব-দুর্বিপাকে কোন দিন জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে, যখন মানুষ হারিয়ে যায়, আর চাইলেও যখন মানুষকে পাওয়া যায় না, তখন যে চিরকাল নিঃশব্দে, অনন্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আছে ও থাকে আমাদের জন্য, সে সস্নেহে তার অনন্তবাহু বেষ্টন করে আমাদের জড়িয়ে ধরে। সেই তখন পরমাশ্বাসে আশ্বাস দেয়, সব অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ও স্বাদের সম্ভার নিয়ে, সেই সম্ভারের স্মৃতি নিয়ে, মানব-জীবনের আদি অস্তিত্ব ও আদি আনন্দ যা

থেকে উদ্ভূত। উপরের উদ্ধৃতিতে একটি তরুণী পল্লীবধূ চিকিৎসার দোষে অন্ধ হয়ে যাবার পর, যখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে হারিয়ে গেল তখন চিরকালের নিঃশব্দ প্রকৃতিই তাকে মায়ের মত তার সকল সান্ত্বনা ও সকল ঐশ্বর্য নিয়ে এসে স্মৃতি ও অনুভব দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে।

পাঁচ

জননী-স্বরূপা বাংলা দেশের অপরূপ স্নেহ-সজল মূর্তি মহাকবির দুই চোখ, চিত্তলোক এবং কল্পনাকে চিরকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল। দেশের মাটির দিকে চোখ মেললেই তাঁর দুই চোখ মুগ্ধতায় আবিষ্ট হত ; চোখ বন্ধ করলে তারই ছবি সমস্ত মনকে প্রেমে, সৌন্দর্যে ও রসে পরিপ্লুত করত। তাঁর সমস্ত জীবনের সুবৃহৎ রচনা-সম্ভার তার সাক্ষ্য সগৌরবে বহন করছে। তিনি পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে বার বার গিয়েছেন এই বিপুলা পৃথিবীর বহু বিচিত্র সৌন্দর্যকে আস্বাদন করেছেন। তাদের সেই বিচিত্র বার্তা তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষ ধরা নেই। কারণ তাঁর বড় প্রেমের, বহু মুগ্ধতার আধার বাংলা দেশের প্রকৃতি তাঁকে চিরকাল তার সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, ভুলিয়ে রেখেছিল। বোধ হয় সে হৃদয়ে দ্বিতীয় কোন মূর্তির স্থান ছিল না।

এই বাংলা দেশের প্রকৃতিকে তিনি কত মূর্তিতেই না এঁকেছেন। বার বার তার ছবি, তার সৌন্দর্য এঁকেও যেন তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত হয় নাই। বার বার বোধ হয় মনে হয়েছে যা দেখেছেন তাকে বোধ হয় পুরো রূপ দেওয়া হয় নাই। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে এই সৌন্দর্য-মূর্তির সহর্ষ প্রকাশ তাই স্বভাবতই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

শুধু সৌন্দর্য-মূর্তি নয়, তার সঙ্গে ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি বলতে আমি সেই চিরন্তন মানব-ভাবনার কথাই বলতে চাচ্ছি—যে ভাবনায় এই বিশ্বের মানব-জীবন সাধনায় সেই পরম রহস্যকে আবিষ্কার করার তপস্যা আছে, আকূতি আছে, সেই রহস্যকে চকিতে স্পর্শের আনন্দ-স্বাদ আছে ; যা নাকি বিশ্বমানবের মহত্তম অবিনশ্বর উত্তরাধিকার, যা আছে আমাদের দেশে বেদান্তে-উপনিষদে, যা আছে রামায়ণে-মহাভারতে ও বিশ্বের এই জাতীয় সাহিত্যে, সংগীতে সংস্কৃতিতে। সেই ভাবমূর্তিকেও তিনি বিচিত্রভাবে বাংলার পল্লীর জীবন-সাধনার মধ্যে, সংগীতের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

তারই কথা আমার বক্তৃতার শেষ কথা।

'অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা'। মহাকবিরই নিজের কথা। রবীন্দ্রনাথ অনেক নিয়েছেন পল্লীগ্রাম, পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন ও পল্লীসাধনা থেকে—এই কথাটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে সকলের কাছে। দিয়েছেন তিনি অনেক। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনাই দিয়ে গেছেন। যা নগর পেয়েছে তাই পল্লীও পেয়েছে। কিন্তু নিয়েছেন কি ?

রবীন্দ্রনাথের সকল কীর্তিই অনন্যসাধারণ। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতই বোধ করি সর্বোত্তম। রবীন্দ্রসংগীত শুধু শিল্প নয়, রবীন্দ্রসংগীত একাধারে তাঁর জীবনসংগীত এবং সাধনাসংগীত। ভারতীয় মার্গসংগীত নিয়ে তাঁর সংগীত সাধনার শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মসংগীত এবং কিছু প্রকৃতি নিয়ে, কিছু প্রেম নিয়ে, কিছু পূজা নিয়ে সংগীতও তাঁর মধ্যে আছে। কিন্তু তার বিচিত্র এবং পরমানন্দময় স্বতস্ফূর্ত উৎসার এবং প্রকাশ ঘটেছে বাংলার কীর্তনাঙ্গ, বাউল ও লোকসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর।

ভারতজীবনের প্রাণধারা-স্বরূপিনী গঙ্গা যেমন বাংলায় ঢুকে ভাগীরথী ও পদ্মা দুইভাগে

বিভক্ত হয়ে গেছেন, ভারতীয় সংগীত বাংলায় তেমনি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাংলার লোকসংগীত ও মার্গসংগীত ভাগীরথীর মত এখানে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ভাবজগতের প্রকাশেও আশ্চর্য প্রভেদ ঘটেছে। বাংলার বাউল, কীর্তন ও শাক্তসংগীতের মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এইখানে এসে সেই মহান সম্পদ-ভাণ্ডার, যা নাকি গুপ্তধনের ধনভাণ্ডারের মত, তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত পেয়েছিলেন এবং সেই ভাণ্ডারকে তিনি জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

যে মহাকবি ও জমিদার জমিদারী কাছারীতে পল্লীবালকদের মুখস্থকরা সংস্কৃতবহুল সাধুশব্দে রচিত বক্তৃতা শুনে বহুকষ্টে হাস্যসম্বরণ করেছিলেন, তিনিই লালন ফকীর, গগন হরকরা প্রভৃতিদের মত বাংলার বাউলদের কাছে তাদের গোপীযন্ত্র ও একতারা সহযোগে খাঁচার অচিন পাখীর আনাগোনার গান শুনে তার মধ্য থেকে—'যে দিন পড়বে না মোর চরণচিহ্ন এই বাটে' জাতীয় গান দিয়ে বাঙালীর জীবনকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ; এবং এই গান গাইতে গাইতেই বাংলার পল্লীর মাটিতে পা রেখে আকাশে মাথা ঠেকিয়েছিলেন। বাংলার বাউল-সংস্কৃতি বাউল-সংগীত, কীর্তন গান, বৈষ্ণবকাব্য— যার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বার্তা কাল থেকে কালান্তরের নব রসায়নে এক অভিনব লোকায়ত মূর্তি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপেক্ষা করছিল—এই সব কিছু তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল এক অভিনব সম্পদের ভাণ্ডার। এই বাউল গান, বাউল-সংস্কৃতি, কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবকাব্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে নবজন্ম লাভ করেছে সেই নবজন্মেই বাংলা সাহিত্য অমৃতে পরিণত হয়েছে।

মহাকবির সমসাময়িক কীর্তিমানদের ও পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁর শিল্পকর্মকে স্থাপন করলেও এর প্রমাণ মিলবে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনার উদ্দেশ্য অন্য কোন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মহাকবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের চেষ্টা নয়, কেবলমাত্র শিল্প-চরিত্র বিশ্লেষণ করা। মহাকবি মধুসূদন বলতে গেলে তাঁর সমসাময়িক দেশ ও কাল থেকে সামান্যই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবি-কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল পশ্চিমের এক মহাকবির কাব্যকীর্তি থেকে। তাঁর উদ্দীপ্ত কবি-কল্পনা তার রুচি অনুযায়ী আপনার কাব্যের অধিকাংশের আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে আমাদের দুই মহৎ কোর গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা ত্যাগ করে যে কবি 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে মাতৃভাষার শরণ নিয়েছিলেন তিনিও একেবারে অলঙ্কারহীন ভাষায় কথা-বলা, সম্পদহীন, ঐশ্বর্যহীন সমসাময়িক বঙ্গজননীর কোলে ফিরে আসতে পারেন নি। তিনি যে দেশজননীর কোলে ফিরেছিলেন কল্পনারাজ্যে, তিনি আত্মিক সংস্কৃতি ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য ও বীর্যের বহুতর অলঙ্কারে ভূষিতা, ঐশ্বর্যশালিনী প্রাচীন ভারতভূমি। ত্রিকালদর্শী ঋষিতুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার অতীত বঙ্গদেশ ও ইতিহাস, ঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের অন্যত্র ছুটে গিয়েছেন তাঁর কল্পনার নবতর ক্ষেত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। এত বড় দুজন মহান শিল্পীর দৃষ্টি বাংলার পল্লীর দিকে ঠিক নিবদ্ধ হয় নি। বৃহৎ দেশ সমগ্রভাবে যে পল্লীগ্রামে স্থাপিত তাঁরা সেই পল্লীগ্রামকে দিতে চেয়েছেন কিন্তু পল্লীর সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে চান নি বা তাঁদের যেন তার সুযোগ হয় নি।

এই গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপরেই শিল্পীর শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের মাতৃভূমিকে এবং সমসাময়িক কালকে যেমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। নিজের কালকে, নিজের দেশকে, নিজের সমসাময়িক মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার মূল্যেই এ আশ্চর্য ইন্দ্রজাল সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেমন তাঁর সুমহৎ গৌরব আছে তেমনি দেশের সমগ্রকে সপ্রেমে বুকে তুলে

নেওয়ার মধ্যে যে দ্বিগুণ গৌরব আছে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। দেশের সমগ্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণের গৌরবে গৌরবান্বিত মহাকবি আমাদের দ্বিগুণ শ্রদ্ধার পাত্র।

ছয়

আমার বয়স সত্তর পার হয়েছে ; পৃথিবীর মূর্তি আমার কাছে আজ অনেক পরিমাণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে ; দিনান্তের ঘণ্টার গভীর ধ্বনি যেন সকল কোলাহলের ওপার থেকে মধ্যে মধ্যে মনে এসে প্রতিধ্বনি তোলে। শেষ খেয়ায় পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত হবার দিন সমাগত। পুরনো বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে সমসাময়িক কালে একই গ্রামের সীমানায় পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলাম তাদের সকলেই প্রায় বিগত। শেষ জন যিনি ছিলেন তিনি আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু এবং একান্ত পরমাত্মীয়। এবার শরতের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শুধু বাইরের সামগ্রী গোছানো নয়, নিজের মনকেও প্রস্তুত করছি। এমনি সময়ে শরতের এক প্রভাতে অকস্মাৎ বাড়ির ভিতর থেকে কাঁচ কলকণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে পেলাম। কান পেতে শুনতেই বুঝলাম আমার পাঁচ বছরের পৌত্রী কলকণ্ঠে আবৃত্তি করছে :

আশ্বিনে হাট বসে
ভারী ধুম করে,
মহাজনি নৌকায়
ঘাট যায় ভরে।
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
মহা সোরগোল—
পশ্চিমি মাল্লারা
বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর
চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে
জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে
সোনা রোদ্দুরে।

[আগমনী : চিত্র বিচিত্র]

মুহূর্তে মন উজান বেয়ে আমার বালক কালের দিকে মুখ ফেরালে। সেই দিনই এক সুযোগে 'চিত্র বিচিত্রে'র কবিতাগুলি একবার উলটে দেখলাম। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রেখা-চিত্রগুলির পথ ধরে উজান-বাওয়া, বালক কালের দিকে মুখ-ফেরানো মন সোজা এগিয়ে চলল মনে মনে। হিমের পরশ-লাগা হাওয়ায়, ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা-ধরা পথ বেয়ে,

বুক-দুরুদুরু, কাঁপা আমলকী বনের পাশ দিয়ে, কুঁড়ি-ভরা শিউলীর ডালে হাত ছুঁয়ে, বর্ষণশেষে ছাড়া-পাওয়া মেঘের নীচে নীচে, ছুটির ছোঁয়াচ-লাগা সোনার আলোয় মন এগিয়ে চলল। যে তারাগুলি বাতি নিয়ে সারা রাত জেগে সকাল বেলা বেলফুল আর জুঁইফুল হয়ে নেমে এসেছিল তারা কবে মিলিয়ে গিয়েছে, তারা আর নেই। মন চলল এগিয়ে। আমাদের পাড়াখানি ছায়ার ঘোমটা টেনে পাশে পড়ে রইল; পড়ে রইল চারিভিতে তালবন নিয়ে পাড়ার মাঝখানের দীঘিটি। চলতে চলতে শরৎ গেল, হেমন্ত গেল, শীতের ছোঁয়া লাগল। মন পেঁছে গেছে বক্শিগঞ্জে পদ্মাপারে যেখানে শুক্রবারে হাট বসেছে। সঙ্গে ভাগনে মদনকে নিয়ে কুমোরপাড়ার বংশীবদন কলসী-হাঁড়ি বোঝাই করে গোরুর গাড়ি নিয়ে চলেছে। হাট ছেড়ে ততক্ষণে পেঁছে গিয়েছে মন মোতি বিলের ধারে যার 'বহুদূর জল, হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল', 'পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে, মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে'। মোতি বিল ফেলে রেখে মন আবার ফিরে এল নিজের পাড়ায়, যেখানে 'ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি, খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি'; 'বিধু গয়লানি মায়-পোয়, সকাল বেলায় গোরু দোয়'; 'আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই'; 'বড়ো বউ মেজো বউ মিলে ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে'। অঘ্রাণ সারা হয়েছে, নদীর ধারা স্বচ্ছ, শিরীষের পাতা ঝরতে শুরু করেছে; 'ওপারে চরের মাঠে, কৃষাণেরা ধান কাটে, কাস্তে চালায় নতশিরে'। 'শুকনো খালের তলে, এক হাঁটু ডোবা জলে বাগদিনি শেওলায় পাঁকে', বুকে আঁচল এঁটে, জল ঘাঁটাঘাটি করে মাছ ধরে চুবড়িতে রাখে'। ওই দূরের রাস্তা দিয়ে, বউ চলেছে চৌগাঁয়ে, ঝি-বুড়ি চলেছে বাঁয়ে', বউয়ের পালকি কাপড়ে ঘেরা; বেলা বেড়ে চলেছে, তাই হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে বাহকেরা হন হন করে ছুটেছে। পৌষে মেলা বসেছে। 'শীতের দিনে নামল বাদল বসল তবু মেলা', 'বিকেল বেলা ভিড় জমেছে ভাঙল সকাল বেলা'। পথে দেখি, 'দু-তিন টুকরো কাঁচের চুড়ি রাঙা', 'তারি সঙ্গে চিত্র-করা মাটির পাত্র ভাঙা'। মন শীত পার হয়ে বসন্তের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। ডিম ডিম রবে দুন্দুভি বেজে ওঠে, সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব। 'পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়'। তারই গায়ে গায়ে 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল', 'ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল', 'চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়' 'বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণা বায়'। বসন্তের সীমা শেষ হয়, মন এসে দাঁড়ায় বৈশাখের দিনে গ্রামের ছোট নদীটির ধারে। আমাদের সেই ছোট নদী যা চলে বাঁকে বাঁকে, 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে', 'পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি', 'দুই ধারে উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি'। সেখানে 'চিক্ চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা, সেখানে 'কিচ কিচ করে খালি শালিকের ঝাঁক', 'রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের ডাক'। তারপর একদিন বর্ষার ঝোড়ো রাত পার হয়ে গেল, বাদল-ধারা নামল, চন্দ্র তারা লুপ্ত হল, বাতাস থেকে থেকে আকাশকে হানা দিল। আবার এক শরতের দিনে মন ফিরে এসে দাঁড়াল গঞ্জের বাঁয়ে অঞ্জনা-নদীতীরে। সামনে সন্ধ্যা নামছে। সূর্যের অন্তিম আলো রক্তিম আকাশের শেষ কিনারায় হারিয়ে গেল; সামনে সংগীতহীন অন্ধকার; অনন্ত অন্ধকার!

মন আমার পাঁচ বছরের পৌত্রীর হাত ধরে যেন সমগ্র বাংলা আর সমগ্র ঋতুচক্র পরিক্রমা করে আবার অঞ্জনা নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। ভুলে গিয়েছি যে আমি পরিণত-বয়স্ক মানুষ, আমি শিশু নই। কিন্তু সামনের প্রসারিত অন্ধকারের কথা আমাকে আবার আমার বাহাত্তর বৎসর বয়সে ফিরিয়ে আনলে। তবু একবার, জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলা দেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম। এই মাটিতেই মহাকবির মত, আপনাদের মত আমারও জন্ম হয়েছে, এই দেশেরই.আলো, বাতাস, গাছপালা, জলধারা, অন্ন আমার দেহমনকে লালন, পুষ্ট

ও শুশ্রূষা করেছে. এই মাটির মানুষদের ভালবাসায় কৃত-কৃতার্থ হয়েছি, এই ভাষাতে হেসেছি কেঁদেছি ; একান্ত দুঃখের দিনে, হতাশার মুহূর্তে এই আলো বাতাস মাটি আমাকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত মনকে আরোগ্য করেছে, এখানকার প্রকৃতিই আমার শেষ ও শ্রেয় আনন্দের আশ্রয়, এখানকার মৃত্তিকাতেই আমার দেহভস্ম মিশে যাবে, আমার প্রাণ এই দেশের আকাশেই মহাব্যোমে বিলীন হবে। যে কবি আমাকে আমার সেই দেশকে চিনিয়েছেন, হাতে ধরে তার গোপন অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছেন, পরম সমাদরে এখানকার মাটির একটি তিলকে আমার নম্র ললাটকে অলংকৃত করে দিয়েছেন তাঁকে আমি কি নিবেদন করব ? শুধু আমার প্রণাম নয়, শ্রদ্ধা নয়, তাঁকে আমি আমার সমগ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয় নিবেদন করলাম।

সাত

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। আমার বক্তৃতামালায় কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা ছিল না, সাহিত্যশিল্পের বিচার এবং বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এবং সে আমার সাধ্যের বস্তুও নয়। রবীন্দ্রনাথ নামক যে মহাকবি আমাদের জাতির বহু পুণ্যফলে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার একক প্রভাবে একটি জাতির মধ্যে অতি বৃহৎ তুলনাহীন পরিবর্তন এক কি দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তিনি তাঁর দেশের নগরজীবনের বাইরে গ্রামে দেশের যে মূল জীবন প্রবহমান, যা তাঁর কাছে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে মনে হয়েছে, আমি সেই স্বদেশের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, ধ্যান ও চিন্তার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। পল্লীর মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি এই তিনে মিলে ত্রিমূর্তি শংকরের মতই স্বদেশ তাঁর ধ্যানবস্তু ছিল। মহাকালের যে অক্ষমালায় পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ, সম্পন্ন উচ্চবর্ণ থেকে অন্তেবাসী মানুষ পর্যন্ত একই সম্মানে ও শ্রদ্ধায় বিধৃত, মহাকবি তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ ধাতুগত প্রেম ও জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই অক্ষমালাতেই রসের মন্ত্র জপ করেছেন, এবং আত্মিকভাবে নিজেকেও স্বদেশের অসংখ্যের একজন বলে একান্ত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে অনুভব করেছেন, এবং সেই অনুভবের মধ্যেই যে তাঁর নরজন্মের চরিতার্থতা নিহিত তাও উপলব্ধি করেছেন। তাই জীবনের অন্তিম পর্বে জীবনব্যাপী সাধনা সমাপনের শেষ লগ্নে নিজের পরিচয় বিবৃত করতে গিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে শেষবার উচ্চারণ করেছিলেন :

সেতারেতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।"

সেই 'আমাদেরি লোক', আমাদেরই স্বজন রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। জীবিতকালে তিনি আমাদের স্বজন হয়েই আমাদের জন্যই জীবন-সাধনা করেছেন. আজও তিনি আমাদের স্বজন রয়েছেন. ভবিষ্যতেও অনাগত দিনে তিনি 'আমাদেরি লোক' হয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে পরম প্রেমের আসনে বিরাজ করবেন।

ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথরেখা ধরে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়, কখনও আলোয় কখনও অন্ধকারে আমাদের মাতৃভাষাভাষী ভাবীকালের প্রজন্ম একের পর এক পথ চলবে, আর সেই ভবিষ্যৎ প্রাণযাত্রার মিছিলের যাত্রীদের মুখের ভাষায়, কণ্ঠের গানে, হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের

আবেগ, চিন্তা ও মননে চিরস্থিতি লাভ করে মহাকবিও তাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবেন। একটু কান পাতলে সেদিনও আজকের মতই মিছিলের কোন এক নবীনের মুখের বাউল সুরের গানে শোনা যাবে, বুঝা যাবে—

তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

সেই কথা, সেই সুর সেদিনও আজকের মত সেদিনের শ্রোতার মনে কাঁপন, চোখে জল, মুখে হাসি টেনে নিয়ে আসবে। যে মাটিতে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এ ভাষা এ সুর সেই মাটিরই, সেই বাংলা দেশেরই। সেদিন নূতন করে ভবিষ্যতের মানুষ আবার অনুভব করবে চিরকালের অনন্তযৌবন, নবীন বাউলের মত মুখে গান নিয়ে মহাকবি তাদের মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতধর্ম

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নব-অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। শতাব্দীকাল ধরে চলেছিল আমাদের ইতিহাসে মনীষীর মিছিল; তাঁদের নাম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতের জপমালা ছিল। কারণ দেশের একটি অবসাদময় পরাজয়ের মুহূর্তে তাঁরা আমাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে গ্রহণের শক্তি ও প্রেরণা তাঁরা দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে এই কীর্তির জন্য তাঁরা আমাদের স্মরণীয় এবং বরণীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা নূতন ভাবধারার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের লজ্জা হতে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন; তার জন্য তাঁরা আমাদের প্রণম্য। কারণ জীবনের নব নব পুষ্পপল্লবের বিকাশের জন্য নূতন রস আহরণ করতে হলে পুরাতন মূলকাণ্ড-শাখা-প্রশাখাকে বজায় রেখেই তা সম্ভব।

অধুনাকালের ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব জীবনধারণার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশের কোন বাধা নেই; তথাপি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক প্রচুর আছেন, ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যকে জীবনের মধ্যে স্বীকার করে নিতে যাঁরা লজ্জা পান; পরধর্ম-নেশায় যাদের আত্মবিস্মৃতি পরিপূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেই স্বভাবতই এই মত্ততার প্রকোপ দেশের দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেকালে নবীন ভাবধারার মত্ত জোয়ারের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যাঁরা নবীন ও পুরাতনের সমন্বয় করে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিক্ নির্ণয় করেছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল দুরূহ। পুরাতনের গোঁড়ামি এবং কালধর্মের ফেনায়িত উচ্ছ্বাস, এই উভয়পক্ষের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে পর্বতের মত ধৈর্য ও চরিত্রবলে। যে মহামানবের গিরিশ্রেণী সেদিনের সন্ধিক্ষণে ভারতধর্মকে রক্ষা করে নূতন গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের তুঙ্গশীর্ষ তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

সাধারণ মানুষের মত মহামানবও যুগ ও পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন না একথা সত্য। তথাপি শুধু কাল ও পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। রান্নার জন্য প্রত্যহ উনুনে যে আগুন জ্বালা হয় এবং আগ্নেয়গিরির জঠরে যে আগুন জ্বলে, এই দুইয়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য না থাকলেও কারণের যে ভেদ আছে একজন সাধারণ প্রতিভাধরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

ভেদ তেমনি। উনুনে আগুন জ্বলে নৈমিত্তিক কারণে, কিন্তু আগ্নেয় শৈলের উদ্ভব নিত্য কারণে, সৃষ্টির আদিভূত কারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্ম-জীবনের বিবিধ প্রচেষ্টা ও কীর্তির পর্যালোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে, কাল ও পরি-বেশের ফলে প্রকাশের রূপভেদ ঘটলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভার শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিশ্বের নিয়ন্তা একটি ধ্রুব এবং শিবময় সত্তায় প্রতি অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসে। তিনি যা করেছেন এবং লিখেছেন, আনন্দ ও বেদনা, হতাশা ও উৎসাহ, যা কিছু অনুভব করেছেন এই সত্তার কাছে তার সব কিছু নিবেদন করে আবার তাকে গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রসাদ বলে। তাঁর এই নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণের প্রধান বাহন ছিল তাঁর গান। তাই তাঁর গান তাঁর সৃষ্টিশক্তির অন্তরতম সামগ্রী, যার সুর দিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাইরে সেই ধ্রুব সত্তার চরণস্পর্শ করে আসেন। তিনি ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম যাই হোন, বিচিত্র তাঁর প্রকাশ, অসীম তাঁর ঐশ্বর্য, সেই প্রকাশ-বৈচিত্র্য তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র ভঙ্গুর আধারে কণায় কণায় বেঁটে ভোগ করে আনন্দ পান। ত্রিভুবনেশ্বরের এই বিচিত্র লীলার আধার হিসাবেই কবি চিরকাল নিজেকে গণ্য করেছেন। তিনি যখন কবি, যখন সাহিত্যিক, যখন সমাজ-সংস্কারক অথবা শিক্ষাব্রতী অথবা দেশকর্মী, সর্বরূপেই তিনি সেই অখণ্ড-আনন্দের কণা বলেই নিজেকে বিবেচনা করেছেন। তাই জীবনের কোন অবস্থাতেই, কর্মশালার কোন ক্ষেত্রেই কবির কণ্ঠে সেই পরমদেবতার আহ্বান স্তব্ধ হয়নি। জীবন যখন রসসিক্ত মনে হয়েছে তখন করুণাধারায় তাঁর আবাহন, কর্মের ঝড়ে তিনি শান্তি, সংকীর্ণ-আত্ম-পরিতোষের তিনি দর্পহারা রাজরাজেশ্বর, অন্যায় বাসনার অন্ধকারে তিনি রুদ্র বজ্রালোক।

তাঁর সাহিত্য ও কাব্য বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বিপুল। তাই আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করলে তাঁর সব রচনার মধ্যেই প্রকট বা স্পষ্টভাবে তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা পাওয়া যাবে না। কারণ তাহলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিধি শুধু ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মাবলম্বী কাব্যে ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সত্য, শিব ও সুন্দর সত্তার আনন্দ-যজ্ঞে বাঁশী বাজানোর ভার পেয়েছিলেন, তাঁর যজ্ঞশালার পরিধি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই জীবনের যে অংশকে অবলম্বন করেই তিনি কাব্য অথবা সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকুন, তা সেই যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তির জন্য। একটি গানে, একটি প্রশ্নে তিনি সেই কথা বলে গেছেন—

এই কি তোমার খুশি
আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা?

এই খুশির আবদার রাখতে ব্যবহারিক অর্থে সারাজীবন যদি বরবাদ হয় তাতে ক্ষতি নেই। তাই ঐ গানেই কবি বলেছেন :

রাতের বাসা হয়নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটি
বিনাকাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা,
সুরের গন্ধ-ঢালা।

শুধু কাব্য অথবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের নানাবিধ কর্মে মানুষ যে এই খুশীর নির্দেশই বহন করে চলে, কবির জীবনে এই বিশ্বাস চিরদিন অটুট ছিল। তাঁর কাব্যে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং বিচিত্র রচনায় এই বিশ্বাসের অজস্র নজীর ছড়িয়ে আছে।

সচারচর দেখা যায় জীবনের সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়লেই বিশ্বনিয়ন্তার কথা মানুষের মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ চৈতন্য তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে আবাল্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এই প্রসঙ্গে নূতন ব্রাহ্মণ-বালক রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রী-মন্ত্র অভ্যাসের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম, কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন…" এবং এই প্রসঙ্গে একটু পরে, "তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেঝের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোন একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোন যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পেঁছায় না।" কবির অন্তরের অন্তঃপুরে সেই শিশুকালে বিশ্বের মূলীভূত কারণের সঙ্গে আদান-প্রদানের যে কাজ শুরু হয়েছিল, সারাজীবন তার বিরাম ঘটে নি সেই সেতু-বন্ধনের পথে কবি তাঁকে আবাহন করেছেন :

এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে—
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে—
এসো সকল কর্ম অবসানে—
এসো নব নব রূপে এসো প্রাণে।

কবির জীবনের বিবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এই আহুত দেবতার পুণ্য দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই দিব্যপ্রভাবে তাঁর চিন্তা কখনো সত্য এবং মঙ্গলের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়নি। যে যুগে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল, তখন দুই বিপরীত মহাকর্ষের দোটানায় পড়ে শিক্ষিত সমাজে সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিদের সঙ্গীন অবস্থা—একদিকে গোঁড়া রক্ষণশীল মতবাদ যা চাইছিল আবার নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সংকীর্ণ সংস্কারের নাগপাশে চলৎশক্তিহীন স্থানু ঈশ্বরের সঙ্গে সমাজকে একসঙ্গে বাঁধতে—অন্যদিকে ছিল উগ্র প্রগতিপন্থী যারা দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের বাঁধন ছিঁড়ে কাটা ঘুড়ির মত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নানাবিধ দমকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে এক অভাবনীয় নব ইংলণ্ডে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্নে বিভোর। অসত্য এবং অমঙ্গলের পাল্লা উভয়-পক্ষেই সমান ভারী। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কোন দলেই নাম লেখালেন না। এক পক্ষের উদ্দেশে তিনি বলতেন, "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি।··ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।" রক্ষণশীলদের সম্বন্ধে তিনি বললেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" কবির নিজের জীবন-সাধনার প্রকৃতিও বিবেকানন্দেরই অনুরূপ ছিল। তাঁর কবিসত্তা কর্মীসত্তা এই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল। হাজার অভিজ্ঞতা

ও হাজার অনুভূতির লীলাচাপল্যের দোলায় তাঁর কল্পনা হাজার গীতের বর্ণাঢ্য মহিমা বিস্তার করেছিল এবং তার মধ্যে বিশ্বরূপের অখণ্ড মহাকাব্যের আস্বাদ পেয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনও তেমনি জাতি-ধর্ম-সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতার সাধনায় নিয়োজিত ছিল।

কবি বিশ্বাস করতেন যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের সমন্বয় সম্ভব করবার সাধনায় ভারতবর্ষের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। ভারতের এই মহান ভূমিকার যোগ্যতা তার ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইউরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর।"

ইউরোপীয় নেশন-পন্থী সভ্যতার পরিণাম প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাশব তাণ্ডবের মধ্যে। সেই যুদ্ধের সন্ধিপত্রের মধ্যেই ত্রিকালদর্শী ঋষির চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আগামী দিনের ভয়াল পরিণতি এবং জীবনের সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাত তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টির সত্যতা প্রমাণ করেছিল। এই সভ্যতার মধ্যে যে নৈতিক দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতা দুরারোগ্য ব্যাধির মত এই তেজস্বী সভ্যতার সার্থক পরিণতিকে বার বার ব্যাহত করছে, কবি তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়, একথা এক প্রকার সর্বজন গ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জর্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতেছে।" প্রায় ষাট বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করেছিলেন। তারপর এই রোগ ইউরোপ এবং আমেরিকা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরাও স্বধর্মচ্যুত হয়ে পরম গৌরবে এই বিশ্বরোগের অংশীদার হয়েছি। যদিও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের ধর্ম মোটামুটি বজায় আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রোগলক্ষণ তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার যা ত্রুটি, নীতির পথ থেকে যত কিছু বিচ্যুতি তা সমগ্রভাবে কবির চোখে পড়েছিল। তবু এই সভ্যতার মধ্যে যা শ্রেয়, যা গ্রাহ্য, যা বরণীয় সে সম্বন্ধে স্বীকৃতি তিনি অকৃপণভাবেই দিয়েছেন। শুধু কাব্যে ও সাহিত্যেই নয়, তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে অকুণ্ঠ প্রয়োগের মধ্যে সেই স্বীকৃতির অজস্র প্রমাণ ছড়ানো আছে। পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তিনি তাঁর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে; ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুইয়ের যোগে তুমি বড় হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক্—এ ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই। এই বিধিদত্ত স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে

পারবে।" আরো অনেক পরে জাপান যাত্রার সময় বিজ্ঞানের জগতে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানকে কৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীমতীর অভিসারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভেতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভেতর থেকে সম্পদে।" কিন্তু শুধু বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিকে তিনি কখনো পরমার্থ বলে মনে করেন নি। তিনি দেখেছেন আমেরিকার ঐশ্বর্য, তার শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। তবু সেদিন ভ্রুকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে—ততঃ কিম? বৈষয়িক শক্তিবৃদ্ধির মত্ততায় অন্তরের সত্য যেখানে অবহেলিত, সেখানে শ্রেয় যে নেই কবি তা বুঝেছিলেন। ভোগের সামগ্রীর যোগ্য হতে হলে প্রেম ও সংযমের যে প্রয়োজন তাই বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হল প্রকৃত মিলন।"

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এই মিলনের বৈরাগী শিব যার দৃষ্টি অন্তরে, হৃদয়ে প্রেম কিন্তু বহিরঙ্গের প্রতি নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য। ইউরোপীয় ঐশ্বর্যময়ী সংস্কৃতি—অন্নপূর্ণা, কিন্তু বৈরাগী শিবকে চরণে দলিত করে ধ্বংসাত্মিকা কালী। কিন্তু মিলনের আগ্রহে শিব যদি বৈরাগ্য বিসর্জন দেয়, সংযম হারায়, তাহলে সেই মিলন ব্যর্থ হবে। কাজেই ভারতকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সমন্বয় সাধনা করতে হবে। কবির উক্তি এখানে সুস্পষ্ট, "আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে সবলভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।" এই বাণী অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন চিত্তে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার অমোঘ আহ্বান। কবি এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিধাতার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন, আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে; আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহা নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।" কোন ধর্ম ভারত বিশ্বে প্রচার করবে, কোন কর্ম সমাপন করবে, তার ইঙ্গিতও কবি দিয়েছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ইহাই ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"…"আমরা ভারতের বিধিনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধ যেন আজও সত্যের দ্যুতিতে ঝলমল, যেন ইদানীং কালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর শতাব্দীকাল পার হয়ে আরও কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল; কিন্তু তখনও যেমন ছিল আজও তেমনি আমাদের দেশে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপহাস ও অবমাননা করবার লোকের অভাব নেই। পাশ্চাত্ত্য জীবনা-দর্শের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে চান। রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পরিণাম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা তাঁদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। দেখবেন আজকের দিনের জন্যও কবির উক্তির উপযোগিতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত ইউরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজমন্ত্রিগণ টিপিয়া টিপিয়া মৃত্যুবাণ ঢালিতেছে। রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় ইউরোপের ক্ষুধিত লুব্ধকগণ ধীরে ধীরে এক এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে।" ষাট বৎসর পূর্বের সঙ্গে তফাৎ এইমাত্র যে, লুব্ধকগণ এখন আর শুধু পাশ্চাত্তোই সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডেও

এই মহালোভের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই লোভের বিকৃতির মধ্যে ভারতকে আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নিজের জন্য। "প্রবৃত্তির প্রবলতা ও প্রভুত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা কোন কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু এই খাটো করার চেষ্টার আজও বিরাম নাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি বিশেষ অংশ ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের সুস্পষ্ট অবজ্ঞাকে গোপন করার চেষ্টাও করেন না। তাঁদের সমগোত্রীয়েরা সেকালেও ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, "দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।…ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটহ তালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।…আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যা বাক্য, যাহা স্বরচিত, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে…যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ওই সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ ঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।" এইসব অবিশ্বাসী আত্মনিন্দাপরায়ণ, পরানুচিকীর্ষুদের ব্যবহার অবিনশ্বর ভারতধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সেই ধর্ম শেষে জয়ী হবেই স্বদেশ এবং বিদেশে। তারই অমোঘ আশ্বাস কবির বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে:
"আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনও সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, "পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন, "ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন, "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

দুই পুরুষ

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমান সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। এই হিসাবে 'দুই পুরুষ'কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম "পিতা-পুত্র" এবং ওই নামেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "নাট্যভারতী"র কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন। রীতেন কোম্পানির পরিচালক শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্যবাদের পাত্র। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সতু সেনের ঋণ আমি অপরিসীম প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় আজ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে গেলেই বন্ধুস্তুতি দাঁড়াইবে। তবে কয়েকটি কথা না বলিলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত বাহির হইতে অসৌজন্য এবং নাটকবিচার ও নাটকের অংশ পরিবর্তন-পরিবর্জন লইয়া স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ শোনা যায় ; কিন্তু শ্রীযুক্ত মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত সেন সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সুযোগে বার বার তাঁহাদের আমি প্রীতিসিক্ত নমস্কার জানাইতেছি। 'দুই পুরুষে'র অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয়ও আমার পুরাতন বন্ধু ; তাঁহাকেও এই সঙ্গে নমস্কার জানাইতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "দেশ-দেশ নন্দিত করি" গানখানি দিয়া নাটকের যবনিকা অপসারণে সমগ্র নাটকখানি মুহূর্তে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে ; গানখানির জন্য নাটকখানি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গানখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য বিশেষভাবে তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অপর গান কয়খানি বাংলার প্রতিভাশালী কবি-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা অনেক।

ঋণ স্বীকার করা ছাড়াও ভূমিকায় অনেক কথা, বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবন, বাংলার নাটক এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চ লইয়া বক্তব্য আমার কিছু ছিল। কিন্তু নাটক প্রকাশের মুখেই রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সে ইচ্ছা আমার বর্তমানে অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। বারান্তরে সুযোগ ঘটিলে সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শখের নাট্যসম্প্রদায়কে একটি কথা নিবেদন করি। রিভলভিং স্টেজ (Revolving Stage)-এর সুবিধায় আসবাবপত্র দিয়া প্রতিটি স্টেজ সাজাইবার যে সুযোগ সাধারণ রঙ্গালয়ের আছে, তাহা তাঁহাদের নাই এবং গুটানো পট দিয়াই তাঁহাদের কাজ চালাইতে হয়। অথচ আসবাব দিয়া দৃশ্য সাজাইবার প্রলোভন তাঁহারা সংবরণ করিতে পারেন না। ফলে প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলিয়া আসবাব সরাইতে হয় ও নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। তাহাতে অযথা সময়ক্ষেপে নাটকের অভিনয়ের গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং তাঁহারা ওই প্রলোভন সম্বরণ করিয়া একটি প্রকাশ্য দৃশ্য (discover scene) এবং পরবর্তী দৃশ্যটি পট দিয়া আবৃত করিয়া অভিনয় করিবেন—এই অনুরোধ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয়ের সময়সংক্ষেপের জন্য এবং গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য নাটকের কতক কতক অংশ বাদ দেওয়া হয়। সেই অংশগুলি [ ] বন্ধনীবেষ্টনের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল।

নাট্যভারতীতে

প্রথম অভিনয় ঃ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

প্রথম রজনীর ব্যবস্থাপক ও অভিনেতৃগণ

প্রযোজক—শিশির মল্লিক
পরিচালনায়—নরেশ মিত্র, সতু সেন
সুরশিল্পী—দুর্গা সেন
নৃত্য-পরিকল্পয়িতা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
ব্যবস্থাপক—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নটবিহারী	ছবি বিশ্বাস	কালী বাগদী	শান্তি দাশগুপ্ত
বরুণ	ফিরোজাবালা	মোড়ল	কুমার মিত্র
মহাভারত	রবি রায়	রাজেন	বিজয়কার্তিক দাস
কমলাপদ	তুলসী চক্রবর্তী	বিপিন	বিপিন বসু
শিবনারায়ণ	যোগেশ চৌধুরী	পুলিস	সুধীর গুপ্ত
ভৃত্য	জগবন্ধু চক্রবর্তী	ইনস্পেক্টার	দ্বিজেন ঘোষ
গোপীনাথ	নরেশ মিত্র	জজ	ভোলানাথ শীল
চাপরাসী	আকাশচন্দ্র দে	জুরীগণ	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ দে, সুশীল রায়, মোহনলাল ষাজ্ঞিস, বেচু দত্ত, গিরীন ঘোষ, আকাশচন্দ্র দে
দেবনারায়ণ	কালী সরকার (অ্যাঃ)		
সুশোভন	জহর গাঙ্গুলী		
ভগবান	শান্তি চক্রবর্তী		
মুটে	বেচু দত্ত		
অরুণ	মিহির ভট্টাচার্য		
গ্রামবাসীদ্বয়	গিরীন ঘোষ, উমাপদ দাস		
পেশকার	উমাপদ দাস	দারোয়ান	জগবন্ধু চক্রবর্তী
ভৃত্যদ্বয়	গোপাল নন্দী, প্রভাস বঙ্গ	ডাক্তার	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
		উকিল	শান্তি চক্রবর্তী
বন্ধু	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	সঙ্গত	বিশ্বনাথ কুণ্ডু
বিমলা	প্রভা	খেমটাওয়ালী	প্রতিভাবালা
সাতু	রাজলক্ষ্মী	বাইজী	হরিমতী
কল্যাণী	অঞ্জলি রায়	ছাত্রীগণ	প্রতিভা, বন্দনা, নির্মলা, সন্ধ্যারাণী, মহামায়া, গীতা (১), গীতা (২) বীণাপাণি, সত্যবালা, আশালতা
শ্যামা	শান্তিলতা ও ছায়া দেবী		
মমতা	গীতা ও পূর্ণিমা দেবী		
জমিদার-গৃহিণী	রেণুবালা		

পরিচয়

নুটবিহারী ... আদর্শবাদী দেশসেবক

অরুণ ... ঐ পুত্র

বরুণ ... ঐ পুত্র

মহাভারত ... ঐ আশ্রিত চাষী

কমলাপদ ... ঐ বন্ধু (মুনসেফ)

সুশোভন ... ঐ ছাত্র, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পুত্র

বিপিন ... ঐ মুহুরী

শিবনারায়ণ ... কঙ্কণার জমিদার

দেবনারায়ণ ... ঐ পুত্র

গোপীনাথ ... ঐ গোমস্তা

কালী বাগদী ... জমিদারের একান্ত অনুগত প্রজা

মণ্ডল ... ঐ ঐ

রাজেন ... উকিল

বৃদ্ধ ... অবসরপ্রাপ্ত উকিল

জজ, জুরী, চাপরাসী, চাকর, প্রতিবেশীগণ, টাউট, কোর্ট-পুলিস, দারোয়ান

বিমলা ... নুটবিহারীর স্ত্রী

শ্যামা ... ঐ কন্যা

সাতু ... ঐ দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা ভগ্নী

কল্যাণী ... ঐ ছাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কন্যা

মমতা ... কল্যাণীর কন্যা

জমিদার-গৃহিণী ... শিবনারায়ণের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নটবিহারীর আশ্রম। কাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যুষ।
আকাশে সূর্যোদয় হইতেছে

(বাগানের মধ্যে একখানি মেটে বাংলো-ধরনের ঘর। বাগানের মধ্যে ছোট ছোট সবজি-ক্ষেত দেখা যায়। দুই পাশে কয়েকটি বড় গাছ। মেটে বাংলোটির সম্মুখে একটি অনাবৃত চত্বর বা রোয়াক। সেই রোয়াকের উপর নটবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের দিকে। চারিদিকে পাখির কলরব। নটবিহারী স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি যুবা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। মুখে বহু ক্লেশের চিহ্ন। কিন্তু সে চিহ্ন যুদ্ধজয়ীর ললাট-ক্ষতের মত তাহার রূপকে দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। পরনে খদ্দর। তাহার সম্মুখেই দুটি ছোট ছেলেমেয়ে—বরুণ ও শ্যামা জোড়হাতে গান গাহিতেছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই তাহারা গাহিতেছিল)

(গান)

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয় অর্জিল জয় সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ওই
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে।
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
দেশ-দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(গান শেষ হইলে নটু সস্নেহে ছেলে ও মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল)

নটু। যাও, এইবার পড়তে ব'স গিয়ে।

বরুণ। আজ কখন ছুটি দেবেন বাবা? আজ যে জগদ্ধাত্রী-পুজো!

শ্যামা। এক্ষুনি ঘট ভরতে যাবে বাবা, খানিক পরেই বলিদান হবে। কাল থেকে থিয়েটার হবে; ম্যারাপ বাঁধছে। একটু পরেই কিন্তু ছুটি দেবেন আমাদের।

নটু। একটু পরেই ছুটি দিতে হবে?

বরুণ। আশ্রমের ছেলেদের তো আজ সমস্ত দিন ছুটি দিয়েছেন! বড়দার বড় ইস্কুলেরও আজ ছুটি। আমাদের—

নটু। আচ্ছা, তোমাদেরও যদি আজ সমস্ত দিন ছুটি দেওয়া হয়?

(প্রবেশ করিল বিমলা—নটবিহারীর স্ত্রী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু মুখে বিরক্তি। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর)

নটু। এস। কি সংবাদ? চাল নেই, না, নুন নেই? ওই দুটো না থাকলেই ভাবনা। বাকি সমস্তগুলোকেই বিলাসের পর্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

বিমলা। (ছেলেমেয়ের প্রতি) যা, পড়তে ব'সগে যা।

নটু। ওদের আজ ছুটি। জগদ্ধাত্রী-পুজো। জগদ্ধাত্রীর গল্প শুনেই ওরা পুজো দেখতে যাবে।

বিমলা। যাবার সময় দুজনে দুটো লাউয়ের খোলা হাতে ক'রে যাস—বুঝলি ?

নটু। বরুণ, শ্যামা, তোমরা এখন পুজো দেখে এস। গল্প ও-বেলায় বলব।

(বরুণ ও শ্যামার প্রস্থান)

বিমলা। ওদের তাড়িয়ে দিলে যে ?

নটু। ওদের সামনে যে কথাটা তুমি বলবে, সেটা বলা খুব শোভন হবে না বিমলা।

বিমলা। আমি কি বলব তুমি জানতে পেরেছ ?

নটু। জানা কথা যে। আদিকাল থেকে গৃহিণীরা আমাদের মত স্বামীকে ওই একই কথা ব'লে আসছেন—

"অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কি ছেলেখেলা
ভারতীরে ছেড়ে ধর এই বেলা—
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

'ভারতী' কথাটা পালটে 'ভারত' বলতে পার। 'স্বদেশ' বললে আরও পরিষ্কার হবে।

বিমলা। (তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল) না। লক্ষ্মীর উপাসনা করতে বলতে আসি নি। বলতে এসেছি, লক্ষ্মীর উপাসনা যখন বর্জনই করেছ, তখন লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা, তাদের সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখবে কেন ? রাখতে হয় তুমি রাখ, আমি রাখতে পারব না ; বাবুদের বাড়ির পুজোয় যজ্ঞির নেমন্তন্নে আমি যাব না, যেতে পারব না।

নটু। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমি যে নিমন্ত্রণ নিয়েছি বিমলা !

বিমলা। তুমি নিয়েছ, তুমি যাও, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও, আমি যাব না। আমায় যেতে ব'লো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যেতে ব'লো না।

নটু। তোমার যে অভিযোগ, সেটা তোমার মনের ভ্রম হতে পারে। দারিদ্র্যের জন্যে যাদের ক্ষোভ থাকে, ঐশ্বর্যের জন্যে গোপন আকাঙ্ক্ষা তাদের অনিবার্য ; তারাই কথায় কথায় সংসারে অপমানবোধ করে। এটা তাদের দুর্বল স্বভাবের ধর্ম। দোতলার বারান্দায় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের বসবার জন্যে তোমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল—এটা সত্যি নাও হতে পারে। হয়তো জায়গার অকুলান হচ্ছিল, তাই তোমাকে ব'লে থাকবেন—

বিমলা। হ্যাঁ, তাই সকলকে বাদ দিয়ে বেছে বেছে আমাকেই ব'লে থাকবেন—তুমি আবার এখানে কেন বাপু ? তুমি নীচে গিয়ে ব'স। শুধু জায়গার অকুলান কেন ? খাবার সামগ্রীরও অকুলান হয়েছিল, তাই খাওয়ার ব্যবস্থাও দুই রকম হয়েছিল। পাতার অকুলান পড়েছিল, তাই ছেঁড়া পাতায় খেয়েছি। সবই আমার মনের ভ্রম, ঐশ্বর্যের জন্যে ক্ষোভ,' সম্পদের ওপর লোভ !

(নটু গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল)

ওই খোঁটাই তুমি চিরদিন আমাকে দিলে। দারিদ্র্যের জন্যেই আমার দুঃখের অন্ত নেই, টাকা পয়সা ছাড়া আমার আর কিছু কামনা নেই, তুমি গরিব ব'লে—

নটু। (হাসিয়া) সে কি মিথ্যে বিমলা ? সে কামনা কি তোমার নেই ? সেটা কি তুমি অস্বীকার কর ?

বিমলা। না, অস্বীকার করি না, স্বীকার করি। টাকা-পয়সা আমি চাই, সম্পদ আমি চাই। কেন চাইব না ? আমার ছেলেমেয়েদের আমি সাধ মিটিয়ে খেতে পরতে দিতে চাই, আমার স্বামীকে—

নুট। আমার কথা বাদ দাও বিমলা।

বিমলা। কেন?

নুট। কারণ, এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ। সংসারে কারও ঈর্ষার পাত্র নই আমি, কাউকে আমি বঞ্চনা করি নি। থাক্, সে কথা তুমি বোঝ নি, বুঝবে না।

বিমলা। আমি মূর্খ, সে কথা আমি জানি। সেইজন্যেই কি তুমি আমায় ঘৃণা কর?

নুট। না, ঘৃণা তোমায় আমি করি না; তবে শিক্ষার গুণ আছে বইকি বিমলা।

বিমলা। হ্যাঁ। আছে বইকি। সেই গুণের আগুনেই তো তুমি পুড়ছ। সে কি আর আমি জানি না? জানি। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে যে তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ধনীর ছেলের গলায় মালা দিলে, সে অপরাধ কি আমার? যার জন্যে একবিন্দু ভালবাসা তুমি আমায় দিলে না, দিতে পারলে না।

নুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বিমলার দিকে চাহিয়া থাকিল, তারপর বলিল) এও তোমার মনের ভ্রম বিমলা।

বিমলা। এও আমার ভ্রম? ভ্রম ক'রেই কি বিধাতা সংসারে আমাকে পাঠিয়েছিলেন? ভ্রম ছাড়া কি জীবনে আমার কিছু নেই?

নুট। তুমি উত্তেজিত হয়েছ বিমলা, ওসব কথা এখন থাক্।

বিমলা। উত্তেজিত হয়েছি! তেজ থাকলে উত্তেজনা আসে মানুষের। আমার তেজ অহংকার ধুলোয় লুটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। উত্তেজিত আমি হই নি, কেবল দুঃখের কথাই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

নুট। শোন।

বিমলা। বল।

নুট। আমার অনুরোধ, তুমি খেতে যাও।

(বিমলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

তুমি যা বলেছ, সে কথা সত্যি কি না, আমি আবার একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই।

(বিমলা স্থির দৃষ্টিতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

আমার অনুরোধ বিমলা, আমার—

নেপথ্যে মহাভারত মোড়ল। দাদাঠাকুর!

নুট। কে? মহাভারত?

[মহাভারত প্রবেশ করিয়া নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল]

মহা। দেখ দাদাঠাকুর, এই দেখ।

নুট। এ কি মহাভারত, তোমার বুকের ওপর জুতোর ছাপ!

মহা। জুতো সুদ্ধু লাথি মারলে বুকের ওপর।

নুট। কে?

মহা। ছোট তরফের ওই মাতাল ছেলেটা। বাবুদের থিয়েটার হবে, তাই বেগার দেবার কথা। কিন্তু ওদিকে আমার আলুর জমিতে খুঁড়বার, মাটি দেবার বাত হয়েছে, তাই গিয়ে জোড়হাত ক'রে বললাম—আজকে আমাকে রেহাই দ্যান। তা জুতো সুদ্ধু বসিয়ে দিলে বুকে লাথি।

নুট। (মহাভারতের মুখের দিকে স্তব্ধভাবে আরও শুনিবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল) তার পর?

মহা। বড়বাবুর কাছে গেলাম, তা বাবু কথাটা উড়িয়েই দিলেন; বললেন—উঃ, তুই বেটার

তো মহা ভাগ্যি রে বেটা চাষা ; একে ব্রাহ্মণ, তায় জমিদার—রাজা।

বিমলা। তায় শুধু-পা নয়, জুতো সুদ্ধ লাথি।

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ মা। সেই কথাই বললেন, বলে—ভগবান ভৃগুমুনির লাথি খেয়েছিলেন, পায়ের দাগ নাকি বুকে আঁকা আছে।

নুট। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে পারবে মহাভারত ?

বিমলা। কথাটা তুমি ভুল বললে।

নুট। কেন ?

বিমলা। জলে বাস করলেই কুমীরে খায় ; বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়।

মহা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। চিরকাল বেগার দিয়ে এলাম, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, দেবতার সঙ্গে বাবুদিগে দিয়ে এলাম। দাদাঠাকুর, মেয়ের বিয়েতে দেড় শো টাকা ধার নিয়েছিলাম বড়বাবুর কাছে, সুদ দিয়েছি দু শো পঁচাত্তর টাকা দশ আনা। চক্রবৃদ্ধি সুদ। খাজনার সুদ টাকায় সিকি, তার ওপরে মামুলী চাঁদা—এবার আবার হাসপাতালের চাঁদা টাকায় এক আনা।

নুট। হাসপাতালের চাঁদা ?

মহা। বাবুরা হাসপাতাল দেবে।

বিমলা। সে তো ভালই হবে, বেতের ঘায়ে চামড়া ফেটে গেলে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দেবে।

মহা। মাজিস্টর সাহেব বলেছে, দিতে হবে।

নুট। (হাসিল) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দীর্ঘজীবী হোন, কল্যাণ হোক তাঁর।

মহা। মাজিস্টর সাহেবের কাছে তুমি একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

নুট। দরখাস্ত নয় মহাভারত, বুকের এই দাগ দেখিয়ে তুমি ফৌজদারী একটা নালিশ ক'রে দিয়ে এস। পারবে ?

মহা। পারব।

নুট। খরচ আছে ?

মহা। খরচ !

নুট। হ্যাঁ। খরচ লাগবে তো।

(বিমলা ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল)

যেয়ো না বিমলা, দাঁড়াও।

বিমলা। না।

নুট। না নয়, শোন।

বিমলা। না—না—না। আমার সম্বলের মধ্যে দুগাছা শাঁখা-বাঁধা, আর মরা খুকীর দুগাছা বালা। সে আমার চেয়ো না, আমি পারব না—সে দিতে আমি পারব না।

(চলিয়া গেল)

নুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ও আত্মসংবরণ করিয়া) আমার এক মোক্তার বন্ধুকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি মহাভারত, তুমি তার কাছে যাও। আমরা দুজনে একসঙ্গে মোক্তারি পাস করেছিলাম। তার পসারও ভাল। আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।

[ঘর হইতে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল]

মহা। তুমি যদি মোক্তারি করতে দাদাঠাকুর, তবে কেমন হ'ত বল দেখি ? ছেলেপিলে ঘর-সংসারের এই দুঃখ, মোক্তারি পাস ক'রে এসে তুমি গরিবগুলোর ছেলে নিয়ে কি পাঠশালা করছ, এতে যে কি হবে তুমিই জান। ওকালতি প'ড়ে পাস দিলে না। মোক্তারি পাস

ক'রে পাঠশালা করছ। মা-ঠাকরুনের রাগের দোষ কি বল? দাদাঠাকুর, তুমি আবার মোক্তারি আরম্ভ কর না কেন?

নুটু। (চিঠি শেষ করিয়া) এই চিঠি নিয়ে তুমি যাও। মোক্তার হরেন্দ্রনাথ বসু। হরেনবাবু মোক্তারকে সবাই চেনে; বড় মোক্তার তিনি। এখনই চ'লে যাও তুমি। এই তো তিন মাইল রাস্তা—রামপুর। তবে আর একবার ভেবে দেখ। যে আগুন জ্বালতে চাচ্ছ, তার আঁচ তোমাকেও লাগবে, হয়তো তাতে তোমাকে পুড়তেও হতে পারে।

মহা। চিতের কড়ি বেঁচে যাবে দাদাঠাকুর, আমার চিতের কড়ি বেঁচে যাবে। দাও, চিঠি দাও। (চিঠি লইয়া প্রস্থান)

নুটু। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনেই আবৃত্তি করিল)

"হে, মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে—"

(ঠিক এই মুহূর্তেই বিমলা আসিয়া দুইগাছি শিশুর বালা ও নিজের দুইগাছি শাঁখা-বাঁধা নুটুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল)

বিমলা। এই নাও।

নুটু। (আবৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল) নিয়ে যাও, আর দরকার নেই। মহাভারত চলে গেছে।

বিমলা। না, দরকার আছে। মহাভারতকে ডাক।

নুটু। না। আমি আমার এক মোক্তার বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে বিনা পয়সাতেই কাজ ক'রে দেবে। আদালত-খরচা পরে নেবে। আমার অনুরোধ সে নিশ্চয় রাখবে।

বিমলা। না, ক'রে দেবে না। এ তোমার অন্যায় অনুরোধ। বিনা পয়সায় কেন সে ক'রে দেবে?

নুটু। সংসারে পয়সাটাই সকলের কাছে বড় জিনিস নয় বিমলা।

বিমলা। (কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) আমার কাছেই পয়সাটা সকলের চেয়ে বড় জিনিস, না?

(নুটু কোনও উত্তর দিল না)

(প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তেমনই ভাবেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত অভিমানে প্রশ্ন করিল) কেন? কেন? কেন তুমি আমাকে এমন ভাবে অপমান কর?

নুটু। না। তোমায় অপমান আমি করি নি। এও তোমার মনের ভ্রম।

বিমলা। এও আমার ভ্রম! (দৃঢ়স্বরে) না, এ আমার ভ্রম নয়। শুধু আজ ব'লে নয়, সমস্ত জীবনটাই তুমি আমায় অপমান ক'রে এসেছ।

নুটু। বিমলা তুমি কি বলছ?

বিমলা। আমি ঠিক বলছি। বিয়ে ক'রে স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসতে না পারে, তাকে যদি ঘৃণা করে, আর দয়া ক'রে যদি সেই ঘৃণা মনে চেপে রাখে, তবে সে অপমান নয় তো কি? তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েদের আর কি আছে? তুমি যদি শিক্ষিতা ধনীর মেয়ে কল্যাণীকেই ভালবাসতে, তবে কেন তাকেই তুমি—

নুটু। (দৃঢ় কঠিন স্বরে) বিমলা!

বিমলা। না, আমি আজ চুপ করব না। কেন তুমি তাকেই বিয়ে করলে না?

নুট। বিমলা!

(বিমলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে চলিয়া যাইতেছিল)

যেয়ো না। শুনে যাও, আমার উত্তর শুনে যাও। হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি এককালে ভালবাসতাম। কিন্তু আজ তাকে আমি ঘৃণা করি। অর্থ এবং আভিজাত্যের পায়ে সে প্রেমকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। তাকে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করি।

বিমলা। আমাকে তুমি কেন ঘৃণা করবে? কেন? আমার কি অপরাধ?

নুট। টাকার ওপর লোভ, সোনার ওপর লোভ, সম্পদের ওপর লোভ—তোমার অপরাধ। বিমলা, লক্ষ্মীদেবীকে সকলে পুজো করে কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা সংসারে চিরদিনই ঘৃণ্য জীব।

(বিমলা আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

আর একটা কথা। (বিমলা দাঁড়াইল)

কল্যাণী এখন পরস্ত্রী। সে আমার ভগ্নীর তুল্য। তার বাপ ছিলেন পণ্ডিত, দেশ-সেবক। তার নাম নিয়ে এমন আলোচনা আর তুমি ক'রো না। এ শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। (নুটু বলিয়াই আবেগবশে চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত-পরে আবার ফিরিয়া আসিল) আরও একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। বিয়ের সময় তুমি নিতান্ত ছোট ছিলে না। তোমার মনে থাকার কথা, মনে থাকা উচিত। তোমার বাবা আমার অবস্থা জানতেন। তা ছাড়া, তোমার বাবাকে আমি বলেছিলাম—দেশের সেবা আমার ব্রত, যে-দেশের লোকের দৈনিক গড় আয় দশ পয়সা। দারিদ্র্য আমার চিরসঙ্গী। সুতরাং দশ পয়সার বেশি তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করতে পার না।

বিমলা। (হাসিয়া) আমি তো দশ পয়সাও খাই না। তুমি, তোমার দুই ছেলে অরুণ-বরুণ, তোমার মেয়ে শ্যামা—চারজনে চল্লিশ পয়সার খাও। আমি খাই তার অবশেষ—উচ্ছিষ্ট।

(নেপথ্যে সাতু-ঠাকরুন—নুটবিহারীর সম্বন্ধীয় ভগ্নী—ঠিক এই সময়েই উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল)

সাতু। বউ! অ বউ! বলি ওলো, অ নুটুর বউ!

নুট। বউ এখানে রয়েছে সাতুদিদি। কি বলছ?

(সাতুর প্রবেশ। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। বেশ আঁটসাঁট চেহারা, পরনে থান; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের ভিতরের পান গালের উপর আবের মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে)

সাতু। বলছি, বাবুদের বাড়ি খেতে যাবে কখন? আমাদের বউরা সব কাপড়-চোপড় প'রে তোর বউয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নুট। এই যাচ্ছে দিদি। যাও বিমলা, সকলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সাতু। মুখের সামনেই একটা কথা আমি বলি—তুই বারণ করু তোর বউকে, বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গা দিয়ে যেন তাদের সঙ্গে বসতে না যায়। গত বছর পাঁচবার বারণ করলাম—বউ, খানিকটে না হয় দেরিই হবে, ওপরে বসতে যাস নি। যেমন যাওয়া, দিলে উঠিয়ে। অপমানটা কি যেচে না নিলেই হত না। কই, আয় বউ, আয়।

(অগ্রসর হইল, বিমলাও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুসরণে উদ্যত হইল)

নুট। (ডাকিল) যেয়ো না বিমলা, তোমার যাওয়া হবে না।

সাতু। সে কি রে! খেতে যাবে না কি?

নুট। না সাতুদিদি, যাবে না।

সাতু। ভক্ষ্যে পুজ্যে উঠিয়ে দিবি?

নুট। দোষ নয়, দিলাম।

সাতু। নুটু, আর পাগলামি করিস নি। একেই তো শনি, পুলিস লেগে আছে তোর পেছনে। তার ওপর বাবুদের সঙ্গে বিবাদ করিস নি। পায়ে মাথায় সমান করতে নেই।

নুট। সেইজন্যেই তো মাথার বাড়িতে পা যাবে না সাতুদি।

(সাতু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

বউদের নিয়ে তুমি যাও সাতুদি, ও যাবে না।

সাতু। যা ভাল বোঝ, তাই কর ভাই। কারুর কথা তো তুমি নেবে না। (প্রস্থান)

(নুটু আপন মনেই উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিল)

বিমলা। (হাসিয়া) বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছ নাকি ?

নুট। না। মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

বিমলা। তা হ'লে বল, নিজেকেই প্রণাম জানাচ্ছ! লোকে তো তোমাকেই বলে—কলির দুর্বাসা।

নুট। তারা ভুল বলে। আমার সে ক্ষমতা থাকলে লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তাকে আবার একবার সাগরতলে নির্বাসনে পাঠাতাম।

নেপথ্যে কে ডাকিল। এইটে কি নুটবিহারীবাবুর বাড়ি ?—নুটবিহারী মুখুজ্জে ?

নুট। হ্যাঁ। নুটবিহারী মুখুজ্জের বাড়ি। কে ? কোথা থেকে আসছেন ?

নেপথ্যে। আমি কমলাপদ—কমলাপদ ঘোষ।

নুট। কমলাপদ, কমল! আরে, এস এস এস। (অগ্রসর হইয়া গেল, যাইবার সময় বিমলাকে বলিল) বিমলা, কমল আমার কলেজের বন্ধু—এখন মুন্সেফ। যা হয় তার খাবার আয়োজন কর।

(নুটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাহিরে গেল। বিমলা ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নুটু পর-মুহূর্তেই বন্ধুকে লইয়া প্রবেশ করিল। কমলাপদর বেশভূষা অভিজাতজনোচিত। ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। নুটুরই সমবয়সী)

নুট। এস, এস ভাই। উঃ, কতদিন পরে বল তো ?

কমল। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার নুটু—রুক্ষ কঠোর ?

নুট। (হাসিয়া) Don't forget Aristotle, old boy! Beauty to different ages different. To full men, strength of body fit for the wars, and countenance sweet with a mixture of terror. এস এস, ভিতরে এস।]

(ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণাবাবুদের বাড়ি, বড়বাবুর খাসকামরা

স্থূলকায় বড়বাবু—শিবনারায়ণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্ধশায়িত, মুখে গড়গড়ার নল। চাকর পায়ে হাত বুলাইতেছে। বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ। পরনে চুনট করিয়া কোঁচানো থান-ধুতি। গায়ে বেনিয়ান। একখানা শাল শরীর হইতে খসিয়া কোমরে পড়িয়া আছে। সম্মুখে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল মামলা-সেরেস্তার কর্মচারী—গোপীনাথ। লোকটি বৈষ্ণব। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ছিটের গলা-বন্ধ কোট, পরনে আধ-ময়লা থান-ধুতি। কাঁধে জামার উপর একখানি চাদর সযত্নে ফেলা আছে। মাথার চুল ছোট

করিয়া ছাটা। মধ্যস্থলে একটি টিকি। আসিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া সবিনয়ে পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল, জিভে ঠেকাইল, বুকে বুলাইল।

শিব। অঃ, কে, গুপী? এস। কি সংবাদ?

গোপী। আজ্ঞে, সংবাদ গুরুতর।

শিব। গুরুতর?

গোপী। আজ্ঞে, ছোটখোকাবাবু আজ মহাভারত মণ্ডলেরে একটা লাথি মেরেছিলেন।

শিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বেটা চাষা তখন এসেছিল বটে আমার কাছে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, লোকটা গেছে ফৌজদারিতে নালিশ করতে।

শিব। (চোখ মুদিয়া নল টানিতে টানিতে নিস্পৃহভাবেই বলিলেন) বল কি? লাথি মারার জন্যে বেটা চাষা নালিশ করতে গেছে!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছিলাম কোর্টে—কমলপুরের স্বর্গীয় মহেশ্বর গাঙ্গুলীর বন্ধকী তমসুদের জন্যে তদীয় পুত্র হরিহর গাঙ্গুলী দিগরের নামে যে নালিশ দায়ের হয়েছে, তারই তদ্বিরের জন্যে।

শিব। (চাকরকে) জোরে—জোরে। ওরে বেটা, আরও জোরে টেপ্। আখ-মাড়াই কলে যেমন আখ পেষে, তেমনই জোরে টেপ্। পায়ের ওপর থাপ্পড় মারবি, ক্রোশখানেক তার শব্দ যাবে, তবে তো! হ্যাঁ, তারপর গুপী? বেটা চাষার নাম কি বললে হে?

গোপী। আজ্ঞে, মহাভারত মণ্ডল।

শিব। হ্যাঁ। বেটার বাবার নাম কি হে? রামায়ণ?

গোপী। আজ্ঞে না। চণ্ডী হ'ল ওর বাপের নাম। চণ্ডীচরণ মণ্ডল। পিতামহের নাম হরিশ মণ্ডল।

শিব। হরিশ মণ্ডল! হরিশ মণ্ডল! হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি। হরিশ মণ্ডল। (এইবার চোখ খুলিয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইলেন) বাবার আমলে যে-প্রজা-ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটে হরিশ ছিল একজন মাতব্বর।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১২৮৫ সালের ধর্মঘটে হরিশ মণ্ডল একজন মাতব্বর ছিল। ডাঙাপাড়ার গৌরহরি ঘোষ, ধর্মরাজের দেবাংশী হরিবোলা পাল—

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবা ও-পাপ সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আমি দয়া করেছিলাম। সমস্ত উচ্ছেদ ক'রেও সামান্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে! চাপরাসী কে রয়েছে বাইরে?

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর!

শিব। মহাভারত মোড়ল, যাকে আজ ছোটখোকাবাবু লাথি মেরেছিল, তার দোরে গিয়ে হাজির থাক। বাড়িতে আসবামাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এত বড় সাহস!

(চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল)

গোপী। আজ্ঞে, যা বুঝলাম, সাহসের পেছনে লোক আছে।

শিব। লোক?

গোপী। আজ্ঞে, নুটু মুখুজ্জে।

শিব। (সোজা হইয়া বসিয়া) নুটু মুখুজ্জে! শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি? কুনো কালীর বেটা? স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছে, সেই ছোকরা?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরেন্দ্র মোক্তারের কাছে তার লেখা চিঠি আমি নিজে দেখেছি। বিনা পয়সায়, খরচা দিয়ে, মামলা দায়ের ক'রে দিতে অনুরোধ করেছিল নুটুবাবু। তা আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা ক'রে দিলাম। হরেনবাবুকে আমি মোক্তারনামাও দিয়ে এসেছি।

শিব। বেশ করেছ। তুমি চাপরাসীকে বারণ কর। বল মহাভারতকে আনবার দরকার নেই এখন। (গোপীর ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান)

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। বাবা! বাবা রয়েছ?

(ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

শিব। কি ব্যাপার? বড়বাবু, এত ব্যস্ত কেন?

দেব। ন্যায়রত্নের বাড়ির মেয়েরা খেতে আসে নি।

শিব। কার বাড়ির?

দেব। শিবু ন্যায়রত্নের, মানে নুটু মুখুজ্জের স্ত্রী খেতে আসে নি।

শিব। খেতে আসে নি?

দেব। না। নুটুর জ্ঞাতি-ভগ্নী সাতু-ঠাকরুণ বললে, গতবারে নুটুর স্ত্রী দোতলায়—মানে আমাদের বাড়িঘর, তা ছাড়া নবীন উকিলের বাড়ি—এইসব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সে বসেছিল। তাতে সাধারণের আপত্তি হতে পারে ব'লে তাকে নীচে বসতে পাঠায় হয়েছিল। সেইজন্যে আসে নি।

শিব। হুঁ।

দেব। কর্তব্যের খাতিরে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিই। তাতে আসে ভাল, না আসে—

শিব। আসবে না।

দেব। না আসে, তার ব্যবস্থা হবে। আর আসবে না কি ক'রে বলছ।

শিব। নুটুকে তোমরা চেন না। সে আরও কি করেছে জান? ছোটখোকা আজ হরিশ মোড়লের নাতিকে একটা লাথি মেরেছে—

দেব। জানি।

শিব। নুটু তাকে উত্তেজিত ক'রে ফৌজদারিতে নালিশ করতে পাঠিয়েছে।

দেব। কি বলছ তুমি বাবা?

শিব। গুপী এখুনি মহকুমা থেকে ফিরে এল, সে-ই খবর নিয়ে এসেছে। কি, বিশ্বাস করতে পারছ না?

দেব। অবিশ্যি লোকে ওদের বংশটাকেই বলে—বিছুটির ঝাড়। তবু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের পেছনে লাগবে, ওর এত সাহস হবে? আর নুটু তো লোক খারাপ নয়।

শিব। ওর পিতামহ শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন আমাকে সভার মধ্যে কি বলেছিল জান? আমার পিতামহের শ্রাদ্ধের বিচার-সভায় আমি গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি" শ্লোকটি আউড়েছিলাম। আমায় সেই সভার মাঝেই বলেছিল—জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি তোমার; দেবভাষার অপমান করা হয় ও-রকম উচ্চারণে—যদার য বর্গীয় জ নয়, অন্তস্থ য। সে উচ্চারণ আজও করতে পারি না। ও-বংশের সন্তানের পক্ষে সবই সম্ভব।

দেব। তা হ'লে?

শিব। তা হ'লে আমাদের নিজেদের কাউকে যেতে হবে। সামাজিকতাটা অন্তত লোকধর্মের খাতিরেও রাখতে হবে। যাও, ডেকে আন,—দামী আসন পেতে, রুপোর থালায় খেতে দাও নুটুর স্ত্রীকে। অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর। যেখানে চামড়ার জুতো না চলে, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়।

দেব। বেশ, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই করি।

শিব। মোক্তারিতে পসার হ'ল না ব'লে ছোকরা যখন চাষাভুষোর ছেলেদের জন্যে পাঠশালা খুলে বসল, তখন আমি হাজার বার বলেছিলাম—উঠিয়ে দাও, ওটা উঠিয়ে দাও। তখন তুমিই বলেছিলে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখবে বই তো নয়। ওরে বাবা, সৎমাকে ঘরে ঢুকতে দিলে নিজের মা কখনও স্থির থাকতে পারেন না। কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, সেখানে সরস্বতীর আসন? নইলে কি কঙ্কণার বাবুরা একটা ইস্কুল দিতে পারেন না? (হা-হা করিয়া হাসিয়া) খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকেই এবার সে কথা ব'লে দিলাম—হুজুর যখন ধরেছেন, তখন হাসপাতাল দোব আমরা, ইস্কুলের কথা বলবেন না।

দেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে আমি যাই।

শিব। যাও। কিন্তু ভুলে যেয়ো না বাবা, নুটু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে, আর মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের শেষ পর্বটি পর্যন্ত আখের কলে মাড়াই ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিতে হবে।

(দেবনারায়ণের প্রস্থান)

[(চাকরকে) আঃ! শরীর ম্যাজম্যাজ ক'রে উঠল যে! জোরে—জোরে—বেশ গোটা-কতক কিল মারু তো পিঠে, দেখি।

(নেপথ্যে ঘড়িতে তিনটা বাজিল)

(সচকিতভাবে) হরি, হরি, হরি! তাই তো বলি, শরীর এমন করে কেন? তিনটে বেজে গেল। আফিং রে বেটা, আফিং।]

তৃতীয় দৃশ্য

নুটবিহারীর আশ্রম। প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য

কেবল বারান্দার উপর দুই-তিনটি মোড়া। মোড়ার উপর উপবিষ্ট নুটু ও কমলাপদ

নুট। কল্যাণীর নাম আমার কাছে ক'রো না কমল। Her father drove me away.

কমল। Drove you away? বল কি নুটু? এ যে আশ্চর্যের কথা!

নুট। Truth is stranger than fiction কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, তুমি আর এসো না আমার বাড়ি; আমি কল্যাণীর বিবাহ অন্যত্র স্থির করেছি; তোমার সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব।

কমল। অসম্ভব!

নুট। অসম্ভব বইকি। [হাইকোর্টের উকিল—roaring practice; সুরেন্দ্রনাথের সহকারী দেশসেবক, ধনী হয়ে মত পালটে করলেন সরকারের সহযোগিতা। সরকার রাজসম্মানে সম্মানিত করলেন। সে অবস্থায়] আমার মত দরিদ্র, পুলিসের সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অসম্ভব বইকি।

কমল। তোমার দারিদ্র্য তিনি জানতেন, জেনেশুনেই he picked you up! আমরা বলতাম, কলেজ-সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি নুটুরত্নকে আহরণ করেছেন।

নুট। তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছিলেন অন্য মানুষ। নির্যাতিত দেশসেবক, প্র্যাকটিসের তখন প্রারম্ভ। তখন ধনের চেয়ে গুণ ছিল তাঁর কাছে বড়। [এণ্ট্রান্সে পনরো টাকা স্কলারশিপ পেয়ে কলেজে গেলাম, প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাকে তাঁর ছোট ছেলে সুশোভনকে পড়াবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে আলাপ

ক'রে তিনি আকৃষ্ট হলেন। এফ. এ-তে ফার্স্ট হলাম, তিনি কল্যাণীকেও পড়াবার ভার দিলেন।]

কমল। আমি তো সব জানি নুটু। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কল্যাণী আমায় 'দাদা' বলত, তুমি তো জান। কল্যাণীর মা কতদিন তোমার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের কথা আমায় বলেছেন।

নুট। তবুও তুমি সব জান না কমল। জানবার কথাও নয়। কল্যাণীকে আমি পড়াতাম, কিন্তু কখনও এ অসম্ভব আশা মনে আমি স্থান দিই নি। বি. এ.-তে ফার্স্ট হলাম, তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে কল্যাণীকে আমার হাতে সমর্পণের সংকল্প নিজে আমাকে জানালেন, তবে আমি নিজেকে কল্যাণীর দিকে আকৃষ্ট হতে দিয়েছিলাম। কল্যাণীও আমার সে আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর চাকা ঘুরে গেল। আলিপুর বোমার মামলার পর পুলিস বার বার আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই সময় বাবাও মারা গেলেন। এম. এ-র রেজাল্ট্ অত্যন্ত খারাপ হ'ল, অর্ডিনারী সেকেণ্ড ক্লাস; সুতরাং সরকারী উপাধিধারী ধনী মৃত্যুঞ্জয়বাবু drove me away! তাঁর ব্যবহারে আমি আঘাত পাই নি কমল, আঘাত পেয়েছিলাম কল্যাণীর ব্যবহারে। "So sweet was ne'er so fatal"।

কমল। তাই তো নুটু, বড় সমস্যায় ফেললে আমাকে।

নুট। (উঠিয়া পড়িল। পদচারণা করিতে করিতে, তীক্ষ্ণ হাসি হাসিতে হাসিতে) কোন সমস্যা নেই কমল। অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া) নুটু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করেছ। কল্যাণীকে তুমি ভুল বুঝেছ।

নুট। (হাসিল) ভুল বুঝেছি ? হবে।

কমল। কল্যাণী বিধবা হয়েছে জান ?

নুট। বিধবা ! কল্যাণী বিধবা হয়েছে ?

(বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

কমল। হ্যাঁ। বছরখানেক আগে সে বিধবা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন নিরাশ্রয়, গায়ের কখানা গহনা ছাড়া নিঃসম্বল।

নুট। কি বলছ কমল ? কল্যাণীর শ্বশুর তো লক্ষপতি ছিলেন। জমিদারি, ব্যবসা—

কমল। হ্যাঁ, সে সবই আছে; কিন্তু কল্যাণীর তাতে কোন অধিকার নেই। আমিই বিচারকের আসনে ব'সে সেই রায় দিয়েছি। কল্যাণীর স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু অমিতাচার ছাড়তে পারেন নি। লিভার অ্যাবসেস, সঙ্গে সঙ্গে আরও সাতখানা রোগে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বাপ তখন বেঁচে। মাস দুই পরে তিনিও মারা গেলেন। আইন অনুসারে কল্যাণী আর তার মেয়ে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল। আইন অনুসারে বিচার ক'রে আমিই সে বিধান দিয়েছি। কল্যাণী এখন নিরাশ্রয়, প্রায় নিঃসম্বল।

নুট। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) মৃত্যুঞ্জয়বাবু তো মারা গেছেন। কল্যাণী তবে এখন ভাইদের আশ্রয়ে ?

কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছেলেদের খবর কিছু জান ?

নুট। এখনকার খবর কিছু জানি না। বড় ছেলে বিলেতে গিয়েছিল, ছোটটি ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে পড়ছিল—সেই পর্যন্তই জানি।

কমল। বড় ছেলে বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক'রে এসেছেন। তিনি এখন খাজা সাহেব। ছোট ছেলে, তোমার ছাত্রটি, সঙ্গীতবিদ ; পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সঙ্গীতের সাধনায় ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছেন কস্তুরী-মৃগের মত। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল—কোন কুলেই এখন আর কল্যাণীর আশ্রয় নেই। একটি মেয়েকে বুকে নিয়ে সে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে —অকূল সমুদ্রে বললে ভুল হবে না। আমি তোমার কাছে এসেছি, নুটু, কল্যাণীর আশ্রয়ের জন্যে।

নুট। আমার কাছে ?

কমল। হ্যাঁ, তোমার কাছে [মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভুল করেছিলেন, তুমি ভুল করেছ, কিন্তু কল্যাণীর ভুল স্বেচ্ছাকৃত নয়। তোমাদের ভুলের বোঝা তার মাথায় তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ। নদীর বুকের ভেলা যখন ভার হয়ে ভেলার আরোহীর বুকে চাপে, তখন নিরুপায় হয়ে তাকে ডুবতেই হয়। অসহায় ষোল-সতেরো বছরের কিশোরী মেয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মবলি দিয়েছে। সে আমায় কি বললে জান ?

(নুটু কমলের মুখের দিকে চাহিল)

তাদের মকদ্দমা আমার কোর্টেই চলছিল। যতদিন মকদ্দমা চলেছে, ততদিন সে ঘৃণাক্ষরে তার অস্তিত্ব আমাকে জানতে দেয় নি। আমি অবশ্য পরিচয় জানতাম। কিন্তু আইনের বিধানের বিপক্ষে আমি নিরুপায় ; তাকে পথে দাঁড় করাতে আমাকে রায় দিতে হ'ল। তারপর সে আমার বাড়িতে এল। আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। সে আমায় বললে—বিচারক হিসেবে কর্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করেছেন ব'লেই ভরসা ক'রে আপনার কাছে এসেছি। দাদা হিসেবে এইবার কর্তব্য করুন। আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি বললাম -বোন, চিরদিন তুমি আমার সংসারে দিদি হয়ে থাক। কল্যাণী বললে—না, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আপনি কায়স্থ। তা ছাড়া আপনি পদস্থ সরকারী কর্মচারী। আপনার বাড়িতে আমার মেয়ে গরিব হয়ে মানুষ হতে পারবে না। যেখানে আমার মেয়ে সেই খাঁটি শিক্ষা পাবে, যেখানে আমি সত্যি সত্যি কুলীন বামুনের বিধবা বোন হয়ে থাকতে পারব, সেইখানে আপনি আমায় পেঁছে দিন। আমি নুটুদাদার কাছে যেতে চাই।]

নুট। (দৃঢ়স্বরে) সে হয় না কমল। কল্যাণীকে আমি আশ্রয় দিতে পারব না।

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) আমি যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি নুটু।

নুট। সঙ্গে নিয়ে এসেছ ? সে কি ? কোথায় কল্যাণী ?

কমল। স্টেশন থেকে তারা গরুর গাড়িতে আসছে। আমার আরদালী তাদের সঙ্গে আছে। আমি তাড়াতাড়ি আগেই এসেছি তোমায় খবর দিতে।

নুট। তুমি অন্যায় করেছ কমল। এ হয় না, হতে পারে না।

কমল। তুমি এ কথা বলবে—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কল্যাণী বললে, নুটুদাদাকে খবর দেবার দরকার নেই। তার কথা আমিও অন্তরে অন্তরে সমর্থন করেছিলাম।

নুট। কল্যাণীর, কল্যাণীর সন্তানের দেহে ধনীর রক্ত, অস্থিমজ্জায় তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষা ; দারিদ্র্যের শিক্ষা সহ্য করবার শক্তি সে রক্তের নেই। তুমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

(নুটুর পিছন দিকে ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার মেয়ের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নুটুর সমস্ত কথাই শুনিল)

কল্যাণী। (ম্লান হাসিমুখে) কিন্তু আমি তো ফিরে যাব ব'লে আসি নি নুটুদা।

নুটু। (সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কে ? কল্যাণী ?
কল্যাণী। হ্যাঁ, আমি। (মেয়ের প্রতি) মমতা, প্রণাম কর, তোমার মামা।
(মমতা প্রণাম করিল ; নুটু নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল) আমাদের ফিরিয়ে দেবে নুটুদা ?
নুটু। (আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, ফিরেই তোমাদের যেতে হবে কল্যাণী। এ কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারবে না। এ হয় না।
কল্যাণী। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ভেসে যাব দাদা ? (নুটু নিরুত্তর)
কমল। নুটু ! (নুটু নিরুত্তর)
চল কল্যাণী, ফিরে চল। এস।
(ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল বিমলা,—বরাবরই তাহার শাড়ির আঁচল দেখা যাইতেছিল)
বিমলা। যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। (নুটুর প্রতি) আমাকে দুঃখ দেবার জন্যে তুমি ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছ, তা আমি জানি। কিন্তু তবু বলব, তুমি পাষাণ। ছি ! ছি ! ছি !
(সকলে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিমলা অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর হাত ধরিল)
কল্যাণী। আপনি বউদি ?
বিমলা। হ্যাঁ। ছি, পরের মেয়ে ব'লে এত অবহেলাই কি করে ভাই ? দেখা না ক'রেই চ'লে যাচ্ছ ? এস, ঘরে এস। কোথায় যাবে ? কেন যাবে ? সত্যি 'ভাই' ব'লে যদি দাবি কর, তবে এ ঘরেও তোমার অখণ্ড অধিকার। সে অধিকার উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা ভাইয়েরও নেই, ভাজেরও নেই। এস (মমতার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) খুকী, চিরকাল তোমরা মামীদের দুর্নাম ক'রে এসেছ। এবার থেকে মামাদেরও দুর্নাম ক'রো, সব সময়ে মামীদেরই দোষ থাকে না।
নেপথ্যে দেবনারায়ণ, নুটু, বাড়ি রয়েছ ? নুটু !
নুটু। কে ?
দেব। আমি দেবনারায়ণ।
নুটু। বাড়ির ভেতর যাও তোমরা বিমলা।
বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) আমি কিন্তু খেতে যাব না ; তুমি যেন কথা দিয়ো না। যে বাড়িতে গয়না-কাপড়ের আদর, সে বাড়িতে আমি গরিব—খেতে যাব না, যেতে পারব না। এস ঠাকুরঝি, বাড়ির ভেতর এস। (কল্যাণী কমলাপদ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল)
কল্যাণী। কি হয়েছে বউদি ?
নুটু। কিছু হয় নি বোন। তোমরা বাড়ির ভেতর যাও। কমল, তুমি ব'স গিয়ে, আমি আসছি।
(বাহিরের দিকে প্রস্থান। কমল, বিমলা, কল্যাণী ও মমতা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। দেবনারায়ণ ও নুটুর কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ)
নুটু। আমার স্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, কিন্তু রাখা না-রাখা তাঁর হাত। আমি তাঁকে বাধ্য করতে পারব না।
দেব। গতবার যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নিজে আমি মাফ চাইতে এসেছি।
নুটু। তাতে আপনাদের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে দেবনারায়ণবাবু। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। বরং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার প্রথার সংস্কার করাই উচিত। কারণ সমাজ এখন মনুর বিধানে চলে না, সমাজ চলে লক্ষ্মীর বিধানে। সে বিধানে আপনারা আমরা পৃথক জাতি, পৃথক বর্ণ।

দেব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ নুটু?

নুট। আপনি কি মাফ চাইবার ছলে আমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছেন দেবনারায়ণবাবু?

দেব। বাড়িতে পেয়ে তুমি আমাকে অপমান করছ নুটু?

নুট। ঠিক—ঠিক। আমাকে আপনি মাফ করবেন দেবনারায়ণবাবু; আমার মনে ছিল না, আপনি আমার অতিথি। বরুণ! বরুণ! তোমার মাকে বল, দেবনারায়ণবাবু নিজে খেতে ডাকতে এসেছেন।

(বাড়ির ভিতর হইতে ঘোমটা টানিয়া কল্যাণী দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)

কল্যাণী। বউদিদি খেতে চ'লে গেছেন দাদা।

নুট। (সবিস্ময়ে) চ'লে গেছেন?

কল্যাণী। হ্যাঁ। এইমাত্র গেলেন। আপনার সাতুদিদি এসেছিলেন, তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন। (সে ভিতরে চলিয়া গেল)

দেব। খেতে গেছেন? বেশ, বেশ। (হাসিয়া চলিয়া গেল)

নুট। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!

নেপথ্যে মহাভারত। দাদাঠাকুর!

নুট। (ব্যস্তভাবে) মহাভারত? কি হ'ল মহাভারত?

(ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মহাভারতের প্রবেশ)

মহাভারত। হ'ল না দাদাঠাকুর। চিঠি ফিরিয়ে দিলে তোমার।

নুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) দাঁড়াও মহাভারত, একটু দাঁড়াও। একটু—(ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিল) কল্যাণী! কল্যাণী!

নেপথ্যে কল্যাণী। আমায় ডাকছেন? আসছি দাদা।

নুট। (আপন মনেই বলিল) "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"।

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। আমায় ডাকছিলেন নুটুদা?

নুট। ডাকছিলাম। কয়েকটা কথা বলবার আছে।

কল্যাণী। বলুন।

নুট। তুমি আমার ব্রতের কথা জান, এককালে তোমার সঙ্গেই কত কল্পনা করেছি।

কল্যাণী। জানি, সে কথা ভুলি নি নুটুদা। মেয়েকে নিয়ে আপনার ব্রতে দীক্ষা নেবার জন্যেই তো এসেছি দাদা।

নুট। মনে আছে কল্যাণী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা?—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।"

কল্যাণী। মনে আছে—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

নুট। (মহাভারতকে দেখাইয়া) এদের মূঢ় ম্লান মুখে সেই চাওয়ার কথা ফোটাবার জন্যে আমি শিক্ষাব্রত নিয়ে পাঠশালা করেছি। এরা যা দেয়, তা থেকেই আমার সংসার চলে।

আমার দীক্ষা নিতে হ'লে সেই পাঠশালার ভার নিতে হবে তোমাকে।

কল্যাণী। বেশ, আমাকে আপনার সহকারী ক'রে নিন।

নুটু। সহকারী নয় বোন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমায় পাঠশালার ভার নিতে হবে। (আমায় অন্য কাজ নিতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থার আগে অত্যাচার অবিচার থেকে এদের বাঁচাতে হবে।)

কল্যাণী। (নুটুকে প্রণাম করিয়া) আপনি ভার দিচ্ছেন, আমি মাথা পেতে সে ভার নিচ্ছি দাদা।

নুটু। আঃ, বোন, আমায় বাঁচালে তুমি। তোমাকে আশীর্বাদ করি—

কল্যাণী। আশীর্বাদ করুন দাদা, মরণ যেন এসে সকল ভার আমার লাঘব ক'রে দেয়। (বলিয়াই দ্রুত ঘরে চলিয়া গেল)

(নুটু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল)

মহা। আমি তা হ'লে বাড়ি যাই দাদাঠাকুর। তুমি আর কি করবে বল? শুনলাম, এখন টাকা দিলেও কোন উকিল-মোক্তারে আমার কাজ নেবে না। বাবুরা নাকি তামাম উকিল-মোক্তারকে ফী দিয়ে—

নুটু। (এই কথায় চকিতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল) অপেক্ষা কর মহাভারত, অপেক্ষা কর, আমি আসছি, আমি আসছি।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল]

বুকের দাগটা, জুতোর ছাপটা যেন মুছো না,—আমি আসছি।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বাবুদের বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষ

ঘরের মেঝেতে দামী আসন পাতা, সম্মুখে রুপার গ্লাসে জল, রুপার থালা-বাটিতে খাবার। একজন ঝি পাখা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। গিন্নী বসিয়া আছেন। স্বয়ং বড়বাবু শিবনারায়ণও দাঁড়াইয়া আছেন। এক পাশে অবগুণ্ঠনাবৃতা বিমলা দাঁড়াইয়া, তাহার সর্বাঙ্গ একখানা চাদরে ঢাকা

শিব। দেখ দেখি, তুমি শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতবউ—নুটুর স্ত্রী, নুটুই কি আমাদের সোজা লোক! সাধুপুরুষ—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই তো বললাম মা, বাড়ির মেয়েদের। ওরা বলে, সন্ন্যাসী কিসের? আরে বাপু, দাড়ি রাখলেই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো বনের সকল বাঁদরই সন্ন্যাসী।

গিন্নী। তুমি আর ব'কো না বাপু। তুমি বরং যাও এখান থেকে। ওগো নুটুর বউ, তুমি খেতে ব'স বাছা। এই দেখ যথাসাধ্য খাতির আমরা করেছি। আর যেন ব'লো না—গয়না নেই ব'লে আমরা অপমান করেছি।

শিব। দেখ দেখি! কি বল গিন্নী, তার ঠিক নেই। গয়না মানে—অলঙ্কার। পণ্ডিত লোকের কথায় কথায় অলঙ্কারের ঘটা, তার ছটা কি? সোনা-রুপোর ছটা সেখানে মণের কাছে ছটাক। (হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) ব'স মা, ব'স, খেতে ব'স। আমি যাই।

বিমলা। না, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি আমার বাপের চেয়েও বড়। আপনার সামনে আমার লজ্জা নেই।

(সে গায়ের চাদরখানি খুলিয়া রাখিল। দেখা গেল, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। বিমলা আসনে বসিল)

ত্যাগী পণ্ডিত লোকে কুশাসনে বসে বাবা, পাতায় খায়, মাটির ভাঁড় তাদের সম্বল। আপনারা এই দামী আসনে, রুপোর বাসনে খেতে দিয়েছেন, আমি কি তার অপমান করতে পারি? তাই দুখানা গয়না প'রে এসেছি। গিলটি নয় বাবা, খাঁটি সোনার।

(ঝির হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। বিমলাও উঠিয়া পড়িল)

আচ্ছা বাবা, এইবার আমি উঠলাম। এই আমার যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। আসি বাবা।

(সে চলিয়া গেল। কাহারও মুখে কথা সরিল না)

গিন্নী। (কয়েক মুহূর্ত পরে) হ'ল তো? হ'ল তো? নাকে ঝামা ঘ'ষে দিয়ে গেল তো?

শিব। (গম্ভীর রুদ্ধস্বরে) দেবনারায়ণ! দেবনারায়ণ!

(দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। বাবা!

শিব। পিঁপড়ে নয়, কাঁকড়া-বিছে। না, কেউটে সাপ। যদি বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর।

দেব। সাপ!

শিব। হ্যাঁ, নুটু মুখুজ্জে কেউটে সাপ। বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর ওকে। এস, সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

নুটুর আশ্রম

মহাভারত দাঁড়াইয়া আছে। নেপথ্য হইতে সাতু-ঠাকরুন বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল

সাতু। হ'ল তো? বলি, হ'ল তো? [পই পই ক'রে বারণ করলাম—ওরে নুটু, মান করিস নে, মানের গোড়ায় ছাই দে, মান বাড়বে। মানে মানে বউকে পাঠিয়ে দে। এখন হ'ল তো? খেলে তো চাঁদির জুতো? তোর বউকে রুপোর বাসনে খেতে দেওয়ার মানিার মানেটা কে না বুঝবে? কই, নুটু কই? গেলি কোথায়? বলি, নুকুলি নাকি ঘরে খিল এঁটে? বলি, ওরে অ নুটু!

নেপথ্যে নুটু। আসছি সাতুদি।

সাতু। আসতে হবে না রে, আসতে হবে না। বলছি—যা, এইবার কিংখাবের পালকি পাঠিয়ে বউকে নিয়ে আয়। মরদ বুঝি। বলি, অ নুটু!] (মহাভারতকে দেখিয়া) অ মরণ, তুই কে রে? অ, বলি, তুই মহাভারত?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদিঠাকরুন।

সাতু। বলি, হ্যাঁ রে, তোর নাকি পাখনা গজিয়েছে?

মহা। ওই! দিদিঠাকরুন কি বলছেন গো!

সাতু। বলি, পিঁপড়ের পাখা গজায় দেখেছিস তো—ফরফর ক'রে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরে? তোর নাকি তেমনই পাখনা গজিয়েছে? বাবুদের ছোটখোকা তোকে নাথি মেরেছে ব'লে তুই নাকি আদালতে গেছলি নালিশ করতে? পরামর্শদাতা বুঝি নুটু?

মহা। তিনি পরামর্শ দেবে কেন দিদিঠাকরুন? আমরা কি মানুষ নই?

সাতু। মানুষ! চাষার খেঁটে আবার মানুষ হ'ল কবে রে? অ্যাঁ, কালে কালে কতই দেখব! তা তোর পরামর্শদাতাকে বলিস, তার বউকে বাবুরা ধ'রে জুতো দিয়ে মেরেছে —অবিশ্যি রুপোর জুতো।

(প্রস্থান)

মহা। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর!

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। উনি আসছেন। তোমায় বললেন, একটু জল খেয়ে নিতে। এস, বাড়ির ভেতরে এস।

মহা। দাদাঠাকুর কই? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।

(কল্যাণীর সঙ্গে মহাভারত ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক দিক হইতে মোক্তারের পোশাক পরিয়া নুটুর ও অপর দিক হইতে অলংকারভূষিতা বিমলার প্রবেশ। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল)

নুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বিস্ময়ে ক্রোধে বলিয়া উঠিল) তুমি শেষে ভিক্ষে নিয়ে এলে বিমলা? সাতু-ঠাকরুন ব'লে গেল, বাবুরা তোমায় চাঁদির জুতো মেরেছে। সে কথা তবে সত্যি? কিন্তু ভিক্ষের গহনাগুলো গায়ে প'রে এলে যে? চাঁদির জুতোটা মাথায় ক'রে আনলে না যে বড়?

বিমলা। রুপো কেন? আমাকে হীরে-মানিক-বসানো সোনার জুতো মারতেও কারও ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। তুমিই আমাকে মার কথার জুতো।

নুট। এ গহনা কার? তুমি কোথায় পেলে?

বিমলা। এ গহনা আমার ব্যাটার বউয়ের। ব্যাটার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গহনা আমি আগাম নিয়েছি।

নুট। কি বলছ তুমি বিমলা?

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝির মেয়ে মমতার সঙ্গে আমার অরুণের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। এ গহনা মমতার—আমার ভাবী পুত্রবধূর।

(কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া নুটুকে প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটবিহারীর শহরের বাসা

নুটবিহারী এখন মোক্তার। অফিস-ঘরে একদিকে একটি তক্তাপোশে বসিবার জায়গা, তক্তাপোশের উপর একটি ডেস্ক। আশেপাশে কতকগুলি ফাইল, দোয়াত ও কলমদান। ইহা ছাড়া কয়েকখানি চেয়ার, একখানি বেঞ্চ। দেওয়ালে দরজার মাথায় একটি বড় ফ্রেমে একখানি কার্পেটের সূচীশিল্প; কার্পেটে বুনিয়া লেখা—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"। ইহা ছাড়া একটি পুরানো আলমারিতে বই—অ্যারিস্টটল, শেক্সপীয়ার ইত্যাদি। বাংলা বই—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি

(কোর্টের পোশাকে নুটু ও জমিদারের কর্মচারী গোপীনাথ আসিয়া প্রবেশ করিল। গোপীনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া কথা আরম্ভ করিল। নুটু চাপকান খুলিয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজে মন দিল)

গোপী। আপনি হলেন প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের সন্তান, বিবেচনা করুন, তার ওপর ব্রাহ্মণ; তাই ধরুন আমার বলা; ও ছেঁড়া কাঁথার আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে ফেলুন নুটুবাবু, একটা মিটমাট ক'রে নিন।

নুট। (কাজ করিতে করিতেই) ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে মিটমাট কি আছে বলুন?

গোপী। অ্যাই দেখুন, মিটমাট নেই? বিবেচনা করুন, আপনি আর প্রজাদের পক্ষ নিয়ে বাবুদের সঙ্গে লাগবেন না। আর বাবুরাও তাঁদের যা কিছু কাজকর্ম এখানকার আদালতে আপনাকেই দেবেন। বছরে বাঁধা মাইনে একটা পাবেন; তা ছাড়া মামলা-মকদ্দমা যখন চলবে, তখন অর্ধেক ফীও পাবেন।

নুট। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু?

গোপী। এটা হয়েছে। কিন্তু আপনি যা বলবেন, তার উত্তর বাকি আছে।

নুট। আমি কিছু বলব না।

গোপী। তা হ'লে বিবেচনা করুন, বক্তব্য আমার আরও আছে। ধরুন, এই এক বছর এমনই ক'রে বিরোধ ক'রে লাভ কি করলেন আপনি? নামডাক হয়েছে, কিন্তু পয়সা কই হ'ল আপনার?

নুট। এইবার আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু?

গোপী। সদরের নবকান্তবাবু উকিলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়—মস্ত উকিল। বিবেচনা করুন, ফৌজদারিতে অমন বাঘা উকিল আর জন্মাল না। হাকিমকেই শুনিয়ে দিত কড়া কথা। ১৯১৫ সালে ১২ই জুলাই কোর্টে বহশ করতে করতেই বিবেচনা করুন, মারা গেলেন। তিনিও প্রথমে আপনার মত বিনা পয়সায় কেস নিয়ে নাম করেছিলেন। বাস্, যেই নাম হ'ল, অমনই সেই যে আট টাকা ফী ক'রে চেপে বসলেন, বিনা পয়সায় আর ন'ড়ে বসতেন না। ১২ই জুলাই নবকান্তবাবু মারা গেলেন, ১৩ই তারিখে ছেলেরা হিসেব করলে—কোম্পানির কাগজে, তেজারতী বন্ধকী কারবারে, ব্যাঙ্কে মজুত আপনার এক লক্ষ পঁয়ষটি হাজার দু শো পঁচাত্তর টাকা। জমিদারির আয় আপনার চোদ্দ হাজার সাত শো টাকা। আবাদী জমি এগারো শো বিঘে। তারপর বিবেচনা করুন, বড় বড় কোম্পানিতে শেয়ার। এইবার আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন। (ঘন ঘন পা দোলাইতে লাগিল) কি বলছেন বলুন তা হ'লে?

নুট। আপনি তা হ'লে আসুন গোপীনাথবাবু।
গোপী। আসব ?
নুট। হ্যাঁ। তা হ'লে আপনি আসুন।
গোপী। আর একটু বক্তব্য আছে নুটুবাবু।
নুট। বলুন।
গোপী। আপনি তা হ'লে সাবধান। নমস্কার।
নুট। নমস্কার। (প্রস্থান)

(গোপীনাথের পুনরায় প্রবেশ, নুটু রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল)

গোপী। বিবেচনা করুন, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। এই এক বছরে তেতাল্লিশটা মামলা আপনি বাবুদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কটাতে আপনি জিতেছেন, হিসেব রাখেন আপনি ? আপনার হিসেব না থাকে, আমার কাছে শুনুন, - সাতটি কেসে কেবল জরিমানা হয়েছে, তাও চাপরাসীর। আর চৌত্রিশটা কেস ডিস্‌মিস। তার পনেরোটাতে খরচা শুদ্ধু দিতে হয়েছে আপনার পক্ষকে। মহাভারতকে রক্ষা করতে বাকি খাজনা দিয়েছেন দু শো পনরো টাকা দশ আনা তিন পাই। মকদ্দমা-খরচার হিসেব নেই। ভাল। বিবেচনা করুন, করুন রক্ষে তাকে। কিন্তু আপনি সাবধান।

(প্রস্থান)

(নুটু আপন মনেই হাসিল, তারপর চোখ মুদিয়া পিছনের বালিশে হেলান দিয়া আবৃত্তি করিল)

নুট। "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—"

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। এই যে দাদা! না খেয়েই আজ আপনি কোর্টে চ'লে গিয়েছিলেন দাদা ? বউদি বললেন—
নুট। এস বোন, এস। কখন এলে কংকণা থেকে ? কেমন আছ ?
কল্যাণী। এই আসছি, আছিও ভাল। কিন্তু আপনি উঠুন দেখি, আসুন, খাবেন—
নুট। মমতা কেমন আছে ? তাকে সঙ্গে আন নি ?
কল্যাণী। সেও এসেছে। শ্যামার সঙ্গে সে গল্প করছে। আসুন, উঠে আসুন।
নুট। তোমার পাঠশালার খবর কি ?
কল্যাণী। মন্দের ভাল। বাবুরা যে পাঠশালা করেছেন, তার মাইনে উঠিয়ে দিয়েছেন। তবুও আমাদের পাঠশালায় পনেরোটি ছেলে রয়েছে। আসুন, উঠে আসুন। আপনি খাবেন, আপনাকে আমি খবর বলব।
নুট। ফাস্ট আওয়ারেই কাজ ছিল কল্যাণী, কাজ সেরে উঠে খাওয়ার সময় হয় নি। কালও কাজ রয়েছে অনেক, সেগুলো আজ না সেরে রাখলেই নয়। কাজ না সেরে আজ আমি উঠব না। কাজ বড় বেশি বাকি প'ড়ে গেছে ভাই।
কল্যাণী। এত বেশি কাজ আপনি নেন কেন ?
নুট। বেগারের কাজ কিছু বেশিই হয় বোন।
কল্যাণী। কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে তো কাজ করতে হবে ?
নুট। শরীর! (হাসিল) I see a man's life is a tidious one. I have tired

myself। কল্যাণী, এক এক সময় ইচ্ছে হয়, মৃত্যুই আমার ভাল।

(কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল)

বিমলা আমায় শান্তি দিলে না কোনদিন। একটা গান শোনাবে বোন, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি!

(খাবারের থালা হাতে বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দিনরাত্রি খাওয়া খাওয়া ক'রে তোমার কাজে অশান্তি ক'রে দিই, না? (হাসিল) ভাত না খাও, এই অল্প একটু খেয়ে নাও দেখি। অশান্তি করতেই এসেছি আবার। ওগো বেয়ানঠাকরুন!

কল্যাণী। না বউদি, 'বেয়ান' বলবেন না ভাই।

বিমলা। কেন ভাই? সম্বন্ধটা কেমন একটু টক-মেশানো মিষ্টি মিষ্টি ক'রে দিয়েছি বল তো? আর মমতার সঙ্গে যখন অরুণের বিয়ে দোব—

কল্যাণী। তবুও আমি আপনার গরিব ঠাকুরঝি হয়েই থাকব বউদি।

বিমলা। কি জানি ভাই! আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কিসে কি দোষ হয় বুঝি না। বেশ। তুমি একটা গান গাও দেখি, তোমার দাদা গান শুনতে শুনতে খাবার খেয়ে ফেলুন।

নুটু। খাবারের থালাটা আমায় দাও বিমলা। গান এখন ভাল লাগবে না। আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

বিমলা। (হাসিয়া) সুরের মধ্যে বেসুর এলেই গান আর ভাল লাগে না, নয়? এখুনি তুমি কল্যাণী ঠাকুরঝিকে গান গাইতে বলছিলে, আমি আসবামাত্র সে গানে তোমার অরুচি ধ'রে গেল?

কল্যাণী। আমি এখন যাই দাদা। শ্যামার সঙ্গে এখনও দেখা করি নি, সে রাগ করবে। অরুণ বরুণ কোথায় বউদি?

নুটু। বিমলা, খাবারটা দাও।

বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝি গান না গাইলে আমি দোব না।

নুটু। বিমলা!

[বিমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া খাবারের থালাটা আগাইয়া দিল, নুটুও হাত বাড়াইল; কিন্তু নুটু ধরিবার আগেই বিমলা থালা ছাড়িয়া দিল, থালাটা পড়িয়া গেল]

কল্যাণী। আহা, পড়ে গেল! (তাড়াতাড়ি কুড়াইতে গেল)

বিমলা। কুড়িও না ঠাকুরঝি। ওগুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

নুটু। না না। কুড়িয়ে নেবে বইকি। গরীব-দুঃখী কাউকে দিয়ে দেবে।

বিমলা। না। ও জিনিস কাউকে দেবার নয়, যা তোমাকে দিয়েছি, সে জিনিস—

নুটু। আঃ, কি বলছ বিমলা?

বিমলা। বলছি, সমস্ত জীবনটাই তো এমনই ক'রে আমি বাড়িয়ে ধরলাম তোমার দিকে, এমনই ক'রেই তুমি ধরলে না। সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। ধুলোয় মিশিয়ে সে মাটিই হয়ে যাবে। সে কি তুলে অন্য কাউকে দেওয়া যায়?

(প্রস্থান)

নুটু। (একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কল্যাণী।

কল্যাণী। দাদা!

নুটু। আমায় তুমি মাপ কর বোন। বিমলার কথায়—

কল্যাণী। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো? আমাদের সংসারে ননদ-ভাজে কত

ঝগড়া হয় ! আর বউদি তো আমায় কিছু বলেন নি।

(বিমলার পুনরায় খাবার লইয়া প্রবেশ)

বিমলা। (খাবারের থালা সযত্নে নামাইয়া দিয়া) নাও, খাও।

কল্যাণী। গান গাইব বউদি ?

বিমলা। না-গাইলে বুঝব, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

নেপথ্যে কমলাপদ। নুটু !

নুটু। কমলাপদ ? এস এস। কলকাতা থেকে কখন ফিরলে ?

(কমলাপদর প্রবেশ)

কমল। এই যে বউদি ! আপনার কাছেই এসেছি আমি। শিগগির খাবার নিয়ে আসুন। আপনাদের বরাদ্দমত দশ পয়সার হিসেব আজ চলবে না। আপনার অরুণ আই. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। বরুণও ম্যাট্রিকে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।

বিমলা। দাবিটা শুধু আমারই ওপর চালাবেন ঠাকুরপো ? অরুণের শাশুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে রেহাই দিচ্ছেন বুঝি বোন ব'লে ?

কল্যাণী। রেহাই দিলেই বা আমি নোব কেন বউদি ? কিন্তু অরুণ বরুণ কোথায় বউদি ?

বিমলা। তারা মহাপুরুষের ছেলে, ভাবী মহাপুরুষ। আজ রবিবার, সেই ভোরবেলায় দুই ভাই সেবক-সমিতির মুঠির চাল আদায় করতে বেরিয়েছে। এস ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোর জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে। আপনি কিন্তু পালাবেন না ঠাকুরপো।

(কল্যাণী ও বিমলার প্রস্থান)

কমল। তোমায় কিন্তু একটা কথা বলব নুটু। কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে ব্যাপারটা এইবার মিটিয়ে ফেল।

নুট। কি বলছ তুমি ?

কমল। ভালই বলছি। আজ তিন বছর ধ'রে বিরোধ ক'রে আসছ। এখানকার ফৌজদারী আদালতে তুমি মামলা চালাচ্ছ, ও'রা জজকোর্টে হাইকোর্টে যাচ্ছেন, সেখানে তোমাকে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে গরিব মক্কেলের জন্যে। ও'দের তো পয়সার অভাব নেই লোকে বলে—কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

নুট। বিরোধ আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গেই। ওই দেবতাটির অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি ধুলোয় নামিয়ে দোব।

কমল। ছি ছি ! তুমি কি যে বল নুটু !

নুট। বলি আমি ঠিক কথাই। কিন্তু তোমার ভাল লাগছে না। না-লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে তোমার মাথার ওপর চেপেছে। পায়ের পথ তো সংকীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গেছে। মাথার টাকটি যে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে উঠছে।

কমল। (সশব্দে হাসিয়া উঠিল) কথাটা বড় ভাল বলেছ ! উঃ, বড্ড বলেছ !

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ওগো, মহাভারত এসে অঝোরঝরে কাঁদছে।

নুট। কাঁদছে ? মহাভারত কাঁদছে ? তাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

(বিমলার প্রস্থান)

কমল, তোমার বোধ হয় এখানে আর থাকা উচিত হবে না।

(মহাভারত আসিয়া নুটুর পা দুইটা চাপিয়া ধরিল)

কমল। আচ্ছা, আমি চলছি। বউদিকে ব'লো, ও-বেলায় আসব আমি। (প্রস্থান)

নুট। ওঠ মহাভারত, ওঠ। আগে কি হয়েছে বল, তারপর কাঁদবে।

(মহাভারতের কান্না বাড়িয়া গেল)

মহাভারত! (মহাভারত তবু উঠিল না)

মহাভারত! (মহাভারত তবু উঠিল না)

(রূঢ়স্বরে হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া) মহাভারত!

(মহাভারত উঠিল)

চোখের জল মোছ, চোখের জল মোছ। খাড়া সোজা হয়ে ব'স। খটখটে শুকনো গলায় বল, কি হয়েছে?

মহা। (করুণ স্বরে) আজ্ঞে, আমার পুকুরের সমস্ত মাছ, এই হালি পোনা—আধ পো, তিন ছটাক—

নুট। ছটাক সের নয়, পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল?

মহা। বাবুরা জোর ক'রে ধরিয়ে নিলে।

নুট। আর?

মহা। আমার গরু বাছুর সমস্ত জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

নুট। হুঁ। আবার নতুন কি হ'ল?

মহা। বাবুদের হুকুম হয়েছে, তোমার জমি কেউ চষতে পারবে না। কারও ছেলে তোমার পাঠশালায় পড়তে পাবে না। আমি বলেছি, সে আমি পারব না, তাই—

নুট। তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও মহাভারত। আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়িও না। তুমি পারবে না।

মহা। এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বললে দাদাঠাকুর? আজ তিন পুরুষ আমরা তোমাদের জমি ক'রে আসছি, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগ তোমরা নিয়ে আসছ। আজ তুমি আমাকে এই কথা বললে?

নুট। বললাম, বলবার কারণ ঘটেছে। আজ তুমি কেঁদেছ। মহাভারত, দুঃখের চাপে যারা হার মানে, হার মানবার আগে তারা কাঁদে।

মহা। (ভাল করিয়া চোখের জল মুছিয়া) বেশ, এই চোখের জল মুছলাম। আর যদি কোনদিন চোখের জল দেখতে পাও, সেদিন থেকে মুখদর্শন ক'রো না।

নুট। বিমলা!

(বিমলার প্রবেশ)

মহাভারতকে জল খেতে দাও। জল খেয়ে একটু সুস্থ হও মহাভারত, আমি স্নান ক'রে দুটো মুখ দিয়ে নিই। তারপর তোমায় এস. ডি ও র কাছে নিয়ে যাব।

মহা। আগুনে জল দিতে বলছ দাদাঠাকুর? তুমি চান ক'রে খেয়ে নাও, আমার মুখে এর পিতিকার না ক'রে জল রুচবে না, আমাকে ব'লো না।

নুট। কোনদিন কখনও যদি আবার এমনই ভুল হয় মহাভারত, তবে এমনই ক'রেই তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। এস। বিমলা, ফিরতে আমাদের দেরি হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাসকামরা। শিবনারায়ণবাবু ও গোপীনাথ। শিবনারায়ণ সেই পূর্ববৎ তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত, চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু তামাক টানিতেছেন)

শিব। (ব্যঙ্গশ্লেষপূর্ণ ভঙ্গীতে) বল কি গোপীনাথ? অ্যাঁ! ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল! টুলো শিব পণ্ডিতের নাতির মুখে চোস্ত ইংরিজী বোল। নুটু মোক্তার ইংরিজীতে সওয়াল করলে!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ফরফর ক'রে ইংরিজীতে সওয়াল করলে। একেবারে তপ্ত খোলায় যেন খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। খই!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, তপ্ত খোলায় নুটু মুখুজ্জে খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে গোপী, ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে। কিছু ভয় নেই। গরম খই তোমার চুপসে গ'লে যাবে। (হা হা করিয়া হাসিলেন) কে রয়েছিস? বড়-বাবুকে ডাক্। ওরে, চা নিয়ে আয়। অ বাপ ভগবান, দয়া কর বাপধন। ভগবান! ওরে ভগবেনে, হারামজাদা শুয়ারকি বাচ্চা!

নেপথ্যে ভগবান। আজ্ঞে, যাই হুজুর।

(দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। আমায় ডাকছ বাবা?

শিব। জি হুজুর।

দেব। বল।

শিব। আরে জনাবালি, বৈঠিয়ে, পহেলে তসলীম তো রাখিয়ে।

(দেবনারায়ণ বসিল)

গোপীনাথ!

গোপী। আজ্ঞে?

শিব। একবার পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দাও তো। ভগবানকে দেখ তো বাবা। চা আনতে বলেছি কখন। চিত্ত-ঘোড়া যে চাঁ-হা চাঁ-হা ক'রে অস্থির হয়ে উঠল হে।

গোপী। ভগবান! ভগবান! (প্রস্থান)

শিব। (এইবার উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন) সব কথা সবার সামনে বলা যায় না দেবু। ব্যাটা ভেকধারী সোজা পাত্র নয়। ঘর থেকে যেতে বললে বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনবে। (বারকয়েক নল টানিয়া ফেলিয়া দিয়া) এস.ডি.ও. সায়েব টাউন-হলের চাঁদা ধরেছিলেন, দিয়েছ সেটা?

দেব। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দিয়েছি আড়াই শো টাকা।

শিব। আরও আড়াই শো টাকা আজই এখুনি তুমি গিয়ে দিয়ে এস। বলবে, বাবা শুনে রাগ করলেন, বললেন—আড়াই শো টাকা দেওয়া মানে হুজুরের অসম্মান করা; আমাদের চাঁদা পাঁচ শো টাকা লেখা হোক।

দেব। কেন আবার আড়াই শো টাকা দেবে বাবা? সায়েব তো খুশি হয়েই—

শিব। কথার প্রতিবাদ ক'রো না দেবু। যা বলি, তাই শোন। গোপীর কাছে যা শুনেছি, তাতে হরুশে চাষার নাতিটা, কি নাম যেন—

দেব। মহাভারত।

শিব। হ্যাঁ, মহাভারতের মাছ ধরা, গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মামলার অবস্থা ভাল নয়। নুটু

নাকি ভাল তদ্বির করেছে। সওয়ালও করেছে খুব জোর। জরিমানা হয় তাকে পারা যায়, আমাদের গোমস্তা চাপরাসীর জেল হ'লে—সে বড় লজ্জার কথা, অপমানের কথা।

দেব। বেশ, তাই করছি। এই সঙ্গে কিন্তু একটা কথা তোমাকে না জানালে আর চলছে না। ছোটখোকাকে শাসন করা দরকার হয়েছে। তাকে একটু শাসন কর তুমি।

শিব। কেন? আমির-উল-উমরা ছোটে নবাব আমার কি করলেন আবার? (হাসিয়া) পয়সাকড়ি বেশি চাচ্ছে বুঝি? তা দিও হে, দিও। আমি বরং লিভার বাঁচিয়ে মদ খেতে ব'লে দোব।

দেব। না। নুটুর পাঠশালার চারিদিকে আজকাল ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে, ওখানে যে মেয়েটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—

শিব। (সশব্দে উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন) তার ওপর নজর দিয়েছে! বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হোয় তো থোড়া থোড়া।

দেব। না বাবা, হাসির কথা নয়। কোন কিছু যদি ঘটে, নুটু ছাড়বে না। আর আমাদের বাড়ির ছেলে এ রকম মামলায় আসামী হ'লে দেশে আর বাস করা চলবে না।

শিব। তা আমি সাবধান ক'রে দোব ছোটে নবাবকে। তবে দশ-বিশ টাকা চাইলে যেন দিও বাপু। কি রকম, বড়বাবুর মুখ যে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল! ওহে, আমি বড় হ'লে বাবা আমার বাগানবাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) এক কাজ কর, ছোটে নবাবকে শহরের গদিতে বসিয়ে দাও। সেখানে মামলা-সেরেস্তার কাজ দেখুক, সায়েব সুবোর সঙ্গে মেলামেশা করুক। লোকাল-বোর্ড ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেম্বার করে দাও। পার তো ধ'রে-প'ড়ে অনারারি হাকিম ক'রে দাও। বুঝলে?

(গোপীনাথ ও ভগবান প্রবেশ করিল, ভগবানের হাতে চা)

দেব। তা হ'লে আমি এক্ষুনি চ'লে যাই?

শিব। হ্যাঁ। আর একটা কথা। এবার অজন্মার বছর। চাষীদের ধান টাকা দিতে কার্পণ্য ক'রো না যেন। সকলকেই কিছু কিছু দিও। আদায় হবে কি হবে না, সেই বিবেচনাটাকেই যেন বড় ক'রে দেখো না এবার, বুঝলে?

(দেবনারায়ণের প্রস্থান)

গোপী। দেশকাল বড়ই খারাপ পড়েছে হুজুর। অজন্মা লেগেই আছে। এই বিবেচনা করুন, ১৩২৩ সালে একবার, ১৩২৬ সালে একবার, ১৩৩০ সালে তো, বিবেচনা করুন, মাঠে কাস্তে যায় নাই। ফের বিবেচনা করুন, ১৩৩৩ সালে, আবার ধরুন এই ১৩৩৬ সালে। আর সে আমলে আপনার ১৩১৩ সালে আকাড়া গিয়েছে, তার আগে বিবেচনা করুন, ১৩০০ সালের মধ্যে আর নেই, ১২৯৪ সালে—

শিব। ১২৯৪ সালে! বটে! (চায়ে চুমুক দিয়া) ওরে ভগবান, গোপীনাথকে চা এনে দে। গলা শুকিয়ে গেল বেচারীর।

গোপী। (জোড়হাত করিয়া) আজ্ঞে, হুজুর, চা আমি খাই না। বিবেচনা করুন, চা তো আর ডাল-ভাত নয় যে, না হ'লে মানুষ বাঁচে না। জীবনে হুজুর চা খেয়েছি তিনবার। একবার আপনার ১৩০৫ সালে—সেবার ভীষণ বর্ষা, তারিখ আপনার ১২ই আষাঢ়।

শিব। কি বার?

গোপী। আজ্ঞে, বৃহস্পতিবার।

শিব। (হাসিয়া) তিথি-নক্ষত্র মনে আছে বাবা—তিথি-নক্ষত্র?

গোপী। আজ্ঞে, অমাবস্যে তিথি—উপবাস করেছিলাম কিনা। তবে নক্ষত্রটা মনে নেই হুজুর।

শিব। বটে !

গোপী। হুজুরদের সঙ্গে শ্রীরামপুরের চৌধুরীদের মকদ্দমা ; চল্লিশ হাজার টাকা তমসুকের নালিশ, সুদে আসলে এক লক্ষ পাঁচ হাজার দু শো তিন টাকা সাত আনা দাবি। এই মামলায় গিয়েছি মুর্শিদাবাদ। বর্ষা আপনার ভীষণ, তার ওপর গায়ে ছিল বিলিতী কম্বল, বিবেচনা করুন, একেবারে গ্যাড়োল ভেড়ার মত অবস্থা। গলা পর্যন্ত ধ'রে গেল। তা সেই দিন উকিল হরিমোহনবাবু বললেন—গোপীনাথ, চা খাও, উপকার হবে। খেয়েছিলাম তা, বিবেচনা করুন, উপকার হয়েছিল হুজুর। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

শিব। না না, খাও না যখন, তখন দরকার কি ?

গোপী। আজ্ঞে, চা যেমন ডাল-ভাত নয়, তেমনই, বিবেচনা করুন, বিষও নয়। তার ওপর আপনি মুনিব যখন বললেন, তখন না খেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

(দেবনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ)

দেব। মামলায় রায় হয়ে গেছে বাবা। আমাদের চাপরাসী দুজনের ছ মাস ক'রে জেল হয়েছে, গোমস্তার এক বছর। আমি পথ থেকেই খবর শুনে ফিরে এলাম।

গোপী। ভগবান, শিগগির চা আন। আপীল করতে যেতে হবে। আপীলে সব উল্টে যাবে হুজুর। রুদ্রপদবাবু পাকা ঘাগী ফৌজদারী উকিল, টেবিলে চাপড় মেরেই সব—

শিব। (রুষ্টস্বরে) গোপীনাথ ! (গোপী মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল)

দেব। সওয়ালে নুটু মুখুজ্জে আমাদের অপমানের বাকি রাখে নি। বলেছে—দেশে ধনী জমিদার অনেক আছেন, তাঁদের অন্যায় নেই এমন নয়, আছে ; কিন্তু তবু তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বারো মাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রে এসেছেন, দেশের গুণীদের বহুকাল পর্যন্ত তাঁরাই সসম্মানে প্রতিপালন করে এসেছেন ; কিন্তু কঙ্কণার বাবুরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাঁরা—

শিব। থাক্। তুমি গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে সদরে যাও। আপীল মঞ্জুর করিয়ে জামিনে ওদের খালাস ক'রে আন। ফৌজদারী বড় উকিল যে কজন আছে, তাদের ওকালত-নামা দাও। এখনই, দেরি ক'রো না।

দেব। টাউন-হলের চাঁদা আরও আড়াই শো টাকা, আমি বলছিলাম, আর দিয়ে দরকার নেই।

শিব। দেবে না ? ওইখানেই তো বড়বাবু, তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। বেশ, সায়েবকে না দাও, দিও না ; কিন্তু টাকাটা আর ঘরে ঢুকিও না। মাঠে একটা বড় সিচের পুকুর ছিল, সেটা বোধ হয় এতদিনে মজে এসেছে। ওই টাকায় পুকুরটার পঙ্কোদ্ধার করিয়ে দাও—চিরঞ্জীব দীঘি।

দেব। চিরঞ্জীব দীঘি !

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে বিবেচনা করুন, চেঁচুরে দীঘি। খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত ২৫০৩ নং পলট। পরিমাণ ৪ একর ২৫ ডেসিমিল। উত্তরে রামহরি ঘোষ—

দেব। আচ্ছা, তাই হবে। এস গোপীনাথ। (প্রস্থান)

গোপী। (যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে) ভগবান, এখনও— (প্রস্থান)

শিব। কে আছিস ? কালী বাগদীকে পাঠিয়ে দে তো (উঠিয়া পায়চারি আরম্ভ করিলেন)

(কালীর প্রবেশ)

কি রে ব্যাটা, বেঁচে আছিস ? (কালী প্রণাম করিল)

হুকুম করলে কাজ তামিল করতে পারিস এখনও ?

(কালী সবিনয়ে মৃদু হাসিল)

নাঃ, আজ নয়, আপীল-কেস হয়ে যাক, তারপর। ভগবান, তামাক নিয়ে আয়।

(কালী ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল)

নেপথ্যে কালী। ভগবান ! ভগবান ! দাসজী !

তৃতীয় দৃশ্য

কঙ্কণায় নুটুর আশ্রম। পূর্বদৃশ্য—প্রথম অঙ্কের অনুরূপ।
আট-দশটি ছেলেমেয়ে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া গান করিতেছে।

গান

শোণিতে ভাসাল ধরণী যাহারা
তারা নয় তারা নয়,
মোরা পথ চাই নূতন বীরের
গাহি তাহাদেরই জয়।

ছেলে— দিগ্বিজয়ীর উদ্ধত অসি
মেয়ে— যুগে যুগে কত উঠিল ঝলসি,
ছেলে— বীর তারা নয়, ধরণী মাগিছে
নূতন অভ্যুদয়।
মেয়ে— বিধাতার খেদ ঘুচাবে যাহারা
মানুষের যত ভেদ,
ছেলে— ভাই ব'লে যারা ভায়েরে চেনাবে
রচিবে নূতন বেদ
মেয়ে— মুক্ত যাদের দীপ্ত কৃপাণ
ছেলে— মিথ্যারে শুধু করে খানখান
উভয়ে— মিতালির ডোরে বিশ্ব বাঁধিতে
যাদের দিগ্বিজয়।

(গানের মধ্যেই কমলাপদ প্রবেশ করিল)

কল্যাণী। (ছেলেমেয়েদের প্রতি) তোমরা যাও, আপনার আপনার জায়গায় গিয়ে পড়তে ব'স।

(ছেলেমেয়েদের প্রস্থান)

কমল। দুটো কথা বলবার জন্যে এসেছি কল্যাণী। একটা নুটুর কথা, একটা আমার নিজের।

কল্যাণী। বলুন।

কমল। নুটুর কথাই আগে বলি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এড বন্ধ করেছে। সে এড পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

কল্যাণী। বন্ধ করলে তার ওপর আর জোর কি বলুন ?

কমল। নুটু অবশ্য খুব লড়ছে। খবরের কাগজেও সে লিখেছে. কিন্তু কোন ফল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। বাবুরা যখন ফ্রী প্রাইমারি স্কুল করেছেন, তখন এ স্কুলের জন্যে এড ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড দেবে না।

কল্যাণী। না দেয়, সে কষ্ট আমি স্বীকার ক'রে নেব কমলদা।

কমল। কষ্টস্বীকারের একটা মাত্রা আছে কল্যাণী। এই আট-দশটি ছেলে, মাইনে বোধ হয় চার আনা হিসাবে দু টাকা আড়াই টাকা। নুটু দেয় পনেরো টাকা। কিন্তু পাঠশালার খরচও আছে। বাদ দিয়ে যা থাকে, তাতে তোমার মমতার চলা অসম্ভব।

কল্যাণী। বাগানে তরি তরকারি হয়, দুটি গরু পুষেছি—দুধও ঘরে হয়, চাষীদের ছেলে-মেয়েদের জামা তৈরি ক'রে দিই, তাতেও কিছু হয়। চ'লে কোন রকমে যাবেই কমলদা।

কমল। চ'লে যাবে, কিন্তু এ ভাবে চলা উচিত নয় কল্যাণী। এ কৃচ্ছ্রসাধনের তোমার প্রয়োজন কি? নুটু নিজেও এ চায় না। সে যখন বলছে পাঠশালা তুলে দিয়ে তার বাড়িতে থাকতে, তখন এ কষ্ট কেন?

কল্যাণী। না, সে হয় না কমলদা।

কমল। নুটুর স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা, সন্দিগ্ধচিত্ত—নুটু সে কথা আমায় গোপন করে নি।

কল্যাণী। না। ও-কথা বলবেন না। তিনি আমায় সহোদরার মত স্নেহ করেন। কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন, সে অসম্ভব।

কমল। বেশ, ভিন্ন বাসা ক'রে তুমি থাক। নুটুর বাসার কাছেই বাড়ি খালি রয়েছে—

কল্যাণী। না, সেও হয় না কমলদা।

কমল। কেন? একটু স্পষ্ট ক'রে বল কল্যাণী।

কল্যাণী। স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে কমলদা?

কমল। বুঝে যে উঠতে পারছি না বোন।

কল্যাণী। এ সংসারে ভগবান আমাকে স্নেহ মমতা আশ্রয়—সমস্ত কিছুর কাঙাল করেছেন। সে কাঙালপনা আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এক জায়গায় তাঁর বিধানকে আমি মানতে পারি নি কমলদা, সে আমি মানতে পারব না। অর্থ-সাহায্য—না কমলদা, সে আমি পারব না। আমার পিতৃকুলের, আমার স্বামীকুলের সমস্ত মর্যাদাই আমার ভেসে গেছে; বহুকষ্টে অবশেষ রেখেছি ওইটুকু, ওইটুকুও যদি চ'লে যায়, তবে আমার কি থাকবে কমলদা?

কমল। তোমার সে মর্যাদা অটুট থাক্ বোন, ও-কথা তোমায় আর বলব না। কিন্তু তোমার তো গহনা রয়েছে, তাই থেকে—

কল্যাণী। সে গহনা মমতার বিয়ের জন্যে রেখেছি, ওইটুকু তার পিতৃধন। ওতে কি আমি হাত দিতে পারি কমলদা?

কমল। নুটু কখনও তার ছেলের বিয়েতে গহনা দাবি করতে পারে না।

কল্যাণী। আমার মেয়ে যে শুধু-হাতে-পায়ে স্বামীর ঘরে যেতে পারে না কমলদা।

কমল। শোন কল্যাণী, নুটুই আমায় পাঠিয়েছে, তার বিশেষ অনুরোধ—

কল্যাণী। ও-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

কমল। এখানে থাকায় বিপদও আছে। বাবুদের সঙ্গে নুটুর বিরোধ দিন দিন যে রকম তীব্রতর হয়ে উঠছে—

কল্যাণী। বাবুদের থিয়েটার-পাগলা ছোট ছেলেটা কয়েকদিন আশেপাশে গান গেয়ে ঘুরে গেছে।

কমল। বলছ কি কল্যাণী?

কল্যাণী। ভয় পাবেন না কমলদা, আমার কাছে পাঠশালার বেত আছে।

কমল। (চিন্তা করিয়া) তুমি দেখছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার কিন্তু এ ভাল মনে হচ্ছে না বোন। যাক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে রক্ষা করুন—এই কামনাই তাঁর

কাছে জানাচ্ছি। তবে অনুরোধ রইল, বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'লে পত্র লিখে জানাতে আমায় দ্বিধা ক'রো না। আমি যেখানেই থাকব, সংবাদ নেব তোমার।

কল্যাণী। কোথায় যাবেন কমলদা ?

কমল। আমার ট্রান্সফারের হুকুম হয়েছে বোন।

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। দিদিঠাকরুন !

কল্যাণী। এস মহাভারত।

মহা। এই যে বাবু! পেনাম। একটি ভদ্দনোক এসেছেন দিদিঠাকরুন। আপনাকে খুঁজছেন।

কল্যাণী। ভদ্রলোক ! আমাকে খুঁজছেন !

মহা। ইস্টিশান থেকে আসছেন গরুর গাড়িতে। এই লম্বা পাজামা পরনে, মাথায় বাবরী চুল। খুব হিন্দী বাত বলছেন। রাজ্যের জিনিস গাড়িতে—

কল্যাণী। নাম কি বললেন ?

মহা। (মাথা চুলকাইয়া) তা তো জিজ্ঞাসা করি নাই দিদিঠাকরুন। এ-হে-হে, একেই মুরুক্ষুর বুদ্ধি বলে।

কমল। আচ্ছা, আমি দেখছি। (প্রস্থান)

কল্যাণী। মহাভারত !

মহা। দিদিঠাকরুন !

কল্যাণী। আমি যদি এখান থেকে চ'লে যাই মহাভারত, তবে কি তোমাদের কষ্ট হবে ?

মহা। আপনি চ'লে যাবেন দিদিঠাকরুন ? কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম ?

কল্যাণী। অপরাধ ! (হাসিল) না, অপরাধ নয় মহাভারত, কিন্তু থাকতে যে আর সাহস হচ্ছে না ভাই। বাবুরা শুনছি নাকি—

মহা। আপনি শুনছেন দিদিঠাকরুন, আমরা চোখে দেখছি।

কল্যাণী। তবে ?

মহা। তবে দিদিঠাকরুন ? (হাসিল) বিষয় নিয়ে মামলা করছে, আমাদের অপমান করছে, সে আমরা সইছি। কিন্তু আমাদের মা-বোনের ওপর অত্যাচার করলে তাও আমরা সইব, এমনই অমানুষ কি আমাদের মনে কর ?

কল্যাণী। নুটুদাও এখানে থাকতে বারণ করছেন।

মহা। বারণ করছে ! দাদাঠাকুর তা হ'লে ভয় খেয়েছে দিদিঠাকরুন। আমাকে বলে—চোখের জল মোছ। চোখের জলেরও তাপ আছে, চোখের জল গরম। দাদাঠাকুর মোক্তার হয়ে ঘরে খিল আঁটতে চাইছে। তোমার কোনও ভয় নাই দিদিঠাকরুন, মহাভারতের জান থাকতে তোমার গায়ে কোনও আঁচ লাগবে না।

কল্যাণী। আঃ, আমায় বাঁচালে ভাই।

(কল্যাণীর সঙ্গীতবিদ্ ছোড়দা সুশোভনের প্রবেশ। পরনে পায়জামা, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগড়া, মাথায় বব-ছাঁটা চুল, তাহার উপর টুপি। পাঞ্জাবির পকেটে একটা বাঁশী। মোটা একটা লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ। দেখিলেই বোঝা যায়, সে রুগ্ন। সঙ্গে কমলাপদ, পিছনে একটা লোকের কাঁধে দুইটা বাদ্যযন্ত্র—একটা সেতার, একটা এস্রাজ ; দুইটাই খেরুয়া কাপড়ের খোলে ঢাকা। লোকটার এক হাতে একটা বেহালার বাক্স, অপর হাতে একটা সুটকেস)

কল্যাণী। (সবিস্ময়ে) ছোড়দা !

সুশোভন। জয়ুর। উসমে চুক না হৈ ! অধীন তোমার ছোড়দাই বটেন। বাঃ, সাদা

থান কাপড়ে তোকে বড় ভাল মানিয়েছে রে ! চমৎকার ! একেবারে খানদানী বেহাগ ।
কমল । আঃ, সুশোভন !
[কল্যাণী এই মন্তব্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল । মহাভারত অবাক হইয়া গেল]
সুশোভন । কি ব্যাপার ? অন্যায় বললাম নাকি কিছু ? না না, আই ডিড নট মীন এনিথিং রং—
কমল । ব'স সুশোভন, ব'স । ও-কথা যেতে দাও ।
[কল্যাণী ঘর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিল; সুশোভন বসিল]
কল্যাণী । এত হাঁপাচ্ছ কেন ছোড়দা ? ব'স, ব'স ।
সুশোভন । হাঁপাচ্ছি ? রোগে বড় কায়দা ক'রে ফেলেছে রে । বাইরে থেকে বোঝা যায় না । মোটাসোটা দেখছিস, ওটা অ্যালকহলিক ফ্যাট । ভেতরে ভেতরে বাত, হাঁপানি, যকৃতানন্দ—মানে লিভারের দোষ, তা ছাড়া অনেক কিছু । সেবা-শুশ্রূষা করতে হ'লে ক্রমেই জানতে পারবি । এখন একটু চা খাওয়া দেখি ।
কল্যাণী । মহাভারত, দোকান থেকে একটা ছোট টিন চা এনে দাও তো । এস, পয়সা নিয়ে যাও ।
সুশোভন । লিপ্‌টন ইয়েলো ব্র্যাণ্ড, কিংবা ব্রুক্‌বণ্ড গ্রীন লেবেল, বাজে কিছু আনিস না যেন । যা-তা বাজে চা আমি আবার খেতে পারি নে ।
(কল্যাণী ও মহাভারতের ভিতরে প্রস্থান)
কমলদা, ডোণ্ট্‌ মাইণ্ড্‌ প্লীজ, একটা ইনফরমেশন দাও দেখি ।
কমল । বল ।
সুশোভন । এখানে ভড্‌কা-শপটা কোথায় বল তো ?
কমল । কি ? কি শপ ?
সুশোভন । ভডকা, ভডকা-শপ—নট রাশিয়ান অফ কোর্স, ইণ্ডিয়ান ভডকা—ধেনো, ধেনো ; ধেনো মদের দোকান কোথায় বল তো ? ওটা না হলে তো আমি বাঁচব না ।
কমল । তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে সুশোভন ?
সুশোভন । পতন চিরকাল অধোলোকেই হয় কমলদা । উর্ধ্বলোকে কেউ কখনও পড়ে না । হ্যাঁ, আছাড় আমি বড্ড বেশি খাই । তবে ভরসার কথা, আছাড় খেয়ে খেয়ে পতন-প্রুফ হয়ে গেছি এখন । লক্ষ্ণৌতে এক বাইজীর বাড়ির দোতলার ছাত থেকে একতলার বারান্দায় পড়েছিলাম, তাতেও কাবু হই নি । এখন আমার কথার উত্তর দাও দেখি ।
কমল । শোন সুশোভন, ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস অ্যাট ওয়ান্স, তুমি এখানে থাকলে কল্যাণীরও এখানে থাকা চলবে না । নুটু কখনও এ সহ্য করবে না । তোমার অর্থ আছে—
সুশো । খট খট লবডঙ্কা । অল গন কমলদা, অল গন, চিচিং ফাঁক ।
কমল । বল কি ?
সুশোভন । নইলে খুঁজে খুঁজে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে আসব কেন, বল ? দাদার ওখানে গিয়েছিলাম, দাদা তাড়িয়ে দিলে ।
(কল্যাণীর মুড়ি চা লইয়া প্রবেশ)
কল্যাণী । খাও ছোড়দা ।
সুশোভন । আরে বাপ রে ! এ যে মুড়ি ! মুড়ি তো আমি খেতে পারি না কল্যাণী । ওটা থাক । আমি শুধু চা খাই । (চায়ে চুমুক দিয়া) আঃ ! তারপর শোন্‌ কল্যাণী, আমি তোর কাছে থাকব ব'লে এসেছি । আমার এই রুগ্ন শরীর, বেশি দিন বাঁচব না ।

কল্যাণী। ও-কথা ব'লো না ছোড়দা। আমি তোমাকে সেবা ক'রে ভাল ক'রে তুলব।
সুশোভন। আমার কিন্তু টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া আমি মদ খাই ; অবিশ্যি খরচ বেশি নয়, আনা ছয়েকের ধেনো। ধেনোতেই চ'লে যাবে আমার।
কল্যাণী। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই, তোমাকে কি আমি ফেলতে পারি ছোড়দা ?
সুশোভন। কমলদা বলছে, এটা নন্টুদার বাড়ি। নন্টুদা নাকি আমার জন্যে তোকে সুদ্ধ তাড়িয়ে দেবে ?
কল্যাণী। না না, নন্টুদা কখনও এমন হৃদয়হীন হতে পারেন ? না না।
কমল। নন্টুর আদর্শ সকলের ওপরে কল্যাণী।
কল্যাণী। আমার আদর্শও যে আমার কাছে সকলের ওপরে কমলদা। ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই, আমি বোন—
সুশোভন। কিছু ভয় করিস না কল্যাণী, নন্টুদা এককালে তোকে ভালবাসত—

(কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল)

কমল। ইডিয়ট কোথাকার ! (কমলাপদও অন্য দিকে চলিয়া গেল)
সুশোভন। মানে ? বোকার মত বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললাম নাকি ? কি হ'ল ? দুজনেই চ'লে গেল যে ! কল্যাণী, ওরে অ কল্যাণী। (হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া) ইয়েস, ইয়েস, ও ইয়েস, আই অ্যাম অ্যান ইডিয়ট। (লাঠি ধরিয়া অগ্রসর হইল)

চতুর্থ দৃশ্য

নন্টুর শহরের বাসা

(নন্টু বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত আইনের বই পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে নোট করিতেছে। কমলাপদও বসিয়া আছে)

কমল। আজই তো আপীল কেসের রায় বেরুবে ? আরগুমেণ্ট্ কেমন হ'ল ? কি রকম বুঝছ ?
নন্টু। (বই রাখিয়া) হ'ল একরকম। তবে—। (একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) জান কমলাপদ, সংসারে মানুষকে ছোট ভাবার তুল্য অন্যায় আর হয় না। সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স তারই সাজে, যে সত্যকার সুপিরিয়র ; উকিলবাবুটি গলাবাজি করতে পারেন ভালই, কিন্তু শূন্যগর্ভ কুম্ভের মত। আমি পরিশ্রম ক'রে পয়েণ্ট্স সংগ্রহ ক'রে চোখের সামনে ধরেছি, কিন্তু তা নেবেন না, কারণ আমি মোক্তার, তিনি উকিল।
কমল। সবই তোমার ভুলের মাশুল বন্ধু। ভুল তো তোমার একটা নয় ; প্রিলিমিনারি ইণ্টারমিডিয়েট দিয়েও ল ফাইনালটা দিলে না ; মোক্তারি পরীক্ষা দিলে। একটু ভুলের জন্যে—
নন্টু। ও-কথা বাদ দাও কমল। (হাসিল)
কমল। একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা ক'রো আজ। সন্ধ্যের ট্রেনেই রওনা হব।
নন্টু। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু ছিলে, তুমিও চ'লে যাচ্ছ !

(সুশোভনের প্রবেশ—মুখে সিগারেট)

সুশোভন। From harmony, from heavenly harmony this frame of universe began। গুড মর্নিং নন্টুদা ! আরে, কমলদা যে ! গুড মর্নিং !
নন্টু। এস। কেমন আছ ?

সুশোভন। ভাল, অনেক ভাল। কল্যাণী ইজ ওয়ার্দি অফ হার নেম, খাড়া ক'রে তুলেছে আমাকে। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া কমলাপদর সামনে ধরিল) আসুন কমলদা।

কমল। নো, থ্যাঙ্কস্, আমি ও ছেড়ে দিয়েছি সুশোভন।

সুশোভন। ছেড়ে দিয়েছেন? বলেন কি? আরে, আমি যে প্রথম প্রথম আপনার পকেট থেকেই চুরি ক'রে সিগারেট খেতে শিখেছিলাম!

কমল। শিষ্যবিদ্যা চিরকালই গরীয়সী সুশোভন।

সুশোভন। আপনি যে ভয়ানক সিগারেট খেতেন! মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম তো নয়। ফার্স্ট ক্লাস ভার্জিনিয়া স্টাফ, আমার অবশ্য এক পয়সায় দশটা। তা হ'লে আপনি তো অনেক টাকা জমিয়েছেন কমলদা!

কমল। (হাসিয়া) তুমি পাগল সুশোভন।

সুশোভন। কেন?

কমল। সিগারেট ছাড়লেই টাকা জমানো যায়?

সুশোভন। যায় না? জমাতে পারেন নি আপনি?

কমল। (হাসিয়া) না।

সুশোভন। তবে আসুন, ফের শুরু করুন। টাকাই যখন জমল না, তখন ছাড়বেন কেন?

কমল। না, নুটুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবন্ধ।

নুট। সুশোভন, এইবার তুমিও ওগুলো ছাড়। সিগারেট মদ—

সুশোভন। (বিলাতী ধরনে শ্রাগ করিয়া) ওরে বাবা! বাঁচব কি খেয়ে নুটুদা? আই হোপ, ইউ আর জোকিং—

নুট। না। সুশোভন, কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে তোমার মায়া হয় না?

সুশোভন। হয় না, তা বলতে পারি না। তবে তুমি মায়া করছ, কমলদা মায়া করছে, তার মাঝখানে আমি আবার মায়া করতে যাই কেন, বল?

কমল। আমি উঠলাম নুটু। ও বেলায় একটু সকাল সকাল ফিরো।

সুশোভন। কমলদা, আমি তোমার ওখানে যেতাম। পাঁচটা টাকা আমাকে ধার দাও। অবশ্য পেএব্‌ল্ হোয়েন এব্‌ল্—আই মীন, হোয়েন আই শ্যাল বি এব্‌ল্।

কমল। আজই আমি ট্রান্স্‌ফার হয়ে চ'লে যাচ্ছি সুশোভন।

(প্রস্থান)

সুশোভন। মাইরি বলছি, মানি অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেব। মাইরি বলছি কমলদা—(অনুসরণোদ্যত)

নুট। টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

সুশোভন। একটা বিউটিফুল ফিল্ম এসেছে। মিউজিক—কেবল মিউজিক, মরিশ শিভেলিয়র গান গেয়েছে। (ইংরেজী গানের সুর ভাঁজিতে লাগিল)

নুট। সুশোভন!

সুশোভন। কমলদা চ'লে যাচ্ছে, আই মাস্ট্ ক্যাচ হিম। কমলদা—

(অল্প খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান)

নুট। স্কাউন্ড্রেল! কি বলব, কল্যাণী দুঃখ পাবে—

(বিমলার প্রবেশ)

এস। (সঙ্গে সঙ্গে হাতবাক্স খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া) এই নাও।

বিমলা। (পিছাইয়া গিয়া) কি ?

নুট। টাকা—খরচের টাকা।

বিমলা। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া) উঃ, খুব চাঁদির জুতোটা তুমি আমায় মারছ যা হোক!

নুট। আমায় মার্জনা কর বিমলা, আজ মহাভারতের আপীল-কেসের রায় বের হবে। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে আছে।

(বিমলা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

শোন, কি বলছ সংক্ষেপে বল।

বিমলা। বলছি—। না, থাক।

নুট। বিমলা, কি বলছ ব'লে যাও।

বিমলা। দুটো কথা। একটা জিজ্ঞাসা করব, একটা অনুরোধ করব।

নুট। বল।

বিমলা। আমার অরুণ যদি সুশোভন হ'ত, তবে কি তাকে তুমি সহ্য করতে ?

নুট। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তোমার দ্বিতীয় কথা—তোমার অনুরোধ ?

বিমলা। সেকালের সেই দুঃখকষ্ট-ভরা জীবন আমায় ফিরিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার উপার্জন আমি চাই না। ওগো, এর চেয়ে যে সেকালে আমার অনেক শান্তি ছিল।

নুট। বাড়ির ভেতর যাও বিমলা। জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে ; কিন্তু পেছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

বিমলা। যদি না যায়, তবে আমায় মুক্তি দাও, এমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি আর পারছি না।

(প্রস্থান)

(নুটু নীরবে বারকয়েক পায়চারি করিয়া আবার বই লইয়া বসিল। আবার উঠিয়া আর একখানা বই বাহির করিল। কয়েকটা নোট করিল। সে নোট করিতেছে, এমন সময় নুটুর পিছন দিকে প্রবেশ করিল কল্যাণী, তাহার হাতে একখানা বই)

নুট। আবার যখন এসেছ বিমলা, তখন তোমার সকল জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর শুনে যাও।

(কল্যাণী এদিক ওদিক চাহিয়া বিমলাকে খুঁজিল)

হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু—

(কল্যাণীর হাত হইতে বইখানা সশব্দে পড়িয়া গেল। নুটু সেই শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে কাছে আসিল এবং বইখানি ও একটি ফাউণ্টেন পেন টেবিলের উপর নামাইয়া দিল)

কল্যাণী। ছোড়দা এগুলো—বোধ হয়—চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

[নুটু চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল]

কল্যাণী। আমায় মাফ করুন নুটুদা।

নুট। মাফ ? না না, মাফ চাইবার কোনও প্রয়োজন তো নেই কল্যাণী।

কল্যাণী। এ লজ্জা রাখবার যে আমার জায়গা নেই নুটুদা।

নুট। লজ্জা তোমার একার নয় কল্যাণী, লজ্জা আমারও। সুশোভন শুধু তোমার ভাই নয়, সে আমার ছাত্র, আমি তার মাস্টার। (বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল) আর কিছু বলবে ?

কল্যাণী। আমি বিদায় চাইছি দাদা, আমায় আপনি— (ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল)

নুট। কেন কল্যাণী ?
কল্যাণী। না। (প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)
নুট। তা হ'লে দাঁড়াও কল্যাণী। বিমলা মনে ক'রে যে কথাটা বলেছিলাম তার অর্ধেকটা তুমি শুনেছ, বাকিটা শুনে যাও—যদি যাওই, তবে শুনেই যাওয়া উচিত। আমি তোমায় ভালবাসি, সহোদরা ভগ্নীর মতই ভালবাসি। তাই আমি তোমায় বিদায় দিতে পারি না। আমার বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।

[কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

যদি কোনদিন মাটিতে প'ড়ে আঘাত পাও, গায়ে তোমার ধুলোর মালিন্য লাগে, তবে সেদিন জেনো, নুটুদা তোমার আদর্শচ্যুত হয়েছে, সে মরেছে।

[বিমলার প্রবেশ—সে এখন শান্ত]

বিমলা। সাড়ে এগারোটা যে বেজে গেল। খাবার হয়েছে, স্নান কর।
নুট। সে কি ? সাড়ে এগারোটা বেজে গেল ? তা হ'লে রায় বোধ হয় এতক্ষণ বেরিয়ে গেল। আমি কোর্টে চললাম। মহাভারত—মহাভারত কই ?
বিমলা। সে তো পাগলের মত হয়ে রয়েছে, অনেকক্ষণ আগেই সে বেরিয়ে গেছে।
নুট। বেরিয়ে গেছে ?
বিমলা। ভয় নেই, অরুণ তার সঙ্গে গেছে।
নুট। আমি চললাম বিমলা। (ব্যস্তভাবে প্রস্থান)
বিমলা। এস ভাই ঠাকুরঝি, একটু জল মুখে দেবে এস।
[কল্যাণী। দাদা ফিরে আসুন বউদি। এই তো কোর্ট, তিন মিনিটের পথ।
বিমলা। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবার জন্যে আমাকে এনেছ ভাই। আমি তো রয়েছি অপেক্ষা ক'রে, আবার তুমি কেন কষ্ট করবে ? এস, খাবে এস।]
(কল্যাণীর হাত ধরিয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে বাহিরে ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল)
বিমলা। এ কি ? ঢাক কিসের ? এই যে অরুণ ! অরুণ—

(অরুণ ও মহাভারতের প্রবেশ, মহাভারত উদ্‌ভ্রান্তের মত)

অরুণ। মামলায় আমাদের হার হয়েছে মা।
মহা। তাই গোপী মিত্তির ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে মা, ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে।
বিমলা। ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে !
মহা। (চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া) একগাছা লাঠি, একটা দা- ঘরে কি তোমাদের কিছুই নাই খুড়োঠাকুর ?
অরুণ। (মহাভারতকে ধরিয়া) না, ছি মহাভারতকাকা !
বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝি, তুমি ভাই মহাভারতকে ভেতরে নিয়ে যাও।
কল্যাণী। (মহাভারতের হাত ধরিয়া) এস মহাভারত, এস ভাই, ভেতরে এস।
মহা। ঢাক বাজাচ্ছে দিদিঠাকরুন—
কল্যাণী। বাজাক। এস, ভেতরে এস। (উভয়ের প্রস্থান)
বিমলা। এইবার তুই যা অরুণ, ওদের বারণ ক'রে আয়।
অরুণ। বারণ করলেও শুনবে না মা।
বিমলা। ঢাক বাজাচ্ছে, শিঙে বাজাচ্ছে, ধেই ধেই ক'রে নাচছে ! বারণ করলে শুনবে না ব'লে তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবি ?

অরুণ। ওতে আমাদের অপমান হয় নি মা। নিজেদের অপমান ওরা নিজেরা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছে, জানিয়ে দিচ্ছে—ওরা কত বড় অত্যাচারী।

বিমলা। তোর দেহে কি রক্ত নেই অরুণ?

অরুণ। অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যায় দিয়ে করা যায় না মা।

বিমলা। খুব শিক্ষা পেয়েছিস যা হোক বাপের কাছে! কথায় কথায় কবিতা আওড়াবি, ইংরিজী আওড়াবি, আর পাথরের মত সহ্য করবি। আচ্ছা। (নিজেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁচু গলায় বলিল) কারা ঢাক বাজাচ্ছ তোমরা? কারা? শোন। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—

(গোপী মিত্তিরের প্রবেশ)

গোপী। আজ্ঞে মা, পেনাম। (ব্যঙ্গভরা ভঙ্গিতে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল)

বিমলা। তুমি গোপী মিত্তির?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আপনাদের চরণের দাস।

বিমলা। এমন ক'রে আমার বাসার সামনে ঢাক বাজাচ্ছ কেন?

গোপী। আজ্ঞে মা, মামলায় আমরা জিতেছি কিনা, তাই বিবেচনা করুন, ঢাক শিঙে বাজিয়ে আপনাদের পেনাম করতে এসেছি। বিবেচনা করুন, আপনারা হলেন কঙ্কণার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশ, আপনাদের পেনাম ক'রে আশীর্বাদ—

বিমলা। আশীর্বাদ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আশীর্বাদ।

বিমলা। আশীর্বাদ নিতে পারবে?

গোপী। দেখুন দেখি, বিবেচনা করুন, সেইজন্যেই তো এসেছি মা।

বিমলা। রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের শেষদিনে, ব্রাহ্মণে আশীর্বাদ ক'রে রাজাকে ফল দিয়েছিল। সেই ফল থেকে বেরিয়েছিল তক্ষক সাপ। আমার আশীর্বাদ থেকে যদি তেমনই তক্ষক সাপ বের হয় গোপী মিত্তির, তবে সে আশীর্বাদ নিতে পারবে? মাথায় ক'রে নিতে যেতে পারবে তোমার বাবুর কাছে?

গোপী। (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া) আজ্ঞে মা, বিবেচনা করুন—। ওরে—ওরে—ওরে, থামা রে! ওরে—

[দ্রুত প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাজনা থামিয়া গেল। পিছন দিক হইতে একটা দা হাতে মহাভারতের প্রবেশ]

বিমলা। এ কি, দা হাতে কোথায় যাবে মহাভারত?

মহা। আসছি মা, আসছি।

[বিপরীত দিক হইতে নন্টুর প্রবেশ]

নন্টু। এ কি মহাভারত? [মহাভারতকে ধরিয়া ফেলিল]

মহা। ছাড় দাদাঠাকুর, ছাড়। ছেড়ে দাও। ওই ব্যাটা গোপে মিত্তিরকে আমি খুন করব। ছাড়।

নন্টু। ছি মহাভারত!

মহা। তুমি শোন নাই দাদাঠাকুর, ওরা ঢাক বাজাচ্ছিল শিঙা বাজাচ্ছিল—

নন্টু। ডাকাতে মশাল জেলে রোশনাই ক'রে ডাকাতি করে, মানুষ অসহায় জীবকে বাজনা বাজিয়ে কাটে, কেটে নাচে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হবে মহাভারত। দাখানা ফেলে দাও।

মহা। কবে? কবে? কবে? আমি ম'রে গেলে তবে হবে?

নুটু। অপেক্ষা কর মহাভারত, কিছুদিন অপেক্ষা কর। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তবে কবে, তা জানি না। কিন্তু তোমার ওপর অত্যাচারের প্রতিকার—তার দেরি নেই। (দাখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিল) বিমলা, আমার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দাও দেখি।

বিমলা। সে কি, কোথায় যাবে ?

নুটু। অজ্ঞাতবাস বিমলা, অজ্ঞাতবাস।

মহা। আমার জন্যে তুমি দেশান্তরী হবে দাদাঠাকুর ? না না। তার চেয়ে আমিই ভিন গাঁয়ে চ'লে যাচ্ছি।

নুটু। না, শুধু তোমার জন্যে নয়। তোমার মত হাজার হাজার মহাভারত আজ দেশে এমনই অন্যায়ভাবেই ধনীর চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, মরছে। আজও তোমার হার হ'ত না মহাভারত, যদি আমি নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব করতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমার তক্‌মা নেই। তক্‌মা আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। ওকালতি পড়তে যাচ্ছি আমি। অন্যায়ের অত্যাচারের প্রতিকার করতে সর্বক্ষেত্রে দাঁড়াবার অধিকার আমার চাই—চাই—চাই।

(নুটু ও বিমলার ভিতরে প্রস্থান)

[অরুণ। (সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) O Lord, how long shall the wicked triumph ? Lift thyself up—thou Judge of the earth—lift up !

মহা ! ভগবান ! ভগবান !]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে মহাভারত পালের বাড়ি পুড়িতেছে। আগুন নিবিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও মাটির উপর পোড়া কাঠ ও খড় হইতে অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে—কোথাও কোথাও আগুনের শিখা দেখা যাইতেছে। চারিপাশে ক্ষুদ্র জনতা। মহাভারত কালী বাগদীর বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই জনতার ব্যস্ত কথাবার্তা শোনা যাইতেছিল।

১ম। আর ভয় নাই, আগুন নিবে এসেছে।

২য়। এইখানে—এইখানে আগুন রয়েছে এখনও। এইখানে জল দাও।

৩য়। ওহে, মহাভারতকে ছাড়াও হে, কালী বাগদী ম'রে যাবে।

(যবনিকা অপসারিত হইল)

১ম ব্যক্তি। ছেড়ে দাও মহাভারত, ছেড়ে দাও। ম'রে যাবে। ছেড়ে দাও।

২য়। মহাভারত ! মহাভারত !

মহা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) এ—ও !

১ম। ম'রে যাবে, মহাভারত, ম'রে যাবে। ছাড়।

মহা। ছাড়ব, ছাড়ব। যে চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জেবলেছে, সেই চিতের ওপর দিয়ে ছাড়ব।

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। মহাভারতকাকা ! মহাভারতকাকা !

মহা। কে ? অরুণখুড়ো ? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) খুড়োঠাকুর, নিজের চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জেবলেছে।

অরুণ। ছেড়ে দাও, ওঠ বুকের ওপর থেকে।

মহা। উঠব ? ছেড়ে দেব ? আমার ঘর পুড়িয়ে দিলে, আর আমি ছেড়ে দেব ?

অরুণ। (আকর্ষণ করিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ ওঠ।

মহা। তুমি বলছ !

অরুণ। হ্যাঁ, আমি বলছি।

(মহাভারত উঠিল, উঠিয়াও প্রতিহিংসাজর্জর দৃষ্টিতে কালীর দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ কালীকে দেখিয়া বলিল)

অরুণ। পিসীমা, শিগগির একটু জল।

১ম ব্যক্তি। স'রে পড় হে। ঘরে আগুন দেওয়ার মামলা—অনেক হাঙ্গামা।

২য় ব্যক্তি। গোপী মিত্তির দেখতে পেলে মুশকিল হবে। চল চল। (প্রস্থান)

মহা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম খুড়োঠাকুর, এমনই কিছু হবে। তোমাদের পাঠশালা-বাড়ি পুড়ল, দিদিঠাকরুন মমতা-মাকে আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। গোপী মিত্তির ব'লে পাঠালে, ভাল হবে না। কাল আবার লোক পাঠিয়ে শাসালে। এই দুবার হ'ল। এর পরের বারই তিনবার। আমি এই তিনবারের লেগে দিনরাত তক্কে তক্কে রয়েছি। [কেলে বাগদী একা—আগুন দিলে, আমি আসতে আসতে ব্যাটা কাজ সেরে ছুটবার উদ্যোগ করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালাম, ব্যাটা ভোঁ ক'রে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল গোয়াল ঘরে। মনে করলে, আমি দেখি নাই। আমি শেকল দিয়ে দিলাম। মরত ব্যাটা পুড়ে। তুমি এসে খুলে দিলে খুড়োঠাকুর। উঃ, তখনও কি ছুট ! আমি না ধরলে ব্যাটা পালিয়েছিল।]

[কল্যাণী জল আনিল। সঙ্গে মমতা। অরুণ কালীর মুখে-চোখে জল দিল।]

কালী। জল! একটু জল!

[মহাভারত চট করিয়া এক মুঠো পোড়া খড় লইয়া কালীর মুখের সম্মুখে ধরিল]

মহা। নে, খা।

অরুণ। মহাভারতকাকা! (কালীকে জল দিয়া) নাও, জল খাও। উঠতে পারবে?

[কালী উঠিয়া বসিল]

এঃ, কয়েক জায়গাই পুড়ে গেছে! কেটে গেছে! মমতা, দেখ তো—যা জিনিসপত্র বেঁচেছে, তার মধ্যে ফার্স্ট এডের বাক্সটা পাওয়া যায় কি না!

[মমতার প্রস্থান]

কল্যাণী। মহাভারতের মাথাও কেটে গেছে। ওর মাথাও ধুয়ে মুছে দিতে হবে অরুণ।

মহা। দিদিঠাকরুন, তুমি দেবতা, তুমি দেবতা। খুড়োঠাকুর তো আমার মাথার রক্ত দেখলে না! খুড়োঠাকুর দয়া করছে কালীকে—শত্তুরকে, যে ঘরে আগুন দিয়েছে, তাকে।

অরুণ। (হাসিয়া) তুমি যে ঘরের লোক মহাভারতকাকা। নাও, কালী, ওঠ।

মহা। দাঁড়াও খুড়োঠাকুর, আমি ধরি ওকে, নইলে পালাবে। তুমি জান না, ও হ'ল কেলে বাগদী, এখন ও চোট-খাওয়া বাঘ।

কালী। (নিঃশব্দে হাসিয়া) বড় বেকায়দায় ফেলেছিলে মোড়ল, নইলে ঘাড়টা তোমার আমি ভেঙে দিতাম।

অরুণ। তুমি কেন মহাভারতের ঘরে আগুন দিলে কালী?

কালী। শুধিও না বাবু, তুমি মহাভারতের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, মুখে জল দিয়েছ। ও-কথা তুমি শুধিও না। তবে হ্যাঁ, দিয়েছি।

অরুণ। বাবুদের হুকুমে এত বড় পাপ করলে তুমি? ছি!

কালী। তিন পুরুষ ধ'রে পরের ভাত তো খাও নাই বাবু, তুমি বুঝতে লারবে। নাও, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

মহা। তুই বাবুদের নাম কর্ কালী, তোকে বাঁচিয়ে দেব।

কালী। কি যা-তা বলছ মোড়ল? (হাসিল) আমার খুশি হয়েছিল তোমার ঘরে আগুন দিয়েছি। থানায় দাও, জেলে দাও, ফাঁসি দাও—যা খুশি তোমার কর কেনে। চল, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

(অরুণ ও মহাভারত কালীকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

(জনতা চলিয়া গেলে শূন্য রঙ্গমঞ্চের এক দিক হইতে কালো র‍্যাপারে মাথা ও সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল—ছায়া মূর্তির মত—গোপী মিস্তির। তাহার কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রবেশ করিল সুশোভন ও অরুণ। সুশোভনের বগলে বেহালার বাক্স। সুশোভন ঈষৎ মত্ত)

অরুণ। আপনি এতক্ষণ কোথা ছিলেন? কোথাও আঘাত লাগে নি তো?

সুশোভন। আমি অত্যন্ত অপদার্থ লোক অরুণ। আগুন নিবোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁপানি আরম্ভ হ'ল। ওই গাছতলাটায় ব'সে ছিলাম।

অরুণ। আপনার বগলে ওটা কি? বেহালার বাক্স বুঝি?

সুশোভন। হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ওটাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু না বাঁচালেই ছিল ভাল। আমার গান শেখা মিথ্যা হয়েছে দেখলাম—একদম বাজে।

অরুণ। কেন?

সুশোভন। ব'সে ব'সে মেঘমল্লার বাজালাম; জান অরুণ, মেঘমল্লার যদি ঠিক নিখুঁতভাবে বাজানো হয়, তবে আকাশ ভেঙে মেঘ এসে বৃষ্টি নামে। কিন্তু নট এ ড্রপ—গোটা

আকাশটা নীল, এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

(উদ্‌ভ্রান্ত মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। আঃ, ঠাকুরদা আমার শালকাঠ দিয়ে ঘর করেছিল, সব পুড়ে গেল।

অরুণ। সে লোকটাকে কার জিম্মায় রেখে এলে মহাভারতকাকা ?

মহা। বেঁধে রেখে এসেছি খুড়োঠাকুর, গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছি।

[অরুণের প্রস্থান]

আঃ, এক ছিলিম তামাক হ'ত এই সময়।

সুশোভন। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া ঠসিগারেট লইয়া) ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান, নাও।

মহা। ছোট দাদাঠাকুর!

সুশোভন। (পকেট খুঁজিয়া) যাঃ, দেশলাইটা গেছে।

মহা। (হাসিয়া একটা পোড়া কাঠ লইয়া) নাও। শালকাঠের আগুন এত শিগগির কি নেবে ? (নিজেও সিগারেট ধরাইল)

সুশোভন। (পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) একটু খাবে মহাভারত ? মনটা ভাল হবে।

মহা। না, তার চেয়ে একটা গান, কি বাজনা শোনাতে পার দাদাঠাকুর ?

সুশোভন। (বেহালা বাহির করিয়া) শুনবে ? খুব করুণ রাগিনী একটা বাজাই, শোন। বাজাইতে আরম্ভ করিল)

মহা। দূর! কি প্যান-প্যান ক'রে বাজাচ্ছ তুমি ? হয় নাচের বাজনা বাজাও, নয় তেজী বাজনা বাজাও। নাঃ, হারামজাদা বাগদীকে আমি থানায় দিয়ে আসি।

[জনৈক মণ্ডলের প্রবেশ]

মণ্ডল। এই যে মহাভারত!

মহা। জমিদারের মণ্ডল মশাই যে!

মণ্ডল। তোমার সঙ্গে কথা আছে মহাভারত।

মহা। না না না। কথা আমার কারুর সঙ্গে নাই।

মণ্ডল। (কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া) শোন, শোন।

মহা। ওইখানে—ওইখানে, শালকাঠের আগুন এখনও জ্বলছে, ওইখানে গুঁজে দাও।

মণ্ডল। আলক্ষ্মী যখন ভর করে, তখন এমনই মতিচ্ছন্নই হয়।

মহা। আলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা. উনি কখনও ছেড়ে যান না।

মণ্ডল। পাগলামি করিস না মহাভারত, ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহা। চণ্ডাল, কসাই—চণ্ডাল, কসাই! তুমি যাও, তুমি যাও। আমি কেলে বাগদীকে থানায় নিয়ে চললাম, আমার সময় নাই, আমার সময় নাই। (প্রস্থান)

মণ্ডল। (সুশোভনকে) ঠাকুর, তোমাকে একটা কথা বলছিলাম।

সুশোভন। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) হোয়াট ইজ দ্যাট কথা ?

মণ্ডল! এই ঘরে আগুন দেবার জন্যে মামলা হবে, তুমি যদি আমরা যা বলব বল, তা হ'লে এই টাকা দেব—

সুশোভন। নো।

মণ্ডল। আরও পাবে ঠাকুর, আরও পাবে—

সুশোভন। নো, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ মানি, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ কার্স্। নেহি মাংতা হ্যায়।

মণ্ডল। এ-হে-হে, এদের সবারই মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি ! (প্রস্থান)

সুশোভন। I had my money and my friends,
I lent my money to my friends,
I asked my money of my friends,
I lost my money and my friends,
I need no money to loose new friends.

মহাভারত ইজ মাই ফ্রেণ্ড্— [বলিতে বলিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলার সদর-শহরের কোর্টের বারান্দার সম্মুখ

একটা গাছতলায় একটা চেয়ারে বসিয়া দেবনারায়ণ ও উকিল রাজেনবাবু। সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোপী মিত্তির। মধ্যে মধ্যে দুই-একজন লোক চলিয়া যাইতেছে।

দেব। আমি বার বার বারণ করেছিলাম রাজেনবাবু—বাবা, এতটা করবেন না, সে কাল আর নেই। কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা শুনলে অপমান হয় যে। তার ওপর জুটেছে এই গোপী।

গোপী। আজ্ঞে বাবু, বিবেচনা করুন, আমরা হলাম ঢাকীর কাঁধের ঢাক। বিবেচনা করুন, যেমন বাজাবেন, তেমনই বাজব। বলিদানের বাজনা বাজান, বলিদানের বোল বলব ; বিবেচনা করুন, আবার বিসর্জনের বোল বাজান, তাই ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বাজব। বিবেচনা করুন, মহাভারতের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছি, আপনি বলুন, খরচ দেন, আবার দাঁড়িয়ে থেকে পোড়া ঘর ছাইয়ে দিই।

রাজেন। যাক, যা হয়ে গেছে তার তো উপায় নেই। এখন কর্তব্য ক'রে যান। আমি জামিনের চেষ্টা দেখছি, আপনারা মিটমাট করতে চান, তাই করুন, কিংবা—কি হে গোপী, পারবে তো ?

গোপী। এই দেখুন, উকিলবাবু কি বলছেন দেখুন ! তবে বিবেচনা করুন, সুতোর সেলাইয়ে চামড়ার মুখ বন্ধ হয় না। রুপোর সুতো চাই, বিবেচনা করুন, সোনার হ'লে আরও মজবুত হবে। সাক্ষীরা তো মানুষ।

রাজেন। টাকা দিয়ে সব সাক্ষীর মুখ বাঁধতে পারবে ?

গোপী। পৃথিবীটা কার বশ রাজেনবাবু ? বিবেচনা করুন, পৃথিবী টাকার বশ। টাকা খরচ ক'রে, বিবেচনা করুন, দশ দিক দেওয়াল গেঁথে বন্ধ ক'রে দিন, দশটা সূর্য্যি উঠলেও দিন রাত হয়ে যাবে। আবার রাত্রে জেবলে দিন বাতি লাখ লাখ, বিবেচনা করুন, অমাবস্যার রাতও দিন হয়ে যাবে।

(শিবনারায়ণের প্রবেশ। সঙ্গে একজন বরকন্দাজ)

শিব। কত টাকা খরচ করলে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে গোপী ?

দেব। এ কি ?' বাবা ?

শিব। হ্যাঁ বড় হুজুর, আমি।

রাজেন। আপনার আসবার কোন দরকার ছিল না কর্তাবাবু।

শিব। একবার আসতে হ'ল বইকি রাজেনবাবু। [বড়বাবুকে যৌবরাজ্যে বসিয়ে আজ বছর কয়েক ঘরেই ঢুকেছিলাম রাজেনবাবু। মদ ছেড়ে আফিং ধরেছিলাম। বাইজী

ছেড়ে নাতনীদের সঙ্গেই হাসিঠাট্টা ক'রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছিলাম।] কেলে বাগদী ব্যাটা ধরা প'ড়ে সব ভেস্তে দিলে। হিসেব ক'রে দেখলাম, ঘরে ব'সে ব'সে বারো বছর—একটা যুগ পার হয়ে গেছে; কেলে ব্যাটা বুড়ো হয়েছে, ব্যাটার ধরা পড়বারই কথা। তাই একবার বেরুতে হ'ল বইকি। (চারিদিক চাহিয়া) তা বেশ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আর কিছু চেনাই যায় না হে।

[রাজেন। একটা চেয়ার আনিয়ে দিই বসুন। কিংবা আমার বাড়িতে—

শিব। উহুঁ, কোমরে বাত আছে, বসলে ওঠা শক্ত হবে রাজেনবাবু। এখন কালীর জামিনের কথা কি বলছেন, বলুন ?

দেব। দরখাস্ত করা হয়েছে। তুমি চল বাবা। গাড়িতে বসবে চল।

শিব। ঠারিয়ে হুজুর বাহাদুর, ঠারিয়ে।] গোপী, কত টাকা হ'লে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে ?

গোপী। আজ্ঞে হুজুর, বিবেচনা করুন, একটা এস্টিমেটো না ক'রে কি ক'রে বলি বলুন ?

শিব। দেবনারায়ণ, গোপী যত টাকা চাইবে, দিতে 'না' ক'রো না। কৈফিয়ত চেয়ো না। আর গোপী, এ মামলায় যদি তুমি কালীকে বাঁচাতে পার, তবে তোমার দু হাতে যতগুলো ধরবে, আমি মোহর বকশিশ দেব।

গোপী। যে আজ্ঞে হুজুর, বিবেচনা করুন, তা হ'লে আমি এই বেরুলাম। সর্বাগ্রে আমি একবার থানা ঘুরে আসি। না, কি বলেন রাজেনবাবু ? (বাবুকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

রাজেন। আমি দেখি, একবার হাকিমের সঙ্গে দেখা করি।

(প্রস্থান)

দেব। তুমি ভুল করছ বাবা। এই রকম খোলা হুকুম দিলে, গোপী আর বাকি রাখবে না। পুকুর চুরি ক'রে ফেলবে।

শিব। কাজ মিটে গেলে মহাভারত যেমন ক'রে কেলে বাগদীর বুকের ওপর চেপে বসেছিল, হিসেবের জন্য তখন ওর বুকে তেমনই ক'রে চেপে ব'সো।

[দেব। কালী বাগদীর স্ত্রী আবার আজ এসেছিল, বলছিল—খরচ নেই। এই সেদিন খরচ দিয়েছি—

শিব। কালী গোপী মিস্তির নয়, দেবনারায়ণ, ওদের কাছে হিসেব চেয়ো না। খরচ দিও। কি রকম, বড়বাবুর মুখ যে ভার হয়ে উঠল !

দেব। তোমার সম্পত্তি, তোমার টাকা, আমি মুখ ভার ক'রে কি করব বল ? টাকা জলে ফেলে দিতে বললেই বা আমার কি বলবার আছে ?

শিব। আহা, ব'লেই দেখ না বড় হুজুর, চটছ কেন ?]

দেব। আমি বলছি, মামলা-মকদ্দমায় কাজ নেই। মহাভারতকে ডেকে মামলা মিটিয়ে ফেল।

শিব। কাকে ডেকে ?

দেব। মহাভারতকে—

শিব। আমাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা কর দেবনারায়ণ, আমার কাশী যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

দেব। এই তো, তুমি চ'টে উঠলে !

শিব। আমি নুটুর সঙ্গে মিটমাট করতে পারি, সে আমার স্বজাতি, গুণী লোক সে; কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে—ছি ! ঘটনার রাত্রেই তুমি গোবিন্দ মোড়লকে টাকা দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে মিটমাট করতে পাঠিয়েছিলে, সে আমি শুনেছি। ছি ছি ছি ! *মহাভারত একটা সামান্য চাষী প্রজা—

দেব। কেন? মহাভারত কি মানুষ নয়? মহাভারতের ঠাকুরদা হরিশ পাল যখন তোমার বাবার আমলে ধর্মঘট করেছিল, তখন তিনি তাকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, সে সময় তুমিই হরিশ মণ্ডলকে রেখেছিলে, মামলা মিটমাট ক'রে নিয়েছিলে। আর আজ মহাভারতের সঙ্গে মিটমাট করবার কথায় বলছ—ছি!

শিব। ছেলেমানুষি বাপজান, ছেলেমানুষি করেছিলাম, যা তুমি করতে চাইছ আজকে। (হাসিয়া) [ওরে বাবা, সেদিন বাক্স খুঁজতে খুঁজতে তোর মায়ের নামের একখানা চিঠি পেলাম, আমিই লিখেছিলাম। তোর মা লেখাপড়া জানে না, তবু তাকে চিঠি লিখেছিলাম—এ-ই লম্বা চিঠি। প'ড়ে আর হাসতে হাসতে বাঁচি না। বউমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখবার বয়স হোক তোমার, তখন বুঝতে পারবে আমার কথা।] ডর মৎ করো বড় হুজুর, সব ঠিক হো যায়গা ; গোপী মিত্তির খাঁটি কথা বলেছে দেবু, পৃথিবী টাকার বশ। মামলা সাক্ষীর মুখে। আর সাক্ষীগুলি সব পৃথিবীর মনিষ্যি।

দেব। কিন্তু ওই মাস্টারনী আর তার ভাই? ওরাই হবে মামলার প্রধান সাক্ষী।

শিব। হুঁ। এক কাজ কর। মাস্টারনীর মাতাল ভাইকে ডাকাও, মদ খাওয়াও, টাকা দাও। আর মাস্টারনীর মেয়েটার সঙ্গে আমার ছোট হুজুরের বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠাও। মন্দ হবে না। মেয়েটা ভাল হে, আমি শুনেছি। আর ছোট হুজুর তো প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে।

[গোপী মিত্তিরের ব্যস্ত উত্তেজিতভাবে প্রবেশ]

গোপী। হুজুর, নুটু মোক্তার—

শিব। (চকিতভাবে গম্ভীর হইয়া) নুটু মোক্তার?

গোপী। নুটু মোক্তার ফিরে এসেছে।

শিব। নুটু ফিরে এসেছে?

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, উকিল হয়ে ফিরে এসেছে, এসেই মহাভারতকে শহরের বাসায় নিয়ে এসেছে।

শিব। হুঁ। (গম্ভীর চিন্তামগ্ন হইলেন) নুটু মরদ বটে।

দেব। লোকে বলত, নুটু ওকালতি পড়ছে। বিশ্বাস করতে পারি নি। যে লোক তিন বৎসর দেশে না এসে, সংসার-স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ ক'রে এমনই ক'রে জেদ বজায় রাখে, তার সঙ্গে পারবে না বাবা। মামলা মিটমাট ক'রে নাও।

শিব। থাক্ দেবনারায়ণ, থাক্। তুমি এই মামলাটা আমার কথামত কর। 'না' ব'লো না। দেবনারায়ণ, কেলে বাগদী ছাড়া আমার আমলের সবাই চ'লে গেছে। কেলেকে বাঁচাবার চেষ্টায় তুমি বাধা দিও না।

[রাজেন উকিলের প্রবেশ]

রাজেন। হ'ল না কর্তাবাবু, জামিন হ'ল না। নুটু মুখুজ্জে উকিল হয়ে ফিরেছে, সে মহাভারতের পক্ষ থেকে আপত্তি জানালে। হাকিম তার যুক্তির বিপক্ষে যেতে পারলেন না। জামিন হ'ল না।

শিব। গোপী!

গোপী। হুজুর!

শিব। তুমি একবার এই শহরের মহেন্দ্র জ্যোতিষীকে খবর দাও। আমার কোষ্ঠীখানা একবার দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) একটা কথা গোপী, নুটুর সঙ্গে দেখা হ'লে আমাকে যেমন সম্মান কর, তেমনই সম্মান করবে। রাজেনবাবু, নুটু বুঝি আপনাদের রাহু হয়ে এল গো! লোকটা মরদ বটে!

দেব। মামলা মিটমাট ক'রে নাও বাবা, নন্টুর সঙ্গে মিটমাট করতে তো তোমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়!

শিব। (রুদ্ধ গম্ভীর ভাবে) না। মামলা চলবে। আমার ঘাড়টা বড় শক্ত দেবনারায়ণ, নোয়াতে গেলে ব্যথা লাগে। রাজেনবাবু, আপনি জজকোর্টে দরখাস্ত করুন আপীলের জন্যে। মামলা চলবে, মামলা চলবে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নন্টুর শহরের বাসা

[ঘরের মধ্যে নির্গমন-পথে আমের শাখা দেওয়া পূর্ণ ঘট। বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরনে লালপেড়ে শাড়ী, হাতে একটি থালায় আশীর্বাদী ফুল, সদ্য সে পূজা করাইয়া ফিরিয়াছে। চুল এলো, চুলের উপর অল্প ঘোমটা। উকিলের বেশে গাউন পরিয়া নন্টু বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল]

নন্টু। (সবিস্ময়ে) আরে বাপ রে! এসব কি?

বিমলা। পুজো করিয়ে এলাম ঠাকুরদের।

নন্টু। (হাসিয়া) ভাগ্যে তোমরা আছ বিমলা, তাই তো দেবলোক আজও বেঁচে আছেন। নইলে বেচারারা শুকিয়ে ভারতলোকের অধীন অবস্থায় উপনীত হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর, কি কামনা করলে?

বিমলা। তোমার জয় কামনা করলাম। আর কোন্ কামনা করব?

নন্টু। কত টাকা মানত করলে?

বিমলা। মানত করেছি, তবে সেটা টাকা নয়।

নন্টু। বল কি?

বিমলা। আজ তোমায় আমি কটু কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কটু কথা বলছি না, ঠাট্টাও করছি না, সত্যি কথাই বলছি—টাকা মানত করি নি, টাকা কামনা করি নি, এমন কি লক্ষ্মীর পুজো পর্যন্ত করাই নি। এতে লক্ষ্মীর আশীর্বাদী নেই।

নন্টু। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) তবে কি মানত করলে?

বিমলা। বুকের রক্ত মানত করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করাব।

নন্টু। তোমার জয় হোক বিমলা, তোমার জয় হোক।

বিমলা। না। চিরদিন যে পরাজয় মেনেই এল, হঠাৎ তার জয় সহ্য হবে না। (পর-মুহূর্তেই হাসিয়া) ওই দেখ, স্বভাব যায় না ম'লে! যা বলব না বললাম, তাই ব'লে ফেললাম। বেশ, আমার জয় হোক; কিন্তু তোমার জয়ই তো আমার জয়।

নন্টু। দাও, আশীর্বাদ দাও। (মাথা নত করিল)

বিমলা। তুমি কি মানুষ! আমার কি তোমার মাথায় হাত দিতে আছে? ঠাকুরঝি! কল্যাণী-ঠাকুরঝি! অ ভাই!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

নন্টু। এ কি কল্যাণী? এ কি বোন? তোমার এই ময়লা বেশভুষা, জী একখানা—

কল্যাণী। কদিন কাপড়চোপড় ক্ষারে কাচা হয়ে ওঠে নি দাদা।

নন্টু। কেন? তুমি কাপড়চোপড়—

বিমলা। দেখ, তুমি কাপড় কাচার নাম ক'রো না বলছি। শুভকাজে যাচ্ছ না ?

নুটু। যারা তোমার সঞ্চয়-করা মালিন্য পরিষ্কার ক'রে তোমার সংসার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ভ'রে দেয়, তাদের নাম কখনও অশুভ হয় বিমলা ? তুমি কি কাপড়চোপড় ধোবার বাড়ি দাও না কল্যাণী ?

কল্যাণী। নিজেই এগুলো ক'রে নিই দাদা। কেন মিছে—

নুটু। না, মিছে নয় বোন। তুমি আমার বোন, এতে যে আমার নিন্দে হবে কল্যাণী।

বিমলা। বেশ তো, মামলা জিতে একখানা কাশীর গরদ কিনে এনে দিও ঠাকুরঝিকে। অন্য কিছু না নিক ঠাকুরঝি, গরদ আমি নেওয়াব। এখন মাথা নামাও।] ও ঠাকুরঝি, আশীর্বাদী দাও তো তোমার দাদার মাথায়।

কল্যাণী। ওরে বাপ রে ! আমি কি দাদার মাথায় হাত দিতে পারি বউদি ?

বিমলা। বোন সব পারে ঠাকুরঝি। ব্রাহ্মণের বোন পৈতের চেয়েও বড়, পৈতে থাকে গলায় —বোনের ঠাঁই মাথায়।

নুটু। (বিমলার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিল) দাও কল্যাণী, আশীর্বাদী দাও।

[কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবে আশীর্বাদী মাথায় ঠেকাইয়া দিল]

বিমলা। ও শ্যামা ! মমতা ! তোরা করছিস কি সব ? অরুণ কোথায় ?

নেপথ্যে শ্যামা। আসছি মা।

[শ্যামা, মমতা ও অরুণের প্রবেশ। অরুণের কপালে চন্দনের ছাপ, পরনে গেঞ্জি, নূতন কাপড়]

বিমলা। অরুণের আজ জন্মদিন। তোমার তো সকাল থেকে অবসর ছিল না। প্রণাম কর্ অরুণ।

শ্যামা। দাদাকে কি দেবেন বাবা ? [অরুণ নুটুকে প্রণাম করিল]

নুটু। কি দেব ? দেব শুধু আশীর্বাদ। জীবনে যেন আদর্শচ্যুতি না ঘটে। আদর্শের সত্যকেই যেন সকলের চেয়ে বড় করতে পার।

[অরুণ মাকেও প্রণাম করিল]

বিমলা। আমি আশীর্বাদ করি বাবা, সংসারে তুই সুখী হোস। তোর স্নেহে তোর স্ত্রীপুত্র যেন সুখী হয়।

[সুশোভনের-একটা মাছ লইয়া প্রবেশ, মাছটা ফেলিয়া দিয়া]

সুশোভন। নুটুদার শুভযাত্রা অ্যাণ্ড্ অরুণের বার্থ-ডে ফীস্ট্—বোথ পারপাস উইল বি সার্ভ্ড্।

নুটু। আজও তুমি মদ খেয়েছ সুশোভন ? কোর্টে আজ তোমার সাক্ষী দিতে হবে।

সুশোভন। অল্প একটু নুটুদা, অত্যন্ত অল্প। মাইরি বলছি। তবে ইউ সী, ভড্কার গন্ধটাই খারাপ।

নুটু। মাছ তুমি কোথায় পেলে ?

সুশোভন। সে ভারি মজার কথা নুটুদা ! তোমার শত্রু—ওই বাবুদের পুকুরের মাছ, তোমার জয়যাত্রা দেখাতে নিয়ে এসেছি।

নুটু। নিয়ে যাও এ মাছ।

সুশোভন। মাইরি বলছি, চুরি করি নি। আমায় দিলে, মাইরি বলছি।

নুটু। দিলে ? কে দিলে ?

সুশোভন। বুড়ো বড়বাবু হঠাৎ বেহালা শোনবার জন্যে ডেকেছিল। দি ওল্ড্ ম্যান ইজ

রিয়েলি অ্যামিউজিং—এ ফানি ফেলো—এ ডার্লিং। আমায় দুটো টাকা দিলে। ঠিক সেই সময় ওদের মাছ ধ'রে নিয়ে এল ; আমি বললাম, টাকা চাই না, আমায় একটা মাছ দিন। হি গেভমি বোথ দি মানি অ্যান্ড দি ফিশ।

নুটু। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত সুশোভন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আরও একটা কথা, তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

[যাইবার সময় মাছটা লাথি মারিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

সুশোভন। এটা কি হ'ল ? অ্যাঁ ? হোয়াট ইজ দিস ? চুরি করি নি, ভিক্ষে নিই নি, সে আমায় দিলে। আগে বাদশারা একখানা গান শুনে কত জায়গীর দিয়ে গেছে। এ তো একটা মাছ।

[বিমলা বাহিরে গিয়া মাছটা লইয়া আসিল]

বিমলা। ও'র মেজাজই ওই রকম ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

কল্যাণী। না বউদি, নুটুদা রাগ করবেন।

বিমলা। ছেলে কি ও'র একার ঠাকুরঝি ? আমার কি কোনও অধিকার নেই ? এই মাছের মুড়ো দিয়েই অরুণ আজ ভাত খাবে।

সুশোভন। দ্যাট'স লাইক ইউ বউদি। মাইরি বলছি বউদি, আমাকে সম্মান ক'রে দিলে। আমিই বরং বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমায় বললে কি জান ? মমতার সঙ্গে ওদের মাতাল ছেলেটার বিয়ের কথা বললে। আমি বললাম, সে অসম্ভব ; আমি নিজে মাতাল, কিন্তু আই হেট দি মাতালস ; তার ওপর আপনাদের ছেলে আনকালচার্ড— মূর্খ ;

[নুটুর মুহুরীর প্রবেশ]

মুহুরী। সুশোভনবাবু, আপনি শিগগির আসুন। এখুনি হয়তো ডাক পড়বে। আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আসুন মশায় সুশোভনবাবু !

সুশোভন। ওয়ান মিনিট প্লীজ, একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই।

(পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া মদ খাইয়া) চলুন এইবার।

(মুহুরী ও সুশোভনের প্রস্থান)

কল্যাণী। এক এক সময়ে ইচ্ছে করে বউদি—

বিমলা। সে ইচ্ছে কি বউদিরই হয় না ভাই ? কিন্তু ও-ইচ্ছে দমন করতে হয়।

কল্যাণী। ছোড়দার জীবন বেশিদিন নয়, তাই ওকে বলতে পারি না—তুমি যাও।

বিমলা। তা যদি বলতে ঠাকুরঝি, তবে আমি তোমাকে ঘেন্না করতাম। এস ভাই, রান্নার কাজ অনেক বাকি, এস, একটু হাত দেবে এস। (বিমলা ও কল্যাণীর প্রস্থান)

শ্যামা। দাদা, মমতা তোমার জন্যে কি এনেছে দেখ !

অরুণ। আগে তোর দেখি ! তুই কি দিচ্ছিস ?

শ্যামা। আমি কার্পেটের জুতো তৈরি রেখেছি।

অরুণ। শ্রীচরণে শু—এস এইচ ও ই !

শ্যামা। দাদার জুতোয় হাত দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারও বেলা বড় জোর জামা-কাপড়টার ভার নিতে পারি। তাই তো মমতা এনেছে নিজের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড়।

নেপথ্যে বিমলা। শ্যামা ! শ্যামা !

শ্যামা। যাবা ! বাবা ! যাই। আর কি এনেছে মমতা, তুমি জিজ্ঞেস কর ওকে ! (প্রস্থান)

মমতা। সত্যি। আমার আরও কিছু দেবার আছে।

অরুণ। দাও মমতা। শিব অঞ্জলি পেতেছিলেন অন্নপূর্ণার সম্মুখে, অন্ন দিয়েও অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার শূন্য হয় নি, শিবের অঞ্জলিও পূর্ণ হয় নি। দিয়ে তুমি আমার হাতও ভ'রে দিতে পারবে না।

মমতা। আমি হ'লে শিবের হাতে অন্ন দেবার স্পর্ধা না ক'রে এক টুকরো বেলপাতা তাঁর পায়ে দিয়ে 'নমঃ শিবায়' ব'লে প্রণাম করতাম। আশুতোষের অঞ্জলি যতই বিরাট হোক, এক কণা ভক্তিতেই তা ভ'রে ওঠে। আশীর্বাদ করতে পথ পেতেন না।

অরুণ। আবার আমি হাত পাতছি, আরও দাও মমতা।

মমতা। নাঃ, রুদ্র-দেবতাকেও তুমি হার মানালে দেখছি! বেশ আবার একটা প্রণাম করছি।

অরুণ। প্রণাম তো তোমার চাচ্ছি না। তোমার ভক্তিতে আমার অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। কিন্তু ভক্তিই কি সব? ক্ষুধা আমার মিটেছে, কিন্তু তৃষ্ণা?

মমতা। তৃষ্ণা?

অরুণ। হ্যাঁ, তৃষ্ণা, জল দাও। তুমি ভক্তি দিচ্ছ, আমি দেবতার মত তুলে নিচ্ছি। কিন্তু ভক্তিই কি সব? আমার অন্তর তো তাতে জুড়িয়ে যাচ্ছে না। তুমি হাসছ মমতা?

মমতা। হাসছি। লবণাক্ত সমুদ্র আদিকাল থেকে নদীর নির্মল স্নিগ্ধ জল পান ক'রে আসছে, আকণ্ঠ পুরে অহরহ অবিরাম। কিন্তু তৃষ্ণা তার তবু মিটল না। সে বোধ হয় বুঝতেও পারবে না যে, নদী তার জীবন নিংড়ে ঢেলে দিলে।

অরুণ। সে কথা নদী বলে না কেন? সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে না-ই যদি ওঠে তার কণ্ঠস্বর, সে তো কানে কানেও সে কথা বলতে পারে।

[মমতার গান]

মুখে কেন শুধাও মিছে,
চোখের পানে দেখ চেয়ে,
ভীরু যে সুর ডরায় ভাষা,
আঁখির আলোয় ওঠে গেয়ে॥
সারাদিন যা মনে মনে
ভাবে আকাশ সঙ্গোপনে,
যেমন রাতের অন্ধকারে
ফোটে তারা আকাশ ছেয়ে,
তেমনি আমার মনের কথা
আঁখির আলোয় ওঠে নেয়ে॥
মুখের চেয়ে অনেক বেশি মুখর দুটি আঁখি,
অধর যেমন দেয় না ধরা, নয়ন যে দেয় ফাঁকি,
নাই বা শোনা হ'ল কানে,
শুনেছ তো গভীর প্রাণে—গভীর প্রাণে,
ব্যাকুল বাণীর নিঝর যেথা ঝরে ঝরে
ঝরে আমার হৃদয় বেয়ে॥

অরুণ। তোমার মুখর চোখের বাণী অনবদ্য মমতা। তৃষ্ণা মিটে গেল। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি বিজয়িনী হও।

মমতা। তা হ'লে আবার একটা প্রণাম করি।

নেপথ্যে নুট। বিমলা! বিমলা!

অরুণ। বাবা! (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল)

মমতা। (প্রস্থান করিতে করিতে) পাওনা রইল, পরে পাবে। [প্রস্থান]

[নন্টু ব্যস্তভাবে প্রকাশ করিল, চারিদিকে দৃষ্টি দিয়া খুঁজিয়া]

নন্টু। একখানা বই আর নোট-করা কয়েকখানা কাগজ ?

[নন্টুর ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে অরুণও অনুসরণ করিল। পুনরায় কাগজ ও বই হাতে নন্টু এবং তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিমলা]

নন্টু। সুশোভনের এজাহারে কোর্টের মধ্যে আমার মাথাটা কাটা গেল বিমলা। একটা মাতাল, অপদার্থ, চোর—আমার মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিলে। কুক্ষণে—কুক্ষণে ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম।

বিমলা। ছি! ও কথা তোমার মুখে সাজে না। বড় বড় গাছ আকাশ ছুঁয়ে থাকে, তাতে ফুল ফোটে, ফল ধরে, কত পাখি আশ্রয় নেয়, আবার কত সাপও এসে বাসা বাঁধে! তাতে কি গাছের মাথা হেঁট হয় ? সে চিরদিন আকাশমুখেই বাড়ে। ও-কথা তুমি ব'লো না। কল্যাণী-ঠাকুরঝি শুনলে কি মনে করবে বল তো ?

নন্টু। কল্যাণী! কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ বিমলা, কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

আদালত-সন্নিকটবর্তী শহরের চৌমাথা। খবরের কাগজের হকার হাঁকিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কানে কলম, হাতে কাগজের তাড়া, আদালতের টাউট চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোর্টের পিয়নের হাঁক শোনা যাইতেছে—কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ, হাজির হো, মুকুন্দ ঘোষ—কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ। (দুইজন টাউট কথা বলিতেছে)

১ম। ওরে বাপ রে! নন্টুবাবু আগুন ছুটিয়ে দিলে! বাবুদের সাজানো খোলস পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

২য়। রুদুবাবুও ছাড়ে নাই। ওই মাস্টারনীর ভাইকে জেরায় বেশ এক হাত নিয়েছে নন্টুবাবুকে। পয়েন্টো ভারি ধরেছিল, বলে—তুমি নন্টুবাবুর হবু বেয়াই ?

১ম। সে যাই হোক, মাতালই হোক, আর ছ্যাচড়াই হোক, আসল মামলায় ওর সাক্ষী খারাপ হয় নি। নন্টুবাবুর সাহস বটে, দু-তিনটে সাক্ষী ছাড়া, সব সাক্ষীকে হস্টাইল ব'লে জেরায় সব ঠিক বার ক'রে নিলে! তুমি দেখো, নন্টুবাবু এই মামলাতেই বড় উকিল হয়ে গেল। হিরণপুরের বাবুদের দাঙ্গার মামলা দেবার জন্যে বাবুদের লোক ঘুরছে।

নেপথ্যে কোর্ট-পিয়ন। হেরম্ব পাল—হেরম্ব পাল হাজির হো! হেরম্ব পাল—

২য়। ওরে বাবা, এ যে আমার মক্কেল হে! হেরম্ব, ও হেরম্ব—

(প্রস্থান)

১ম। ও মশায়, ও মশায়, ও হিরণপুরের সরকার মশায়! শুনুন শুনুন।

(প্রস্থান)

(গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। এ যে বিপরীত হয়ে গেল গোপী! সাক্ষীদের একটাও টিকল না! এক-একজনকে এক-এক মুঠো টাকা—সব বরবাদ গেল! বেইমানি করলে সব!

গোপী। আজ্ঞে না। জেরায় টিকল না, বিবেচনা করুন, স্বচক্ষে দেখলেন, জেরায় টিকল না। নন্টু মোক্তার হ'ল অনর্থের মূল। সব হস্টাইল ব'লে জেরা আরম্ভ করলে। আর

বিবেচনা করুন, সত্যি জিনিসটাই পাজি জিনিস, বিবেচনা করুন, পারার মতন পাজি জিনিস, কিছুতেই হজম হয় না, ফুটে বেরুবেই।

দেব। এখন উপায়?

গোপী। হাইকোর্টে আপীল করব, ভাবছেন কেন? বিবেচনা করুন, বাবারও বাবা আছে।

দেব। এই সব এজাহারের পর হাইকোর্টে কোনও ফল হবে না।

গোপী। ওই কথাটি বলবেন না হুজুর। তবে বলি শুনুন, এই আপনার ১৩১৫ সালে, ইংরাজী ১৯০৮, লাট কমলপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গা, ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, বিবেচনা করুন, আমি বার বার বারণ করলাম, 'যদি পায় রাজ্য দেশ, তবুও না যায় বৃহস্পতির শেষ'—বারণ করলাম, আজ থাক্। তা সেজোবাবু—

দেব। (বাধা দিয়া) গোপী, তুমি একবার মহাভারতকে দেখ, নুটুবাবুর সঙ্গেও দেখা কর। মামলা মিটমাট কর।

গোপী। মিটমাট করবেন?

দেব। হ্যাঁ, মিটমাট করব। সাহেব-সুবোর কাছে আমাদের সুনাম একেবারে নষ্ট হবে। ওই মহাভারত যাচ্ছে। তুমি ডাক ওকে। আমি একটু স'রে যাই। ভয় নেই, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। ডাক মহাভারতকে। কথা বল। (প্রস্থান)

গোপী। মহাভারত! মহাভারত! বলি, শোন হে, শোন।

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। মিটমাট আমি করব না হে। আর কিছু বলবে তো বল।

গোপী। আরে, শোন শোন।

মহা। (গোপীর মুখের কাছে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া) খটখট লবডঙ্কা—খটখট লবডঙ্কা। জমি নাই, কাড়বি কি? ঘর নাই, আগুন লাগাবি কিসে? খটখট লবডঙ্কা! আর আমার করবি কি?

গোপী। জমি ফিরে পাবে, ঘর তৈরি ক'রে দেব। নগদ টাকাও কিছু আদায় ক'রে দেব। (চুপিচুপি) বারো আনা তোমার, সিকি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

মহা। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিল) দাদাঠাকুর! ও দাদাঠাকুর!

[নুটু ও তাহার মুহুরীর প্রবেশ]

নুট। কি মহাভারত? আরে, আপনি যে মিত্তির মশাই!

গোপী। প্রণাম।

মহা। দাদাঠাকুর, মিত্তির বলছে মিটমাট করতে।

নুট। মিটমাট!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবেচনা করুন, মিটমাট।

নুট। (গোপীর দিকে চাহিয়া) দুটি শর্তে মিটমাট হতে পারে মিত্তির মশাই।

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, দু'শো শর্ত মানতে রাজী আছি। কর্তাবাবু বললেন কি জানেন? বললেন, নুটুবাবু হলেন আমাদের গাঁয়ের গৌরব।

নুট। কর্তাবাবু বয়স্ক লোক, আমার বাপের বয়সী, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

গোপী। আপনার শর্ত কি বলুন?

নুট। প্রথম শর্ত—এই মিটমাটের কথা, অবশ্য কর্তাবাবুকে বাদ দিয়ে, কাঁধে ঢাক বাজিয়ে শহরে জানাতে হবে। আর, মহাভারতের পোড়া ঘর এখনও ছাওয়ানো হয় নি, সেই চালে উঠে বাবুদের ছাওয়াতে হবে।

গোপী। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, হাইকোর্টের পর সে কথা বিবেচনা করা যাবে। প্রণাম তা হ'লে। (প্রস্থান)

নুট। সুশোভন কোথায় জান মহাভারত?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর আপনার তালে আছে দাদাঠাকুর। আদালত থেকে দু টাকা খোরাকি পেয়েছে, আজ পাকী মদের দোকানে ব'সে গিয়েছে। মদ খাচ্ছে আর তালপাতা নিয়ে কি বুনছে!

(মহাভারতের প্রস্থান)

নুট। রাস্কেল!

(কোর্ট-রুমের মধ্যে প্রবেশ করিল)

দৃশ্যান্তর—কোর্ট-রুম

উকিল, আসামী, জজ, দর্শক। আসামীর ডকে কালী বাগদী; নুটুবাবু আর্গুমেণ্ট করিতেছে

নুট। ইওর অনার, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করেছি ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক অত্যাচারী ধনীর অপরাধে, তারই অন্নপুষ্ট, যে অন্নের প্রভাবে তার বিবেক, তার বুদ্ধি, তার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনই একজন অজ্ঞান দুর্বলের ওপর দণ্ড-বিধান করা ছাড়া ধর্মাধিকরণের আজ গত্যন্তর নেই। বিচারকের অনুমতি নিয়ে আর একবার শেষবারের জন্য আসামীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—কেন সে এ কাজ করলে? মহাভারতের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা ছিল না—এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। তবু সে যখন এ কাজ করেছে, তখন অন্তরালবর্তী কোন চতুর যন্ত্রীর সুচতুর হাত তাকে এ অন্যায় করতে বাধ্য করেছে। সেই কথা প্রকাশের শেষ সুযোগ আমি হতভাগ্যকে দিতে চাই।

(হাকিম হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন)

(কালীর প্রতি) কালীচরণ, আবার তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি—বল, কার হুকুমে, কেন, তুমি মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়েছ?

কালী। কেন বার বার শুধোচ্ছ মশায়? হ্যাঁ, আমি আগুন দিয়েছি। নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি। বাবুরা আমায় কেন বলবে? কিসের লেগে বলবে? আমি নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি।

নুট। ইওর অনার, আজ আমার মনে হচ্ছে ভগবানের পুত্র যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার কথা। ভগবানের পুত্র একবারই মাত্র ক্রুশে বিদ্ধ হন নি, বার বার—নিত্য এই সংসারে ভগবানের পুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষ ভগবানের সন্তান, তার মনুষ্যত্ব এই কালী বাগদীর মনুষ্যত্বের মত যেখানেই পিষ্ট হয়, সেইখানেই তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হন। ওই অজ্ঞান আসামীর অন্তরের মধ্যে দাসত্বের ক্রুশে বিদ্ধ মনুষ্যত্বের রক্তাক্ত মূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। এর বিচার একজন করবেন। ভগবানের পুত্র মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্রুশে বিদ্ধ করার অপরাধে বিচার করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা, তিনি। তাঁর বিধানে এ অপরাধের দণ্ডও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীসাস ক্রাইস্ট্ সে কথা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God। সর্বশেষে বিচারকের কাছে ওই নির্বোধ হতভাগ্য ভ্রষ্টমনুষ্যত্ব আসামীর জন্যে করুণা প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেণ্টল্‌মেন—

জুরী। আমাদের পরামর্শ করবার কোন প্রয়োজন নেই হুজুর, আমরা সকলেই একমত। আসামী দোষী—উই ফাইন্ড্ হিম গিল্‌টি।

জজ। I accept your verdict and condemn the accused to five years R.I.

(জজ, জুরী, কর্মচারী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেল। নুটু কেবল রহিয়া গেল। সুশোভন ও মহাভারতের প্রবেশ। সুশোভনের বগলে বেহালা, হাতে তালপাতার মুকুট)

সুশোভন। লং লিভ নুটুদা। হিয়ার ইজ এ ক্রাউন মেড অব পাম-লীভস্।

নুটু। জান সুশোভন, আমার যদি তোমার মত ছেলে হ'ত, তবে তার মুখে আমি নিজ হাতে বিষ তুলে দিতাম।

সুশোভন। (চমকিয়া) কেন নুটুদা?

নুটু। কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ সুশোভন? তোমার মরণই মঙ্গল, মরণ না হ'লে তোমার আত্মহত্যা করা উচিত।

(প্রস্থান)

সুশোভন (বসিয়া পড়িল) মহাভারত!

মহাভারত দাদাঠাকুর।

সুশোভন নুটুদা ও-কথা বললে কেন?

মহাভারত বড় দাদাঠাকুরের কথা ছাড়ান দাও। চল, বাড়ি চল।

সুশোভন (কাঁধ খ্রাগ করিয়া) মহাভারত, আমার দোষ আমি জানি, আমি অপদার্থ, আমি মাতাল। কিন্তু আমি কারও কোনও ক্ষতি করি না নুটুদা। দু-চার পয়সা, দু-চারটে জিনিসও চুরি করি, কিন্তু তোমার আর কল্যাণীর ছাড়া অন্য কারও নয়—আপন্ গড, ঈশ্বর জানেন মহাভারত।

[মহাভারত স্তব্ধ হইয়া রহিল]

সুশোভন। মহাভারত!

মহা। দাদাঠাকুর!

সুশোভন। বেহালা বাজাব, শুনবে?

মহা। এই রাস্তার ওপর দুপুরে রোদে?

সুশোভন। জান মহাভারত, পটাসিয়াম সায়ানাইড ব'লে এক রকম বিষ আছে, সে বিষ জিবে ঠেকাবামাত্র মানুষ ম'রে যায়, কোনও যন্ত্রণা হয় না!

মহা। না না দাদাঠাকুর, ও-কথা তুমি মনে ঠাঁই দিও না। বড় দাদাঠাকুরের রাগ অমনই বটে।

সুশোভন। অনেক সময় ভাবি, এখান থেকে চ'লে যাই। কিন্তু ভয় হয় কি জান? মরবার সময় বড় কষ্ট পাব। এখানে মরবার সময় কল্যাণী সেবা করবে, কাঁদবে; তুমি কাঁদবে, মমতা কাঁদবে, অরুণ কাঁদবে, বউদিও কাঁদবে মহাভারত—সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।

মহা। দাদাঠাকুর! আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে দাদাঠাকুর। বড় দাদাঠাকুর রাগ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দেব।

সুশোভন। (উঠিয়া) "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে—তুমি অভাগারে চেয়েছ।" কবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটুবাবুর অট্টালিকার ড্রইং-রুম

নুটুবাবু এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছে। পূর্বোক্ত ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পর। ইতিমধ্যেই সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। ড্রইং-রুমে মূল্যবান আধুনিক আসবাব, দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েল-পেণ্টিং—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু। প্রাচীন জিনিসের মধ্যে সেই সূচীশিল্প—"ইট ইজ ইজিয়ার ফর এ ক্যামেল"খানি রহিয়াছে—

(অরুণ ও শ্যামা বসিয়া আছে, মমতা গান গাহিতেছে —)

এই তো ভাল এই তো ভাল,
সে তারার পানে তরণী বাই তীরের মায়া সেই ঘুচাল ॥
উথলে জল তুফান হাঁকে
তবুও মিছে পিছনে ডাকে,
সকল মন-হরণ-করা জানে যে শুধু একটি আলো ॥
শ্যামল কোন সাগরদ্বীপে যদি না ভিড়ে তরী,
স্বপন নীড় রচার সাধ বিফলে যায় ঝরি,
অজানা পথে তিমির-রাতে
হাতটি শুধু রাখিও হাতে,
ঘরের দীপ হ'ল না জ্বালা ঝড়ের মেঘে বিজলী জ্বালো ॥

মমতা। এইবার আমায় ছুটি দাও। কংকণায় পাঠিয়ে দাও। নইলে মা হয়তো চ'লে আসবেন।

শ্যামা। ভালই হবে। একবার তাঁর পায়ের ধুলো পড়বে। বাবা এখন বড়লোক হয়েছেন বলে পিসীমা আর আসতেই চান না। না, এ-বেলা তোমার যাওয়া হবে না, ও-বেলা দাদা তোমাকে গাড়ি ক'রে পোঁছে দিয়ে আসবে। চল না দাদা। আমিও যাব।

অরুণ। পোঁছে দিয়ে আসতে রাজী আছি, কিন্তু গাড়ি ক'রে নয়—পায়ে হেঁটে।

শ্যামা। তাই হবে কমরেড মুখার্জি। তোমাদের জ্বালায় অস্থির বাবা! তুমি আজ জেলে যাচ্ছ, কাল বেরুচ্ছ, আবার পরশু যাচ্ছ জেল। বরুণবাবু তো আজ দু বছর ডিটেনুশনে। বাবা মামলা আর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। মা আপনার মনেই আছে। আমারই হয়েছে বিপদ। একা থাকি কি ক'রে বল তো? দয়া ক'রে বিয়ে করবার অবসর ক'রে মমতাকে এনে দিয়ে যা খুশি কর, কিছু বলব না।

অরুণ। তার চেয়ে ভাল একটি সঙ্গী দেখে তার ঘরে তোকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় বল দেখি? মমতা, কি বল? বেটার সাজেশন না? চমৎকার হয় না?

মমতা। নিশ্চয়, চমৎকার হয়।

শ্যামা। চমৎকার হয়! মেয়েরা কক্ষনো পুরুষের সমান হতে পারবে না—এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। হাজার অনিচ্ছে সত্ত্বেও পুরুষের কথায় ডিটো মারতেই হবে। চমৎকার হয়! এদিকে মেয়ের মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

মমতা। ঠিক কথা ভাই শ্যামা। এ দেশের মেয়েদের কিছু হবে না। অনিচ্ছে সত্ত্বেও ফ্যাকাশে মুখে আমরা ডিটো মারি, আবার ইচ্ছেয় বুক তোলপাড় করলেও লজ্জায় মুখ লাল ক'রে আমরা ডিটো দিতে পারি না। আমাদের দেশের মেয়েদের কিছু হবে না।

শ্যামা। দাঁড়াও না, এক্ষুনি গিয়ে আমি মাকে ধরছি, দাদার বিয়ে দেবে কি না? আজই

একটা হেস্তনেস্ত করব। মা! মা! (প্রস্থান)

অরুণ। মমতা!

মমতা। বল।

অরুণ। সত্যিই মমতা, একটা হেস্তনেস্ত না কি ব'লে গেল শ্যামা, করার এইবার প্রয়োজন হয়েছে। তোমার মাও দেখলাম ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু কয়েকটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে আমার।

মমতা। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আজও আছে তোমার?

অরুণ। আমার ব্রত তুমি জান।

মমতা। সে ব্রতের ভাগ কি আমি গ্রহণ করি নি?

অরুণ। যদি আমায় দীর্ঘকাল বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়, মমতা?

মমতা। বাইরে থেকে তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব আমি।

(বাহিরে মোটরের হর্নের শব্দ)

অরুণ। বাবা এলেন। এস, আমরা ভেতরে যাই। (মমতা ও অরুণের প্রস্থান)

(একজন চাকর কতকগুলি জিনিসপত্র, অ্যাটাচি কেস, ফুলের মালা লইয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর প্রবেশ করিল নুটু। নুটু এখন প্রৌঢ়। পরনে দামী খদ্দরের কাপড় জামা চাদর। আসিয়া চেয়ারের উপর বসিল। চাকর চাদর ছড়ি লইল। পায়ের জুতা লইয়া স্লিপার দিল)

নুটু। দীজ মীটিংস, উঃ, আই অ্যাম টায়ার্ড। খবরের কাগজটা কই রে?

(চাকর খবরের কাগজ দিয়া বাহির হইয়া গেল; নুটু কাগজ পড়িতে লাগিল। চাকর পুনরায় প্রবেশ করিয়া একখানি কার্ড দিল; নুটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল)

নুটু। কোথায়? কোথায় তিনি?

চাকর। আজ্ঞে, বাইরে চেয়ারে বসতে দিয়েছি।

নুটু। আঃ, ইডিয়ট কোথাকার!

[ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল, চাকরও গেল, পুনরায় নুটু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল]

আসুন আসুন। কাশী থেকে কবে ফিরলেন? এই বসুন।

[নিজে দামী আসন আগাইয়া দিল]

বৃদ্ধ। ফিরেছি আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল। শুনলাম সব। ভারি আনন্দের কথা। তুমি এতবড় বাড়ি করেছ, অ্যাসেম্বলির মেম্বার হয়েছ, তোমার ছেলে এম.এ.তে ফার্স্ট হয়েছে। ভাবলাম, বেটার লেট দ্যান নেভার, যাই, একবার নুটুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এখন বল, কি জানাব—অভিনন্দন, না, আশীর্বাদ?

নুটু। (প্রণাম করিয়া) সমস্ত আপনাদের আশীর্বাদ।

বৃদ্ধ। বার থেকে যখন তোমাকে সাপোর্ট ক'রে আপীলটা আমার সইয়ের জন্যে পাঠালে, তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য হলাম। নুটু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? কংগ্রেস নুটুকে নমিনেশন দিলে না? যাক, বার-লাইব্রেরির এককালে প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তুমি হ'লে বর্তমান প্রেসিডেন্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সই ক'রে পাঠিয়ে দিলাম।

নুটু। আপনার নামে অনেক কাজ হয়েছে। আপনার নাম—

বৃদ্ধ। না না, বড় উকিল ব'লে পসার ছিল, তাকে কি আর নাম বলে? তুমি কর্মী, কীর্তিমান পুরুষসিংহ; তোমার নিজের গুণেই কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটকে হারানো সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কেন? কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন দিলে না কেন?

নুট। পার্টি-পলিটিক্স তো জানেন ! পার্টি-পলিটিক্স আর কি ! আমি যথাসর্বস্ব কংগ্রেসের প্রয়োজনে ঢালতে পারছি না, এবারকার সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স মুভমেণ্টে আমি জেলে যাই নি—এই আমার অপরাধ।

বৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে নুটু, মডার্ন পলিটিক্সের এই সব আন্দোলন আমি বেশ বুঝতে পারি না বাপু। জেলেই যদি সবাই যাবে, তবে কাজ করবে কে ?

নুট। (হাসিয়া) জানেন, থার্টির মুভমেণ্টের সময় আমার ছেলেকে আমি সেই কথা বলেছিলাম—বলেছিলাম, দেশের অন্নবস্ত্রের আগে সংস্থান কর। জেলে যাওয়ার চেয়ে সেটা বড় কাজ। মুখে সে প্রতিবাদ করলে না, কিন্তু সেই দিনই বিকেলে অ্যারেস্টেড হ'ল। থার্টি থার্টিওয়ান—দু বছর মাটি ক'রে এবার সে একজামিন দিলে। আমার ছোট ছেলে আরও প্রগতিশীল, সে এখনও দেউলীতে। আমার বড় ছেলে ইলেক্‌শনের সময় কলকাতায় গিয়ে ব'সে রইল, পাছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার জন্যে তাকে কাজ করতে হয় !

বৃদ্ধ। ছেলের বিয়ে দাও হে, ছেলের বিয়ে দাও। সব সেরে যাবে। ওসব হ'ল এক ধরনের হিস্টিরিয়া।

নুট। বিয়ে তো হয়েই যেত এতদিন, কিন্তু জেলে তো আর ছাঁদনাতলা পাতা হয় না ! এইবার বিয়ে দেব। কিন্তু ছেলে বলে কি জানেন—উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করব না।

বৃদ্ধ। ভাল কথা নুটু, তুমি কি ছেলের বিয়ের কোথাও ঠিক করেছ ?

নুট। হ্যাঁ (ইতস্তত করিয়া) মানে—অনেকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, আমিও অবশ্য—

বৃদ্ধ। দেখ, কয়েকদিন আগে আমার বাড়ির সামনেই নর্দমার ধারে একটা মাতাল প'ড়ে ছিল, লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। আজ আবার দেখলাম, সে একটা ইতর জাতের মাতালের সঙ্গে মাতলামো করছে। আজও লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। একটি দরিদ্র বিধবা এসেছিল আমাদের বাড়ি, হাতে-তৈরী জামা টেবিল ক্লথ বিক্রি করতে। মেয়েরা বললে—তোমার বেয়ান। প্রতিশ্রুতি কি তোমার এদের কাছে ?

নুট। (মাথা হেঁট করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল) আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমার এদের কাছেই। এ আমার হয়েছে নীলকণ্ঠের বিষ।

বৃদ্ধ। এ বিষ উদরস্থ হ'লে কিন্তু মারাত্মক হবে নুটু। না না, তুমি এ কাজ ক'রো না। কংকণার ন্যায়রত্নের বংশ তোমরা, তুমি নিজে কীর্তিমান হয়েছ ওই বংশের পবিত্রতায়। এ কাজ তুমি ক'রো না।

[মহাভারতের প্রবেশ—ভঙ্গী তাহার সংকুচিত ; পূর্বের মত স্বচ্ছন্দ নয়]

নুট। কি মহাভারত ?

[মহাভারত প্রণাম করিল]

মহা। আজ্ঞে, দিদিঠাকুরুন এলেন, সঙ্গে এলাম। তাই বলি, আপনাকে পেনাম।

নুট। কল্যাণী এসেছে ?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। এটি তোমার সেই চাষী বীর নয়, যাকে নিয়ে তোমার কংকণার বাবুদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে ? হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কীর্তির কনগ্রাচুলেশনই তোমাকে দেওয়া হয় নি। ওইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কীর্তি হে। কংকণার বাবুদের মত অত্যাচারী বাবুদের তুমি জব্দ কর নি, সংশোধন করেছ। কংকণায় আমি গিয়েছিলাম, আমার পুরনো মক্কেল তো, ওঁদের এলাকায় জমি-জেরাত আমার আছে। দেখলাম, সে আমলই আর নেই, ধারা-

ধরন সব পালটে গেছে। কর্তাবাবু বললেন—এসব নুটু উকিলের শিক্ষা রাজেনবাবু। ব'লে হা-হা ক'রে হাসলেন। স্বীকার করলেন, আগে যা করতেন, সেসব অন্যায়। তোমার অ্যাসেম্ব্লি-ইলেক্শনে ও'রা তো তোমাকেই সাপোর্ট করেছিলেন শুনলাম। বড়বাবু বললেন—নুটুর ওপর রাগ তো নেই-ই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কত বড় লোক নুটু, আমাদের গ্রামের গৌরব, তাকে আমরা সাপোর্ট্ করব না?

মহা। আমি বাইরে যাই দাদাঠাকুর। (সসম্ভ্রমে প্রস্থান)

নুট। (মহাভারতের যাওয়াটা গ্রাহ্যই করিল না) হ্যাঁ, ও'রা আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছেন। অল্পবয়সে মানুষ এক দিকই দেখে, দু দিক দেখতে চায় না। দিনে আলোকে ভাবে একমাত্র সত্যি, আলোই থাকবে চিরকাল; আবার রাত্রে অন্ধকারকেও ভাবে তাই। দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কঙ্কণার বাবুদের দোষটাই সে বয়সে আমার চোখে পড়েছিল, দোষ ছাড়া কিছু দেখতে পাই নি ; কিন্তু আজ দেখছি, গুণও যথেষ্ট আছে ও'দের।

বৃদ্ধ। কর্তাবাবু রসিক লোক তো, বললেন—যাব একদিন নুটুবাবুর ওখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তা বললেন—নুটু শুনেছি মস্ত উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকে ডাক আসে, আমি একবার তার সঙ্গে সওয়াল-জবাব করতে যাব রাজেনবাবু। নিজের নাতিকে —দেবনারায়ণবাবুর ছেলেকে দেখালেন, ছেলেটি এবার বি. এ. পাস করেছে। ভাল ছেলে। বললেন—একেও আমি উকিল করব। তা তোমার ছেলেটি কই—আমাদের দেশের ভাবী উজ্জ্বল নক্ষত্র?

নুট। অরুণ!

(প্রবেশ করিল শ্যামা)

শ্যামা। দাদা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

বৃদ্ধ। এটি তোমার মেয়ে?

নুট। প্রণাম কর শ্যামা। (শ্যামা প্রণাম করিল)

বৃদ্ধ। রাজরাণী হও ভাই। বাঃ, চমৎকার মেয়ে! মেয়ের বিয়ের ঠিক কিছু করলে? এইবার বিয়ে দাও।

(শ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল)

নুট। পাত্র খুঁজছি, কিন্তু মনের মত যে পাচ্ছি না। বর পাচ্ছি তো ঘর পাচ্ছি না, ঘর মিলছে তো বর মনের মত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। এক কাজ কর না! দেবনারায়ণের ছেলেটিকে দেখ না! ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগল হে।

(নুটু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল)

আজ উঠলাম নুটু। তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আলাপ করব।

নেপথ্যে সুশোভন। (জড়িতকণ্ঠে) "মরণ রে, তু'হু মম শ্যাম সমান"।

বৃদ্ধ। ওই সেই লোকটা না?

নুট। (গম্ভীরভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। না নুটু, তুমি এ কাজ ক'রো না। না না না। তোমার মত লোকের—ছি ছি ছি!

(নুটু চুপ করিয়া রহিল। প্রবেশ করিল সুশোভন)

আচ্ছা, আজ আমি আসি। (প্রস্থান)

(নুটু তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল ; রুদ্ধ গম্ভীর তাহার মূর্তি)

নুট। দারোয়ান!

সুশোভন। (অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) আমার মুখ দিয়ে আজ রক্ত উঠল নুটুদা। আমার

দশটা টাকা দেবেন ? ডক্টর সেন আট টাকার কমে দেখেন না।

(দারোয়ানের প্রবেশ, অভিবাদন করিল)

নুটু। ইস্‌কো নিকাল দো বাড়িসে।

দারোয়ান। (বিস্মিত হইল) হুজুর !

নুটু। নিকাল দো ইস্‌কো। (সুশোভনকে আঙুল দিয়া দেখাইল)

সুশোভন। আমাকে নিকাল দেবে নুটুদা ?

নুটু। (দারোয়ানকে) খাড়া হোকে কেয়া দেখতা তুম।

সুশোভন। আমি যাচ্ছি নুটুদা। আই হ্যাভ নো ডিজায়ার টু লিভ, রোগের যন্ত্রণা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্টিল আই ওয়ান্টেড টু লিভ ফর কল্যাণী—সে বড় আঘাত পাবে, দ্যাট ইজ দি রিজন্‌ আই কেম অ্যাবেগিং। আমি যাচ্ছি। "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"। (প্রস্থান)

নুটু। আওর বাড়িমে ঘুস্‌নে মৎ দো। নেহি তো তুমারা নোক্‌রি চলা যায়গা। যাও।

(দারোয়ানের প্রস্থান)

(মুহুরীর ফাইল লইয়া প্রবেশ)

এখন নয়, পরে। যাও এখন।

(ফাইল রাখিয়া মুহুরীর প্রস্থান)

শ্যামা !

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবা !

নুটু। মহাভারত বললে, কল্যাণী এসেছে—

শ্যামা। হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

নুটু। পাঠিয়ে দাও এখানে।

(শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল)

এক্ষুনি, বলবে, আমি অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এক্ষুনি।

(শ্যামার প্রস্থান)

(নুটু দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করিতে লাগিল)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

নুটু। (স্থির হইয়া দাঁড়াইল) কল্যাণী ! আমি সুশোভনকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি। আর কোনদিন আমার বাড়ি ঢুকতে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণী। (মাথা হেঁট করিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল) আপনি দাদা, শাসন আপনি করবেন বইকি নুটুদা।

নুটু। না, শাসন নয়। তার সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা আমার নেই, হতে পারে না। তোমাকেও ওকে ত্যাগ করতে হবে কল্যাণী।

কল্যাণী। (শিহরিয়া) নুটুদা ! ছোড়দার মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে রক্ত ওঠে। উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

নুটু। তার মরবার জায়গার অভাব হবে না কল্যাণী। হাসপাতাল আছে, গাছতলা আছে, পথ আছে—

কল্যাণী। আপনি কি বলছেন নুটুদা ?

নুটু। সত্য চিরদিন নিষ্করুণ কঠোর। জ্ঞানহীন শিশু আগুনের শিখায় হাত দিলে জ্ঞানহীন ব'লে আগুন তাকে ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচার আগুনের মতই দীপ্ত,

পবিত্র, অথচ নিষ্ঠুর। সে বিচারের দণ্ড থেকে অপরাধীকে রক্ষা করতে গেলে তার আঁচ তোমাকেও লাগবে। আরও একটা কথা—তোমাকেও কতকগুলো জিনিস ছাড়তে হবে।

কল্যাণী (স্থিরভাবে নুটুর দিকে তাকাইয়া তারপর ধীর-স্বরে বলিল) বলুন।

নুট। দারিদ্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে দারিদ্র্য মর্যাদাহীন নয়, সে দারিদ্র্য মহত্বহীন নয়, তাতে মালিন্য নেই।

কল্যাণী। সেই দীক্ষাই তো আপনার কাছে—

নুট। আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিতে পার নি। কল্যাণী, তুমি জামা তৈরি ক'রে বিক্রি করতে যাও ভদ্রলোকের বাড়ি, তারা তোমাকে করুণা ক'রে জিনিসের দাম বেশি দেয়, দয়া করে। সেটা বিনিময় নয়, দান। তোমার বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখ—মালিন্যের ছাপ। ওসব তোমায় ত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী। আর কিছু আমায় বলবেন দাদা ?

নুট। তোমার উত্তর শুনতে চাই বোন।

কল্যাণী। না।

নুট। সময় চাচ্ছ ? উত্তর এখন দিতে পারবে না ?

কল্যাণী। না। আমার উত্তরই দিচ্ছি—না। আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। দয়া আমি কারও কাছে নিই না। আমার দারিদ্র্য আমার অহংকার। আর ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই। তা ছাড়া নুটুদা, আপনি যখন তাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারছেন না, তখন মমতার বাপকেই বা 'আত্মীয়' ব'লে স্বীকার করবেন কি ক'রে ? মমতা তো তার বাপকে অস্বীকার করতে পারবে না নুটুদা।

নুট। (কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম। ভবিষ্যতেও—

কল্যাণী। মমতাকে, ছোড়দাকে নিয়ে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

নুট। অপেক্ষা কর।

(কল্যাণী দাঁড়াইল, নুটু আলমারি খুলিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীকে দিল)

মমতার গহনা—আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে। আর একটা কথা।

কল্যাণী। বলুন !

নুট। সম্বন্ধ ছাড়বার আগে যদি মমতার মামা হিসাবে তার বিবাহে কিছু যৌতুক দিই, সে কি তুমি নেবে না ?

কল্যাণী। (একটু ভাবিয়া) মাথা পেতে নেব নুটুদা।

[নুটু চেক-বই বাহির করিয়া একটা চেক লিখিল]

নুট: এই নাও। মমতার বিয়েতে যৌতুক দিও।

কল্যাণী। (চেক মাথায় ঠেকাইয়া) শ্যামা-অরুণের আমি পিসীমা। তাদের বিয়েতে আমাকেও কিছু দিতে হয় দাদা। গরিব বোন ব'লে ফিরিয়ে দেবেন না।

(প্রণাম করিয়া চেকখানি নুটুর পায়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নুটু চেকখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর সিগার ধরাইল)

মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। যে মকদ্দমাটায় আমরা হেরেছি, সেইটের রায়। (রায়ের কাগজ নামাইয়া দিল)

হাইকোর্টে আপীল করবে পার্টি! তাই বলে, পয়েন্টগুলো একবার দেখে—

(নুটু পড়িতে আরম্ভ করিল। মুহুরীর প্রস্থান)

নুট। (পড়িতে পড়িতে উত্তেজিত ভাবে) অ্যান ইডিয়ট! গর্দভ বিচারকের আসনে বসলে চিৎকারের মূল্য থাকে—যুক্তি হয় মূল্যহীন। (রায়খানা সক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার'।

(উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিল। বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিল)

(মুহুরীর পুনঃপ্রবেশ)

মুহুরী। (ব্যস্তভাবে) বাবু, কঙ্কণার বাবুরা—কর্তাবাবু, দেবনারায়ণবাবু এসেছেন।

নুট। (চকিত হইয়া উঠিল) কে? কঙ্কণার বড়বাবু?

(ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। মুহুরী রায়খানা কুড়াইয়া ফাইল সমেত গুছাইয়া লইল। নুটু, শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ। মুহুরীর প্রস্থান)

নুট। আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ। (বড়বাবুকে প্রণাম করিল, দেবনারায়ণকে নমস্কার করিল) বসুন।

শিব। সে তো তুমি না বলতেই এসেছি হে। এখন তাড়িয়ে দেবে কি না বল?

নুট। (পুনরায় প্রণাম করিয়া) তা বলতে পারেন। আপনাদের কাছে আমার অনেক অপরাধ। তবে আমি অমানুষ নই।

শিব। এক শো বার—হাজার বার। শুধু মানুষ নয় হে, তুমি একটা মরদ। মরদ-পুরুষ সংসারে বড় দুর্লভ হে। তুমি একটা মরদ।

দেব। অপরাধ আপনার নয় নুটুবাবু, দোষ আমাদেরও অনেক ছিল।

শিব। (চারদিক দেখিয়া) তাই তো হে নুটু, এ যে তুমি ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! বা—বা—বা! বলিহারি—বলিহারি! হুঁ, তুমি মরদ বটে।

নুট। এখন বসুন।

শিব। শোন হে নুটু, কি জন্যে এসেছি শোন। তোমার সঙ্গে সওয়াল করতে এসেছি। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে সেরা উকিল। এ-জেলা ও-জেলা ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে সওয়াল করব।

নুট। (হাসিয়া) বেশ, বসুন।

শিব। ধর, তোমার বাড়িতে ভিখিরী এসেছে। তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই না দাও তাকে?

নুট। এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা। আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন —এ যে বলির দ্বারে বামনদেবের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

শিব। হুঁ। উপমাটা তুমি বড় ভাল দিয়েছ নুটু। তবে দেখ, বিবেচনা ক'রে দেখ, পাতালে থাকতে যদি ভয় হয় তো ভেবে দেখ। (হা-হা করিয়া হাসিলেন)

নুট। বসুন আগে।

শিব। উঁহু, আগে তুমি দেবে বল; তবেই বসি, নইলে যাই।

নুট। বেশ, মাথাই পাতলাম আপনার পায়ে। এইবার বসুন। বসুন দেবনারায়ণবাবু, বসুন।

শিব। ওকে বলতে হবে না; ওর বাবা বসবে—ও তো ছেলেমানুষ। ঠিক বসবে ও।

(উভয়ে বসিলেন)

নুট। এইবার অনুমতি করুন।

শিব। (বসিয়া) তোমার বড় ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে; আমার নাতনীকে

তোমায় আশ্রয় দিতে হবে—দেবনারায়ণের মেয়ে।

দেব। (নুটুর হাত চাপিয়া ধরিল) আমাকে কন্যাদায় থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

শিব। তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ.-তে এম. এ.-তে ফার্স্টো হয়েছে। তুমি নিজে একটা মরদ, দেশবিদেশে নামডাক। টাকাও করেছ অঢেল। কিন্তু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে তোমার বাড়ির অযুগ্যি হবে না। আর নাতনীর আমার ভারি লক্ষণ ভাল হে। রুপের কথা আর বলব না, তুমি নিজেই দেখবে। আমি তো নুটু, ম'জে আছি নাতনীর রূপে! দেবুর যে আমার জামাই পছন্দ হ'ল না, নইলে—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

দেব। নুটুবাবু!

নুট। (হাসিয়া) ছাড়ুন, কর্তাকে আগে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) ভিক্ষে আমি দিচ্ছি; কিন্তু ভিক্ষে তো শুধু দিতে নেই কর্তা, সে তো আপনাকে বলতে হবে না। দক্ষিণে সমেত ভিক্ষে দেব আমি। 'না' বললে শুনব না। আমার কন্যাও বিবাহ-যোগ্যা, সেইটিকে দক্ষিণে স্বরূপ আপনাদের নিতে হবে—দেববাবুর বড় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

শিব। বলিহারি! বলিহারি! বলিহারি! এই না হ'লে উকিল! ওরে বাপ রে! উল্টো ছাঁদে গেরো! ও দেবু, নুটু যে হারিয়ে দিলে রে! (হা-হা করিয়া হাসিলেন) আচ্ছা, তাই হ'ল।

নুট। ছেলেমেয়েকে আমি ডাকি।

শিব। না, আজ থাক্। দেখাশুনো দিন দেখে। আজ নয়। আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠলাম।

নুট। সে কি! একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতেই হবে।

শিব। আজ নয় বাবা। আগে তুমি যাবে কঙ্কণার বাড়ি, আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেবে, তবে। আজ ব'লো না। সে আমার প্রতিজ্ঞা আছে নুটু, উঁহু সে হবে না।

নুট। (হাসিল) বেশ, আজ বিকেলেই যাব আমি।

(শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ অগ্রসর হইল, নুটু অনুসরণ করিল। নুটু ফিরিল)

নুট। বিমলা! বিমলা!

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। মা কঙ্কণায় গেছেন।

নুট। কঙ্কণায়? এ কি, তুই যেন কেঁদেছিস মনে হচ্ছে শ্যামা!

শ্যামা। না বাবা, না। (প্রস্থান)

নুট। শ্যামা! (অনুসরণোদ্যত)

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। দাদাঠাকুর!

নুট। এস মহাভারত। বাবুরা আজ কি জন্যে এসেছিলেন জান? দেববাবুর মেয়ের সঙ্গে—

(মহাভারত প্রণাম করিল)

মহা। আমি চললাম দাদাঠাকুর।

নুট। না। ও-বেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি ও-বেলা বাবুদের ওখানে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মহা। না।

নুট। তুমি অরুণের খুড়ো, দেবনারায়ণবাবু তোমাকে বেয়াইয়ের মত সম্মান করবেন।

মহা। সম্মান! জুতোর ছাপটা যে বুকের ভেতর এখনও আঁকা আছে দাদাঠাকুর। সম্মানে আমার কাজ নাই। দিদিঠাকুরুন কাশী যাচ্ছে, আমিও তেনার সাথে কাশী যাচ্ছি। আর কটা দিন বলেন? ই কটা দিনের তরে বাবুদের বেয়াই হতে লারব। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপুনি শেষটা এই করলেন দাদাঠাকুর?

(প্রস্থান)

নুট। (দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) মহাভারত! মহাভারত! (অগ্রসর হইল, দরজার মুখেই অরুণ প্রবেশ করিল, নুটু থমকিয়া দাঁড়াইল)

অরুণ। সে চ'লে গেল।

নুট। ডাক তো তাকে।

অরুণ। সে ফিরবে না বাবা।

নুট। (হাসিয়া) সে আমার ওপর রাগ করেছে। একজন লোক পাঠাতে হবে ওর বাড়িতে। যাক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে।

অরুণ। আপনার কাছে আমারও কিছু বলবার আছে বাবা।

নুট। (তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অরুণের আপাদমস্তক দেখিয়া) অরুণ!

অরুণ। বলুন।

নুট। আমার মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্যের সঙ্গে তোমার বক্তব্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। নয় কি? [অরুণ চুপ করিয়া রহিল] বল, কি বলবে বল? তোমার বক্তব্যই আগে শুনব আমি।

অরুণ। আপনি কি কল্যাণী-পিসীমাকে—

নুট। কল্যাণীর সঙ্গে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি।

অরুণ। ত্যাগ করেছেন?

নুট। তুমি কি আমার কাছে তার জন্যে কৈফিয়ত চাও?

অরুণ। না। ও-কথা আর জিজ্ঞাসা করব না। আমার আর একটা কথা জানবার আছে। আপনি কি কঙ্কণার গাঙুলীদের বাড়িতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন?

নুট। লজ্জাহীনতা কি মডার্নিজমের প্রধান ধর্ম অরুণ?

অরুণ। জীবনের অতি গুরুতর সমস্যায় আপনার মত ব্যক্ত করা লজ্জাহীনতা বাবা? সে হ'লে আপনার কথা সত্য, আমি স্বীকার করছি।

নুট। ভাল, এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অরুণ।

অরুণ। বলুন।

নুট। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার অধিকার আমার চেয়ে কম নয়। তোমার সে অধিকার আমি স্বীকার ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার ঘর—আমার গ'ড়ে তোলা সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সম্রাট।

অরুণ। দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যদি আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বিদ্রোহ করবার অধিকার আপনার থাকে, তবে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে—

নুট। তুমি বিদ্রোহ করবে অরুণ? তুমি আমাকে অমান্য করবে?

অরুণ। গাঙুলীদের বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না—এই কথাটা আপনার পায়ে ধ'রে জানাতে এসেছি বাবা।

নুট। (সরিয়া গিয়া) থাক্, আমার পা তুমি স্পর্শ ক'রো না।

[অরুণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল]

তোমার বক্তব্যের বোধ করি আরও কিছুটা বাকি আছে। সেটা বোধ করি এই যে, মমতাকেই তুমি বিবাহ করতে চাও ?

[অরুণ নীরব হইয়া রহিল]

[নুটু আপন মনেই আবৃত্তি করিল]

I tax not you, you elements, with unkindness ;
I never gave you kingdom, called you children ;
You owe me no subscription : then let fall
Your horrible pleasure ; here I stand, your slave—

অরুণ, আজ কিং লিয়ারকে আমার মনে পড়ছে। অবশ্য কিং লিয়ারের মত সর্বস্বান্ত ইমোশনাল নই আমি। (অরুণের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) তুমি বিদ্রোহ করতে চাও অরুণ ?

অরুণ। (নতজানু হইয়া আবেগভরে) আপনার কাছে আমি মিনতি করছি। আজ আপনার গৌরবে আমি যে বিশাল সৌধ গ'ড়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সে সৌধ আপনি ভেঙে দেবেন না। আপনার আদর্শ—

নুটু। ইউ মীন টু সে, কংকণার বাবুদের বাড়িতে তোমার বিয়ে দিলে আমি আদর্শচ্যুত হব ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমাকে, সুশোভনবাবুকে, মমতাকে পরিত্যাগ করলে আপনি আদর্শ-চ্যুত হবেন, সে কি আপনি বুঝতে পারছেন না ?

নুটু। আমার আদর্শবোধে তোমার সন্দেহ জেগেছে, অরুণ ? এত বড় ইম্পার্টিনেন্স তোমার ? এত বড় স্পর্ধা ? গেট আপ, উঠে দাঁড়াও। [অরুণ উঠিল] এত বড় স্পর্ধা তোমার ? [অরুণ নীরব] উত্তর দাও। এত বড় স্পর্ধা তোমার ?

অরুণ। না, স্পর্ধা আমার নয়, স্পর্ধা আমার আদর্শের, যে আদর্শে আপনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। স্পর্ধা আমার শিক্ষার, যে শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন আপনি।

নুটু। সে শিক্ষার আরও কিছু বাকি আছে। শোন। অবাধ্য সন্তান আর দুষ্ট অঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। দুষ্ট অঙ্গের মতই তাকে পরিত্যাগ করতে হয়।

(অরুণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

তুমি জান অরুণ, কত বড় আঘাত তুমি আমায় দিয়ে যাচ্ছ ?

(অরুণ একবার দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই সে ফিরিয়া আসিল)

অরুণ। ওইটে আমি নিয়ে যাব। কার্পেটের ওপর লিখেছিলাম আমি, বুনেছিলেন মা। ওটা আমি নিয়ে যাব।

("It is easier for a camel"-লেখা সূচীশিল্পের দিকে অরুণ অগ্রসর হইল)

নুটু। (সক্রোধে) অরুণ !

অরুণ। না, ওটা আর এখানে থাকবে না, থাকতে পারে না, ওটা রাখবার আপনার অধিকার নেই।

নুটু। অরুণ !

অরুণ। আপনি আজ ধনী, দারিদ্র্যকে আজ আপনি ঘৃণা করেন, মিথ্যা মর্যাদার মোহে মানুষকে আপনি আত্মীয় স্বীকার করতে লজ্জা পান। বীর্যে সাহসে গৌরবান্বিত অতীতকে স্বীকার করতে আপনার আজ সঙ্কোচ হয়। আপনার কাছে থাকবে না। এ আমি নিয়ে যাব।

নুটু। ওটা তোমার মায়ের হাতের কাজ অরুণ, ওটা তুমি রেখে যাও। তোমার মা আমাকে

পরিত্যাগ করেন নি।

অরুণ। আমার আগেই আমার মা চ'লে গেছেন।

নুট। চ'লে গেছেন ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চ'লে গেছেন।

[অরুণ চলিয়া গেল]

নুট। রেখে যাও। ওটা রেখে যাও। অরুণ, ওটা রেখে যাও। (থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) বিমলা ! অরুণ ! মহাভারত ! (দরজা সন্ধান করিতে করিতে) দরজা—দরজা—দরজা কই, দরজা ? গেট অফ হেভেন্‌স কি বন্ধ হয়ে গেল ? স্বর্গদ্বার কি রুদ্ধ হয়ে গেল ? বিমলা ! বিমলা !

[কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া সোফায় পড়িয়া গেল]

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। বাবা ! বাবা ! বাবা ! এ কি ! দাদা—দাদা !

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

(অরুণ চলিয়া যাইতেছে, শ্যামা প্রবেশ করিল)

শ্যামা। ফেরো দাদা, ফেরো। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অরুণ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন ?

শ্যামা। হ্যাঁ, শিগগির ডাক্তার ডাক—শিগগির !

অরুণ। এইটে—এইটে—শ্যামা, এইটে নিয়ে যা। আমি পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডাকি।

শ্যামা। মায়ের কাছে লোক পাঠাও দাদা—শিগগির।

[সূচীশিল্পটি লইয়া চলিয়া গেল]

অরুণ। মুহুরীবাবু, শিগগির পাশের ডাক্তারকে ডাকুন। বাবার অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন—শিগগির। দরোয়ান !

নেপথ্যে শ্যামা। জল—জল—কেষ্ট, মাথায় জল ঢাল।

অরুণ। দরোয়ান ! দরোয়ান !

(দরোয়ানের প্রবেশ)

শিগগির তুমি কংকণায় যাও। মাকে গিয়ে বল, বাবার বড্ড অসুখ—শিগগির।

(দরোয়ানের প্রস্থান। অরুণ ভিতরে গেল। পুনরায় ফিরিয়া আসিল)

বরফ—বরফ—মুহুরীবাবু, ডাক্তারবাবু কি এখনও এলেন না ?

[প্রস্থান]

নেপথ্যে নুট। দরজা—দরজা ! বিমলা, দরজা খুলে দাও। বিমলা !

নেপথ্যে অরুণ। এই যে ডাক্তারবাবু !

(ডাক্তার ও অরুণ ঘর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই অরুণ প্রবেশ করিল)

অরুণ। মুহুরীবাবু ! হরিশ, মুহুরীবাবু কি এখনও বরফ নিয়ে ফেরেন নি ? (প্রস্থান)

নেপথ্যে নুটু। বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল।
নেপথ্যে শ্যামা। সব দরজা-জানলা খুলে দিয়েছি বাবা!
(বরফ লইয়া মুহুরী ভিতরে গেল, বিমলা ও অরুণের প্রবেশ)
বিমলা। রাস্তায় দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হয়েছে অরুণ, কোনও আশাই কি নেই? ওরে, ওদের তুই ভেতরে নিয়ে আয়। আমি—
নেপথ্যে নুটু। মাই লর্ড—
(বিমলা ও অরুণের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রইং-রুম

(সোফার উপর নুটু শায়িত। শ্যামা, বিমলা, অরুণ, মহাভারত, মমতা, কল্যাণী প্রভৃতি)
নুটু। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God
(নুটুর চেতনা হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিমলার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিল)
নুটু। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।
বিমলা। না না। তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়, না হতে পারে? না না।
নুটু। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহাভারত চ'লে গেছে। অরুণ— ; কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে— ; আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। সম্মুখে আমার গাঢ় অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।
বিমলা। না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তোমার স্বর্গদ্বার খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কণার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি।
মহা। দাদাঠাকুর!
নুটু। কে? মহাভারত? মহাভারত, ভাই! কল্যাণী কই? কল্যাণী?
(সম্মুখে সূর্যাস্তের রশ্মি ঘরে আসিয়া পড়িতেছিল। নেপথ্যে বেহালা বাজিয়া উঠিল)
নুটু। কল্যাণী!
কল্যাণী। দাদা!
নুটু। মার্জনা—বোন—মার্জনা—
(কল্যাণী কোন কথা বলিল না, নুটুর পায়ে মাথা রাখিল)
একদিন বলেছিলাম, তোমার স্থান আমার মাথায়, যদি কোনদিন প'ড়ে গিয়ে আঘাত পাও, দেহে তোমার ধুলোর মালিন্য লাগে—
কল্যাণী। (মুখ তুলিল, চোখে অশ্রুর রেখা) না না, আঘাত পাই নি, ধুলো লাগে নি। বউদি আমায় কোল পেতে ধরেছেন দাদা।
নুটু। বিমলা!
(বিমলা কথা বলিল না, ম্লান হাসি হাসিল)
মহা। দাদাঠাকুর।
নুটু। মহাভারত, সুশোভন কই? সুশোভন?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর বারান্দায় ব'সে আছেন দাদাঠাকুর। তিনি বললেন, আপনার কষ্ট তিনি দেখতে পারবেন না।

নুট। বেহালা বাজাচ্ছে, নয়? আঃ, চমৎকার! সেই গানটা বাজাতে বল মহাভারত, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চল্, একলা চল, একলা চল রে'।

(অরুণ উচ্ছ্বসিতভাবে পায়ের উপর পড়িল)

কে? কে?

অরুণ। বাবা!

বিমলা। অরুণ। মাফ চাচ্ছে তোমার কাছে।

নুট। মাফ! না না, তার তো অপরাধ নয়।

বিমলা। তবে তাকে তুমি আশীর্বাদ কর।

নুট। আশীর্বাদ! স্ট্যাণ্ড আপ মাই বয়, স্ট্যাণ্ড আপ। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও।

(অরুণ দাঁড়াইল)

আমার যাত্রা আজ শেষ হ'ল, তোমার যাত্রা শুরু হ'ল। সে যাত্রায় তোমার জয় হোক। আমার সম্মুখে সন্ধ্যা, তোমার সম্মুখে যেন উদয় হয় নবপ্রভাত। কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং মাই বয়, কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং!

বিমলা। এইবার তুমি চুপ কর। আর কথা ব'লো না। হাঁপাচ্ছ তুমি।

নুট। (ব্যস্তভাবে) একটা কথা—একটা কথা—তোমায় একটা কথা বলব শুধু।

বিমলা। বল।

নুট। না, কারও সাক্ষাতে নয়—কারও সাক্ষাতে নয়। যেতে বল—সব যেতে বল।

(সকলে চলিয়া গেল)

বিমলা। বল, কি বলছ বল।

নুট। বলবার কিছু তো নেই। দিচ্ছি—তোমায় দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ কর—

(বিমলা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

নুট। বুঝতে পারছ না? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার সব—সব আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

(বিমলা পাথরের মত উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বেহালা বাজিতেছে। যবনিকা নামিয়া আসিল।)

গ্রন্থ-পরিচয়

'নবদিগন্ত'

তারাশংকরের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস-নির্ভর কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি করা। তিনি গল্প-উপন্যাস-নাটকে নানা বাস্তব জীবনের সমস্যা ও ঘটনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ইতিহাস-আশ্রিত বিষয়কেই বেছে নিয়েছেন বেশী করে। আবার তাঁর মন্বন্তর (১৩৫০), ঝড় ও ঝরাপাতা (১৩৫৩), সপ্তপদী (১৩৬৪), 'বিপাশা', (১৩৬৪), 'যোগভ্রষ্ট' (১৩৬৭), 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' (১৩৭০) অথবা 'উনিশ শ' একাত্তর' (১৩৭৮) প্রভৃতি উপন্যাসের অবলম্বন ছিল একবারে সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী।

প্রখ্যাত ও প্রবীণ সাহিত্য-সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক বৃহৎ গ্রন্থে 'মন্বন্তর' প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেনও—তারাশংকর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সদ্যলব্ধ কাহিনী তুলে এনে তাঁর উপন্যাসে সংযোজন করছেন।*

সমসাময়িক কালের ঘটনা নিয়ে গল্প বা উপন্যাস রচনা করলে সমসাময়িক কাহিনী-নির্ভর হবে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু তার প্রয়োগনৈপুণ্য কতটা রসসিক্ত ও সার্থক হয়েছে—কতটা মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে সে আখ্যায়িকায় সেটাই দেখার।

তারাশংকরের 'নবদিগন্ত' উপন্যাসের আরম্ভ ১৯৪৩ খৃীষ্টাব্দের যুদ্ধ ও মহামন্বন্তরের ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলির কথা দিয়ে। কিন্তু তারাশংকর প্রেক্ষাপটের সামনে পিছনে আলো ফেলে কাহিনীকে নিয়ে গিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। তারপর ধীরে ধীরে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। পিতামহ, পুত্র ও পৌত্রকে নিয়ে 'নবদিগন্ত'-এর কাহিনী বয়ন করেছেন তারাশংকর।

বর্ধমানের এক গণ্ডগ্রামে মাতুলালয়ে লালিত ও অযত্নে বর্ধিত এক মাতৃপিতৃহীন কুলীন-পুত্রের কাহিনীই হচ্ছে 'নবদিগন্ত' উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বিদ্যার্জন, জমিদারের জামাতা হয়েও জমিদারগৃহিণীর জামাতার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ—তারপর অতি কষ্টে পুনরায় বিদ্যার্জন ও আইনজীবী হিসেবে সুদূর চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠালাভ—এই উপন্যাসের প্রথম দিকের প্রধান অংশ।

স্রষ্টা তারাশংকর কাহিনী ১৯৪৩ খৃীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে বারে বারে অতীতে ফিরে গিয়েছেন। আবার সমসাময়িক ভারতের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথের অতি সচেতন এবং সজীব বর্ণনা দিয়েছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত।

এই বর্ণনায় দ্রুত বিলীয়মান অতিনিকটবর্তী অতীতের পটভূমিতে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং তারাশংকরের জীবনের চোখে দেখা অনেক কাহিনী প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই মহা উপন্যাসে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মহাঝঞ্ঝা, দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অসংখ্য মানুষের আত্মবলি ও রাজনৈতিক মহাসংগ্রাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এর উন্মাদ-করা ঘটনাবলী, দেশভাগের আগের Direct action-এর সেই ভয়ংকর দিনগুলি এবং হিন্দু ও মুসলমানের হানাহানি ও রক্তপাত এবং ক্ষমতা হস্তান্তর ও খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং আততায়ীর হাতে গান্ধীজীর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে 'নবদিগন্ত' উপন্যাসের যবনিকা নেমে এসেছে।

তারাশংকর ১৯৪৩ খৃীষ্টাব্দের নানা ঢেউ ও তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উত্তাল ভারতবর্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটি প্রেম ও ভালোবাসার এবং রাজনীতির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হৃদয়বিদারক সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী নিপুণ হাতে বয়ন করে গিয়েছেন।

---

* 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ. ৫৬১

তারপর তাঁর পরিণত লেখনী ধীরে ধীরে উপন্যাসের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

'নবদিগন্ত'-এর মধ্যে অসংখ্য গৌণ ও অগৌণ চরিত্র এসে ভিড় করেছে। স্রষ্টা তারাশঙ্করের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল এই মহা উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের পটভূমিকায় কাহিনী টেনে এনে উপন্যাসটি শেষ করবেন। আকস্মিক মৃত্যু এসে তাঁর সে আশা পূর্ণ হতে দেয় নি।

তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালের কথা লিখেছেন। সেসময় সারাদেশব্যাপী ক্ষুধাতুর জনসাধারণের মৃত্যুমিছিল। আর একদিকে কালোবাজারী ও চোরা-চালানকারীদের প্রাদুর্ভাব। কলকাতার রাস্তাঘাটে বের হলই মৃতদেহ চোখে পড়ে। তারই সঙ্গে বিদেশী সৈন্যদের কদর্য ব্যভিচার ও হঠাৎ বড়লোকদের লাম্পট্য ও লালসার বিকৃত জীবন এবং সেই সঙ্গে সে-সময়ের আদর্শবাদী যুবক-যুবতীদের কথাও বর্ণনা করেছেন।

'ঝড় ও ঝরাপাতা' ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের রক্তঝরা দিনগুলিকে নিয়ে লেখা। অজয় ও উমার মত দুটি কিশোর ও কিশোরীকে এই উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়।

তবে তারা নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ও মেয়ে কানু ও নেবু। অজয় ও উমার মতই তাদের মনের মধ্যেও প্রেমের মুকুল হয়তো মুকুলিত হয়েছিল। নেবু গুলি লেগে মারা যায়।

'যোগভ্রষ্ট'র মধ্যে আমরা Direct action-এর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিশীর্ণ মৃত্যুআতঙ্কে আতঙ্কিত কলকাতাকে দেখতে পাই।

'বিপাশা'র মধ্যে পাই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের দেশভাগের দিনগুলির রক্ত নিয়ে হোরি খেলার কথা।

'সপ্তপদী'তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কদাচার ও ব্যভিচার দেখতে পাই রিশ ব্রাউনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও লাম্পট্যের মধ্যে।

স্রষ্টা তারাশঙ্কর 'নবদিগন্তে'র মধ্যে তাঁর চোখে দেখা ঘটনা ও আত্মজৈবনিক কাহিনী মিশিয়েছেন। তাঁর প্রথম জীবনের দেশসেবার কাহিনী পাওয়া যায় এলাহাবাদের মনোরমার পরিবারের মধ্যে। গঙ্গাচরণের চরিত্রে যেন নুটু মোক্তারের চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অন্ততঃ প্রথম জীবনের নুটুবাবুর সঙ্গে গঙ্গাচরণের মিল আছে।

হরিপ্রিয়ার সঙ্গে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী নীহারবালার ক্ষীণ সাদৃশ্য যেন চোখে পড়ে।* 'আমার সাহিত্য-জীবন'এ নীহারবালার সঙ্গে এক ট্রেনে যাওয়ার কথা তারাশঙ্কর বলেছেন।

'নবদিগন্ত' উপন্যাসটির গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশ : প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮০ (?)। ডবল ডিমাই সাইজ, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রচ্ছদপট। বোর্ড বাঁধাই। পৃ: ৪+৪৩০। প্রকাশক : শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

'নবদিগন্ত' তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি। কথাশিল্পী ও কাহিনীকার হিসেবে তিনি যে অনন্যসাধারণ ছিলেন 'নবদিগন্ত' পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়॥

* 'আমার সাহিত্য জীবন' দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ৫৯

'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী'

তারাশংকরের সঙ্গে পল্লীবাংলা—বিশেষ করে রাঢ়-বাংলার লাল মাটি ও শালবন—তার তথাকথিত পতিত ও অন্ত্যজ শ্রেণী, সাঁওতাল-আউল-বাউল-বৈষ্ণব-বেদে-সাপুড়ে-বাউরি-বাগদি প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। প্রথম যৌবনে দেশ-মাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য দেশসেবায় ব্রতী হয়ে তিনি তাদের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার সামাজিক রীতিনীতি এবং অভাব ও অভিযোগ বুঝতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের সুখ ও দুঃখের অংশভাগী হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। তার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসে।

জীবনের একেবারে অন্তিমে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এ 'নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতামালা'য় বক্তৃতা দিতে। ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল অধ্যাপক ও দেশবরেণ্য নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নামে এই 'বক্তৃতামালা'র ব্যবস্থা করেন তাঁর সুযোগ্য ও যশস্বী পুত্র বিনয়েন্দ্রনাথ।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'বক্তৃতামালা'র বক্তা নির্বাচিত হন তারাশংকর। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ তারিখে তিনি শান্তিনিকেতনের চীনা ভবন-এর প্রাঙ্গণে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা করেন।

এই বক্তৃতা চতুষ্টয় এবং রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারত ধর্ম" মোট পাঁচটি প্রবন্ধ একত্র সংকলিত করে তারাশংকরের জীবিতকালে সর্বশেষ গ্রন্থ—এই প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হয়।

'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাংলা' প্রবন্ধ সংকলনটির পুস্তক-আকারে প্রথম প্রকাশ—প্রথম সংস্করণ : ২৭ ভাদ্র ১৩৭৮ (?) [ইং সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (?)]। ডবল ডিমাই সাইজ। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য: ৪.৫০। প্রকাশক : সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯।

স্রষ্টা তারাশংকর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে কি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থে তারাশংকরের মন্তব্যে।

শান্তিনিকেতনের 'চীনাভবনে'র সভাস্থলে তারাশংকর রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে গভীর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় শেষ প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন :

'...জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম।..."

'দুই পুরুষ'

তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' খুবই মঞ্চ-সফল বিখ্যাত নাটক। ইতিপূর্বে তিনি 'মারাঠা তর্পণ' নামক একটি নাটক লিখে লাভপুরে মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু সুখ্যাতির অভাবে এবং কলকাতার রঙ্গমঞ্চের মঞ্চকর্তাদের দুর্ব্যবহারে সেটি তিনি অগ্নিতে সমর্পণ করেন।*

তারাশঙ্কর নিজেই ছিলেন সুবিজ্ঞ ও শৌখিন সুঅভিনেতা। তাছাড়া লাভপুরে বিত্তবান ও ভূস্বামীর অভাব ছিল না। কলকাতার মতই সেখানে গড়ে উঠেছিল নাট্যমঞ্চ। বিখ্যাত এবং যশস্বী নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িও ছিল লাভপুরে। তাঁর অনেক নাটকের প্রথম রজনীতে তারাশঙ্কর অভিনয় করেছেন। নাটকের মঞ্চসজ্জা সংলাপ ও অভিনয়ে তারাশঙ্করের ছিল অগাধ জ্ঞান। নাটককে কি করে মঞ্চ সফল ও গতিশীল করে তোলা যায়—তার অনেক নির্দেশ তিনি দিয়েছেন 'দুই পুরুষ' নাটকের মধ্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যাহ্নে জাপান যখন পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে এবং সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছে—সে সময় মঞ্চস্থ হয় 'দুই পুরুষ'। সেই সময় দেশের ভয়ানক দুর্দিনেও মঞ্চসফল নাটক হিসেবে মঞ্চপ্রেমিক জনসাধারণের অভিনন্দনে নাটক ও নাট্যকার উভয়েই অভিনন্দিত হন। 'নিউ থিয়েটার্স' কর্তৃক চলচ্চিত্রায়িত হয়ে 'দুই পুরুষ' চলচ্চিত্রেও প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল।

নাট্যকার তারাশঙ্করের নাটক রচনা সম্পর্কে প্রথম যৌবন থেকেই কি ধারণা ছিল তা বিবৃত করেছেন "ইতিহাস ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে। "ইতিহাস ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি:

"এবার নিজের কথা বলি। তখন ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যের কোন একটা সময়। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে একদফা আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। পরাধীন দেশের তরুণ, পরাধীনতার বেদনা অনুভব করি। সে আন্দোলনের উত্তাপ আমাকেও স্পর্শ করেছিল, তাতে অংশও গ্রহণ করেছিলাম। আবার অভিনয়ও ভাল লাগে, নাটক রচনা করি। সে রচনা অবশ্য তখন solitary pride-এর সামিল আমার কাছ। মধ্যে মধ্যে জমজমাট নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি। দেশপ্রেম, নাটক রচনা ও অভিনয়-স্পৃহা এই তিনের সম্মিলিত ফল একসময় দাঁড়াল একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাম 'মারাঠা তর্পণ'।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ১ আষাঢ় তারাশঙ্কর 'দুই পুরুষ' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন:
'দুই পুরুষ আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। সেই হিসাবে 'দুই পুরুষ'কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না।

'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম 'পিতা পুত্র' এবং ঐ নামেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "নাট্যভারতী"র কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন।"

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানখানি দিয়া নাটকের যবনিকা অপসারণে সমগ্র নাটকখানি মুহূর্তে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে; গানখানির জন্য নাটকখানি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গানখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য বিশেষভাবে তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 'হে ভুবনেশ্বর' গানখানি বন্ধুবর শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।"

---

* 'আমার সাহিত্য-জীবন', প্রথম পর্ব, পৃ. ১৭

"অপর গান কয়খানি বাংলার প্রতিভাশালী কবি-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা অনেক।"

"শখের নাট্য সম্প্রদায়কে একটি কথা নিবেদন করি। রিভলভিং স্টেজ (Revolving stage)—এর সুবিধায় আসবাবপত্র দিয়া প্রতিটি সেট সাজাইবার যে সুযোগ সাধারণ রঙ্গালয়ের আছে—তাহা তাঁহাদের নাই এবং গুটানো পট দিয়াই তাঁহাদের কাজ চালাইতে হয়। অথচ আসবাব দিয়া দৃশ্য সাজাইবার প্রলোভন তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন না। ফলে প্রতিদৃশ্যের পর পর্দা ফেলিয়া আসবাব সরাইতে হয়। নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। তাহাতে অযথা সময়ক্ষেপে নাটকের অভিনয়ের গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং তাঁহারা ওই প্রলোভন সম্বরণ করিয়া একটি প্রকাশ্য দৃশ্য (discover scene) এবং পরবর্তী দৃশ্যটি পট দিয়া আবৃত করিয়া অভিনয় করিবেন এই অনুরোধ।"

('দুই পুরুষ', ভূমিকা, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৪৯)।

'দুই পুরুষ' নাটকের 'ভূমিকা'য় তারাশংকর অনেক মূল্যবান কথা লিখেছেন। উপলব্ধি-পরায়ণ পাঠককে তারাশংকরের নাটক ও তাঁর সৃষ্ট নাট্যরস বুঝতে সাহায্য করবে।

'দুই পুরুষ' নাটকটির গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশ প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৯ (ইং [১৯৪২]) ; ডবল ক্রাউন সাইজ, কাগজের মলাট, পৃ ১২+১৪+১৪০ (টাইটেল পেজ, উৎসর্গ পত্র, ভূমিকা, 'নাট্যভারতী'তে প্রথম অভিনয় ও প্রথম রজনীর ব্যবস্থাপক ও অভিনেতৃ-গণ, পরিচয় এবং মূল নাটক) মূল্য : দেড় টাকা। প্রকাশক : শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ দাস, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

'দুই পুরুষ' নাটকের উৎসর্গ-পত্র এইরূপ

"পরম কল্যাণীয়
শ্রীমান শান্তিশংকর মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমান সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়"

তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' নাটকের বীজগল্প 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ খৃীষ্টাব্দে পাকাপাকি সাহিত্য-জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন তারাশংকর এবং দক্ষিণ কলকাতার মনোহর পুকুর সেকেন্ড লেন-এ একটি পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করলেন। এই ঘরখানিতে কাটিয়েছিলেন প্রায় দেড় বৎসর। এরই মধ্যে অনেকগুলি ভালো গল্প ও একটি উপন্যাস লিখেছিলেন।

"এই সময় আরো একটি গল্প লিখেছিলাম, 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'—দুই পুরুষের বীজ।" (আমার সাহিত্য-জীবন, প্রথম পর্ব পৃ. ১০৯। বৈশাখ ১৩৭৬)।

'দুই পুরুষ' নাটকের বীজগল্প 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পটির উৎসের সন্ধান তারাশংকরের লেখাতেই পাওয়া যায়। গল্পটির ঘটনাবলী ও নুটুবাবুচরিত্রটি কাল্পনিক নয়। এই নুটুবাবুকে নিয়েই তারাশংকর গল্পটি লিখেছিলেন। 'দুই পুরুষ' নাটক রচনার সময় আরো অনেক চরিত্রের সংযোজন ও রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে মূল গল্পের সংবর্ধন করেন। প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তারাশংকরের 'আমার সাহিত্য-জীবন' থেকে তুলে দিচ্ছি :

"দুই পুরুষের বীজ ছিল "নুটু মোক্তারের সওয়াল" নামক ছোট গল্পে। গল্পটি 'প্রবাসী'তে বের হয়েছিল। নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুর-হাট সাব-ডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার, তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতার অনেক গল্প আমাদের

দেশে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাবুদের বাড়িতে নেমন্তন্নে মাছ কম দেবার গল্প, নীচে খেতে দেওয়ার গল্পটি অন্যতম। তাঁর স্ত্রী নাকি এইভাবে অপমানিতা হয়েছিলেন এবং বাড়িতে এসে স্বামীর কাছে কেঁদেছিলেন। সেই কারণেই নাকি জেদের বশে ইস্কুল-মাস্টারি ছেড়ে মোক্তারি পাস করে নটুবাবু মোক্তারি আরম্ভ করেন এবং কয়েকশো টাকার একটি তোড়া স্ত্রীর হাতে দিয়ে নেমন্তন্ন খেতে পাঠান। বলে দেন যে, যখন মাছ দিতে আসবে তখন তোড়াটি নামিয়ে দিয়ে বলবে—আমার গয়নার টাকা হয়েছে, গয়না গড়ানো হবে, সুতরাং যাদের গয়না আছে তাদের সমান না হোক, একখানার চেয়ে কম দিলে চলবে না।" ('আমার সাহিত্য জীবন,' দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ৭৩। ভাদ্র, ১৩৭৩। কলকাতা।)।

'দুই পুরুষ' দেশের এক ক্রান্তিকালে মঞ্চস্থ হয়ে বিপুল খ্যাতি ও জন সম্বর্ধনা লাভ করে। স্বয়ং তারাশঙ্করের নিজের ভাষায়—"আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্মুখে প্রসারিত পথ। কাগজে কাগজে 'দুই পুরুষে'র অকুণ্ঠিত প্রশংসা বেরিয়েছে। একখানি কাগজ, বোধ হয় 'আনন্দবাজার', লিখেছে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের রুদ্ধপ্রায় গতি নূতন গতি পেল এই নাটকে এবং সেই গতির সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের গতির নিবিড় একাত্মতা আছে; বাঙালীর জাতীয় জীবনের সত্য এবং সার্থক নাটক; কথাশিল্পী তারাশঙ্কর নাট্যকার হিসাবে বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাগজে সংবাদ পাচ্ছি, লোকমুখেও সংবাদ পাচ্ছি, বন্ধুবান্ধবদের চিঠি পাচ্ছি, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে করতালি-মুখরতার মধ্যে নাটক অভিনয় হচ্ছে।"

"আজ বলি, আমার সাহিত্যিক-জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হ'লেও দুঃসময়ের পাওনা হিসাবে অসামান্য। সেদিন রঙ্গমঞ্চের এই সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমার জীবনে এ সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হ'ত না। শুধু আর্থিক সাহায্যই করে না রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার হিসেবে আমার খ্যাতিকে ত্বরিত গতিতে বিস্তৃত করেছিল। এই 'দুই পুরুষে'র সময়েই বাংলা দেশের সাহিত্যিক শিল্পী শিক্ষাবিদ চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়ার গায়ক গুণী ধনী বহুজন অভিনয় দেখে গেছেন।"

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত